"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

আলোকে ও আঁধারে
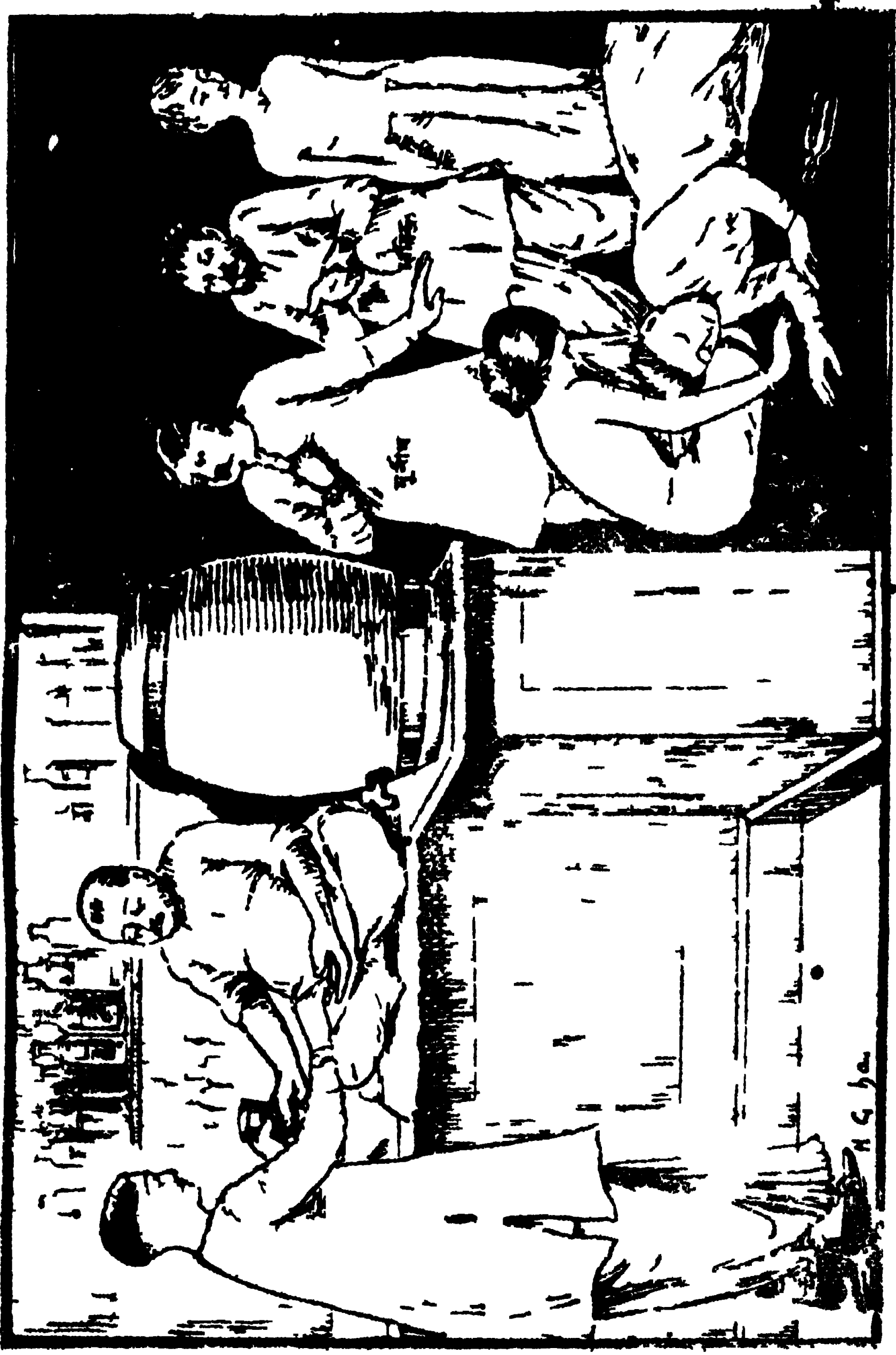
শুঁড়ীর দোকানে উজ্জ্বল গ্যাসের আলোয় যুবক যখন মদ ক্রয় কবেন ভখন তাঁহাব প্রাণে আমোদের ঢেউ খেলে নেশার ঝোঁকে তিনি ভবিষাতেব চিন্তা ভুলিয়া যান। কিন্তু পবিণামে তাহার ভাগ্যে দুর্নাম, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যনাশ স্ত্রীব মলিন মুখ চন্দ্রিমা ও কাতর অশ্রুজল সুনিশ্চিত।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৪শ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৩২ সাল { ১ম সংখ্যা

নববর্ষ-প্রাতে

তপ ক্লিষ্ট শী। সন্ন্যাসীর মত ধূলি ধূসরি[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভৈরব [illegible] বিশ্ব মানবের সভা দ্বারে আসিয়া করাল পিনাকে [illegible] দিয়া [illegible] পাড়িল বর্ষ [illegible] হইয়াছে বসন্তের শোভা সম্পদ সুখ স্মৃতি স্বপের স্বরের মত বিলীন হইয়াছে [illegible]—[illegible] কর্ম্মক্ষেত্র—নূতন চিন্তাধারা তোমার সম্মুখে হে মানব রৌদ্রতপ্ত মুখে [illegible] [illegible] দিব্যজ্যোতি [illegible] সুপ্ত প্রাণকে নাড়া দিয়া জাগাইয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইয়া চল [illegible] মায়া ত্যাগ করিয়া ঘর্ম্মধারার ক্লান্তি কালিমা মুছিয়া ফেলিয়া নূতন বর্ম্ম আঁটিয়া কর্ম্ম আহবে ছুটিয়া চল। নশ্বর জীবনের গণিত কয়টি বৎসরের মধ্যে পরিপূ। একটি বৎসর গত হইল তোমারি দেহ মানব বার্দ্ধক্য আর এক বৎসর বাড়িয়া গেল। হে জীবন পথের যাত্রী তোমার পাথেয়ের হিসাব নিকাশ কর তোমার জীবন শতদলে কতখানি মধু আছে—একবার পরিমাপ করিয়া লও। ব্যবসায়ী আজ যেমন তাহার দোকানে বৎসর সঞ্চিত ধূলা বালি ঝাড়িয়া পুরাতন আবর্জ্জনাকে দূর করিয়া [illegible] আসবাবে [illegible] ভরিয়া দ্বারে ঘটাম্র পল্লব রাখিয়া মঙ্গলের আবাহন করিতেছে ও তাহার পুঞ্জিত পণ্য দ্রব্যাদির হিসাব নিকাশ গ্রহণ করিতেছে তেমনি আজ তোমার জীবনের প্রত্যেক বিভাগটির জমা মজুদের ফিরিস্তি করিয়া কুচিন্তা কুবাক্য কুকর্ম্মগুলিকে বহিষ্কার করিয়া, নূতন সঙ্কল্প—নূতন শক্তি—নূতন প্রেমে দেহ মন আলোকিত করিয়া নূতন অতিথির আদর অভ্যর্থনায় সঞ্জীবিত পুলকিত হইয়া উঠ। হে যৌবনের ভিখারী, নবীনের পূজারী, অমৃতের

অভিলাষী, চাহিয়া দেখ— প্রভাতে আজ কোন্ অতিথি তোমার প্রাণের দ্বারে উপনীত—বৈশাখের ক্ষুধাতুর বুকের উপর অরুণ রাঙ্গা চরণ ফেলিয়া কে তন্দ্রা ভাঙ্গা প্রাণ মাতান পঞ্চমুখী শঙ্খ বাজাইয়া স্বর্গ-দূতের মত দিব্য প্রভায় নামিয়া আসিয়াছে। সে নূতন বর্ষ—নূতন বর্ষ।—আজ তার বন্দনা গীতি গাও।

আজ বৈশাখের বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া এই নববর্ষ প্রাতে আমাদিগকেও পাঠকগণকে বলিতে হইতেছে—আপনার জীবনের হিসাব নিকাশ লও ভাই কোনটা বেশী কোনটা কম আছে তন্ন তন্ন করিয়া দেখ ইহাই আমাদের নববর্ষ প্রবেশের প্রথম ও প্রধান উপদেশ। প্রথমে দেখ—নিজের দেহকে দেখ তোমার শরীরের ওজন পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বাড়িল কি কমিল তোমার হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক ভাবে চলিতেছে কি না তোমার হজম শক্তি পূর্ব্বের ন্যায় অব্যাহত আছে কি না তোমার দাঁতগুলি পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ় উজ্জ্বল আছে কি না তোমার চুলগুলি যথাযথরূপে সন্নিবদ্ধ প্রচুর ও ঘোর মসীময় আছে কি না তোমার বহিস্করণ যন্ত্রগুলি পূর্ব্বের ন্যায় অনুগত আছে কি না কোন নূতন ব্যাধির বীজ তোমার শরীরের মধ্যে উপ্ত হইবার অবসর পাইয়াছে কি না ইত্যাদি। তারপর তোমার মানস ভাণ্ডারের দরজা জানালাগুলি একবার এই নব রবি কিরণে খুলিয়া দেখ খুঁজিয়া পাও কি না তাহার মধ্যে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুকোমল বৃত্তিগুলি দেখ তাহার মধ্যে আলস্য কর্ম্মবিমুখতা পরশ্রীকাতরতা ঈর্ষা, দ্বন্দভাব অবৈধ আসক্তি আলস্য প্রভৃতি আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছে কি না একবার হিসাব করিয়া দেখ—তোমার পাকা আমিত্বটাকে কতখানি প্রসারিত করিতে পারিয়াছ তোমার স্মৃতিশক্তি ধৃতিশক্তি জ্ঞানার্জ্জন শক্তি সহানুভূতি শক্তি কর্ম্মের শক্তি জীবনী শক্তি কতটুকু কমবেশী হইয়াছে।

তারপর একবার ঘরের পানে তাকাইয়া দেখ—তোমার স্ত্রী পুত্র কন্যার স্বাস্থ্যের দিকে নজর কর তাহাদের মানসিক বৃত্তি প্রবণতাগুলি বিশেষণ করিয়া দেখ তোমার জীবনের সহিত একত্ব বজায় রাখিয়া তাহারা চলিতে পারিতেছে কি না। কাণ পাতিয়া শোন—তাহাদের জীবনের কোন তারটি বেসুরো বাজিতেছে একবার সিদ্ধান্ত করিয়া দেখ তাহাদের সঙ্গীতকে তোমার মনোমত সুরে গঠিত করিয়া দিতে পারিবে কি না। অভ্যাস একবার শিকড় গাড়িয়া ফেলিলে তাহাকে উপড়ান দায় হইয়া উঠে আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে দেখিয়াছি যে প্রাণের দ্বারে বার বার আঘাত করিয়াও আমাদের বর্ষিয়ান আত্মীয়দের কদভ্যাসের মূলোচ্ছেদ করিতে সক্ষম হই নাই মিথ্যার মোহে তাহারা এমনি মজিয়া আছেন যে সত্যের আলোক দেখিয়া তাহারা চক্ষু মুদিয়া ফেলেন।

স্বাস্থ্যনীতি, সদাচার মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের সুসাধ্য পন্থাগুলি বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। Child is the father of man—শিশুকাল হইতেই মাতা পিতা শিক্ষক সঙ্গী প্রতিবাসী ও পরিপার্শ্বের নিকট হইতে ও মধ্য দিয়া শিশুর জীবনকে ভবিষ্যতের আদর্শানুযায়ী গঠন করিয়া তুলিতে হইবে, তবেই সে শিক্ষা সত্য, কার্য্যকরী ও সফল হইবে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অতি আদিম জ্ঞানও আজ আমাদের দেশের শিক্ষক শ্রেণীর শতকরা নিরানব্বই জনের নাই। পিতা মাতার জীবন বাল্যকাল হইতে বিকৃত শিক্ষার কোলে গঠিত। সুতরা জাতিকে সবল, সুস্থ, শক্তিশালী, আত্মনির্ভরশীল ও উন্নত করিতে হইলে আমাদের এই বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় বয়সেও জীবনের গতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া

একটি উজ্জ্বল আদর্শের সৃষ্টি করিয়া ভবিষ্য বংশীয়ের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে। বাড়ীর মধ্যে মাতা পিতা ও বাড়ীর বাহিরে শিক্ষকের প্রভাব শিশুর জীবন-নিয়ন্ত্রনে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। সুতরা কাজে কাজেই পাঠশালার শিক্ষক হইতে কলেজের প্রফেসর পর্য্যন্ত—সকলেরই এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়া অন্যান্য পুস্তকের অধ্যাপনার অবসরে ছাত্রগণকে স্বাস্থ্যধর্ম্ম সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দানের কর্ত্তব্যটি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করা চাই। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন কুশরক্ষার বেলা তুমি আছ, আর মানুষ করবে কি ও পাড়ার বামুন ? মানুষ করা মানে আমরা বুঝি—দু টি খাইতে পরিতে দেওয়া এর নিয়মিত স্কুলের মাহিনা যোগাইয়া যাওয়া। কিন্তু এই ধারণাকে আমাদের বদল করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষাও মানুষ করা জিনিষটা যে আরও গুরু দায়ীত্বের সে সত্যকে আজ নূতন বৎসরের রবি করোজ্বল শুভ্র প্রভাতে প্রা ।র মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে।

নিজের ও নিজ স সারের হিসাব নিকাশ লইয়া অবশেষে নিজের পাড়া প্রতিবাসা ও নিজের সমাজের—এর সামর্থ্য ও অবসর থাকিলে নিজের জাতির একটা হিসাব নিকাশ গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজের মধ্যে বাস করিয়া সমাজকে বাদ দিয়া আপনার স্বাস্থ্য শক্তি অর্জ্জন করা চলে না। আমি ভাল খাইব—ভাল পরিব—ভাল আচার গ্রহণ করিব ভাল স্বাস্থ্য অর্জ্জন করিব আর আমার পাড়া প্রতিবাসী অস্বাস্থ্যের পঙ্ক পম্বলে হাজিয়া মজিয়া থাকুক—তাতে আমার কি এ ধারণা যাহারা করেন তাহারা স সারে স্বাস্থ্য ও সুখ দুটিই ভোগ করিবার স্থায়ী অধিকারী হয় না। আমি আমার পুত্র কন্যা সুখে থাকিল বটে, কিন্তু আমার পাড়া প্রতিবাসীগণ দুষ্পাচ্য ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্য কর্দ্দমাক্ত পানীয় গ্রহণ করিয়া নিজেদের রোগ প্রতিষেধ শক্তিকে খর্ব্ব করিয়া আমাদের স্থূল দৃষ্টির অগোচরে ভ্রাম্যমান অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ মারাত্মক ব্যাধি জীবাণুগুলির সমৃদ্ধি ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিল যখন তাহারা কলেরা বসন্ত আমাশা বা ম্যালেরিয়ায় একে একে মরিতে লাগিল তখন আমি কি আমার পুত্র কন্যাকে ভাল খাওয়াইয়া পরাইয়াও সুস্থ রাখিতে সমর্থ হইব ? বাটীর আবর্জ্জনা পরের দরজায় ফেলিয়া দিয়া মনে করিলাম—রোগ হইতে মুক্ত থাকিলাম—এ ধারণাকে দূর করিতে হইবে। আমাকে বাচাইতে হইলে আমার সমাজকেও বাচাইতে হইবে এই সত্য প্রতীতিকে ভিত্তি করিয়াই প্রাচীনকালে নর নারায়ণের সেবা ভাব ও আধুনিককালে সমাজতন্ত্রতা বা সাম্যবাদের উদ্ভব হইয়াছে। নিজের যেটুকু বেশী আছে লোহার সিন্ধুকে তাহাকে রুদ্ধ করিয়া মরিচা ধরিতে না দিয়া সমাজের অভাবগ্রস্ত প্রাণীকে তাহা বিলাইয়া দিতে হইবে নিজের স্বাস্থ্য শক্তি ও চিকিৎসা জ্ঞান থাকিলে পরের আধি ব্যাধিতে সেবা শুশ্রূষার মধ্যে আত্মদান করিতে হইবে, অপরে যদি কদাচারী ও স্বাস্থ্যধর্ম্ম পালনে উদাসীন হয় তাহা হইলে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে চাহিয়াও তাহাদিগকে সুপথে আনিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। সেবা ব্রত অপেক্ষা ধর্ম্ম আর নাই। বিদেশের মাটিতে গিয়া বীর বিবেক সিংহের গর্জ্জনে একদিন চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন Feel my boys, feel Love for the poor the down trodden even unto death—this is our motto I am ready to go to hundred thousand hells to serve others Let my life be a sacrifice at the alter of humanity '

এই সেবার ভাবকে আজ দেশের প্রত্যেক নির্জীব প্রাণের মধ্যে জাগাইয়া দিতে হইবে। এই সেবার মধ্য দিয়া আমাদের দেবতাগণ বড় হইয়া গিয়াছেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বড় হইয়াছেন, আমাদিগকেও বড় হইতে হইবে। এজন্য দেশের মধ্যে একদল সেবক প্রয়োজন। ভগবান বুদ্ধ, ঈশা মুশা—নিজেদের উপলব্ধ সত্যে দীক্ষিত করিয়া মূর্ত্তিমেয় আপন ভোলা পরার্থপর একনিষ্ঠ সেবক দ্বারা স্বপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মকে জগতের মধ্যে প্রচারিত ও সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন বিবেকানন্দ অরবিন্দ, ম্যাটসিনি গান্ধি লেনিন গ্যারিবল্ডি প্রভৃতি জাতিবরেণ্য কর্ম্মবীরগণ সকলেই সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের কাছে একদল সেবক ভিক্ষা করিয়াছিলেন তাহারা অনেকেই চাহিয়াছিলেন—বেশী নয়, একশ আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের যন্ত্ররূপে।

দেশের লোকের মধ্যে স্বাস্থ্যধর্ম্ম মন্ত্র ছড়াইতে গোপালন ও কৃষির উন্নতির দ্বারা দেশের দুস্থ নরনারীকে বাঁচাইয়া দাঁড় করাইয়া দিতে এবং ব্যাধি অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের মধ্য দিয়া দেশের মুক্তিকে অভিনন্দন করিয়া আনিতে—স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ' একটি আদর্শ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। আগামী ক'দিনের মধ্যেই আনুষ্ঠানিক কার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়া যাইবার কথা। ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছে ভাল বীজ সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে এখন চাই পরগতপ্রাণ। সত্য মুক্তি কাম আত্ম নির্ভরশীল, নির্ভীক নির্বন্ধন কয়েকটি কর্ম্মী—আমরা তাকাবো একাগ্র লাঙ্গলের ফাল লইয়া। পাঁচ বৎসরে না হোক দশ বৎসরে না হোক এক যুগে না হোক দুই যুগে না হোক বর্ত্তমানে না হোক—দশ যুগ পরে একশ বৎসর পরে ভবিষ্যৎ কালে জগতের সর্ব্বজাতি নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকাইয়া দেখিবে—বাংলায় যথার্থই সোনা ফলে। আমরা কাহারো দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিব না—চাঁদার খাতায় নাম সহি না করিলে রক্ত চক্ষু দেখাইব না—আকাশের চাঁদ হাতে আনিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ম্যানিফেষ্টো খবরের কাগজের স্তম্ভে স্তম্ভে জাহির করিবার স্পর্দ্ধা রাখিব না। নীরব ব্যাকুলতায় যদি কিছু চাই ত সে প্রাজ্ঞের উপদেশ প্রাচীনের আশীর্ব্বাদ সাধারণের সহানুভূতি এবং সুহৃদদের যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা। আর চাই—কয়েকটি খাঁটি বাঙ্গালীর মাটিভক্ত সোনার চাঁদ যাদের বুক লোহার পাতে মোড়া প্রাণ যাদের জগৎজোড়া। কাজের উৎসাহে যারা গৃহ ছাড়া কাজের আনন্দে যারা আত্মহারা। সময় হইলেই ডাক পড়িবে। ইতি ... বৈশাখ। ১৩৩২।

> দেশের মুক্তি কাজটা খুব বড় অথচ তার উপায়টা খুব ছোট হবে—এটা প্রত্যাশা করার ভিতরেই একটা গলদ আছে। এই প্রত্যাশার মধ্যেই রয়ে গেছে ফাঁকির পরে বিশ্বাস বাস্তবের পরে নয় নিজের শক্তির পরে নয়।—রবীন্দ্রনাথ।

হিষ্টিরিয়া

[ডাক্তার শ্রীক্ষেত্রমোহন গুপ্ত, এম্ বি, এম্ আর এ-এস]

পুরাকালে সকলের বিশ্বাস ছিল য হিষ্টিরিয়া রোগ কেবল স্ত্রীলোকদেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং জরায়ু ও ডিম্বকোষের পরিবর্ত্তন ব াত ইহা উদ্ভত হয়। সেই জন্য হিষ্টিরিয়া কথাটি জবায়ু অর্থ বিশিষ্ট একটি মৌলিক শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই মত এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কারণ ক ান কখন বালকদেরও এই রোগ হয় এবং অধিক বয়সে পুরুষদেরও এই রোগ হইয়াছে এমন ঘটনাও দেখা গিয়াছে। আমাদের দেশে হিষ্টিরিয়া রোগ পূর্ব্বকালে ছিল কি না তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। তবে এ কথা সত্য যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আচাব ব্যবহাব যতই আমাদেব দেশে প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইতেছে ততই এই বোগ আমাদের স্ত্রীলোকদেব ভিতব অধিক পবিমানে দেখা যাইতেছে। বঙ্গদেশে ইহাব প্রসাব ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতেছে এব কলিকাতা মহানগরীতে উক্ত রোগগ্রস্ত রোগী অনেক দেখা যায় ও ক্রমে পল্লীগ্রামেও ইহার বিস্তাব হইতেছে। যদিও এই রোগ মারাত্মক নয় না বটে কিন্তু স সারেব সকল লোকেরই একটা অশান্তির কারণ হইয়া উঠে। যাহাব সংসারে একটি হিষ্টিরিয়া রোগী আছে তিনি এই কথাব প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম কবিতে পাবিবেন। অতএব সকলেরই এই রোগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানা দরকাব।

হিষ্টিরিয়া এক প্রকাব মানসিক বিকাব মাত্র। দেহের কোন কোন অংশের কি পরিবর্ত্তন হইতে এই বিকাব উদ্ভূত হয তাহা নির্ণয় কবা যায় না। হিষ্টিরিয়া রোগীব সমযে সময়ে হঠাৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিব বিক্ষেপনী (convulsion) বা তদ্রূপ লক্ষণাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাকে হিষ্টিরিয়ার ফিট বলে। রোগী ভেদে এ রোগেব বিভিন্ন প্রকার লক্ষণাদি দৃষ্ট হয়। ইহা মানসিক আবেগের প্রবলতা মাত্র। অর্থাৎ বিচার বুদ্ধির বশবর্ত্তী না হইয়া মনেব ইচ্ছাশক্তি যখন ভাবাবেগের সম্পূর্ণ পরাধীনতা প্রাপ্ত হয় তখনই ইহার লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। তাহার অধিকাংশই দেখিলে মনে হইবে যেন রোগী কপট অভিনয় বা ভান করিতেছে মাত্র তাই আমাদেব দেশে সাধাবণ অশিক্ষিত লোকেরা ঐরূপ বোগীকে ভূতে পাইয়াছে বলে। বলা বাহুল্য যে দেখিতে ভানেব মত হইলেও প্রকৃত পক্ষে উহা ভান নয় কারণ সে সময়ে ঐ সকল লক্ষণাদি প্রকাশের প্রবণতা তাঁহারা বোধ কবিতে পাবেন না। ইহা অনেক স্থলে অকস্মাৎ কোন শারীরিক বা মানসিক অবস্থা বিপর্য্যয় হইতে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সাধাবনত দাম্পত্য জীবনে কলহ কোন আত্মীয় বা প্রিয়জনের মৃত্যু জনিত গভীর শোক বিচ্ছেদ জ্বালা যন্ত্রণা সাংসারিক উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা ইত্যাদি নানাবিধ মানসিক কারণে ইহাব উৎপত্তি হয়। দেহের স্থান বিশেষে অত্যন্ত আঘাত লাগিলে বহুদিন রোগভোগে শবীর দুর্ব্বল হইলে সামান্য কারণে ইহা প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোকের জরায়ু বা ডিম্বকোষেব পীড়া হইতে সাধারণত হিষ্টিরিয়া হইয়া থাকে। কাহাবও মতে রতিস্পৃহা অতৃপ্ত থাকিলে কখন কখন হিষ্টিরিয়া হইয়া থাকে। সাধারণত দেখা যায় যে যাহারা অতিরিক্ত কোমলাঙ্গী এবং সহজেই যাহাদেব মানসিক উত্তেজনা উপস্থিত হয় তাঁহাদিগকেই এই রোগ সহজে আক্রমণ করে। আমাদেব দেশে যে সকল পরিবারের স্ত্রীলোকেরা উপযুক্ত শিক্ষা না পাইয়া অল্প লেখাপড়া শিখিয়া আহার ব্যবহার ইত্যাদিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। স্ত্রীশিক্ষার নিন্দা করিতেছি না। বঙ্গ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নাটক নভেল স্ত্রীলোকদের মধ্যে অতিশয় প্রচলিত হইয়াছে। অর্দ্ধ শিক্ষিতা

রমণীরা ঐগুলি পাঠ করিয়া তাহাতে মহৎ উদ্দেশ্য থাকিলেও তা। সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন না কেবল কাল্পনিক গল্প পড়িয়া নিজ নিজ জীবনে ঐগুলি প্রতিফলিত করিতে চান। ইহাতে জীবন নৈরাশ্যময় হয় ও হিষ্টিরিয়া উপস্থিত হয়। শিক্ষাব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতা শিক্ষক বা গুরুজনদের পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া উচিত। রামায়ণ মহাভারত মহাপুরুষদের জীবন চরিত গীতা। সাবিত্রী ইত্যাদি সতী রমণীদের কাহিনী নীতি সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম পুস্তকাদি তরল মতী পাঠক পাঠিকাদের দিবার ব্যবস্থা করা উচিত। পিতামাতা গুরুজনদের বিশেষ লক্ষ রাখা উচিত যেন কোনও রকমে নাটক নভেলাদি তাহাদের ছেলে মেয়েদের হাতে না পড়ে। ছেলে মেয়েদের ছোট বেলা হইতে আত্মসংযম শিক্ষা দেওয়া উচিত। কারণ যাহারা পিতামাতা কর্ত্তৃক অতি সমাদরে প্রতিপালিত ও যাহাদের চিত্ত সদাই অব্যবস্থিত যাহারা শৈশব হইতেই সকল প্রকার বাসনার চরিতার্থতা সাধন বিষয়ে গুরুজনের নিকট হইতে সহায়তা পাইয়া আসিয়াছেন তাঁহারাই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা প্রায়ই আত্মাভিমানিনী হন এবং সর্ব্বদা নিকটস্থ সকলের সহানুভূতির জন্য লালায়িত হইয়া থাকেন। কোন রমণীর এই সহানুভূতিস্পৃহা এত অস্বাভাবিকরূপে বলবতী হইয়া পড়ে যে তিনি সকলের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সত্য সত্যই নিজ দেহে অসুখের সৃষ্টি করেন।

লক্ষণ —হিষ্টিরিয়া রোগে সকলের এক প্রকার লক্ষণ হয় না। ইহাতে নানাবিধ ব্যাধির ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাদি দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ আলোক বা গোলমাল সহ্য করিতে পারেন না কেহ কেহ নাকে বিকট দুর্গন্ধ অনুভব করেন আবার কেহ কেহ দুর্গন্ধ দ্রব্য সুগন্ধি বলিয়া সমাদরে গ্রহণ করেন। অনেক রোগীর দেহের স্থানবিশেষে (যথা—মেরুদণ্ড ডিম্বকোষের উপর ইত্যাদি) জোরে চাপিলে বা আঘাত করিলে ফিট হইয়া পড়ে। আবার ফিট হইলে ঐ সব স্থানে চাপ বা আঘাত করিলে কখনও কখনও ফিট দূর হইতেও দেখা যায়। হিষ্টিরিয়া জনিত পক্ষাঘাত হইতেও দেখা যায়—তবে সে পক্ষাঘাত চিরস্থায়ী হয় না। উহা ধীরে ধীরে উপশম হয় এবং কখন বা উদ্বেগ বা আতঙ্ক হইতে তাহা দূরীভূত হয়। অনেক হিষ্টিরিয়া রোগী বক্ষে বা পেটের ভিতর হইতে একটা গোলা উঠার কথা বলিয়া থাকেন। হিষ্টিরিয়ার ইহা একটী বিশেষ লক্ষণ। ইহাতে তাঁহাদের নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ হয়। উহা প্রায়ই ফিট হইবার পূর্ব্বে লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়। কাহারও কাহারও বুক ধড়ফড় করে। কেহ কেহ অনিক রোদন ও হাস্য করেন। কাহারও বিভ্রম উপস্থিত হয় এবং কেহ মরিতে আসিতেছে বা কোন হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিতে আসিতেছে ইত্যাদি নানারূপ ভয় হয়। ফিটের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঐরূপ লক্ষণাদি উপস্থিত হওয়ায় রোগী তখনই সাবধানতা সহকারে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই জন্যই হিষ্টিরিয়া ফিটগ্রস্ত রোগীকে মৃগী রোগীর ন্যায় জলে আগুনে বা কোন বিপজ্জনক স্থানে পড়িয়া মারা যাইতে দেখা যায় না। কোন প্রকার পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে পারিলেই রোগী শুইয়া পড়েন এবং তৎপরেই তাঁহার হস্তপদাদি সর্ব্ব শরীর আলোড়িত ও বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ থাকে কেহ কেহ নিজ বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত করিতে থাকেন। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে থাকে। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ হয়। চক্ষু প্রায় মুদ্রিত থাকে। কখন কখন মুখ দিয়া ফেনা নির্গত হয় কিন্তু মৃগী রোগীর ন্যায় ফিটের সময় দন্ত দ্বারা জিহ্বা কাটিতে বা অজ্ঞাতসারে মলমূত্র নিঃসরণ হইতে দেখা যায় না। রোগী কোন কথার জবাব না দিলেও এবং বাহ্যতঃ সংজ্ঞাহীন বোধ হইলেও তাঁহার সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় না। কিছুক্ষণ পরে আক্ষেপ বন্ধ হয় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে থাকেন। কেহ কেহ কাঁদিতে থাকেন এবং কেহ বা ভুল বকিতে থাকেন। ফিট উপর্য্যুপরিও হইতে পারে। কাহার কাহারও ফিট অল্পক্ষণ থাকে আবার কাহারও ফিট ২।৩ ঘণ্টাও থাকে। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত

রোগীদের মধ্যে কাহারও কাহারও এক প্রকার অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে দেখা যায়, যাহাতে রোগীকে যেরূপ অবস্থায় যেভাবে রাখা যাউক না কেন সেইরূপেই থাকে—হস্ত তুলিয়া ছাড়িয়া দিলে তাহা সেই উত্তোলিত অবস্থায়ই থাকে। এইরূপ অবস্থাকে ইংরাজীতে কেটালেপ্সি (catalepsy) বলে। কাহাকেও মনে হয় যেন গভীর নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন—ইহাকে ট্রান্স (Trance) বলে। এইরূপ অবস্থা প্রায়ই ঘণ্টা কতকের পর চলিয়া যাইলেও কখন কখন ইহা কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। ইহাতে মুখ বিবর্ণ হস্তপদাদি শিথিল ও চক্ষু নিমীলিত থাকে। নাড়ী সূক্ষ্ম হয় শ্বাসকার্য্য এত মৃদুভাবে হয় যে হঠাৎ দেখিলে রোগীর মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। প্রায়ই ইহা হইতে রোগীর মৃত্যু হয় না। এইরূপ অবস্থা বেশী দিন থাকিলে যত্ন সহকারে রোগীকে মাঝে মাঝে আহার করান না হইলে মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়।

চিকিৎসা।—(১) সংযম শিক্ষা—হিষ্টিরিয়া মানসিক বিকার মাত্র। অভিভাবকেরা পূর্ব্ব হইতে বালক বালিকাদের শিক্ষা ও মনের গঠনের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিলে বালক বালিকাদের কোন বিষয়ে উৎকট জেদ থাকিতে না দিলে তাহাদের মন সুস্থ সবল হইতে পারে এবং তাহা হইলে এই রোগ কোন ক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না।

(২) স্বাস্থ্যরক্ষা—দেহ সুস্থ সবল রাখিতে যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিতে হইবে। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন প্রচুর পরিমাণে লঘু অথচ পুষ্টিকর আহার গ্রহণ নিয়মিত অঙ্গ চালনা নিয়মিত স্নান পাঠাভ্যাসের জন্য অত্যধিক মস্তিষ্ক চালনা না করা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা অত্যধিক চিন্তা মন সদা প্রফুল্ল রাখা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। জরায়ুর বা ডিম্বকোষের কোন পীড়া থাকিলে প্রদর থাকিলে তাহার প্রতিকার করা একান্ত আবশ্যক।

(৩) সহানুভূতি প্রদর্শন—রোগীর ক্রিয়াকলাপে বিরক্ত হইয়া এবং তাঁহার সমুদয় লক্ষণাদি ভাণ মনে করিয়া তাঁহার উপর কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার করা উচিত নয়। কিন্তু যত্ন করা উচিত কিন্তু তাই বলিয়া অতিরিক্ত সহানুভূতিও ভাল নয়। বাস্তবিক দেখা যায় যে পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়েরা রোগীর প্রতি অযথা সহানুভূতি প্রকাশ করিলে রোগ শীঘ্র যাবে না। এজন্য নিজ বাড়ী অপেক্ষা হাসপাতালে চিকিৎসিত হইলে শীঘ্র ফল হইতে দেখা যায়। এমন কি অনেক সময় পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে যাইলে তথায় অপেক্ষাকৃত সাবধানে থাকিতে হয় বলিয়া হিষ্টিরিয়া শীঘ্র সারিয়া যায়।

(৪) মানসিক চিকিৎসা—চিকিৎসকের উপর রোগীর বেশ বিশ্বাস আছে তাহার দ্বারা চিকিৎসা করাইলে শীঘ্র ফল হইয়া থাকে। আমাদের সমাজে হিষ্টিরিয়া রোগে স্বপ্নাদ্য ঔষধ ও ঠাকুর দেবতার মাদুলী ধারণ ইত্যাদি যে প্রচলিত আছে এবং তাহাতে উপকারও দেখিতে পাওয়া যায়। রোগীর মনের বিশ্বাসই এই উপকারের হেতু। পাশ্চাত্য প্রদেশে মেসমেরিজম (Mesmerism) হিপনটিজম প্রভৃতি কতকগুলি প্রক্রিয়া আছে যাহার দ্বারা একজন স্বীয় বলবতী মানসিক শক্তি প্রভাবে অন্যের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। ঐ শক্তির দ্বারাও রোগীর মানসিক বিকার দূর করিতে পারা যায়। আমাদের দেশেও ঝাড়ন ফোঁড়ন ইত্যাদির প্রথা প্রচলিত আছে ইহাতেও রোগীর বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিলে কখন কখন হিষ্টিরিয়া আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

(৫) ফিটের সময়—এমোনিয়া (Ammonia) বা স্মেলিং সল্ট (Smelling Salt) বা তদ্রূপ কোন তীব্র গন্ধদ্রব্য আঘ্রাণ করাইলে কখন কখন ফিট বন্ধ হইয়া যায়। ফিটের সময় কোমরের বা বুকের কাপড় জামা আলগা করিয়া দেওয়া উচিত। ফিট্ বন্ধ করিবার আরও অনেক প্রকার অবস্থা আছে যথা—খুব শীতল জল মস্তকের উপর জোরে ঢালিয়া দেওয়া ঘাড়ের উপর বরফের চাপড়া চাপিয়া ধরা, মরিচ বা লবঙ্গ

বা অন্য কোন উগ্রগন্ধ দ্রব্য পোড়াইয়া নাসিকার নিকট ধরিলে তাহার ধোঁয়ায় দেওয়া চলে না। কবিরাজেরা নস্য দেন ইত্যাদি। অল্পক্ষণের জন্য রোগীর নাসিকা ও মুখ বলপূর্ব্বক বন্ধ করিয়া ধরিলে অনেক সময় ফিট ছাড়িয়া যায়। কাহারও কাহারও তলপেটের বাম বা দক্ষিণ পার্শ্বে ডিম্বকোষের উপর জোরে কিছুক্ষণ চাপিয়া ধরিলে ফিট বন্ধ হইতে দেখা যায়। ব্লিষ্টার বা তপ্ত শলাকা প্রয়োগের ভয় দেখাইলে কখন কখন ফিট্ ছাড়িয়া যায়। ফিট বন্ধ হইলে পর সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম করা প্রয়োজন।

শিশু খাদ্য

প্রায় বিংশ বৎসর পূর্ব্বে কোন সুদূর পল্লীতে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যাইয়া অবগত হইলাম যে উক্ত গ্রামের এক দাসের (কৈবর্ত্ত দাস) বাড়ীতে সদ্য প্রসূত একটী শিশুকে অসহায় রাখিয়া তাহার মাতা পিতা ভ্রাতা ভগ্নি ৪।৫টী লোক ৩।৪ দিনের মধ্যেই কলেরার করাল গ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। শিশুটী খালি ঘরে বিনাখাদ্যে বিনা শুশ্রূষায় অসহায় অবস্থায় পড়িয়া ২ দিন হইল অনবরত চিৎকার করিতেছে। অস্পৃশ্য শিশু বলিয়া সমাজের ভয়ে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাহাকে কেহই গ্রহণ করে নাই। বরং নিকটস্থ প্রতিবাসীগণ সর্ব্বদাই তাহার মৃত্যু কামনা করিতেছে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় থাকিয়াও দুইদিন হইল শিশুটার মৃত্যু হয় নাই। অপরাহ্ন বেলা ৪টার সময় এই সংবাদ পাইয়া সেই গৃহে উপনীত হইয়া দেখিতে পাই যে এক মৃতকল্প শিশু ছেঁড়া কাঁথার উপর মলমূত্রে জড়িত হইয়া ক্ষীণ স্বরে চীৎকার করিতেছে। শিশুটীকে উত্তমরূপে গরম জল দ্বারা ধৌত করত একজন দয়াবান দাস কৃষকের সাহায্যে শুষ্ক বস্ত্রাবৃত করিয়া বাটীর বাহিরে আনয়ন করি। এবং তাহার দ্বারা সদ্য গাভী দুগ্ধ দোহন করিয়া শিশুকে ঝিনুক দ্বারা অল্প অল্প করিয়া দুগ্ধ পান করাই। প্রথমে সে দুগ্ধ পান করিতে কষ্ট ও অনিচ্ছা প্রকাশ করে শেষে আস্তে আস্তে কিছু দুগ্ধ পান করিতেই ঘুমাইয়া পড়ে। বহু চেষ্টা করিয়াও গ্রামের কাহারও স্তন দুগ্ধ পান করাইবার সুবিধা পাইলাম না।

অবশেষে শিশুকে লইয়া রাত্র ১১টায় যখন বাড়ী ফিরিলাম তখন শিশু বেশ ঘুমাইতেছিল। পুনরায় তাহাকে গো দুগ্ধ পান করাইলাম। পরদিন ঐ শিশুর অবস্থার একটু উন্নতি দেখিয়া আশান্বিত হইলাম। তৃতীয়দিন হইতে শিশুর তরল দাস্ত হইতে আরম্ভ হইল। গো দুগ্ধ বন্ধ করিয়া হরলিকস মিল্ক ফুড বোতলের সাহায্যে পান করাইতে আরম্ভ করিলাম চতুর্থ দিন শিশুটী আর জগতে রহিল না।

পল্লীগ্রামে প্রায়ই দেখা যায় ম্যালেরিয়াক্রান্তা গর্ভবতী জ্বর ও শোথ হইয়া ভুগিতেছে কিন্তু গর্ভাবস্থায় কোন ঔষধ খাওয়ান কর্ত্তব্য নয় কারণ ঔষধ খাইলে গর্ভস্থ শিশু মারা যাইবে এই কুসংস্কারের আশঙ্কায় গর্ভিণীকে ঔষধ দেওয়া হয় না এবং সন্তান প্রসব হইলেই প্রসূতী বিনা চিকিৎসাতেই বা সামান্য ঔষধেই আরোগ্য লাভ করিবে এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে। ফলে প্রসবের পরক্ষণেই প্রসূতী বা প্রসূত সন্তানের জীবলীলা শেষ হয়। অথবা প্লীহা যকৃত সহ ক্ষীণকায় শিশু কিছুকাল প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়া ইহজগত ত্যাগ করে।

একবার কোন সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন ভদ্র লোকের বাটীতে এইরূপ একটী প্রসূতী ও শিশু রোগী আমার চিকিৎসাধীন হয়। প্রসূতীকে আমি চিকিৎসা করি কিন্তু শিশুটীকে দেখিতে পাই না, জিজ্ঞাসা করাতে কেহই তৎসম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করেন না।

করিবার শক্তি তাহার জন্মে না। শিশু জীবনের কয়েক দিন এবং কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত যে দুগ্ধে জলের ভাগ কঠিন পদা। অপেক্ষা বেশী এরূ। দুগ্ধ খাইয়া শিশু বেশ হজম করিতে ।ারে এবং ।ক্ত হইতে পারে সুতরাং এই সময় ঘন দুগ্ধের অ্যাপ্রিকট বা চ ।নকা ও চাটকা ।রের ব্যবস্থা করিবে। সব ।।৯ সহজপাচ্য ও বলকারী এরূপ খাদ্য খাইতে দিবে। যে পরিমাণে দুগ্ধ ।ইলে সহজে হজম হ তদনুযায়ী দুগ্ধ ।। তে দিবে। রাত্রিতে ।ে ৮ পরিবারে বা পানীয় দ্রব্য ।। তে দিবে। ।িদি ।র । বিমা ।। হইতে দিবে। যে সকলে ।ে ।।। । । ।। ।। ।তে দেওয়া উচিত ।হ।

ব্যায়াম।—প্র তীব ।। ৩ বসিয়া শুইয়া না ।াকিয়া ।রিয়া ।িবা। বেড়ান ।।। সহজসাধ্য সাংসারিক কার্য্য করা উচিত। অতিরিক্ত ।িবা।্ করা উচিত নহে। যেরূপ ।।।ম।ে ।া ।েবে প্রয়োজন ।। রূপ সহজসাধ্য পরি।।।। ।া ব্যায়াম। করা উচিত। এরূপে সহজে দুগ্ধ নি সৃত । ও সে দুগ্ধ ।হজ ।চ্য বলকারী ও শিশু বর্দ্ধক ।। ।বে।

ঋতু।—প্রসবের পর ঋতু হ ।। ।।৯ দুগ্ধের ফ্যাট কম ও প্রটীড বেশী হয়। ।। ।। সে দুগ্ধ শিশু ।ল পরিপাক করিতে পারে না এবং সেজন্য শিশুর পেটের পীড়া হইয়া থাকে। প্রসবের পর প্রায় ।। মাস কাল ঋতু বন্ধ থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে শিশুর অঙ্গ ।াক্তি বৃদ্ধি হয়। সুতরাং পরে ঋতু হইলে সেজন্য শিশুর বিশেষ অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না। তথাপি ঋতুর কয়েক দিন স্তন দুগ্ধ কম অথবা একেবারে বন্ধ করা মন্দ নহে।

গর্ভ।—একবার সন্তান হওয়ার পর পুনরায় গর্ভ সঞ্চার হইলে আর কোলের শিশুকে স্তন পান করান উচিত নহে। একবার সন্তা। হবার পর ৩।৪ মাসের পর পুনরায় গর্ভ হওয়াও দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা একমাস পরেই পুনরায় গর্ভ হওয়ার কথাও জানি। আমাদের দেশে একটা গর্ভ হইলে কোলের ছেলের এড়ে লাগা বলে। সেজন্য ঐ দুগ্ধ পান করিয়া ঐ ক্রোড়স্থ শিশুর শরীর বর্দ্ধনে ব্যাঘাত জন্মায় এবং শিশু রোগা ও পেটের পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে শিশুকে স্তন ছাড়ান বড় সহজ নহে, এবং স্তন দুগ্ধের অনুরূপ খাদ্যও সংগ্রহ করা গুরুতর বিষয়। সুতরাং এরূপ স্থলে যে গর্ভস্থ শিশুর ভবিষ্যত চিন্তা অপেক্ষা ক্রোড়স্থ শিশুরই চিন্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের কথা ভাবিবার বিষম হইয়া উঠে। আবার একটী ক্রোড়স্থিত এবং আর একটী বর্দ্ধনশীল গর্ভস্থিত সন্তান—এই দুইটীকে এক সময়ে রীতিমত ভাবে খাদ্য যোগান মাতার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। কেহ কেহ বলেন গর্ভাবস্থায় স্তন পান করাইলে গর্ভস্রাব হইতে পারে। এরূপ হলে দুর্ভাগী মাতার বিষম সঙ্কট। মাতা যদি সুস্থা বলশালিনী ও কার্য্যক্ষম হন তবে স্তন পান করাইলে বিশেষ অনিষ্ট হয় না। অন্তত ৬ হইতে ৮ সপ্তাহ পর্য্যন্ত নিরাপদে স্তন্য পান করান যাইতে পারে।

ভয় বা মানসিক উত্তেজনা দ্বারা দুগ্ধের উপাদানের ।। নিঃস্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। সাধারণত স্বাভাবিক স্তন দুগ্ধে শতকরা

ফ্যাট	৪
সুগার	৭
প্রটীডস	১.৫
জল	৮৬.১৫

বর্ত্তমান থাকে। যে মাতার শরীর দুর্ব্বল ও যিনি পুষ্টিকর খাদ্য পান না অথবা অদ্ধাহারে বা অনাহারে অধিক সময় অতিবাহিত করেন সে মাতার দুগ্ধে শতকরা

ফ্যাট	১.১
সুগার	৪
প্রটীডস	২.৫
মিনারেল্ ম্যাটার	৭
জল	৯২.৩১

থাকে ইহাকে Poor milk বা 'হীন স্তন্য' বলা যাইতে পারে।

মাতা রোগগ্রস্তা গর্ভবতী ও নাড়ী প্রধান ধাতু

বিশিষ্টা হইলে, ম্যামারি গণ্ডির (Mamuary gland) কার্য্য ভালরূপ সম্পন্ন হইতে পারে না সেজন্ত তাহার স্তন দুগ্ধে শতকরা

ফ্যাট	৮
সুগার	৫
প্রটীডস	৪৫
মিনারেল ম্যাটার	৯
জল	৮৯ ৬১

বর্ত্তমান থাকে —এরূপ দুগ্ধকে Bad milk বা 'দুষ্ট দুগ্ধ' বলা যাইতে পারে।

যে সকল মাতা ভাল হজম করিতে ও পুষ্টিকর সুখাদ্য খাইতে পারেন বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না বসিয়া শুইয়া থাকিয়া জীবনাতিপাত করেন তাদের স্তন দুগ্ধে শতকরা—

ফ্যাট	৫ ১
সুগার	৭ ৫
প্রটীডস	৩ ৫
মিনারেল ম্যাটার	২
জল	৮৩ ৭

বর্ত্তমান থাকে। এরূপ দুগ্ধকে over rich milk বা অতি সমৃদ্ধ স্তন্য বলা যাইতে পারে।

কোন কারণে যদ্যপি মাতৃদুগ্ধ কম হইয়া যায় এবং তাহা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হয় তাহা হইলে মাতার খাদ্যদ্রব্যে (ডেডস কলাইয়ের ডাল ডাবের জল তরমুজ টাটকা ফলমূল ও) জলীয় খাদ্য বাড়াইয়া দিতে হইবে। তাহার কোন নাড়ীঘটিত উত্তেজনা —ভয় শোক বা আনন্দ অধিক হইলে তাহা দূরীকরণে মনোনিবেশ করিতে হইবে। শিশুকে দুগ্ধ দিতে দিতে তিনি উপযুক্তা এরূপ বিশ্বাস তাঁহার মনে উৎপাদন করিতে হইবে।

অনেক সময় দেখা যায় মাতৃস্তনে অত্যধিক দুগ্ধ জন্মে। অনেক সময় দুগ্ধ চুয়াইয়া পড়িতে দেখা যায়। সেরূপস্থলে স্তন দুগ্ধ যাহাতে কম হয়, সেরূপ চেষ্টা প্রয়োজন হয়। এরূপ ক্ষেত্রে মাতার খাদ্যের জলীয়ভাগ খুব কম করিয়া দেওয়া উচিত।

সময়ে সময়ে স্তন দুগ্ধের কঠিন পদার্থসকল কম বেশী হইয়া থাকে ও বাঁকা যায় তা জানিতে পারা যায়। এমন পরীক্ষা করার সুবিধা ও সুযোগ সকল স্থানে সকলের ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু শিশুর পুষ্টি ও বৃদ্ধির দ্বারা পীড়াদির বিষয় অবগত হইয়া আমরা স্তন্য দুগ্ধের বিবরণ বুঝিতে পারি। তবে সুবিধা হইলে যেন পরীক্ষা করিয়া তাহার কঠিন পদার্থ বাড়া কমা শিশুকে ঘন ঘন স্তন পান করান উচিত। ও পরিশ্রম কম করিবে ও তার খাদ্য দ্রব্যে ... কমিয়া দিবে। পক্ষান্তরে যদি কঠিন পদার্থ কম হয় তাহা হইলে অনেক বার বার শিশুকে স্তন্যপান করা বে মাতার পরিশ্রম ও খাদ্যদ্রব্যের ... বাড়াইয়া দিবে। এইরূপে স্নেহ পদার্থের বাড়া কমা হইলে মাতাকে আমিষ ঘটিত পদার্থ (মসুরের ডাল ছানা মাছ মাংস ডিম প্রভৃতি) খাইতে দিবে। পক্ষান্তরে স্নেহ পদার্থের ভাগ কম করিতে হইলে ঐরূপ খাদ্য বন্ধ করিয়া দিতে হয়। প্রোটীডের ভাগ বেশী করিতে হইলে মাতার পরিশ্রম কমাইবে প্রটীডের ভাগ কম করিতে হইলে পরিশ্রম বেশী করাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমিষ খাদ্য কম করিতে হইবে।

অনেকস্থলে মাতার পীড়াদি হেতু মাতৃস্তনে দুগ্ধ কম হইয়া থাকে কিন্তু দুগ্ধের উপাদানের বিকৃতি হয় না সেরূপ স্থলেও শিশুকে স্তন্যপান করিতে দিবে না ও অন্য খাদ্যদ্বারা তাহার উদর পূর্ণ করিবে।

ঔষধ —যতদিন পর্য্যন্ত শিশু স্তন্য পান করে সেই সময় কতকগুলি ঔষধ মাতাকে খাওয়াইলে তাহা স্তন দুগ্ধের সহিত নিঃসৃত হইয়া থাকে। সেই দুগ্ধ পানে শিশুর অনিষ্ট হইয়া থাকে। আমরা কোন পল্লীগ্রামে একটা প্রসূতী চিকিৎসায় আহুত হইয়া জানিতে পারি যে তাহার পেটের পীড়া হওয়ায় গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তার তাহাকে কয়েক দিন ধরিয়া আফিং

ঔষধ খাইতে দিয়াছিলেন সে ঔষধে প্রসূতীর উপকার হইয়াছে বটে কিন্তু শিশুটার মৃত্যু হইয়াছে। অন্য এক স্থানে একজন খ্যাতনামা ডাক্তারবাবু একটী স্তন্যদায়িনীর আমাশয় রোগে ইপিকাক প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাতে কোলের শিশুর বমি হইতেছিল। একস্থানে একটি স্তন্যদায়িনী রোগীকে কলচিকম দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল এবং রোগীর ক্রোড়স্থ শিশু মৃতপ্রায় হইয়া সে উদ্ধার পাইয়াছিল। একজন স্তন্যদায়িনীকে সেলাইন দ্বারা দাস্ত দেওয়ায় মাতৃদুগ্ধ কমিয়া গিয়াছিল। একজন মাতাকে অতিরিক্ত [illegible] কো খাইতে দেওয়ায় ক্রোড়স্থ সন্তানের পেট [illegible] হইয়াছিল। আমরা বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলেই এই সকল অনিষ্টের কথা অনুধাবন করিতে পারি। সুতরাং স্তন্যদায়িনীকে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে সেই সময় শিশুর স্তন্যপান বন্ধ করিয়া দিতে হয় অথবা দুগ্ধে নিঃসরণকারী ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় না। এবং নিতান্ত দরকার হইলেও যদি স্তন্য বন্ধ করা না গেলে খুব সাবধানে বিবেচনার সহিত কম মাত্রায় মাতাকে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাহার ফলাফল লক্ষ্য করা উচিত। আর্সেনিক এণ্টিমনি [illegible] পটাশ আইওডাইড মার্কারী ওপিয়ম মর্ফিয়া কলচিকম ইত্যাদি ঘটিত ঔষধ সকল দুগ্ধের সহিত নিঃসৃত হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল ঔষধ মাতাকে প্রয়োগ করা উচিত নহে।

অনেক সময় মাতার শুষ্ক খাদ্য গ্রহণে অথবা তরল দ্রব্য বা জল না খাইলে অথবা মাতা জোলাপ লইলেও স্তন দুগ্ধ কম হয়। বেলেডোনা ঔষধ প্রয়োগেও মাতৃ দুগ্ধ কম হইতে দেখা গিয়াছে।

স্তনের বোঁটা —কোন কোন মাতার স্তনের বোঁটা সময়ে সময়ে এত ছোট ও চেপ্টা হইয়া থাকে যে শিশু তাহা টানিতে পারে না। তখন শিশুকে অন্য কোন উপায় দ্বারা মাতৃ স্তন হইতে দুগ্ধ দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। এজন্য Nipple shield দ্বারা স্তন পান করান সুবিধা ও সহজ। কিন্তু উহার রবারের বোঁটা ও কাঁচের নল প্রত্যহ ভাল করিয়া পরিষ্কার না করিলে শিশুর বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে। আবার যখন স্তনের বোঁটা অত্যন্ত নরম হয় এবং সহজেই মাতা বেদনা বোধ করে তখন মাতা একটু যত্ন ও একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া শিশুকে স্তন্যপান করাইলে ক্রমে বোঁটার যন্ত্রণা কমিয়া যায়। যদি বোঁটাটী শুষ্ক ও [illegible]ক্ত হয় তাহা হইলে স্তন পান করাইলে ঐরূপ অবস্থা দূরীভূত হয়।

দুগ্ধ জ্বর —অনেক স্থলে স্তনে দুগ্ধ বন্ধ হইয়া স্তনে বেদনা হয় এবং স্তন ফুলিয়া শক্ত হয়। এ দেশে তাহাকে ঠমক আসা বলে। ঐরূপ স্থলে শিশুকে কয়েক ঘণ্টা স্তন্য পান করান বন্ধ করিয়া রাখা উচিত এবং আস্তে আস্তে স্তন দুগ্ধ হস্ত দ্বারা টিপিয়া অথবা ব্রেষ্টপাম্প দ্বারা বাহির করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই দুগ্ধ কমিয়া স্তন স্বাভাবিক অবস্থাপন্ন হয়। অনেক স্থলে স্তনের কোন একটী স্থান ফুলিয়া শক্ত ও পরে তথায় প্রদাহ পূযযুক্ত পরিণত হয়। গুলার্ড লোসনে উপকার না হইলে ঐ সকল স্থান কাটিয়া পূয বাহির করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসা করা উচিত।

খাদ্য নিরূপণ —মাতৃ স্তন দুগ্ধই যে শিশুর প্রথম এবং প্রধান খাদ্য—সে বিষয়ে দ্বিরুক্তি করিবার উপায় নাই। কিন্তু ঐ দুগ্ধ যদি কোন কারণে বিকৃত অল্প বা অপ্রচুর হয় তবেই শিশু খাদ্য নির্ব্বাচন সমস্যা উপস্থিত হয়। স্বীয় মাতৃ স্তন্য যেমন উপযোগী—অন্য মাতৃ স্তন্য সেই শিশুর সেরূপ উপযোগী হইবে কি না বা তৎ পরিবর্ত্তে অন্য জীবের স্তন দুগ্ধ তাহার জীবন ধারণের পক্ষে অনুকূল হইবে কি না—ঠিক করিতে হইলে আমাদের অনেক বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। কারণ সকল শিশুরই শরীর এক ভাবে গঠিত নহে। কেহ কোনও খাদ্য খাইয়া ভাল থাকে আবার সেই খাদ্যই অন্য শিশুর সহ্য হয় না। একজনের পুষ্টিকর খাদ্য অন্য শিশুর অস্বাস্থ্যকর হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত প্রাকৃতিক খাদ্য পিতামাতার আর্থিক অবস্থা সহর বা পল্লীতে বাস মুক্ত বা আবদ্ধ বায়ুতে অবস্থান, শীতপ্রধান বা

শীত প্রধান স্থানে বাস, ঋতুভেদ ইত্যাদি শিশু শরীর পুষ্টি সাধনের উপর অনেক বিষয় নির্ভর করে। এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া শিশুখাদ্য নিরূপণ করা প্রয়োজন হয়।

আজকাল খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ স্তন্য দুগ্ধের অভাবে অথবা ফ্যাশনের বশবর্ত্তী হইয়া যে সমস্ত কৃত্রিম খাদ্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন সে সমস্ত খাদ্য কখনই স্তন দুগ্ধের অনুরূপ হইতে পারে না। কোন্ বয়সে কোন্ জিনিষটি কতটা পরিমাণে শিশু জীবনের বিশেষ উপযোগী তাহা নিরূপণ করিতে হইলে প্রকৃতি দেবী যাহা শিক্ষা দিয়াছেন আমাদের তাহারই অনুকরণ করা উচিত।

প্রকৃতিদেবী সমস্ত স্তন্য পায়ী জন্তুদের যে খাদ্য সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা প্রধানত আমিষ খাদ্য। মনুষ্য জাতি তাহাদের জীবনের প্রথম বারমাস পর্য্যন্ত অসাক্ষাৎভাবে মাংসাশী (Carnivora)। ইহা দেখিয়া স্পষ্টই জানা যাইতেছে—টাটকা এবং প্রচুর পরিমাণে আমিষ খাদ্য খাইয়া বেশীর ভাগ মনুষ্য জীবন বর্দ্ধিত হয়।

জীবনের প্রথম বার মাস পর্য্যন্ত প্রথম দ্রুত পুষ্টি সাধনের সময়। এই সময়ে শিশুকে মাতৃ স্তন্য, ধাত্রী স্তন্য, কোন জন্তুর দুগ্ধ কিম্বা উহাদের দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত কোন খাদ্যরূপ খাওয়ান যাইতে পারে। এই চারি প্রকার খাদ্য মধ্যে মাতৃ স্তন্যই যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ইহা পরীক্ষা সিদ্ধ তত্ত্ব।

যদ্যপি মাতার শরীর ও স্তনের অবস্থা ভাল হয়, মাতা বলবতী, সুস্থশরীরী সুস্থমনা হন যদ্যপি তাঁহার ছেলেকে দুগ্ধ খাওয়ানর প্রবল ইচ্ছা ও স্তনে যথেষ্ট দুগ্ধ থাকে তবেই সেই দুগ্ধ পানে ছেলের পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে রুগ্না মাতারও স্তনে যথেষ্ট দুগ্ধ থাকিতে দেখা যায় এবং কোন কোন স্থলে বলবতী মাতরও স্তনে দুগ্ধ কম থাকে। কিন্তু ইহা সাধারণ নিয়ম নহে। মোটকথা মাতার দুগ্ধ খাইয়া ছেলের পুষ্টি সাধন হয় কিনা অথবা কোনরূপ অপকার হয় কি না তৎপ্রতি বাটীর কর্ত্তা গৃহিণীর সবিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

স্তন্যদানের সাধারণ নিয়ম—মাতা বসিয়া শিশুকে কোলে রাখিয়া তাহার মাথা ও পৃষ্ঠদেশ ভাগ বেশ সুরক্ষিত করিয়া স্তনের বোঁটা শিশুর মুখে দিবেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত শিশুর পেট না ভরে ততক্ষণ নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন সুস্থ মনে, একাগ্র চিত্তে তাহাকে স্তন্য প্রদান করিবেন। প্রত্যেকবার স্তন্যদানের পূর্ব্বে বোঁটা ধুইয়া লওয়া ভাল।

> **খাদ্য সম্বন্ধে সাধারণ ভুল**
>
> **ভুল নং ১।** শুধা [illegible] পাওয়া অসময় (দুষ্ট) ক্ষুধা [illegible] হইয়াছে বুঝা।
>
> **ভুল নং ২।** নানা রকমের তরী তরকারী [illegible] মশলা চাটনী আচার ভাজা-ভুজি না [illegible] ওয়া দায় ওয়া।
>
> **ভুল নং ৩।** যাঁরা মাথার কাজ করেন [illegible] কায়িক পরিশ্রমী অপেক্ষা খুব কম খাওয়া উচিত—[illegible]।
>
> **ভুল নং ৪।** মাছ মাংস [illegible] পোষ্টাই হয় না—এই মত।
>
> **ভুল নং ৫।** খুব বেশী খাইলে গায়ে জোর হয়।

শিশুর ঠোঁট ও গাল এমন ভাবে গঠিত যে তদ্দারা সে স্তন হইতে বেশ দুধ টানিয়া লইতে পারে। স্তনও একরূপভাবে গঠিত যে উহা হইতে আবশ্যক মত টাটকা দুগ্ধ উৎপন্ন হইয়া নির্গত হয়। স্তন হইতে টাটকা দুগ্ধ টানিয়া লওয়ায় শিশুর লালা প্রভৃতি হজমকারী পদার্থের সহিত মিশ্রিত হয় বলিয়া তদ্দারা কোনরূপ পচন ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। শিশুর যতক্ষণ পেট না ভরে ততক্ষণ সে দুগ্ধ টানিতে থাকে দুধও ক্রমাগত উৎপন্ন হইয়া সমান ধারায় বাহিরে আসিতে থাকে এই কারণে শিশুও ক্লান্ত হয় না এবং খাইবার সময়ও বেশী লাগে না। ইহা ব্যতীত স্তনের আর

একটী স্বাভাবিক গুণ যে উহা শিশুর বয়সের উপযোগী উপাদান ও পরিমাণের তারতম্য করিয়া দুগ্ধ উৎপন্ন করিয়া থাকে।

শিশু জন্মিবার পরই—আমাদের দেশে মাতৃস্তন্য দেওয়া হয় না কারণ প্রথমে ভাল দুগ্ধ হয় না এবং মাতাও শিশুকে স্তন দিতে সমর্থ হয় না। এরূপ স্থলে প্রসব হওয়ার পর ৬ হইতে ৭৮ ঘণ্টা কাল শিশু স্তন দুগ্ধ পান করে না। শিশুকে মধু খাইতে দেওয়া হয় পরে গরুর দুগ্ধ মিশ্রিত জল পরিমাণে ন্যাকড়ার পলিতার দ্বারা তাহার মুখে দেওয়া হয়। শিশু উহা আগ্রহের সহিত পান করিয়া থাকে। তাহার পর মাতার শরীর একটু সবল হইলে দুগ্ধ পান করান হয়। বিলাতে জন্মের পর মিসরির জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শিশুকে দেওয়া হইয়া থাকে।

শিশু জন্মিবার পর যত শীঘ্র সম্ভব শিশুকে স্তন্য পান করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে তাহার ওজন ও জীবনী শক্তি কম হইতে পারে না। জন্মিবার পর প্রত্যেক ঘণ্টা প্রত্যেক দিন শিশুর খাদ্যের প্রতি আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। এই সময়ে অযত্ন হইলে তাহার জীবন রক্ষার বিশেষ বিঘ্ন হইতে পারে।

শিশু যত অল্প বয়স্ক হয় তাহার পরিপোষণ কার্য্য তত দ্রুত সম্পন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং তাহার শরীরের ক্ষয় পূরণ করিয়া তাহার বৃদ্ধি হইবার সাহায্যের জন্য অনেক বার স্তন দিতে হয়।

তদ্ব্যতীত শিশুর শরীরের উত্তাপ রক্ষা করিবার জন্যও তাহার খাদ্যের প্রয়োজন। নিম্নলিখিত নিয়ম অনুসারে শিশুকে খাওয়ান উচিত —

বয়স —	সময় অন্তর—	২৪ ঘণ্টায়—	রাত্রিতে—
জন্ম হইতে ৪ সপ্তাহ পর্য্যন্ত	২ ঘণ্টা	১ বার	১ বার
৪ হইতে ৬ সপ্তাহ পর্য্যন্ত		৯ বার	১ বার
৬ হইতে ৮ সপ্তাহ পর্য্যন্ত	২	৮ বার	১ বার
২ হইতে ৮ মাস পর্য্যন্ত	২	৭ বার	১ বার
৪ হইতে ১ মাস পর্য্যন্ত	৩	৬ বার	১ বার
১ হইতে ১২ মাস পর্য্যন্ত	৩	৫ বার	

এইরূপ সকাল ৬টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্র ১০টার মধ্যে স্তন পান শেষ করান উচিত। নতুবা মাতার ঘুমের ব্যাঘাত হইতে পারে। মাতার বিশ্রাম ও ঘুম বিশেষ প্রয়োজন নতুবা মাতার স্বাভাবিক দুগ্ধ উৎপন্ন হইতে পারে না।

অনিয়মিত ভাবে দুগ্ধ খাইতে দিলে বা খুব শীঘ্র শীঘ্র বা খুব দেরীতে স্তন্য পান করাইলে দুগ্ধের পরিমাণ ও উপাদান উভয়ই পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে ঐ দুগ্ধ পানে শিশুর শরীর বর্দ্ধনের কোন সাহায্য করে না এবং ঐ দুগ্ধ শিশু সহজে হজম করিতে পারে না। শীঘ্র শীঘ্র দুগ্ধ পানে দুগ্ধের জলীয় ভাগ কম এবং কঠিন অংশ বেশী হইয়া থাকে সুতরাং ঐ দুগ্ধ জমাট দুগ্ধের মত কার্য্য করে সেজন্য সে দুগ্ধ শিশু হজম করিতে পারে না। আবার দেরীতে দেরীতে দুগ্ধ দিলে দুগ্ধের জলীয় ভাগ বেশী হয় ও কঠিন পদার্থ কম হয়। সুতরাং দুগ্ধ জলের মত পাতলা হইয়া থাকে। ইহা যদিও সহজে হজম হইতে পারে কিন্তু শিশুর পুষ্টি সাধন মোটেই হয় না। এজন্য নিয়মিত সময় অনুসারে দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা মাতাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

এক বৎসর পর স্তন দুগ্ধ ফুরাইবার সময় দুগ্ধের অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় এই সময় শিশুকে আর মাতৃস্তন্য না দেওয়াই ভাল। কোন কোন মাতার প্রায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত স্তনে দুগ্ধ বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু তা বলিয়া সে দুগ্ধ আর শিশুকে খাইতে দেওয়া উচিত নহে। এক বৎসর পরে অথবা শিশুর দন্তোদ্গমের পর শিশুর হজম করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়,

তখন গরুর দুগ্ধ ও শ্বেতসার ঘটিত পদার্থ (দুধের সহিত সাগু বার্লি ও মিস্রির গুড়া ভাতের দলা বা রুটির টুক্‌রা) শিশুকে খাইতে দেওয়া উচিত। এই জন্যই আমাদের দেশে ঐ সময়ে অন্ন প্রাশন মহোৎসব করা হয়। শিশুর বয়স ৯ মাসের উপর হইলেই অর্থাৎ ইনসাইসর বা কর্ত্তনকারী দন্ত উঠিলেই বুঝিতে হইবে শিশুর অগ্ন্যাশয় রস (Pancreatic juice—যাহা শ্বেত সারকে পরিপাক করিবার সহায়তা করে) সম্পূর্ণভাবে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে তখন তাহাকে শালি জাতীয় বা অন্ন ঘটিত পদার্থ খাইতে দেওয়া উচিত এবং হঠাৎ স্তন দুগ্ধ বন্ধ না করিয়া ক্রমে ক্রমে কমাইয়া দুই মাসের মধ্যে স্তন দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। দাঁত উঠিবার সময় শিশুর প্রায়ই পেটের অসুখ হইয়া থাকে সে সময় স্তন দুগ্ধ বন্ধ করা উচিত নহে তাহা হইলে পেটের পীড়া বৃদ্ধি হইয়া শিশুর বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে।

অনেক স্থলে মাতার অসুখের জন্য বা [illegible] হইলে স্তন দুগ্ধ বন্ধ করিতে হয় তখন মাতৃ দুগ্ধের পরিবর্ত্তে অন্য দুগ্ধ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যদি গো দুগ্ধ পানে শিশু বর্দ্ধিত হয় তবে তাহাই পান করাইবে নতুবা গর্দ্দভী দুগ্ধ বা মাতৃ দুগ্ধের অনুকরণ করিয়া অর্থাৎ গো দুগ্ধে জল ও অতি সামান্য মিস্রীর গুড়া মিশ্রিত করিয়া শিশুকে খাইতে দিবে। যতদিন পর্য্যন্ত শিশুর দন্তোদ্গম না হয় ততদিন শালিজাতীয় খাদ্য শিশুর মোটেই সহ্য হইবে না সুতরাং সাগু বার্লি বিস্কুট রুটি ভাত প্রভৃতি সে সময় খাওয়ান উচিত নহে। কিন্তু দন্ত উঠিবার পর যদি মাতৃস্তন্যের অভাব হয় তখন গো দুগ্ধের সহিত ঐ সকল পদার্থ ভাল করিয়া মিশ্রিত করিয়া সেবন করান যাইতে পারে। তাহাতে শিশুর বিশেষ অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না বরং শিশু ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই দন্তোদ্গমের সময় অনেক শিশুর উদরাময় পেটের পীড়া হয় এজন্য অনেক মাতা শিশুকে [illegible] বার্লি প্রভৃতি পথ্য দেন তাঁহাতে তাহার পেটের পীড়া দূরীভূত হওয়া দূরের কথা—বরং বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে উপরন্তু শিশুর বমনও হইতে দেখা যায়। এরূপ স্থলে স্তনে যে পরিমাণ দুগ্ধ থাকে তাহাই পান করিতে দেওয়া উচিত এবং সে দুগ্ধের সহিত এক চামচ করিয়া সুপরিস্রুত চূণের জল বা বাইকার্ব্বনেট অব সোডা অথবা সোডা সাইট্রাস অবস্থাভেদে ২।১ গ্রেন মিশ্রিত করিয়া ২।১ বার খাইতে দেওয়া উচিত। দন্তোদ্গমের পর বা ১২ মাসের সময় যখন বুঝিবে শিশু গরুর দুগ্ধ এবং যে কোন আকারের শ্বেতসার ঘটিত পদার্থ খাইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে তখন স্তন দুগ্ধ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

যখন কোন কারণে শিশুকে মাতৃস্তন্য দেওয়া অসম্ভব বা [illegible] হইয়া থাকে তখন অন্য কোন স্ত্রীলোকের স্তন্য বা শিশুর পরিপোষণের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু কোন কোন স্থলে দেখা যায় আপন মাতৃ দুগ্ধ শিশুর যেমন পুষ্টিকর হয় অন্য মাতার স্তন্য সেরূপ পুষ্টিকর হয় না। সেরূপ স্থলে ডাক্তার দ্বারা অথবা নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা স্তন দুগ্ধ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য।

ধাত্রী দুগ্ধ —মাতার অভাব হইলে কিম্বা বিলাসিতার বশবর্ত্তী অথবা দেশের রীতি অনুসারে অনেকস্থলে শিশুকে ধাত্রী দুগ্ধ পান করান হয়। এরূপ ধাত্রী নির্ব্বাচন করিতে হইলে সে ধাত্রীর মেজাজ ধীর স্বাস্থ্য ভাল বয়স ২০ হইতে ৩০ এর মধ্যে এবং যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যাহার সন্তান শিশুর বয়সোপযোগী ও বিশিষ্ট শিশু লালন পালনে যে অভ্যস্তা ও সক্ষমা—এরূপ ধাত্রীর হস্তে শিশুর লালন ভার দেওয়া কর্ত্তব্য।

ধাত্রীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করা উচিত। তাহার কোন পুরাতন রোগ—উপদংশ যক্ষ্মা প্রভৃতি আছে কি না তাহা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করা উচিত। যদি নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা এরূপ ধাত্রী ঠিক করা যায় ভাল।—নতুবা তাহার স্তন দুগ্ধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ঐ রূপ রোগগ্রস্তা ধাত্রী দ্বারা শিশু পালন করা কখনই উচিত নহে।

ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া তাহার খাদ্য বস্ত্র ও অবস্থান এবং পরিশ্রমের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সে সাধারণতঃ যেরূপ খাদ্য খাইত যেরূপ বিশ্রাম করিত তাহাকে তাহাই দেওয়া উচিত নতুবা ভাল বা মন্দ খাদ্যে অথবা কম বা বেশী পরিমাণে তাহার স্তন দুগ্ধের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। স্তন দুগ্ধের পরিবর্ত্তন হইলেই ছেলের সে দুগ্ধ সহ্য হইবে না। তাহাকে পরিষ্কার বস্ত্র ও অবস্থানের জন্য ভাল বায়ু ও আলোকপূর্ণ গৃহ দেওয়া উচিত।

মাতৃস্তন্য ছাড়া—যদি অন্য খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন হয় অর্থাৎ যদ্যপি মাতা রোগগ্রস্তা হন বা অন্য কোন স্ত্রীলোকের দুগ্ধও যোগাড় করিতে না পারা যায় তাহা হইলে অন্য স্তন্যপায়ী জীবের দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মানব জীবনের প্রথম গঠন আমিষ জাতীয় খাদ্য দ্বারা হইয়া থাকে স্তন্যপায়ীদের দুগ্ধ আমিষ এবং উহার উপাদান একই তবে জন্তুর খাদ্য অবস্থান ও দৈহিক অবস্থা অনুসারে ঐ উপাদানের কিছু কম বেশী থাকিতে পারে। ঘোড়া ও গাধার দুগ্ধ যদিও মানব দুগ্ধের সদৃশ। কিন্তু তাহা সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং তাহা এত বেশী নয় যে তদ্দ্বারা একটা দেশ বা সমাজ চলিতে পারে সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের সযত্ন পালিত সুস্থ গো দুগ্ধই মাতৃস্তন্য অভাবে উপযুক্ত খাদ্য। কিন্তু তাই বলিয়া সকল গরুর দুগ্ধ শিশু খাদ্যের উপযোগী নহে। যে সকল গরু রোগ শক্তিশালী এবং যে গরুর দুগ্ধ খাইয়া তাহার বৎস বেশ সতেজ হয় যে গাভী বেশ হজম করিতে পারে যাহার দুগ্ধের পরিমাণ বেশী ও দুগ্ধের উপাদান সমান এরূপ গরুর দুগ্ধ পান করিতে দিলেই ভাল হয়। সেজন্য গাভীকেও যত্ন করা প্রয়োজন তাহার খাদ্য ও অবস্থান যাহাতে ভাল হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন।

জন্মিবার সময় একটি শিশুর ওজন কিছু কমবেশী চারি সের হয়। একটী সুস্থকায় শিশু পাঁচ মাস বয়স পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তাহে মোটামুটি আধ পোয়া (৪ আউন্স) ওজনে ভারি হয়। তারপরেও প্রতিমাসে গড়ে তাহার আড়াই পোয়া করিয়া বাড়া উচিত। একটি পরিপূর্ণ সুস্থকায় এক বৎসরের শিশুর ওজন এগার সেরের নীচে গেলেই তাহাকে ডাক্তার দেখান ও তাহার বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ কর্ত্তব্য।

প্রত্যেকবারে কি পরিমাণ দুগ্ধ শিশুকে খাওয়ান যাইতে পারে তাহাও স্থির করা প্রয়োজন ও নিয়ম মত সেই পরিমাণ দুগ্ধ অথবা শিশুর ওজনের পরিমাণানুসারে তাহার পাকস্থলীর অবস্থা বুঝিয়া তাহার দুগ্ধের মাত্রা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। শিশুর তিন মাস পর্য্যন্ত যথেষ্ট মাতৃ স্তন্য থাকিলে তাহাকে অন্য দুগ্ধ দেওয়া উচিত নহে। তিন মাসের পর হইতে অর্দ্ধেক মাতৃস্তন্য ও অর্দ্ধেক গো দুগ্ধ (জল মিশ্রিত করিয়া) দেওয়া যাইতে পারে। চতুর্থ মাস হইতে সাত মাসের মধ্যে সুস্থ শিশুর মোট দুগ্ধের পরিমাণ তিন পোয়া হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ পোয়া পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে বাড়াইয়া দিতে হয়।

শিশু শরীরের তাপরক্ষা করা শিশু খাদ্যের অন্যতম উদ্দেশ্য সুতরাং শিশু শরীরের তাপ নির্ণয় করিয়াও শিশুখাদ্য নির্ব্বাচন করা উচিত।

দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রথম কয়মাস শিশুদের কাঁদিবার সময় চক্ষে জল আসে না ও মুখ হইতে লালা পড়ে না। এতদ্দ্বারা প্রতীত হয় যে তখন তাহাদের পাকস্থলীতে সর্ব্বপ্রকার হজমকারী রস জন্মে না। যতদিন দাঁত না উঠে ততদিন পাকস্থলীতে এই সকল পাকরসের আবির্ভাব হয় না। এই কারণে দাঁত না উঠিলে—৯ মাসের আগে শিশুকে শালি কু জাতীয় খাদ্য—ভাত রুটী মিঠাই মণ্ডা ফলফুলুরী এমন কি—সাগু বার্লিও পথ্য দেওয়া কোনক্রমে উচিত নহে। দশ মাসের পর ক্রমে স্তনদুগ্ধ দেওয়া বারে কম করিয়া গো দুগ্ধের সহিত বার্লি দেশীয় বিশুদ্ধ এরারুট পটী বা কর্ণ ফ্লাওয়ার দেওয়া অভ্যাস করা ভাল পেটের সামান্য গোলমাল থাকিলে ইহার সহিত ১ গ্রেণ বা আধরতি আন্দাজ লবণ মিশ্রিত করা

ভাল। যতদিন পর্য্যন্ত মাড়ীর দাঁত না উঠে ততদিন মাংস ঘটিত খাদ্য দেওয়া উচিত নহে। মাড়ীর দাঁত উঠিলে পর ক্রমশ মাংসের জুস্ মৎস্যের ঝোল ডিমের শ্বেতাংশ ভাত ও পাতলা ডাল খাইতে দেওয়া যায়।

উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে পেটের পীড়া তড়কা (convulsions) রিকেট (Rickets) প্রভৃতি রোগে অনেক শিশু মারা যায়।

শিশুর খাদ্য সর্ব্বদা সামান্য গরম ও একটু মিষ্ট হওয়া আবশ্যক স্তনদুগ্ধে যে পরিমাণ মিষ্ট থাকে গরুর দুগ্ধে তদপেক্ষা কম মিষ্ট থাকে সে জন্য গরুর দুধ খাওয়াইবার সময় তৎসহ একটু চিনি মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান উচিত। কিন্তু সাধারণ চিনি অপেক্ষা সুগার অব মিল্ক (Sugar of mill) বা দুধ হইতে প্রস্তুত চিনি ব্যবহার করাই ভাল। এই চিনি না পাইলে মিশ্রির গুড়া দেওয়া উচিত। সাধারণ চিনি বা গুড় পাকস্থলীতে গিয়া গাজিয়া অম্ল উৎপন্ন করে ও তাহাতে বদ হজম জন্মায়।

খাওয়ানোর পূর্ব্বে প্রত্যেকবার দুগ্ধ ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হয় যদি কোন কারণে দুগ্ধ বেশী ঠাণ্ডা হইয়া যায় তবে খাওয়ানোর সময় দুগ্ধ সামান্য গরম করিয়া লওয়া উচিত। দুগ্ধ কখনও এক মিনিটের বেশী গরম করা উচিত নহে দুধের সর ছাঁকিয়া ফেলা ভাল। বীজাণু দোষ হইতে নিরাপদ করিয়া লইবার জন্য যদি দুধ খুব ফুটাইয়া লইবার দরকার হয় তাহা হইলে উহাকে আটা পাত্রে ঠাণ্ডা হইতে দিয়া তৎসহিত ২।১ কোয়া মিষ্ট কমলালেবুর রস বা আঙুরের রস মিশাইয়া লওয়া চাই।

ঠিক নিয়মিত সময়ে শিশুকে দুগ্ধ খাওয়ান উচিত। যখন তখন ছেলে কাঁদিলেই দুধ খাওয়ান উচিত নহে। সব সময়েই যে শিশু ক্ষুধার জন্য কাঁদে—তাহা নহে হয়ত তাহার পিপাসা হইয়াছে অথবা অনিয়মিত খাওয়ানোর দোষে পেট ফাঁপিয়াছে পেট কামড়াইতেছে গাত্র চুলকাইতেছে বা পিপড়া কামড়াইয়াছে তাহার গায়ে কাপড় কষা হইয়াছে বা বিছানায় প্রস্রাবের জন্য ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। শিশুর শীত বা সর্দ্দি লাগিলেও কাঁদিতে পারে। কাঁদিলেই যে দুধ খাওয়াইতে হইবে এরূপ মনে করা ভুল। তাহার কাঁদার কারণ নির্ণয় করিয়া প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

শিশু কাঁদিলেই তাহাকে চুপ করিবার জন্য কাঠের চুষি আঙ্গুল ঝুমঝুমি বাঁশি বা স্তন মুখে দেওয়া ও তাহা মুখে দিয়া ঘুমাইবার অভ্যাস করান ভাল। কিন্তু ঐ গুলির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখাও বিশেষ প্রয়োজন। তাহাতে অজীর্ণ পেট কামড়ান ও পেট ফাঁপা প্রভৃতি সারিতে দেখা যায়। নিয়মিত শিশুকে মৃদু মধুর রৌদ্র ও বৈকালে বায়ু সেবন করান বহু রোগের প্রতিষেধক।

শিশুর খাদ্য ঠিক পরিপাক হইতেছে কি না তাহা জানিবার জন্য মধ্যে মধ্যে শিশুর মল দেখা প্রয়োজন। যদি মলে সব ছানা বা দধির মত ছোট ছোট সাদা সাদা পদার্থ থাকে তবেই জানিবে—তাহার খাদ্য হজম হয় নাই তখনই খাদ্য পরিবর্ত্তন করা উচিত।

স্তন দুগ্ধ অম্ল নহে কিন্তু গরুর দুগ্ধ অম্ল গুণ বিশিষ্ট এই কারণে গরুর দুগ্ধের সহিত চূণের জল মিশাইয়া খাওয়াইলে ভাল হয়। চূণের জল মিশাইলে পাকাশয়ে দুগ্ধ জমাট বাঁধিতে পারে না। যে সকল ছেলে দুধ খাইয়া দধির মত বমন করে বা ঐ রূপ বাহ্যে করে তাহাদের চূণের জল মিশান দুগ্ধ খাওয়ান উচিত।

যে সকল শিশুর হজম শক্তি কম তাহাদের মাখম তোলা দুগ্ধ সহ সদ্য বাছুর হওয়ার পর গাভীর ১।১৫ ফোঁটা সাদা কস দিয়া খাওয়াইলে সহজে হজম হয়।

কোন শিশু যদি উপযুক্ত পরিমাণে না খায় ও ক্রমশ রোগা হইতে আরম্ভ করে তবে তাহার গায়ে তৈল বা মাখম মাখাইলে উহার কিছু ভাগ শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শিশুর খাদ্যের ন্যায় কার্য্য করে।

যদি কোন শিশু বেশ সুস্থ দেখায় শক্ত সবল স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও কোলে না লইলে ভারি বোধ হয় বমি করে না দিবসে অন্ততঃ ২ বার পরিষ্কার হরিদ্রা আভাযুক্ত নরম বাহ্যে হইতেছে কাঁদে কম প্রত্যেকের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে খেলা ধূলায় ভুলিয়া থাকে তখনই বুঝিতে হইবে ছেলে বেশ উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে।

[ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী]

বাঙ্গালীর শুদ্ধাচার (২)

স্ত্রী সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে ভক্তি পরায়ণা শুদ্ধান্ত করণা অতি পবিত্রাচারিণী—একান্ত যত্ন নিপুণতার সঙ্গে গোময় না লেপে এঁটো পাড়েন না কিন্তু তাঁর চক্ষের উপর স্বামী মহাশয় কি আহার গ্রহণ কচ্ছেন সেদিকে দৃষ্টি নেই। অদূরে অবস্থিত পায়খানার বিষ্ঠাভুক্ত অগণ্য মাছি এসে ভাতে ভাগ বসাইতেছে—নির্ব্বিকার চিত্তে পেটের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছেন। মাছি তাড়াতে কেহই কড়ে আঙ্গুলটি তুলেন না।

বর্ত্তমান বেগ ও উদ্বেগ।

(Daily Pas enger বা বাড়ী হইতে দৈনিক যাতায়াতকারী চাকুরে বাবুর জীবন)

[শ্রীক্ষীরোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ব এ]

ছুট ছুটু ছুট—গেল গেল গেল -
ওই বুঝি ট্রেণ ছাড়ে
আজ দেরী হলে বেগে বড় বাবু
রাখিবে না মাথা ঘাড়ে।

মাথার চাঁদিতে তৈল ছিটায়ে
স্নান সারে সত্বর
উত্তমরূপে তেল মাখিবার
আছে কি গো অবসর ?

হুড় হুড় হুড় জল ঢালে গায়
দুই চারি পাঁচ ঘড়া
তবু বাবু বলে ঠাণ্ডা হয় না
এমনি ধাতুটা কড়া।

পেটটা গরম রয়েছে সমান
আজ কয়দিন থেকে
মিছরী ভিজান পড়ে আছে গ্লাসে
ফাক্ নাই খেতে ছেকে।

মাছ খাওয়া আজ হবে না হবে না,
কাটা বেছে কেন রাখেনি ?
তিনটে মিনিট বড় জোর খেতে
পাই, সেটা বুঝি দেখেনি ?"

আর্শী চিরুণি ঝট্ করে লয়ে
কাটিল মাথায় টেরি
ফুকারিয়া কন্—"ভাত বাড় ওগো
দিয়ে করো নাক্কো দেরী।"

শা । শাদা শ । ান গান ান
সো সো সো গিলিছে
পাশের কাছে বসিয়া গৃহিণী
অবাক হইয়া দেখিছে।

মুখ ঘাসে চা । অবলা বামা
বুঝে না দাসের জ্বালা
কি খোয়াবে দিন কাটে গো স্বামীর
কি কষ্টে দিয়েছে বালা।

আহো কি ভীম। জীবন হেরিয়া
কেঁদে ওঠে প্রাণ পাখী
কি গতি বেগ গো ব্যস্ততা আহা
দেখে ঝরে মোর আঁখি।

রুদ্ধশ্বাসেতে দৌড়িছে বাবু
রোদে যায় মাথা পুড়ে
টস টস ঘাম ঝরে সারা গায়
বন বন মাথা ঘুরে।

বড় বাবুটির দন্ত খিচুনী
ছোট সাহেবের হাক
দেখে শুনে পেটে চমকায় পিলে
রাঙা হয় মুখ নাক্।

একটা বাজিল টিফিন্ লাগিল
বাবুরা ছাড়িল হাঁফ
কচুরী জিলাপি চলিল অমনি
খাওয়া বেশ গুপ গাপ।

কি রুচি বিকার, কি ছাই খাবার
পুরিতেছে পোড়া পেটে।
গুণ বিচারিতে নাই গো সময়
খেটে দিন যায় কেটে।

"আজি ত বাঁচিনু কোনরূপে বাবা
কাল যাহা হয় হবে।
বর্ত্তমানের দারুণ উদ্বেগে
ব্যাকুলিত জীব ভবে।

জোয়ালে বদ্ধ ক্ষুধায় ক্ষুব্ধ
তাড়িত বলদ প্রায়
যার তার হাতে যেখানে সেখানে
পচা বাসি ছাই খায়।

উৎকট রজোগুণের কর্ম্মী
সতত ঘূর্ণমান,
ক্ষিপ্ত মানসে স্নেহ-প্রেম দয়া
বিবেকের নাহি স্থান।

সামনে যা' পায় তীব্র রুক্ষ
বিদাহী কটু লবণ,
গপ্ গপ্ গপ্ হাম্ হাম খায়,
করে না গো চর্ব্বণ।

অকালে ভেজাল গো গ্রাসে খেয়ে
ঝাঁপিল ঘূর্ণিপাকে
বন বন পাক্—দে পাক্ দে পাক্,
আর তারে কেবা রাখে।

ক্লান্ত শরীরে ঘরে যায় বাবু
সন্ধ্যায় কাজ সেরে
আখের ছিবড়ে যেন গো নীরস—
কলে পিষে দেছে ছেড়ে।

নেশার জিনিষ।

১। নেশার জিনিষ ঠিক ভিজে বেড়ালের মত ছুঁচ হয়ে ঢুকে, ফাল্ হয়ে বেরোয়। প্রথমে দাস থাকে পরে প্রভু হয়ে উঠে।

২। মদ চুরুট তামাক দোক্তা সিদ্ধি কাফি, আফি প্রভৃতি নিজেদের প্রকৃত রূপগুণ লুকিয়ে রাখে প্রথম প্রথম খুব আরাম দেয়, কিন্তু পরিণামে দেহ মনের ধ্বংস সাধন ক'রে ছাড়ে।

৩। মদ যায় সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, সুখ তার খিড়কী দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়।

৪। নেশার জিনিষ কোন জন্মে কারো হজম শক্তি বাড়ায় না, কোন অসুখের উপশম করে না শরীরের কোন উপকারে আসে না, প্রত্যেকটি বিষের সমান্।

৫। নদ নদী সমুদ্রে যত লোক ডুবে মরেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী লোক মদে ডুবে মরেছে। একা প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে যে তামাক বিড়ি সিগারেট খরচ হয় সেইগুলির ছাই ও গুল্ দিয়ে ভারতবর্ষের [illegible] সমুদ্রকে স্বচ্ছন্দে বুজিয়ে দেওয়া যায়। নেশা লোকের পয়সা নষ্ট করে মস্তিষ্ক বিকৃত করে, জীবনের, সুখ শান্তি নষ্ট করে। নেশার জিনিষ ছুঁয়ো না, কিনো না, বেচো না, খাইয়ো না।

চক্ষু রত্নের যত্ন

শ্রী ান্দকুমার ব

নেত্রের দশটি নিষেধ

১। ভোর বা সন্ধ্যার অপ্প আলোকে ার তেজওয়ালা বাতির নিকট চোখে কোনরূপ ীড়া যদি দৌর্ব্বল্য বক্তদুষ্ট বা াড়া দৌর্ব্বল্য (nervou lerangement r debility) প্রভৃত উপসর্গ হলে কখনও পড়াশুনার কাজ করবে না।

২। শারিত বা অর্দ্ধ ায়িত অবস্থায় ার উত্তেজনার সময় বা পরিশ্রান্ত হয়ে কোন লেখা পড়বে না।

৩। চলন্ত ঘোড়ার বা গরুর গাড়ী বা যে ট্রেন াব ঝাকি োর চলে াবমন বসে কিম্বা পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেড়া অম । ওয়ার ঠিক পরেই ড়ো না।

৪। ার ছোট লেখা বে াড়ত অভ্যাস করো না ছোট লেখা বলতে এই বুঝি া যা পড়তে চোখে একটু কষ্ট হয় বার বার ঠেকে বা মাঝের ার লাইন ছলে অন্য লাইনের দিকে ি াগবা য়ে যায়। বা বায়োস্কোপে ঘন ঘন াওয়া বা িয়েটারে রাত্রি জাগরণ চোখের পক্ষে মোটেই হিতজনক নয়। বায়োস্কোপে গিয়ে চিত্র দেখানোর পর্দ্দা থেকে যতদূর সম্ভব দূরে এব সোজাসুজি না বসে তির্য্যক্ ভাবে বসতে হয়।

৫। ময়লা হাত দিয়ে কখনও চোখ রগড়াবে না অথবা মলিন রুমাল বা কাপড় দিয়ে চোখ মুছবে না।

৬। পড়বার সময় বইখানি চ খের খুব দূরে বা অতি নিকটে ধরো না,—বেশ সহজ স্বাভাবিক ভাবে চোখে ন ক ড়ি আঙ্গুল আন্দাজ দূরে পড়ার ি া ার রে াধ ঘটা একাগ মনে প া া া কা বোধ করবে না বা জলে বে না।

এ প ন

৭। পড়বার বা লেখার াময় ডড ভবতের মত—কোল ক া ভ ণ ভাঁজ হয়ে বসো না।

৮। প্রখর রৌদ্রে বসে পড়ো না বা লিখো না

অন্তত পড়বার সময় সূর্য্যের কিরণ যেন বইয়ের পাতার উপর এসে না পড়ে।

৯। দক্ষিণ চক্ষু ও ন া া কিছু বিজাতীয় পদার্থ পড়বে—তখন ঐ চক্ষু ডল্ বে না বরং বাম চক্ষু ব ড়িও। এইরূপ বাম ে চ ো বিছু পড়লে ডাহিন চক্ষু চল্ ত থাক্‌বে। অথবা প্রয়োজন বোধে উপর বা নীচের পাতা উল্‌টিয়ে কাপ ড়ব ্ট পাকিে বস্তুটি এক কোণ ি বেে এনে সাবধানে বা র করে ফেলো।

১। ।ুে চিবি ২ বব অনু মোদন করা প ড়া প্রতিবাসাব ব্যবস্থ দে য়া কোন খ্ব া সা ি ক পত্রিকায় বিজ্ঞাপিত স ম্র প্রা েস পত্রের নজীব প্রদর্শিত অতি অ চর্য্য ফলপ্রদ সর্ব্ব প্রকাব চক্ষু বোগেব মহৌষধ লেও কখনও চক্ষে দেবে না। মনে রাখবে—

সাত বাজাব ধন—এক মানিকেব চেয়ে চোখে ব দল্য ঢেব বেশী।

এ রূপ ক র সা উচিত নয়।

কখন্ চশমা নেওয়া দরকার

(১) যখন তুমি বিশ হাত দূরের লোক ক দিন দুপুরে একবার মাত্র দৃষ্টি ফেলেই চিনতে পাব না বা বড় রাস্তার ওপারে দোকানেব সাইনবোর্ডগুলো চলতে চলতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেব সঙ্গে পড়তে পাব না কিম্বা যখন এক এক সময়ে আলোর মাঝেও চোখ ঝাপসা হ য়ে আসে ও চোখে কতকটা সত্যি সত্যি সর্ষে ফুল দেখ তে থাক।

(২) যখন কোন বস্তুর উপব দুই এক মিনিট অনন্যমন্ হ য়ে এক দৃষ্টে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তেই চোখ দিয়ে জল পড়ে চক্ষু আপনা আপনি ভারী হয়ে বুজে আসে এবং খুব অবসন্ন হ যে পড়ে।

(৩) যখন চোখেব ভিতর বা চাবি পাশে বেদনা অনুভব কর যখন ক্রমাগত মাথা ধরতে থাকে কপাল টিপ টিপ—রগ দিপ দিপ্ করে অথচ তার কোন নিকটবর্ত্তী কারণ খুঁজে পাচ্ছ না ডাক্তারের ব্রোমাইড, এস্পিরিন বা নানাপ্রকার খেয়ে মাথায় সুগন্ধি কেশ তৈল মেখে কপালে রক্ত চন্দন ঘষা কর্পূব সহ লাগিয়ে স্নেহি স ট শুকেও কোন ফল হচ্ছে না।
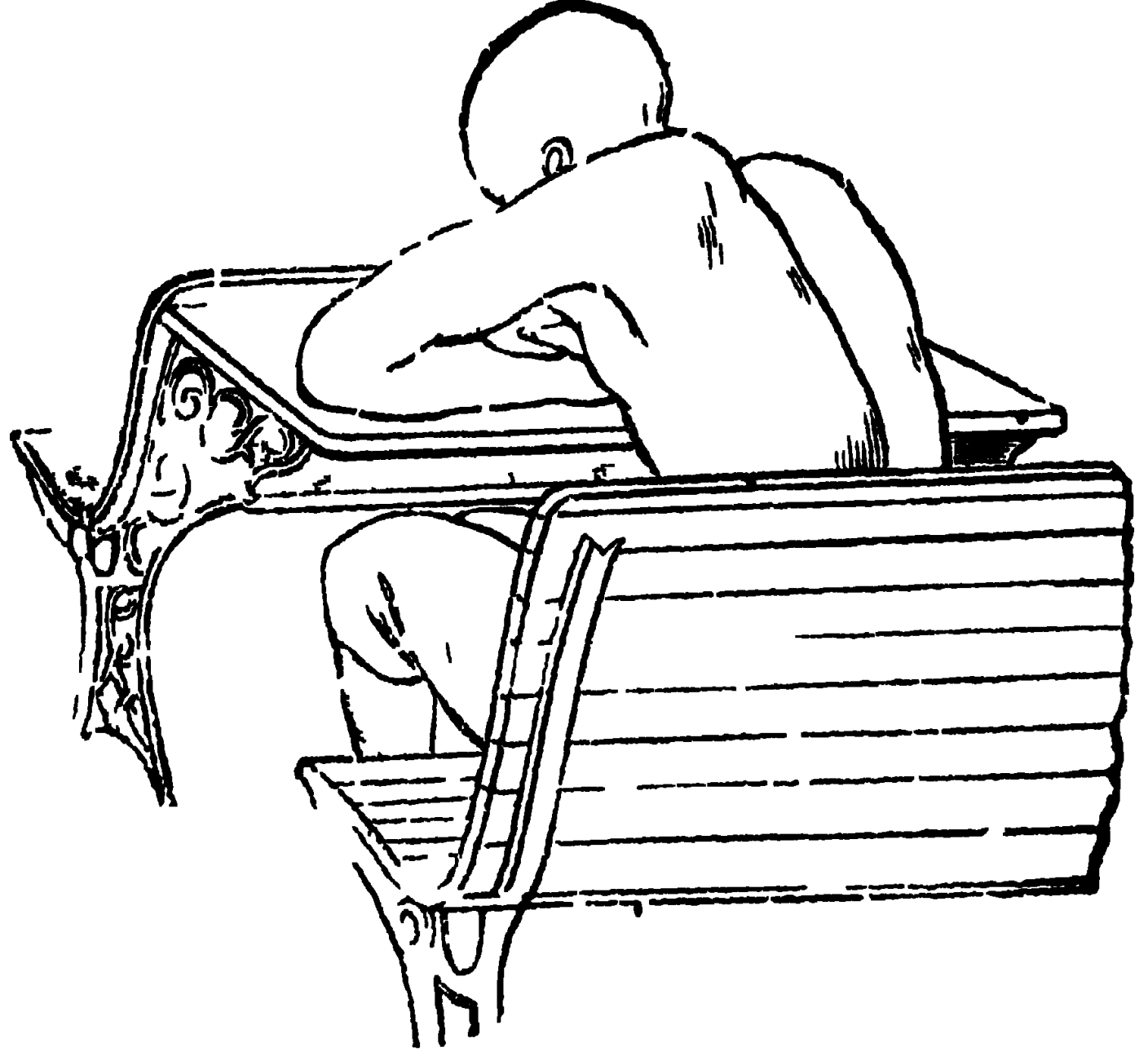
(৪) অফিসে কাজ কবতে কবতে মাঝে মাঝে যখন চোখ রগড়াতে হয় চক্ষু বুজতে হয় বা চক্ষুকে বিশ্রাম দিতে হয়

(৫) যখন প্রখব রৌদ্রেব তেজ একটু সইতে পাব না—কপালে হাত দিয়ে বা কোন উপায়ে চোখ আড়াল দিতে হয়।

(৬) বন্ধু বান্ধববা কাগজ পত্র যত চোখের নিকটে রেখে পড়েন্ তাব চয়েও বেশী নিকটে রেখে যখন তোমায় পড়তে হয়।

(৭) যখন খানিকক্ষণ পড়তে পড়তে বইযেব হরপগুলো সব যেন তাল পাল পাকিয়ে যায় দুই লাইনের মাঝের জায়গাগুলো লুপ্ত হয়ে লেখাগুলো যেন পরস্পরের কাঁধে চে প অ ছে বলে মনে হয়।

(৮) পূর্ব্বে ছোট হরপগুলো চোখের যতটা নিকটে রেখে পড়তে পারতে আর তা না পেরে বইখানা চোখের আরও নিকটে এনে বা পিছনে ঠেলে যখন পড়তে হচ্ছে।

(৯) ছুঁচের কার্য্য করতে বা পড়তে যখন নে হচ্ছে—আরো বেশী আলো পেলে ভাল হয়।

(১০) যখনি চোখ মাঝে মাঝে কারণে অকারণে লাল হয়ে উঠে মাঝে মাঝে টন্ টন করে—জ্বালা করে—ফুলে উঠে চোখের পাতা নাচে বা চোখের ভোমা গুলো কাঁপে আর কেবল অন্ধকারই ভাল লাগে।

স্ত্রীলোক বা পুরুষের উপরিউক্ত দশ দশায় যে কোন ত্রয়োদশা এসে যদি উপস্থিত হয় তাহলে জানবে—তার চশমা নেওয়ার অবিলম্বে আবশ্যক হয়েছে। অকারণে চশমা পরা যেমন চক্ষের পক্ষে অনিষ্টকর কারণ উপস্থিত হলে চশমা না ব্যবহার করা চোখের পক্ষে তেমনি বিপজ্জনক। জেনে রেখো—এক জোড়া চক্ষুর পরিপূর্ণ জ্যোতির চেয়ে এক জোড়া চশমার দাম অনেক কম, সমস্ত ঐশ্বর্য্য দিয়েও সেই বিলয়মান্ জ্যোতিকে ফিরে পাবার চেষ্টা করা উচিত।

চক্ষুর স্বাস্থ্য।

(১) চক্ষুর সুস্থতা দেহের স্বাস্থ্যের উপর পুরো পুরি নির্ভর করে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি পুষ্টিকর আহার খেলে নিয়মিত পরিশ্রম বিশ্রাম ও নিদ্রা দিলে সংযত ভাবে ইন্দ্রিয় চালনা করলে এবং বহিষ্করণ যন্ত্র গুলিকে কর্ম্মক্ষম (বিষ্ঠা মূত্র প্রভৃতি পরিষ্কার) রাখলে তাঁর চক্ষু ভাল না থেকে যায় না। চোখের কিছু দোষ উপস্থিত হলে বুঝতে হবে—সঙ্গে সঙ্গে দেহ রাজ্যেও কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটেছে। সুতরাং চোখকে ভাল রাখতে হলে দেহকে ভাল রাখতে হবে দেহকে অটুট দীর্ঘস্থায়ী ও নীরোগ রাখতে গেলে চক্ষুরও রীতিমত যত্ন নিতে হবে। দেহকে শুধু বসিয়ে খেতে দিলে বা বিশ্রাম না দিয়ে ক্রমাম্বয়ে খাটালে যে যেমন দু দিনে ভেঙে পড়ে চক্ষু সম্বন্ধেও সেই সত্য প্রযুজ্য। তাকেও নিয়ম মত বিশ্রাম দান করান কাজ করান বিশ্রাম করান ও অসুস্থ হলে চিকিৎসা করান উচিত।

(২) একটা এনামেলের গভীর চওড়া মুখ (গামলার মত) পাত্রের মধ্যে সহনযোগ্য ঠাণ্ডা জল পুরে তার মধ্যে রোজ একবার করে কপাল ও চক্ষুদ্বয় (নাক বন্ধ দিয়ে) বিশ বার চোখ খোলা বন্ধ করিয়ে বেশ জোর করে বুজবে ও খুলবে—এর নাম হল চক্ষু স্নান। চক্ষের কোন সাধারণ দুর্ব্বলতা ও সামান্য উপসর্গ দেখা দিলে এক গ্লাস জলে ১২।১৪ ফোঁটা বোরিক লবন মিশিয়ে তদ্দ্বারা চক্ষু স্নান করাবে।

(৩) চক্ষুকে ঠাণ্ডা রাখতে গেলে খাদ্যের সঙ্গে একটু আধটু জলপাই তৈল পরিষ্কার বাদাম তৈল বা গব্যঘৃতের মাখন খাওয়া ভাল। নারিকেল বাদাম বা তিল তৈল প্রত্যহ মাথায় মাখা কপালে ও চক্ষুর চারিপার্শ্বে মালিশ করা চক্ষুর পক্ষে হিতকর। এতে চক্ষুর জ্যোতি অব্যাহত রাখে। চক্ষের ও মস্তিষ্কের শ্রান্তি দূর করে।

(৪) নাছোড়বান্দা চক্ষের পীড়া প্রায়ই কোষ্ঠ বদ্ধতা ও হজম শক্তির চিরস্থায়ী অভাব বশতঃ উদ্ভূত হয়। ঐ সকল ক্ষেত্রে অন্ত্রধৌতি (Colon flushing) করালে বিশেষ উপকার দর্শে।

সিফিলিস গণোরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক জনিত পীড়ার জন্য প্রায় ক্ষেত্রেই চক্ষু পাতার দানা বাঁধা চক্ষুর প্রথম ও দ্বিতীয় আস্তরণের বা চক্ষু মণির প্রদাহ চক্ষুর মধ্যে স্ফোটক অক্ষি নাড়ী ও পেশী সমূহের অবশতা অক্ষমতা প্রভৃতি) নানারূপ দুঃসাধ্য যন্ত্রণাদায়ক নেত্র ব্যাধির সৃষ্টি হয়। ঐ সকল ক্ষেত্রে ভাল চিকিৎসক দ্বারা চক্ষু চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে কারণ ঘটক মূল পীড়ার

অন্ত্রধৌতি সম্বন্ধে বিস্তারিত সচিত্র পুস্তিকা স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘে পাওয়া যায়। মূল্য ⁄ ৫০ আনা মাত্র পয়সা ৫ টিকিট পাঠালে ডাকে পাঠান হয়।

হয় নাই হইয়াছে মাত্র একটা ক্ষণিক উত্তেজনার চঞ্চল আক্ষেপ ত্যাগ বা উৎসর্গ যাহা হইয়াছে তাহার মধ্য দিয়া অহমিকার এমন একটা তীব্র বিস্ফুলিঙ্গ ঠিকরাইয়া পড়িতেছে—যাহার বিষাক্ত জ্বালায় পুণ্য ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ত্যাগ সত্যই যদি কিছু হইয়াছে, তাহার জন্য দর্বি কি আছে? এ ত্যাগ তো নিজের জন্যই নিজেদের বাঁচিবার জন্যই। আমার জাতি সমাজকে বাঁচাইবার জন্য আমার যে কর্ত্তব্য তাহা সামান্য মনুষ্য ধর্ম্ম মাত্র সত্য করিয়া বিচরণ করিলে উহার বিশেষ মহিমা কোথায়?

বাঙ্গালী জাতি দেহ মনে এমন ক্ষত দুষ্ট যে তাহার দ্বারা কোন সমুচ্চ কার্য্যের সম্ভাবনা আদৌ নাই। এখানে আড়ম্বর চলে ভাল উত্তেজনার মদিরায় উন্মত্ত হইয়া দেশ সেবার নামে একটা বেশ বড় রকম বাহাদুরীর আয়োজনও চলে বেশ। চলে না—সেই কাজ যাহা নীরবে লোক চক্ষুর অন্তরালে বিনা দুন্দুভি নিনাদে করিতে হয় যাহাতে বক্ষরক্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া ক্ষয় করিতে হয় অথচ তাহার জন্য বাহবা দিবার জন প্রাণী মাত্র থাকে না —সেই কাজ বাংলায় ভাল চলে না— যাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হয় অনুনিষ্ঠ সাধক হইতে হয় যাহার জন্য সংযম ও কঠোর পৌরুষের আশ্রয় লইতে হয়।

বাংলায় সত্য কাজ হয় না তাহার কারণ বাঙ্গালার যুবকগণ পথভ্রান্ত হইয়াছে। যে যুবকের প্রাণে সত্যের অগ্নিহোত্র অনির্ব্বাণ জ্বলিতেছে অগাধ নিষ্ঠায় যাহার চিত্ত প্রাণ ভরপুর তেমনি যুবকের আত্মোৎসর্গে দেশের কাজ হইবে। উত্তেজনা কিছু নাই—পুরস্কার কিছু নাই বরং শুধু নিরাশাকেই সম্বল করিয়া—বেদনাকে পাথেয় করিয়া চলিতে হইবে কাজ তবে হইবে।

যুবক বাঙ্গালা যেন উদ্‌ভ্রান্ত। লক্ষ্য নাই নিষ্ঠা নাই, ধূপের মত একবার জ্বলিয়া উঠে—তখনি আবার শীতল অসাড়। এমন করিয়া কি কাজ হয়—কখনও হইতে পারে? যত তুচ্ছ কাজই হউক স্থির লক্ষ্য ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা না রহিলে উহা হইতে পারে না। বাঙ্গালী যুবক একটা একটা সাময়িক ঘটনায় যে সেবা শক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহা অনন্যসাধারণ—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তথাচ বাঙ্গালী যুবকের কর্ম্ম শক্তি সার্থক যোগ্য নহে। ঐ সব সেবার মধ্যে বেশ একটা ক্ষণ ক্ষয়িষ্ণু উত্তেজক উন্মাদনা আছে কিন্তু এমন কাজ রহিয়াছে যাহাতে উত্তেজনার লেশ মাত্র নাই অথচ তাহার সার্থকতা সমধিক।

খুটাইয়া কাজের কথা বলিলে আবার সাতকাণ্ড রামায়ণ গাহিতে হয়। তাহার কোন প্রয়োজন নাই একটা কাজের কথাই আলোচিত হউক। পল্লী সবার প্রয়োজন উহা একটা বিরাট সত্রানুষ্ঠানের মত বিস্তৃত ও ব্যাপক। কিন্তু উহার এমন কয়েকটা অপরিহার্য্য অঙ্গ আছে যাহা করিতে হইলে চাই—কেবল প্রাণের ঐকান্তিকতা অপরিমেয় উদ্যম একটা অচ্যুত শুভ বুদ্ধি আর যৌবনের সর্ব্ব বিজয়ী বীর্য্যস্পর্শ।

বলিয়াছি বাঙ্গালায় যৌবন নাই—যুবক নাই। যৌবন থাকিলে দেশ এমন হতশ্রী হইত না যৌবন যে সত্য শিব সুন্দরের জ্যোতি প্রীতির প্রস্রবণ। যৌবন থাকিলে পল্লীগুলি সেই যৌবন স্পর্শে অনুপম শোভা ধারণ করিত জাতি যৌবনের সেবা শুশ্রূষায় নব বলে বলিষ্ঠ হওয়া উচিত

পল্লীর শ্রমজীবি মূর্খ অজ্ঞান অন্ধ কে তাহার সহিত ডাকিয়া কথা কয়? কে তাহাকে দুটা ভাল কথা বলে? কে তাহাকে বলিয়া দেয় এই মঙ্গল পন্থা—এ পথে চলিলে তোমার ভাল হইবে বিপদ কাটিয়া যাবে। গ্রাম জঙ্গলাকীর্ণ ইহার কারণ কি একমাত্র অর্থাভাব? মিথ্যা কথা যুবক নাই বলিয়া দেশ অরণ্য হইতেছে। আলো জ্বলিলে যেমন তাহার চারিপাশের অন্ধকার সরিয়া যায় তেমনি আনন্দ ভাস্বর যৌবন দেবতার অধিষ্ঠানে কোন কদর্য্যতাই রহিতে পারে না। তাহাই নহে কি? ইউরোপ তাহার যৌবন লইয়া যেখানে পদার্পন করিয়াছে সেই স্থানটাই অনুপম শোভায় ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। যৌবনের কাছে বাধা কিছু নাই অসম্ভব কিছু নাই।

বাঙ্গলার শতকরা তিরানব্বই জন অশিক্ষিত। এমন কেহ নাই যে তাহাদের লইয়া দুদণ্ড দুইটী জ্ঞানের কথা বলে কিছুক্ষণ সদালাপ করে ব্যথায় সহানুভূতি প্রকাশ করে। এ কাজও কি কেহ করিতে পারে না? এই অতি সামান্য কাজ যাহাতে অর্থ সঙ্গতির কোন আবশ্যকতা—কোন বিশেষ শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন নাই। কেবল একটু মমতা বুদ্ধি কেবল একটু অতিথ্য একত্ববোধ কেবল নিজের জাতির একটা বিরাট কার্য্যকরী অঙ্গ বলিয়া একটু স্বগৌরব অনুভব থাকিত তবে নিঃসংশয়ে এই সব উদ্ধার কাজ অনুষ্ঠিত হইতে পারিত। কি করিয়া বিশ্বাস করিব—যুবক বাঙ্গলার অস্তিত্ব আছে?

আজ নব বর্ষের প্রারম্ভে জাতির অন্তর দেবতা সেই সব যুবককে চাহিতেছেন যাহারা রৌদ্রস্নাত রৌদ্র সনিভ তেজ প্রবুদ্ধ রুদ্র দেবতার উপাসক। যাহারা প্রোজ্জ্বল সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া খরতৃষ্ণিত মরিচীকা অতিক্রম করিতে চলিয়াছে অটল অক্লান্ত পাদক্ষেপে যাহারা তুঙ্গ অদ্রির শীর্ষদেশকে উল্লঙ্ঘন করিবার প্রয়াসী। এ যৌবন জল তরঙ্গের জোয়ার আর কি দেশে জাগিবে না?

আজ আমরা বহির্মুখী বঙ্গীয় যুবকের কাছে এই নিবেদন করিতেছি যে আসুক ফিরিয়া তাহারা আমাদের ঘরের তুলসীতলা প্রভৃতি পালিত গৃহের শান্তি সুধা-সিক্ত আঙ্গিনায় জাতি এখন হাটের হট্টগোল চাহে না চাহে আগে ঘর গৃহস্থালীর ছোট ছোট কাজ গুছাইয়া লইতে যাহাতে বাঙ্গালী আবার সেই পরিপূর্ণ তৃপ্তি প্রচুর স্বচ্ছন্দতা ফিরিয়া পাইবে। সেদিন ফিরিয়া আসিবে তাহার দুঃখী প্রাণে শুধু পাখীর মত আবার আনন্দের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিবে।

সমাজের অনাচার অত্যাচার অভিযোগ বিপদ আপদ ভাগাভাগি করিয়া লইয়া সকলের মধ্যে শুচিময় সত্যবানের সনাতন শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া এস ভাই নব জাগ্রত দেশ সেবা মন্ত্রে দীক্ষিত কর্ম্ম পাগল বাঙ্গলার সবুজ প্রাণের দল দেখা করিয়া লাভ কি? —

যাত্রা অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নিক ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা—সিন্ধু নীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু

(১) মানুষের হৃদপিণ্ড প্রতিদিন গড়ে ৯২১৬ বার স্পন্দন করে। সাধারণ অবস্থায় ইহা বৎসরে তিন কোটিবার স্পন্দিত হইয়া থাকে।

(২) ৫ বৎসর পরমায়ু বিশিষ্ট প্রত্যেক মানুষ সারা জীবনে আপন দেহভারের অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী ওজনের আহার্য্য ও পানীয় উদরসাৎ করিয়া থাকে।

(৩) মানুষ গীত গাহিবার সময় তাহাকে ৪৪টি মাংশপেশী ব্যবহার করিতে হয়।

(৪) পুরুষের মস্তিষ্ক গড়ে ১৮ ছটাক এবং স্ত্রীলোকের ১।/ ছটাক। গড়ে প্রতি পুরুষের মস্তকে সওয়া সের এবং প্রতি স্ত্রীলোকের মস্তকে দেড় সের মগজ থাকে।

(৫) দ্বাবিংশতী বৎসর বয়সে মানুষের সমুদয় অস্থি শক্ত হয় ও জোড়া লাগে। তৎপূর্ব্বে ইন্দ্রিয়-সেবার অমিতাচার একেবারে উচিৎ নহে।

(৬) পুরুষের মস্তিষ্কের ওজন ৪ বৎসর পরে এবং স্ত্রীলোকের মস্তিষ্কের ওজন ৩ বৎসর পরে কমিতে থাকে।

(৭) মনুষ্য প্রতি মিনিটে ১ —১৮ বার নিশ্বাস গ্রহণ করে। প্রতি শ্বাস গ্রহণের সময় মানুষ এক পাইণ্ট (Pint) বায়ু দেহ মধ্যে টানিয়া লইয়া থাকে।

(৮) মনুষ্য শরীরে প্রায় এক কোটি নাড়ীতন্তু (Nerves) এবং মুখমণ্ডলে চৌদ্দখানি অস্থি আছে। একটি মধ্যমাকার মনুষ্য শরীরে প্রায় সত্তর লক্ষ লোমকূপ থাকে।

(৯) রক্তনাড়ী তিনমাস সময়ের পর মাতৃদেহে সংযুক্ত হইয়া থাকে।

(১০) প্রত্যেক দশ হাজার লোকের মধ্যে গড়ে একজন লোকের একশত বৎসর পরমায়ু নির্ণীত হইয়াছে।

মোটামুটি ধরতে গেলে একটা বয়স্ক হাতীর ওজন প্রায় পঁচাত্তর মন হবে।

*

নিরামিষ ভোজীরা বলেন মাংসাশীদের চেয়ে তাঁদের মাথায় বেশী ঘনসন্নিবদ্ধ চুল হয় এবং ঐ চুল অধিককাল স্থায়ী হয়। টাক পড়া ব্যায়রাম অধিক মাংসাশীদের মধ্যে প্রায় দেখা যায়।

চীন ভাষায় ৩ ... বর্ণমালা আছে ... উহা লইয়া ছয় রকম লেখভঙ্গি (Style) প্রচলিত আছে।

প্যারিসের ডাক্তাররা কয়েক ... সব পূর্বে বিস্তৃত ও বিধিবদ্ধভাবে পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ করে ... দেখেছেন যে মাতালের সন্তানেরা কখনও ... সুস্থ ... হতে পারে না।

একজন সাধারণ মানুষ ... দিনকাল বাতাসের অভাবে মারা যায় জলের অভাবে এক সপ্তাহের মাথায় মৃত্যু বরণ করে নিদ্রার ... দশ দিনের ভিতর ইহলীলা সাঙ্গ করে।

... মধ্যে ... সময় ... অনেকে ... দক্ষি... দিকে ... জগতের ... দিবে।

... আকারের ... তারা নদীর ... গিয়ে ... যায়।

... পাড়ে তার ... হবে। ... প্রথম ডিমটি ...

*

... বিশারদ ... বলেছেন ... আছে।

*

জগতে ... হাজার রকমের পোকা আছে। ... কতকগুলি পোকা এত ... আর বক্তি ... সন্দেহ।

শিশু মঙ্গলে

শিশুরে যে কোলে করে থামায় ক্রন্দন
জাগায় দেবতা বুকে পুলক স্পন্দন।
অনাথ শিশুরে যেই গৃহতলে আনে
স্বর্গ তারে হাসি মুখে নিজ পানে টানে।
যে জননী বাছনীরে আনেন ধরায়,
চৈতন্য শঙ্করে নিত্য সত্য সে জীয়ায়।

রক্ষা-কবচ।

কবিরাজ শ্রীভবতারণ বিদ্যারত্ন]

ডালিমের ফুল তিন চারিটি কাঁচা দুগ্ধে বাটিয়া অল্প মধুর সহিত ৩।৪ দিন ২বার পান করিলে রক্ত প্রদর রোগে বিশেষ উপকার হয়।

[illegible] এক তোলা কাঁচা দুগ্ধের সহিত বাটিয়া মধু মিশাইয়া প্রত্যহ একবার বা ২বার পান করিলে শ্বেত প্রদরে বিশেষ উপকার হয়।

[illegible] রোগে।—ফোটক একত্রিত পর একটি উৎপন্ন হয় কোনটি অনেক থাকে কোনটি বা পাকিয়া যায়। ফোটকগুলি পাকিয়া গলিয়া গেলে তাহাতে সজিনা গাছের মূলের ছাল ও দেবদারু কাষ্ঠ উহার কুচি বা চূর্ণ [illegible] সহিত বাটিয়া নিত্য দিন প্রলেপ দিলে ঘা সত্বর ভাল হয়।

মৃগী রোগে।—[illegible] কৃষ্ণতিল [illegible] আধতোলা রসুন বাটা [illegible] উভয়মাপে মিশ্রিত করিয়া কিছু জল খাওয়ার পর প্রাতে প্রতিদিন ৭।৮টার সময় খাইলে রোগ আরোগ্য হয়। কিম্বা ব্রাহ্মীর রস অর্দ্ধ ছটাক ও কাঁচা দুধ আধ ছটাক মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন প্রাতে ১—২ দিন খাইলে মৃগীরোগ নষ্ট হয়। পুরাতন হইলে উক্ত যে কোন প্রকার ঔষধ ২ মাস পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য।

প্রথম বুচকা খুলিলে তাহাতে বটের আঠা কিম্বা [illegible] শামুক পরিষ্কার পাথরের থলিয়া বা কম্বলের উপর ঘর্ষণ করিতে করিতে গরম হইলে ঐ তাপ দুই বেলা ২।৩ বার করিয়া লাগাইলে বসিয়া যায়। কোন স্থানে আব উঠিতে থাকিলে ঐ ভাবে শামুকের স্বেদ (foment) ২ বেলা করিয়া লাগাইলে উপকার পাওয়া যায়। এইরূপ ৪।৫ দিন করিলেও যদি না সারে তাহা হইলে অন্য ব্যবস্থা করিবে।

রবিবারে শ্বেত জয়ন্তীর মূল এক আনা আধ কিম্বা এক পোয়া দুগ্ধসহ বাটিয়া ২১ দিন খাইলে ধবল নষ্ট হয়। ইহা বিশ্বনাথের স্বপ্নপ্রাপ্ত ঔষধ বলিয়া খ্যাত। পুরাতন ধবল হইলে আরো কিছু দিন খাইবে।

সুপারী পাতার রসের সহিত গন্ধক ঘষিয়া মাখিলে সেই স্থানের কেশসকল উঠিয়া যায়।

জন্মিয়া যদি কোন শিশু মাই না টানে, তাহা হলে সামান্য একটু [illegible] আমলকী ও হরিতকী মিহিভাবে গুড়াইয়া ২।৩ ফোঁটা মধুর সহিত মাড়িয়া শিশুর জিহ্বায় ১ মিনিট কাল ধরিয়া দুই চারিবার ঘষিয়া দিবে।

মাষকলায়ের আধ ছটাক ডাল প্রথমত ঘৃতে ভাজিয়া পরে আধ সের দুগ্ধে আধঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিয়া চিনি বা মিশ্রীর সহিত দুই সপ্তাহ কাল ভক্ষণ করিলে কিম্বা টাটকা কই মাছের পেটি অথবা পুঁটি মাছ ঘৃতে ভাজিয়া দুই সপ্তাহ কাল খাইলে শুক্র গাঢ় হয় ও সহবাস শক্তি বর্দ্ধিত হয়।

কাঁচা পেঁপের দুগ্ধ লাগাইলে অথবা উহার সহিত অনন্তমূল ঘষিয়া একত্র লাগাইলে জিহ্বা ও মুখের ঘা আরোগ্য হয়।

পানের রস অথবা পিঁয়াজের রস মাথায় মাখিয়া আধঘণ্টা পর দধি ও চিনি দিয়া মাথা ঘষিয়া ধুইয়া ফেলিলে মাথায় খুস্কি নিবারিত হয় ও উকুন সকল মরিয়া যায়।

সাদা কুমড়ার বীজ বা শসার বীজ কিম্বা আমলকী বাটিয়া নাভির নীচে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ নিবারণ হয়। যবক্ষার চূর্ণ ২ দুই আনা হইতে ছয় আনা ও চিনি অর্দ্ধ তোলা হইতে এক তোলা প্রতিদিন প্রাতে শীতল জল সহ খাইলেও বিশেষ উপকার হয়। ৪।৫ দিন খাইতে হয়।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম"

১৪শ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩২ সাল { ২য় সংখ্যা

হিন্দু লোকাচার ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান

[ডাক্তার শ্রীবামণশচন্দ্র বায় এম্‌ এম্‌ এ]

আমাদেব দৃঢবিশ্বাস আছে যে হিন্দদিগেবর আচাব ব্যবহাব স্বাস্থ্যবিজ্ঞানানুমোদিত। তবে হিন্দুর অমুক করিলে অমুক হয় অতএব অমুক কর এই ভাবে কথাগুলি না বলিয়া ধর্ম্মেব দোহাই দিয়া শাস্ত্রের বড গম্ভীরস্বরে অনুজ্ঞা রূপে সেগুলিকে বলিয়া গিয়াছেন। সেরূপ বলিবার দুইটি কাবণ থাকিতে পারে প্রথম কারণ হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণতা—সকল কথাই ধর্ম্মের সঙ্গ জড়িত করিয়া দিলে হিন্দুর হৃদয়ে তাহা সহজে ও স্থায়ীরূপে স্থান পাইবে। দ্বিতীয় কারণ সমাজেব মূঢ়াবস্থা। নিতান্ত শিশুকে আলমারিব জিনিষগুলি ঘাটিলে আমার নানারূপ অসুবিধা হইবে অতএব আলমারি ঘাঁটিও না এ কথা বলা অপেক্ষা আলমারির জিনিষ ঘাটিলে তুমি শাস্তি পাইবে—এইরূপ অনুশাসন বলিলে ইহা অধিকতর কার্য্যকরী হয়। যখন সমাজে অধিকাংশ লোকেই মূঢ় থাকে, তখন এই ভাবেই বলা যায়। বো হ এ কারণ সাধ কথায় ধর্মেব দোহাই দিয়া দব াব ই সয়। াহারা বিদ কাব সংগোপন করিয়া কেবল শ্পন আজ্ঞাকপে হিন্দশাস্ত্রকাবরা বলিয়েন।

কিন্ত না বুঝিয়া বা া বিা ব ব ন া া দাড়ায় অজ আমাদিের ঠিব সেই অবস্থা দাডাইয়াছে শাস্ত্রকাবব প্রত্যেক জিনিষেব হেতু বলিয়া না যা য়া। আমাদেব কেহ কেহ অন্ধবিশ্বাসেব বশবর্তী হইয়া শাস্ত্রেব মর্য্যাদাকে দূরে রাখিয়া তাহাব বিধিব অক্ষরে অক্ষরে (কখনও বা উহারও বেশী) অনুসবণ কবিয়া থাকি। কেহ কেহ বা হিন্দুশাস্ত্রকে অজ্ঞতার পরিচায়ক কুসংস্কার ও ব্রাহ্মণদিগের চাতুরী জ্ঞানে সদর্পে উড়াইয়া দিই। উভয় স্থলেই যে অন্যায় করি, সেই কথাটা এই প্রবন্ধে কতকটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

হইয়া নানারূপ কঠিন পীড়া আনে এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও সংশয়াপন্ন করে। এই জন্যই ক্ষতস্থানটিকে প্রলেপসিক্ত করিয়া পরিষ্কার কাপড়ের খণ্ডদ্বারা বাঁধিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে। যখন রমণী প্রসব করেন তখন তাঁহার জরায়ুর ভিতর গাত্রে ৮।১ ইঞ্চি পরিধিযুক্ত একটি ক্ষতস্থান সৃষ্ট হয়। গর্ভাবস্থায় ঐ স্থানটিতে ফুল সংলগ্ন থাকে প্রসবান্তে ফুল পড়িয়া গেলে জরায়ু গাত্রে সেই স্থানে প্রকাণ্ড ক্ষত সৃষ্ট হয়। রমণীর দেহে যে যে পরিচ্ছদ স ।।হয় তিনি যে বস্ত্র তুলা জল ব্যবহার করেন এবং তিনি যে ভূমিতে বা শয্যাতে বসেন এবং তাঁহার গৃহে যে বায়ু সঞ্চালিত হয় ইহাদের সকলগুলি হইতে ঐ জরায়ুজ ক্ষত দুষ্ট হইয়া পড়িতে পারে। এ কথা কে না জানেন? কিন্তু কেন শিক্ষিত ব্যক্তি এই সকল জানিয়া শুনিয়াও নিজ পুরাঙ্গনাদের লোকাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেছেন?

যে কোনও হিন্দুগৃহে যান দেখিবেন প্রসবের জন্য বাটীর মধ্যে নিকৃষ্ট ঘরটিই নির্দ্দিষ্ট হয়। সে ঘরটি হয় অতীব অন্ধকারময় আর্দ্র বায়ুসঞ্চারহীন গো-গৃহ বা পায়খানার নিকটবর্ত্তী। প্রসূতির ব্যবহারের জন্য যে শয্যাদ্রব্য দেওয়া হয়—তাহা ত্যক্ত মাদুর ত্যক্ত কম্বল ছিন্ন কন্থা মলিন উপাধান মাত্র। প্রসূতির পান ভোজনের জন্য মৃৎপাত্র দেওয়া হয়—অধিকাংশ স্থলে একই পাত্র উপর্য্যুপরি প্রত্যহই ব্যবহৃত হয়। প্রসূতির পরিচারিকা একজন হাড়ী ডোম বা তজ্জাতীয়া। সর্ব্বাপেক্ষা সুবন্দোবস্ত—সর্ব্বাপেক্ষা বড়ত্বময় আচার—যে ব্যক্তি প্রসূতির গৃহে যাইবে সে ময়লা কাপড়ে যাইবে কিন্তু বাহিরে আসিয়া সে কাপড় ত্যাগ করিবে। পাঠক এতদপেক্ষা উৎকট বুদ্ধিহীনতার কথা দৃষ্টান্ত আর দেখাইতে পারি কি?

চরক সংহিতায় প্রসবগৃহসম্বন্ধে এই লিখিত আছে—

প্রশস্ত রূপ রস গন্ধায়াং ভূমৌ উপলিপ্ত ভিত্তিং সুবিভক্ত পরিচ্ছদং প্রাক্‌দ্বারং দক্ষিণ দ্বারং বা অষ্টহস্তায়তং চতুর্হস্ত বিস্তৃতং বিধেয়ম সূতিকা গৃহটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। ঘরের ভিতরের পরিসর দৈর্ঘ্যে ৮ হাত প্রস্থে ৪ হাত (প্রায় ১২ ফীট × ৬½ ফীট) হইবে। দক্ষিণ অথবা পূর্ব্বদিকে দ্বার থাকিবে। ঘরের মেজে সমতল ও সুপরিষ্কৃত হইবে এবং সূতিকাগৃহ মৃণ্ময় হইলে ঘরের ভিতরের দেওয়ালের গাত্রসকল গোময় ও মৃত্তিকাদ্বারা লেপিত হওয়া আবশ্যক। ঘরের মধ্যে কোনওরূপ দুর্গন্ধাদি থাকিবে না ও ঘরখানি দেখিতে বেশ সুদৃশ্য হইবে এবং যে স্থানে সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইবে সে স্থানে যেন জলসিক্ত বা অন্য কোনও কারণে অপ্রশস্ত না হয়। আমার টিপ্পনী করা অনাবশ্যক। কি পাশ্চাত্য কি প্রতীচ্য—সকল শাস্ত্রের অনুজ্ঞা কি শুনুন আর বাঙ্গালীর বাড়ী বাড়ী কি ব্যবস্থা হয় তাহা নিজ নিজ বক্ষে হাত দিয়া স্মরণ করুন আর একবার পাধভক্ষণ ও পেঁচোয় পাওয়ার কথা মনে করুন। যে দেশে সাক্ষাৎ যমরাজ্যের চতুঃসীমার মধ্যে ও যমরাজ্যানুমোদিত অবস্থার মধ্যে প্রসূতি গৃহ রচিত হয় সে দেশে প্রসূত হওয়াটা জীবনমরণ ব্যাপার বলিয়া যে গণ্য হইবে এবং (হয় ত বা) চিরজন্মের মত সাধভক্ষণ করানর ব্যবস্থা থাকিবে তাহার আর বিচিত্রতা কি? আমরা যাহাকে চিকিৎসার ভাষায় টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কার বলি সেই ব্যাধিই এতদিন পেঁচোয় পাওয়া নামে উপদেবতা কীর্ত্তি বোধে গুরু পুরোহিত কর্ত্তৃক চর্চ্চিত হইতেছিল। যখন ব্রাহ্মণগণ সমাজের নেতা ছিলেন তখন তাঁহারা নির্লোভ ও শাস্ত্র চর্চ্চানুরত ছিলেন এখন তাঁহাদের প্রকৃতশাস্ত্র জ্ঞান রসাতলে গিয়াছে, তাঁহাদের বুদ্ধিও লোপ পাইয়াছে পেটের ক্ষুধাও পূর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণতরভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে—আজ তাই কয়েকটি মূর্খ ব্রাহ্মণসন্তান উপকথা উপদেবতা উপ আচার, উপ ব্যবহারের উপসর্গে সমাজকে পীড়ন করিয়া উপজীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন।

ফলকথা, যদি আমরা হিন্দুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চাই, তবে ঐ ভাবে প্রসবগৃহ করিলে চলিবে না। বাটীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহটিই প্রসবগৃহ হওয়া চাই—যে

গৃহ শুষ্ক—যে গৃহ জীর্ণ ভগ্ন নহে, যে গৃহে ময়লা নাই—দুর্গন্ধ নাই, যে গৃহ প্রশস্ত—বায়ুসঞ্চরণপূর্ণ যে গৃহ পায়খানা—গোয়াল—নর্দ্দমা হইতে বহুদূরে সেই গৃহেই প্রসব করান চাই। প্রসূতির ব্যবহারের জন্য শয্যা শয্যাস্তরণ উপাধান, সমস্তই অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। প্রসবকার্য্য পালঙ্কের উপরে হইলে ভাল হয়—এ কথা চরক ঋষিও আদেশ করেন। প্রসূতির ব্যবহার্য্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদি সর্ব্বাঙ্গরূপে পরিষ্কার হওয়া চাই। নীচজাতীয়া মলিনভাবদুষ্টা হাড়ী ধাই না রাখিয়া বাড়ীর অপর মেয়েদেরই মধ্যে প্রসূতির সেবার কার্য্য বণ্টন করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়। যে কেহ প্রসবগৃহে প্রবেশ করিবেন তিনি যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া—পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া তবে প্রসবগৃহে যাইবেন বাহিরে আসিয়া তিনি পুনরায় বস্ত্রত্যাগ বা স্নান করিতে পারেন—তাহাতে কিছু আসে যায় না। মোট কথা এই—বাহিরের কোনও ময়লা কাপড় চোপড় দূষিত বায়ু ময়লা হাত ময়লা জল—সকলগুলি হইতেই রোগবীজ প্রসূতির জরায়ুস্থ ক্ষতকে দুষ্ট বা প্রতিরোধ শক্তিহীন ক্ষীণপ্রাণ নব বংশধরকে সংক্রামিত করিয়া উভয়ের প্রাণসংশয় করিয়া তুলিতে পারে।

(৩) পানভোজন।

আহারসম্বন্ধে কথা বলা বড়ই শক্ত যেহেতু আজ আমরা ঠিক কতটুকু হিন্দুয়ানী তাহাতে বজায় রাখিয়াছি তাহা বলা বড় শক্ত। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান ভোজনটা ⅓ হিন্দু ⅓ মোগলাই, ⅓ ইংরাজী। সে যাহাই হউক, খাঁটি হিন্দুয়ানীর সন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে বাঙ্গালীর খাইবার পারম্পরিক পদ্ধতি এই —প্রথমে গণ্ডূষ, পরে শুক্ত (তিক্ত) পরে ঘৃত পরে ডালনা, ডাইল্ ও নানারূপ ব্যঞ্জন, শেষে অম্ল ও সর্ব্বশেষ দুধ দধি ও মিষ্টান্ন। খাঁটি হিন্দু ভোজনের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে মাংসের স্থান নাই। কিন্তু ভাতের সঙ্গে ঘৃতের ও অপর ডাইলের মধ্যে মুগ ডাইলেরই আদর বেশী। এতদ্ব্যতীত প্রকৃত হিন্দু স্বপাক-ভোজন করেন স্বপাকে কখনও অসুবিধা হইলে মাতা বা স্ত্রীর হস্তে রন্ধন ব্যতীত আহার করেন না। হিন্দুরা ভোজনক্রিয়াটাকে ধর্ম্মের একটা অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন হিন্দুরা ভোজনের স্থানাস্থান বিচার করিয়া তবে ভোজনে বসেন। এগুলির মধ্যে কতটা বিজ্ঞান বা যুক্তি আছে, তাহা দেখা আলোচনা করিয়া যাউক।

প্রথমত —আহারটাকে ধর্ম্মের আনুষঙ্গিক মনে করা। ধর্ম্মভাবের সঙ্গে মনের পবিত্রতা ও সংযমের নিত্য সম্বন্ধ এই জন্য আহার করিতে বসিয়া গুরু ভোজনের সম্ভাবনা কম। যাঁহারা আহার করিতে করিতে গল্প করেন তাহারা ঠিক যে ভাল করিয়া চর্ব্বণ করেন বা সকল সময়ে আহারের স্বাদ গ্রহণ করেন এমন মনে হয় না। আহারে বসিয়া গল্প করিলে অনেক সময়ে ভোজনের মাত্রাও বেশী হইয়া পড়িতে পারে এবং অমনোযোগিতাবশত অখাদ্য কিছু দৈবাৎ উদরসাৎ হইতে পারে ও বিষম লাগিয়া বিপদ হইতে পারে। এই জন্য দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া ধর্ম্মভাবে সংযত হইয়া পরিষ্কৃত স্থানে একান্তে আহার করার এত আদর। যে হিন্দুরা আহারকে এত পবিত্র মনে করেন তাঁহাদের মধ্যে উচ্ছিষ্টভোজনব্যাপারটা কি বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয় না? ইহার উত্তরে সেই উল্টা বুঝিলি কথাটিই বলিতে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে প্রসাদভক্ষণের ব্যবস্থা আছে কিন্তু কোথাও উচ্ছিষ্টভোজনের ব্যবস্থা নাই। বাঙ্গালার লোকাচারে—কথায় প্রসাদ আছে কার্য্যে উচ্ছিষ্ট ভোজনই প্রচলিত রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা কখনও উচ্ছিষ্ট ভোজনের অনুমোদন করেন নাই তাঁহারা প্রসাদেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রসাদ বলিলে উচ্ছিষ্টান্ন বুঝায় না প্রসাদ বলিলে সেই খাবারকে বুঝায়—যাহা কোনও গুরুলোক প্রসন্নচিত্তে অবলোকন করিয়া আশীর্ব্বাদপূত করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রের ব্যবস্থা কোথায় আর আজ লোকাচারের প্রভাব কোথায়! ইহাকেই বলে— কোথাকার জল কোথায় মরে।

দ্বিতীয়ত —শারীরিক পরিপোষণে আহারের সম্পূর্ণতা। এ কথাটি একটু বিশদ করিয়া না বুঝাইলে

সাধারণের বোধগম্য হইবে না। আহারটা রসনার উপভোগ্য বা দেহের ক্ষণিক বিলাসের সামগ্রী নহে। নিত্য শারীরিক ক্ষয় পরিপূরণ করা শারীরিক দৈনিক কর্ম্ম যথাসম্ভব সর্ব্বাংশেই সম্পূর্ণ করা এবং তাহার গঠন বা পরিপোষণ। সহায়তা করাই খাদ্যের মূল লক্ষ্য। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ঐ সকল কাম করিতে হইলে ছয় জাতীয় খাদ্য দ্রব্য খাওয়া উচিত। সেগুলি যথা —(২) ছানা বা মাংসজাতীয় খাদ্য ইহাদের দ্বারা শরীরের ক্ষয়পূরণ ও সৌষ্ঠবলাভ ঘটিয়া থাকে। মাংস ডিম্ব ডাল মৎস্য ছানা পনির—এই জাতীয় খাদ্য। (২) স্নেহময় পদার্থ—যথা তৈল ঘৃত মাখন চর্ব্বি ইহাদের দ্বারা শারীরিক উত্তাপ রক্ষা ও পেশীসঞ্চালন কার্য্য সমাধা হয়। (৩) শালি বা শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য—যথা চাউল আটা ময়দা সুজি খৈ মুড়ি মুড়কী শাকসব্জী সাগু বার্লি প্রভৃতি ইহাদের দ্বারাও শারীরিক উত্তাপ রক্ষা পেশী সঞ্চালন কার্য্য হইয়া থাকে। (৪) লবণ (৫) জল ও (৬) দেহ ক্ষয়নিবারক সূক্ষ্ম রস। এই শেষোক্ত জিনিষটিকে ইংরাজীতে (Vitamin) ভাইটামীন কহে। খাদ্যে ইহার অভাব হইলে বেরীবেরী স্কার্ভি প্রভৃতি ব্যারাম জন্মে। টাটকা ফলের রস টাটকা মাংসে চাউলের গাত্রস্থ লাল বক্তাবরণে ইহা থাকে। এই জন্য হিন্দুদিগের মধ্যে ফলের আদর এত বেশী এবং বোধ হয় এই জন্য নিত্য অন্নভোজনও হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত। এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার ডাইলের মধ্যে মুগের ডাইলে এই ভাইটামীন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আছে। অতএব কাঁচা মুগের ডাইল ভিজাইয়া খাওয়া এবং অপরাপর ডাইলের অপেক্ষা মুগের ডাইলই খাওয়া যে অত্যন্তরূপে বিজ্ঞানসম্মত তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। হিন্দুরা অত্যন্ত মেধাবী জাতি এবং মস্তিষ্কের চর্চ্চা তাহাদিগের মধ্যে অতিশয় প্রবল। এই কারণেই ঘৃতভোজনটা হিন্দুরা কিছু বেশী বুঝেন। লর্ড ব্রাণ্টন ঘৃতকেই সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবৃদ্ধিকর খাদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শীতপ্রধান পাশ্চাত্যদেশের খাদ্যমধ্যে মাংসের প্রাধান্য থাকিলেও, গ্রীষ্মপ্রধান বাঙ্গালা দেশের পক্ষে শ্বেতসারবহুল অন্নই যে উত্তম পথ্য তাহা বৈজ্ঞানিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। আর্য্যগণ যে মাংস খাইতেন না বা হিন্দুরাও যে মাংস খাইতেন না এমন কথা বলি না। বৌদ্ধযুগের তথা বৌদ্ধরাজার (অশোকের) সার্ব্বভৌমত্ব এ দেশে মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময় বিজ্ঞানের মতে ছাগমাংসই সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিবির্জ্জিত মাংস। ছাগমাংসভোজনে যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক রোগ জন্মে না।

হিন্দুদিগের মধ্যে চায়ের প্রচলন ছিল না বটে কিন্তু গুড় মধু ও চিনির অত্যন্ত আদর ছিল। কেহ পরিশ্রান্ত হইলে এখনও পল্লীগ্রামে গুড় ও জল দেওয়া যায়। সুরাসেবী য়ুরোপ এককালে সুরার ও মাংসসারের (Meat extract) শতমুখে প্রশংসা করিতেন। সৈনিকগণের জন্য সাময়িক অবসাদের জন্য বিশ্রামের পরে সুরাসার ও মাংসসারের ব্যবস্থা ছিল এখন তৎপরিবর্ত্তে শর্করা খণ্ড ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। চিনির রূপ শ্রমহারী গুণের কথা হিন্দুরা বহুপূর্ব্বে জানিতেন। চিনির সম্বন্ধে আর একটি গুণ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এত দিন পরে শিখিতেছেন। সেটি মধুরেণ সমাপয়েৎ। হিন্দুদের এই আদেশ সম্পূর্ণ বিজ্ঞানানুমোদিত। আহারের প্রথমে তিক্ত রস ও শেষে মিষ্টরসের ব্যবস্থা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত। আহারের পূর্ব্বে সুপ (soup) বা শুক্তভোজনে পরিপাক ক্রিয়া আরও বেশী হয়। শূন্যোদরে চিনি খাইলে পাকস্থলীর ভীষণ উত্তেজনা হয় এই জন্য হিন্দুরা চিরকালই ভোজনের শেষে মিষ্টান্নভোজন করেন। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ পুনরায় উল্টা বুঝিয়াছে। আমাদের দেশে বহুক্ষণ উপবাসী থাকার পরে এক গ্লাস সরবৎ খাওয়ার ব্যবস্থা কে করিল? আমার বিশ্বাস—ইহা আর্য্য প্রথা নহে ইহা মোগলাই প্রথা। শূন্যোদরে এক গ্লাস সরবৎ খাইলেই তৎক্ষণাৎ ক্ষুধা নষ্ট হয় তৎপরবর্ত্তী আহার সহজে পরিপাক হয় না পেট ভার হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগের শৌচব্যবস্থা প্রভৃতি বর্ণনাকালে

দেখাইলাম যে উহার মূলে স্বাস্থ্যানুযায়ী সকল ব্যবস্থাই আছে। আরও দু চারিটি কথাদ্বারা ঐ কথা ও অন্যান্য নিত্যকৃত্যগুলিকে অধিকতর পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব। অনেকেরই ধারণা আছে যে বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য সকল প্রথাই বিজ্ঞানসম্মত আর পুরাতন হিন্দু প্রথাগুলি যুক্তিবাদহীন কুসংস্কারের একটি জ্বলন্ত মূর্ত্তি মাত্র।

প্রথমে শয্যাত্যাগের কথা ধরা যাউক। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করাই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত। ঐ সময়ে প্রকৃতির নৈসর্গিক মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিলে কাহার হৃদয় আনন্দে মগ্ন হয় না? ঐ সময়ে উঠিয়া উদ্যান ভ্রমণ পুষ্পচয়ন ও স্নানাদি করা যে পরম স্বাস্থ্যপ্রদ বিধি তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। রাত্রি জাগরণ করিয়া বেশী বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়া পাশ্চাত্য সমাজানুমোদিত বা বিলাসিতার উত্তরসাধক বিধি হইতে পারে—কিন্তু কোনও মতে স্বাস্থ্যকর নহে।

শয্যাত্যাগের পর স্নান করা ও পূজা বন্দনাদি করা হিন্দুর কর্ত্তব্য। রাত্রের আলস্য ত্যাগের ও তাহাকে কর্ম্মঠ করিবার পক্ষে প্রাতঃস্নানের মত অনুকূল বিধি খুব কমই আছে। যাহারা জামাজোড়া বহুটার আঁটিয়া ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া চা পান করেন বা সকালে সামান্য একটু বেড়ান ও দুপুরে গরম জলে স্নান করেন শীতকালে শীত তাঁহাদিগকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে এবং তাঁহারাই সহজে সর্দ্দি কাসির দ্বারা আক্রান্ত হয়েন। কিন্তু রীতিমত তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া সর্ব্বঋতুতে প্রাতঃস্নান করিলে শরীর ও মন বড়ই সুস্থ পবিত্র থাকে।

স্নানের সময় আমরা তৈল ব্যবহার করি বলিয়া য়ুরোপীয়েরা আমাদিগকে greasy বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহাদিগের চিকিৎসাশাস্ত্রে কিছু দৃষ্টি আছে তাঁহারাই জানেন যে তৈলাভ্যঙ্গকালীন রীতিমত ব্যায়াম (exercise) করার ফল পাওয়া যায়—যে হেতু সমস্ত পেশীই সঞ্চালিত বা দলিত বা উত্তেজিত হয় এবং রক্তসঞ্চলনক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, ঘর্ম্ম নির্গত হয়। এইরূপে শরীরের ক্লেদ বিদূরিত হয়। দ্বিতীয়ত, যাঁহারা রীতিমত তৈল ব্যবহার করেন তাঁহাদের ত্বক্ অত্যন্ত মসৃণ থাকে ঘামাচি চুলকানি ফোড়া ক্ষত তাঁহাদিগের প্রায়ই হয় না। পাশ্চাত্যদিগের অনুকরণে তৈলত্যাগ করিয়া রীতিমত সাবান ব্যবহার করিলে চর্ম্ম উগ্র হয় এবং নানারূপ রোগের আকর হইয়া উঠে। তৈলব্যবহারের ফলে শীতকালে শীতবোধটা খুব কমই হয় এবং গ্রীষ্মকালে অতীব ঘর্ম্মস্রাব হইলেও অকস্মাৎ chill লাগিবার ভয় কমিয়া যায়। যে সময়ে খুব ঘর্ম্ম হইতে থাকে সে সময়ে সেই ঘর্ম্ম যদি বাষ্পাকারে ত্বক্ হইতে দ্রুত উপিয়া যাইতে থাকে তবে দেহ শীতল হইয়া নানারূপ আকস্মিক পীড়া জন্মাইতে পারে। কিন্তু তৈলাক্তদেহে যদি ঘর্ম্ম হইলেই চর্ম্মস্থ ঘর্ম্ম অল্প তৈলবিন্দুর সহিত মিশিয়া ধীরে ধীরে উপিয়া যাওয়ায় sudden chill অর্থাৎ আকস্মিক ঠাণ্ডা লাগার ভয় দূর হইয়া যায়। হাম বসন্ত আরক্ত জ্বর প্রভৃতি ব্যাধিগুলির সারিবার সময় দেহ হইতে মৃত চর্ম্মত্বক্ খসিতে থাকে। ঐ মৃত ত্বকে ঐ সকল ব্যাধির সংক্রমণ সমর্থ বীজ থাকে। যে দেশে তৈলের ব্যবহার আছে সে দেশে ঐ ব্যাধির সংক্রামতা অল্প। যে কোন কারণে হউক তাহা অন্যত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে না। আমাদের দেশে সংক্রামক ব্যাধি হইতে আরোগ্য হইলে না হইলেই রোগীকে নিম হলুদ মাখান যে প্রথাটি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানানুমোদিত। আজ পাশ্চাত্য দেশেও ঐ সকল ব্যাধির প্রচার নিবারণোদ্দেশে ঐ সময়ে ভ্যাসেলীন বা জলপাইয়ের তৈল ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। নিম ও হরিদ্রা ষোল আনা রূপে antiseptic বা রোগবীজাণুহারী না হইতে পারে কিন্তু উহাদের মধ্যে যে ঐ ধর্ম্ম যথেষ্টই আছে তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্নানের পরেই আহ্নিকের ব্যবস্থা। আহ্নিক করিতে হইলে কখনও নগ্নগাত্রে বা শুধু মেঝের উপরে যেমন তেমন করিয়া বসিতে নাই। পট্টবস্ত্র বা রেশমের বস্ত্র পরিধান করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া

আহ্নিকে বসিতে হয়। এই সকল বিধির মূলে আধ্যাত্মিকতা ত আছেই তদ্ভিন্ন স্নানের পরে দেহকে নব রবি কিরণে উষ্ণ করিয়া লওয়ার অনুকূল সকল বিধই আছে। আসন পট্টবস্ত্র—এতদুভয়ই তাপ অপরিচালক। সন্ধ্যা করিবার সময়ে প্রাণায়াম করিতে হয়—প্রাণায়ামও দীর্ঘায়ু প্রদ। সন্ধ্যা বন্দনার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিবার স্পর্দ্ধা রাখি না—আধ্যাত্মিক ভাব বিচারও করিব না। কিন্তু সকল কাজের পূর্ব্বে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে শ্রীভগবানের চরণোদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম করিলে হৃদয় ও মন যে বড়ই পবিত্রতা অনুভব করে—সমস্ত দেহ মন প্রাণ যে একটা অব্যক্ত পুলকস্পন্দনে অনুপ্রাণিত হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? যদি একটা প্রাণ ভরিয়া হাসিলে দশ দিন পরমায়ু বৃদ্ধি হয় তবে ঐ এক এক ভক্তি গদগদ পুলক স্পন্দনে পরমায়ু দশ বর্ষ বৃদ্ধি হয়।

তৎপরে ভোজন। প্রকৃত হিন্দু স্বপাক ভোজন করিবেন দিনে একবার অন্ন খাইবেন। সংযমশিক্ষা দেওয়া হিন্দুয়ানীর পদে পদে উদ্দেশ্য। এই জন্যই হিন্দু খাদ্যসম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়াছেন যে আহারে বসিয়া কথা কহিবার অনুমতি থাকিলে অমিতাহারের সম্ভাবনা। এখনকার দিনে নূতন ব্রহ্মচারী (?) এক বৎসর আহারে বসিয়া কথা কহেন না বটে কিন্তু ইসারায় সকল রকম ঈপ্সিত ভোজ্যই চাহিয়া লয়েন। কিন্তু প্রকৃত হিন্দু তাহা করেন না। তিনি আহার্য্যগুলি নারায়ণকে নিবেদন করিয়া সন্তুষ্ট মনে পূতচিত্তে নারায়ণের প্রসাদ গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি প্রকৃতই "আমি শ্রীভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করিতেছি এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আহারে বসেন তিনি ভোজন করিয়া যতটা আত্মতৃপ্তি—যতটা চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন, তাহা কি বর্ত্তমানকালীন উচ্ছৃঙ্খল-লোভী ভোজন বিলাসী ভুরি চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় গ্রহণ করিয়াও বোধ করেন? ভোজন করিতে বসিয়া সংযতভাবে খাইলে এবং আহারান্তে শারিরীক ও মানসিক প্রসাদ বর্ত্তমান থাকিলে পরিপাকক্রিয়া বেশী হয় না—কতকগুলা হাঁস, মেষের অস্থি মাংস "কুঁচকি কণ্ঠায়" খাইয়া অবসন্ন দেহ ও লোভ জনিত অতৃপ্তি লইয়া উঠিলে সহজে পরিপাক হয়? তাহার পরে গোঁড়া হিন্দুরা স্বপাক খান, পরিষ্কৃত স্থানে বসিয়া খন ও কাহারও স্পৃষ্ট ভোজন করেন না—এইরূপ করার প্রধান গুণ এই যে, এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে কোনও রোগ সংক্রামিত হইতে পারনা। এই জন্যই বোধ হয়, আমাদের দেশে টাইফয়েড জ্বর খুব কমই হইত। একই হুকায় তামাকসেবন হোটেলে একই গ্লাসে পান কর নাম মাত্র ধৌত করিয়া একই বাটিতে চা খওয়া প্রভৃতি দোষের ফলে ডিফথিরিয়া যক্ষ্মা টাইফয়েড প্রভৃতি ব্যাধি ব্যাপ্ত হইতে পারে। স্পৃশ্য ভোজন ব্যাপারটা ঐ ব্যাপ্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

নিজ ভোজ্য নিজে সংগ্রহ করিয়া নিজে রাঁধিলে আরও দুইটা সুফল পাওয়া যায়। প্রথমত নিজে প্রত্যহ হাত পুড়াইয়া খাইতে হইলে রকমারি করিয়া বিলাসিতার আশ্রয় লওয়া চলে না এবং নিজের মনের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে রন্ধন করিয়া ভোজন করিলে অনেক ব্যাধির হাত এড়ান যায়। কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে পাচকঠাকুর ও ঠাকুরাণীদের প্রভাব বড় বেশী। উঁহাদের মধ্যে কত জন যে সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ ঔরসজাত এবং কতগুলাই যে উপপতি বা উপপত্নীরত তাহা জানা গৃহস্থ আবশ্যকীয় মনে করেন না। অথচ এই সকল পাচকদিগের মধ্যে দক্র, উপদংশ (পারার ঘা) ও মেহ (গণোরিয়া) যে কত বেশী পরিমাণে দেখা যায় তাহা চিকিৎসকমাত্রই অবগত আছেন। ইহারা যে কাপড় পরে, তাহার গন্ধ রূপ ও রস গৃহস্থবাঞ্ছিত না হউক, পরীক্ষায় লাঞ্ছিত হইবে—নিঃসন্দেহ। যাঁহারা ময়রাদিগকে বা এই সকল পাচকদিগকে তাঁহাদিগের অলক্ষ্যে দৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে ইহারা যেমন নোংরা তেমনই কাণ্ডজ্ঞানহীন। আর স্বপাকাহারী শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণসন্তানদিগের বংশধর হইয়া আজ আমরা বিলাসিতার তাড়নায়, তথাকথিত ব্রাহ্মণের নামে অজাতকুল, বেজাতি, বেলেল্লাপ্রতিপালিত, নানা

সাহেবদিগের আহারের সময় —

প্রাতে ৬।৭টায় ছোট হাজরী (লঘু)।

প্রাতে ৯।১০টায়— ব্রেকফাষ্ট (লঘু)।

দুপুরে ২টায়— লাঞ্চ (গুরু)।

[কোন মতে লাঞ্চ বা ব্রেকফাষ্ট গুরু ও লাঞ্চ লঘু হওয়ার প্রচলন আছে।

বৈকালে ৪টায় —চা রুটি (লঘু)।

রাত্রি ৮টায়— ডিনার (গুরু)।

রাত্রি ১১টায়—সাপার (লঘু)।

[কেহ কেহ সাপারের ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়াছেন

হিন্দুদিগের পূর্ব্বে যাহা ছিল —

প্রাতে ৭।৮টায়—জলযোগ (লঘু)।

মধ্যাহ্নে ১২।১টায়—ভোজন (গুরু)।

সায়াহ্নে ৪।৫টায়—জলযোগ (লঘু)।

রাত্রে ৯।১০টায়— ভোজন (গুরু)

[অনেক পরিবারে মাত্র একবার জলযোগেরই ব্যবস্থা ছিল।]

হিন্দুদিগের এখন যাহা হইয়াছে —

প্রাতে ৯॥ টায়—অন্নাহার (গুরু)।

বেলা ১টায়—জলযোগ (লঘু)।

সন্ধ্যায় ৬।৭টায়—জলযোগ (লঘু)।

রাত্রি ১০টায়—অন্নাহার (গুরু)

[কোন কোন পরিবারে প্রাতে জলযোগেরও বন্দোবস্ত আছে]

উপরে গুরু ও লঘু এই দুইটি বাক্য যাহা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আহার্য্যের পরিমাণজ্ঞাপক রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে—পরিপাকের তারতম্যানুসারে ব্যবহৃত হয় নাই। এইভাবে বেশ মনোযোগের সহিত উপর্য্যুক্ত তালিকাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে সাহেবরা যে রকম সময়ে আহার করেন সেই ঠিক বিধি এবং হিন্দুরা স্বেচ্ছায় যে রকম সময়ে যেরূপ আহার করিতেন তাহাও সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যানুকুল বিধি কিন্তু ইংরাজ রাজত্বে কর্ম্মজীবি হিন্দুর আহারের কালাকাল বিচার করিবার অবসর নাই। প্রাতে সম্পূর্ণ ক্ষুধার উদ্রেক হইতে না হইতেই অর্দ্ধসিদ্ধ অত্যুষ্ণ ও মাত্র দুই একটি ব্যঞ্জনের সাহায্যেই হিন্দুকে আহার সমাপ্ত করিয়া দাসত্বের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়*। অফিসে যখন তাহার ক্ষুধার সম্যক্ উদ্রেক হয়—তখন নির্দ্দিষ্ট টিফিনের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে ক্লান্ত অবস্থায় আসিয়া ভোজন করিতে গেলেই ভোজনের মাত্রা বেশী হয় এবং পরিপাক কম হয়। যে কয়টি কারণে অজীর্ণতা আইসে বর্ত্তমানকালে হিন্দুর ভাগ্যে সে সকলগুলিই আসিয়াছে। অনিয়মিত আহার করা পূর্ব্বাহারের ক্ষুধার উদ্রেক হইবার পূর্ব্বে আহার করা আহার করিয়া অত্যধিক পরিশ্রম পূর্ব্বভোজনের পর একাদিক্রমে মস্তিষ্ক চালনা করা পুনঃ ক্ষুধার উদ্রেক হইলে আহারের অসম্ভাবনা থাকায় এবং ক্লান্ত দেহে পথশ্রমের পরে আহার করা—এ সকলগুলিই বাঙ্গালীর নিত্য অভ্যাস হইয়া জাতিগত ডিসপেপসিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

এ সব ছাড়াও হিন্দুর ভোজন রীতি পুরা বিজ্ঞানানুমোদিত। সাহেবেরা ও মুসলমানেরা শয্যায় বসিয়া খাইতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। কিন্তু হিন্দুরা মনে করিয়া থাকেন যে দ্বিতীয় পাত্র পর্য্যন্ত সক্‌ড়ি হইয়া থাকে অর্থাৎ একখানা থালা যেখানে বসান যায় সেস্থানও সক্‌ড়ী হয়ই—কিন্তু যদি এক থালা ভাত বড় একটা বারকোষের উপরে বসাইয়া সেই বারকোষটিকে মাটিতে বসান যায় তবে সে মাটি এঁটো হয় না। অবশ্য টেবিলে বসিয়া ভোজন করিলে জল ছিটাইয়া সে জায়গাটিকে পরিষ্কার করার (ধোয়াইয়া লওয়ার) প্রয়োজন হয় না কিন্তু সাহেবেরা বসে ভোজন করিতে বসিলে স্থানাস্থান বিচার করেন না। কিন্তু হিন্দুরা যেথা সেথা বসুন সে জায়গাটাকে পরিষ্কার

* শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যে আয়ুষ্ক্রমমানস্তু মৃত্যুর্ধাবতি ধাবত—আহারান্তে সামান্য বেড়াইলে আয়ুবৃদ্ধি পায় এবং আহার করিয়া দীর্ঘপথ দৌড়িতে আরম্ভ করিলে মৃত্যু ও তাহার পাছে পাছে দৌড়িতে থাকে অর্থাৎ তাহাকে নানারূপ ক্লেশকর সাংঘাতিক ব্যাধি আসিয়া আক্রমণ করে। আমাদের সহরে কেরাণীকুলের দশা ঠিক এইরূপ হয় নাই কি?—সম্পাদক স্বা, স।

করেন এবং "সক্‌ড়ী 'সকড়ী করিয়া উদ্ব্যস্ত" করিয়া তুলেন। এটা কি গোড়ামী না মূর্খতা? এটা তুমের কিছুই নহে।

যাঁহারা জীবাণুতত্ত্ব বা ব্যাক্‌টেরিওলজী জানেন তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে আহার্য্য সামগ্রীর কণা মাত্র পাইলেই ব্যাধি জীবাণুগণ অসম্ভবরূপে বংশবৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে এবং আহার্য্য জিনিষের অবাধ যোগে নানারূপ সংক্রামক ব্যাধি ব্যাপ্তিলাভ করে। এই জন্য প্রকৃত হিন্দুরা যাহার তাহার স্পৃষ্ট ভোজ্য গ্রহণ করে না যথা তথা পংক্তি ভোজনে আপত্তি করেন এবং সকড়ী সকড়ী বলিয়া অস্থির হইয়া পড়েন। যে সকল ভোজ্য সদ্য ধুইয়া আহার করা চলে (যেমন ফল) হিন্দু সে সকল ভোজ্য যেখানে সেখানে গ্রহণ করিয়া থাকেন। লুচি ও সন্দেশের চলনটা বর্ত্তমান যুগের কিন্তু ভাতটা বহু কালের চলন। ভাত ধুইয়া আহার করা চলে না বলিয়া হিন্দু যেখানে সেখানে অন্নগ্রহণ করেন না।

হিন্দুরা বলেন দুগ্ধে লবণ দিয়া পান করিলে গো মাংস ভক্ষণ করার তুল্য হয়। অনেকের অভ্যাস আছে—দুধে ভাত মাখিয়া খাইতে খাইতে মাছ বা তরকারী টাক্‌না দিয়া খায়। এ রকম করিলে দুধে লবণ দিয়া পান করারই তুল্য হয়। একত্র দুধ ও মাংস ভক্ষণের নিষেধের হেতুও এই। অনেকে এ সকল কথাগুলি গোড়ামী ও বোকামীর দৃষ্টান্ত বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু আজ পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন যে লবণসংযোগে দুধের পরিপাক ক্রিয়া ভাল হইতে পারে না। অতএব এখন আমরা নিশ্চয়ই বুঝিলাম যে হিন্দুরা লবণসংযোগে দুধের ব্যবহার নিষেধ করিয়া করিয়া যুক্তিসঙ্গত কার্য্য করিয়াছিলেন।

হিন্দুরা মৃতদেহের সৎকার করিয়া থাকে।—অপরাপর জাতিরা প্রোথিত করেন। সৎকার করাই সর্ব্বাপেক্ষা শাস্ত্রানুমোদিত বিধি। অগ্নিসংযোগে মৃতদেহস্থ যাবৎ রোগবীজ ও জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় প্রোথিত করিলে তাহার ফলে অনেকটা জমী ও তদূর্দ্ধস্থ বায়ু দূষিত হইয়া থাকে। তবে প্রত্যেক কুল ও সদ্যোজাত শিশু মরিলে এতদুভয়কে পুতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা উক্ত অস্বাস্থ্যকর নহে যেহেতু এতদুভয়ের সংক্রামক রোগদুষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম।

বর্ত্তমান সময়ে ইউজেনিক্‌স বলিয়া একটি বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই—স্বাস্থ্যবান ও পরিণত বয়সে সন্তানাদি হইলে তাহারা বেশ স্বাস্থ্য ও মেধা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই কথার আলোচনা অপর একদিন করিবার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু হিন্দুরা যে এ বিষয়ে খুব মনোযোগী ছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে যে ধারণা আছে যে অষ্টম গর্ভের সন্তান হইলেই কৃতি হয় বোধ হয় সেই ধারণা ঐ ইউজেনিক্‌সেরই সাক্ষ্য দিতেছে।

এই প্রবন্ধে মোটামুটি চারিটি বিষয় লইয়া আমি ইঙ্গিত করা হিসাবে কথা বলিয়াছি। তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেক একটি বিষয়ে অনেক কথা বলা চলে। যেমন বর্ত্তমানকালে অন্ততঃ কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে Brain food বলিয়া একটা মস্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকট হইয়াছে তাহার কারণ বিজ্ঞাপিত বিলাতী ঔষধের বিজ্ঞাপন। এ সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা করিলে বড় প্রবন্ধ হইয়া পড়ে—অথচ সাবধান হিন্দুরা বহু বর্ষ পূর্ব্বে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন যে ঘৃতই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট Brain food। এই জন্যই সাত্ত্বিক চিন্তাশীল মনীষীরা ঘৃতভোজনই করিতেন মাংসের জন্য লালায়িত হইতেন না।

কেমন করিয়া পাইব? স্নেহ—সেবার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হয়। রোগের সময় কপাল টিপিয়া দেওয়া মুখে আদর করাই কেবল সেবা নয়,—খাওয়ান একটী শ্রেষ্ঠ সেবা। ভোজনের মধ্য দিয়া আমরা জীবন লাভ করি। যাহার দ্বারা জীবন সুস্থ সঞ্জীবিত হয় তাহা কি পরম সেবা নহে? তাহা কি হীন কার্য্য? হিন্দুর নারী জাতি এই জন্যই সাগ্রহে—ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া নারীর একটী গুণ বিভূতি বলিয়া—জগদ্ধাত্রীর মত রন্ধনশালে গিয়া আমাদের অমৃত যোগাইতেন।

রন্ধন—পাচক বর্ণ—সামা—শুচিতা এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিবার রহিয়াছে। ধীরে ধীরে তাহা পাঠক বর্গের গোচর করিব। আজিকার শেষ কথা—রন্ধন আবার শুচিতা ও সঙ্কীর্ণতা ফিরিয়া আসিলে জাতির জীবনী শক্তিও আর একটু ফিরিয়া আসিবে।

বসন্তের কোষ্ঠী

[শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু]

ষড় ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতুই সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও শীর্ষস্থানীয় রূপে পরিগণিত। কিন্তু ঋতুরাজ—মনুষ্য গো মীন প্রভৃতির পক্ষে যমরাজ স্বরূপ। বস্তুত বসন্তকালে প্রতিবৎসর কত শত জীব যে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলীলা পরিত্যাগ করে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই মারাত্মক ব্যাধির বসন্তকালে অধিকতর প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় বসন্তরোগ কহে। স্থান ও জাতি ভেদে বসন্তরোগ বহু নামে প্রখ্যাত। যথা—বোম্বাই প্রদেশে পিচিনো মান্দ্রাজ বিভাগে—পেয়া, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে—চেচক পাঞ্জাবে—অন্দরতা মাতা বারানসীতে—ভবানী মূলতানে—বাবা এলাহাবাদে—দেবী সাওতাল পরগণায়—জগদম্বা ছোট নাগপুরে—গোটী উড়িষ্যায়—ঠাকুরাণী আসামে—পীড়ক কুচবিহারে—শীতলা চট্টগ্রামে—বড় পীড়া ইত্যাদি

একটি কিম্বদন্তী আছে যে বসন্তরোগ প্রথমে উষ্ট্র হইতে মনুষ্য শরীরে পরিচালিত হইয়াছিল। কিন্তু এই রোগ সর্ব্বাগ্রে কোথায় কি প্রকারে প্রকাশিত হয় তাহার কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অদ্যাপি কেহ করিতে পারেন নাই। অনেকেই বলেন যে, ভারতবর্ষ এই পীড়ার উৎপত্তি স্থান এবং ভারতভূমি হইতেই ইহা অন্য দেশে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে পুরাকালে বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহারাজ নহুষের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং যজ্ঞ শীতল কালীন কুণ্ড হইতে আবির্ভূতা হইয়া শীতলা নাম ধারণ পূর্ব্বক প্রথমে মৎস্যাধিপতি বিরাট রাজ সমীপে উপস্থিত হন। তৎপরে বৃন্দাবন মথুরা বারাণসী গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান পর্য্যটন করেন। ইহা পৌরাণিক সূত্রে গণিত হইলেও জানিতে পারা যায় যে খ্রীষ্টাব্দের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে বসন্তরোগ ভারতবাসীর উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত পুরাকালে শীতলাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা ও অর্চ্চনাদি বহু সমারোহের সহিত সম্পাদিত হইত এবং যাহারা অর্চ্চকগণ ইনঅকিউলেশন্ বা নূতনধর্য্যাধান দ্বারা মানবজাতিকে স্বাভাবিক বসন্ত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন তাহারও বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়।

চীনদেশে বসন্তরোগ অন্যান তিন হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে সুপরিচিত। আরবদেশে মহম্মদের জন্ম বৎসরে অর্থাৎ ৫৬৯ খ রাজপ্রতিনিধি এব্র ও তাঁহার

অধীনস্থ একদল য়্যাবিসিনিয়ান সৈন্য মক্কা নগর আক্রমণ করিতে গিয়া তাঁহারা সহসা এই পীড়ার আক্রান্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া অবশেষে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। আফ্রিকা সম্বন্ধে অনেকে অনুমান করেন যে কাফ্রিগণ যখন অতি সহজে এই রোগাক্রান্ত হয় তখন আফ্রিকা দেশ বোধ হয় ই রোগের আকর স্থান। অবশ্য ইহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা বলা যায় না। তবে অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতবর্ষের সহিত আফ্রিকার যথেষ্ট সম্বন্ধ থাকায় এই রোগ ভারতভূমি হইতে উক্ত স্থানে যাইতে পারে। ইংলণ্ডে ক্রুসেড বা ধর্ম্মযুদ্ধের অবসানে এবং আমেরিকার চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই রোগ দেখা দিয়াছিল।

বসন্তরোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য এতাবৎকাল বহু উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে ও হইতেছে কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে ফলাফল সম্বন্ধে এখনও এতাদৃশ দুষ্ট হইয়া থাকে। ইন্ অকিউলেসস্ বা নৃ মসূর্য্যাধান অর্থাৎ বসন্ত বীজ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া মৃদু বসন্তোৎপাদন দ্বারা ভবিষ্যতে রোগের মারাত্মকতা নিবারণ প্রথা ভারতবর্ষ চীন, মিসর তাতার আবিসিনিয়া প্রভৃতি দেশে বহুকালাবধি প্রচলিত ছিল তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বিত হইত। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে শীতলাদেবীর পূজারিগণ নিয়মিত সময়ে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পরিভ্রমণপূর্ব্বক টীকাগ্রহণাভিলাষী নরনারীকে একমাস কাল দুগ্ধ নবনী মাংস ইত্যাদি ভোজনে বিরত করিয়া একখানি পবিত্র রক্তবস্ত্র দ্বারা ভূজদ্বয় উত্তমরূপে মার্জ্জন ও করপৃষ্ঠস্থ অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে ঈষৎ ক্ষত উৎপাদন পূর্ব্বক তদুপরি বসন্তের পূয ও গঙ্গাজল মিশ্রিত কার্পাস বন্ধনে এবং মন্ত্রাদি পাঠে নৃ মসূর্য্যাধান কার্য্য সমাধা করিতেন। অত পর লোকে [illegible]রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শরীরস্থ বিষ ঈষৎ লইয়া নিজের শরীরের রক্তের সহিত মিশাইয়া দিত। এই প্রথাকে লোকে বাঙ্গালা টীকা দেওয়া বলিত।

আরব দেশে কেবল হস্তের উপরিউক্ত স্থানে আবিসিনিয়ায় উরুদ্বয়ে এবং জাঞ্জিবারে বাহুর উপরিভাগে টীকা দিত। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কেবল আরব দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক আবুবীর মহম্মদ রাজিস ব্যতীত এসিয়ার অপর কেহ ভালরূপ চিকিৎসা জানিতেন না। তিনি রোগ প্রশমন জন্য রক্ত মোক্ষন করিতেন এবং পীড়ার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক ঔষধাদি দিতেন এবং রোগীকে সবল রাখিবার নিমিত্ত নানাবিধ তরল পথ্যাদির ব্যবস্থাও করিতেন। চীনদেশে পূযের পরিবর্ত্তে গুটিকার শুষ্ক কন্দ নাসাপরি স্থাপন করিত। স্কটল্যাণ্ডের হাইল্যাণ্ডের শিশুদিগকে বসন্তরোগীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখিত অথবা শিশুদিগের হস্তে বসন্তের পূয মিশ্রিত পশমী সূতা জড়াইয়া দিত। ওয়েলস দেশে বসন্তের শুষ্ক কন্দ ক্রয় করিয়া হস্ত বা পদের কোমল স্থানোপরি ঘর্ষণ করিত। ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রথিতনামা চিকিৎসক সিডেনহামের বদ্ধিমত্তার বসন্তরোগীর চিকিৎসা প্রণালী ক্রমশ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তৎপূর্ব্বে সংসারত্যাগী পূতাত্মাগণের রোগ নিরাময় করা ক্ষমতা এবং সংসারত্যাগিনী ধর্ম্মপরায়ণা মহিলাদিগের মন্ত্রপূত কবচ এতদুভয়ের প্রতি সাধারণের অকপট ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। বসন্ত [illegible] বিক্রয় প্রথা সর্ব্বাগ্রে ভারতেই আরম্ভ হয় কিন্তু জানিতে পারা যায় যে এই নিয়ম কেবল ভারতবর্ষেই নিবদ্ধ ছিল না উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের পশ্চিম ও দক্ষিণ বিভাগেও প্রচলিত ছিল।

ভ্যাক্সিনেসন বা গো মসূর্য্যাধানে অর্থাৎ গোবীজে টীকা দিয়া জীবকে স্বাভাবিক বসন্তরোগ হইতে রক্ষা করিবার নিয়মও এদেশে অশ্রুতপূর্ব্ব নহে। অতীত ভারতবর্ষে পারস্যদেশে এবং য়্যাণ্ডিস্ পর্ব্বত নিবাসী কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। ১৭৭৫ খৃ হইতে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার এডওয়ার্ড জেনার গো বসন্ত বিষয়ে গভীর গবেষণা ও পরীক্ষাকার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানার্জ্জন করিয়া ১৭৯৬ খৃঃ গো বসন্তের বীজ লইয়া মানব শরীরে টীকা দিবার প্রথা আবিষ্কার করেন। ১৭৯৮ খৃ ইহার তথ্য বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রণয়ন

করেন। ১৮ ২ খৃ জিনি ইংলণ্ডীয় পার্লিয়ামেণ্ট হইতে দেড়লক্ষ টাকা এবং ১৮ ৭ খৃ তিন লক্ষ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর গবর্ণমেণ্ট ক্রমে নৃ-মসূর্য্যাধানে নিবারণ ও গো মসূর্য্যাধানে প্রচলন জন্য প্রয়াস করেন। ১৮৫৩ খৃ গবর্মেণ্ট এ সম্বন্ধে একটি বিধি বদ্ধ করেন। কয়েক বৎসর হইতে গবর্ণমেণ্টের এই আইন ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই বিঘোষিত হওয়ায় ক্ষণ কেবল গো মসূর্যাধান ব্যতীত ন মসূর্যাধান দেখিতে পাওয়া যা না গো বীজের টীকাতে মৃত্যু সংখ্যা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে বাঙ্গালা টীকা অপেক্ষা এই ইংরাজী টীকা সর্ব্বতোভাবে উত্তম ও নিরাপদ। সেই জন্য আইন দ্বারা বাঙ্গালা টীকা এদেশে বন্ধ করা হয়। টীকা দিলে বসন্তের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা থাকে। টীকা দেওয়া সত্বেও যদি বসন্ত হয় (ইহাতেও দেখা যায়) তাহাতে প্রাণের আশঙ্কা প্রায় থাকে না। কিন্তু ইংরাজী টীকার তেজ মানব শরীরে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না সেজন্য মধ্যে মধ্যে টীকা লওয়া আবশ্যক।

জন্ম-রহস্য

(গত চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

গর্ভাধান।

পুরুষের জনন যন্ত্র সমস্ত হইতে শুক্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা মুষ্ক বা অণ্ডকোষ আশয়নালী মধ্য গ্রন্থি (Prostate gland) বীর্য্যাধার (Vesiculæ Seminalis) কাউপার গ্রন্থি এবং মূত্রনালী (Urethra) সন্নিহিত গ্রন্থিসমূহ নির্গত রসবিন্দুসমূহের সংমিশ্রণ সঞ্জাত।

শুক্র।

স্ত্রী সম্ভোগের ফল প্রতিবারে পুরুষের যতখানি রেত পাত বা শুক্র স্খলন হয় অবস্থা বিশেষে তাহার পরিমাণে তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। নির্গত শুক্র গাঢ় চটচটে বর্ণহীন কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে দুগ্ধশুভ্র জ্যোতি প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। গোটের উপর পুরুষদিগের শুক্র দেখিতে ভাতের ফেনের ন্যায়। শুক্রের গন্ধ অতি অদ্ভুত উহা কাহারো বাদামের ন্যায় কাহারো বা করাতের দ্বারা সন্তচ্ছিন্ন অস্থির গন্ধের ন্যায়। আশয় নালী মধ্য গ্রন্থি (Prostate) হইতে একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম বীজাণুপুঞ্জের শুক্র-মধ্যে অবস্থান হেতু উহার গন্ধ ঐরূপ অপরূপ হয়। শুক্রের গন্ধের কারণ সম্বন্ধে মত ভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন মুষ্ক হইতেই শুক্র ঐরূপ গন্ধযুক্ত হয়। শুক্রের (alkalinity) ক্ষারধর্ম্ম আশয়নালী মধ্য গ্রন্থি নিঃসৃত রসের সংস্রব ঘটিয়া থাকে বলিয়া অনেক অনুমান করিয়া থাকেন। বীর্য্যাধার নির্গত রসের সংমিলনে শুক্রের বর্ণের উৎপত্তি ঘটে এবং কাউপার গ্রন্থিসমূহ হইতে নির্গত রসের সংস্রবে উহা আঠার ন্যায় চটচটে হয়। শুক্র অনেকক্ষণ বাতাসে অনাবৃত অবস্থায় থাকিলে আরও তরল হইয়া যায় এবং উহার আঠার ন্যায় চটচটে ভাবও আর থাকে না।

অনুবীক্ষণ যন্ত্র (Microscope) সাহায্যে শুক্র পরীক্ষা করিলে তন্মধ্যে পুং বীজাণুপুঞ্জ এবং মূত্রনালী ও প্রষ্টেট হইতে নির্গত (granules cells and epithelia) নানাবিধ কণিকা কোষ এবং সূক্ষ্ম তন্তুসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক পুং বীজাণুর দেহের মস্তক মধ্যভাগ এবং পুচ্ছ এই তিনটি অংশ আছে। শুক্রের বীজাণুর দ্বারা উহার সন্তানোৎপাদিকা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বীর্য্যস্খলিত হইবামাত্র

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে পুংবীজাণু গুলি পুচ্ছ সঞ্চালন পূর্ব্বক তন্মধ্যে বিচরণ করিতেছে। যত্ন পূর্ব্বক বীর্য্য কোন পাত্রমধ্যে রাখিয়া দিলে ৪৮ ঘণ্টা পরেও এই বীজাণুগুলিকে জীবিত দেখিতে পাওয়া যায়। মূত্রের ও যোনিনালী নিঃসৃত অম্লরসের সংস্পর্শে বীজাণুসমূহ মরিয়া যায়। উহাদিগের দেহে ৪৭ ডিগ্রীর অধিক তাপ প্রয়োগ করিলে এবং ১৫ ডিগ্রীর ন্যূন শৈত্য প্রয়োগ করিলে ইহারা মরিয়া যায়। বৈজ্ঞানিক (Duhrssen) বলেন সাড়ে তিন সপ্তাহ পরে রমণীদিগের জননযন্ত্রসমূহের মধ্যে সজীব ও সচল বীজাণু সমূহ দেখিয়াছেন। জলের সংস্পর্শে এক ঘণ্টার মধ্যেই বীজাণুসমূহ একেবারে গতিশক্তিহীন হইয়া থাকে।

শুক্র জল অপেক্ষা ভারী এবং উহা জলে ও অম্লরস সমূহে (acids) অনায়াসেভাবে মিশিয়া যায় এবং সুরাসার (Alcohol) স্পর্শে ঘনীভূত হইয়া জমাট বাঁধে। রাসায়নিক ভাস্কয়েণীন শুক্র বিশ্লেষণ পূর্ব্বক উহার যে সকল উপাদান এবং ঐ সকল দ্রব্যের যে পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল —

জল	শতকরা	৯	ভাগ।
জৈব পদার্থ		৬	
মৃৎলিপ্ত ফস্ফট		৩	
সোডিয়াম ক্লোরাইড (লবণ)		১	

ইহা জানা কথা যে পুংবীজাণু ও স্ত্রী অণ্ডাণু মিলিত হইয়া গর্ভমধ্যে ভ্রূণের সঞ্চার হয়। কিন্তু পুরুষ স্ত্রী সহবাস করিলেই নারীর অণ্ডাণুর (ovam) সহিত

গর্ভাধান।

পুরুষের বীর্য্যগত বীজাণু মিলিয়া নারীর গর্ভ সঞ্চার হয় না। পুরুষ স্ত্রী সহবাস করিলে স্খলিত শুক্রের সহিত অসংখ্য বীজাণু নির্গত হয় বটে। কিন্তু নারীদিগের অণ্ডাণু অতি অল্প সংখ্যায় নির্গত হইয়া থাকে —তাহাও আবার ঋতুর কয়েক দিন পর্য্যন্ত সতেজ কার্য্যক্ষম থাকে। প্রতিমাসে রমণীগণের অণ্ডাণুকোষ হইতে দুই তিনটির অধিক অণ্ডাণু কখনও বাহির হয় না। বলা বাহুল্য, রতি সুখ সম্ভোগের সময় পুরুষদিগের শুক্রের সহিত বীজাণু নির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু রমণীদিগের অণ্ডাণু কামকেলির সময় বাহির হয় না। সুতরাং অবস্থার অনুকূল না হইলে গর্ভাধান সম্ভবপর নহে। মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার সহিত গর্ভাধানের কোনও সংস্রব নাই।

গর্ভাধানের স্থান।

পুরুষের বীর্য্য স্ত্রীসম্ভোগকালে স্খলিত হইয়া সবেগে নারীর যোনি নালীর (vaginal passage) * মধ্যে প্রবেশ করে। পুরুষেন্দ্রিয় একটু দীর্ঘ ও বীর্য্য খুব বেগে পড়িলে সম্ভবতঃ উহা গর্ভগ্রীবায় গিয়া (Cervix) লাগে। বীর্য্য মধ্যস্থ বীজাণু তথা হইতে গর্ভের ভিতর গিয়া স্ত্রী অণ্ডাণুর সহিত মিলিত হইলে গর্ভ উৎপাদন হইতে পারে কিন্তু কোথায় কি অবস্থায় নারীর অণ্ডাণুর সহিত পুরুষের বীজাণুর সম্মিলন ঘটে তাহা অদ্যাপি কেহ সম্পূর্ণ নির্ভুল বিশ্বাসযোগ্যভাবে নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বৈজ্ঞানিকদিগের অভিমত এই যে নারীদিগের কামোদ্দীপনের ফলে তাহাদিগের গর্ভমুখ বা জরায়ুমুখ প্রসারিত হইয়া পড়ে। পুরুষের শুক্র গ্রহণের জন্যই নাকি—স্থানীয় নাড়ীসমূহের (Nerve) উত্তেজনার ফলে ঐরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। সুতরাং কতকটা বীর্য্য পুংবীজাণু সমেত গর্ভ মধ্যে চলিয়া যায়। আবার কেহ কেহ বলেন বীর্য্য যোনি নালিতে গর্ভগ্রীবার সন্নিকটে পতিত হইলে কতকগুলি পুং বীজাণু পুচ্ছ সঞ্চালনের দ্বারা ব্যাঙাচির মত অগ্রসর হইয়া গর্ভমুখ দিয়া গর্ভাশয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। বীজাণুপুঞ্জ জরায়ু মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও উহাদিগের কৃমিবৎ গতি ক্ষান্ত হয় না।

অনেকের ধারণা অণ্ডাণুকোষ (ovary)-স্থিত

* পুরুষ ও স্ত্রীদিগের জননেন্দ্রিয়ের বাহ্যাভ্যন্তরিক গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে সবিশেষ জানিতে হইলে ১৩৩১ সালের আশ্বিন সংখ্যা পাঠ করা উচিত। নূতন গ্রাহকগণ ৵ ডাক টিকিট পাঠাইলে ১ খণ্ড পাইবেন।

পৃষ্ঠ স্থানটি ঈষৎ ফুলিয়া নানা দাগা হইয়া উঠে। এই উন্নত স্থানটি ভেদ করিয়া বীজাণু মাথা ঠেলিয়া ঠেলিয়া পুচ্ছ নাড়িতে নাড়িতে অণ্ডাণুর মধ্যদেশে উপস্থিত হয়। বীজাণুটি [illegible] অণ্ডাণুর কুসুমের (Vitellu) মধ্যে প্রবেশ করিলে উহার পুচ্ছ সঞ্চালন ক্রিয়া ক্রমে বন্ধ হইয়া যায় এবং পরিশেষে উহার পুচ্ছ একেবারেই অদৃশ্য হয়। সঙ্গে বীজাণুর [illegible] ও মধ্যদেশ একটি গোলাকার আণবিক পুরুষ ভাবাত্মক কোষাণুকেন্দ্র গঠন করে। [illegible] কোষাণুকেন্দ্র The mal [illegible] nucleu) [illegible] অণ্ডাণুর কুসুমকোষের মধ্যে [illegible] কোষাণুকেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে [illegible] পুরুষ উভয় কোষাণুকেন্দ্র পরস্পর [illegible] হইয়া যায়। পুরুষ ও স্ত্রী [illegible] কোষাণু [illegible] কিছুক্ষণ ক্রিয়ার বিরাম দেওয়া যায়। তাহার পর আবার বিভাগ প্রক্রিয়া (process of Segmentation) আরম্ভ হয়। ডিম্বাণু প্রথমে দুইটি কোষে বিভক্ত হয়, এই দুইটি কোষের প্রত্যেকটি আবার দুইটি করিয়া কোষে বিভক্ত হয়। [illegible] না বহুসংখ্যক কোষের উৎপত্তি ঘটে ততক্ষণ এইভাবে [illegible] দ্বিধা বিভক্ত হইয়া অন্য কোষ গঠন ক্রিয়া চালাইতে থাকে। এই পরস্পর সংলগ্ন কোষপুঞ্জই মানব [illegible] প্রাথমিক অবস্থা। এই কোষপুঞ্জের [illegible] সংযোজিব দ্বারা [illegible] আকার বৃদ্ধি পায়। কোষাণুর গঠনবৈচিত্র্য এ তাহাদিগের [illegible] স্থান বৈচিত্র্যের দ্বারা [illegible] ক্রমে মানবমূর্ত্তি ধারণ করে। এই পরিবর্ত্তন পরম্পরার পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব অতীব জটিল সুতরাং আমরা এস্থলে উহার বিশদ বিবরণ প্রদান করিতে পারিলাম না। ভ্রূণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যসমূহ ভ্রূণবিজ্ঞান (Embryology) নামে অভিহিত। ইহা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের অনুশীলনযোগ্য সন্দেহ নাই। যে ডিম্বাণুর গর্ভাধান কার্য্য শেষ হইবার পর বিভাগ প্রক্রিয়া (Segmentation) আরম্ভ হইয়াছে সে ধীরে ধীরে অণ্ডাণুপ্রবাহ ভিতর দিয়া জরায়ুগর্ভে প্রবেশ করে এবং তাহার আভ্যন্তরিক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া তথায় অবস্থান করে। তাহার পর অতি দ্রুত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর (mucous membrane) উপরিভাগ ছিন্ন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গে উহার প্রবেশপথ বা ছিদ্রটি সম্পূর্ণরূপে বুজিয়া যায়। তখন গর্ভাশয়ে নিহিত ডিম্বাণু ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে উহা সম্পূর্ণ পরিণত হইলে প্রসবকাল সমাগত হয় এবং পূর্ণাঙ্গ সন্তান [illegible] হইয়া থাকে

ভ্রূণ-প্রসঙ্গ।

মাসভেদে অবস্থাভেদ।

গর্ভাধানের পর দ্বিতীয় সপ্তাহে ডিম্বাণু প্রায় সিকি ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। তৃতীয় সপ্তাহের শেষভাগে মস্তিষ্ক চক্ষু ও কর্ণের অঙ্কুর পরিদৃষ্ট এবং

প্রথম মাস

[illegible] আবরণকারী থলিয়াটি (Amnion) নির্ম্মিত হইয়া থাকে। চতুর্থ সপ্তাহের শেষে অর্থাৎ গর্ভাধানের একমাস পরে ভ্রূণের মুখ ও গুহ্যদেশ সংগঠিত হয় এবং অন্যান্য অবয়বের চিহ্নগুলি বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। কেবল তাহাই নহে দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে হৃদপিণ্ডের যে অঙ্কুর বা সূচনা দেখা যায় তাহা এই সময়ে অনেক বাড়িয়া উঠে।

দ্বিতীয় মাসের শেষে ডিম্বাণু কুক্কুট ডিম্বের ন্যায় বড় হয়। এই সময়ে নাসিকাটি স্বাভাবিক আকার লাভ করিতে আরম্ভ করে এবং কণ্ঠাস্থি ও অধো হনুর (lower jaw) গঠন কার্য্য আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয় মাস।

তৃতীয় মাসের শেষে ভ্রূণ তিন ইঞ্চি এবং সওয়া তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয় এবং ওজনে কিঞ্চিদধিক তিন আউন্স হইয়া থাকে। এই মাসে (Placenta) ফুল দেখা দেয় অঙ্গুলিসমূহের উপরিভাগে নখের রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। গলা গড়িয়া উঠে এবং জননেন্দ্রিয়

৩য় মাস

(। চিত্র প্রদত্ত । ।তে পূ।গর্ভা গর্ভিণীর জরায়ু কাল মধ্যে ব অবস্থা প্রদর্শিত হল। শ।ট্ট জলের ।। ।শ পূর্ণ অব ।ব মধ্যে রহিয়াছে।

। ব ব ।বক

দশম চা দ্র।াসে। য ।। ব পাব।৩ অবস্থা । হইলে প্রসা বেদনা আবস্থ । ।। ।।কালে শি জন্মগ্রহ।করে।

গর্ভাবস্থা।

নারীর প্রত্যাণব গর্ভাধানেব সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ।র্ভাবস্থার আরম্ভ এব গর্ভস্ ।ব পুংবিপুষ্টিব পব উহাব ।ম্মৈব সাহত গর্ভাস্থা। শেষ। ভিন্ন ভিন্ন রমণীর গর্ভ কালের পাব ।। । । । ।কে। দশ চান্দ্রমাসে স্বস্থ্য। শেষ বার ঋতুদর্শন হইবার ।।দি। হইতে গণনা করিয়া সধারণত ২৮ দিনে (অর্থাৎ ৯ মাস ১ দিন দশ ।স দশ দিন ভুল হিসাব) গর্ভকাল নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

গর্ভের সূচনা হইতে গর্ভিণীর শরীরে যন্ত্রসমূহের বিশেষ জনন য এবং তাহার আনুষঙ্গিক যন্ত্রগুলির বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে।

গর্ভাবস্থায় প্রধান শারীরিক পরিবর্ত্তন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে রজঃস্রাব না হই কই লোকে উহাকে গর্ভ লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। য রমণী সুস্থ ও স ল নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিনি বজঃস্বলা হইয়া থাকেন তাব রজঃস্রব বন্ধ হ লে উহাকে গর্ভধানের লক্ষণ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। দুর্ব্বল ও রোগার্ত্ত নারীদিগেব রক্তাল্পতা এব ক্ষয় রোগের উপ ি ত্ত শোণিতস্রাব বন্ধ হতে পাবে। শিশুকে স্তন্যদানের অবস্থায় গর্ভ সঞ্চাব হইলে স্ত্রীলোকে যেমন সেদিকে লক্ষ্য করে না সে রূপ বজঃস্রাব বন্ধ থাকার সময়ে গর্ভ সঞ্চার হইলেও সেদিকে কেহ দৃকপাত করে না।

গর্ভ সঞ্চারের পর তৃতীয় বা চতুর্থ সপ্তাহ নারীদিগের গা বমি বমি করে এব অল্প অল্প বমি হয়। তৃতীয় মাস পর্য্যন্ত এই অবস্থা থাকে।

প্রাভাতিক উপসর্গ।

এই অবস্থায় কখন কতবার বমি হইবে তাহার কোনই ঠিক নাই। যদি কোন সুস্থ সবল রমণী বিবমিষা দ্বারা আক্রান্ত হয় এব মাঝে মাঝে বমন করিতে থাকে আর যদি তাহার অসুখের অন্য কোন কারণ বা লক্ষণ দেখিতে না পাওয়া যায় তাহা হইলে এই প্রকার বিবমিষাকে গর্ভ সঞ্চারের একটি সামান্য প্রামাণিক লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

গর্ভাবস্থায় একশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের ক্রমাগত মুখে জল উঠিয়া থাকে। ইহাদিগের মুখনি সৃত জল অর্থাৎ লালা বড়ই চট্‌চটে, শ্বেতবর্ণ এবং ফেণিল। সহজে ইহা মুখ হইতে বাহির

লালানির্গম —মুখে জল ওঠা।

হইতে চাহে না অথচ না পরিত্যাগ করিলেও সোয়াস্তি পাওয়া যায় না—বড় বিরক্তি ঠেকে।

গর্ভাবস্থায় অনেক রমণীরই নাড়ীগণের অসামঞ্জস্য বা বিশৃঙ্খল ভাব (Nervus derangement) পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

নাড়ীসম্বন্ধীয় লক্ষণ।

ঐ সময়ে নাড়ীর উত্তেজনা এরূপ অধিক হয় যে তুচ্ছ কারণে হৃদয় মন বিষাদে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং আনন্দের সামান্য কারণ ঘটিলেই আহ্লাদের আর সীমা থাকে না। যাহাদিগের শরীর দুর্ব্বল নাড়ী মণ্ডলের অবস্থাও মন্দ একটু অযত্নে তাহাদিগের গলা স্থায় হিষ্টিরিয়া বা মূর্চ্ছা রোগ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই সময়ে শরীরের নানাস্থানে শিরা ও মাংসপেশীসমূহের একরূপ কষ্টদায়ক বেদনা হইবার সম্ভাবনা। তদ্ভিন্ন গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীদিগের ক্ষণে ক্ষণে মেজাজের পরিবর্ত্তন এবং অগ্নিমান্দ্য হওয়াও স্বাভাবিক। আহার বিষয়েও রুচির পরিবর্ত্তন দেখা যায় এই সময়ে নানা প্রকার দ্রব্য খাইতে সাধ হয় স্বাভাবিক অবস্থায় রমণী যে প্রকার খাদ্য খাইবার জন্য কখনও আগ্রহ প্রকাশ করে না এই সময়ে সে রূপ দ্রব্য খাইবার জন্য তাহার খুব আগ্রহ দেখা যায়।

গর্ভসঞ্চারের পর কয়েক সপ্তাহ যেয়ে গর্ভিণী স্তনযুগলে অল্প অল্প ভার বোধ করে। দ্বিতীয় মাসের শেষে বাহিরের লোকেও স্তনযুগলের বৃদ্ধি লক্ষ্য করিতে পারে।

স্তনের পরিবর্ত্তন।

সেই সময় হইতে স্তনযুগলের আকার ও পরিসর বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ক্রমশ স্তনযুগল কঠিন ও গ্রন্থিবহুল হইয়া উঠে। স্তনদ্বয়ের আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চর্ম্মের নিম্নস্থ শিরা ধমনীসমূহ পুষ্ট হইয়া উঠে ইহাতে গৌরাঙ্গী রমণীদিগের চর্ম্ম মস্মরের ন্যায় চিক্কণ উজ্জ্বল হয়। স্তনের আকার বৃদ্ধি হেতু চর্ম্মের এরূপ চাপ লাগে যে স্তন মণ্ডলের উপর শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বল রেখাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। তৃতীয় মাসের পর স্তনের অগ্রভাগে টিপিলে অল্প অল্প দুগ্ধ বাহির হয়। প্রথম প্রথম এই দুগ্ধ বেশ স্বচ্ছ থাকে কিন্তু গর্ভ যত পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে এই দুগ্ধের বর্ণ তত গাঢ় হইতে থাকে। স্তনের যে সকল গর্ভলক্ষণাত্মক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে তাহার মধ্যে স্তনবৃন্তের চারি পার্শ্বস্থ স্থানের (areola) পরিবর্ত্তন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই সময়ে স্তনের বৃন্ত উন্নত এবং কঠিন হইয়া উঠে এবং উহার চারি পার্শ্ব স্থানের বর্ণ ধূসর হইতে মসীময় হইয়া থাকে। চারি মাসের সময় স্তনবৃন্তের চারি পার্শ্বস্থ স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোল গোল গুটির দ্বারা আকীর্ণ হয় এবং চুচুকের প্রসারণ ঘটে। চুচুক প্রদেশের পর এক ইঞ্চির অধিক স্থান ব্যাপিয়া একটি বৃত্ত দেখিতে পাওয়া যায় এই বৃত্তটি কতকটা শ্বেত চন্দনের অলকা তিলকার ন্যায় ছোট ছোট শ্বেতাভ বিন্দু সকলের দ্বারা সমাকীর্ণ হইয়া থাকে। পঞ্চম মাসেই এই বৃত্তের সৃষ্টি হয় এবং ইহা গর্ভসঞ্চারের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত।

গর্ভসঞ্চারের ফলে উদর প্রাচীরের পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ কিছু নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়াতে তলপেটের দিকটা কিঞ্চিৎ চেপ্টা হইয়া যায়।

উদরবৃদ্ধি।

চতুর্থমাসের মাঝামাঝি হইতে সাত আটমাস পর্য্যন্ত উদরের আকার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তবে নবম মাসে উদরের নিম্নাংশের উচ্চতা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়া অষ্টম মাসের প্রথমে যে অংশ যেরূপ আকারের ছিল ঠিক সেইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ জরায়ু বৃদ্ধি হেতু ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া আটমাসের শেষাশেষি সময়ে প্রায় বুক পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠে পরে ধীরে ধীরে তলপেটের দিকে নামিতে থাকে। নাভি হইতে উহার নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং সুস্পষ্ট একটি পিঙ্গলবর্ণ রেখা দেখিতে পাওয়া যায় এবং উভয় কুক্ষিদেশের বর্ণ গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। উদর যত বড় হইয়া সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া আসিতে থাকে গর্ভবতীর নাভি মধ্যস্থ কত চিহ্নটি তত উচ্চ হইয়া উঠিতে থাকে। তার পর ছয় কি সাতমাসে নাভির

ঐ ক্ষত চিহ্ন চারি পার্শ্বের চর্ম্মের সমান সমান উচ্চ হয়। গর্ভের পরিণত অবস্থায় নাভিকুণ্ড আরও উচ্চ হইয়া উদরের উপর একটা বড়ার মত স্ফীত হইয়া থাকে। উদর প্রাচীরের সম্প্রসারণ চড়ু সাধারণত তলপেটের উপর দিয়া ঈষৎ রক্তবর্ণ বা নীলবর্ণ ক কগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রসবান্তে এই দাগগুলি শ্বেতবর্ণ ধারণ করে এবং চিহ্নিত স্থানগুলি ভিতরদিকে অল্প বসিয়া যায়।
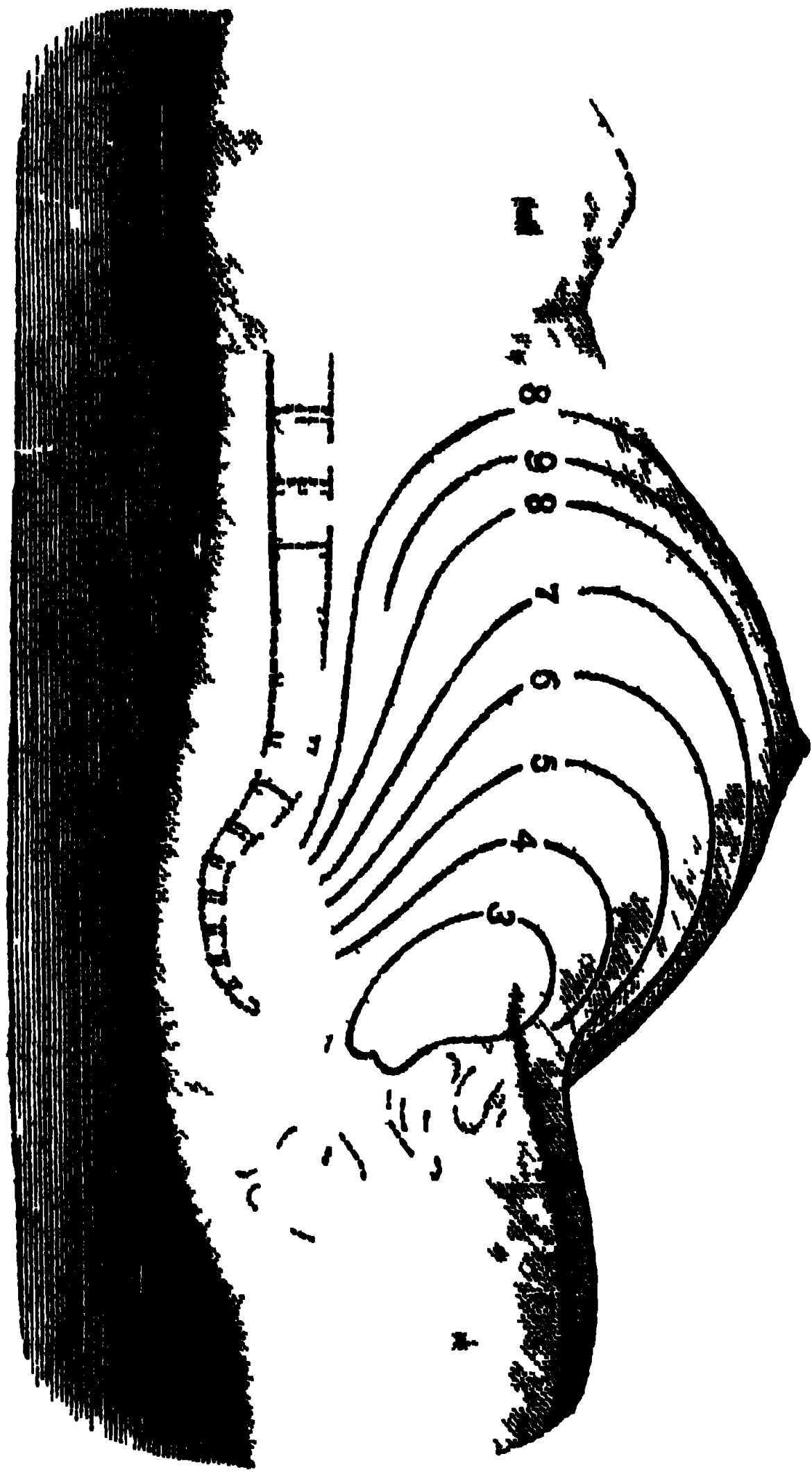
[গর্ভাবস্থায় জরায়ুর বৃদ্ধি ও পরিসর—৩ ৪ ৫ অঙ্কের জরায়ুর সেই সেই মাসের পরিসর দেখান হইয়াছে। ৮ হ তে ৯ মাসের মধ্যে জরায়ু কিছু নামিয়া আসে।]

চতুর্থ মাসের প্রথম হইতে আবের ন্যায় একটা পদার্থ তলপেটের অধোভাগ হইতে উঠিয়া উদর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। চতুর্থ মাসের পর ভ্রূণটি ক সাধারণত অনুভব করিতে পারা যায়, আর গর্ভাবস্থার শেষ চারিমাস উদরের উপর হাত বুলাইয়া বাহির হইতেই ভ্রূণের প্রধান প্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুভব করিতে পারা যায়। গর্ভ সঞ্চারের পর অষ্টাদশ সপ্তাহে অর্থাৎ পঞ্চম মাসে গর্ভিণী সর্ব্বপ্রথম ভ্রূণের অঙ্গ সঞ্চালন বেশ স্পষ্ট অনুভব করে। ভ্রূণের এই অবস্থাকে জীব সঞ্চারের অবস্থা বলে। গর্ভের পূর্ণাবস্থায় উদরের উপরে হাত রাখিলে ভ্রূণের ঘন ঘন অঙ্গ সঞ্চালন অনায়াসে অনুভব করিতে পারা যায়। ঐ সময়ে অন্য হাত দিয়া ভ্রূণটিকে একটু সরাইয়া দিলে প্রায়শ ভ্রূণটি নড়িয়া চড়িয়া সাড়া দিয়া থাকে।

ভ্রূণের অঙ্গ চালনা।

চতুর্থ মাসের পর উদরের উপর কাণ রাখিয়া বা ষ্টেথিসকোপ বা ঐরূপ পরীক্ষায় ব্যবহৃত শব্দবহ যন্ত্র রাখিয়া মনোযোগ দিয়া শুনিলে ভ্রূণের হৃদপিণ্ডের স্পন্দন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। চতুর্থ মাস হইতে গর্ভাবস্থার শেষ পর্য্যন্ত ঐরূপ শব্দ শ্রবণগোচর হইয়া থাকে। ভ্রূণের হৃদয় স্পন্দন শুনিতে পাইলে গর্ভ সঞ্চার সম্বন্ধে আর কোনই সংশয় থাকে না কারণ ভ্রূণের হৃদয় স্পন্দন শব্দ গর্ভ সঞ্চারের একটি বিশিষ্ট এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য লক্ষণ।

ভ্রূণের হৃদপিণ্ড

গর্ভাবস্থায় অপেক্ষাকৃত ঘন ঘন মূত্রস্রাব হইয়া থাকে বিশেষত জরায়ু যখন তলপেটের নিম্নভাগে থাকে সেই সময় অনেকবার প্রস্রাব হয়। চতুর্থ মাসে জরায়ুর ঊর্দ্ধগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই উপসর্গের উপশম হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় সাধারণত গর্ভিণীদিগের কোষ্ঠবদ্ধতা হইয়া থাকে। অন্ত্রসমূহের উপর চাপ পড়ে বলিয়াই যে কেবল এইরূপ ঘটে তাহা নহে, মলনালীর প্রাচীরের অবস্থান্তর ঘটে বলিয়াই প্রধানত গর্ভিণীদিগের কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না।

মূত্রস্থলী ও মলনালী।

ঘণ্টা বাঁধিবে কে ?

[শ্রীশচন্দ্র গোস্বামী, বি এ]

দেশের সর্ব্বত্র শুনিতে পাইতেছি—পল্লীসংগঠন কর, Back to land back to villages সকলেই বলিতেছেন জাতির প্রাণ পল্লীতে—The nation dwells in Cottages পল্লীর স্বাস্থ্য নাই শিক্ষা ভাব প্রবল কুসংস্কারের রাজত্ব সেখানে অতএব পল্লীকে সংস্কৃত কর। নানা দলে নানা কথা বলিতেছেন—কেহ বলিতেছেন ম্যালেরিয়া ব কব সব দু খ যাইবে কেহ বলিতেছেন অর্থাভাব দূর কর ম্যালেরিয়া যাইবে কারণ malaria is a euphemism for insuffi cient food etc আবার কেহ কহ বলিতেছেন ও সব কিছু না খদ্দর—খদ্দর সাব নাও পল্লী বিশ্বাতে অসনায়। সমাজ স স্কারক তার স্বরে বলিতেছেন কুসংস্কারই মূলীভূত কারণ— আচারে বিচারে বাধা কবি দিয়া দূর। তর্কের লইতে হবে কবিতা সন্ধান। নানামুনির নানা মত—কিন্তু এটা ঠিক এব কোনটাই ভুল নয়—সমস্তগুলি যোগ করিলে স্বরূপই দাঁড়ায় বটে। পল্লীসমাজের ধ্বংসের কারণ সামাজিক রাজনৈতিক আর্থিক এবং তার ফলেই স্বাস্থ্যাভাব শিক্ষাভাব ও ধর্ম্মহীনতা। সমস্তগুলি ত জানা গেল কিন্তু কর্ম্মী কোথায় ? এই পুঞ্জীভূত দুঃখ ও দৈন্য ঠেলিয়া বীরের মত যে বলিবে—আলো চাই প্রাণ চাই চাই মুক্ত বায়ু।

সাহস বিস্তৃত বক্ষপট আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু সেই প্রাণবান্ সেবক কোথায়—কাজ করিবে কে ? ঘণ্টা বাঁধিবে কে ?—who is to bell the cat ?

প্রথমত দেখা যাক্ পল্লীর সংখ্যা কত ? কি অভাব রসদ কোথায় ? বর্ত্তমানে কি ভাবে কাজ হইতেছে উন্নতির উপায়ই বা কি ?

আমি অদ্যাবধি যতগুলি এ সম্বন্ধে আলোচনা দেখিয়াছি তাহার প্রায় সকলেই বলিতেছেন—বর্ত্তমান পল্লীসমাজ দূষিত, ইহার আমূল পরিবর্ত্তন কর। এই দল বলেন পল্লীর যাহা কিছু সবই খারাপ তাদের স্বাস্থ্য নাই অর্থ নাই তাদের উচ্চ ভাব নাই। এই সমাজ বিদ্রোহীর দল বলেন সংহার কর তারপর স গঠন কর অর্থাৎ আমূল পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর উপায় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা মনে রাখিবে যে মনুষ্যের যত গুণ আছে সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা দণ্ড প্রণেতা রক্ষাকর্ত্তা সমাজই রাজা সমাজই শিক্ষক এব সমাজকে একেবারে অচ্ছিন্ন করিলে চলিবে না। প্রত্যেক দেশের ভাবধারা (tradi tions) আছে তাহাকে বাদ দিয়া সংগঠন সম্ভব নয়। প্রত্যেক জাতির বৈশিষ্ট্য আছে তাহা বজায় রাখিতে হইবে। সমাজ মধ্যে বাস করিয়াই যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে ওলাদেবী ও শীতলা দেবীর কৃপা ছাড়া ও যে কলেরা বা বসন্ত প্রতিরোধ করা যায় তাহা গ্রামবাসীকে জানাইতে হইবে। অজ্ঞ বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া অথবা কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া নাক সিটকাইলে তাহাদের হৃদয়ের সন্ধান পাইবেন না—হৃদয়ও জয় করা হইবে না। আমি অনেক কর্ম্মীকে দেখিয়াছি যাঁহারা গ্রামবাসীকে দয়ার চক্ষে দেখেন—কৃপা করিয়া তাহাদের জন্য বক্তৃতা বা কাজের ভান করিয়া তাহাদের কৃতার্থ করেন। এই প্রকার সেবা কখনও জনসাধারণ গ্রহণ করেন না। অশ্রদ্ধার দান নিরন্নও গ্রহণ করেন না। সমাজ সেবা ও পল্লী সেবার প্রথম কথা—শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ শ্রিয়া দেয়ম্ ভিয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া ন দেয়ম্। সংগঠনকামীকে এই মন্ত্র মনে রাখিতে হইবে এবং সমাজে বাস করিয়াই তাহাদের সহিত ধীরে ধীরে মিশিয়া যুক্তি তর্ক ও চরিত্রের মাহাত্মের দ্বারা পল্লীবাসীর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা—পল্লীর সম্বন্ধে কর্ম্মীকে প্রথমত

জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিতে হইবে। রোগ নির্ণয় করা যেমন ডাক্তারের সর্ব্ব প্রথমে প্রয়োজন হয় এবং পরে চিকিৎসার কথা উঠে পল্লী সেবককেও প্রথমে পল্লীটার কথা বিশেষ করিয়া জানিতে হইবে এবং সমগ্রভাবে দেশের কথাও তাহার জানা থাকা দরকার। এই কথাটীর নাম (Village Study) অথবা (Village Survey) আমি বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর পল্লীতথ্য সংগ্রহ নামক তথ্য সংগ্রাহক পুস্তিকা ও শান্তি নিকেতনের পল্লীসেবা বিভাগের (Village Survey) দিকে কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। যে গ্রামটী কাজ করিতে হইবে সেখানকার লোক সংখ্যা কত এবং বহু বৎসরের ইতিহাস —তাহাদের গ্রামের স্বাস্থ্যের ও গৃহ শিল্পের ধ্বংসের বিশেষ কারণ—লোকের মাদক দ্রব্যাদির বহুল পরিমাণে ব্যবহার এক স্পষ্ট ইতিহাস কর্মীকে জানিতে হইবে।

একথা সত্য যে কুটীর শিল্পের অভাবে মৃত্যুর কারণগুলি সর্ব্বত্রই এক বিষয় হয় না। সর্ব্বদা বুঝিতে পারিবেন যে স্থানীয় কতকগুলি সমস্যা আছে। এই local সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

তৃতীয় কথাটি হইতেছে কর্মী কি ভাবে কে তাহাকে ভরণ পোষণ করিবে। নানা প্রকার সমিতিতে কার্য্যোপলক্ষে আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে আমাদের পল্লীবাসীরা আত্মশক্তিতে একেবারে বিশ্বাস হারাইয়া ছেন—সর্ব্বত্র একই কথাই শুনিতে পাইতেছি—যে আমার গ্রামটা বড় খারাপ এখানকার লোকগুলি বড় স্বার্থপর আপনারা সহর হইতে টাকা ও লোক পাঠাইয়া গ্রামটাকে বাঁচান। এই কথাটীর মত এক কথা আমি বেশী শুনি নাই। আমার গ্রামকে আমি বড় করিতে না পারিলে বহিরাগত কোন সমিতি অথবা ব্যক্তির সাধ্যও নাই যে উহাকে ভাল অথবা বড় করিয়া দেয়। পল্লী সমাজের ভিতরে যে শক্তি আছে উহাকে না জাগাইলে কাজ হইবে না। সবই ওখানে বিদ্যমান আছে— গ্রামবাসীদের মধ্যে একজনকে ভার লইয়া কাজে নামিতে হইবে। পরদানে পুষ্ট সমিতি যেমন গ্রামবাসীর প্রীতি আকর্ষণ করে না তাহারা কখনও ঐ সমিতির সুখ দুঃখের ভাগী হয় না। বহিরাগত সমিতির দান ও পরিচালনায় প্রথমটা গড়িয়া উঠিলেই গ্রামবাসীকে নিজের কাজ নিজে দেখিতে হইবে। ইংরাজের হাতে পড়িয়া বাহ্য জগতে আমরা নাবালকত্বে (perpetual minor) গণ্ডী ছাড়াইতে পারি নাই পল্লীসংগঠনেও চিরকাল outside agencyর দরকার নাই Every thing must should evolve from within কাজেই গ্রামবাসীর সহানুভূতি উৎসাহ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই হিসাবে কর্মী স্থানীয় হওয়াই দরকার তাহাতে কাজ করিবার সুবিধা হয়। এই তো গেল কর্মীর কথা নির্ব্বাচন করা। এখন দেখা দরকার কর্মী কি ভাবে নিজের ব্যক্তিগত অভাব দূর করিবে। আমাদের দেশে একদল তথাকথিত স্বদেশ হিতৈষী আছেন তাঁহারা বলেন ত্যাগ চাই—ত্যাগ চাই। স্বদেশের জন্য সর্ব্বস্ব পণ চাই। এই শ্রেণীর লোকের বেশ জানেন যে ত্যাগের সীমা আছে মানুষ না খাইয়া বেশী দিন কাজ করিতে পারে না। এরা চিরকাল সত্য যে তাদের বিলাসের সখ অপূর্ণ রাখিতেই হইবে কিন্তু তাই বলিয়া কর্মীর শাক ভাতেরও প্রয়োজন নাই এ কথার অর্থ হয় না। এখন কথা হইতেছে কর্মীকে পালন করিবে কে? এইটা আমার মতে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা। আমার বিশ্বাস অপরের দানে কেহ চিরদিন বাঁচিতে পারে না— যে রোগীর জীবনীশক্তিই নাই—Vitality অত্যন্ত low—সে কি কেবল injectionএর জোরে বাঁচিতে পারে। কর্মীর অভাব আছে সত্য কিন্তু সে অভাব তাহাকে নিজেই দূর করিতে হইবে। আইরিশ জন নায়ক (George Russel) বলিয়াছেন—গ্রামেই সব আছে—শুধু সেই অর্থ সম্পদ উদ্ধার করিতে হইবে। গ্রামেই দেহের ও মনের ক্ষুধা তৃপ্ত করিবার অবস্থা যত দিন না হইবে তত দিন কর্ম্মী ও কর্ম্মের স্থায়ীত্বের আশা কম। Unless the countryside can afford to young men some food for soul as well as for body they will always go to the already over crowded towns

---

স্বাস্থ্য-সমস্যা

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুহ, এইচ এ বি]

শারীরিক মানসিক ও নৈতিক—সর্ব্ববিধ জাতীয় উন্নতির মূল জাতীয় স্বাস্থ্য। The wealth of a nation is truly the health of the people স্বাস্থ্যই জাতির প্রকৃত সম্পৎ—রাস্কিনের (Ruskin) এই সারগর্ভ কথা যে কিরূপ সত্যবান স্বাস্থ্যহীন দরিদ্র আমরা জাতীয় জীবন মরণের ভীষণ সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আজ তাহা মনে প্রাণে উপলব্ধি করিতেছি। শত বৎসর পূর্ব্বেও আমরা এরূপ স্বাস্থ্যহীন দুর্ব্বল ও অল্পায়ু ছিলাম না কিন্তু এই অল্পকাল মধ্যে আমাদের এতটা শারীরিক অবনতি কি করিয়া সংঘটিত হইল। কি করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এত দরিদ্র দুর্ব্বল ও স্বাস্থ্যহীন এবং এত অধিক রোগক্লিষ্ট ও অল্পায়ু হইয়া দিন দিন ধ্বংসের পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম ইহা একটা সমস্যার বিষয় বটে।

বেড়া আগুনে ঘেরা নিরুপায় জন্তু মুক্তির সন্ধানে চীৎকার করিয়া চারিদিকে যেমন বৃথা ছুটাছুটি করে অকূল পাথারে হাবুডুবু খাইয়া মগ্নপ্রায় ব্যক্তি শ্রান্ত অবসন্ন দেহে সম্মুখে যাহা কিছু দেখিতে পায় মুক্তির শেষ উপায় মনে করিয়া তাহাকেই যেমন সে সবলে আঁকড়িয়া ধরিতে চায় আমরাও তেমনি আসন্ন মৃত্যুর [illegible]মুষ্টি হইতে মুক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত দিশাহারা হইয়া ভিন্ন ভিন্ন মতে পরিচালিত ও ভিন্ন ভিন্ন পথে ধাবিত হইতেছি। জাতীয় দুর্ব্বলতার জন্য বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক প্রথা ব্যাধি ও অকালমৃত্যুর জন্য মক্ষিকাদি জীববিশেষ স্বাস্থ্যহীনতার জন্য হৃতসর্ব্বস্ব পল্লীগ্রাম এবং দারিদ্র্যের জন্য শিক্ষা ও শাসন নীতিকেই প্রধানত দোষী সাব্যস্ত করিয়া শিক্ষা সংস্কার পল্লী সংস্কার, সমাজ সংস্কার শাসন সংস্কার—এক কথায় স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল-সংস্কারের জন্য আমরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। ফল আসল কাজ কিছু হোক্ না হোক্ বাদ প্রতিবাদ ও সমালোচনায় নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে [illegible] করিতেছি না। [illegible] জাতীয় জীবন [illegible] শাসন পদ্ধতির [illegible] জাতীয় [illegible] অথবা [illegible] সুযোগ [illegible] নাড়াচাড়া করিতেছি। [illegible] পড়িয়াছি

[illegible] প্রধান [illegible] অপর [illegible] প্রকৃত কারণ ও তাহা [illegible] আমাদের [illegible] foreign exploitation—এ সম্বন্ধে আলোচনা [illegible] অন্নাভাবের মূল কারণ [illegible] অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি তাহাও বলা বাহুল্য। এক্ষণে এই মূল্যবৃদ্ধির প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে [illegible] স্বাস্থ্যাভাবের [illegible] কারণ [illegible] প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক।

প্রথমত ব্যাধি ও তাহার কারণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে আমাদের স্বাস্থ্যহানির মূল কারণ বোধ হয় কতকটা সুস্পষ্ট হইতে পারে।

ম্যালেরিয়া কালাজ্বর কলেরা বসন্ত যক্ষ্মা প্রভৃতি

সাধন করিতে সক্ষম । জীবনী ি প্রাপ্ত হওয়ায় রোগের আক্রমণ হ আত্মরক্ষা করিবার শক্তি (power of r istance) আমাদের ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। গ র অয় কা জাতি ত এরূপ দুরবস্থা ঘটে না প্ত নীতির পুনরায় স প না করিয়া শুধু রোগবীজ ধ্বংস করিবার জন্য রাম ক্তি ও অর্থের গ য় চ প্য করা ইবে বলিয়া ত য় ব ক গুপ্ত স্যানিটারী দ চিন ই বলিয়াছেন।

Th ll h l v ull um t cumn the h l y l ti vn ul ctim ly c rc ati l lati ml *m ction* whi th l cl l w ull c n contiit ill it ll it n *str l ll m* *the c nstit ti i mt n y n th ttl* *fou ll iten* The ih ll ctive w ol m tn l ili tli th h ct lis i lim u ul ut r ili il im pr i ll i l n mi ml i dutiil w ll i l th i ple *m* *thit lil n t um it h m in th li* *onditi n f tn p ll l l* *to pr ent th*

ডাক্তার মুখুর এই বাক্যটী ঘরে ঘরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। আমি আমাদিগের রীতিনীতি চার ব্যবহার ও দৈনিক খাদ্যপ্রণালীর সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাও স্বাস্থ্যহানির আংশিক কারণ নহে তাহা কে বলিতে পারে। দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে দেহ যখন স্বভাবতই ক্লান্ত ও নিস্তেজ হইয়া বিশ্রামের শীতল ক্রোড়ে লুটাইয়া পড়িতে চায় তখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অফিস আদালত ও কল কারখানায় ছুটাছুটি করা গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীদিগের স্বাস্থ্যের কতটা উপযোগী, তাহা বিবেচনার বিষয় বটে। সে যাহা হোক ষাট বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের জীবনীশক্তি এতটা অভাব ছিল না বলিয়াই ম্যালেরিয়া ও অন্যাদি রোগের বীজ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকিতেও তাহাদের আক্রমণ ও তজ্জনিত মৃত্যু এত অধিক হইতে পারে নাই। অতএব এক্ষণে এই কয়েক বৎসর মধ্যেই আমাদের জীবনী শক্তি সহসা এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার কারণ কি তা নিরূপণ করিতে পারিলেই আমাদের স্বাস্থ্য স র অনেকটা সমাধান হইতে পারে। রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু মহাশয় তৎপ্রণীত নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

খাদ্যের পরিমাণ অধিক হইলে যেমন অজীর্ণ উদরাময় প্রভৃতি বিবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগ উৎপন্ন হয় সেরূপ **যথোচিত খাদ্যের অভাবেও** দেহ সত্বর দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে এবং নানাবিধ রোগের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। **যথোচিত পরিমাণ খাদ্যের অভাব যে মনুষ্যের অকালমৃত্যুর এক প্রধান কারণ** যে কোন দেশের নিতান্ত দরিদ্র লোকের মধ্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল লোকের অবস্থা এত শোচনীয় যে তাহারা দুই সন্ধ্যা দূরে থাকুক এক বেলাও পেট পুরিয়া খাইতে পায় না। এই **আজীবনব্যাপী স্বল্পাহারের ফলে** তাহাদের শরীর স্বতই এত দুর্ব্বল হইয়া থাকে যে কোন একটি সংক্রামক ব্যাধি উপস্থিত হইলে তাহারাই প্রথমতঃ ও সহজে আক্রান্ত হয় এবং তজ্জন্য বহুসংখ্যক লোককে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা যায়।

বাস্তবিক এইখানেই আমাদের স্বাস্থ্যহানির ও জাতীয় ধ্বংসের মূল কারণ নিহিত রহিয়াছে। উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার্য্যের অভাবেই আমাদের জীবনী শক্তি ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় দেশে রোগ ও অকালমৃত্যুর এত আধিক্য দেখা যাইতেছে। ইহার উপর এই

স্বাস্থ্যহানির মূলে আবার একটা মানসিক কারণও বিদ্যমান রহিয়াছে। একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর। অন্নচিন্তা ও ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে তজ্জনিত মানসিক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাও আমাদের সাথের সাথী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেহের উপর মনের ক্রিয়া নিতান্ত সামান্য নহে। অত্যধিক মানসিক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার ফলে অসামান্যসুন্দরী ফ্রান্সের রাণী মেরী এন্টয়নেট (Marie Antonette) সপ্তাহকাল মধ্যে পক্বকেশা বৃদ্ধায় পরিণত হইয়াছিলেন। এই প্রকার মানসিক কারণে সুস্থ ব্যক্তিও ক্রমে দুর্ব্বল ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া রোগপ্রবণ ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। আমাদের এই মানসিক অসুস্থতার মূলেও অন্নাভাব, জ্ঞানাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব—এই ত্র্যহস্পর্শের কুযোগ ঘটিয়াছে। যিনি যতই অভিনব বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপ্রণালী উদ্ভাবন করুন না কেন এবং ডাক্তার কবিরাজের সংখ্যা যতই বাড়ুক না কেন এই মূল কারণের উচ্ছেদ না হওয়া পর্য্যন্ত জাতীয় স্বাস্থ্যের পরিমাণ ক্রমশ মন্দতরই হইতে থাকিবে।

আমাদের প্রধান খাদ্য চাউল ও দুধ। ইহাদের দুষ্প্রাপ্যতাই আমাদিগকে ক্রমে অনাহারে অভ্যস্ত করিতেছে। অনাহার বলিতে শুধু পরিমাণের অল্পতা নহে পুষ্টিকর উপাদানের স্বল্পতাও বুঝিতে হইবে। এই অভ্যাসগত অল্পাহারই (Chronic starvation) আমাদিগের রোগপ্রবণতা ও অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও রুগ্না মাতার স্তনে যথেষ্ট পুষ্টিকর দুগ্ধের অভাববশতঃ স্তন্যপায়ী শিশু শুধু তাহারই উপর নির্ভর করিয়া যথারীতি বলিষ্ঠ ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে গাভী দুগ্ধও মহার্ঘ্য বলিয়া শিশুর পক্ষে যতবার যে পরিমাণ দুগ্ধের আবশ্যক প্রথম হইতে সে তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে থাকে। অবশেষে অল্পাহারই তাহার স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়।

চাউল সম্বন্ধেও ঠিক এই অবস্থা। ভাত খাইতে আরম্ভ করিবার সময় হইতেই বালক বালিকাগণ ক্রমশ অল্পাহারে অভ্যস্ত হইতে থাকে। এ কথা শুধু দরিদ্র পরিবারের পক্ষেই প্রযুজ্য নহে আমাদের দেশে খুব বড় লোক ছাড়া সাধারণ ভদ্রলোকদিগের মধ্যে এইরূপ অল্পাহারের পরিমাণ অবশ্য বেশী। কেন না যিনি যত বড় চাকুরেই হউন তাঁহার উপার্জ্জনের অধিকাংশই কতকটা সখ করিয়া (নানা বিলাস সামগ্রী ও অনাবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে) কতকটা বা বাধ্য হইয়া (ডাক্তারী ঔষধ লবণ দেশলাই ইত্যাদির জন্য) তাঁহাকে বিদেশী বণিকগণের হাতে তুলিয়া দিতে হয়। আর বাকি অল্পাংশ হইতে ছেলেদের শিক্ষার ব্যয় (নিতান্ত সামান্য) বাদে অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ যাহা থাকে তাহা দ্বারা খাদ্যদ্রব্যাদি অগ্নিমূল্যে ক্রয় করিয়া কোনরূপে পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে হয়। সাজ পোষাক হইয়াছে আজকাল সভ্যতার মাপকাঠি এখন পেটে যতটা অন্ন থাকুক না থাকুক ভদ্রলোক না সাজিয়ে বাড়ীর বাহির হইবার উপায় নাই। এই সভ্যতার চাল বজায় রাখিতে গিয়া ভাতের হাঁড়িতে চাউলের পরিমাণ বিশেষ ক্রমশ কমাইতে বাধ্য হইতেছি। আবার মানুষী ঢেঁকির আসনে বিলাতী কল বসাইয়া চাউলের প্রধান পুষ্টিকর উপাদান (vitamine) প্রায় সবটাই তুষের সঙ্গে বাটিয়া ফেলিতেছি। প্রাচীনদিগের ন্যায় দুঃস্থ জন নিঃসহায় দরিদ্র আত্মীয়ের প্রতিপালন ত দূরের কথা নিজ পরিবারের ভরণপোষণই কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বালক বালিকাদিগকে প্রথম হইতে যে বয়সে যতবার ও যে পরিমাণ আহার্য্য দেওয়া আবশ্যক, হাজারে কয়জন ভদ্রলোক তাহা দিতে পারেন বা দিয়া থাকেন? বাল্যকাল হইতে এইরূপ অল্পাহারে অভ্যস্ত হওয়ায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলী ক্রমশ দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে ক্ষুধামান্দ্য জন্মে। তখন স্বভাবতঃ মনে হয় কেন আমরা ত দু বেলা বেশ পেট ভরিয়াই আহার করিতেছি বরং বেশী কিছু খাইতে গেলেই অম্লের দোষ জন্মিতে পারে। ইহার কারণ এই যে খাদ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বাবধি আমরা প্রকৃতিকে যেমন বঞ্চনা করিয়া আসিতেছিলাম এখন সময় বুঝিয়া প্রকৃতিও তাহার প্রতিশোধ লইতেছেন (refuses to

act)। ইহার উপর আবার সভ্যতার নূতন সরঞ্জাম "চা'য়ের বহুল ব্যবহার প্রচলিত হওয়ায় সোণায় সোহাগা র সংযোগ ঘটিয়াছে। খাদ্য হিসবে ইহার উপযোগিতা কিছু থাক্ না থাক ইহা দ্বারা স্বাভাবিক ক্ষুদবৃত্তিটাকে সময়ে অসময়ে ভোগ। দিয়া বশ ভুলাইয়া রাখা চলে।

উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে যে আমরা ক্রমশ এরূপ অন্ত সারশূন্য ও রোগপ্রবণ হইয়া পড়িতেছি সে কথাটা বুঝিবাও না বুঝিয়া যক্ষ্মা ও ম্যালেরিয়া রোগের বীজাণু গুলিই যে আমাদিগকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে জনসাধারণকে তাহাই দেখাইবার ও বুঝাইবার জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন লইয়া দেশের কাছে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছি এবং সেই বীজাণুর ধ্বংস সাধন করিতে কোন প্রদেশে কত কোটি টাকার আবশ্যক তাহারই হিসাব করিতে বসিয়া গিয়াছি। মূলে প্রকাণ্ড একটা ভুল রাখিয়া বাহিরে বেবি (baby) সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর অভিনয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতেছি। আমাদের পক্ষে ইহাপেক্ষা অধিকতর আত্মবঞ্চনা যে কি হইতে পারে জানি না। ভারতবর্ষ পূর্ব্বেও দেশে এত খাদ্যাভাব ছিল না বলিয়াই তখনকার লোকের স্বাস্থ্য উন্নত ছিল দেহ সবল ছিল মন সতেজ ছিল সুতরাং আয়ুকালও কিছু বেশী ছিল। প্রৌঢ়ত্বের অবসানেও অনেকের নাকের উপর চশমা বসিত না স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য দাঁত বাঁধান ত দূরের কথা অনেকেই সে বয়সে ছোলাভাজাও চিবাইয়া খাইতেন এবং তাহা অনায়াসে হজমও করিতেন।

জীব পুষ্টির জন্য আহার্য্যের মধ্যে গব্য দ্রব্য আমাদের প্রত্যেকের কতখানি আবশ্যক এবং অর্থাভাব ও দুর্ম্মূল্যতাবশত আমরা বাস্তবিক উহা কি পরিমাণে পাইয়া থাকি তাহা সকলেই জানেন। ইদানীং এই দুগ্ধ সমস্যার সমাধানে লোকের ঐকান্তিক আগ্রহ দেশের পক্ষে আশাপ্রদ বটে কিন্তু দুঃখের বিষয় চাউলের দুর্ম্মূল্যতা ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে কাহারও বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা যায় না, অথচ চাউলের মূল্যের অনুপাতেই কিন্তু অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য হ্রাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

আমাদের স্বাস্থ্যহীনতা ও স্বল্পায়ুতার সহিত অন্ন সমস্যার যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন দেখিতে হইবে, চাউলের মূল্য দিন দিন এত বাড়িয়া চলিয়াছে কেন এবং তাহার প্রতিকারের বা উপায় কি। চাল ডাল ভোজী লোকের সংখ্যা দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা যে পরিমাণে বাড়িয়াছে চাউলের মূল্য কিন্তু সে অনুপাতে খুব বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ দেশে আবাদের উপযুক্ত জমির পরিমাণও ত কম বাড়ে নাই। সুতরাং এ হিসাবেও চাউলের দর ক্রমশ এতটা বৃদ্ধি হওয়ার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। তবে এরূপ হইতেছে কেন? অবাধ বাণিজ্য ও অর্থনীতির দোহাই দিয়া আমরা এ দেশ হইতে প্রতি বৎসর যে প্রায় দশ কোটী টাকার (অর্থাৎ প্রায় দেড় কোটী মণ) চাউল ও কুড়ি কোটী টাকার গম সমুদ্র পথে রপ্তানি দিতেছি ইহাকেই কি এই দুর্ম্মূল্যতার একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয় না? দেশে খাদ্য শস্যের পরিমাণ (supply) প্রয়োজনের (demand) অতিরিক্ত মজুত থাকে না বলিয়াই ত বেশী ফসল জন্মিলেও তাহার মূল্য কমিতে পারে না বরং কোন কারণে কোথাও ফসল একবার নষ্ট হইয়া গেলে দাম আরও চড়িয়াই যায়। আমাদের বোধ হয় এক বৎসরের জন্যও যদি ইহার অর্দ্ধেক রপ্তানি বন্ধ রাখা যায় তবে পর বৎসরই চাউলের মূল্য প্রায় অর্দ্ধেক নামিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা যে হইবার নয়। পাশ্চাত্য অর্থনীতি শাস্ত্রের বোল আওড়াইয়া অনেকেই হয় ত প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন— কেন ইহাতে দেশের লাভ ছাড়া লোকসান ত কিছুই হইতে পারে না। বৈদেশিক বাণিজ্য এইরূপে দেশে প্রচুর অর্থাগম হইতেছে বলিয়াই ত আজ আমরা দশ টাকা মণের চাউল খাইয়াও স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া রহিয়াছি নতুবা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের' মত না খাইয়াই দেশের বারো আনা লোক কোন্ দিন মরিয়া যাইত।" প্রতিশ্রেণীর

তুলা ইত্যাদি অন্যান্য বাণিজ্য দ্রব্য সম্বন্ধে এ যুক্তি সম্পূর্ণ প্রযুজ্য হইলেও বল বীর্য্য স্বাস্থ্য আয়ুর আধার প্রাণস্বরূপ অন্ন সম্বন্ধেও কি এই নিয়ম সব সময়ই খাটিতে পারে? স্থান কাল ও পাত্রভেদে জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানেরও সাধারণ নিয়মের কিছু না কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াই থাকে আর অর্থশাস্ত্রের এই কট নীতি কি এতই অপরিবর্ত্তনীয়? আগে চাউলের দর কমাইয়া লও তবে উহার দর যাহাতে আর বাড়িতে না পারে সেই পরিমাণ চাউল দেশে মজুত রাখিয়া অবশিষ্টাংশ স্বচ্ছন্দে বিদেশে ছাড়িয়া দাও কোনই আপত্তির কারণ নাই। কিন্তু এখন যে ভাবে খাদ্যশস্যের রপ্তানি চলিতেছে অর্থনীতিবিদ্‌গণ যাহাই বলুন আমাদের ত মনে হয় ইহা দ্বারা আমরা দেশের ধনাগম বৃদ্ধি করিতেছি বটে কিন্তু তাহা আমাদের বল বীর্য্য স্বাস্থ্য আয়ু—এক কথায় আমাদের যথাসর্ব্বস্ব বিনিময় করিয়া। আর সেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে লোক মরিয়াছিল—তখন দূর দেশ হইতে এত সহজে ও অল্প সময়ে খাদ্যশস্য আমদানী করিবার সুবিধা ছিল না বলিয়া—শুধু চাউলের দর বৃদ্ধি হওয়ার জন্য নয়।

কেহ কেহ মনে করেন পাটের চাষ কমাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে বেশী পরিমাণে খাদ্যশস্যের আবাদ করিলে অথবা চাকরী সমস্যার একটা সমাধান করিতে পারিলে কিংবা জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত (birth control) করিবার নূতন হুজুগে যোগদান করিলেই আমাদের বর্ত্তমান অন্নকষ্টের অনেকটা লাঘব হইবে। কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে পথই আমরা অবলম্বন করি না কেন লক্ষ লক্ষ মণ শস্য অধিক উৎপাদিত হইলেও অথবা চোরের উপর রাগ করিয়া মাটিতে ভাত খাওয়া নীতির অনুসরণ করিয়া দেশের জন সংখ্যা কমাইয়া দিলেও আমাদের খাদ্য শস্যের উপর বৈদেশিকগণের অবাধ বাণিজ্যের প্রভাব বর্ত্তমান থাকিতে তাহার মূল্য বড় বেশী হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই—কারণ দূর ভবিষ্যতেও বিদেশী ক্রেতাগণের অর্থের কখনও অপ্রতুল হইবে বলিয়া মনে হয় না।

শিশু মৃত্যুসংখ্যাও ক্রমশ অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ ধুয়া ধরিয়াছেন—দেশী দাইগুলিই যত অনিষ্টের মূল হয় তাহাদিগকে আমাদের নিকট পাঠাইয়া দাও নয় ত আমাদের শিক্ষা মত তাহাদিগকে সংস্কৃত (reform) করিয়া অবিলম্বে আঁতুড় ঘরে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর—নতুবা এ শিশুমৃত্যু কিছুতেই নিবারিত হইবার নয়। কিন্তু তাহারা মনে করে সেই প্রকাণ্ড ভুলটা রহিয়া গিয়াছে পাশ্চাত্যের মোহে অন্ধ আমরা তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। ডক্টর আনি বেসান্ট (Dr Annie Besant) গত জানুয়ারী মাসে দিল্লী নগরীতে All Parties Conference এ সম্মিলিত দেশীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায়গণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

Did they know that average life in India was 25 years? Did they realise that epidemics took almost double the toll of life compared with western countries, *because the Indian children were born of starving mothers and were generated by starving fathers*

(A B Patrika Jan 27 1925)

Chronic starvation বা জন্মাবধি উপযুক্ত খাদ্যের অভাবই যে আমাদের শিশুমৃত্যু ও জাতীয় ধ্বংসের মূল কারণ এই বর্ষীয়সী মহিলার পূর্ব্বে কোন দেশীয় বা বিদেশীয় চিকিৎসক বা অন্য কেহই এই খাঁটি কথা এত বড় গলায় ও এমন স্পষ্ট ভাষায় বলেন নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিশুরক্ষার উপায় ও নিয়মগুলি সর্ব্ব সাধারণকে বুঝাইবার ও দেখাইবার জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন বা শিক্ষিতা ধাত্রীর আবশ্যকতা যে একেবারেই নাই এ কথা আমরাও স্বীকার করি না কিন্তু সর্ব্বাগ্রে মূল কারণের দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না করিয়া এবং তাহার প্রতিকারে যত্নবান্ না হইয়া শুধু শিশুমঙ্গল মাতৃমঙ্গল ও ধাত্রীমঙ্গলের অভিনয়ে অর্থব্যয় করা ঘোড়ার সম্মুখ ভাগে গাড়ী যোতার মতই নিরর্থক

বলিয়া-মনে হয় না কি ? মাটীর নীচে অন্ধকারে বাসা বাঁধিয়া দুরন্ত কীট বৃক্ষের মূল ধ্বংস করিতেছে অথচ তাহার মস্তকে নিরন্তর জল সেচনের জন্য চারিদিকে দমকল বসাইবার বিরাট আয়োজন চলিতেছে— ব্যবস্থা মন্দ নয় !

অনশনক্লিষ্ট দুর্ব্বল জাতির সন্তানদিগকে রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়াই জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। শুধু টনিক খাওয়াইয়া ইনজেক্‌শন দিয়া বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীব বিশেষের gland দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্য ও সজীবতা ফিরাইয়া আনিবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করা কোন বাতিকগ্রস্ত (maniacal) বৈজ্ঞানিক ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভবপর বলিয়া ত বোধ হয় না। অন্ন সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিলেই অর্থসমস্যা ও স্বাস্থ্যসমস্যার অনেকটা সমাধান হইয়া যাইবে কিন্তু তাহা না করিয়া সমাজ সংস্কার ধাত্রী সংস্কার প্রভৃতি যিনি যতই করুন এ জাতির ধ্বংসরোধ কিছুতেই রুদ্ধ হইবার নয়।*

* মুন্সীগঞ্জ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের হাসপাতালের ভিত্তিস্থাপন—৬ই মে রবিবার বঙ্গের জাতীয় শিক্ষার এক স্মরনীয় দিন। মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক এই হাসপাতালের ভিত্তিস্থাপিত হইয়াছে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ রায় এম এ এম বি মহাশয়ের জীবনব্যাপী সাধনা ও স্বার্থত্যাগ ভগবৎ কৃপায় সাফল্য লাভ করিল। ঐ সভাস্থলে শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ রায় মহাশয়—১ লক্ষ টাকা এবং মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী মহাশয় ৫ হাজার টাকা এবং শ্রীযুক্ত বাবু মনোমহন পাণ্ডে মহাশয় বাৎসরিক ৫ হাজার টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করেন।

মহাত্মা গান্ধি চিকিৎসা ও চিকিৎসক সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করেন। Prevention is better than Cur —এই সত্যকেই তিনি সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছেন। যাহাতে রোগ না হয় এই চেষ্টা প্রত্যেক চিকিৎসক ও সমাজহিতৈষীর সর্ব্বতোভাবে করা কর্ত্তব্য। চিকিৎসক সংখ্যা ও হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে যে সমাজের উন্নতি হইল তাহা মহাত্মা মনে করেন না। বরং তিনি চিকিৎসকের ব্যবসাবুদ্ধি ও বিজ্ঞাপন দ্বারা পেটেন্ট ঔষধ বিক্রয়ের প্রভৃত নিন্দা করেন।

ঈশ্বরের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া অতি বিনীতভাবে তিনি ধুরন্ধরবর্গকে সাবধান করিয়া দেন যেন ভবিষ্যতে তাহারা প্রকৃত জনসেবা দ্বারা এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটী অনুপ্রাণিত ও কার্য্যকরী করেন May this institution be of use to the real suffuers

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্"

১৪শ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৩২ সাল { ৩য় সংখ্যা

স্বাভাবিক উপায়ে রোগ-আরোগ্য

কোন ব্যাধি উপস্থিত হইলে রোগী এবং চিকিৎসক উভয়কেই একযোগে যাহাতে রোগ আরোগ্য হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টাকেই চিকিৎসা বলা হয়। এই চিকিৎসা যথাসম্ভব স্বাভাবিক উপায় দ্বারা হওয়া উচিত। যে সকল অনিয়ম জন্য বা শরীরের দুর্ব্বলতা জন্য রোগ প্রকাশ পায় বা শরীরকে আক্রমণ করে তাহা বিশদরূপে আলোচনা করিয়া এবং স্বাভাবিক পন্থাগুলি কার্য্যকরী করিয়া রোগ নিবারণ করিবার চেষ্টাই প্রকৃত চিকিৎসা। ইহাতে রোগের মূল নষ্ট হয় এবং পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। এই উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক উপায়ে রোগ আরোগ্য প্রবন্ধে ধারাবাহিক ক্রমে আমাদের দেশের প্রচলিত রোগ সমূহ একে একে আলোচিত হইবে এবং প্রতি রোগ-প্রসঙ্গে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি সবিস্তার বুঝান হইবে।

১। রোগ বর্ণনা ২। প্রাদুর্ভাব ৩। কারণ বা হেতু ৪। শরীরের মধ্যে পরিবর্ত্তন ৫। লক্ষণ সমূহ ৬। রোগ কালীন অন্য উপসর্গ বা আন্তর ব্যাধি সকল ৭। রোগ ভোগ কাল ৮। রোগমুক্তি পদ্ধতি ৯। সাধারণ প্রতিষেধ বা রোগ আক্রমণ রোধ ১০। রোগ নির্ণয়

১১। চিকিৎসা—

(ক) স্বাভাবিক উপায় দ্বারা।

(১) রোগগ্রস্ত স্থানের (স্থানিক) চিকিৎসা।

শরীরের দুর্ব্বলতা বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার হ্রাস হইলে এই সকল জীবাণু শক্তিগত ও সংখ্যাগতভাবে বৃদ্ধি পায় এবং আমাশয় রোগের লক্ষণ সকল দেখা যায়। পূর্ব্বে যাহারা শান্তিতে মনুষ্য দেহে বাস করিতেছিল তাহারাই ভীষণ ভাবাপন্ন হইয়া রোগ উৎপন্ন করে অথবা দূষিত জল মল ও আহার্য্য দ্বারা শরীর মধ্যে প্রবে কবিয়া রোগ উ পাদন করিয়া থাকে।

মক্ষিকা পোকা মাকড় প্র তি এ রোগ বহন করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। মিবার কোরকগুলি মক্ষিকা দ্বারা গলাধঃকৃত হওয়ার পর দুগ্ধদব্য বা পানীয় জলমধ্যে পুনবায় সংক্রামিত হয়। এই জন্যই রান্না ঘর প্রভৃতিতে মাছির প্রবেশাধিকার দিতে চিকিৎসকগণ এত নিষেধ করেন।

শরীরের মধ্যে পরিবর্ত্তন
(নিদান Pathological anatomy)।

বৃহদন্ত্রের গাত্রের তিনটি আস্তরণের মধ্যে সর্ব্ব নিম্ন আবরণটির নাম শ্লেষ্মাধরা কলা। আমাশয় রোগে প্রধানত এই আস্তরণ বা কলা এবং প্রায়ই দ্বিতীয় কলাসহ স্ফীত হয় এবং উহাদের মধ্যে রক্তাধিক্য হইয়া থাকে। অন্ত্রমধ্যে শ্লেষ্মার আধিক্য হয় এবং গ্রন্থি সকল স্ফীত হয় এবং বিদারিত হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাধরা কলা স্থানে স্থানে নরম হইয়া যায় এবং স্খলিত হয় এবং ক্ষত উৎপাদিত হয়। শিশুদিগের মধ্যে ইহা বেশী হইয়া থাকে। আরোগ্যের পর মসৃণ দাগ থাকে।

পচধরা আমাশয় রোগে প্রদাহ খুব বেশী হয় এবং সেই জন্য বড় বড় ঘা হইয়া থাকে। বৃহদন্ত্রের সর্ব্ব বহিস্থ আস্তরণের মাংসময় প্রাচীর পর্য্যন্ত এই সকল ঘা ভেদ করিয়া যায়। আরোগ্য হইলে আরোগ্য স্থান সঙ্কুচিত হয় এবং অন্ত্রের মধ্যস্থ ছিদ্রপথকে সঙ্কুচিত করিয়া দেয়। অন্ত্রমূলিকা গ্রন্থিসকল (Mesenteric glands) স্ফীত হয়। পরে পাকিয়া স্ফোটকে পরিণত হয়। এইরূপে যকৃৎ মধ্যেও স্ফোটক হইতে পারে।

হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী সকল মেদময় অপকর্ষ (fatty degeneration) প্রাপ্ত হয় এবং ভিতরকার পরিসর কমিয়া যায় ও প্লীহা [illegible] ধারণ করে।

কঠিন অবস্থায় এই প্রদাহ ক্ষুদ্রান্ত্রের নিম্নাংশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়।

লক্ষণ [illegible] ক্ষুধা কমিয়া যায়। [illegible] অল্প জ্বর বোধ হয়। মল ক্রমে [illegible] পরিবর্ত্তিত হয় এবং অল্প বিস্তর রক্ত ও পূ[illegible] মিশ্রিত হইয়া আঠাল ভাব ধারণ করে। [illegible] যেন দগ্ধ হয়। জিহ্বা [illegible] রোগীকে [illegible] দেখা যায়। নাড়ী ক্ষী[illegible] কঠিন অবস্থায় মিনিটে [illegible] স্পন্দন [illegible] অল্প ও ঘোর [illegible] হয়। [illegible] হইতে দিবা [illegible]

মৃদু অবস্থায় জ্বর [illegible] থাকে। কঠিন অবস্থায় আক্রমণ হঠাৎ কম্প [illegible] হইয়া থাকে। জ্বর বেশী হয় এবং তাহার বিরাম [illegible]। জিহ্বা শুষ্ক ও চকচকে দেখা যায়। [illegible] পেটের সূচবিদ্ধবৎ তীব্র বেদনা [illegible] মুহুর্মুহু মলত্যাগেচ্ছা ও অধিকতর রক্ত পূ[illegible] অতি কুন্থনসহ নির্গত হয়। [illegible] জ্বর বেশী হয় একটু একটু [illegible] বাহ্যের বেগ আসে [illegible] মলের সহিত অন্ত্র [illegible] আবরণ সমূহ পরিত্যক্ত হয় এবং অতিশয় দুর্গন্ধ পাওয়া যায় বমনেচ্ছ মুহুর্মুহু হই উঠে রোগী প্রলাপ বকিয়া থাকে এবং [illegible] হয়। দুর্ব্বলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। নাড়ী [illegible] ও দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়া থাকে।

রোগকালীন জটিল উপসর্গ সমূহ

—প্রথম হইতে রোগীর নিয়মমত যত্ন এবং স্বাভাবিক উপায়ে চিকিৎসা হইলে অন্য উপসর্গ প্রায় দেখা যায় না। তবে কঠিন অবস্থার রোগে অচিকিৎসা ও অবহেলার ফলে অন্ত্রের আবরণে ঝাঝরীর ন্যায় বহু

ছিদ্র হইয়া উদর দেশের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহ রক্ষাকারী কোষ্ঠধরা কলার প্রদাহ (Peritonitis) জন্য রোগীর মৃত্যু হইতে দেখা যায়। ফুসফুস বৃক্ক প্লীহা ও বৃহৎ স্ফোটক দেখা দিলে রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে।

রোগ ভোগকাল ও রোগ মুক্তি পদ্ধতি—রোগের হেতু সমূহের উপর তা নির্ভর করে। মৃদু রোগ প্রায় সপ্তাহে আরোগ্য হয়। কঠিন হইলে ২।৩ সপ্তাহ সময় লাগে বা [illegible]মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়।

সাধারণ প্রতিষেধ বা রোগ আক্রমণ রোধ—এমিবা অথবা ব্যাসিলাস জনিত উদরাময় পাকাশয়ের অভ্যন্তরে ক্রামক রোগের ন্যায় দূষিত খাদ্য বা পানীয়ের সহিত বা অপরিষ্কৃত অঙ্গুলি দ্বারা মুখমধ্যে নীত হয়। এই সকল রোগ বীজাণু পাকস্থলী অতিক্রম করিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও পরে বৃহদন্ত্র আক্রমণ করে।

আবরণযুক্ত আমিবাই প্রধান সংক্রামক। আবরণ শূন্য অমিবা পাকস্থলীর পাচকরসে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আবরণযুক্ত এমিবা পাচকরসে ধ্বংস হয় না। রোগীর শরীর হইতে মলের সহিত পরিত্যক্ত হইবার পর বহুকাল পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিবার ক্ষমতা অব্যাহত রাখে।

আমাদের দেশের আর্দ্রভূমি এবং জলীয় বাষ্প পূর্ণ বায়ুমণ্ডল এই সকল আবরণযুক্ত আমিবার বাঁচিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা করিয়া দেয়। ইহারা নানাভাবে বাহিত ও পরিচালিত হইয়া পানীয় জল [illegible] মধ্যে ক্রমে আশ্রয় পায়।

মাছি ও অন্যান্য কীটেরা এই সংক্রামক জীবগুলিকে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করিবার প্রধান সহায়। পরীক্ষা দ্বারা নিম্নলিখিত তথ্যগুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

১। মক্ষিকারা রোগ জীবাণুপূর্ণ মল ভক্ষণের সহিত আবরণযুক্ত এমিবা (Encysted Amoeba) ও অন্যান্য জীবাণু নিজেদের পাকাশয়ের মধ্যে গ্রহণ করে।

২। এই সকল আবরণযুক্ত এমিবারা মক্ষিকার উদরে কোনরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত না হইয়া অবিকৃত অবস্থায় মক্ষিকার মলের সহিত পরিত্যক্ত হয়।

৩। মক্ষিকারা ৪ মিনিট পূর্ব্বে যে সকল দ্রব্যাদি পাকাশয়ে প্রবেশ করাইয়া ছিল—তাহা তাহাদের মলের সহিত সদ্য পরিত্যাগ করিতে পারে।

৪। মক্ষিকারা খাদ্য দ্রব্যের উপর বসিয়া খাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারই উপরে মল পরিত্যাগ করে কিম্বা বমন করে। তদ্ভিন্ন উহাদের পদ ও পক্ষপুটদ্বয়ে মল বা রোগ বীজাণু সহস্র সহস্র সংখ্যায় লাগিয়া থাকে। এই জন্যই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জীবাণুজনিত রোগসকল এত দ্রুত বিস্তৃত হয়।

উপরোক্ত মন্তব্যসকল অকাট্য প্রমাণ দ্বারা মক্ষিকাদের বংশ বৃদ্ধির স্থানগুলিকে সমূলে ধ্বংস করিবার প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। আমাদের আবাস গৃহ এবং আহারাদির স্থানে যাহাতে মক্ষিকা বা অন্যান্য কীট পতঙ্গাদি অবাধে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিতে না পারে তাহা সকলের যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

নিম্নলিখিত উপায় গুলি প্রতিপালন করিলে এমিবা বা ব্যাসিলস জনিত উদরাময় নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না।

১। মনুষ্য দেহ মধ্যে এই সকল জীবাণু আবরণযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

২। আবরণযুক্ত ও মুক্ত এমিবারা মনুষ্য দেহ হইতে মলের সহিত পরিত্যক্ত হইলে যত শীঘ্র সম্ভব বিশোধক দ্রব্য দ্বারা বা অন্য উপায়ে ধ্বংস করা আবশ্যক।

[illegible]। আবরণযুক্ত এমিবা দ্বারা যাহাতে বাসভূমি দূষিত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

৪। সংক্রামণের সকল প্রচ্ছন্ন উৎপত্তি-স্থলকে মক্ষিকা এবং অন্যান্য কীট পতঙ্গাদি হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

রোগবাহক কি এবং তাহাদের দ্বারা রোগ কিরূপে সংক্রামিত হয় তৎসম্বন্ধে স্বাস্থ্য সমাচারের পাঠকগণ

কিছু কিছু অবগত আছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়—কোন মনুষ্য বা জন্তুর শরীর হইতে রোগ উৎপাদনকারী বিষ (জীবাণু বা অলক্ষ্য বিষ) অন্য দেহে গিয়া রোগ উৎপাদন করিলে সেই মনুষ্য বা জন্তুকে রোগ বাহক বলা হয়।

৫। বাহক দ্বারা রোগ বিস্তৃতি বন্ধ করা বিধেয়। দুই প্রকার রোগ বাহক দেখা যায়—

(ক) **আরোগ্যোন্মুখ রোগী**—যাহারা এই রোগের সর্ব্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে সকল লক্ষণ নিবারণ হইয়া কেবল মলের সহিত এমিবা পরিত্যক্ত হইতেছে তাহারা রোগ বাহকের কার্য্য করে।

(খ) **সংস্পর্শ বাহক** অর্থাৎ যাহাদের পূর্ব্বে আদৌ রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই কিন্তু তাহারা মলের সহিত রোগ জীবাণু পরিত্যাগ করিয়া রোগ বিস্তারের সহায়তা করিতেছে।

দুই শ্রেণীর বাহকেরা মলসহ পরিত্যক্ত আবরণযুক্ত এমিবা দ্বারা অপরের মধ্যে রোগ বিস্তার করিতেছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শতকরা ১০।১৫ জন এইরূপ আমাশয় রোগ জীবাণুর বাহক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে (Acton and Knowles

প্রত্যেক চিকিৎসকের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে আবরণযুক্ত এমিবাগুলি পরিব্যাপ্ত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার।

এই জন্য যে সকল কার্য্য প্রণালী গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

(১) রোগগ্রস্ত স্থানের মল সকল পরিশোধন করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষাপযোগীভাবে নিকাশ করিতে হইবে।

(২) ব্যবহার্য্য জলকে সংক্রামণ হইতে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিতে হইবে এবং পানীয় জল ও দুগ্ধকে সকল সময়ে ফুটাইয়া খাইতে হইবে।

(৩) জমিতে উৎপন্ন ফল ও তরকারি না ধুইয়া ব্যবহার করিবে না।

(৪) মক্ষিকা ও অন্যান্য পতঙ্গাদি সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করিবে। আহারের স্থান ও আহার্য্য সকল মক্ষিকা ও কীটাদি হইতে জাল দ্বারা রক্ষা করিবে এবং সাধারণ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে যাহাতে মক্ষিকা বা পতঙ্গাদি বংশ বৃদ্ধি করিবার আদৌ সুবিধা না পায়।

রোগ নির্ণয়—

মল পরীক্ষার উপর রোগ নির্ণয় পূর্ণ মাত্রায় নির্ভর করে। রোগ এমিবা জনিত না ব্যাসিলাস জনিত তাহা ঠিক করিবার জন্য অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা যথারীতি সম্পূর্ণ পরীক্ষা দ্বারা কেবলই এই বিষয়ের সঠিক নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে।

সাধারণ চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য সেবকদের এই সকল সুযোগ প্রায় নাই বা তাহাদের দ্বারা হওয়াও সম্ভবপর নহে। তবে মোটামুটি ভাবে সদ্য পরিত্যক্ত মলের লিটমস কাগজের উপর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া (Reaction) পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একরূপ ঠিক করা যায়। এমিবাজনিত আমাশয়ের মলে অম্লত্ব অবস্থা থাকে। নীল লিটমস কাগজ এই মল সংস্পর্শে লাল হইয়া যায়। এবং ব্যাসিলাস জনিত মলে ক্ষার ভাব বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং লাল লিটমস কাগজ তাহার স্পর্শে নীল হইয়া যায়।

ব্যাসিলাস জনিত রোগের মলের রক্ত লালবর্ণ থাকে এবং মল ও পরিমাণে কম কম হয়। এমিবা জনিত রোগের মলের অন্যান্য রক্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া কাল্চিটে হয় এবং মল তরল ও পরিমাণে বেশী বেশী হইয়া থাকে। কখন কখন উভয় প্রকার কারণ বর্ত্তমান দেখা যায়। যথা এমিবা জনিত রোগীর উপর ব্যাসিলস আক্রমণ করে বা ব্যাসিলাস জনিত রোগীর উপর এমিবা আক্রমণ করে। এইরূপ অবস্থাকে মিশ্রিত সংক্রামন (Mixed infection) বলা হয়।

এমিটিন নামক ঔষধ রোগীর ত্বকের নিম্নে দুই দিন উপর্য্যুপরি ইনজেক্শন করিলে যদি রোগ এমিবা জনিত হয় তাহা হইলে তাহা আরোগ্যমুখ হয়। সেই জন্য আমাশয় রোগের প্রথমেই এমিটিন ইনজেকসন

করা আবশ্যক। যদি কোন উপকার না হয় তবে ব্যাসিলাস জনিত রোগ নির্দ্ধারণ করিয়া উপযুক্তমত চিকিৎসা করিবে।

১১। চিকিৎসা।—

কোন রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে যাহাতে চিকিৎসা দ্বারা রোগীর কোন ক্ষতি না হয় তাহা চিকিৎসকের সর্ব্বতোভাবে মনে রাখা কর্ত্তব্য। রোগ নিরূপণ হইলে চিকিৎসক চিকিৎসা করিতে সুবিধা পান। তবে আমাদের গরীব দেশে যেখানে ১ জনের চিকিৎসার জন্য এক জন শিক্ষিত চিকিৎসক নাই সেখানে স্বাস্থ্য সেবকেরা এবং জননায়কেরা যাহাতে এই রোগ বিধিমত চিকিৎসা করিতে পারেন এবং সংক্রামক রোগের প্রারম্ভে রোগ বিস্তার প্রতিরোধ করিতে পারেন সেইরূপ বিধিসকল আলোচনা করিয়া এই আমাশয় রোগের চিকিৎসা আলোচিত হইল।

প্রতীকারক কার্য্য প্রণালীগুলি নিম্নলিখিতভাবে আলোচিত হইবে।

১। আমাশয় রোগের ও স্বাভাবিক উপায় দ্বারা চিকিৎসা।

২। স্থানিক চিকিৎসা—(Local treatment) অর্থাৎ রোগ দ্বারা শরীরের যে সকল অংশ দুষ্ট হইয়াছে তাহাদের উপর ঔষধ প্রয়োগ।

৩। শরীরের প্রকৃতি ও ধাতুগণের দোষ সংশোধন করিবার চিকিৎসা। (Constitutional treatment)

৪। বিশেষ চিকিৎসা—যেমন ইনজেকসন দ্বারা।

১। স্বাভাবিক উপায় দ্বারা চিকিৎসা (Treatment of the disease by Natural methods)—প্রথমত অন্নবহানালীর (Alimentary Canal) মধ্যে যে সকল সঞ্চিত পুরাতন আবদ্ধ মল আছে তাহা পরিষ্কার করিতে হইবে এবং যথা সম্ভব তাহাকে বিশ্রাম দিতে হইবে। কারণ রোগগ্রস্ত স্থানকে বিশ্রাম দিয়া প্রকৃতি রোগ আরোগ্য করেন। যে কোন দ্রব্য অন্নবহানালীকে উত্তেজিত করিতে পারে তাহা স্থানান্তরিত করিবে বা সেইরূপ দ্রব্যকে একেবারে সেখানে প্রবেশ করিতে দিবে না। যদি পাকস্থলীতে খাদ্য দ্রব্য অপরিপক্ক অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে রোগীকে ঈষদুষ্ণ জল যথেষ্ট পান করাইয়া বমি করাইবে, যতক্ষণ না পাকস্থলী খালি হয়।

পরে রোগীকে কিছু বিশ্রাম করিতে দিয়া নিম্নান্ত্র অন্ত্রধৌতি * দ্বারা পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করিবে। দুই পাইন্ট বা এক বড় বোতল ঈষদুষ্ণ গরম জল বা Normal Saline দ্বারা অন্ত্রধৌতি ক্রিয়া করাইবে এবং যত বেশীক্ষণ এই জল রোগী ভিতরে রাখিতে পারে ততই ভাল। যদি রোগী বেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে প্যাড বা তোয়ালে দ্বারা মলদ্বার চাপিয়া রাখিবে তাহাতে কুন্থন ক্রমশ কমিয়া যায়। পরে রোগী বিছানার উপর পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিবে যাহাতে অন্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট জল উত্তমরূপে অন্ত্রের গাত্রাভ্যন্তর ধুইয়া ফেলিতে পারে।

যদি জল শীঘ্র বাহির হইয়া আসে কিম্বা যদি পুরা ২ বোতল জল একেবারে লইতে সক্ষম না হয় তাহা হইলে এই অন্ত্রধৌতি ক্রিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু ঠাণ্ডা জল দ্বারা পুনরায় করাইবে।

এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা অন্নবহানালীর নীচের দিকে যাহা কিছু বিষাক্ত উত্তেজক দ্রব্য ছিল তাহা বহিষ্কৃত হইয়া যাইবে।

এইরূপে স্বাভাবিক চিকিৎসা দ্বারা রোগের প্রথম অবস্থায় (যখন পথ্যান্ত নিঃসৃত পদার্থ শ্লেষ্মাশূন্য মলময় এবং বিনা বেদনায় নির্গত হয়) সকল খাদ্য দ্রব্য বন্ধ করিয়া ভোগকাল কমান বা রোগ আরোগ্য করা যাইতে পারে। যদি পেটে খুব উত্তাপ বা বেদনা থাকে তাহা হইলে রোগীর সহ্যমত গরম বা ঠাণ্ডা জলে ভিজা গামছা বা তোয়ালে বেশ করিয়া নিঙড়াইয়া জলশূন্য করিয়া পেটের উপর বাঁধিয়া দিবে।

যদি বেদনা বা কুন্থন পূর্ব্ববৎ থাকে তাহা হইলে

---

* অন্ত্রধৌতি সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞান বহুল পরিচয় আমাদের অন্ত্রধৌতি নামক পুস্তকে পাওয়া যায়। মূল্য ৵ মাত্র ডাঃ মাঃ পৃথক।

(উষ্ণ গরম জলে রোগীকে ১০।১২ মিনিট যাবৎ (Sitz bath যাহাতে কোমর পর্য্যন্ত জলে ডুবে) কটিস্নান করাইবে। পরে তোয়ালে দ্বারা বেশ করিয়া শুষ্ক করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া পায়ের উপর গরম জলের থলি বা বোতল দিবে। রোগীকে যথেষ্ট পরিমাণ ঈষদুষ্ণ বা ঠাণ্ডাজল খাইতে দিবে। কিন্তু দুই তিন দিন পর্য্যন্ত কোন খাদ্য দিবে না।

যদি পেটকামড়ানি বা শূলবৎ বেদনা তবুও থাকে তাহা হইলে অন্ত্রমধ্যে কোন উত্তেজক দ্রব্য তখনও আছে তাহা অনুমান করিয়া পুনরায় অন্ত্রধৌতি করাইবে। এই প্রকারে প্রত্যহ দুইবার অন্ত্রধৌতি করান যাইতে পারে এবং অন্ত্র সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হইলে জলের মাত্রা কমাইবে। প্রত্যেক দাস্তের পর অল্প পরিমাণ অর্থাৎ ৪ হইতে ৬ আউন্স অতি উত্তপ্ত জল পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করিবে। এই জল ক্রমে ক্রমে সারা ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের মধ্যে শোষিত হয় এবং এইরূপে রোগগ্রস্ত স্থান সকল উপশমিত হইবে এবং প্রদাহ কমিয়া যাইবে।

যখন মলে দুর্গন্ধ পাইবে রোগীকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবে এবং মলকে ফিনাইল প্রভৃতি দ্বারা বিশোধন করিবে।

রোগীর জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিবার চিকিৎসার পদ্ধতি স্থিরীকৃত করিবে। যদি রোগী খুব দুর্ব্বল হয় জ্বরের সময় বদ্ধ ঘরের ভিতর ঈষদুষ্ণ জলে তাহার গাত্র মুছাইবে। পরে অতি সত্বর গাত্র মুছাইয়া দিয়া জানালা দরজা খুলিয়া দিবে দেখিবে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে। সর্ব্বদা হাত পা গরম রাখিবে। পেটকামড়ানি ও পেটের বেদনার জন্য গরম জলের স্বেদ ১০।১৫ মিনিট ধরিয়া দিবে এবং যতক্ষণ না বেদনার লাঘব হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত বারে বারে দিতে হইবে।

রোগীর গৃহে মুক্তবায়ু বেশ চলাচল করিবে ও রৌদ্রও খুব আসিবে। রোগীকে যথাসম্ভব স্থিরভাবে থাকিতে হইবে ও যত ইচ্ছা নিদ্রা যাইতে দিবে। যদি ক্ষুধায় কাতর হয় তবে অল্প পরিমাণ ঈষদুষ্ণ জল খাইতে দিবে। আরোগ্যন্মুখ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন আহার্য্য দিবে না। রোগের বৃদ্ধি অবস্থায় ও জ্বরের সময় খাইতে দিলে অন্ত্র মধ্যের প্রদাহ বাড়িয়া যাইবে এবং তাহে বেশী বৃদ্ধি হবে ও রোগীর কষ্ট বৃদ্ধি পাইবে। এই অবস্থায় খাদ্য দ্রব্য পরিপাক পাইবে না বা শরীর মধ্যে গৃহীত হইবে না। সেইজন্য আহার্য্য না দেওয়াই বিধেয়।

রোগ আরোগ্য অবস্থার চিকিৎসা —সুচিকিৎসার ফলে মলের সহিত রক্ত দেখা বন্ধ হইলে এবং অন্যান্য দোষাবহ লক্ষণ সকলের অবসান হইলে রোগ প্রায়ই আরোগ্যন্মুখ হয়।

ক্ষুধার উদ্রেকের সহিত রোগী খাইতে চাহিবে। এ সময় পথ্য সম্বন্ধে অনিয়ম হইলে রোগের পুনরাক্রমণ হইয়া থাকে এবং রোগী খুব বেশী কষ্ট পায়। অল্প অল্প তরল পথ্য দিয়া আরম্ভ করিবে। বার্লি ভাতের মাড় বা বোতলের খুব তরল জলবৎ পেয় অথবা ছানার জল অতি অল্প পরিমাণে আরম্ভ করিবে। পরে ঘোল নরম সুসিদ্ধ কাঁচকলা মণ্ড দিতে পারা যায়। সকল প্রকার লক্ষণ বিলুপ্ত হইবার তিন দিন পরে নরম সুসিদ্ধ অন্ন অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে। কঠিন খাদ্যের পরিমাণ খুব সাবধানতার সহিত ব্যবস্থা দিতে হইবে এবং আস্তে আস্তে বাড়াইয়া ঠিক নিয়মিত সময়ে দিবে।

রোগী আরোগ্যন্মুখ অবস্থায় খুব সাবধানে থাকিবে এবং উদর গহ্বরকে বেশ করিয়া ঠাণ্ডা লাগা হইতে রক্ষা করিবে।

যে সকল খাদ্য অন্ত্র মধ্যস্থিত শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিকে উত্তেজিত করে তাহা একেবারে বর্জ্জন করিবে। মদ্য, মাংস বা কোনরূপ আমিষ আহার ডাল বা মশলা বা উগ্র চাটনি নিষিদ্ধ। রোগীর উন্নতির সহিত পথ্য আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তন করিবে। সিদ্ধ করা ফল বেদানা ডালিম, ফলের রস নরম সুসিদ্ধ ভাত বা মণ্ড প্রশস্ত। যে সকল আহার্য্য দ্বারা কোষ্ঠ কাঠিন্য হয় তাহা একেবারে দিবে না। স্বাভাবিক মল না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ

অন্ততঃ একবার করিয়া অন্ত্রধৌতি দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবে।

স্থানিক চিকিৎসা
(Local treatment)

এইরোগে বৃহদন্ত্রের নিম্নাংশে এ গুহ্যদ্বারে (Rectum) প্রথমেই প্রদাহ ও ক্ষত হইয়া থাকে। সেই জন্য অন্ত্রের নিম্নাংশকে অন্ত্রধৌতি দ্বারা স্থানীয় চিকিৎসা আবশ্যক।

এই রোগ এমিবা ঘটিত না ব্যাসিলস ঘটিত তাহা কেবল বিশেষজ্ঞগণই স্থির করিতে পারেন। সাধারণ চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য সেবকদের নির্দ্ধারণ করিবার সুবিধা নাই। সেই জন্য যাহাতে সহজ ও নিরাপদ ভাবে চিকিৎসা হইতে পারে তাহাই এস্থানে বিবৃত হইল।

(ক) নিম্ন লবণাদিক লোসন (৫ গ্রেণ ১ আউন্স জলে) দ্বারা ধৌত করিবে। অথবা

(খ) লবণ জলে (৭ গ্রেণ বা ৪৫ রতি লবণ ফুটান জল ১ পাইণ্ট) ধৌত করিবে।

পরে নিম্নলিখিত আরোগ্যকারী ধুইবার ঔষধ পর্য্যায় ক্রমে পেটের মধ্যে ধারণ করিবে।

১। Methylene Blue লোসন (Gr ১ to a pint) তুল্যভাগ ঈষদুষ্ণ জল সহ।

২। এমিটিন এমপ্যুল ১ গ্রেন ভাঙিয়া ৮ আউন্স স্বাভাবিক লবণ জলে দি

এইরূপ অন্ত্রধৌতি দ্বারা পুরাতন মলগুটিকাসমূহ বাহির হইয়া যায়। অন্ত্র মধ্যে সঞ্চিত যে সকল শ্লেষ্মা আবর্জ্জনার মধ্যে এমিবা বা ব্যাসিলাই প্রচুর পরিমাণে জন্মায় তাহারা ধৌত ক্রিয়ার দ্বারা স্থানচ্যুত হয় এবং এমিবা বা ব্যাসিলস ধ্বংস প্রাপ্ত হয় কিন্তু রোগীর কোন ক্ষতি হয় না।

কখন কখন ম্যালেরিয়া বীজাণুর জন্য আমাশয় রোগ হয় এবং এইসঙ্গে রোগীর ম্যালেরিয়া জ্বর ও হইয়া থাকে। কুইনাইন বাইহাইড্রোক্লোর ২ গ্রেন এক পাইণ্ট লবনজলে দ্রব করিয়া—তাহার সাহায্যে প্রত্যহ এক বা দুই বার অন্ত্রধৌতি করাইবে। রক্ত পরীক্ষা দ্বারা ম্যালেরিয়া জ্বর স্থির হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিকিৎসা করা আবশ্যক।

যাহারা ব্যাপকভাবে কঠিন অবস্থায় রোগ দেখা যাইবে তাহাতে এ প্রক্রিয়া সর্ব্বদাই প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩। শরীরের প্রকৃতি বা ধাতু-সকলের দোষসংশোধন চিকিৎসা
(Constitutional treatment)

আমাশয় রোগের উৎপাদক এমিবা বা বাকটিরিয় সুস্থ ভাবে যাহারা কোন প্রকার রোগ উৎপাদন করে না পারে। এবং ইহারা বহির্গত হইতে শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেও সহজে কোন রোগ উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যদি শরীরের ধাতু বা প্রকৃতি দোষযুক্ত হয় তবেই ইহারা দেহীকে আক্রমণ করিয়া রোগ উৎপাদন করে। রোগের কারণ বা হেতু আলোচনা সময় এই সকল বিষয় পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। তবে এই সকল কারণগুলি কতকগুলি ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা দূরীভূত হইয়া থাকে এবং শরীর মধ্যে বল ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া রোগ আরোগ্য সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল চিকিৎসা করিয়া যে সকল দেশীয় ঔষধে এই রোগের সর্ব্বতোমুখী উপকার দেখা গিয়াছে তাহাই এখানে ধাতু বা প্রকৃতি সংশোধন চিকিৎসার প্রসঙ্গে বিবৃত হইল।

(ক) **এক্‌স্ট্র্যাক্ট বেল ও ইন্দ্রযব লিকুইড**—এটা ১টা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের যোগ। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগণনাথ সেন সরস্বতী মতানুযায়ী কল্পতরু ড্রাগস লিমিটেড কোং দ্বারা এই এক্সট্র্যাক্ট তৈয়ারি করান। ইহাতে আতইচ বেলশুট মুথা ইন্দ্রযব কুচির ছাল বালা লোধ এবং ত্রিফলা যথাযোগ্য মাত্রায় বর্ত্তমান আছে এ বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই যোগ প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল ঔষধের একত্রীভূত ক্রিয়া—আমাশয় রোগে অনেকটা জোয়াণের ন্যায় কার্য্য করে। অন্ত্র মধ্য হইতে পুরাতন সঞ্চিত মল

---

* এই ঔষধ ব্যবহারে রোগীর প্রস্রাব নীলাভ হইয়া থাকে।

সহজ প্রাপ্য জিনিষ লইয়াই মাপ করা হইয়া থাকে। যে দেশের লোকের যাহাতে সুবিধা হইয়াছে সে দেশে সেইরূপেই মাপ করা চলিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে রতি (কুঁচ) বা টাকা ল'য়া ওজন

ইংরাজী ইঞ্চি ও ফরাসি মিটার মাপের কাঠি বা গজ।
চিত্র—১

করার প্রথা আছে। সের হিসাবে মাপ করার প্রথা আছে। আঙ্গুলের মাপ ধরিয়া দৈর্ঘ্য মাপ করার প্রথা আছে বিলাতে ইঞ্চি ফুট পাউণ্ড আউন্স প্রভৃতির চলন আছে। ফ্রান্সে মিটার প্রভৃতির চলন আছে। আগে যখন রেল বিস্তার ঘটে নাই তখন সে সেই দেশে নিজ নিজ দেশীয় মাপ চালাইতেন। এখন আর তাহা করিবার যো নাই—এখন সকলে মিলিয়া সাধারণ মাপ কতকগুলি মানিয়া লইয়াছে—কাজেই সেই মাপগুলি সকলকে জানিতে হয়—তাহা পরে দিতেছি।

মাপ করিতে গাইলে জলীয় জিনিষ (liquid) ও কঠিন (solid) জিনিষ এবং হাওয়ার মত জিনিষ (gas) এই তিন জাতীয় জিনিষের আলাদা মাপ করিতে হয়। সে সকল মাপ পরস্পর স্বতন্ত্র। তাই আলাদা আলাদা করিয়া মাপের কথা লিখিলাম।

কঠিন জিনিষের মাপ কয় প্রকার।—কঠিন জিনিষের মাপ সাধারণতঃ তিন প্রকারের।

(১) দৈর্ঘ্য মাপ—অর্থাৎ শুধু লম্বায় বা শুধু চওড়ায় বা শুধু মোটা বা আড়ে মাপ। শুধু এক এক দিকের মাপকে দৈর্ঘ্য মাপ বলে।

স্কোয়ার (বর্গ) ফেন্টি মিটারে ভাগ করা কাঠফলক।
চিত্র—২

একটি স্কোয়ার (বর্গ) সেন্টিমিটারকে স্কোয়ার মিলিমিটারে ভাগ করিয়া দেখান হইল। চিত্র—৩

(২) বর্গ মাপ—লম্বা ও চওড়া এই দুইটির পরস্পর গুণফল। অর্থাৎ যে কোনও জিনিষ যতখানি যায়গা জুড়িয়া থাকে তাহাকে তাহার বর্গমাপ (area) বলে।

(৩) ঘন মাপ (Volume)—অর্থাৎ লম্বা চওড়া

দশখানি A র মত চাকাতে একটি B র মত যষ্টি হইবে। B র মত ১০ খানি যষ্টি একত্রিত করিলে ১ খানি C র মত পাত হইবে এবং C র মত ১০ খানি পাত একত্রি করিলে D র মত একখানি ঘন চোকা হইবে।

চিত্র—৪

এই যে অত উঁচু বাড়ীতেও জল পৌঁছাইবে। অর্থাৎ যত বেশী উঁচু থেকে জল ছাড়া যায় প্রায় তত উঁচুতে অথবা তত জোড়ে নলের মুখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে। এই গোটা কথাটা লইয়া ডুস ও নাড়ীর (pulse) একটু আলোচনা করিব।

ডুস।—এ জিনিষটি আর কিছুই নয়—কেবল পেটের মধ্যে জল প্রবেশ করাইবার ছোট খাট চৌবাচ্চা কল। মলদ্বার বা যোনি পথে জল দিয়া ধুইবার জন্য ডুসের প্রয়োজন। পূর্ব্বে সেই বদলে এনিমা সিরিঞ্জ নামে একপ্রকারের [illegible] ব্যবহৃত হইত। সে [illegible] জল ধরিবার পাত্র (ডুস ক্যান) [illegible] (৩ হইতে ৬ ফুট লম্বা) রবারের নল আর মলদ্বারে বা যোনি [illegible] প্রবিষ্ট করাইবার জন্য কাচকড়ার (vul canite) নল বা রবারের ক্যাথিটার। কোন উঁচু [illegible] ডুসের জলপাত্রটিকে বসাইয়া বা টাঙ্গাইয়া তাহার তলার দিকের নলমুখে রবারের নলটি লাগাইয়া রবারের নলের অপরদিকে

ডুস রবারের নল ও ক্যাথিটার সমেত।

মলদ্বারের বা যোনি পথের জন্য যে কাঁচকড়ার নল আছে সেটি লাগাইলেই ডুসটিকে ঠিক করিয়া খাটান হইল।

এই ডুসের জলপাত্রের গায়ে লেখা [illegible] ২ ৩ প্রভৃতি সংখ্যা দ্বারা সেই ডুসক্যান বা পাত্রে কত পাইন্ট জল ধরে তাহা [illegible]। সাধারণতঃ তিন পাইন্ট (২ সের) জল একটি পূর্ণ বয়স্ক লোকের পেটের ভিতর তাহার মলদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট করান যায়। ডুসটিকে যত উঁচুতে টাঙ্গান হইবে [illegible] মলদ্বারের ভিতর জল যাইবে। পেটের ভিতর [illegible] বেগে সেই জলটি বাহির [illegible] ছাড়া তত বেশী জোরে জল প্রবিষ্ট হইলে [illegible] অনুভূত হয়— [illegible] উঁচু করিয়া সক্যানটিকে [illegible]।

পূর্ব্বে [illegible] সিরিঞ্জ নামক পিচকারী [illegible] মলদ্বারে [illegible] প্রবিষ্ট করান হইত। এই পিচকারীর মাঝখানের [illegible] বলটিতে চাপ দিলে সঙ্গে সঙ্গে পেটের মধ্যে জল যাইত। তাহাতে রোগীর কষ্ট হয়। [illegible] আজকাল উক্ত এনিমা সিরিঞ্জ একরকম উঠিয়া গিয়াছে। বায়ুর উপর হইতে নীচের দিকে যে চাপ আছে সেই চাপের ফলে ডুস দিয়া আজকাল মলদ্বার ধৌত করা হয়।

পেটের উপর ভাগে বাম দিকে পাকস্থলী বলিয়া যে যন্ত্রটি আছে আমরা যা কিছু খাই প্রথমে সেই খানেই জমে। বিষ খাইলে প্রথমে সেইখানেই বিষটি গিয়া পড়ে। এই জন্য বিষ খাইলে পেট ধুইবার দরকার হয় তাহাকে পাকস্থলীর ধৌতি (stomach washing) বলে। [illegible] করিবার জন্য মুখ দিয়া গলার ভিতর দিয়া পেটের মধ্যে একটা মোটা নল চালাইয়া দেওয়া হয়। ঐ নল দিয়া প্রচুর পরিমাণে সুধু জল বা ঔষধের জল দ্বারা পাকস্থলীটি [illegible] করা হয়। [illegible] মধ্যে জল ঢালিতে ঢালিতেই তাহা পাকস্থলীর মধ্যে যায় না। এই জন্য পাকস্থলীটাকে কতকটা জলে পূর্ণ করিয়া লইয়া নলের মধ্যে জল থাকিতে থাকিতেই নলটিকে উপুড় করিলেই পেটের মধ্যে যত জল আছে সে সব জলই বাহির হইয়া আসে। তাহার কারণ বায়ুর অধঃ চাপ ঐ জলকে চাপিয়া বাহির করে কিন্তু যদি ঐ নলটি খালি

১ ২ জ্বরে এক মিনিটে ১১ বার স্পন্দিত হয়।
১ ১২
১ ৪ ১৩
১ ৫ ১৭

টাইফয়েড জ্বরে নাড়ী অনুপাতে বাড়েনা—বরং অল্পে চলে।

এদেশে যত থার্মোমিটার ব্যবহৃত হয় তাহা ফারেনহিট নামক লোকের মাপের অনুযায়ী দাগ করা। বিলাতে সেণ্টিগ্রেড নামক অপর মাপের থার্মোমিটার ব্যবহৃত হয়।

সেণ্টিগ্রেডমতে ডিগ্রিতে জল জমিয়া বরফ হয়।
ফারেনহীটের ৩২
সেণ্টিগ্রেডের ১ জল ফুটিতে থাকে
ফারেন হীটের ২১২
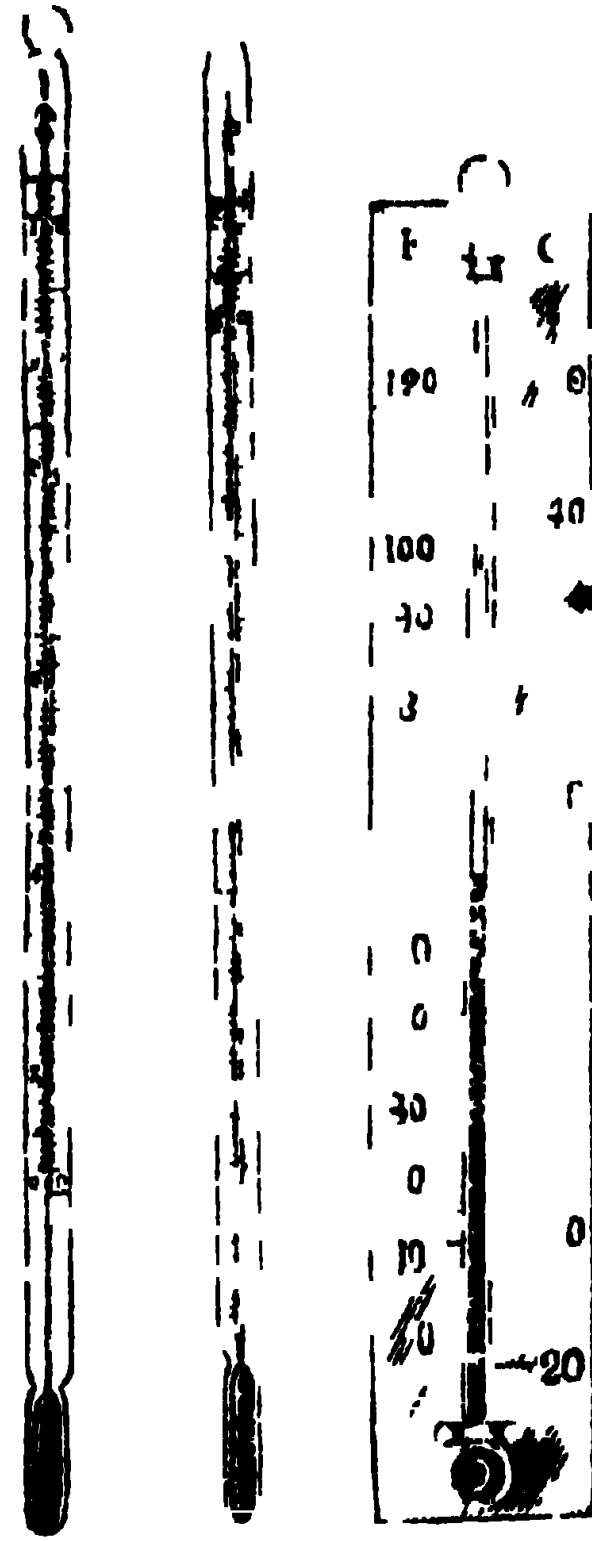
তিনটি তাপমান যন্ত্র। তন্মধ্যে বড়টির ডানদিকে সেণ্টিগ্রেড স্কেল ও বাম দিকে ফারেনহাইট মতে তাপের হার দেখান হইয়াছে।

চিত্র—১১

জন্ম-রহস্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গর্ভিণীর শুশ্রূষা।

অনেকে স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থাকে দশমাসে ব্যায়রাম বলিয়া বিবেচনা করেন। অনেকের মনে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে নারীরা গর্ভের বৎসরে দশ মাস রোগ ভোগ করে বলিয়া তাহাদিগকে বারমাস রোগ ভোগ করিতে হয় না—কিন্তু এই ধারণার ফলে অনেক নারী নানাপ্রকার স্ত্রীরোগে আক্রান্ত হইয়া ক্লেশভোগ করিয়া থাকে। অনেক রমণী গর্ভাবস্থায় আত্মীয় স্বজনের প্ররোচনায় অথবা নিজ বিবেচনানুসারে আপনাকে রোগী মনে করেন নিজ অবস্থা সম্বন্ধে সর্ব্বদা অত্যন্ত চিন্তা করেন এমন কি আহার বিহারের সাধারণ ব্যবস্থার পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন কিন্তু এরূপ আচরণ কোন মতেই প্রার্থনীয় নহে। সুস্থ ও সবল নারীর গর্ভাবস্থায় শারীরিক নিয়ম যথাযথ প্রতিপালিত হইতেছে কি না বা স্বাস্থ্য রক্ষার বিহিত ব্যবস্থার অনুসরণ করা হইতেছে কি না তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিলেই যথেষ্ট। যে সকল কার্য্য স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষার পরিপন্থী, গর্ভাবস্থায় সে সমুদায় কার্য্য করা কখনই সঙ্গত নহে কারণ তদ্দ্বারা গর্ভিণী ও গর্ভস্থ শিশু উভয়েরই স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। সুস্থ অবস্থায় মহিলাদিগকে শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যে সকল নিয়ম পালন করিতে হয় গর্ভাবস্থায় রমণীদিগের বিশেষ যত্নসহকারে সেই সকল নিয়ম পালন করা উচিত। স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে তাহার স্বাস্থ্য নীতি লঙ্ঘনের অধিকার

লাভ করে না এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত। গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীদিগের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লঘুপাক ও পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন করাই সঙ্গত উগ্র চা দ্রব্য আহার করা কখনই উচিত নহে। কিন্তু আহার সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়াকড়ি এবং বাড়াবাড়িও অসঙ্গত। গর্ভাবস্থায় প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ ফলের সরব প্রভৃতি তরল পদার্থ পান করা যাইতে পারে কারণ তদ্দারা বৃক্ক (Kidney) ও মূত্রস্থালীর (Bladder) ক্রিয়ার অনেকটা আনুকূল্য হইয়া থাকে। কিন্তু চা কফি এবং অন্যান্য উত্তেজক পানীয় অধিকমাত্রায় পান করা উচিত নহে।

যাহাতে চর্ম্ম ও বৃক্কের ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় গর্ভাবস্থায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। গর্ভিণীদিগকে এই সকল বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। গর্ভিণীর কোষ্ঠবদ্ধ হইলে যষ্টিমধুর ন্যায় মৃদু বেচক দ্রব্য সেবন ও শিলে বাটা কিসমিস মিশ্রিত তপ্ত দুগ্ধ পানের দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করা আবশ্যক। বৃক্কের (Kidneys) ক্রিয়া যদি যথাযথভাবে সম্পন্ন না হয় পানীয় দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি আবশ্যক। শীতল জল বা যবচূর্ণ মিশ্রিত জলই এইরূপ ক্ষেত্রে আশু ফলদায়ক। শরীরাভ্যন্তর পরিষ্কার এবং লোমকূপসমূহ মুক্ত রাখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মে স্নান করা আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় সাধারণভাবে স্নান বন্ধ করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। প্রত্যহ প্রাত কালে এবং রাত্রিতে পরিষ্কার গরম জলে জননেন্দ্রিয় ধুইয়া পরিষ্কার করা উচিত। গর্ভাবস্থায় যোনি হইতে প্রদরজাত স্রাব আরম্ভ হইলে প্রত্যহ বিষদোষ নাশক ঔষধ (Boracic Acid Powder অথবা Sodi Citras) মিশ্রিত জলের পিচকারী দিয়া জননেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরভাগ পরিষ্কার করা উচিত।

গর্ভিণীর উদরে কোনরূপ চাপ যাহাতে না লাগে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্র ও পরিচ্ছদ প্রভৃতি ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হয়। যদি গর্ভিণীর উদর ঝুলিতে থাকে তাহা হইলে (abdominal belt) বা উদর বন্ধনী (বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়) ব্যবহার করান আবশ্যক। এই বন্ধনী ব্যবহারের ব্যবস্থা এরূপ সুন্দর যে বন্ধনীটি নিম্নদিক্ হইতেই উদরটিকে আশ্রয় দান করে।

গর্ভাবস্থায় সর্ব্বপ্রকার কঠোর ব্যায়াম স্ত্রীলোকদের পক্ষে নিষিদ্ধ। তবে গর্ভিণী যাহাতে নিয়মিতরূপে গৃহস্থালীর কার্য্য করে তদ্বিষয়ে তাহাকে উৎসাহিত করা উচিত। তাই বলিয়া গর্ভিণীকে অধিক আয়াস সাধ্য কর্ম্মের ভার দেওয়া কখনও যুক্তিসঙ্গত নহে। মুক্ত স্থানে নিয়মিতরূপে ও অল্প পরিমাণে ব্যায়াম গর্ভিণীর স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে বিশেষ আবশ্যক—এই ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন স্বাস্থ্যনীতির অনুমোদিত এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু গর্ভের শেষাশেষি অবস্থায় দূরপথ পদব্রজে ভ্রমণ যানে আরোহণ বেশী উঠা নামা লম্ফঝম্প ধরিয়া শারীরিক বা মানসিক ব্যায়াম কখনই সঙ্গত নহে।

গর্ভিণী গমন সঙ্গত কি না এ প্রশ্ন স্বভাবত উঠিতে পারে। বিষয়টি গুরুতর ও প্রণিধানযোগ্য। যে সকল রমণীর পূর্ব্বে গর্ভস্রাব হইয়া সন্তান নষ্ট হইয়া যাছে গর্ভাবস্থায় তাহাদিগের পুরুষ সংসর্গ কোন মতেই সঙ্গত নহে। কিন্তু যে সকল নারী সুস্থ ও সবল তাহারা গর্ভবতী হইলেও গর্ভকালের প্রথমার্দ্ধে তাহাদিগের পুরুষ সংসর্গ নিষিদ্ধ নহে। তবে গর্ভিণীর সহিত মৈথুনে প্রবৃত্ত হইলে মৈথুনকার্য্যে অযথা বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধ। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সংযমের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারা গর্ভিণী গমন পাতক মধ্যে গণনা করিয়াছেন। যাহাতে গর্ভিণীর মন অত্যন্ত উত্তেজিত ক্ষুব্ধ ও বিষাদে অবসন্ন না হয় তাহার মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। জননীর মনে নানারূপ ভাবের যে তরঙ্গ উঠে গর্ভস্থ ভ্রূণের উপর তাহার প্রভাব যে অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হইয়া যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্য গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদা লোকের সহিত সৎ ব্যবহার নির্জ্জনে সাধু চিন্তা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ সচ্চরিত্র স্বাস্থ্যবান ও অনিন্দ্যসুন্দর পুত্র কন্যা জননের

ঘটনা। প্রাথমিক প্রসূতি বা প্রথম পোয়াতীদিগের এই প্রথম অবস্থা উত্তীর্ণ হইতে বার হইতে চব্বি। ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগিয়া থাকে। কিন্তু একাধিক সন্তানবতী প্রসূতিদিগের এ অবস্থা ছয় হইতে আট ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়।

প্রথমাবস্থা শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় অবস্থার আরম্ভ এবং সন্তানের জন্মগ্রহণের সঙ্গেই উহার

দ্বিতীয়াবস্থা।

সমাপ্তি। প্রাথমিক প্রসূতিরা এক হইতে ৩ ঘণ্টার মধ্যে এই অবস্থা অতিক্রম করে কিন্তু সন্তানবতী প্রসূতিদিগের এই অবস্থা অতিক্রম করিতে দশ পনর মিনিটের অধিক সময় লাগে না।

স্বাভাবিক ভাবে তৃতীয় অবস্থা অতিক্রম করিতে দিলে এই ব্যাপারে যে বত সময় লাগিতে পারে তাহা

তৃতীয়াবস্থা।

নির্ণয় করিয়া বলা বড়ই কঠিন। কোনো কতিপয় কারণবশতঃ স্বাভাবিক ভাবে ফুল ও চমস্থলী পড়িতে দেখা যায় না। অনেকে বলিয়া থাকেন স্বাভাবিক ভাবে ফুল পড়িতে দিলে, ঐ কার্য্যে এক হইতে তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগিতে পারে। কিন্তু এ অনুমান ঠিক নহে স্বাভাবিক উপায়ে পুষ্পনির্গম আরও অধিক সময় লাগিতে পারে। স্বাভাবিক চেষ্টায় ফুলটি জরায়ু হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং তন্মধ্য হইতে বাহির হইয়া যোনি প্রণালীর মধ্যে আসে। তখন তলপেটের উপরিভাগে চাপ দিলে ফুল নির্গত হয়। এইরূপ প্রচেষ্টায় ফুল পড়িতে সাধারণতঃ বারো হইতে পনর মিনিট সময় লাগে। কখনও কখনও আধ ঘণ্টা পরেও পড়িতে দেখা যায়। জরায়ু হইতে ফুল বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত ধাত্রীকে প্রতীক্ষা করিতে হয়।

প্রসবকালে কার্য্য প্রণালী।

সূতিকা গৃহটি যাহাতে বৃহৎ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় এবং তন্মধ্যে অবাধে বায়ু ও আলোক সঞ্চারিত হইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সূতিকা গৃহের যে স্থানে সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করে সেই স্থানেই গর্ভিণীর পালঙ্ক স্থাপন করা কর্ত্তব্য। কেন না তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্নে রৌদ্র বাতায়ন পথে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া গর্ভিণীর শয্যার উপর পতিত হইবে। শয্যার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে প্রচুর পরিমাণে রৌদ্র আসিয়া পড়ে তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যক। গর্ভিণীর শয়নের জন্য স্প্রীংযুক্ত খাট উপযোগী নহে। খাটখানি উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া তদুপরি মাদুর সতরঞ্চি কম্বল তোষক প্রভৃতি বিছাইয়া এবং বালিস যথা স্থানে রাখিয়া শয্যা রচনা করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন একটি প্রকাণ্ড গামলায় প্রচুর জল রাখিতে হইবে। হস্তাদি প্রক্ষালন বিশোধনার্থ ঔষধ মিশ্রিত জলের সংস্থান প্রভৃতি অস্ত্রমার্জ্জনার জন্য গার্য্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্র খণ্ড সমূহ ভিজাইয়া রাখিবার জন্য এবং প্রসবকালে ব্যবহার্য্য অস্ত্রাদি রাখিবার জন্য চারিটি পোর্সেলেনের বেসিন অভাবপক্ষে মাটির অথবা কলাই করা গামলা আবশ্যক। এসব সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য ব্যবহারার্থ প্রচুর পরিমাণ শীতল ও গরম জল সূতিকাগারে রাখিতে হইবে। গর্ভিণীর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হইতে পারে সুতরাং তজ্জন্য আবশ্যকীয় সরঞ্জাম ও একটি প্রশস্ত শয্যা পাত্র (B dpan) খাটের তলে রাখিয়া দিতে হইবে। প্রয়োজন হলে জল গরম করিবার জন্য সূতিকা গৃহের নিকটে আগুণ করিয়া রাখিতে হইবে। প্রসব কালে যে দ্রব্য ও পাত্রগুলি ব্যবহৃত হইবে সেগুলিকে পূর্ব্বে উত্তমরূপে মাজিয়া ঘষিয়া কার্ব্বলিক সাবান বা সোডার জলে ধুইয়া রাখিতে হইবে। নবজাত শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ ও বস্ত্রাদি এবং গর্ভিণীর ব্যবহার্য্য বন্ধনী প্রভৃতি একটা দড়িতে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে বর্ষা বা শীত কাল হইলে সেগুলি আগুণের নিকটে টাঙাইয়া রাখিবে তাহা হইলে সেগুলি বেশ গরম থাকিবে। প্রসবান্তে প্রসূতির যোনিদ্বারের উপর স্যানিটারী তোয়ালে নামক এক প্রকার তোয়ালে পশম নির্ম্মিত ছোট ছোট গদী এবং তলপেট বাঁধিবার উপকরণসমূহ হাতের নিকট

গর্ভিণীর যোনি ও মলদ্বারের মধ্যবর্ত্তী পারিণিয়াম সেবনী নামক ক্ষীণ মাংস রজ্জু (Perineal Raphe) ছিঁড়িয়া না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। এই সময়ে গর্ভিণী নিজ বাম ভাগ চাপিয়া শয্যার উপর শুইয়া থাকিবে এবং তাহার নিতম্ব শয্যার প্রান্তভাগ অতিক্রম করিয়া বাহিরে পড়িবে। এই সময়ে তাহার পদদ্বয় উপরের দিকে তুলিয়া ধরিয়া উভয় পদের মধ্যে একটি বালিস দিয়া পা দুইটি ফাঁক করিয়া রাখিতে হইবে। এই সময়ে ধাত্রী কিম্বা প্রসবকর্ত্তা পদদ্বয়ের পার্শ্বে এবং নিতম্বের সমান্তরাল ভাবে দাঁড়াইয়া গর্ভিণীর উদরের উপর বাম হস্ত সংস্থাপন পূর্ব্বক উদরটিকে গর্ভিণীর উরুদেশের মধ্যে এমনভাবে লইয়া আসিবেন যে প্রয়োজন মাত্রে ভ্রূণের অগ্রগামী মস্তকটি অঙ্গুলি দ্বারা ধরিতে পারা যাইবে। জরায়ুর আকুঞ্চন মাত্র গর্ভিণীকে কাতরতাসূচক শব্দ করিতে বলা উচিত কিন্তু ঐ সময়ে বেগ দিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। এইরূপ করাতে জরায়ুর আকুঞ্চন শক্তি যদি হ্রাস পায় এবং ভ্রূণের মস্তক বাহির না হইয়া পড়ে তাহা হইলেই ভাল। কিন্তু আকুঞ্চন যদি প্রবল হইয়া শিশুর মাথা বাহির করিয়া ফেলে তবে সে অবস্থায় মস্তকটি যাহাতে সুবিধামত বাহির হইতে পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করা ভিন্ন ধাত্রী বা তৎস্থানীয় চিকিৎসক আর কিছুই করিতে পারে না। কারণ ঐ অবস্থায় ভ্রূণের মস্তক ভিতরে ঠেলিয়া দেওয়া সুপরামর্শ সিদ্ধ নহে। এই সময়ে বাম হস্তের অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা ভ্রূণের মস্তক ধরিয়া বাহিরে আনিবার চেষ্টা করিতে হয় এবং মাথাটি যাহাতে সহজে নাড়াচাড়া করিতে পারা যায় এমন অবস্থায় সেটিকে রাখিতে হয়। যতক্ষণ না মাথার পৃষ্ঠদেশ বা গ্রীবার উপরিস্থিত প্রদেশ বাহির হইয়া আসে ততক্ষণ এইরূপ সতর্কতা সহকারে ভ্রূণ মস্তক আকর্ষণ করিতে হয়। এই সময়ে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির সাহায্যে ভ্রূণমস্তকে চাপ দিলে মাথাটি দীর্ঘ হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের মস্তক বাহির হইয়া আসে।

যদি ধাত্রীরা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে জরায়ুর আকুঞ্চনের বা প্রসব বেদনার বেগ হ্রাস করিতে পারেন তাহা হইলে বেদনা থামিবামাত্র গর্ভিণীর গুহ্য দেশের পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে চাপ দেওয়া ধাত্রীদিগের কর্ত্তব্য। চাপটি যাহাতে কার্য্যকরী হয় তজ্জন্য ভ্রূণ মস্তক অনেক পরিমাণে নিম্নে ঝুঁকিয়া পড়া আবশ্যক কেননা মাথা নীচের দিকে ঝুঁকিবার পূর্ব্বে চাপ দিলে মাথা পুনর্ব্বার জরায়ুমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

চাপ প্রয়োগ করা সত্ত্বেও যদি ভ্রূণ-মস্তক অনেকটা নীচের দিকে ঝুঁকিয়া না পড়ে তাহা হইলে ধাত্রীকে পুনর্ব্বার ব্যথা না উঠা পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইবে তার পর ব্যথা উঠিলে আবার প্রসব করাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। যদি ভ্রূণের মস্তক পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নিম্নাভিমুখে ঝুঁকিয়া পড়ে কিন্তু প্রসব কার্য্যে বাধা হইতে থাকে তাহা হইলে গর্ভিণীকে তখন অল্প অল্প বেগ দিতে বলিতে হয়। ঐরূপ ক্ষেত্রে গর্ভিণী অল্প অল্প বেগ দিলেই ভ্রূণের মাথা বাহির হইয়া আসে।

ভ্রূণের মাথা বাহির হইলেই উহার নাড়ী গলায় জড়াইয়া আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা ধাত্রী বা প্রসবকারকের প্রথম কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে পরীক্ষার্থে যোনি মধ্যে দুইটি অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া ভ্রূণের গলাটি ঠিক করিয়া লইয়া উহার চারিদিক অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিলেই গলায় নাড়ী জড়ান আছে কি না বুঝিতে পারা যায়। নাড়ী সন্তানের গলায় জড়ান থাকিলে কোন কৌশলে নাড়ীর পাক খুলিয়া দিতে হয় নচেৎ নাড়াটা হয়ত এমন ছোট থাকে যে প্রসব হওয়াই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সাধারণত নাড়ীর একটা পাক নীচের দিকে টানিয়া আনিয়া মাথার উপর দিয়া সরাইয়া বা গলাইয়া দিয়া পাক খুলিয়া দেওয়া হয়। যদি ভ্রূণের গলায় নাড়ী জড়ান না থাকে কিংবা জড়ান নাড়ীর পাক খুলিয়া দেওয়ার পর স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নাড়ীর স্পন্দন বেশ চলিতেছে তাহা হইলে ভ্রূণ দেহ প্রসব করার জন্য তাড়াতাড়ি করা উচিত নহে। ভ্রূণের মাথা বাহির হইবার প্রায় আধ মিনিট পরে আর এক বার জরায়ুর সঙ্কোচনের ফলে ব্যথা উঠে। সঙ্গে সঙ্গে

শিশুর স্কন্ধ দুইটি বাহির হইয়া পড়ে। যে সময় স্কন্ধ দুইটি নামিয়া আসিতে থাকে তখন মস্তকটি দুই উবর সম্মুখের দিকে তুলিয়া ধরিতে হয়। তাহাতে স্কন্ধের পশ্চাদ্ভাগ মূলাধার পীঠিকার (Perineum) উপর আসিয়া পড়ে। তাহার পর মাথাটি একটু পশ্চাতের দিকে সরাইয়া স্কন্ধের সম্মুখভাগ পশ্চাৎ হইতে বাহিরে আনিতে হয়। এ কৌশলে দুইটি স্কন্ধ বাহির হইলে মস্তক ও স্কন্ধদ্বয় সম্মুখের দিকে আকর্ষণ করিলে দ পর সমস্ত শরীর বাহির হইয়া আইসে। তখন নব প্রসূত সন্তান তীক্ষ্ণ স্বরে কাঁদিয়া সকলের নিকট আপনার আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করে। নূতন খোকাকে মায়ের বিপরীত দিকে মুখ করাইয়া ডান কাতে শোয়াইতে হয় এবং যাহাতে নাভীতে টান না লাগে সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়। নাড়ীর স্পন্দন ক্রিয়া বন্ধ হইলে জাতকের উদরের দুই ইঞ্চি উপরে সেটিকে সূতা দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিতে হয় এবং তাঁ নের একটু উপরে নাড়ী একখানি সুতীক্ষ্ণ কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। ইহাকেই চলিত কথায় না ।কাট বলে। ।ভাব অন্য প্রান্তে সূতা বাঁধিবার কোন প্রয়োজন হয় না — কেবল কাটিবার সময় (চিত্র প্রদর্শিত মত) ২ টি আ ল দিয়া একটু টিপিয়া ধরিলেই হইল। বি।ষ ।বে বা ।কে যেন—বাঁ।র চাঁচ ভোতা ছুরী প্র তি অন্য কোন [illegible] নিষ নাড়ী কাটার জন্য ব্যবহৃত না হয় [illegible] ধার কাঁচি ব্যবহার করাই উচিত এবং উহা যেন পূর্ব্বাহ্নে গরম জলে [illegible] কাল ফুটান হয়।

[শিশুর নাড়ী কি করিয়া কাটে হয়।]

যাহা হউক এই সময় নাভীর উপরে ও ক্ষতস্থানে বোরাসিক এসিড্ পাউডার ছড়াইয়া উদরের উপর দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া খোকাকে একখানি কাঁথা বা কম্বলে জড়াইয়া তাহার শয্যায় রাখিতে হয়। ছেলে হইবার পর প্রসূতিকে আর কাত করিয়া না রাখিয়া তাহাকে চিত করিয়া শোয়াইতে হয়। এই সময়ে ধাত্রীর সহচরী বা ডাক্তারের অনুচর প্রসূতির জরায়ুর প্রান্তভাগে হস্তস্থাপন করে। তৃতীয় অবস্থার শেষ অর্থাৎ ফুল পড়া পর্য্যন্ত তাহাকে ঐ ভাবে জরায়ুর উপর হাত রাখিয়া উহার আকুঞ্চন প্রসার। লক্ষ্য করিতে হয় জরায়ু প্রান্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক উহার আকুঞ্চন ক্রিয়া বৃদ্ধি করিতে এবং জরায়ুমধ্যে যাহাতে ঘনীভূত রক্ত সঞ্চিত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। যে সকল গর্ভিণীর সন্তান প্রসূত হওয়ার পর অতি মৃদুভাবে জরায়ু সঙ্কুচিত হইতে থাকে অথবা যাহাদিগের জরায়ুর আকুঞ্চন ক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হয় তাহাদিগের জরায়ুগুহায় রক্ত

অবস্থা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সময়—অর্থাৎ প্রসবের পর দেড়মাস পর্য্যন্ত সূতককাল। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সূতকস্রাব বন্ধ হইলেই—অর্থাৎ প্রসবের দশ বার দিন পরেই সূতক কালের অবসান হয়।

শিশুর জন্ম এবং ফুলপড়ার অব্যবহিত পরে প্রসূতি যেরূপ শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করে তাহা পূর্ণ গর্ভাবস্থায় রমণীরা কল্পনাও করিতে পারে না। সূতিকাগারে থাকিবার সময় প্রসূতি সাধারণ বিরাম সুখভোগ এবং ক্লেশের অবসানে তৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। নানা ক্লেশজনক গর্ভাবস্থায় এরূপ তৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ কোনমতেই সম্ভবপর নহে। প্রসবান্তে রক্তক্ষয় ও যন্ত্রণা ভোগ হেতু প্রসূতির পিপাসা প্রবল হইয়া থাকে। তাই প্রসবের পর প্রসূতি ক্রমাগত জল খাইতে চাহে। প্রসবের পরে প্রায় বার ঘণ্টা পর্য্যন্ত প্রসূতির প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা প্রবল হয়। ঐ সময়ে তাহাকে প্রস্রাব করিতে দিলে সে প্রস্রাব করিয়া মূত্রস্থালী রিক্ত করিয়া ফেলিতে পারে। যে কয়দিন প্রসূতি শয্যাগত থাকে সে কয়দিন স্বভাবত মলত্যাগের বেগ অনুভূত হয় না। শয্যাবস্থা উদরের পেশীসমূহের শিথিলতা এবং উদরের অভ্যন্তরে বিসদৃশ চাপ বশত এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

প্রসবের পর জরায়ুর সঙ্কোচ বশত মাঝে মাঝে তলপেটে তীব্র বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। এই বেদনা এদেশে হাদলের ব্যথা নামে পরিচিত। নূতন প্রসূতিরা এই বেদনা অনুভব করে না কিন্তু যে সব প্রসূতির একাধিক সন্তান জন্মিয়াছে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই প্রসবের পর হাদলের ব্যথায় কষ্টভোগ করিয়া থাকে। স্তন যুগলের পরিসর বৃদ্ধি এবং স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারকালে প্রসূতিরা স্তনমধ্যে সূচি বেধ তুল্য ঈষৎ তীক্ষ্ণ বেদনা অনুভব করিয়া থাকে। স্তন যদি দুগ্ধের চাপে অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে তাহা হইলে স্তনে বড় বেদনা হয়। প্রসূতিকে যখন শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে দেওয়া হয় তখন সে মাংসপেশীসমূহের দুর্ব্বলতা হেতু অত্যন্ত অবসন্নতা অনুভব করে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার শরীর যে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে শয্যায় শুইয়া থাকিবার সময় প্রসূতির সে বিষয়ে কোন ধারণাই থাকে না। কিন্তু এই দুর্ব্বলতা অধিক দিন থাকে না অল্পকালের মধ্যেই প্রসূতি তাহার স্বাভাবিক বল উৎসাহ ও উদ্যম পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সূতককালে আহার।

সূতককালে প্রসূতিকে লঘুপাক বলকর এবং পর্য্যাপ্ত আহার্য্য প্রদান করা আবশ্যক। প্রথম দুই দিন বলকারক তরল খাদ্যই প্রসূতির উপযোগী। কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে তৃতীয় দিন প্রসূতিকে অল্প পরিমাণে দুই তিনবার কঠিন অথচ লঘু খাদ্য এবং আনুষঙ্গিক পানীয় প্রদান করা যাইতে পারে। তৃতীয় দিনের পর হইতে প্রসূতির আহারের ব্যবস্থা আরও উত্তমরূপে করিতে হয় এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করিতে হয়। কিন্তু প্রসূতি যতদিন শয্যাগত থাকে ততদিন তাহাকে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর অল্প পরিমাণে কয়েকবার করিয়া খাদ্য প্রদান করা বিশেষ আবশ্যক। ভোজ্য দ্রব্যগুলি যাহাতে নানাপ্রকার হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টিরাখা বিশেষ আবশ্যক। শোণিত স্রাবের বাহুল্য বা পূর্ব্ব পীড়া নিবন্ধন যে সকল প্রসূতি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তাহাদিগকে সবল রাখিবার জন্য পানীয় হিসাবে অল্প পরিমাণে পুরাতন সুরা দেওয়া যাইতে পারে।

মূত্রাশয়। সন্তান প্রসবের পর ২৪ ঘণ্টাকাল মূত্রাশয়ের উপর দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক। প্রসূতি যাহাতে ষোল ঘণ্টার মধ্যে ২।১ বার প্রস্রাব করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়।

মলকোষ্ঠ। প্রসবের পর দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাকালে অথবা তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে বিরেচক ঔষধ প্রদান করা যাইতে পারে। যদি মলত্যাগের বেগ স্বভাবত না হয় তাহা হইলে পিচকারী করিয়া মলস্থলী মধ্যে সাবান জল দেওয়া আবশ্যক।

সুস্থ সবল রমণীরা সন্তান প্রসব করিবার পর তাহাদিগের যোনিনালী ও জরায়ুতে পচন ক্রিয়া চলিতে

অন্তঃধৌতি।

পারে না বিনা পরীক্ষাতেও ইহা জানিতে পারা গিয়াছে। কিন্তু যে সকল রমণীর জননেন্দ্রিয়ে পবিশেষে ব্যাকটিরিয়া বা কীটাণু দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগের যোনি মধ্যে বাহির হইতেই কীটাণু প্রবেশ করিয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং কীটাণু বিনাশ এবং সূতকস্রাবের পচন নিবারণার্থ শোষণশীল কাপাসে (Absorbent cotton) নির্ম্মিত ছোট ছোট গদি বিষ দোষ নাশক (antiseptic) ঔষধে ভিজাইয়া যোনিদ্বারে সন্নিবেশিত করিতে হয় এবং ঘন ঘন ঐ গদি বদলাইয়া দিতে হয়। যে সকল রমণী বলিষ্ঠ এবং সুস্থ প্রসবের পর তাহাদিগের যোনির অন্তঃধৌতি করিবার প্রয়োজন হয় না।

শয্যায় বিশ্রাম।

এবং সূতকস্রাব জলের ন্যায় বর্ণহীন হইয়া সম্পূর্ণ বন্ধ না হয়, ততদিন প্রসূতিকে শয্যায় শুইয়া থাকিতে হইবে। সাধারণতঃ প্রসবের পর দশ বা দ্বাদশ দিনে প্রসূতির শয্যাত্যাগ করিবার উপযুক্ত অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ঐ সময়ে বিশেষ গুরুতর কারণ ভিন্ন শয্যায় থাকিবার প্রয়োজন হয় না। প্রসবান্তে প্রসূতির বিশ্রামের পর ১।১২ ঘটা পরে দুগ্ধ বেশী না থাকিলেও নবজাত শিশুকে স্তন টানিতে দেওয়া উচিত ইহাতে স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার কার্য্যের সুবিধা হয়, জরায়ুর স্বাভাবিক সঙ্কোচনে সহায়তা করা হয় এবং সন্তানটিরও ঐ দুগ্ধগত কলোষ্ট্রাম নামক রেচক দ্রব্য খাইয়া কোষ্ঠ সাফ করিবার সুযোগ ঘটে। প্রসবের পর যত দিন পর্য্যন্ত না স্তনে
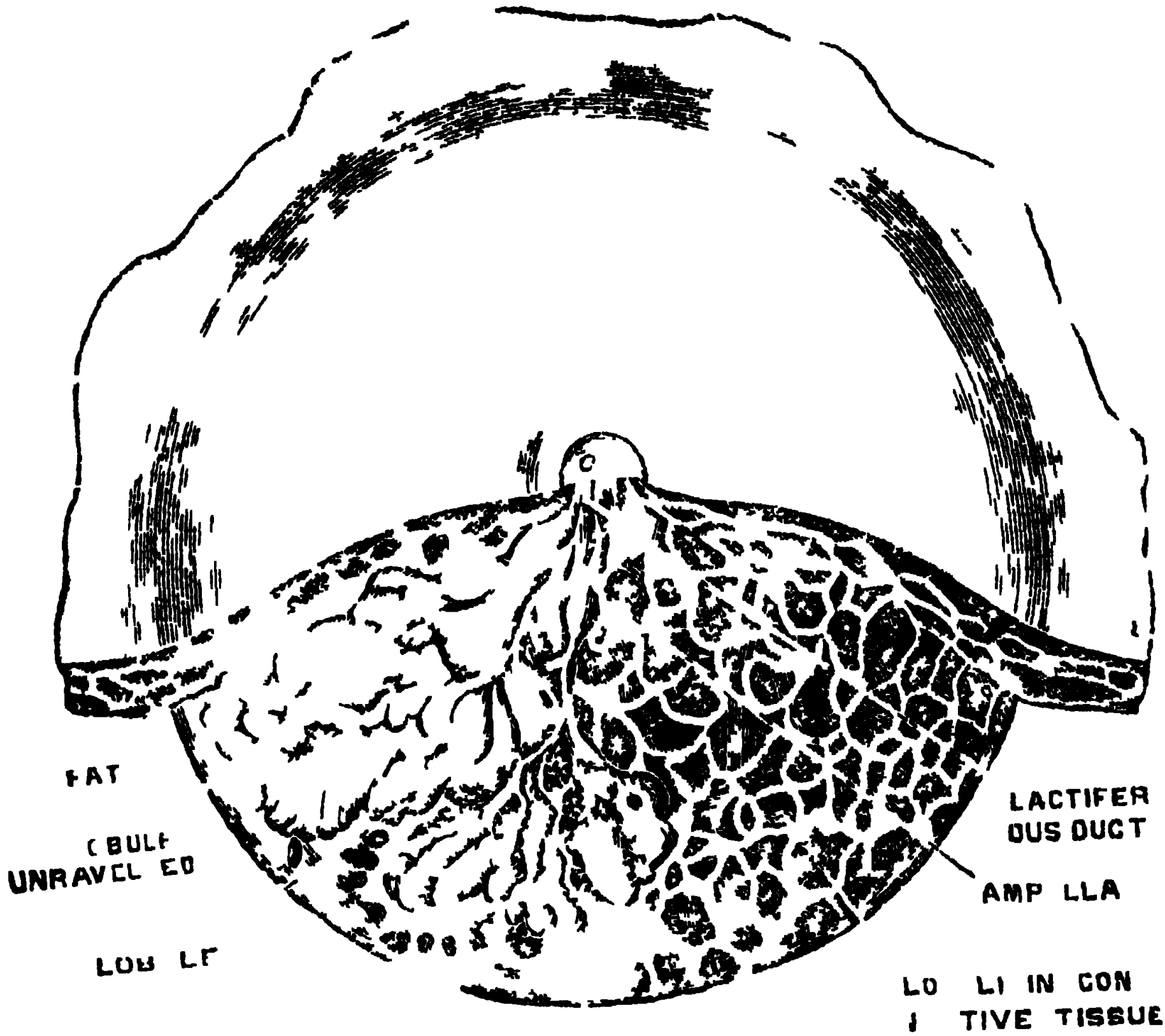
স্তনের অর্দ্ধভাগের চর্ম্ম অপসৃত করিবা নীচের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষগুলি ও দুগ্ধবহ নালিকাগুলি দেখান হইয়াছে।]

যতদিন না ক্ষতগুলি সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া যায় জরায়ু যথাপূর্ব্ব সঙ্কুচিত হইয়া উদর গহ্বরে প্রবেশ করে দুগ্ধ আইসে ততদিন দিবসে অতি সামান্য মাত্রায় চারিবার শিশুকে স্তন্যপান করিতে দেওয়া আবশ্যক।

স্তন্যদান রীতি। স্তনে পরিমিত দুগ্ধ সঞ্চার হইবার পর দিবাভাগে দুই ঘণ্টা অন্তর এবং রাত্রিকালে চারি পাঁচ ঘণ্টা অন্তর শিশুকে স্তন্যপান করাইতে হয়। স্তনপান করাইবার পূর্ব্বে ও পরে স্তনের বৃন্ত বা বোঁটা গরমজলে ধুইয়া ফেলা উচিত। স্তনেরবোঁটায় যে দুগ্ধ শুকাইয়া অম্লরসযুক্ত হইয়া থাকে তাহাই ধুইয়া ফেলিবার জন্য প্রথম বারে স্তনের বৃন্তটি প্রক্ষালন করা হয়। কারণ ঐ বিকৃত দুগ্ধে শিশুর অপকার হইতে পারে। স্তনবৃন্ত হইতে দুগ্ধ ধুইবার জন্য দ্বিতীয়বারে স্তনবৃন্তটি প্রক্ষালন করা হয় কারণ যাহাতে দুগ্ধ লাগিয়া না থাকিতে পারে সে বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। যেহেতু স্তনের বৃন্তে সংলগ্ন দুগ্ধ পচিয়া স্তনের দুগ্ধ গ্রন্থিসমূহে এবং দুগ্ধ নালীতে বিষক্রিয়া ঘটাইতে পারে। স্তন যদি গ্রন্থিযুক্ত স্ফীত এবং কোমল বোধ হয় তাহা হইলে একভাগ হরিদ্রা বর্ণ মোম এবং আটভাগ তিল তৈল উত্তমরূপে মিশাইয়া এবং উহা এক খণ্ড ফ্লানেলে মাখাইয়া স্তনের উপর লাগাইয়া দিলে উহার প্রতীকার হয়। যদি স্তনে দুগ্ধের পরিমাণ অল্প হয় তাহাতে প্রসূতিকে প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য ও উহার মাঝে মাঝে প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়াইয়া দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তবে প্রসূতির পরিপাক শক্তির যাহাতে কোনরূপ বিকার না ঘটে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রসূতির আহারের ব্যবস্থা করাই সঙ্গত।

নিদ্রা। যাহাতে শীঘ্র প্রসূতির শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি দূরীভূত হয় তজ্জন্য তাহার প্রচুর ও প্রগাঢ় নিদ্রা আবশ্যক। এ বিষয়ে প্রকৃতিই প্রসূতির সম্পূর্ণ অনুকূল যেহেতু প্রসবের পর সূতিকাবস্থায় কোন প্রসূতির নিদ্রা হইতেছে না এরূপ অবস্থা প্রায় দেখা যায় না। তবে বিশেষ কোন কারণে এই অবস্থায় প্রসূতির নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

বাঁধনের ব্যথা। অনেক প্রসূতির জরায়ুর মধ্যে চাপবাঁধা রক্ত থাকে তাহা হইতে প্রসবের পর বাঁধনের ব্যথায় অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকে। সুতরাং জরায়ু মধ্য হইতে সঞ্চিত রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া ইহার প্রতীকারের প্রধান উপায়। এজন্য জরায়ুটি অল্পে অল্পে টিপিলে এবং সঙ্কুচিত করিলে ঘনীভূত রক্ত সাধারণতঃ নির্গত হইয়া যায়। যে সকল প্রসূতি সন্তানকে স্তন্যপান করায় না তাহারা অত্যন্ত তীব্র বাঁধনের ব্যথায় আক্রান্ত হইলে উহার প্রতীকারের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে ঔষধ সেবন করিতে পারে।

(সমাপ্ত)

সমালোচনা।

প্রভাতী—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য বারো আনা। আলোচ্য পুস্তকখানি গদ্য পদ্যের গীতি কাব্য। ভক্তের হৃদয়ে বিমল শুভ্র প্রভাতে যে সকল চিন্তাস্রোত জাগ্রত হয়—যে সকল উচ্ছভাব আসিয় হৃদয়াকাশে ফুটিয়া উঠে গ্রন্থকার নিজ জীবনের মধ্য দিয়া সেই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে কোন কষ্ট কল্পনা নাই—লোক মনোরঞ্জনকর বিনান বাক্যচ্ছটা নাই ইহা revealationএর মত পবিত্র উপভোগ্য ও একটা অপার্থিব জ্যোতি মণ্ডিত। আমাদের বড ভালো লাগিয়াছে।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি—শ্রীযুত ক্ষিতীন্দ্রনাথ পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র জীবনকালে মহর্ষি স্বীয় পৌত্রের নিকট ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূলনীতি—বিশ্বজনীন জ্ঞান ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি—কেমন করিয় ভগবদেচ্ছায় সাধিত হইয়া চলিয়াছে তাহাই তৎকালীন বালক পৌত্রের নিকট কথাচ্ছলে পরিব্যক্ত করিতেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ সেগুলি একান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। সেই বক্তৃতাগুলি বর্ত্তমান নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রায় ৩১ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন এটি দ্বিতীয় সংস্করণ। পুস্তকখানির সমালোচনা কি করিব—পুস্তকখানি পড়িলে মনে হয় যেন মহর্ষি পুনরায় বাঙ্ময় হইয়া সম্মুখে বসিয়া উপদেশ দিতেছেন। জ্ঞান ও ধর্ম্মরাজ্যের প্রত্যেকটি বিষয় এমন নিখুত সুশৃঙ্খল সৌন্দর্য্যের সহিত লিপিবদ্ধ করা সঙ্কলয়িতার অসীম লিপিচাতুর্য্য ও শক্তিবৃত্তির পরিচায়ক। পুস্তকখানি আবাল বৃদ্ধ বণিতার পুন পুন পাঠ করা উচিত।

ভূস্বর্গে কলেরা।—

কাশ্মীর রাজ্য ভূস্বর্গ বলিয়া পরিচিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, নারী সৌন্দর্য্যে কাশ্মীর স্বর্গই বটে। কিন্তু সেই স্বর্গে কলেরার এত প্রাদুর্ভাব কেন? প্রায় প্রতি বৎসরই সংবাদ পাওয়া যায় যে কাশ্মীরে কলেরা রোগে বহু লোক মরে। এবারও দেখা যাইতেছে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া কলেরা রোগ সেখানে সংক্রামকভাবে বর্ত্তমান ছিল এখন কমিতেছে। ৩ শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে কেবল সেই এক সপ্তাহেই ১৫১৯ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল তন্মধ্যে ৮৫১ লোক মরিয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েক সপ্তাহেও তাহা হইলে অনেক লোক নিশ্চয়ই মারা গিয়াছে। ইহাই কি ভূস্বর্গের লক্ষণ? সকলেই জানেন প্রধানতঃ পানীয় জল দূষিত হইয়া কলেরা রোগ বিস্তৃত হয়। আজ কালকার দিনে দূষিত পানীয় জল শোধিত করিয়া লওয়া কঠিন নহে—জল শোধন করিবার অনেক বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্তত জল ফুটাইয়া লইলেও অনেকটা শোধিত হইতে পারে। অথচ প্রতি বৎসরই বিস্তর লোক কলেরায় মরে। সুতরাং বেশ প্রতীতি হয় যে লোক শিক্ষার অভাবই প্রধানত ইহার জন্য দায়ী। কাশ্মীর গবমেণ্টের উচিত কাশ্মীরবাসীকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া বিশেষত কলেরার প্রাদুর্ভাব সময়ে জল শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে বাধ্য করা।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা।—

৺কাশীধামে সম্প্রতি দুইটা সন্তরণ প্রতিযোগিতা হইয়াছিল—একটা ১৩ মাইল ও আর একটা ৫ মাইল। গত ৭ই মে ১৩ মাইল প্রতিযোগিতা হয়। তাহাতে কাশীর বেঙ্গলী ইউনিয়ন ক্লাবের মিঃ কে সি চক্রবর্ত্তী ৪ ঘণ্টা ৪ মিনিটে ঐ ১৩ মাইল সন্তরণ করিয়া প্রথম হন। ২২জন প্রতিযোগীর মধ্যে ৮জন লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিয়াছিলেন। ১২ বৎসর বয়স্ক বালক শ্রীমান পি সি বাগচি ৪ ঘণ্টা ৫ মিনিটে লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিয়া ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। আর ৫ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ৬২টি বালক যোগ দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৪ বৎসর বয়স্ক এইচ সি দাস প্রথম হন। কলিকাতা ও কাশীতে সন্তরণ প্রতিযোগিতা নিয়মিতভাবে চলিতেছে ইহা বড়ই সুখের বিষয়। দেশের সর্ব্বত্রই এই ব্যাপারে বালক ও যুবকগণকে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং প্রত্যেক প্রদেশে একটী প্রধান নগরে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া এবং সর্ব্বত্র শাখা সন্তরণ সমিতি স্থাপন করিয়া এবং যথোচিত পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে কার্য্য করা উচিত। ক্রমে ইংলিশ চ্যানেল ও অন্যান্য আন্তর্জ্জাতিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় আমাদের ছেলেদের পাঠাইতে হইবে। আর মনে থাকে যেন ওলিম্পিক গেমসে ভারতবর্ষ উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। সে কলঙ্ক ভঞ্জন করিতেই হইবে।

স্বাস্থ্য-প্রতিকৃতি।

শ্রীযুক্ত ক্ষি—ন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে। চিত্রকর—একবর্ট।

সকল নিয়ম ভঙ্গ করিলে আজ না হৌক দুদিন দশদিন পরে যে শাস্তি পাইতেই হইবে এ কথা তাহারা ভুলিয়া যায় এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়া নিজেদের শাস্তি লাভের পথ উন্মুক্ত করে।

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি কেবল জানিয়া রাখিলে চলিবে না, কেবল মুখস্থ করিলেও চলিবে না। আমাদের কর্ত্তব্য—সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া সমস্ত শক্তিসামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল নিয়ম অনুসারে জীবন যাপন করা। নিয়ম তো আমরা মানি কিন্তু ওগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার কোন ব্যবস্থা আমাদের এভাব আসলে সেই নিয়মগুলি পালন করিবার অভ্যাস আমরা অর্জন করি না।

আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিদিন মঙ্গল নিয়ম অনুসরণ করিবার অভ্যাস করা চাই। এই অভ্যাসের কথা নয়, তাহা নহে। বাহিরে লোক এই অভ্যাস অর্জন করে সেই আমরা প্রত্যহ করি। প্রত্যেক দিন সকল সময়েই যাহাতে সুস্থ থাকিতে পারে সে বিষয়ে অনেকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখে। যে সকল নিয়ম তাহারা সহজে পালন করিয়া স্বাস্থ্য বজায় রাখে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের মতে সেগুলি প্রকৃতির অনুকূলই বটে।

স্বাস্থ্যলাভ করিবার নিজেকে সুস্থ রাখিবার মূলমন্ত্র হইতেছে—স্বাস্থ্যকেই ধ্যান কর আরোগ্যকেই সর্ব্বদা আবাহন কর—অস্বাস্থ্যকে নহে রোগকে নহে। স্বাস্থ্যের আদর্শের প্রতি তোমার লক্ষ্য ও দৃষ্টি স্থির রাখ এবং তুমি আপনাকে যে প্রকার সবল সুস্থ সুখী ও আত্মনির্ভরশীল দেখিতে চাও নিজে সেইপ্রকার হইয়াছ তাহাই মনে সর্ব্বদাই চিন্তা কর প্রাণের ভিতর তোমার নিজেকে সেইপ্রকার আদর্শ ব্যক্তি রূপে চিত্রিত করিয়া দেখিতে থাক।

স্বাস্থ্যরক্ষার সর্ব্বপ্রধান সহজসাধন হইতেছে—মুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু সম্ভবমত ভিতরে টানিয়া লও সম্ভবমত তাহা কিছুক্ষণ ধরিয়া রাখ এবং সম্ভবমত ধীরে ধীরে নাসিকা দ্বারা সেই টানিয়া রাখা বায়ু বাহির করিয়া দাও। এই জন্যই প্রাণায়ামকে হিন্দুরা সন্ধ্যাহ্নিকের অঙ্গরূপে ধরিয়া লয়। প্রাণায়াম অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে খোলা যায়গায় গিয়া বিশুদ্ধ বায়ুর নিশ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করা অধিকতর সহজ বলিয়া বোধ হয়।

সাধারণতঃ আমাদের জীবন ধারণের জন্য যতটুকু আহার করা আবশ্যক তদপেক্ষা আমরা প্রায় এক তৃতীয় অংশ অধিক আহার করি। সেই এক তৃতীয় অংশকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য আমাদিগকে নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এইরূপ চিকিৎসকেরা এই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন আমাদের চিকিৎসা ও যোগোপদেষ্টাগণ বহুপূর্ব্বে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এইজন্য আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে উদরের অর্দ্ধেক আহার্য্য দ্রব্যে সিকি অংশ জল বা বায়ু দ্বারা পূর্ণ করিবে তাহা হইলে রোগের সম্ভাবনা থাকিবে না।

স্বাস্থ্য নষ্ট করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায় হইতেছে ভয়। ভয় পাইলে রক্তের স্বাভাবিক সঞ্চালন থাকে না—ব্যতিক্রম ঘটিবে। রক্ত সঞ্চালনে ব্যতিক্রম ঘটিলেই পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। পরিপাক ক্রিয়ার গোলযোগ ঘটিলেই জীবনের সমস্ত কার্য্য প্রণালীর উপর আঘাত পড়ে। ভয়ের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে চাহিলে খুব গভীর রূপে নিশ্বাস লইবে এবং আহার কমাইয়া দিবে। কার্য্যের মাত্রা বাড়াইয়া দিবে আলস্য সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবে সকলের গুণ গ্রহণ করিবে ও সকলকে প্রশংসা করিবে অপরের দোষ বাহির করিতে অগ্রসর হইও না। বৃথা ভৎসনা করিতে উদ্যত হইও না সকলকে অন্তরের সহিত প্রীতি করিতে শিক্ষা কর সকলকেই ভগবানের সন্তান জানিয়া কাহাকেও ঘৃণা করিও না।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম পালন করিবার অভ্যাস অর্জ্জন কর। সর্ব্বদা সুস্থ লোকদিগের সহিত আহার বিহার কর। স্বাস্থ্য সংক্রামক জানিও।

রহিল ও অপর দিকে সেই সঙ্গে ইংরাজী মালের প্রচুর কাটতি হইবার উপায় হইল। যাহা হউক ইংরাজী শিক্ষার অন্য সু বা কু ফলের সঙ্গে আমাদের ততটা প্রয়োজন নাই—যতটা ইংরাজী শিক্ষার ফলে—কিসে কতটা ও কেন আমরা রোগ ও ব্যাধি সম্বন্ধে উদাসীন ভাবাপন্ন হইলাম এই কথাটার বিচার লইয়া। পূর্ব্বে আমাদের এদেশের জাতি ধর্ম্ম ছিল—লোকেরা চির কাল সকলে মিলিয়া মিশিয়া এক রকম অঙ্গাঙ্গীভাবে থাকিতে অভ্যস্ত ছিল। ইংরাজ চোখে কাহাকে দেখা করিতে দেয় না। তাহার শিক্ষা বিভাগ তাহার স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। কাজেই এদেশে ইংরাজী আমলে বিশ্ববিদ্যালয় শুধু শিক্ষাই দিতে লাগিল স্বাস্থ্য বিভাগ স্বাস্থ্যতত্ত্ব লইয়া রহিল চিকিৎসা বিভাগ ডাক্তারদিগকে লইয়াই রহিল—ফলে আমরাও রাজ কার্য্যের ব্যাপারে জাতীয় এই বিড়ম্বনাটাকে ভাল করিয়া পরিপাক করিয়া লইলাম। আমরা জনসাধারণে চিকিৎসামূলক ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারকে অস্পৃশ্য মনে করিতে শিখিলাম। ভিতরে ভিতরে এই সংস্কার দৃঢ়মূল হইয়াছে বলিয়াই আজ আমাদের দেশের লোকের হাতে শিক্ষার প্রতিষ্ঠান মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি আসিয়া পড়িলেও আমরা কিছুতেই কাযে ব্যবহারিক জীবনে সকল দিককে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশাইয়া মিলাইয়া কায করিতে পারি না—সেই ইংরাজী স্বাতন্ত্র্য আদর্শকেই বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহারই নকটানুসরণে ধারা চালাইয়া আসিতেছি।

তাহার উপর আমরা একটা মস্ত কথা ভুলিয়া যাই যে ইংরাজ এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করে তাহাদের রাজকার্য্য পরিচালনোপযোগী মুন্সী উকীল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি প্রস্তুত করিবারই জন্য। তাহাদের প্রয়োজন মত শিক্ষাদানের সেই সঙ্গে যে দু একটি এদেশীয় লোক মানুষ হইয়া গিয়াছেন—সে তাঁহাদের সুকৃতির ফলে। ইংরাজ যখন নিজ রাজকার্য্য পরিচালনোপযোগী কর্ম্মচারী প্রস্তুত করাই উদ্দেশ্য করিয়া ছিল তখন তাহার দেশের শিক্ষার আদর্শ কত উচ্চ তাহা দেখিবার তাহার অবসর ও প্রয়োজন ছিল না। এখনো সেই মনোবৃত্তির পরিচয় শিক্ষাকার্য্যে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান। যতটুকু বিদ্যা না হইলে রাজকার্য্য চালান যাইবে না ইংরাজ ততটুকু বিদ্যাদানেরই ব্যবস্থা করিয়াছিল। কাযেই কিসে আমরা ব্যক্তি ও জাতি হিসাবে মানুষ হই তাহার জন্য মাথা ঘামাইবার ইংরাজের প্রয়োজন তখনো ছিল না এখনো হয় নাই।

তবেই মোট কথা দাঁড়াইতেছে এই যে—পূর্ব্ব পুরুষেরা স্বাস্থ্যবান ছিলেন ও দেশ স্বাস্থ্যসম্পদে পূর্ণ ছিল। সে কালের বৈদ্যেরা জনসাধারণকে স্বাস্থ্যকথা বা চিকিৎসার পরিচয় দিতে নারাজ ছিলেন। ইংরাজী আমলে নগদ পয়সার চটকে পঙ্গপালের ন্যায় বাঙ্গালী ইংরাজের চাকুরী করিতে ছুটিল তাহার ফলে তাহাদের মধ্যে একদিকে যেমন বিলাসিতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত বহিতে লাগিল অপরদিকে তাহারা ইংরাজের পাঠশালায় পড়িয়া মানুষ হইতে না শিখিয়া ইংরাজের তোতাপাখী হইতে লাগিল—ফলে আত্মনির্ভরতা দূর দর্শিতা স্বাধীনচিন্তার ক্ষমতা ও স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গেল।

এখন কথা আজ বড় করিয়া বাঙ্গালীকে শুনাইতে হইবে। কারণ বাঙ্গালী জাগিয়া ঘুমায়। বাঙ্গালী নিজের চোখে দেখে যে

(১) তাহার শিশু অকালে প্রাণ হারায়।

(২) তাহার শিশুরা বাঁচিয়া থাকিলেও রোগা ও নানা অস্বাস্থ্যের আকর হইয়া শক্তিহীন হইয়া কোনও রকমে দেহ খাড়া করিয়া দেহ ধারণ করিয়া থাকে মাত্র।

(৩) সধবা বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা অম্ল ও ক্ষয় রোগে সূতিকা ও রজো আধিক্যদোষে জর্জ্জরিত হইয়া অল্পায়ু হইতেছেন।

(৪) ম্যালেরিয়া কালাজ্বর ক্ষয়কাশ ইনফ্লুয়েঞ্জা ইচ্ছাবসন্ত প্লেগ ওলাউঠা আমাশয় টাইফয়েড জ্বর—প্রভৃতি নিবার্য্য ব্যাধিগুলি এদেশে শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে এবং যমরাজের মাশুল স্বরূপ নিত্যই অসংখ্য প্রাণীর প্রাণ হনন করিতেছে।

(৫) গো জাতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশের লোকের স্বাস্থ্য ও সম্পদের হানি ঘটিতেছে।

কিন্তু এমন মর্মান্তিক সংবাদের ফলেও বাঙ্গালীর চৈতন্য হয় না—বাঙ্গালী আপনার বুকের সন্তানকে বাঁচাইবার জন্যও এতটুকু চেষ্টা করেনা। হায়! এ জাতির পরিণাম যে কি হইবে তাহা ভাবিয়া আমি আকুল হইয়াছি।

ছেলের পর ছেলে মরিতেছে যে চারিটা ছেলে মাত্র জীবন্মৃত হইয়া বাঁচিয়া আছে—স্ত্রী রুগ্না জীর্ণা—তবু বাঙ্গালীর অঙ্গুলি হেলন পর্য্যন্ত নাই—বাঙ্গালী অদৃষ্ট-বাদী অদৃষ্টের দোহাই দিয়া ও নিজের স্কন্ধের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বাজার অনুরূপ পরবর্ত্তী চেষ্টার আশায় মুখ তাকাইয়া দিনের পর দিন নিশ্চিন্ত মনে নৈরাশ্য জনিত সুখের সাগরে নিমজ্জমান।

কিন্তু আজ বাঙ্গালীকে বড় করিয়া শুনাইতে হইবে যে—

(১) আমি দীন আমি হীন বলে নিজে ভেবনা কো
তোমাতে আমার বল আমি রব আশায়—

এই মন্ত্রের সাধনা শিখিতে হইবে। আপনার বাহুকে আপনার জাত ভাইয়ের বাহুকে বিশ্বাস করি শিখিতে হইবে রমণীজাতিসুলভ অদৃষ্টবাদিতা হীনের ন্যায় কৃপার দান প্রতীক্ষা নিজের ক্ষমতায় সন্দেহ—এ সমস্ত দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে।

(২) বাঙ্গালীকে বুঝিতে হইবে—তাহার বোঝা তাহাকে নিজেকেই বহিতে হইবে—অপর কেহ তাহার স্ত্রী পুত্রের সুখ দুঃখের ভাগ লইতে পারে না।

(৩) বাঙ্গালীকে আদাজল খাইয়া জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে—কি করিলে শরীর ভাল থাকে ও কি করিলে ব্যারাম হয়—এই বিষয়দ্বয় লইয়া। জ্ঞান যতক্ষণ না ঘরে ঘরে বিস্তৃত হইতেছে ততক্ষণ বাঙ্গালীর ভদ্রস্থতা নাই। আমার স্বার্থ অপরের স্কন্ধে তুলিয়া দিলে সে ব্যক্তি যদি তাহা বহন করিতে স্বীকৃত হয় তবে সে ব্যক্তি তাহার মধ্যে যথেষ্ট আপনার সুবিধা করিয়া লইবে—ইহা স্বভাবের নিয়ম। লোকে একটা মামলা করিতে হইলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার প্রত্যেক ঘটনার সন্ধান লয় সাক্ষীসাবুদের তদ্বির করিয়া ঘটনা সামঞ্জস্য বাচনিক বজায় রাখিবার জন্য কত পড়া মুখস্থ করিবার মত শিখায় উকীল ও মামলাবাজ লোকের কাছে কত সলাপরামর্শ লয়। পারিলে নূতন আইন ও নজীরই আপনিই পড়িয়া লয়—মকদ্দমার সময়ে উকীলের পাশে দাঁড়াইয়া বুদ্ধি জোগায— ফিরিয়ে আপিল করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয় তবু এতটুকুও ধৈর্য্য হারায় না এতটুকু বিচলিত হয় না চেষ্টা এতটুকুও মন্দ হইতে দেয় না। আর—বাড়ীতে ছেলেরা কি খায় কি খায় না কোন খাবার কি অবস্থায় কতটুকু খায় তাহার পড়ার চাপে কোনও হইয়া পড়িতেছে কি না যে বিদ্যালয়ে তাহারা পড়ে সেখানে যথেষ্ট আলো হাওয়া আছে কিনা তাহারা বাড়ীতে বা বাহিরে গোপনে ঔষধ সেবন করিতে পায় কি না—এ সংবাদ কয়টি পুত্রের পিতামাতা রাখেন? সংবাদ রাখা দূরের কথা এ প্রশ্ন করিতে প্রাতর্ভাব মস্তিষ্কের অবস্থার সম্বন্ধে যাহারা সন্দিহান নন। পুত্রের তথাকথিত সুস্থ অবস্থার সংবাদ তাহারা লইবেন ত না —আবার ছেলে অসুস্থ হইলে দুই চার দিন লঙ্ঘন দিয়া দুই চার দিন টোটকা সেবন করাইয়া দুই দিন হোমিওপ্যাথি সেবন করাইয়া তাহার পরে যখন অবস্থা জটিল হইয়া দাঁড়ায় তখন আজ এবেলা এ ডাক্তার ও বেলা ও ডাক্তার এইভাবে আঁকু পাঁকু করিয়া—শিশুটিকে বিসর্জ্জন দেন। কোন পিতা নিজ শিশুর অস্বাস্থ্যের কারণ বুঝিবার জন্য মকদ্দমা চালাইবার জন্য যে শ্রম করেন তাহার এতটুকু আয়াস স্বীকার করেন? কোন পিতা উকিল, কৌন্সিলি নির্ব্বাচন করিবার বুদ্ধির তিলার্দ্ধ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক নির্ব্বাচন করেন? কোন পিতা প্রাণের দায়ে চিকিৎসকের চিকিৎসা প্রণালীর দোষ গুণ নির্ণয় করিবার জন্য সেই রোগ সম্বন্ধে ওয়াকিব হাল হইবার চেষ্টা করেন? অথচ এরূপ না করিলে সময়ে সময়ে রোগীর প্রাণ যায়।

আজ তাই বলি হে বঙ্গবাসি। তোমরা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য এই পৃথিবীস্থ যাবতীয় জ্ঞানের ও আকাশের তাবৎ বস্তুতত্ত্বের তথ্য নির্দ্ধারণে তৎপর হও তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু নিজ দেহতত্ত্ব নিজ স্বাস্থ্যতত্ত্ব না শিখিলে তোমার কোনও কালে ভদ্রস্থতা নাই। আজ প্রত্যেক পাঠশালায় স্কুল কলেজে এবং প্রত্যেক জাতীয় বিদ্যামন্দিরে সযত্নে এই সকল জিনিষ শিখান চাই। ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতির অপেক্ষা স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব কম আবশ্যক নহে। ঘরে ঘরে স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে দেহতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব অধীত হওয়া চাই। ছেলে মেয়েকে শুধু মুখে আদর করিলে চলিবে না—শুধু মায়া মমতার জড়ানো মৌখিক আলিঙ্গন করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যদি ছেলেকে সত্য সত্যই ভালবাস যদি সত্য সত্যই ছেলেকে অমূল্য নিধি সাত রাজার ধন এক মাণিক স্নেহের গোপাল প্রভৃতি মনে কর তবে সে গোপালের [illegible] করিতে শিখ। দৈবযোগে শিশুপালন হয় না—হইয়াছে—কিন্তু দৈবযোগে বা [illegible] বলে শিশুপালন শিশুরক্ষা শিক্ষা করা যায় না। শিক্ষার অভাবে শুধু যে অনাদর হয় তাহা নহে অনেক সময়ে কুফলও হয়। গল্পে আছে একটি প্রভুভক্ত হনুমান তাহার নিদ্রিত প্রভুর সেবা করিতেছিল। একটা মাছি বারবার তাড়ান সত্ত্বেও প্রভুর দেহের উপরে বসিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করায় হনুমান স্থির করিল যে উৎপাতকারী মাছিকে কাটিয়া ফেলা উচিত। পুনর্ব্বার মাছিটি প্রভুর বুকের উপরে বসিবামাত্রই সে তরবারির একটি বিষম আঘাত করিল। ফলে মাছিটি মরিল বটে কিন্তু প্রভুও দ্বিখণ্ডিত হইলেন। শিক্ষিত না হওয়ার ফলই এইরূপ। কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমান ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে আমি শিক্ষার আদর্শরূপে নির্দ্দেশ করিতে প্রস্তুত নহি। আজ আমাদের দেশের প্রধান অভাব—অর্থের অভাব নয় সামর্থ্যের অভাব নয় ঐক্যের অভাব নয়—

জ্ঞানের অভাবই আজ ভারতের প্রথম ও প্রধান অভাব।

সেই জ্ঞানের অভাব ঘুচাইতেই হবে। জাতিবর্ণ স্ত্রীপুরুষ ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকেই শিক্ষাদান করিতে হইবে।

শিক্ষা বলিলে ইংরাজের স্কুল কালেজের শিক্ষাকে মনে করিতে ভুলিয়া যাও।

শিক্ষা বলিলে এমন শিক্ষাকে বুঝিতে আরম্ভ কর—যাহা

দেহে শক্তি
মনে স্ফূর্ত্তি } [illegible] আত্মনির্ভরতা
চিত্তবৃত্তির অবাধ স্ফুরণ অতএব মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ } ঘটায়।

[illegible] আজ হইতেও [illegible] চেষ্টা হউক—

(১) দেশী ভাষায় শিক্ষার প্রচলন

(২) দেহ ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব (স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে তৎসঙ্গে মাতৃত্ব ও গার্হস্থ্য[illegible]) শিশুতত্ত্ব ও সেই সঙ্গে শিশুপালন—সকল বিদ্যালয়ে অবশ্য পাঠ্য হউক।

(৩) দেশের ও বিশেষ করিয়া স্থানীয় ইতিহাস ভূগোলও অবশ্য পাঠ্য হউক। রামায়ণ মহাভারত পুনঃ পুনঃ অধীত হউক।

ইহা ছাড়া যে যাহা শিখিতে পারে শিখুক।

প্রত্যেক বালককে মৌলিক ভাবে দেহ ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখান হউক। প্রত্যেক যুবক যৌন সম্বন্ধীয় তথ্যে সুপণ্ডিত হউক। প্রত্যেক জনক জননী শিশুতত্ত্ব শিশুপালন শিশুচিকিৎসা ও খাদ্যবিচার সম্বন্ধে শিখিতে থাকুন।

বাড়ীতে কাহারো কোনও ব্যারাম হইলে প্রথমাবধি জনক জননীর সে বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া চাই। সে ব্যারামটির কারণ চিকিৎসা ও ভাবী ফল সম্বন্ধে অভিভাবকের সযত্নে এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। সুবিধামত চিকিৎসকের নিকটে তদ্বিষয়ে পরিচয় লওয়াও বাঞ্ছনীয়। এক কথায় মকদ্দমা তদ্বির করার চেয়ে বেশী যত্নে (যে হেতু প্রাণের দায়ে)

ব্যাবামের তদ্বির করা চাই। বাড়ীতে একটা ব্যাবাম হইলে কি ভাবে তাহার তদ্বির করিতে হয় তাহা মল্লিখিত ১৩৩ সনের ভাদ্র মাসের স্বাস্থ্য পত্রিকায় রোগীর বিবরণী বা রিপোর্ট প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

পুনশ্চ একটি লোক ডাক্তার করতে গেলে প্রায় দশ হাজার টাকা ব্যয় পড়ে। এ কথাটি অনেকে ক । যা বুঝা যাব জন্ম নিচে খরচের হিসাব দিলাম। খরচের দফা খুব কম করিয়া ধরা হইয়াছে।

(১) শৈশব (৭ বৎসর কাল)।— ৫টা সের ধরিয়া গড়ে দুধ ধরি ১ এক টাকা। দিন সের ধরিয়া দুধ ধরিলে ৭ বৎসরে দুধের দাম ১ ৮৲ দুইবৎসর কা ড চো ড়—গড় ১১ন এব দুং বৎসরে চিকিৎসার ব্যয় অনুমান ৪ ৲ [ি ।। শ্যা ১ বাড়ী ভাড়া ধরিলাম না।] মোট—২ ৲

(২) ি ন ৯ তে ৭ বৎসর (৭ বৎসর)। ।।বার যাবদ মাসে গড়ে ১ ৲ হিসাবে ৮৪ ৲ কাপড় চো প বাবদে ১ ৫৲ দু ধাি বাবদে ২ ৲ এব চিকিৎসা বাবদে ১৫ ৲—মোট ১১১৫ [শেষ দুর তিন বৎসর (৭ ৮ ও ৯ বৎসর) পাঠ্যাবস্থা। তাহাতে ২ ।। বেতন অনেকস্থলে লাগে না এবং প্রাইভেট মাষ্টারও থাকে না। পুস্তকের দামও সামান্য—এ কারণে উহার ব্যয় ধরা হইল না।]

( ) স্কুল (৮ বৎসর কাল ব্যাপী)। আটবৎসরে গড় পড়তা ৩৲ হিসাবে বে ন ২৮৮ পুস্তক ১১ ৲ পরীক্ষার ফি ১৫৲ খাই ।রচ ১১৫ ৲। কাপড় চোপড় ৪ ৲ মোট ১৯৬৫৲

(৪) কলেজে (২ বৎসর)। গড় পড়তা ৬৲ বেতন ধরিলে মোট বেতন ১৪৪৲ বই ৫ ৲ খাই খরচ ২ ৮৲ কাপড় চোপড় ১ মোট ৬ ৲

( ) বৎসর মেডিকল কলেজের খরচ।— বেতন ৯৬ ৲ পুস্তক ১৫ পরীক্ষার ফি ৬ ৲ খাই খরচ ৮৬৪৲ কাপড় চো ড় ৩ ৲ মোট

ব ডপ ব ১৫ ব সব বয়স তে ডাক্তারি পা ওয়া— এ দ া ব া ব ামে দি । টাকা করিয়া ধরিলেও ৩৬ ৲ উপার্জি হ ত। অতএব সর্বসাকল্যে ব্যয় দাড়াইতেছে অন্যূন ২২৮ + ১১১৫ + ১ ৫ + ২ ৩৪ + ৩ = ৯২৪২ টাকা।

এ ব্যয়ে একটা ডাক্তার তৈয়ারী হয়—আর এই দরিদ্রদেশে আমরা তাহাদিগের ষোল আনা কা উ ল করিতে পারি না। কি বিস্ময়ের বিষয়!

খাদ্য দোষে শিশু-যকৃত

(Infantile Liver)

[ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী]

মাতা যখন দেখিতে পান তাহার সযত্ন রক্ষিত স্নেহের পুত্তলি আদরের ধন জীবনের ধ্রুব তারা ক্রমে শুকাইয়া যাইতেছে ভাল করিয়া দুগ্ধ পান করিতেছে না গা গরম গরম বোধ হয় হস্তপদ সর্ব্বদাই গরম থাকে কুন্থন সহ ভাঙ্গা ভাঙ্গা মল ত্যাগ করে অথবা নিয়মিত রূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না খাদ্যে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, খিট খিটে হয় সর্ব্বদাই কাঁদে সহজে শান্ত হইতে চায় না, কোনরূপ স্ফূর্ত্তি নাই স্যাৎস্যাতে মাটীতে শুইয়া থাকিতে ভালবাসে জলপাত্র দেখিলে সতৃষ্ণ নয়নে তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জলসহ পাত্রটী মুখে টানিয়া ধরে,—তখনই মাতার মাথায় টনক পড়ে তাহার সন্তানের কিবা অসুখ হইয়াছে। তখনই গৃহিণী মহলে একটা সাড়া পড়ে—কেহ বলেন বাতাস লাগিয়াছে কেহ বলেন দোষ হইয়াছে কেহ বলেন এ ড়ে লাগিয়াছে। ঝাড়া ফিকা জলপড়া তেলপড়া, টোট কা ইত্যাদি অনেক ব্যবস্থাই তখন হইতে থাকে। তাতেও যখন শিশুর কোন উন্নতি দেখা যায় না তখন কর্ত্তার কাণে সে সংবাদ গৃহিণী কাঁদিয়া কাটিয়া প্রদান করেন—তুমি এদিকে দেখই না—কি লইয়া থাক কি কাজে ব্যস্ত আছ—এ দিকে সোনার ধন খোকা যে মরিতে বসিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন কর্ত্তার প্রাণে ঘোর আশঙ্কা আসে এবং

সকল কার্য্য ফেলিয়া তাহার প্রতিকারের জন্য ব্যস্ত হন। ছোট ছেলে কটু তিক্ত ঔষধ সেবন করিতে পারিবে না বলিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই ভাল—বন্ধুদিগের নিকট এরূপ স উপদেশ লইয়া ব ্রা মন একজন সবজান্তা পুঁথিগতবিদ্যা ফোঁটা ে া ডাক্তার বাবুকে ডাকেন। ডাক্তার বাবু প্রশের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বাটীস্থ সকলকে নিতান্ত বিরক্ত করিয়া এ পুঁথি সে পুঁথি ঘাটিয়া ২।৪টি অনুবটিকা খোকার জন্য পাঠাইয়া দেন। কিন্তু খোকার কোথায় কোন দোষে কি পীড়া হইয়াছে তাহার মোটেই অনুসন্ধান করেন না। তিনি কেবল লক্ষণের সহিত ঔষধের মিল দেখেন। ২ দিন ৪ দিন ক্রমে ১৫ দিন এক মাস গেল খোকা কিন্তু সারিল না। ক্রমে তাহার হাত পা মুখ ফোলা ফেনা ফ্যাকাসে রঙ আভযুক্ত হইল অন্যান্য লক্ষণও প্রবলতর হইতে লাগিল। জ্বর বেশী বাহ্যে প্রস্রাবের অনিয়ম খাদ্যে অনিচ্ছা দুগ্ধ পানের পরেই বমন নিয়ত ক্রন্দন ও অস্থিরতা বাড়িতে লাগিল। তখন কর্ত্তা পীড়া কঠিন বোধে আর একজন ডাক্তার ডাকিলেন হোমিওপ্যাথিক এ্যালোপ্যাথিক কবিরাজী প্রভৃতি অনেক চিকিৎসা হইল। শেষ শান্তি সস্ত্যয়নও করা হইল অনেক অর্থ ব্যয় হইল। ত খোকা স্নেহ মমতা ভুলিয়া মাতৃক্রোড় হইতে ঢলিয়া পড়িল সব ফুরাইল।

প্রায় প্রতি পরিবারে এরূপ শোক ক্রন্দনের রোল হা হুতা। নিয়ত দেখি ও শুনি কি লোকের কি একটা ধারণা হইয়াছে যে আনাড়ী ফোঁট ফেলা চিকিৎসাশাস্ত্রানভিজ্ঞ বই পড়া ডাক্তার না হইলে আর শিশু চিকিৎসা হইবেই না। এখন চিকিৎসার অর্থই ঔষধ খাওয়ান। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ আজ একটা কাল একটা আজ একজন কাল আর একজন আজ হোমিও কাল এ্যালো পরশু শাস্ত্রীয় ঔষধ এইরূপে নিয়ত ডাক্তার ও ঔষধ পরিবর্ত্তনে রোগ ত সারেই না বরং জটিল হয়। শেষে তার ভবলীলা শেষ হয়। পথ্যও যে চিকিৎসা, তা আর বড় কেহ মনেই করেন না। পথ্যের দোষেই রোগ ও পথ্যের সুব্যবস্থায় রোগ আরোগ্যের কারণ—এ কথা রোগী বা রোগীর আত্মীয় স্বজনকে বুঝান সহজ নহে। বর বুঝা ে া ে ্ া সকল দিকেই ক্ষতি হয়। স্বীকার আপনার ে ে পরের কোন উপকার করিতে বড় রাজি হন না। এরূপ সংবাদপত্রের প্রায় জনহিতকর পত্রিকা ছাড়া অনেক স্থান ... কোথায় ? শিশু যকৃত সম্বন্ধে এত কথা ... খাদ্যদোষেই জন্মে এবং শিশু খাদ্যের ... আরোগ্য হয়—কি ... প্রকারে লোক সমাজে তাহা বুঝাইতে ... ক্ষোভে এ রোগের ... নহে ডাক্তারের টাকা দিলে ... না ... যেন কেবল মাত্র খাদ্যের বিচার করার ... আজ কিছু বলিতে চাই।

অনেক ... এরূপ রোগ গ্রস্ত অনেক ... আমার চিকিৎসাধীন হইয়াছে। আমি ... পূর্ব্বক ... অনেক শিশুকে দেখিয়াছি ... ভাবে ... পীড়া শিশুকে আক্রমণ করে। এক বৎসর বা অধিক বয়স্ক শিশুদিগের মধ্যেই ইহা প্রবল হয়। সাধারণ সপ্তম বা অষ্টম মাসেই পীড়া আরম্ভ ... দন্তোদগম বা প্রসূতির পুনঃ গর্ভ সঞ্চারের সময়েই অধিকাংশ স্থলে রোগ লক্ষণ উপস্থিত হয়। ... ও ৪র্থ মাসেও এই পীড়ার সূচনা হইতে দেখা গিয়াছে। ... জন্মের কয়েক দিন পরেও কয়েকটা শিশুকে এই রোগে আক্রান্ত হইতে দেখিয়াছি। ... বৎসর বয়সের পর আর এ রোগ হইতে দেখা যায় না।

ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকল শিশুই এ রোগে আক্রান্ত হয়। সহর বা পল্লী ভদ্র বা অভদ্র স্বাস্থ্য পূর্ণ গৃহ বা স্থান—কোন স্থানেই এরূপ পীড়া হইতে অব্যাহতি পাইতে দেখি নাই। সযত্নে পালিত শিশু ও

না পাইলেই ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করে। মাতাও সন্তানের ক্রন্দন শব্দে উপদেশ উপেক্ষা পূর্ব্বক স্তন্য পান করাইয়া থাকেন। রাত্রে শিশু মাতৃক্রোড় হইতে স্থানান্তরিত করিতে না পারিলে ফল লাভ করা দুরাশা। দুষ্ট গাভীদুগ্ধ পান বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য অথবা তাহাকে জলসহ উত্তমরূপে ফুটাইয়া সেবন করান উচিত। শিশুর দন্তোদ্গম [illegible] বিস্কুট পাউরুটি ভাতরুটি ও ভাতের সঙ্গে সজী মাছের ঝোল অথবা দুধভাত দেওয়া [illegible]। [illegible] এই পীড়া দীর্ঘদিন ভোগ করে বলিয়া [illegible] বাছবিচার ঠিক রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। [illegible] মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে পথ্যের কঠিন ব্যবস্থা দ্বারা কোন উপকার হইবে না সুতরাং তাঁহারা ঐরূপ সহজসাধ্য বিকৃত পথ্যই প্রদান করিয়া পীড়া জটিল [illegible]য়া ফেলেন। তাঁহারা চান ঔষধ। আমি তরুণ সেফালিকাপত্রের নিষ্কাশিত রস এক ঝিনুক মাত্রায় প্রাতে কালে সেবন ও লিভারের উপর ওলঞ্চের প্রলেপ দিয়া অনেক স্থলে উপকার পাইয়াছি।

পীড়ার প্রথমাবস্থা হইতে পথ্যের বাঁধাবাঁধি নিয়ম ও উক্ত পত্রের রস সেবন এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারিলে রোগমুক্তির আশা করা যাইতে পারে।

দেশসেবা না ভণ্ডামী ?

যার [illegible] রাখে [illegible]। যিনি [illegible] স্বদেশ প্রেমিক যিনি নিজের জন্মভূমিকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন যাহার স্বদেশ প্রেমে কপটতা নাই স্বদেশ প্রেমের [illegible] (ferry) করেন না স্বদেশ [illegible] নয় তিনি দেশের [illegible] জাতির একাধিক [illegible] দেখিয়া মর্ম্মাহত না হইয়া পারেন না।

যিনি মুখে স্বদেশ কাজে [illegible]—যিনি অপরকে যে অন্যায় কাজ করিতে নিষেধ করেন নিজে সেই কাজ করেন—ভণ্ডামিতে যিনি সিদ্ধহস্ত—স্বদেশ প্রেমিকের ছদ্মবেশে যিনি স্বদেশের বুকে ছুরি বিদ্ধ করিতে [illegible] সেই [illegible] ভণ্ডামির মুখোস খুলিবার সময় আসিয়াছে।

মানুষ মাত্রের [illegible] আছে। অল্পবয়স্ক অপরিণত বুদ্ধি অনভিজ্ঞ যুবক সম্প্রদায়ের দুর্ব্বলতা আবার আরও বেশী। অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার অভাবে সবযুক [illegible] নিজেদের হিতাহিত সহজে বুঝিতে পারে না—আপাত সুখকর পরিণামে দুঃখজনক প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহারা নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরাই করিয়া থাকে। যৌবনে প্রবৃত্তি সহজেই চঞ্চল উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। সেইজন্য দূরদর্শী নীতিবিদ কবি পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন

যৌবন ধনসম্পত্তি প্রভুত্বমবিবেকিতা।
একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম।

যুবক সম্প্রদায়ের এই দৌর্ব্বল্যের সুযোগে একশ্রেণীর লোকে অর্থোপার্জ্জনের উপায় বাহির করিয়া লইয়াছে। যুবকদিগের ইন্দ্রিয়ভোগ প্রবৃত্তি স্বভাবতই অতি প্রবল। নানা কৌশলে সেই প্রবৃত্তিকে আরও উত্তেজিত করিয়া এই শ্রেণীর লোকে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম মানব মহাত্মা গান্ধি মর্ম্মান্তিক ব্যথার সহিত সংবাদপত্রের অশ্লীল বিজ্ঞাপনগুলির প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বাঙ্গালা সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠা খুলিলেই চক্ষে [illegible] তাহা

বন্ধ করিয়া দিতে হয়। অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদিগকে বাঙ্গলা সংবাদপত্র হাতে করিতে দেখিলেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে হয়। কেন?

কেন—না বাঙ্গলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত অধিকাংশ বিজ্ঞাপনই কুৎসিত রোগের উৎকট বীভৎস বর্ণনায় পূর্ণ। সে বর্ণনা পাঠ করিলে ঘৃণায় মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। যুবক যুবতীর ইন্দ্রিয়লালসার উদ্দীপনা করাই যে সেই সকল বিজ্ঞাপন প্রচারের উদ্দেশ্য ইহা বুঝিতে একটুও বিলম্ব হয় না। সুতরাং বিজ্ঞাপনদাতাদের অর্থাগমেরও সীমা থাকে না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সকল সংবাদপত্রে এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপন বাহির হয় সেই সকল সংবাদপত্রেই ঢক্কানিনাদে অশ্লীলতার নিন্দা প্রচারিত হইয়া থাকে। ইহা কি কপটতা নয়—ভণ্ডামি নয়? কিন্তু [illegible]। ভণ্ডামির কারণ কি? কারণ—অর্থলাভ। [illegible] খাতিরে অশ্লীলতার নিন্দা না করিলে চলে না অথচ অশ্লীলতাপূর্ণ বিজ্ঞাপন না ছাপিলে অর্থাগমও হয় না। কাজেই ভণ্ডামি ছাড়া আর গত্যন্তর কি?

আজকাল আবার আর এক বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। কেবল কুৎসিত ঔষধের বিজ্ঞাপন নয় বাঙ্গালার সাহিত্যও কলঙ্কিত হইতে চলিয়াছে। সম্প্রতি art বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য কথাটা বিলাত হইতে আমদানী। এই আর্টের দোহাই দিয়া সাহিত্যে শিল্পে চিত্রে নাট্যে অনাচার ব্যভিচারের চূড়ান্ত হইতেছে। অশ্লীলতার সমর্থন করে দুর্নীতির পক্ষে ওকালতি করিবার জন্য art কথাটি ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। দুর্নীতি প্রচার যাহারা সহ্য করিতে পারেন না তাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করিলেই দুর্নীতিবাগীশেরা আর্টের দোহাই দিয়া তাঁহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়।

আর্ট যাহা তাহা স্বর্গীয় পবিত্র। কিন্তু যাহা পাঠ করিলে শ্রবণ করিলে দর্শন করিলে মন অপবিত্র হয় চিত্তের বিকার উপস্থিত হয় তাহা art কেমন করিয়া হইবে? Art ও দুর্নীতি ইহাদের মাঝে একটা সীমারেখা থাকা আবশ্যক এবং আছেও। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ না হয় ততদূর পর্য্যন্ত art এর সীমা। সেই সীমা পার হইলেই ইন্দ্রিয়লালসার উদ্দীপনার আভাষ জন্মিলেই তাহা দুর্নীতি। উলঙ্গ শিশু art কিন্তু উলঙ্গ যুবক যুবতী দুর্নীতি। ক্রীড়াশীল হাস্যময় সদানন্দ শিশুকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখিলেও চিত্তের বিকার জন্মে না তাই তাহা art। কিন্তু পূর্ণ বয়স্ক যুবক যুবতীর উলঙ্গ চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাকে art বলিয়া চালানো চলে কি? আজ চলিতেছে কিন্তু এখন সে সীমারেখা মুছিয়া গিয়াছে—art ও দুর্নীতি একাকার হইয়া গিয়াছে। এ দুর্নীতি প্রচারে বাধা দিবার কেহ নাই art ও দুর্নীতির মাঝখানের মুছিয়া যাওয়া সীমারেখা খুঁজিয়া বাহির করিবারও কেহ নাই। কাজেই art এর নামে অশ্লীলতা দুর্নীতি কুরুচি—সবই অবাধে চলিয়া যাইতেছে।

এই দুর্নীতিকে art বলিয়া প্রচারের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য কি? একমাত্র উদ্দেশ্য—অর্থ লাভ। এই সব নগ্ন স্ত্রীমূর্তি লালসার উদ্দীপক বর্ণনা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাট্যাভিনয় হুহু করিয়া বিকায়—ইহাতে জলের ন্যায় অর্থ লাভ হয়।

মদ্যপানে মানুষ যে কিরূপ পশুতে পরিণত হয় তাহার দৃষ্টান্ত রাস্তাঘাটে অহরহ দেখিতে পাওয়া যায়। মদ্যপানে যে স্বাস্থ্যহানি ঘটে চিকিৎসক মাত্রেরই মত এইরূপ। কিছু দিন পূর্ব্বে মদ্য বর্জ্জনের আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। মদ্যপদিগের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই কি এই আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল? পাঠকেরা যদি এরূপ মনে করেন তাহা হইলে নিশ্চয় ভুল করিবেন। সে মদ্যবর্জ্জন আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল রাজনীতির খাতিরে—ইংরেজকে জব্দ করিবার জন্য। কিন্তু সে রাজনীতিক চাল যখন ব্যর্থ হইল—ইংরেজ যখন জব্দ হইল না তখন সে আন্দোলনও ক্রমে নিবিয়া গেল। এখন আর কাহারও মুখে মদ্য বর্জ্জনের নাম পর্য্যন্ত শুনা যায় না। তৎপরিবর্ত্তে এখন বিশেষ বিশেষ মাকাম

মদ্যের বিশেষ প্রশংসাপূর্ণ বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে। কেবল তাহা নয়। মদের বোতলের লেবেলে হিন্দুর পরমারাধ্য দেবদেবীর চিত্র বাহির হইতেছে দেবদেবীর নামে মদের বোতলের brand—মার্কাও প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু হিন্দুসমাজ এ সকল দেখিয়াও দেখে না। কারণ হিন্দু সমাজের প্রাণশক্তি নাই হিন্দু সমাজ জড়। অন্য সমাজের অন্য ধর্ম্মের এমন অসম্মান অপমান হইলে লাঠালাঠি দাঙ্গা হাঙ্গামা হইত রাস্তায় ড্রেণে মদের স্রোত বহিয়া যাইত কত মদের দোকান ধ্বংস হইত তাহা কে বলিতে পারে। যে সকল কাগজে মদের প্রশংসাপূর্ণ বিজ্ঞাপন বাহির হয় সেই সকল কাগজেই পেটের দায়ে পেশাব খাইতে হবে নিন্দাও কাগজে মধ্যে একটু আধটু বাহির হয় না তাও নয়। কথায় ও কাজে এমনই সামঞ্জস্য

এ রকম ভণ্ডামি শুধু আমাদের দেশেই আছে আর কোন দেশে নাই মনে করা ঠিক নয়। দেশের প্রতি অবিচার করা হইবে রাজনীতি অর্থনীতি বাণিজ্যনীতির খাতিরে নানা রকমের ভণ্ডামি নানা দেশে চলিতেছে। অহিফেনের কথাটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক। এই অহিফেন বিষ সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া লোকের কি যে সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা কে না জানেন? পাকা আফিম আর চণ্ডুর ধূম পান করিয়া চীনা জাতটাই অমানুষ হইয়া গেল। এই অহিফেনের ব্যবসা একটা মস্তবড় ব্যবসা। ইহাতে অজস্র অর্থাগম হয়। মহাচীনের হতভাগ্য অধিবাসীদের প্রতি অনুকম্পা পরবশ হইয়া জনকতক পাদ্রী চীনেদের রক্ষার জন্য সে দেশে অহিফেনের রপ্তানী রহিত করিবার জন্য প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। সে আন্দোলনের যৌক্তিকতা কেহ অস্বীকার করিতে পারিলেন না অহিফেনের রপ্তানী রহিত করিতে প্রতিশ্রুত হইতেই হইল। কিন্তু কাজে অবশ্য কিছুই হইল না। কারণ তাহাতে স্বার্থে ঘা পড়ে—অর্থহানি হয়। এই সেদিনও জেনেভায় কত আড়ম্বর করিয়া অহিফেন কনফারেন্স হইয়া গেল। কিন্তু ঐ আড়ম্বরই সার—বিশেষ কোন ফল হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই।

তার পর চায়ের কথা ধরুন। চা যে কত বড় অনিষ্টকর পদার্থ বিশেষতঃ আমাদের এই গরম দেশে এই কথা বুঝাইবার জন্য আমরা দশ বারো বৎসর ধরিয়া কত চেষ্টাই না করিতেছি। কিন্তু এতটুকু সুফল ফলিয়াছে দেখিয়া আশ্বস্ত হইতে পারি নাই। খাঁটি বিশুদ্ধ চাই শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। এই স্বভাবতঃ অনিষ্টকর পদার্থ যদি ভেজাল সহযোগে বিকৃত করা হয় তাহা হইলে সে জিনিসটা সদ্য প্রাণঘাতী বিষ হইয়া দাঁড়ায়। অল্পমাত্রায় সেঁকো কুচিলা প্রভৃতির ন্যায় চাও slow poison বা মৃদুবীর্য্য বিষের কাজ করিয়া থাকে। সংবাদপত্র সেবক ও সংবাদপত্র পাঠকেরা যে এ কথা জানেন না এমন মনে করিতে পারি না। কিন্তু চায়ের বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া এই বিষ সেবনে সহায়তা করিতেও তাঁহারা ইতস্ততঃ করেন না। সে বিজ্ঞাপনের ঘটাই বা কত। শীতকালে চা পান করিলে শরীর গরম হইয়া শীতের প্রকোপ অনুভূত হয় না। আবার গ্রীষ্মকালে চা পান করিলে শরীর শীতল হয়। চায়ের এই দুই পরস্পর বিরোধী বিপরীত ধর্ম্ম কত বড় বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল সে কথা মুখে ব্যক্ত করা যায় না!! এ রকম hypocrisy আর কত দিন চলিতে পারে

চায়ের ন্যায় তামাকও আর একটি অতি ভয়ঙ্কর পদার্থ। কিন্তু ইহার ব্যবহার তদনুপাতে সার্ব্বজনীন। ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ—প্রায় পনেরো আনা সাড়ে তিন পাই লোকে কোন না কোন আকারে তামাক সেবনে অভ্যস্ত। দোক্তা গুল নস্যি জরদা বিড়ি সিগারেট বর্ডসাই চুরুট হুক্কা পাইপ প্রভৃতি কত রকম আকারে ও নামে এই বিষটি যে ব্যবহৃত হয় সে সকল তত্ত্ব আমরা জানিও না। আর ইহার প্রচারের জন্য কত না অর্থ ব্যয় করা হয় মদ আফিম সিদ্ধি গাঁজা চরস প্রভৃতির ব্যবহার কিছু সংযত করিবার জন্য লাইসেন্স এবং বিক্রয়ের নির্দ্ধারিত সময়ের ব্যবস্থা

আছে এবং হয়ত তাহাতে সামান্য কিছু [illegible] থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু চা তামাক একেবারে নাম কাটা সেপাই—ইহাদের সাত খুন মাপ। ইহাদের বিক্রয় ব্যবহার সংযত করিবার জন্য কোনই ব্যবস্থা নাই। অথচ অনিষ্টকারিতায় ইহারা প্রথমোক্তগুলির অপেক্ষা একটুও কম নয়। তথাপি ইহারা কেন যে আবগারি আইনের আমলে আসে না তাহার কারণ বুঝা যায় না।

আবার irony of fate (অদৃষ্টের উপহাস) দেখুন। অনেক আন্দোলন আলোচনার পর আইন পাশ হইল যে ষোল বৎসরের কম বয়স্ক কেহ তামাক সেবন করিতে পারিবে না। কিন্তু ঐ [illegible] পথে ঘাটে বাহির হইলে ষোল বছরের কম বয়স্ক অনেক ছেলের মুখে সিগারেট বিড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নিষেধ করিবার কেহ নাই। [illegible] Statute Book এর শোভাসম্পাদন করিবার জন্য রচিত হইল, গতিক দেখিয়া এইরূপই বোধ হয়। আর আইন চলিবেই বা কি করিয়া? এ যে বড় আঁটুনী ফস্কা গেরো। ছোট ছোট ছেলেদের ধরিবে কি করিয়া? তাহারা অনায়াসে [illegible] পিছলাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু [illegible] তাগিদ দিলে যথার্থই আইন রচনার [illegible] সেটা [illegible] করা হয় নাই। যাহারা [illegible] কম বয়সের ছেলেকে তামাক বা [illegible] দ্রব্য বিক্রয় করিবে তাহাদিগকে [illegible] করিলে আইনটি যথার্থই ফলপ্রদ হইত। [illegible]—বিক্রেতা [illegible] অবাধ বিক্রয় চলিতেছে [illegible] করিতেছে। [illegible] বড় আশ্চর্য্যের কথা মনে হইতেছে— [illegible]।

স্বাস্থ্য নীতি শিক্ষা।

রোগ হইলে চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়। কারণ রোগী সাধারণত জানে না কেমন করিয়া তাহার রোগ হইল এবং কেমন করিয়াই বা রোগ আরাম হইবে। কিন্তু রোগ কেন হয় এবং হইলে কি উপায়ে তাহা আরাম হইতে পারে চিকিৎসক তাহা জানেন। সেই জন্য রোগ হইলেই লোকে চিকিৎসকের কাছে ছুটিয়া যায় যে তিনি রোগীর অবস্থা দেখিয়া রোগের কারণ নির্ণয় করিবেন ও আরোগ্যের উপায় নির্দেশ করিবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে সুস্থ থাকা বা অসুস্থ হওয়া না হওয়া শিক্ষার উপর অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

অনেক রোগ আছে যাহা কেন হয় জানা থাকিলে আমরা সাবধান থাকিতে পারি। তাহা হইলে সহজে সেই রোগ আমাদের আক্রমণ করিতে পারে না। আবার শরীরের সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থা আমাদের অনেক [illegible] উপর নির্ভর করিতেছে।

এই সব জ্ঞান শিখিতে হয়, ইহা অর্জ্জন করিতে হয়—যত্ন করিয়া শিক্ষা করিতে হয়। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় স্বাস্থ্যও একটা বিদ্যা। ছেলেবেলা হইতে যেমন করিয়া অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয় তেমনি স্বাস্থ্য বিদ্যাও উপার্জ্জন করিবার বিষয়। অন্য বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারিলে যেমন আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অনেকটা সুবিধা হয় স্বাস্থ্য বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারিলেও তেমন আমাদের অনেক উপকার হয়। সে উপকার বড় কম নয়। স্বাস্থ্য বিদ্যা জানা থাকিলে আমরা সুস্থ থাকিতে পারি অনেক রোগ সহজে আমাদের আক্রমণ করিতে পারে না। শরীর সুস্থ থাকিলে আমরা জীবনে অনেক সুখ

ভোগ করিতে পারি। শিশুকাল হইতে নিজের শরীরকে সুস্থ রাখিতে শিক্ষা করিলে আমরা দীর্ঘজীবী হইয়া সুস্থ ও সবল থাকিয়া জীবনকে পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারি।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে কোন ব্যক্তি বিশেষকে কিম্বা কতকগুলি লোককে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর কি না এবং তোমার বা তোমাদের পক্ষে স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করা উচিত কি না? তাহার উত্তর এই যে—হাঁ, ইহা সম্ভব। শুধু সম্ভব নয় অবশ্য কর্ত্তব্য।

এখন এই শিক্ষা দেওয়ার উপায় কি? উপায় অনেক আছে। উপদেশ অধ্যয়ন দৃষ্টান্ত—প্রভৃতি নানা উপায়ে এই শিক্ষা দেওয়া যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি শৈশব কাল শিক্ষা করিবার উপযুক্ত সময়। এই সময় যেমন সাধারণ শিক্ষা আরম্ভ করা হয় সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষারও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে এবং তাহা করাও উচিত। কেন না স্বাস্থ্য যাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় এমন কদভ্যাস দাঁড়াইয়া গেলে বেশী বয়সে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা লাভ করিলেও কোন ফল পাওয়া যাইতে পারে না।

শিক্ষার যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী আছে স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া তাহার একটা বা একাধিক প্রণালী নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া শিশুকে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বই পড়াইয়া স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দেওয়া যায় না। কাজেই তাহাদের উপদেশ এবং বিশেষ করিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দিতে হইবে। অনেক স্থলে দেখা যায় ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া মুখ ধোয় না দাঁত মাজে না। ইহার যে কি বিষময় ফল তাহা সকলেই জানেন। এ ক্ষেত্রে শিশুর এই অপরিচ্ছন্নতার জন্য শিশুর পিতা মাতাই প্রধানতঃ দায়ী। এবং ইহার ফল প্রধানত শিশুকে ভোগ করিতে হইলেও পরোক্ষভাবে শিশুর পিতা মাতাকেও যে কিছু পরিমাণ ভোগ করিতে হয় না এমন নহে।

এই সকালে উঠিয়া মুখ ধোওয়া ও দাঁত মাজা স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষার অন্তর্গত বিষয়। শিশুর পিতা মাতার উচিত উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা শিশুকে ইহার দোষ গুণ বুঝাইয়া দেওয়া। শিশু এক কথায় কিম্বা এক দিনে অবশ্য ইহা বুঝিতে পারিবে না। বিশেষ ধৈর্য্য সহকারে বারে বারে ধীরে তাহাকে অভ্যাস করাইতে হইবে। অভ্যস্ত হইয়া যাইবার পর কোন দিন মুখ ধুইতে বা দাঁত মাজিতে ভুলিয়া গেলে মুখে দুর্গন্ধ হইবে। তখন শিশু তাহা আপনি অনুভব করিয়া সু অভ্যাসের উপকারিতা এবং ইহা না করার কুফল বুঝিতে পারিবে।

শিশুকে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দিতে হইলে দেখা যাইতেছে যে তাহার পিতা মাতা ও অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। দুর্ভাগ্যের বিষয় এদেশের বয়স্ক ব্যক্তিরাও স্বাস্থ্যনীতি সম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। সেই জন্য ছেলে বুড়ো সকলেরই এক সঙ্গে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা লাভের আর একটা স্থান—বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে হইলে বাঁধা মত অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিতে হয়। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় স্বাস্থ্য বিদ্যাও পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিতে হয়। এ দেশের শিশু বিদ্যালয় গুলিতে সম্প্রতি স্বাস্থ্য বিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ syllabu প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সেই syllabu এর ছাঁচে ঢালিয়া প্রায় ঝুড়ি ঝুড়ি স্বাস্থ্যনীতিমূলক শিশু পাঠ্য পুস্তক পুস্তিকা বিরচিত হইয়া মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা তাহা মুখস্থ করিয়া গড় গড় করিয়া আবৃত্তি করিয়াও যাইতেছে। কিন্তু ছাত্রেরা পুস্তকে যাহা পাঠ করিতেছে নিজ নিজ জীবনে তাহা কতদূর অভ্যাস করিতেছে তাহা বলা কঠিন। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে ছেলেরা স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা করিতেছে কি না তাহা বলা যায় না। কারণ পুস্তক পাঠ করিয়া মুখস্থ করিয়া

দীর্ঘজীবন লাভের উপায়

আমাদের দেশে একটি চলতি কথা আছে— পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজে। তার মোটামুটি অর্থ এ যে পঞ্চাশ বছর পার হলেই সংসার ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া তপস্যা করিতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের জীবন উপভোগের কাল পঞ্চাশ বৎসরের অধিক নহে। এ প্রবচনটি সকলেই প্রায় ধ্রুব সত্য বলিয়া মানেন। পঞ্চাশ বৎসর পার হইলেই এদেশের লোকে নিজেকে বৃদ্ধ মনে করে, অপরেও তাই মনে করে। আমরা জলদগম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিতেছি কেন? কেন? কেন? পঞ্চাশ বৎসর পার হইলেই আমরা নিজেদের বৃদ্ধ মনে করিব কেন, সংসার উপভোগ ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া তপস্যায় বসিতে যাইব কেন?—কেন?—কেন?

কোন দিক দিয়াই আমরা এই প্রবচনটির সার্থকতা দেখিতে পাই না, তার সমর্থন করিতে পারি না। এই প্রবচনটি কেন যে ব্যর্থ তাহার একটু বিচার করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

শাস্ত্রে আমাদের আয়ুষ্কাল এক শত বৎসর। এ শতবর্ষব্যাপী জীবনকাল চারিভাগে বিভক্ত। যথা: বাল্যকাল, যৌবনকাল, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য। এই প্রত্যেক ভাগটি পঁচিশ বৎসর করিয়া—মোট একশত বৎসর। শাস্ত্রীয় হিসাব মত ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাল্যকাল। ২৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যৌবনকাল। ৫০ হইতে ৭৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রৌঢ়ত্ব। তৎপরে বার্দ্ধক্য।

কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান ধারণা অনুসারে ১৬ বৎসর বয়স হইলেই যৌবনকাল আরম্ভ হইয়া যায়। কাজেই আমাদের আয়ুষ্কালও সেই অনুপাতে কমিয়া আসিয়াছে। ষোল বৎসর বয়স হইতে না হইতেই আমরা যুবজনোচিত আচরণ করিয়া থাকি। এইরূপে অকাল বার্দ্ধক্যও আমরা ইচ্ছা করিয়া টানিয়া আনিয়াছি। কিন্তু ইচ্ছা করিলেই অতি সহজেই আমরা আমাদের আয়ুষ্কাল বাড়াইয়া লইতে পারি।

শাস্ত্রীয় হিসাবমত শতবর্ষ পর্য্যন্ত বাঁচিতে হইলে বাল্যকাল হইতেই তাহা অভ্যাস করিতে হয়। বাল্যকাল হইতেই শিশুকে এই তিনটি বিষয়ে অভ্যাস করাইয়া দিতে হয়— খাদ্য, ব্যায়াম ও বিশ্রাম। এই বিষয়গুলি ঠিক হইলে শরীর সহজে পীড়িত হয় না, রোগ সহজে দেহকে আক্রমণ করিতে পারে না। শিশুর শরীরের অবস্থা উপযোগী খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া দিতে হয়। তাহার সামর্থ্যোপযোগী ব্যায়ামের মাত্রা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হয় এবং সে যাহাতে নিয়মিত সময় বিশ্রাম করে সে দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়। কিছুদিন ধরিয়া অভ্যাস করাইলেই যথেষ্ট হইল—তার পর কলের মত সহজ সরল ভাবে জীবনধারা বহিয়া চলিয়া যায়—আর কিছুই ভাবিতে হয় না।

উঠন্ত মূলো পত্তনেই চেনা যায়। শিশুর শারীরিক অবস্থা দেখিলেই তাহার জীবনকাল কতদিন হইতে পারে তা কতকটা আন্দাজ করিয়া বলিতে পারা যায়। দেহানুযায়ী পূর্ব্বোক্ত তিনটি বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শিশুকে তাহা অভ্যাস করাইয়া দিলে সেই আনুমানিক আয়ুষ্কাল আরও অনেক দিন বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এই তিনটি বস্তুর মধ্যে খাদ্যই প্রধান। উপযুক্ত খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিলেই আয়ুষ্কাল অতি সহজে ও স্বচ্ছন্দে বর্দ্ধিত হইতে পারে। বাল্যকাল বৃদ্ধির সময়। এই সময়ে সর্ব্বাঙ্গ পুষ্ট হইতে থাকে। ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বৃদ্ধি চলে। ২৫ বৎসর বয়সে শরীর পূর্ণ পরিণতি লাভ করায় তখন যৌবন আরম্ভ হয়। খাদ্য সুনির্ব্বাচিত হইলে ঔষধের

প্রস্তুত করা আবশ্যক। বৎসর বৎসর এই ষ্ট্যাটিষ্টিক্‌স প্রস্তুত করিয়া তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে জাতিগত ভাবে আমাদের দৈহিক উন্নতি হইতেছে কি অবনতি হইতেছে। উন্নতি হইলে মঙ্গল। কিন্তু অবনতি হইলে বুঝিতে হইবে কার্য্যপ্রণালীতে ত্রুটি আছে। তখন তাহার সংশোধন করিতে হইবে। এই ভাবে কিছুকাল চলিলে পূর্ব্বোক্ত প্রবচনটির সংশোধন করা আবশ্যক হইবে।

স্বাস্থ্য

[শ্রীহরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

মোহের বিষ। যৌবন ফুরাইয়া গিয়াছে। এ জীবন নশ্বর এ সংসার অনিত্য—এ ভাবটা যে একটু শিথিল হইয়াছে তাহাকে জাতীয় নবজীবনের পল্লবরাগ বলা যাইতে পারে। আর এ জীবন ও পরজীবন এক পাশ এ দিক ও দিক মাত্র। আমাদের আমিত্ব এজীবনের বাল্য কৈশোর যৌবন ও বার্দ্ধক্যের মধ্যে যেরূপ অক্ষুণ্ণ ভাবে চলিয়া আসিতেছে—পর জীবনেও সেইরূপই থাকিবে। যাহাদের ইহজীবনে সুখ শান্তি ও আশা নাই তাহাদের মৃত্যুর পরেও নাই ইহা একপ্রকার অবধারিত সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিয়া স্বর্ণময় ভবিষ্যৎ পাইবার আশা আকাশ কুসুম বা স্বপ্ন ভিন্ন আর কিছু নহে।

২। ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিলেও—নিজ নিজ জীবন—নিজ অস্তিত্ব ও সাহিত বিশ্বের আদান প্রদান—এ সকলের কাছে কম প্রিয়। কি রোগী কি ভোগী কি ধনী কি দরিদ্র কি সবল কি দুর্ব্বল সকলেই সর্ব্বদা ইহার স্থিতি ও স্থায়িত্বের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহা করিতেছেন। এমন কি জীবন এতই প্রিয় যে গলিত নখদন্ত পলিতকেশ বৃদ্ধ স্পন্দহীন গলিত কুষ্ঠ চিররোগী পরান্নভোজী পরাধীন মানবগণও অনন্ত জগতের মধ্যে নিজেকে সুখী বলিয়া মনে করে। কেহ মরিতে চায় না। অবশ্য মৃত্যু ও মৃতের কথা ভাবিতে বিমর্ষ হইয়া থাকে। জীবনে প্রীতি প্রত্যেক মানবেরই স্বতন্ত্রতম সত্য বা অনাহত ধর্ম্ম। কাজেই ভাবনার কিছুই না বলিয়া আর ঠেলিয়া ফেলিবার যো নাই। দুঃখের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াই হউক কি সুখেই হউক ইহার মধ্যেই সত্য শিব সুন্দর ফুটাইয়া তুলিতে হইবে এবং যিনি যতটা ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছেন বা পারিবেন, তিনিই সংসারে মানবমণ্ডলীর কোটা নয়নের সম্মুখে ততোধিক পরমরমণীয়—অনবদ্য সুন্দর আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন ও হইবেন।

৩। সমস্ত জগৎই কম্পনশীল। দুঃখে প্রিয়মান হইয়া জড়ের ন্যায় নয়ন মুদিয়া থাকিলে সুসার কিছুই নাই বরং মুদ্রিত নয়নে অনন্ত মৃত্যুর উপাসনা না করাই মঙ্গলদায়িনী প্রকৃতির ইঙ্গিত বলিয়া বোধ হয়। যাহাতে এই পৃথিবীকেই শান্তি সুধা পরিপ্লুত করা যায় যাহাতে ধরাতেই অমরার সৃষ্টি করা যায় তজ্জন্য প্রত্যেকেরই বদ্ধপরিকর হওয়া কর্ত্তব্য। জীবনে আমরা সুখী হইব শান্তি আনিব—পৃথিবীর প্রত্যেক স্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করিব সুব্যবস্থা বিধান করিয়া দুঃখ দারিদ্র্য ও অকাল মৃত্যু হইতে দূরে অবস্থান করিব এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া প্রত্যেকেরই কার্য্য ক্ষেত্রে পদার্পণ করা শ্রেয়। এই পৃথিবীতে যত প্রকার দুঃখ ও বিড়ম্বনা বিদ্যমান আছে স্বাস্থ্যহীনতা তাহার মধ্যে প্রধান ও উন্নতির পরিপন্থী। স্বাস্থ্যরক্ষা বা নিজের অস্তিত্ব সম্যকরূপে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা প্রত্যেক সৃষ্ট প্রাণীরই প্রধান ধর্ম্ম। এই স্বাস্থ্য শরীরে—মনে—

আশ্রয়। যাহার শরীর সুস্থ নয় তাহার মনও দুষ্ট—তাহাতে আত্মার স্পন্দনও অতি মন্দ। তাই ঋষি শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং এই মহামন্ত্র কতই না উল্লাসের সহিত গাহিয়াছেন।

৪। জীব সৃষ্টি কৌশল—জন্মমৃত্যু—জড়ের সহিত চৈতন্যের সংযোগ বিয়োগের নিগূঢ় তত্ত্ব—অধ্যাপি মানব বুদ্ধির অগম্য হইলেও দেহ রক্ষার প্রয়োজনীয় তত্ত্ব এক প্রকার সকল সুসভ্য মানব সমাজই অবগত আছে। যাহাতে সর্ব্ব সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারে তৎ সম্বন্ধে সকলকেই শিক্ষা দেওয়া ঠিক। স্বাস্থ্য সম্বন্ধ সাধারণ বিষয়গুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষার অঙ্গীভূত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

৫। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এদেশবাসী সকলেই বড়কটা উদাসীন। তদ্ধেতুই এদেশ প্লেগ কলেরা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি যমদূতবর্গের নিত্য লীলা নিকেতনে পরিণত হইয়াছে। ব্যারামে ভোগা—চিকিৎসার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মূল্যবান স্বাস্থ্য হারাইয়া করুণ মনে মর্ম্মান্তিক বিলাপে দিক দেশ পূর্ণ করা যেন এ দেশে একটা অভ্যস্ত ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। দেশবাসিগণ যাহাতে ব্যারাম না আইসে সেজন্য পূর্ব্ব হইতে তেমন মনোযোগ দিতে চাহে না। তাহাদের মৃত্যুর পর শেষ প্রবোধ নিয়তি কেন বাধ্যতে। যেন নিয়তির সমস্ত দণ্ড একমাত্র দেশী লোকের উপরই পড়িতেছে।

৬। কংগ্রেসই বল কনফারেন্সই বল বিজ্ঞান ইনসটিটিউটই বল ধর্ম্মসভাই বল স্বদেশী আন্দোলনই বল—দেশ হইতে অকাল মৃত্যুর সহচর প্লেগ কলেরা প্রভৃতি রোগগুলিকে একেবারে নির্ম্মূল করিতে না পারিলে বোধ হয় দেশে এমন দিন আসিবে যে বিজ্ঞান থাকিবে কিন্তু বিজ্ঞ আর থাকিবে না ধর্ম্ম থাকিবে কিন্তু ধার্ম্মিক আর থাকিবে না আন্দোলন থাকিবে কিন্তু স্বদেশী আর থাকিবে না সকলই শূন্য বলিয়া বোধ হইবে। পরন্তু যাহারা স্বদেশী বলিয়া গৌরব করেন মাতৃ সেবক বলিয়া আত্মশ্লাঘা করেন জাতীয়তা রক্ষার জন্য যাহাতে দেশে স্বাস্থ্যোন্নতির বিশিষ্ট বিধি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়া বিধেয়। এই জন্য সভা সমিতির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ধনী লোকদের অর্থ সাহায্যের ব্যাপকতা ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মবীরদের জীবনোৎসর্গরূপ মহৎ ব্রতের প্রচুরতার তীব্র অভাব উপলব্ধ হইতেছে।

৭। সুস্থতার অকাল নাশ দেশে ঘটাইতে হইলে যতবিধ সুপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে সংযমকে কেন্দ্রীভূত করিয়া সুসঙ্গত উপায়ে পরিমিত পবিত্র খাদ্য পানীয় বস্ত্রাদির বন্দোবস্ত ও ব্যায়াম (শ্রম) প্রথা প্রচলন করা তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। দেশের দুর্দ্দিনে যাবজ্জীবেৎ সুখমপ্রিয়ম নীতিকে একটুকু ঘরের বাহির করিয়া দিলেই আমরা দেখিব দেশের অবস্থা কি শোচনীয়। ধনীরা চর্ব্ব্যচূষ্য লেহ্য পেয়াদি সুখসেব্য মূল্যবান সামগ্রী আবশ্যক হইতে প্রচুর পরিমাণে উদরস্থ করিতেছেন আর ব্যায়ামের অভাবে উদরাময় বাত ইত্যাদি নানা ব্যাধিসহ কোনমতে দিন গুলি কাটাইতেছেন। পক্ষান্তরে দেশের দশ—মুটিয়া মজুর কৃষক—যাহাদিগকে দিন মজুরী করিয়া—গতর খাটাইয়া দিন কাটাইতে ও জীবন ধারণ করিতে হয় তাহারা অনাহারে অর্দ্ধাহারে কুৎসিত আহারে দিনের দিন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ধীর ভাবে ভাবিতে গেলে ইহা কতই না ভয়াবহ শোচনীয় পরিণামের বিষয়। প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের দুইটা দিকই নাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে ধনী ও গরীব উভয় শ্রেণীই অতিরিক্ত আহারে ও অনাহারে ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। যাহাতে দেশের সাধারণ লোক শ্রমজীবী সম্প্রদায় কৃষককুল স্বাস্থ্যকর আবাসে থাকিতে পারে পেট ভরিয়া দুইটা খাইতে পারে এবং পবিত্র জল বায়ুর উপকারিতা শরীরের উপর উপলব্ধি করিতে পারে তজ্জন্য প্রচুর কাজের সৃষ্টি অন্নের পন্থা আবিষ্কার ও কোন সঙ্গত উপায়ে শিক্ষার বিশিষ্ট ব্যবস্থার প্রয়োজন। যাহাতে তাহাদের শুষ্ক ও ম্লান ওষ্ঠাধর ও অনশনক্লিষ্ট নয়ন কোটর হইতে কালিমার রেখা চিরদিনের জন্য অপনীত হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বিশুদ্ধ জল বায়ুর উপকারিতা ও দূষিত জল বায়ুর অপকারিতা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে সভা সমিতি ও প্রধান প্রধান সহরে সঙ্ঘ স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে দেশের ভিক্ষুকগণ ভিক্ষার জন্য যেরূপ গৃহ হইতে গৃহান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায় দেশের উন্নতিকামী লোকদিগকেও সেইরূপ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে গাথা—স্বাস্থ্য লাভের উপায়—নিকটায় ও নিরক্ষর দীপবাসীদের নিকট গাহিয়া বেড়ান ঠিক। স্বাস্থ্যের সহিত জন্মমৃত্যু ও জীবনের কি নিকট সম্বন্ধ তাহা প্রত্যেকে যাহাতে সুন্দররূপে আয়ত্ত ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে তৎপ্রতি যত্ন লওয়া উচিত। আর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে লোকদের ঔদাসীন্য যাহাতে লোপ পায় স্বাস্থ্যকে সুখের আকর বলিয়া যাহাতে তাহারা জানিতে পারে তাহাও গভীরভাবে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া ঠিক। কার্য্য ব্যপদেশে ধনীদের অকাতর অর্থদান দেশশুদ্ধ লোকের সহানুভূতি অকাতর পরিশ্রম স্বার্থত্যাগ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্বজ্ঞান নিরতিশয় আবশ্যক।

ঘণ্টা বাঁধিবে কে?

(য় পর্য্যায়)

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি এ]

অন্ধবাদেরা বলিয়াছেন—পল্লীতে মনের ও দেহের খাদ্যের (food for body as well as for soul) অভাব তাই পল্লীবাসী সহরবাসের জন্য এত ব্যস্ত। কথাটি ভাবিবার বিষয়। পল্লীবাস অনেকেই ছাড়িয়াছেন তার কারণ সেখানে শিক্ষিতেরা নিজের রুচি বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন না। পল্লীবাস করিতে হইলেই মামলা মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে হয়। যিনি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে জানেন না অথবা দিতে চান না চতুর পল্লীবাসী তাহাকে মূর্খ উপাধি দিয়া থাকেন। অবশ্য কেবল মূর্খ উপাধি দিয়াই তাহারা ক্ষান্ত থাকেন না—লোকটাকে নানাপ্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। ফলে তাহাকে সহরে পলাইয়া বাঁচিতে হয়। দেখা গিয়াছে পল্লীতে বাস করিতে হইলে যথেষ্ট অর্থ লোক বল চতুরতা ও বুদ্ধি থাকা অত্যাবশ্যক। পল্লীবাসী প্রতি বেশী দুষ্ট ও অর্থবান্ লোককে যতটা খাতির করে বিদ্বান ও নিঃস্ব প্রতিবেশীকে ততটাই কৃপার চক্ষে দেখেন। যাহারা পল্লীগ্রামে কোনও মান নাই এ কথা তাহারা বিশ্বাস করিবেন না জানি কিন্তু কথাটি সত্য। যদি পল্লীসংগঠনকামী হইবেন—চতুর বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে যাইবেন তাঁহাকে একাধারে চতুর ও হইতে হইবে। আমি নানাপ্রকার সংগঠন কার্য্যে দেখিয়াছি যে কর্ম্মীর এই চতুরতার ও বিষয় জ্ঞানের অভাব তাহার কার্য্য পণ্ড করিয়াছে।

পল্লীবাস করিতে হইলে দল পাকাইবার অথবা দলে যোগ দিবার মত প্রবৃত্তি থাকা আবশ্যক। গুপ্ত কবি ঠিক বলিয়াছেন—

যেখানে বাঙ্গালী সেখানে দলাদলি।

পল্লীতে দলাদলির উত্তেজনা এত বেশী যে অনেকের গ্রামে দলাদলি না জমাইতে পারিলে বেশ অসুবিধা হয়। মামলাবাজ একদল লোক প্রতি গ্রামে সংগঠন কামী লক্ষ্য করিয়া থাকেন—ইহারা বিরাট অধ্যবসায়ের সহিত প্রতিনিয়ত সৎপরামর্শ দিয়া পল্লীবাসীর মামলা মোকর্দ্দমার সহায়তা করেন। সৎপরামর্শ দিবার সময় ইঁহারা পারিশ্রমিক লন না সত্য কিন্তু দেখা গিয়াছে মামলা উপলক্ষে সহরে যাতায়াতে ইঁহাদের বেশ লাভ হয়। উকীল নিযুক্ত করা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশীর ভিটে ক্রোক্ হইয়া যাওয়ার দিন পর্য্যন্ত ইঁহারা অর্থ সমান ভাবেই রোজগার করেন। সংগঠনকামী

ইহাদিগকে দয়া করিলে ইঁহারা একটুও দমিবেন না পরন্তু তাহার নামে নং মামলা রুজু করাইবেন। আইন ইঁহারা পড়েন নাই কিন্তু উকীলকে ইঁহারা শিখাইতে পারেন। সরকার দশ বারার আসামী ঠিক করার সময় ইঁহাদের উপর কেন লক্ষ্য রাখেন না জানি না। পল্লীবাস করিতে হইলে ইঁহাদের অনুগত থাকিতে হইবে।

আমাদের এক বন্ধু বলিতেন—পঞ্চমকারে পল্লীজীবন ব্যতিব্যস্ত। তান্ত্রিকের পঞ্চমকার নহে—ইহারা বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য—ম্যালেরিয়া মহাজন মামুলি ও মোহ। —মামুলি অর্থে গতানুগতিক জীবন যাপনের অভ্যাস মোহ অর্থে দলিল ও দায়েরের প্রতি অহেতুকী ভক্তি। আমার সহবাসী বন্ধুরা বলিবেন এ দিকের নিন্দা বাদ। আমার বাঙ্গালীর প্রীতি—

সেত স্নেহ দিয়ে তৈরী যার স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। আমার দুর্ভাগ্য যে আমি দেখিয়াছি পল্লীবাসীর জীবন এক দুঃস্বপ্নে ভরা। মেয়ে বড় হলেই বিয়ের ভাবনা অপেক্ষা জাতিপাতের দুঃস্বপ্ন ও পিতৃবিয়োগ হলে শোক অপেক্ষা জ্ঞাতিভোজন ও ব্রাহ্মণ ভোজনের দুঃস্বপ্ন। আর স্মৃতি সে ত আরো দুঃখময়—একদিকে রঘুনন্দনের হাঁচি টিক্‌টিকি—আর একদিকে পল্লীসমাজধ্বজদের গত অত্যাচারের বহু স্মৃতি।

সংগঠনকামীকে এই পুঞ্জীভূত বাধার সহিত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এ বড় বিষম ঠাঁই। তুমি সেবা করিতে যাও তাদের গ্রামে স্কুল খোলো জঙ্গল কাট অথবা মামলা মোকদ্দমা মিটাইবার চেষ্টা কর—পল্লীবাসী উহার মধ্যে মতলব (motive) আবিষ্কার করিবেই করিবে। সৎ কাজকে সৎ ভাবে গ্রহণ করার জন্য যে উদার চিত্তবৃত্তির প্রয়োজন তাহা ইহাদের নাই।

তোমার মেয়ের ভাল বিবাহের সম্বন্ধ আসিলে ইহাদের গাত্রদাহ হইবে—বরপক্ষকে পত্র দিয়া কুৎসা রটনা করিবে অথবা নিজের ট্যাকের পয়সা খরচ করিয়া নিজে যাইয়া নিন্দা করিয়া আসিবে—এমনই পরশ্রীকাতরতা। গল্প আছে যে প্রতিবাসী পুত্র মুন্সেফ হইয়াছে এ সংবাদে কেহ মনকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিলেন যে মুন্সেফ হইলে কি —মাছ খেতে পাবে না।

কথায় কথায় বয়স্কদের মধ্যে হস্তবজ্রনোচিত গালাগালি হইতে দেখা যায়। সন্ধ্যায় বৈঠকে গল্পগুজবের সঙ্গে সঙ্গে পরনিন্দার আলোচনাও কম হয় না। বয়স্কা কন্যা অথবা বিধবা যে বাড়ীতে থাকে তার আশে পাশে উঁকি দিতে দিতে গ্রাম্য মাতব্বরেরা রাত কাবার করেন। যাঁহারা নারী হরণ করেন রাত্রিতে তাঁহারা দিবাভাগে পতিতোদ্ধার দোহাই রমণীর বর্জনের ব্যবস্থা করেন। ইঁহারা মামলা করিতে প্রস্তুত থাকিবেন যদি কোন যুবতী নারী ইঁহাদের গ্রামের কোন বাড়ীতে গোপনে কাহারও বাক্সের প্রতি বেশী নজর পাতিত হয় ইহারা তাহাদের কঠোর সামাজিক দণ্ড দেন। যে বিধবা অভাবের প্রবল তাড়না। প্রতিদিন সমাজধ্বজদের কাছে ভিক্ষা করে। ওদের যে ভিক্ষা না মিলিলে অসতী হন তাহাও তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে কানে দোষ দিয়া বলিবেন বিধবা অসতী হওয়া অপেক্ষা আত্মহত্যা করা উচিত ছিল। এমনই চমৎকার যুক্তি ইঁহাদের

এ পল্লীর নৈতিক আবহাওয়া। এ সকল দুর্নীতির জন্য পল্লীজীবন এত দুঃখময় হইয়াছে। বিপদে আপদে কাহারও সহানুভূতি পাওয়া যায় না—গ্রামবাসীদের জীবনেও আনন্দ নাই। সন্ধ্যার পর নীরব প্রান্তে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখা যায়— আনন্দ কোলাহল নাই—হরিসভা কবে উঠিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি? সংগঠনকামীকে এই পরিবর্ত্তনের কারণ লক্ষ্য করিতে হইবে—ভাবিতে হইবে।

আমার মনে হয় পল্লীর এই দুর্গতির কারণ শিক্ষিত ও গ্রামের শীর্ষস্থানীয়দের পল্লীত্যাগ। জমিদার পল্লী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় ইমারতীর লোভে গিয়াছেন— মধ্যবিত্ত লোকেরা আশায় বাস্তু ভিটা ছাড়িয়াছেন। গ্রামে নেতাদের অভাবে মোড়লদের রাজত্ব হইয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞ ও শিক্ষিত ব্রাহ্মণের মূর্খ পুত্রেরা পিতার নামের

দোহাই দিয়া অপঠিত শাস্ত্রের বর্ণনা করিয়া পল্লীবাসীকে ঠকাইয়া দুপয়সা করিতেছেন। ফলে ভাসিয়াছে ম্যালেরিয়া। টোল উঠিয়া গিয়াছে— গাঁয় পঞ্চায়েৎ ভাঙ্গিয়া সবাই স্ব স্ব প্রধান হইয়াছেন।

যিনি পল্লীসংগঠন করিতে যাইবেন তাঁহাকে প্রথমত বাধা দিবে—প্রবীণ দল! দ্বিতীয় গ্রামের জমিদারের কর্মচারিগণ। তৃতীয়ত গ্রামবাসী জন সাধারণ। কর্মীর ধৈর্য্যও যেমন দরকার তেমনি দরকার দীর্ঘকালব্যাপী সংগঠন কার্য্যের। নৈতিক আবহাওয়া বদলাইতে হইলে শিক্ষিতদের গাঁয়ে গিয়ে হইবে—নিজের জীবনযাত্রার মধ্য দিয়া ও নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের সাহায্যে তাদের দুর্দ্দশা দূর করিতে হইবে।

আজকাল প্রায়ই দেখা যায় গ্রামের অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্নরা ভোটের সময় [illegible] গ্রামবাসীকে কৃতার্থ করেন আবার ভোটের পালা সাঙ্গ হইলেই কাকস্য পরিবেদনা। এই সব মতলব লইয়া পল্লীবাসীদের সঙ্গে মিশিতে গেলে প্রকৃত সমবেদনার সৃষ্টি কখনও হইবে না—স্থায়ী মিলন হইবে না। চালাকী দ্বারা কখনও কোন মহৎ কার্য্য হয় না। ইংরাজী শিক্ষার ফলে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে যে ব্যবধান গঠিত হইয়াছে তাহা দূর করিতে হইবে—গুপ্ত কবির মত বলিতে হইবে

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসীগণে
প্রেম পূর্ণ নয়ন মেলিয়া
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

প্রেম আসিলেই অপ্রেম দূরীভূত হইবে গ্রামে মনের মাঝে মিলিবে—গ্রাম বাসযোগ্য হইবে।

(ক্রমশঃ)

বাংলার মাটী

(দ্বিতীয়)

[[illegible] শ্রী[illegible] মজুমদার]

বঙ্গের অমর কবি রবীন্দ্রনাথের মর্ম্মস্পর্শী গানের সঞ্জীবনী শক্তিতে অনেকেরই হৃদয়ে বাংলার মাটী ও বাংলার জলের প্রতি সুসুপ্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতি জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। কবির বাঁশরী ঝঙ্কারে বঙ্গদেশ চিরকালই মুখরিত এবং সমাজের ক্রমোন্নতির জন্য যে টুকু কবিতা আবশ্যক বা লাগে কখনই সেটুকুর অভাব হয় নাই। সমাজের বিবর্ত্তনের জন্য কবিতার ন্যায় বিজ্ঞানও আবশ্যক। এতদুভয়ের সংমিশ্রণেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে কেবল কবিতারই রাজত্ব চলিয়া আসিতেছে। তাহার ফলে আমাদের চরিত্রের এক দিক বিকশিত হইয়াছে অন্যদিক বিকশিত হইতে পারে নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া আমরা যেরূপ মুগ্ধ হইতে পারি তাহার রহস্য ভেদ করিয়া সেরূপে জ্ঞানাঞ্জন করিতে পারি না। আমরা সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে বাংলার মাটীর একদিক যেমন কবির মনোমোহন সঙ্গীতে উদ্ভাসিত হইয়াছে অপর দিক সেরূপ বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিশ্লেষিত হয় নাই। বাংলায় কবি অনেক আসিয়াছেন কিন্তু বৈজ্ঞানিক দুই একজন মাত্র দেখা দিয়াছেন।

কবির কল্পনায় বাংলার মাটী শস্য শ্যামলা। কিন্তু বস্তুত কি তাহাই? বাস্তবিকই কি বাংলার সর্ব্ব স্থানে মৃত্তিকার উর্ব্বরতা এত অধিক যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফসল জন্মিয়া থাকে? ফলত তাহা নহে

এব হইতেও পাবে না। কা ণ বা লাব সকল স্থানের মৃত্তিকা সম শ্রেণীব ভূস্তব হইতে উৎপাদিত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন অন্যান্ত কাব।ও বর্ত্তমান বহিয়াছে। ঐ সমুদায় কারণেব উপর বঙ্গীয় মৃত্তিকা তত্ত্বে ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে পারে।

অনেকেই অবগত আছেন যে পৃথিবী সূর্য্যমণ্ডল হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। আকাশ পথে ক্রমা আবর্ত্তন কবিতে কবিতে উহা অনেক পবিমাণ আদিম তাপ বিকীবণ কবিয়া শীতল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পৃথিবীব উপবিভাগ অনেক পরিমাণে শীতল হইয়া গেলেও ইহাব ভিতরে এত উত্তাপ সঞ্চিত আছে যে লৌহ প্রভৃতি কঠিন ধাতুও দ্রব অবস্থায় বহিয়াছে। উপরেব যে অংশ শীতল হইয়া কঠিনীভূত হইয়াছে তাহা প্রায় ২ মাইল গভীব হইবে। এই ২ মাইল গভীর ভূপঞ্জর যে একবকম উপাদানে প্রস্তুত অথবা উপাদানগুলি সকল স্থানে একভাবে সজ্জিত তাহা নহে। পক্ষান্তবে ইহা বিভিন্ন স্তবে বিভক্ত। পৃথিবীর বয়সেব বৃদ্ধির সহিত এই সমুদায় স্তব ক্রমশ উৎপাদিত হইয়াছে। সুতবা সর্ব্বনিম্ন স্তব সর্ব্বাপেক্ষা পুবাতন ও সর্ব্ব প্রথম উৎপাদিত। সর্ব্বোচ্চ স্তব সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক।

যদি পৃথিবীর প্রথম বয়স হইতে কোনরূপ নৈসর্গিক দুর্ঘটনা না হইত তাহা হইলে স্তর গুলি উৎপত্তির সময় অনুসাবে পব পব সজ্জিত থাকিত কিন্তু অগ্ন্যুৎপাত ভূমিকম্প ঝটিকা নদ নদীব স্রোত বন্যা সমুদ্রেব তুফানোচ্ছ্বাস বারিপাত প্রভৃতি ক্ষয়কাবী শক্তি দ্বাবা অনেক স্থানেই স্তবসমূহেব আদিম সংস্থান ব্যবস্থাব বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। পুরাতন স্তব নূতনেব উপব আসিয়াছে নূতন পুরাতনেব নীচে গিয়া পড়িয়াছে সমুদ্রগর্ভ পর্ব্বতে উন্নীত হইয়াছে পর্ব্বত সমুদ্র গর্ভে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এত বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকেব তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভূপঞ্জরের স্তবসমূহের আদিম সংস্থান প্রণালী আবিষ্কাব করিতে সমর্থ হইয়াছে। নিম্ন হইতে উপর দিকে অগ্রসর হইলে ভূপঞ্জবেব যে সমুদায় স্তর দৃষ্ট হয় সে গুলিকে চাবি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। [১] এজোইক (Azoic) [২] পেলিওজোইক (Paleozoic) [৩] মেসোজোইক (Mesozoic) এবং [৪] নিয়োজোইক (Neozoic)। সর্ব্ব নিম্নস্তবে জীব জন্তুর চিহ্ন একেবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না। পেলিওজোইক যুগেব স্তবসমূহে জীবনেব প্রাথমিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলির অধিকাংশ সামুদ্রিক এবং অধিকাংশ প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মেসোজোইক যুগেব সময় জলচর ব্যতীত স্থলচর জীব উৎপন্ন হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাহাদেব কোন প্রতিনিধি দেখিতে পাওয়া যায় না। নিয়োজোইক স্তরেই আমবা বর্ত্তমান সময়েব উদ্ভিদ ও জীব এবং তাহাদিগেব জ্ঞাতি দিগকে দেখিতে পাই। নিয়োজোইক শ্রেণীব নিওসিন নামক দ্বিতীয় স্তবেই প্রথম মানব দেখিতে পাওয়া যায়।

বঙ্গ দেশে পূর্ব্বোক্ত চাবি শ্রেণীব স্তরই অল্প বিস্তব পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ এজোইক এবং নিয়োজোইক শ্রেণীব স্তবেব দ্বাবা প্রায় সমভাবে বিভক্ত। এজোইক শ্রেণীব দুইটী সর্ব্ব নিম্ন স্তবেব নাম নিস (Gneiss) একটা পুবাতন অ বটী অপেক্ষাকৃত নূতন। অধ্যাপক হল্যাণ্ড নটাকে Peninsular Gneiss অথবা উপদ্বীপস্থ নিস বলে। বঙ্গ দেশেব সর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্ত হইতে গঙ্গাব তীববর্ত্তী প্রায় ১৪ মাইল দীর্ঘ এব ৩৫ মাইল প্রস্থ বিস্তীর্ণ ভূভাগ এই নিস অথবা প্রধানত ঐ নিসজাত মৃত্তিকা দ্বাবা আবৃত। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে যে সমস্ত প্রস্তব কিংবা মৃত্তিকা সলিল বাহিত কর্দ্দম (পলি) দ্বারা প্রস্তুত হয় সেগুলিতে স্পষ্ট স্তবেব পব স্তব দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ মৃত্তিকা অথবা প্রস্তরকে ভূ বিদ্যায় Sedimentary (পলিজাত) প্রস্তব বলে। নিস শ্রেণীব প্রস্তব পলিজাত। কিন্তু পলিজাত হইলেও ইহা অস্বাভাবিক উত্তাপ চাপ প্রভৃতিব দ্বারা এরূপ ভাবে পবিবর্ত্তিত বিপর্য্যস্ত ও স্থানচ্যুত হইয়া

গিয়াছে যে উহার আদিম স্তরসমূহ অনেক সময় পরি লক্ষিত হয় না। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উত্তাপের প্রসারণী শক্তির প্রভাবে নিম্ন হইতে এক দ্রবীভূত পদার্থ ইহার অভ্যন্তরে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহাকে গ্রানিট্ (granite) বলে। গ্রানিট আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত লাভার ন্যায় উপরে উঠিয়া পড়ে না জমির উপরি ভাগের অনেক নিম্নে থাকিয়া যায়। গ্রানিট অবশ্য অগ্ন্যুৎপন্ন প্রস্তর (igneous rock)। গ্রানিট খনিজ পদার্থসমূহ অনিয়মিত ভাবে মিশ্রিত। কিন্তু নিসে সেগুলি প্রায় সমান্তরালভাবে অবস্থিত ও সজ্জিত থাকিয়া স্তরিভূত বা সজ্জিত। নিস্ কে পরিবর্তনসম্ভূত (metamorphic) প্রস্তর বলে। ইহার কারণ এই যে ইহা অদৃষ্ট পরিজ্ঞাত হইলেও চাপ উত্তাপ ও রাসায়নিক শক্তি বিশেষে উহা অনেক পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ইহা এক প্রকার পলিজাত ও অগ্ন্যুৎপন্ন প্রস্তরের মধ্য বর্ত্তী স্থান অধিকার করে। অগ্ন্যুৎপন্ন প্রস্তর হইতে কুঞ্চিত (foliated) গঠন প্রণালী ও সম্ভেদ (cleavage) দ্বারা ইহাদের পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। অপর পক্ষে ইহাদের বিস্তারাকার এবং সময়ে সময়ে স্তরিবৎ গঠন প্রণালী ও পর্দ্দার (layer) অস্থায়ী অবস্থা ইহাদিগকে পলিজাত প্রস্তর হইতে পৃথক করিয়া দেয়। বঙ্গদেশে আদ্রা বাঁকুড়ার পশ্চিমাংশ ভাগলপুরের দক্ষিণাংশ কটকের উত্তর ও পূর্ব দার্জিলিং গয়ার উত্তর ও দক্ষিণ হাজারিবাগ মানভূম মুঙ্গেরের দক্ষিণাংশ পালামৌ রাঁচি সম্বলপুর সিংহভূমের মধ্যাংশ ও সাঁওতাল পরগণা— প্রভৃতি জেলায় নিস অথবা পরিবর্ত্তন সম্ভূত প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

যে সমুদায় পরিবর্ত্তনসম্ভূত প্রস্তরে একেবারে তাহাদের আদিম অবস্থা বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই তাহা দিগকে উপপরিবর্ত্তনসম্ভূত (Submetamorphic) প্রস্তর বলে। উপপরিবর্ত্তনসম্ভূত প্রস্তর নিম্নলিখিত জেলাগুলিতে দৃষ্ট হয় —বাঁকুড়ার দক্ষিণ পশ্চিম কটক (সামান্য) দার্জিলিং এবং দক্ষিণাংশ। গয়ার পূর্ব্বদিক (সামান্য) হাজারিবাগের উত্তর পূর্ব্ব মানভূমের দক্ষিণাংশ মুঙ্গেরের দক্ষিণাংশ পাটনায় রাজগৃহ পর্ব্বতশ্রেণী সম্বলপুর (সামান্য) ও সিংভূমের প্রায় সমস্ত।

নিস সম্ভূত স্থানের জমি অত্যন্ত ভগ্ন ও অসম বলিয়া উহাতে জল আটকাইতে পারে না। তজ্জন্য যে সকল স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও সরস সেইরূপ স্থানেই শীতকালে ফসল জন্মিয়া থাকে। উচ্চ জমিতে কেবল ভাদুই ও রবি শস্য হয়। নিসজাত জমি অবশ্য গ্রানিটজাত জমি অপেক্ষা ভাল। কিন্তু ইহাতে যে কোয়ারজ (Quartz) ও অন্য আছে সেগুলিতে উপযুক্ত পরিমাণে উদ্ভিদ খাদ্য নাই।

পরিবর্ত্তনসম্ভূত ও উপপরিবর্ত্তনসম্ভূত প্রস্তর শ্রেণীর ঊর্দ্ধে বিন্ধ্য শ্রেণী (Vindhyan system) অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে জীব অথবা উদ্ভিদ কঙ্কাল পরিদৃষ্ট হয় না। সাহাবাদ জেলার দক্ষিণাংশ এবং পালামৌ জেলার উত্তর পশ্চিমাংশের কিয়দংশ ব্যতীত বঙ্গের আর কুত্রাপি বিন্ধ্য শ্রেণীর প্রস্তর নাই। কিন্তু মধ্যভারতে প্রায় ৮ মাইল ব্যাপিয়া এই শ্রেণীর প্রস্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। বিন্ধ্য শ্রেণীর পর ভারতবর্ষে গন্ধবান শ্রেণীর আধিপত্য (Gondwana system) এতদুভয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেক। কিন্তু ভারতে ইহাদের মধ্যবর্ত্তী স্তর সমূহের প্রায় কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। জলের ক্ষয়কারী শক্তি উহাদিগকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে। গন্ধবান শ্রেণী —চারিটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত এবং পেলিওজোইক যুগের কার্ব্বনিফেরাস (carboniferous) স্তর হইতে মেসোজোইক যুগের জুরাসিক (Jurassic) স্তর পর্য্যন্ত সমস্ত স্তর ইহার অন্তর্ভূত। নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে গন্ধবান শ্রেণীর উপশ্রেণী গুলির নাম —(১) তালচর (Talchers) (২) দামোদর (Damodar) (৩) পঞ্চ কোট (panchets) ও (৪) মহাদেব (Mahadevas)। দ্বিতীয় শ্রেণীর তিনটী বিভাগ আছে যথা — (১) বরাকর (২) লৌহ প্রস্তর (৩) রাণীগঞ্জ। এই বরাকর বিভাগের স্তর হইতেই প্রধানত এতদ্দেশে পাথুরিয়া কয়লা পাওয়া যায়। পঞ্চকোট ও মহাদেব

উপশ্রেণীর প্রস্তর হইতে বালুকাময় জমি উৎপন্ন হয়। সাধারণত গন্ধবান শ্রেণী সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযুজ্য। গন্ধবান শ্রেণী জাত মৃত্তিকা সারবিহীন ও চাষ আবাদের অনুপযুক্ত। আন্দাদের উত্তরাংশে বর্দ্ধমানের উত্তর পশ্চিম কোণে কটকের পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে হাজারিবাগ মানভূম পালামৌ ও সাঁওতাল পরগণার স্থানে স্থানে পূর্ব্বীয় পশ্চিমে ও রাচীর উত্তর পশ্চিমে গন্ধবান শ্রেণীর প্রস্তর রহিয়াছে। পুরাকালে ভারতে এই শ্রেণীর প্রস্তর বহুল পরিমাণে বিরাজিত ছিল। কিন্তু তাহার অধিকাংশ ভাগই বিলুপ্ত হইয়াছে।

মেসোজোইক যুগের শেষ ও নিয়োজোইক্ যুগের প্রারম্ভের মধ্যবর্ত্তী কোন সময়ে পৃথিবীর অন্তর্নিহিত তেজের ভয়াবহ বিকাশ হয়। এই ভীষণ ভূকম্পনে হিমালয় পর্ব্বত উৎক্ষিপ্ত হয়। উপদ্বীপস্থ শিলার বিদীর্ণ অংশসমূহ (fissures) দিয়া এই সময় লাভা প্রবাহ বহির্গত হইয়া দক্ষিণ ভারতের নিম্নের অনেকাংশ আবৃত করিয়া ফেলে। এইরূপ লাভা আবৃত অংশের পরিমাণ দুই লক্ষ বর্গ মাইলের কম নহে এবং ইহা দাক্ষিণাত্য ট্রাপ (Deccan trap নামে অভিহিত। এই ট্রাপ হইতেই প্রসিদ্ধ রিগর অথবা দাক্ষিণাত্যের কালামাটি উদ্ভূত হইয়াছে। বঙ্গদেশে রাজমহল পর্ব্বতের কিয়দ্ পরিমাণ স্থান ব্যতীত আর কোন স্থানেই রিগর মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায় না।

বঙ্গ দেশের অনেক স্থানে ধূসর অথবা লোহিত ধূসর বর্ণ এক প্রকার জমি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে লেটারাইট (Laterite) বলে। বাঁকুড়া ভাগলপুর বীরভূম বর্দ্ধমান কটক মেদিনীপুর পালামৌ পুরী রাচি প্রভৃতি জেলায় অল্প বিস্তর পরিমাণে লেটারাইট পাওয়া যায়। লেটারাইট— উহার অব্যবহিত নিম্নস্থিত প্রস্তরের ধ্বংসাবশেষ। সময়ে সময়ে এই ধ্বংসাবশেষ জলপ্রবাহ দ্বারা নিম্ন ভূমিতে নীত হইয়াছে এবং তথায় গিয়া আবার জমাট হইয়া গিয়াছে। শেষোক্ত প্রকার লেটারাইটকে নিম্ন ভূমিস্থ (Low level) এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারকে উচ্চ ভূমিস্থ (Highlevel) লেটারাইট বলে। বঙ্গদেশে লেটারাইট প্রায় নিম্নভূমিস্থ লেটারাইট। অত্যন্ত জমাট লেটারাইট জল সংরক্ষণ করিতে পারে না বলিয়া উহাতে ভাল গাছ জন্মে না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত চূর্ণীভূত লেটারাইট মন্দ জমি নয়।

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রস্তরস্তরের বিষয় বিবৃত হইল সেগুলিই বঙ্গদেশের ভূপঞ্জর গঠন করিয়াছে। দার্জ্জিলিং জেলায় এবং সমুদায় স্তর ব্যতীত টারসিয়ারী (Tertiary যুগের কয়েকটী স্তর দৃষ্ট হয়। এই স্তরের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখন আলোচ্য বিষয় এবং আধুনিক স্তরগুলি উপরে উঠিয়াছে। এরূপ বিপর্য্যয়ের কারণ সম্ভবতঃ স্তরসমূহের মর্দ্দন (folding) এবং স্থানচ্যুতি (Faulting)।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সমস্ত পশ্চিম বঙ্গের মৃত্তিকা পলিস্তর দ্বারা প্রায় সমভাবে বিস্তৃত। পলিস্তর (Indo Gangetic Alluvium) নিয়োজোইক যুগের অন্তর্গত এবং ইহাই পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক স্তর। ইহা নিম্নস্থিত প্রস্তরাদির ধ্বংসাবশেষ দ্বারা গঠিত। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত নিম্ন স্তর এবং দক্ষিণে ভারতীয় উপদ্বীপের শিলা ও নিম্ন কাল অপরাপর মৃত্তিকার মধ্যে বহু বিস্তীর্ণ পলিক্ষেত্র অবস্থিত। অন্যদিকে ইহা পঞ্চনদ হইতে আরম্ভ হইয়া আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এইভাবে বিস্তৃত ব্যাপী ক্ষেত্রের পরিমাণ তিন লক্ষ বর্গ মাইলের কম হইবে না।

উৎপত্তির হিসাবে পলিস্তরকে নূতন ও পুরাতন এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। উভয়ের মৃত্তিকা অভ্র চাসযুক্ত কর্দ্দম। পুরাতন পলিস্তর অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং ক্রমাগত জলস্রোত দ্বারা ইহার উপবিভাগ ধৌত হ যায় ইহা অনেকটা তরঙ্গায়িত। পক্ষান্তরে নূতন স্তর নূতন বালি সংযোগে গঠিত হইতেছে। গঙ্গার ব-দ্বীপ (Delta) এই স্তরের অন্তর্গত। পুরাতন স্তরে কাঁকড় নামে পরিচিত কার্ব্বনেট অব লাইমের গুটি পাওয়া যায়। ইহা হইতে গুটিং চুণ প্রস্তুত

রাজনীতিতরণী কর্ণধার বিহীন হইল জগতের সহিত ভারতের রাজনীতিক দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ না হইতেই ভারত দেউলিয়া হইয়া পড়িল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একা বাঙ্গালা মায়ের সন্তান নহেন—তিনি ভারত মাতার প্রিয়তম সন্তান। তাঁহার রাজনীতি চতুরতা হয় ত বিশমার্ক কও পরাজিত করিতে সমর্থ ছিল। চিত্তের একাগ্রতা ও দৃঢ়তায় কল্পনার প্রসারতায় ভাবের গভীরতায় সংগঠন নৈপুণ্যে চিন্তার মৌলিকতায় চিত্তরঞ্জন প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন—একমেবাদ্বিতীয়ম্ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ দেশসেবক তাঁহারা তাঁহাকে ব্যতীত ভারতে আর কে ... তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন— তাঁহাকে ... পুরোভাগে দেখা যাইত। ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ে তিনি ... সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন— তাঁহার ন্যায় প্রচুর অর্থও কেহ উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই আইন জ্ঞানে ও আইন ব্যবসায়ীর গুণপনায়ও কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না— আবার সেই প্রভূত আয় এক কথায় বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া তাঁহার ন্যায় একেবারে সন্ন্যাসী সাজিতেও আর কেহ পারেন নাই।

তিনি যে স্বরাজ্য দল গঠন করিয়া গিয়াছেন রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার প্রভাব তাঁহার দলের ...গণকেও একবাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছে। দেশ সেবা যে ছেলেখেলা নহে—অবসর বিনোদনের সৌখিন উপায় মাত্র নহে—তাহা তিনি নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়া সকলের চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছিলেন। দেশ সেবা যে রীতিমত কাজ উহাতে একনিষ্ঠ হইয়া একাগ্র চিত্তে করিতে হয় অনন্যমনা হইয়া না করিলে যে দেশ সেবা করা হয় না তাহাই জগৎকে দেখাইবার জন্য তিনি ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় এবং তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া উহাতেই মনে প্রাণে আত্মবিনিয়োগ করিয়াছিলেন।

দানে দাতাকর্ণ প্রতিজ্ঞায় ভীষ্ম কর্ম্মশক্তিতে ... কুশেস রাজনীতিজ্ঞতায় চাণক্য ত্যাগে বুদ্ধ—চিত্তরঞ্জন তাঁহার অননুকরণীয় চরিত্র মহিমায় ভারতে নেতৃত্বের মহান আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। দরিদ্র নারায়ণের বন্ধু ছিলেন বলিয়া দেশবন্ধু সার্থকনামা পুরুষসিংহ। বিশ্বাসের দৃঢ়তা। তিনি স্বয়ং কারাবরণ করিয়াছিলেন এবং একমাত্র আত্মজকেও জেলে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। Lawless law বা বেআইনী আইনের কাণ্যন্ত প্রতিবাদ ... এমন করিয়া আর কে ... করিতে পারেন ...।

চিত্তরঞ্জনের ... ব্যক্তিত্বের প্রভাব এত বেশী ছিল যে রাজনীতি ক্ষেত্রে নামিবামাত্র সমগ্র দেশ একবাক্যে তাঁহাকে নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ দূরদর্শিতা বলে তিনি স্বরাজ্যদল গঠন করিয়া যে ... নীতিক ... করিয়াছিলেন তাহার প্রয়োগে তিনি বার বার সফলতা লাভ করিয়াছিলেন ... ভারতের আর কোন রাজনীতিকের ভাগ্যে ঘটে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ যখন দেশময় ছড়াইয়া পড়িল তখন দেশব্যাপী ভাবের বন্যা ছুটিল তাহার তরঙ্গ সমুদ্র পারস্থিত দেশগুলির পর্য্যন্ত কূলে কূলে গিয়া আঘাত করিতে লাগিল। দার্জ্জিলিং হইতে মৃতদেহ যখন কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল তখনকার দৃশ্য যে দেখিয়াছে সে জীবনে কখনও তাহা ভুলিতে পারিবে না এবং ... তাহার মত দুর্ভাগ্যও কেহ বোধ হয় না। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যা হইতে ষ্টেসনে তাঁহার শবদেহের প্রতীক্ষা তার পর যতই সময় যাইতে লাগিল ততই লোক সমাবেশের বৃদ্ধি। জাতি বর্ণ ধর্ম্ম সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে পাঁচ ছয় লক্ষ নরনারীর একত্র সমাবেশ এই কলিকাতাতে পূর্ব্বে কখনও হইয়াছে বলিয়া কেহ ... করিতে পারেন না। সমগ্র দেশ ব্যাপী সম্পূর্ণ হরতালও আর কখনও এমন করিয়া হয় নাই। এই যে শোক প্রবাহ ইহা দেশবাসীর হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে স্বতঃ প্রবাহিত ইহাতে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র ছিল না। ... কর্ত্তব্যবুদ্ধির পরিচয়—ইহাও স্বতঃ প্রবৃত্ত—কাহাকেও এতটুকু অনুরোধ করিতে কিম্বা স্মরণ করাইয়া দিতে হয় নাই। দেশের মনের উপর

যাহার এমন প্রভাব তিনি যে কত বড় মহান তাহার সম্যক্ ধারণা করাও সহজ নহে।

মৃত্যুকালে দেবেন্দ্র বাবুর বয়স ৫৫ বৎসরের অধিক হয় নাই। ইহা কি মরিবার বয়স? কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের মহৎ জীবন প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না। সার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন বয়সেও বিলক্ষণ কর্ম্মক্ষম আছেন। স্বর্গীয় দাদা ভাই নৌরোজী মহোদয়ও পরিণত বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। কিন্তু এরূপ দু একটা দৃষ্টান্ত ধরা ছাড়িয়া দিতে হয় কারণ গুলি নিয়ম নহে—নিয়মের ব্যতিক্রম। কিন্তু অকাল মৃত্যুই যেন এ দেশের সাধারণ নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে কোন মহৎ জীবনের কথাই ধর না কেন মৃত্যুকালীন বয়সের সন্ধান লইলেই দেখা যায় তাহাদের অকাল মৃত্যু হইয়াছে। ইহা আমাদের দেশের পক্ষে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়। দেশ সেবকেরা দেশের ও দশের সেবায় যখন প্রবৃত্ত হন তখন তাহারা যেন আত্ম বিস্মৃত হইয়া যান। এবং হয়ত এমন ভাবে আপনার অস্তিত্ব ভুলিতে না পারিলে বুঝি বা দেশ মাতৃকার সম্যকপ্রকারে সেবাও করা যায় না।

পথ্য-চিকিৎসা

(২)

আহার এবং ঔষধ—দুইই এই রকম একটা প্রবচন আমাদের দেশে বরাবর চলিত আছে। যে বস্তু ক্ষুধার নিবৃত্তি করে অথচ পীড়ারও উপশম করে তাহার আদর আমাদের কাছে খুবই বেশী। এইরূপ কয়েকটি বস্তু আমরা অতি পবিত্র বলিয়া মনে করি এবং কত আদর করিয়া তাহাকে মিষ্ট মিষ্ট নামে অভিহিত করি। যেমন বেল বা শ্রীফল আনারস পেঁপে প্রভৃতি। এই সকল বস্তু কেবল যে সুখাদ্য তাই নয় ইহাদের সমুচিত ব্যবহারে পীড়ার উপশমও হইয়া থাকে।

শ্রীফল অতি সুখাদ্য। ইহা যেমন সুস্বাদু তেমনি তৃপ্তিদায়ক খাদ্য। বেলের সরবৎ গ্রীষ্মকালে অতি উৎকৃষ্ট পানীয়। সামান্য পেটের অসুখে বিশেষত আমাশয় রোগে বিবেচনা পূর্ব্বক শ্রীফল ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকারও পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে পাকা অপেক্ষা কাঁচা বেলই সমধিক প্রশস্ত। বেলের মোরব্বা চমৎকার খাদ্য ও ঔষধ। কাঁচা বেল পোড়াইয়া খেজুরে গুড় সহ তরুণ আমাশয়ে অতি প্রসিদ্ধ পথ্য। তবে অবশ্য পীড়ার কঠিন অবস্থায় চিকিৎসকের মত না লইয়া ব্যবহার করা উচিত নহে।

সুপক্ক সুমিষ্ট পেঁপে যেমন তৃপ্তিকর খাদ্য তেমনি স্নিগ্ধ। অথচ ইহার হজমীশক্তি অদ্ভুত বলিলেই চলে। কাঁচা পেঁপের তরকারী চাটনী প্রভৃতিরও এই গুণটি বিশেষ ভাবে আছে। তাছাড়া কাঁচা পেঁপে হইতে পেপসিন নামক একটী ঔষধও প্রস্তুত হয়। তাহারও প্রচুর প্রয়োগ দেখা যায়। কবিরাজীশাস্ত্রে কাঁচা ও পাকা পেঁপের গুণের বর্ণনার দোষ নাই। কাঁচা পেঁপের দুই এক ফোঁটা আটা কলা বা অন্য কোন দ্রব্যের মধ্যে পুরিয়া সেবন করিলে পীহা ও গুল্ম বিনষ্ট হয়।

শতমূলী নামক একটী পদার্থ পল্লীগ্রামে অযত্নে স্বতঃ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ইহার সহিত সকলেই বোধ হয় অল্পাধিক পরিমাণে পরিচিত ঔষধার্থে ত ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ই। তাহা ছাড়া খাদ্যরূপেও কিছু কিছু ব্যবহৃত হয় কিন্তু অল্প পরিমাণে। ইহার অনেক গুণ। মোরব্বার আকারে ইহা বেশ সুস্বাদু খাদ্য। অথচ ইহা স্নিগ্ধতাগুণসম্পন্ন এবং চক্ষুর পক্ষে উপকারী। সন্তানবতী স্ত্রীলোকদের স্তনে দুগ্ধ কমিয়া

গেলে ইহা কিছু দিন নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করিলে আবার স্তনে যথেষ্ট দুগ্ধ সঞ্চার হয়। তাহা ছাড়া ইহা বলকর পথ্য। কবিরাজ মহাশয়েরা ইহার বিলক্ষণ আদর করিয়া থাকেন।

আমলকীও এইরূপ একটা মহাগুণসম্পন্ন বনজাত ফল। দুই প্রকার আমলকী আছে। এটা ঔষধার্থে এত বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয় যে ইহার অপর এক নাম অমৃত ফল। কবিরাজী শাস্ত্র মতে আমলকী ত্রিদোষ—বায়ু পিত্ত কফ—নাশক। রক্তপিত্ত ও প্রমেহ রোগে আমলকীর মোরব্বা মহোপকারী পথ্য পর্য্যায়ভুক্ত। রোগ প্রশমনার্থ আমলকী ব্যবহার করিবার ইচ্ছা করিলে চিকিৎসকগণের মত লইয়া ব্যবহার করা উচিত। কারণ ব্যবহার ভেদে ইহার গুণের তারতম্য হয়। আর শুধু খাদ্যরূপে আমলকীর মোরব্বা পরিমিত মাত্রায় স্বচ্ছন্দে সকল সময়ে সকল অবস্থায় খাওয়া যায়।

উচ্ছে আমাদের গৃহিণীগণের একটী অতিপ্রিয় তরকারী। প্রাচীনা গৃহিণীরা উচ্ছের তরকারীর ব্যবস্থা করিয়া অনেক রোগ প্রশমন করিতে পারিতেন। জ্বরের পর অরুচি হইলে উচ্ছের সুক্ত যে কি উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন তাহা কে না জানেন? অরুচি নাশ করিতে ইহা অদ্বিতীয় বলিলেই হয়। উচ্ছের ব্যঞ্জন সপ্তাহে দুই একদিন নিয়মিত ভাবে ভক্ষণ করিলে জ্বর পিত্ত, কফ প্রভৃতি রোগ দমন করিয়া থাকে। সম্প্রতি উচ্ছের আর এক গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা নিয়মিত ভক্ষণে বসন্ত রোগ আক্রমণ করিতে পারে না—ইহা না কি বসন্ত রোগের উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ প্রতিষেধক। এ সম্বন্ধে পরীক্ষা ও বিস্তৃত ভাবে অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

কেশুতা পল্লীবাসীদের কাছে অতি তুচ্ছ জিনিস। ইহা স্বভাবজাত শাক। কালেভদ্রে লোকের যখন খাইবার সখ হয় তখনই লোকে ইহা কিঞ্চিৎ তুলিয়া লইয়া যায়। ইহার তরকারী খাইতে তেমন সুমিষ্ট না হইলেও ইহা মহোপকারী পথ্য। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। সামান্যত ইহা রোগ কুষ্ঠ কফ ও পিত্ত নাশক। কিন্তু বাজারে শাক নামে ইহা বিবিধ ঔষধের উপাদান স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী রোগের তরুণ অবস্থায় গৃহস্থলোকে ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাইলে উপকৃতই হইতে পারিবেন। (ক্রমশ)

খাদ্য সংরক্ষণ।—

দীর্ঘকাল ধরিয়া খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ করিতে হইলে দুইটী উপায় অবলম্বন করা হয় যথা বোরিক এসিড ব্যবহার বা বরফ ব্যবহার। ইয়োরোপের অনেক দেশে বিশেষতঃ বিলাতে লোক সংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট খাদ্য উৎপন্ন হয় না। সেই সকল দেশকে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে হয়। দূরদেশ হইতে খাদ্য দ্রব্য আমদানি করিতে হইলে তাহা পাছে বিকৃত হইয়া যায় সেই জন্য হয় বোরিক এসিড ব্যবহার করিয়া না হয় বরফের বাক্সে খাদ্য রাখিয়া তাহা

লুকাইয়া লাইয়া খাত চালান দিতে হয়। অনেকের বিশ্বাস, বোরিক এসিড ব্যবহার করিলে খাদ্য বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা। এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্ট একটী কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কমিটি অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে খাত দ্রব্য সংরক্ষার জন্য বোরিক এসিডের ব্যবহার প্রশস্ত নহে। কিন্তু গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার জন গ্লেইষ্টার নিজে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বোরিক এসিড ব্যবহার করিলে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। অধ্যাপক মহাশয় কয়েকটি বোরিক এসিডের কারখানার মজুরদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে দশ বারো বৎসর ধরিয়া বোরিক এসিডের কারখানায় কাজ করিতেছে এমন স্ত্রী পুরুষ সর্ব্বদা বোরিক এসিড লইয়া নাড়া চাড়া করিলেও এবং কারখানার আবহাওয়া বোরিক এসিডের সূক্ষ্ম চূর্ণে পূর্ণ থাকিলেও এবং তাহা মজুরদের শ্বাস নালীর ভিতর দিয়া অনবরত তাহাদের দেহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সঞ্চিত হইতে থাকিলেও তাহাদের স্বাস্থ্য উত্তম। বিশেষত তিনি বলেন যে বরফে জমাইয়া খাদ্য দূরদেশে প্রেরণ করা চলিলেও সেখানে উহা বরফের বাক্স হইতে বাহির করিবার পর অল্পক্ষণ মধ্যেই পচিয়া যাইতে পারে। অতএব বরফ অপেক্ষা খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষার পক্ষে বোরিক এসিড বহু গুণে উৎকৃষ্ট। এখন গবর্মেণ্ট কোন মত গ্রহণ করিবেন তাহা বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে আমাদের এই কলিকাতা সহরে বরফের বাক্সে মৎস্য আমদানীর সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। সহরে লোক সংখ্য যেমন বাড়িতেছে মৎস্যের আমদানীও তদনুপাতে বাড়িতেছে তথাপি মৎস্যের মূল্যও দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। মৎস্যের মূল্য বৃদ্ধি কেবল মৎস্য ব্যবসায়ীদের অতি লোভ—profiteering এর ফল। বাজারে যথেষ্ট মৎস্য আমদানী হওয়া সত্বেও মৎস্য ব্যবসায়ীরা কতক মাছ বরফের বাক্সে লুকাইয়া রাখিয়া খরিদ্দারকে কম মাল দেখাইয়া অতিরিক্ত মূল্য আদায় করিয়া থাকে। যে দিনকার আমদানী সে দিন বিক্রীত না হইলেও তাহাদের কোন ক্ষতি নাই—বরফের ভিতরে থাকিলে পর দিন কিম্বা আরও দুই চারি দিন পরে নিশ্চয়ই বিক্রীত হইয়া যাইবে। বরফের এরূপ ব্যবহার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। অষ্ট্রেলিয়া হইতে মাংস কিম্বা মাছ বিলাতে রপ্তানী করিতে হইলে বরফের ঘরে (cold storage) উহা রক্ষা না করিলে চলে না। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘন্টার পথ দূর হইতে কলিকাতায় বরফের বাক্সের ভিতর মৎস্য আমদানী করিবার পর কেবল বেশী দাম আদায় করিবার জন্য সেই মৎস্য দুই চারি দিন ধরিয়া বরফের ভিতর রক্ষা করা আমরা সঙ্গত মনে করি না। সকলেই জানেন টাটকা মৎস্যের স্বাদ এক রকম আর দীর্ঘকাল বরফে রক্ষিত মৎস্যের স্বাদ আর এক রকম। বরফে রক্ষা করিলে মাছ না পচিতে পারে কিন্তু উহার স্বাদ নিশ্চয়ই বিকৃত হইয়া যায়—ছিবড়ে ছিবড়ে মতন খাইতে লাগে। আমরা আশা করি কর্পোরেশন এ দিকে একটু কৃপাদৃষ্টিপাত করিবেন কেবল মৎস্য আমদানী করিবার সময়ই এবং সেই জন্যই বরফ ব্যবহার করিবার অনুমতি দিবেন কিন্তু এখানে বরফের ভিতর মাল আটকাইয়া রাখিতে দিবেন না। তাহা হইলে মৎস্যের মূল্য কিছু কমিতে পারিবে, গরীব লোকে একটু আধটু মাছ খাইয়া বাঁচিবে।

---

৫ বা ১ গ্রেণ) নানাল্গা সেবন করিলে অল্প সময় মধ্যে বেদনা কমিয়া যায় রোগী সুস্থ হয়। তবে যদি বেদনার লাঘব না হয় তাহা হইলে পুনরায় ১ বটী বা গ্রেণ নানাল্গা সেবন করিতে হয়। এইরূপে বেদনা শান্ত হইলে বেদনার মূল কারণ দূর করিবার জন্য ... চিকিৎসা করিলে ... রোগমুক্ত হওয়া যায়।

বসন্ত ... কামক ... অবস্থায় সাধারণভাবে এইরূপ বেদনা হইতে দেখা যায়। এই সকল স্থলে ... পারিবারিক অসাধ্য ও ইন্দ্রজালের ন্যায়।

মাথার বেদনা ... ভিন্ন ... কারণ ... নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করাইবে। ... চিকিৎসক ... ও বেদনার ... ১ বা ২ মাত্রা ... ৫ বা ১ গ্রেণ নানাল্গা সেবন করিলে বেদনা অচিরে উপশমিত হয়। ... বোধ হইবে সে স্থানে এনোডাইন্ এম্‌ব্রোকেশন (Anodyn Imbrocation) ২।১ বার মালিশ করিলেই বেদনার লাঘব হয়। যে স্থলে অব ... চক্ষুপীড়া কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি কারণে শিরঃপীড়া উপস্থিত হয় সে স্থলে ... রোগের ... না করিয়া কেবল শিরোরোগের চিকিৎসায় ফলোদয় হয় না। কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ... কর্তব্য (কোষ্ঠ কাঠিন্য অধ্যায় দেখুন)।

দন্তশূল—দাঁতের গোড়া ফুলিয়া বেদনা দাঁতে পোকা লাগিয়া (caries) গর্ত হওয়ার জন্য দন্তমাড়ির বেদনা বা আক্কেল দাঁত (wisdom tooth) উঠিবার পূর্ব্বে অসহ্য বেদনা ইত্যাদিতে (Dentaline) ডেণ্টালিন বেদনা ... স্থানে ... দ্বারা লাগাইলে তৎক্ষণাৎ বেদনার লাঘব হয়। যদি ইহার প্রয়োগেও উপশম না হয়, অথচ বেদনা কপাল ও মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে তখন ১ মাত্রা বা ৫ গ্রেণ নানাল্গা সেবনে সত্ত্ব উপকার পাওয়া যায়। দন্তশূলগ্রস্ত রোগীর কোন দ্রব্য চিবাইয়া খাওয়া উচিত নহে। কোন ঠাণ্ডা দ্রব্য বরফজল বা অতিরিক্ত অম্ল খাওয়া অবিধেয়। সকল দ্রব্যই ঈষদুষ্ণ করিয়া খাওয়াই উচিত।

দন্তশূলের জন্য গালের উপর বা চোয়ালে বেদনা অনুভূত হইলে সেই বেদনার স্থানে এনোডাইন্ এম্‌ব্রোকেশন্ মালিশ করিবা মাত্র বেদনার লাঘব হয়।

কর্ণশূল—কানে ঠাণ্ডা লাগায় বা প্রদাহ হওয়ায় কিম্বা ফোড়া হওয়ায় কর্ণগহ্বরে বা তন্নিকটস্থ স্থানে বেদনা হইয়া থাকে। এই বেদনা কখন কখন সূচীবেধবৎ ... বা কটকটানি যুক্ত হয়। বেদনার ... সেঁক বা পুলটিস দিবে এবং নানাল্গা সেবন করিবে সেবন মাত্র বেদনা আরোগ্য হইবে। কর্ণদেশে বেদনা হইলে কোন দ্রব্য চিবাইয়া খাইবে না। চিবাইলে আরও বেদনা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কদাচ ... কাছে কান ... খোঁচাইবে না বা কান ... না। কর্ণগহ্বরে ক্ষত হইলে বা পূয হইলে অটোরালিন (Otorralin) প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

চক্ষুতে বেদনা বা চক্ষু রোগ জন্য মস্তকে বা ঘাড়ে বেদনা—উপযুক্ত চক্ষুচিকিৎসকের ব্যবস্থা ব্যতীত চক্ষে কদাচ কোন ঔষধ এক ফোঁটাও দেওয়া উচিত নহে। তবে গোলাপ জল দ্বারা বা বোরিক লোশন দ্বারা ধুইতে পারা যায়। এরূপ ঔষধ ব্যবহারে কোন ক্ষতি হয় না। ... বেদনার লাঘব জন্য নানাল্গা সেবন করা ... ও ... উপায়। বেদনার পুনরাক্রমণ বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত চক্ষু চিকিৎসক দ্বারা চক্ষের রোগ নির্ণয় করাইয়া চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য। কদাচ অবহেলা করা উচিত নহে। বিলম্বের জন্য অনেক সময় চিরকালের জন্য চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়।

কপালের অর্দ্ধেকদিকের বেদনা বা আধকপালে—নানা কারণে হইয়া থাকে। কখনও কখনও ম্যালেরিয়া বিষের জন্য এরূপ বেদনা হইতে দেখা যায়। এই সকল রোগে নানাল্গা সেবন মাত্রই বেদনার লাঘব হয় ও চায়না ব্রোম ট্যাবলেট প্রত্যহ ৩।৪টি খাইলে ম্যালেরিয়া বিষ নষ্ট হয় ও বেদনা ক্রমশঃ সমূলে নষ্ট হইয়া থাকে। কপালের অস্থি বা নাসিকা গহ্বরের আভ্যন্তরিক আবরণের প্রদাহ হওয়ায় কপালের বেদনা উপস্থিত হইলে ঔষধ ব্যবহার করা আবশ্যক ও বিচক্ষণ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করান উচিত। তবে বেদনা লাঘবের জন্য নানাল্গা ব্যবহার করা যাইতে পারে। এনোডাইন্ এম্‌ব্রোকেশন মালিশদ্বারাও আধকপালের বেদনার উপশম হইয়া থাকে।

বাতের বেদনা—রিউমেটিক জ্বরে যখন

গন্থি সকল ফুলিয়া অসহ্য যন্ত্রণা দেয় বা গেঁটে বাতে রাত্রে নিদ্রা হয় না তখন ১ বা ২ মাত্রা (৫ বা ১ গ্রেণ) **নানালো** সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ বেদনার উপশম হয় এবং সুনিদ্রাও হয়। এই সঙ্গে **এনোডাইন এমব্রোকেশন** মালিশ করিলে বেদনার আরও সত্বর উপশম হয়।

সায়েটিকা লম্বেগো— কোমরে পাঁজাতে ও উরুর পশ্চাৎদিকে বেদনা হয় [illegible] জন্য অনেকে চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়েন ও বেদনার জন্য অনেকে কষ্ট পান। এ অবস্থায় **নানালো** সেবন মাত্রই এই সকল বেদনার লাঘব হইয়া থাকে। কিন্তু **এনোডাইন এমব্রোকেশন** [illegible] করিলেও এই রোগ আরোগ্য হয়।

স্ত্রীলোকদিগের বেদনা—বড় কাল [illegible] রাবক প্রভৃতির জন্য অনেক স্ত্রীলোকদিগের [illegible] হইয়া থাকে এবং [illegible] প্রসবের পর [illegible] ব্যথা হইয়া থাকে। এই সকল বেদনা এক ঘণ্টা অন্তর এক ঘণ্টা করিয়া ২।৩ বার **নানালো** সেবনে উপশম হইয়া যায়।

শূল বেদনা—অনেক প্রকার আছে। [illegible] দ্রব্য পরিপাক না পাওয়ায় বা অন্ত্র মধ্যে মল বদ্ধ হওয়ায় বা অপান ও সমান বায়ুর চালিত [illegible] কারণে [illegible] হওয়ায় পেটে শূল বেদনা হইয়া থাকে। এই বেদনাকে **অন্ত্রশূল** (Intestinal Colic) বলা [illegible]। এইরূপ বেদনা আরম্ভ হইবামাত্রই অগ্রে **নানালো** প্রয়োগে যন্ত্রণার সাময়িক উপশম করিয়া পরে রোগের কারণ দূরীভূত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

পিত্ত থলিতে (Gall bladder) ঘনীভূত পিত্ত জমিলে বা পাথরি হইলে এবং লিভারের [illegible] নলীতে (Biliary passage) ঘনীভূত পিত্ত থাকিলে অনেক সময় অসহ্য যন্ত্রণা হইতে থাকে। এই বেদনাকে **পিত্তশূল** (Biliary colic) বলা যায়। সময়ে সময়ে এই বেদনা এতদূর বেশী হয় যে রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এইরূপ যন্ত্রণা লাঘবের জন্য **নানালো** অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর দুই বা তিন মাত্রা সেবন করিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। এই সঙ্গে লিভারের উপর গরম স্বেদ দিবে ও **এনোডাইন এমব্রোকেশন** মালিশ করিবে। এবং বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা লিভারের চিকিৎসা করাইবে।

মূত্রগ্রন্থি বা মূত্রনালীতে ময়লা বালি বা পাথুরি জমিলে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা একদিকের কোমর হইতে অণ্ডকোষ বা প্রস্রাবের দ্বার পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া থাকে। এ অবস্থায় যদি রোগীর প্রস্রাবের চেষ্টা হয় তবে কয়েক ফোঁটা মাত্র হইয়া থাকে [illegible] প্রস্রাব হয় না। এই বেদনাকে Renal colic বলা যায়। খাদ্য দ্রব্যের অনিয়ম বা আধিক্য ব্যায়ামের অভাব ও অজীর্ণ রোগ ইত্যাদি কারণে এই রোগ হইয়া থাকে। **নানালো** এক বা দুই মাত্রা সেবন করিলেই এই বেদনার লাঘব হয়। এই বেদনার [illegible] তাহাতে কোষ্ঠ ও প্রস্রাব পরিষ্কার হয় এরূপ চিকিৎসা করাইবে। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে অপধোর্ম্মি ([illegible]) দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করা [illegible]। [illegible] বন্ধ করিবে। কেবল [illegible] [illegible] জন্য [illegible] পেট ভরাইবার [illegible]। পরিষ্কার জল [illegible] (Distilled water) [illegible] পরিমাণে [illegible] দিবে। এরূপ গরম জল [illegible] প্রস্রাব [illegible] [illegible] যদি কোন [illegible] থাকে তাহা হইলে [illegible] প্রতিক্রিয়া [illegible] বাহির হইয়া [illegible]। [illegible] তাহার [illegible] হইবে ও [illegible] অজীর্ণ রোগের [illegible] নিয়মগুলি পালন করিবে।

অম্ল ও অজীর্ণ রোগ ইত্যাদির চিকিৎসা।

বাঙ্গালায় [illegible] পরিবার না [illegible] যেখানে [illegible] না কেহ অম্ল ও অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছেন। এক দিকে ম্যালেরিয়া ও অন্যদিকে ডিস্পেপসিয়া—এই উভয় সংকটের মধ্যে পড়িয়া আমাদের জাতীয় জীবন [illegible] বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু [illegible] প্রতিকারের [illegible] কি? রোগ আছে অথচ ঔষধ নাই বিষ আছে—প্রতিষেধক নাই ইহা হইতে পারে না।

একমাত্র আহারের দোষেই অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়। সেই দোষ নানা কারণে উৎপন্ন হয় ও নানা ভাবে ঘটিয়া থাকে তাই আমরা মোটামুটি ইহাদের বর্ণনা করিলাম।

আহারের মাত্রার আধিক্য ইহার প্রধান কারণ। সাধারণের মধ্যে এই ধারণা আছে যে যত খাইতে পারিবে তাহার তত শরীরের উপকার হইবে। কিন্তু তাহা ভুল। আহার মাত্রা যত আবশ্যক মত ও রুচি

“শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম”

১৪শ বর্ষ | ভাদ্র ১৩৩২ সাল | ৫ম সংখ্যা

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নির্দ্দেশ

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্‌ এম্‌ এস্‌]

(১) পুষ্টি বা পরিপোষণ।

আমরা জানি যে জীবন ধারণ করিতে হইলে অন্তত পাঁচ প্রকারের খাদ্য আবশ্যক যথা—

(১) শ্বেতসার বা শালি জাতীয় খাদ্য—যেমন ভাত তরকারী অথবা আটা ময়দা বা ছাতু ও শাকসব্জী অথবা ফলমূল।

(২) আমিষ বা মাংস জাতীয় খাদ্যদ্রব্য—যেমন—মাছ, মাংস ডিম্ব অথবা ডাল বা ডালের তৈয়ারী পাপর বড়ি বড়া, ধোঁকা প্রভৃতি অথবা ছানা।

(৩) স্নেহজাতীয় পদার্থ—যেমন ঘি তেল মাখন চর্ব্বি।

(৪) লবণ মশলা ও জল।

(৫) ভাইটামীন নামক একপ্রকারের পদার্থ। ইহা দুধে টাটকা শাকসব্জীতে টাটকা মাংসে ঘৃত মুগের ডালে প্রভৃতিতে আছে। [“টাটকা” কথাটি স্মরণ যোগ্য।]

[illegible]

(১) মাংসজাতীয় খাদ্য হইতে দেহের গঠন পুষ্টি ও ক্ষয় পরিপূরণ ঘটিয়া থাকে। এবং

(২) শালীজাতীয় খাদ্য হইতে } দেহের কার্য্যশক্তি ও
(৩) স্নেহজাতীয় খাদ্য হইতে } উত্তাপ সৃষ্টি হয়।

শিশুদিগের সম্বন্ধে দুইটি বিশেষ কথা বলিবার আছে প্রথমটি এই যে প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের তুলনায় তাহাদিগের শারীরিক উত্তাপ রক্ষা করিবার বিশেষ প্রয়োজন ঘটিয়া থাকে—এই জন্য শিশুদের দেহে স্বভাবত মেদ বেশী থাকে এবং এই জন্যই শিশুখাদ্যে (দুগ্ধে) মাখনের ভাগ যথেষ্ট থাকা চাই কারণ স্নেহজাতীয় খাদ্য হইতেই দেহের উত্তাপ রক্ষিত হয়। যে দুধে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে নাই সে দুধে অপর উৎকৃষ্ট দুধ হইতে ক্রীম (নবনীত?) মিশাইয়া লইতে হয়। দ্বিতীয়ত শিশুদিগের শারীরিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত হইতে থাকে এ কারণে তাহাদিগের

খাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে মাংস জাতীয় পদার্থ থাকা চাই এবং তাহা দুধে ছানার আকারে যথেষ্টই থাকে।

আমরা মানুষ—কতকটা প্রকৃতির তাড়নায় ও কতকটা নিজ বুদ্ধি শক্তি ও অভিজ্ঞতার বশে উপরের উক্ত নিয়মগুলি আবিষ্কার করিয়া লইয়াছি। এখন যদি প্রকৃতির লীলার দিকে দৃকপাত করি তবে ঠিক উপরোক্ত বিধানের পোষক প্রমাণ পাইব।

একটা যে কোনও ছোলার বীজকে যদি মাটিতে পুঁতি এবং তিন চার দিন পরে তাহাকে উঠাইয়া পরীক্ষা করি তবে কি দেখি? দেখি যে ছোলার বীজের দুইটি দলের মাঝখান হইতে কল বা অঙ্কুর উঠিয়াছে। যদি কোনও প্রকারে উহার উত্তাপ লইতে পারি তবে দেখিব যে ছোলার ভিতরকার কল উদ্গমের (জন্মের) সঙ্গে সঙ্গে ছোলার ভিতরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং সেই সঙ্গে ছোলার ভিতরের শাঁস ক্রমশঃ পাতলা হইয়া কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছোলার ভিতরের শাঁসটি কি? উহা ঐ অঙ্কুরের খাদ্য। উহাতে আছে—শ্বেতসার ও শর্করা সামান্য পরিমাণে স্নেহ পদার্থ এবং যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ জাতীয় পদার্থ। অঙ্কুরটি লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই যে উহার শিকড় নিম্নাভিমুখী এবং পত্র পল্লবের আভাষ মাত্র লইয়া উদ্গত হইয়াছে—উভয়েই নানা জাতীয় কোষ দ্বারা সুরক্ষিত। অঙ্কুরটি সূর্য্যালোকের দিকে পত্র পল্লবগুলিকে চালিত করে এবং পৃথিবীর দিকে মূলকে চালিত করে। উহার প্রথমাবস্থায় সমস্ত খাদ্যই ঐ বীজের দুইটি দল হইতে প্রাপ্ত হয়। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সূর্য্যকিরণ সাহায্যে ও ভূমি হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে।

গাছপালা ছাড়িয়া যদি কোনও একটি ডিম ভাঙ্গিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে উহার মধ্যে স্নেহবহুল "কুসুম" ও খাঁটি আমিষ জাতীয় অণ্ডলালা থাকে। এই উভয় জাতীয় খাদ্য খাইয়াই ডিমের মধ্যে ভ্রূণটি বাড়ে।

ফল কথা উদ্ভিদই বল পক্ষীদের কথাই বল আর স্তন্যপায়ী জীবের কথাই বল—সকল অবস্থাতেই ভ্রূণ বা গর্ভস্থ শিশুর খাদ্য প্রায় একই উপাদানযুক্ত যথা—

	আমিষ জাতীয়	স্নেহ জাতীয়	শ্বেতসার জাতীয়
স্ত্রীলোকের দুগ্ধ	১ ২৯	৩ ৮১	৬ ২
গো দুগ্ধ	৩ ৫৫	৩ ৬৯	৪ ৮৮
ডিমের কুসুম ও লালা	১ ৫	১ ৬	——
ছোলার শাঁস	২১ ৭	৪ ২	৫৯

এখানে বক্তব্য এই যে মানব শিশুরা স্ত্রীলোকের ও গরুর দুধ বহুক্ষণ ধরিয়া পান করে কাজেই উপরের শতকরা হার হিসাবে দুধের উপাদানগুলি কম দেখাইলেও মোটের উপরে মানব ও গো শিশু বহুল পরিমাণে ঐ সকল উপাদান পাইয়া থাকে। ভ্রূণাবস্থায় স্তন্যপায়ী জীবের গর্ভে মাতৃ খাদ্যের অংশ মাতৃরক্ত হইতে ফুলের সাহায্যে গ্রহণ করিয়া থাকে।

বৃক্ষের বীজটি কঠিন ত্বকের মধ্যে সুরক্ষিত। অঙ্কুরটি যখন বাহির হয় তখন তাহার শিকড়ের প্রান্তে কঠিন ত্বক থাকে। এবং যতদিন না উহা বেশ বড় হয় ততদিন উহার উপরাংশটি কঠিন ত্বকের দ্বারা আবৃত থাকে। অণ্ড হইতে যে যে প্রাণী জন্ম গ্রহণ করে তাহারাও যতদিন না বেশ পুষ্ট ও সক্ষম হয় ততদিন অণ্ডের মধ্যে সুরক্ষিত থাকে। পরে অণ্ডভেদ করিয়া বাহির হইলেও কিছুকাল তাহাদের মাতা তাহাদিগকে নীড়ের মধ্যে আটকাইয়া রাখে নরম পোকা মাকড় ধরিয়া আনিয়া স্বয়ং শিশুদিগের ওষ্ঠাভ্যন্তরে ছাড়িয়া দেয় চরিবার সময়ে উড়িবার সময়ে ও প্রথম প্রথম আহার্য্য সংগ্রহের সময়ে স্বয়ং কাছে কাছে থাকে। মানুষের বেলায় এই মাতৃ-সাহচর্য্য ও লালন পালন আরো বেশী কঠিন ও দীর্ঘকাল স্থায়ী।

মোট কথা এই দাঁড়াইতেছে—জীবের জীবনের প্রথমাবস্থাতে তাহার পরিপোষণের ভার প্রকৃতিই গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই জন্য সর্ব্বত্রই সকল প্রাণীরই (১) ভ্রূণাবস্থায় পাঁচ জাতীয় খাদ্যের আয়োজন থাকে এবং (২) ভ্রূণ ও শৈশবাবস্থায় প্রত্যেক

প্রাণীরই মাতৃ মেহের ভিতর দিয়া অথবা অপর কৌশল দ্বারা রক্ষণা-বেক্ষণের রীতিমত বন্দোবস্ত আছে।

(২) ভোজন ও পরিপাক ক্রিয়া।

খাদ্যের উদ্দেশ্য প্রধানত চারিটি যথা—শারীরিক পুষ্টি ক্ষয় পরিপূরণ কার্য্য করিবার ক্ষমতার সঞ্চার দৈহিক উত্তাপ রক্ষা। এই হিসাবে খাদ্যের উদ্দেশ্য বিচার করিলে আমরা প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতে একই ব্যাপার দেখিতে পাই।

উদ্ভিজ্জেরা মূল দ্বারা ভূমি হইতে রস সংগ্রহ করিয়া তাহা কাণ্ড ও শাখার মধ্যে চালিত করে কাণ্ড ও শাখাগুলি আবশ্যকীয় পদার্থ ঐ রস হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখে। পত্রগুলি বায়ু হইতে অক্সিজেন ও কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড নামক বায়বীয় আহরণ করিয়া আপনার প্রয়োজন মত কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড বাষ্প সংগ্রহ করিয়া রাখে। ঐ কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড বাষ্পই শ্বেতসার গঠনে নিযুক্ত হয়। শ্বেতসার গাছের মজ্জা (পিথ) ও প্রত্যেক উদ্ভিদকোষের মধ্যে থাকে। মূল রস সংগ্রহ করে কাণ্ড ও শাখা রস সঞ্চারিত করে পত্র বায়ু হইতে গৃহীত কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড বাষ্পকে সূর্য্যালোকের সাহায্যে শ্বেতসারে পরিবর্ত্তিত করে। এ শ্বেতসারই জীবজন্তুর ভোজ্য। সূর্য্যালোক শ্বেতসার প্রস্তুত কার্য্যে প্রধান সহায়ক বিধায় গাছপালা মাত্রেই সূর্য্যাভিমুখী হয়।

উদ্ভিদ জগৎ ছাড়িয়া প্রাণী জগতে আসিলে আমরা দেখিতে পাই—কতকগুলি প্রাণী উদ্ভিদভোজী অপর কতকগুলি মাংসাশী। উদ্ভিদভোজী অধিকাংশ প্রাণীই অপর প্রাণীর খাদ্য—যেমন মাছ ছাগল মেষ গো মহিষ শূকর হরিণ। মাংসভোজী প্রাণীরা অধিকাংশ অপর উদ্ভিদভোজী প্রাণীর ভোক্তা—যেমন বাঘ সিংহ ইত্যাদি। যাহারা উদ্ভিদভোজী—উক্ত উদ্ভিদ খাদ্য সংগ্রহের জন্য তাহাদের দেহের মধ্যে কত প্রকার ব্যবস্থা আছে। কাহারো গ্রীবা দীর্ঘ কাহারো সম্মুখে এক পাটি দাঁত নাই কাহারো জিহ্বা অতীব দীর্ঘ কেহ লাফাইয়া বা উড়িয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাইতে পারে কাহারো চঞ্চু আছে কাহারো গলদেশে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য কাহারো খাদ্য নরম করিবার জন্য থলি থাকে কোন কোনও জানোয়ারের পাকস্থলী চারিটি কক্ষে বিভক্ত ইত্যাদি।

মানুষের বেলায়—হস্তপদাদি আছে খাদ্য সংগ্রহের জন্য এবং পরিপাক কার্য্যের জন্য আছে নানা জাতীয় রস।

উদ্ভিদেরা তরল ও বায়বীয় খাদ্য খায় বলিয়া উহাদিগের দন্ত বা পাকস্থলীর প্রয়োজন হয় না; কিন্তু শিকড় যে রসকে আকর্ষণ করিয়া উক্ত রসকে সমস্ত দেহে পরিব্যাপ্ত করিবার জন্য যে কৌশলের প্রয়োজন তাহা উহাদের দেহে আছে। এবং পত্র থাকেই সবুজবর্ণ হয় ঐ সবুজবর্ণটি ক্লোরোফিল্ নামক এক প্রকারের রঙ্গের পদার্থ থাকার ফল। উক্ত ক্লোরোফিল সূর্য্য কিরণের সাহায্যে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড বাষ্পকে শ্বেতসারে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। এই জন্য গাছের যে দিকে সূর্য্য কিরণ পাত হয় সেই দিকেই গাছ বাড়ে এবং সেই দিকেই সবুজ পত্র থাকে। পশু পক্ষী ও মানুষ কঠিন খাদ্য খায় বলিয়া উক্ত খাদ্য আহরণের জন্য উহাদের দেহে নানা জাতীয় কৌশল আছে এবং খাদ্য কঠিন বলিয়া ঐ কঠিন খাদ্যকে ক্ষুদ্রাকারে পরিণত করিবার জন্য দাঁত। চর্ব্বণ এবং রস করিবার জন্য নানা প্রকারের রসের গ্রন্থি দেহে বর্ত্তমান আছে। কাজেই দেখা যায় গো উদ্ভিদ হউক আর ইতর প্রাণীই হউক আর মানুষই হউক—সকলের পক্ষেই খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক করিবার মূল নিয়ম এক কিন্তু জীবভেদে উক্ত প্রক্রিয়ার কৌশলের বিভিন্নতা বর্ত্তমান আছে।

(৩) রক্ত সঞ্চালন।

রক্ত চলাচলের উদ্দেশ্য—খাদ্যের পরিপাচক রসকে দেহের প্রত্যেক স্থানে লইয়া যাওয়া এবং দেহের দূরা ভিদূর স্থান হইতে তত্তৎ স্থানের মল সংগ্রহ করিয়া

তাহার নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা। গাছের দেহের মধ্যে রক্ত না থাকিলেও রস সঞ্চালিত হয়। ইতর প্রাণীর দেহের মধ্যে ঐ প্রকারে রক্ত খাদ্যের রসের অথবা জলের অবাধ সঞ্চালনের ব্যবস্থা আছে। এবং নরদেহে হৃৎপিণ্ড ও শিরাধমনী সাহায্যে রক্তসঞ্চালনের কথা অবিদিত নাই। ফলকথা প্রকৃতির রাজ্যে বহুর মধ্যে একত্বেরই প্রাধান্য সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। বাহ্যতঃ দেখিতে বিভিন্ন প্রকারের প্রাণীর জীবনের স্থিতি ধারণের উপায় ও প্রক্রিয়া সব একই নিয়মানুগ।

(৪) শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য ও মলত্যাগ।

যেমন প্রস্রাব ও মল ত্যাগ দেহের ময়লা যদি আমাদের নিশ্বাস বায়ু দেহের ময়লা ভিন্ন আর কিছুই নয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে গাছপালার সবুজবর্ণ পত্রের সাহায্যেই গাছের আহার্য্য প্রস্তুত ও সংগৃহীত হয়। এখন আরো বলি যে গাছপালার পত্রের নিম্নদিকে সূক্ষ্ম ছিদ্র অসংখ্য আছে গাছ তাহার দেহ হইতে এই ছিদ্রপথে অপ্রয়োজনীয় বাষ্প নিষ্কাশন করে। উহাই উদ্ভিদের নিশ্বাস কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

মাছ তাহার কানকোর সাহায্যে জল হইতে অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করে এবং জলের উপরিভাগে উঠিয়া মাঝে মাঝে নিশ্বাস ত্যাগ করে। অধিকাংশ মাছ মলত্যাগও করে। প্রস্রাব ত্যাগের কথা জানা নাই। পোকা মাছ পাখী সরীসৃপ প্রভৃতিরা স্বতন্ত্র মূত্রত্যাগ করে না। তাহাদের মল ও মূত্র এক সঙ্গে বাহির হয়। কিন্তু বড় বড় জন্তুদের প্রস্রাব ও মল উভয়ই স্বতন্ত্র নির্গত হয়। মানুষেরা আরো এক ধাপ উচ্চে—তাহারা তাহার উপরে ঘর্ম্ম নামক পদার্থ দ্বারা দেহের মল বাহির করে।

কাজেই উদ্ভিদ হইতে মানুষ পর্য্যন্ত—যে দিকেই তাকাও দেহ হইতে সকলেই মল ত্যাগ করে—তবে সে মল ও তাহার ত্যাগের প্রণালী অবস্থাভেদে নানা প্রকারের।

(৫) স্নায়ুর কার্য্য।

উদ্ভিদের স্নায়ু আছে কি না তাহা জানা নাই—অর্থাৎ নরদেহে মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র স্নায়ু জাল যে ভাবে আস্তৃত আছে উদ্ভিদ দেহে সেইরূপ স্নায়ু বিন্যাসের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও উদ্ভিদ দেহে স্নায়ুর কার্য্য যে বিলক্ষণ ঘটে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। পরগাছা লতাগুলি যে ভাবে অপর বৃক্ষকে আবেষ্টন করিয়া উঠে তাহাতে উক্ত পরগাছার বোধশক্তি প্রমাণিত হয়। গাছের শিকড় যে ভাবে রসের দিকে বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া ধাবিত হয় তাহাতেও বোধশক্তির পরিচয় পাই। গাছের পাতা ও ডাল রৌদ্রের অভিমুখে কোন প্রেরণায় ধাবিত হয়? রৌদ্র বোধ উহাদের স্নায়বিক বোধের পরিচায়ক নয় কি? ফুল দিনে মুদিত হয় এবং রাত্রিকালে প্রস্ফুটিত হয় ইহাও তাহাদের বোধশক্তির পরিচায়ক নয় কি? লজ্জাবতী লতা স্পর্শে কুঞ্চিত হয় কেন?

নিকৃষ্ট জীবদেহে সম্পূর্ণ স্নায়বিক বিকাশ না থাকিলেও স্নায়বিক কার্য্যের পরিচয়ের অভাব নাই। অমেরুদণ্ডী ইন্দুর প্রভৃতি বড় (পোকা) অত্যন্ত স্পর্শবোধক। মাছি ও ময়লা জলে আলোক পাত করিলে মাছেরা সেদিকে আকৃষ্ট হয়। কেন্নো মাকড়শা প্রভৃতি স্পর্শ মাত্রে বোধ করে। কুকুরের আঘ্রাণশক্তি অতীব প্রবল। আরসুলা পিপীলিকা ও ইন্দুরের ঘ্রাণশক্তি বেশ প্রবল। কাজেই বেশ দেখা যাইতেছে যে শ্রীভগবান সমস্ত প্রাণী জগৎ একই আদর্শে সৃষ্টি করিয়াছেন—গাছই হউক আর মাছই হউক স্নায়বিক কাজ উভয়েই দরকার—তবে কাজের তারতম্য অস্বীকার করিবার যো নাই।

(৬) সন্তানোৎপাদন।

সৃষ্টির ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যই প্রাণীর সৃষ্টি। প্রত্যেক প্রাণীর পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্য—বংশ রক্ষা করা। বংশ বলিলে উদ্গত বিশেষ ধর্ম্মগুলিরই উপরে লক্ষ্য করা হয়।

বিবাহ দিয়া থাকি। কাযেই পাঁঠাধর্ম্মবিশিষ্ট সন্তানাদিও জন্মে!

(৮) ব্যাধির সংক্রমণ

ঘাম মাখা একটা জামা বাৰ দিনে ঘরে টাঙ্গাইয়া ... ইহাকে মসী বা ... বলে। কিন্তু খুব ... শুক্‌না দিনে রোদে জামা টাঙ্গাইয়া রাখিলে ঐরূপ কিছুই হয় না। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ—

রোদহীন বাতাসহীন
আলোকহীন স্যাঁতস্যাঁতে

এই চারিটি জিনিষের একত্রে মিলন হইলে সেখানে নানা প্রকারের ছাতা জন্মায়। জীবাণুরা ... সূক্ষ্ম উদ্ভিদ বা প্রাণী ... তাহাদের এক লক্ষটি একত্রিত হইলে তবে সূচের অগ্রভাগটি ... বড় ... দেখায়। এই জীবাণুরা—

রোদ বাতাস ও আলোর অভাব যেমন জায়গায়
স্যাঁতস্যাঁতে ভাবের আধিক্য } জীবাণুরা বাড়ে।
বা
রোদ হাওয়া ও আলো পাইলে } জীবাণুরা মরিয়া
স্যাঁতস্যাঁতের অভাব ঘটিলে } যায়।

মসী ছাতার মত এক জাতীয় অতীব ক্ষুদ্র উদ্ভিদ। মসীর মত অনেক জীবাণু আমাদের দেহে বাসা বাঁধে যদি আমরা কিছুদিন—

অন্ধকার স্যাঁতস্যেঁতে
রৌদহীন বায়ুহীন

ঘরে বাস করি। এই জন্য গরীবদিগকেই যত ছোঁয়াচে ব্যারাম প্রথম ও বেশী করিয়া ধরে। ছোঁয়াচে ব্যারাম বলিলে—ক্ষয়কাশ হাম বসন্ত প্লেগ ইনফ্লুয়েঞ্জা কলেরা সর্দ্দি টাইফয়েড জ্বর আমাশয় ইত্যাদিকে বুঝায়। এসকল ব্যারাম নিবার্য্য। কিসে তাহা নিবারিত হয় তাহা বুঝা সহজ। সহরে বা গ্রামে খুব বড় বড় রাস্তা ও চওড়া রাস্তা করিয়া দিলে প্রত্যেক পল্লীতে একেকটা খোলা যায়গা রাখিলে সূর্য্যালোকের গতি অবাধ হয় তাহার উপরে গ্রামের জল নিকাশের জন্য ভাল ড্রেন প্রভৃতি করিলে রোগ জীবাণুরা বাসা বাঁধিতে পায় না। এই জন্যই—সরকারকে রাস্তা বাহির করিবার ও খোলার জন্য পার্ক বা উদ্যান করিবার জন্য এত ব্যস্ত হইতে হয়। এই জন্যই ড্রেন বসান প্রয়োজন হয়। এই জন্য বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে সরকারের নিকটে বাড়ীর নক্সা দিয়া পাস করাইয়া লইতে হয়—পাছে বাড়ীর কোনও অংশ অস্বাস্থ্যকর থাকে। আমরা অন্যায় করিয়া রাগ করি—আমরা টেক্স দিতে ... কবি আমরা লুকাইয়া বাড়ীর ভিতরে অনেক কিছু করি কিন্তু সে সব করায় ক্ষতি কার?

পল্লী-সংগঠন

রাজনীতির মোহের আশায় পড়িয়া আমরা দিন কতকের জন্য বহির্মুখী হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু মোহের ঘোর কাটিতে বেশী বিলম্ব হয় না। রাজনৈতিক জীবনে উন্নতিলাভ করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে পল্লী সংগঠন করিতে হইবে এ তত্ত্ব সহজেই বুঝা গেল। সেই জন্য আমাদের স্বরাজ সাধনার প্রথম সোপান হইতেছে পল্লী সংগঠন।

পল্লী সংগঠন করিতে হইলে যাহারা পল্লী ছাড়িয়া সহরবাসী হইয়াছে প্রথম তাহাদিগকে পল্লীবাসে ফিরিয়া যাইতে হয়। কিন্তু পরিত্যক্ত পল্লী এখন যত্ন অভাবে শ্রীহীন নানাবিধ রোগের আকর। পল্লীবাসে ফিরিয়া যাইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে পল্লীগুলিকে বাস যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে—তাহার স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইবে।

পল্লী সংগঠনের ন্যায় এরূপ একটা গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে স্বদেশের এবং বিদেশের নানা অবস্থার খবর লইতে ও রাখিতে হয়। পূর্ব্বে আমাদের দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেমনই থাক এখন যে সে অবস্থা খুবই হীন তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। কিন্তু প্রতীচ্য ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের অবস্থা আমাদের মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত নহে। স্বাস্থ্য—বিশেষ্য গ্রাম্য স্বাস্থ্য রক্ষার সেখানে সুব্যবস্থা কিরূপ আমরা আমাদের পাঠক পাঠিকাগণকে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিব।

আমেরিকার মফস্বলের গ্রামগুলিতে স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা করিবার জন্য বেতনভোগী স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীগণ স্থায়ীভাবে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা অপর কোন কাজই করেন না। গৃহস্থ লোকের নিত্য নৈমিত্তিক ও দৈনন্দিন অপরিহার্য্য কার্য্যগুলির মধ্যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলিও অন্যতম এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এই গ্রাম্য স্বাস্থ্য রক্ষার কার্য্যক্ষেত্র প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতি বৎসর নূতনভাবে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য বিভাগ এই সকল কার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন। গ্রাম্য চিকিৎসকেরা গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনের কর্তৃপক্ষগণ এবং জনসাধারণ সর্ব্বদা এই বিভাগের কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ করিয়া থাকেন।

ভিন্ন ভিন্ন জেলায় স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্য্যের প্রণালী বিভিন্ন রকমের হওয়াই সম্ভব। তবুও কতকগুলি বিষয়ে সকল জেলার অবস্থাই প্রায় সমান। গ্রাম্য স্বাস্থ্যরক্ষা কার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ অবস্থার উল্লেখ করিলে সকলে বিষয়টি বেশ বুঝিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয়। আমরা সেইজন্য যথাসম্ভব সাধারণ ভাবে বিষয়টি বিবৃত করিবার চেষ্টা করিতেছি।

কোন জেলায় স্বাস্থ্যোন্নতিকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে একটি স্বতন্ত্র স্থায়ী স্বাস্থ্য বিভাগ স্থাপন করিতে হয়। এরূপ বিভাগ স্থাপন করিতে হইলে প্রথমেই কিছু অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কর্তৃপক্ষকে অতি বিবেচনাপূর্ব্বক এই ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে হয়। কারণ যদি জনসাধারণ এই অর্থব্যয় অনাবশ্যক কিম্বা অপব্যয় বলিয়া মনে করে তাহা হইলে মুস্কিল। সুতরাং সাধারণের মনের ভাব বুঝিয়া অর্থাৎ স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপন করিলে অর্থ ব্যয় করিলে জনসাধারণ বিরক্ত হইবে না বুঝিলে তবে তাঁহারা অর্থ ব্যয় করিবেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সাধারণের মনের ভাব কেমন করিয়া বুঝিবেন? তাহার উপায়টিও আছে এবং সে উপায়টি হচ্ছে—লোকমত গঠন করা। অর্থাৎ প্রথমে কর্তৃপক্ষ সাধারণের স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপনের উপকারিতা এ বিষয়ে অভিজ্ঞের সাহায্যে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। অনেক এ বিষয়ে সাধারণের মন স্বতই পূর্ব্ব হইতে অনেকটা প্রস্তুত থাকে। গ্রামের ও গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টার কথা শুনিলে কেহ বা প্রসন্ন না হয়? কর্তৃপক্ষ কেবল সেই সুপ্ত ভাবটিকে জাগাইয়া দেন লোকদিগকে নিজেরা আলোচনা করিতে এবং সিদ্ধান্ত করিতে সুরু করাইয়া দেন। কোন জেলায় কাজ আরম্ভ করিবার সময় জেলার কর্তৃপক্ষ স্থানীয় চিকিৎসকগণের সঙ্গে পরামর্শ করেন তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অন্যান্য অপর উপায়ও অবলম্বিত হইয়া থাকে। তা ছাড়া জেলার প্রধান প্রধান লোকদের লইয়া স্বাস্থ্য কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিও নানা প্রকারে লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। যখন অধিকাংশ লোক স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপনের উপকারিতা বুঝিতে পারে তখন স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপন করিলে সাধারণ অর্থব্যয় করিতে গেলে লোকে যে আপত্তি করিবে না তাহা অনেকটা বুঝিয়া লওয়া যাইতে পারে।

জনসাধারণ যখন কোন স্থানে স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন তখন আন্দোলন উপস্থিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে উহার আবশ্যকতা জানানো হয়। ইহার ফলে সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। জেলার কর্ত্তারা অনেক সময় নিজেরাই স্বাস্থ্য বিভাগের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া স্বত প্রবৃত্ত হইয়া অর্থসাহায্য করিতে পারেন। এরূপ

একজন বাবোমেসে অর্থাৎ (full time ইনি আর অন্য কোন কাজ কিম্বা অবসর সময়ে স্বতন্ত্রভাবে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে পারিবেন না) চিকিৎসক স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী একজন সেবিকা (nurse) ও একজন পরিদর্শক কর্ম্মচারী হইলে ছোট ছোট জেলাগুলির কাজ এক রকম চলিয়া যাইতে পারে। জেলার আয়তন বড় হইলে সেবিকা ও পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হয়। আর অফিস কাজ চালাইবার জন্য কেরাণী ভৃত্য প্রভৃতি আরও দুই একজন করিয়া লোক আবশ্যক হইতে পারে। ইহাদের ভ্রমণ ব্যয় চই অফিস ভাড়া ও তাহার কার্য্য পরিচালনের ব্যয় এ ি ও আছে। স্থল বিশেষে অ। যেখানে কোন একটা বিশেষ পীড়ার বেশী প্রাদুর্ভাব সেখানে সেই পীড়ার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও রাখিতে হয়। এইরূপে কোন জেলায় দন্ত চিকিৎসক কোথাও স্যানিটারী এঞ্জিনীয়ার কোথাও জীবাণুতত্ত্ববিদ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ আতিরিক্ত কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যুক্তরাজ্যের ২ টি প্রদেশে এই সকল কার্য্যের জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত ও সংগৃহীত হইয়াছে। ১৯টি রাজ্যের ৭৬টি জেলায় সকল ব্যয়ভার সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগ প্রদান করিতেছেন। আর রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বোর্ড ২০টি প্রদেশের ১৫টি জেলাকে অর্থ সাহায্য করিতেছেন।

স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ কি কি ?

জেলার স্বাস্থ্যবিভাগের প্রধান ও প্রথম কাজ—লোকশিক্ষা। যে সকল রোগ এক ব্যক্তির শরীর হইতে অপর এক ব্যক্তির শরীর বা এক স্থান হইতে অপর স্থানে সংক্রামিত হয় তাহা কিরূপে হয় এবং সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতিরই বা উপায় কি ? এই সকল বিষয়ে লোককে শিক্ষা দান।

এই শিক্ষা দিবার কয়েকটি উপায় আছে।

(১) বক্তৃতা। সুযোগ থাকিলে চিত্র ম্যাজিক লণ্ঠন নক্সা মানচিত্র আদর্শ চিত্র বা মূর্ত্তি এবং চলচ্চিত্র প্রভৃতির সাহায্যে বক্তৃতাগুলি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেওয়া।

(২) পত্রিকা। সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগ সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ ও অন্যান্য সূত্র স্বাস্থ্য স ... সম্বন্ধে পত্রিকা রচিত মুদ্রিত ও বিতরিত হইবে।

( ) ... স ... দ ... বা প্রবন্ধাদি ... ।

(৪) মেলায় কোন মেলা প্রদর্শনী ... উপলক্ষে ... লোকের সমবেত হইবার ... স্বাস্থ্য প্রদর্শনীও ... পদার্থ ... ও ... ।

(৫) ... আবশ্যকতা লোককে ... ।

অবশ্য ... মূল্য ... কাজের দ্বারা ... সকল ... সম্ভবপর ... স্বাস্থ্য বিভাগ ... করিবেন এবং সাধারণ ... সমিতি বা স্বেচ্ছাসেবক ... পরিচালন করিবেন।

... ...

স্বাস্থ্য বিভাগের ... সর্ব্বাপেক্ষা ... রোগের প্রা ... ব্যক্তিদের ... সেবক ব্যবস্থা ... ।

জানা রোগীর ... ভিতরে ... তাহার সম্বন্ধে ... করিতে হইবে। চিকিৎসা ব্যবসায়ী দলের কর্তৃপক্ষ ও বাড়ীর কর্তার কাছ হইতে এই সকল সংবাদ পাওয়া যাইতে পারিবে। স্বাস্থ্য বিভাগের যোগ্যতা অনুসারে রোগের ... সংগ্রহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে বা অসম্পূর্ণ বিবরণ মাত্র সংগৃহীত হইতে পারে।

(২) আইনানুসারে রোগীকে স্বতন্ত্র করিবার

ব্যবস্থা বা কোয়ারেন্টাইন রাখিবার ব্যবস্থা স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগই করিয়া থাকেন।

(৩) রোগ নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ জন্য রোগোৎপত্তির মূল সূত্রানুসন্ধান। সম্ভব হইলে হেলথ অফিসারের স্বয় বসন্ত ডিপথেরিয়া স্কারলেট ফিভার টাইফয়েড ফিভার পোলিওমায়েলিটিজ ও সেরিব্রোস্পাইনাল মেনিনজিটিজ রোগাক্রান্ত সর্ব্বপ্রথম রোগীকে দেখিতে গিয়া তাহার মূল সূত্রানুসন্ধানের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

(৪) রোগ যাহাতে বিস্তৃত হইতে না পাবে সেজন্য সেবিকারা বাড়ীবাড়ী ঘুরিয়া গৃহস্থকে রোগ নিবারণ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বেড়াইবে।

(৫) সংক্রামক রোগের প্রধান ও অন্য ইতিহাস অফিসের রেকর্ডভুক্ত হইয়া থাকিবে এবং রোগাক্রান্ত স্থানের মানচিত্রও অফিসে রক্ষিত হইবে।

(৬) সংক্রামক রোগ নির্ণয়ে মতভেদ ঘটিলে যিনি রোগীর চিকিৎসা করিতেছেন তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে।

(৭) বসন্ত টাইফয়েড ও ডিফথিরিয়া রোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান ও দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য বিনামূল্যে রোগ নিবারণের পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৮) সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে যখন বিনা মূল্যে প্রাণিতত্ত্ববিষয়ক নমুনা বিতরিত হয় তখন তাহা জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের হাত দিয়া বিতরিত হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঐ দ্রব্যগুলি ভাল অবস্থায় ও যথেষ্ট পরিমাণে অর্থাৎ জেলার প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে সঞ্চিত রাখিবার ভার জেলার স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীকেই লইতে হইবে।

পরীক্ষাগার বা Laboratory

সংক্রামক রোগের লক্ষণ নির্ণয় এবং জল ও দুগ্ধের সংক্রামকতা নিবারণের উদ্দেশ্যে সরকারী বা জেলার নিজস্ব স্থানীয় ল্যাবরেটরী থাকা চাই। সরকারী ল্যাবরেটরী দূরে অবস্থিত হইলে জেলার নিজস্ব ল্যাবরেটরী না থাকিলে কাজের বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিতে পারে।

যৌন রোগ নিবারণ

১। লোকশিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়তা যদি কোথাও থাকে তবে তাহা এইখানে। ইহা সামাজিক ব্যাধি। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষা করা যেমন দরকার সমাজকেও সেইরূপ এই কুৎসিত ব্যাধি হইতে রক্ষা করা দরকার। সুতরাং এই সামাজিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য লোকশিক্ষার বিশেষ রকম ব্যবস্থা করা গ্রাম্য স্বাস্থ্য সমিতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানতম কর্ত্তব্য। এবং তাহাই করাও হইয়া থাকে। উপদেশ বক্তৃতা দৃষ্টান্ত প্রভৃতি সকল উপায়েই শিক্ষা দেওয়া হয়।

২। যৌন রোগাক্রান্ত (অর্থাৎ গণোরিয়া গ্লীট সিফিলিস প্রভৃতি রোগ দুষ্ট) ব্যক্তিরা অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইতে না পারিলে সমাজের কল্যাণার্থ গ্রাম্য স্বাস্থ্য সমিতি স্বয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন কিম্বা তাহার যাহাতে চিকিৎসার কোন না কোন রকম ব্যবস্থ হয় সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। দরিদ্র লোকদের যৌন রোগের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য জেলার চিকিৎসকগণকে প্রয়োজন হইলে বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করিতে হইবে।

৪। যৌন রোগ সংক্রান্ত আইন চালাইবার মূল ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণের সহিত গ্রাম্য স্বাস্থ্যসমিতি সহযোগিতা করিবেন এবং এ বিষয়ে লোকমত গঠনের চেষ্টা করিবেন। তাহাতে আইনের কার্য্য পরিচালনের সুবিধা হইবে।

যক্ষ্মারোগ

১। যক্ষ্মারোগের বিস্তৃতি নিবারণের জন্যও লোক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কম নয়। এই শিক্ষার প্রধান সময় বাল্য কাল হইতে এবং প্রধান স্থান পাঠশালা। বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ভাবে

ক্লাশ খুলিয়া, চলচ্চিত্র লণ্ঠন চিত্র ও পুস্তিকার সাহায্যে এই শিক্ষা দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও থাকে।

২। জেলার ভিতর যত যক্ষ্মা রোগী আছে গ্রাম্য স্বাস্থ্য বিভাগ তাহাদের রোগ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখেন।

৩। কাহারও যক্ষ্মা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হইলে তাহার পরীক্ষার জন্য স্থানীয় চিকিৎসকগণের সহযোগিতায় রোগ পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়।

৪। যে সকল বাড়ীতে যক্ষ্মা রোগী আছে সেবিকারা মধ্যে মধ্যে ঐ সকল বাড়ীতে গিয়া রোগের শুশ্রূষা সম্বন্ধে এমন ভাবে উপদেশ দেন যাহাতে তাঁহারা শুশ্রূষাকারী চিকিৎসকগণকে যথোচিত পরিমাণে সাহায্য করিতে পারেন। যক্ষ্মা রোগীরা যাহাতে যক্ষ্মা নিবারণের বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতির স্বাস্থ্যকর আবেষ্টনের সাহায্য পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই ভাল হয়। তবে স্যানিটেরিয়াম চিকিৎসার সুযোগ লাভ করা অসম্ভব হইলে গৃহেই উপযুক্ত রূপ সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করা দরকার।

৫। স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে এই রোগের সঞ্চার হইয়াছে কি না তাহা নির্ণয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে ছাত্রদের দেহ পরীক্ষা করা হইবে। তাহা ছাড়া সাধারণভাবে তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করিয়া যাহাতে তাহারা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত না হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা হইবে।

বিশেষ বিশেষ রোগের সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা

ম্যালেরিয়া বক্রকীট ট্রাকোমা প্রভৃতি রোগ সম্বন্ধে জেলা বিশেষে বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার হয়। এ সকল ক্ষেত্রে সাধারণ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া রাখা আবশ্যক। সময় সময় এমন অবস্থা ঘটে যে স্থানীয় স্বাস্থ্য সমিতিকে কিছু কাল ধরিয়া এই শ্রেণীর কোন একটী রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে নিযুক্ত থাকিতে হয়।

ম্যালেরিয়া।—ম্যালেরিয়া নিবারণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে এই কাজগুলি করিয়া রাখিতে হইবে যথা—

১। রোগের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে সকল সংবাদ সংগ্রহ। বিশেষ করিয়া ম্যালেরিয়াবাহী মশকের সন্ধান লইতে হয়। সমগ্র জেলার খবর ত রাখিতেই হইবে তৎসহ গ্রাম নগর প্রভৃতি সম্বন্ধেও বিশেষভাবে সংবাদ লইতে হইবে। মশকদের পরিদর্শন করিয়া রোগীদের রক্ত ও প্লীহা পরীক্ষা করিয়া স্কুলের ছাত্র রোগী হইলে তাহার আক্রান্ত হইবার ইতিহাস এবং চিকিৎসকগণের নিকট হইতে সংগৃহীত বিবরণ হইতে এই জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে।

২। গ্রামে পল্লীতে নগরে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য সুবিবেচিত ও কার্য্যোপযোগী কর্ম্ম পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

৩। এই রোগের প্রকৃতি ও প্রভাব সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে এবং ইহা নিবারণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা করা আবশ্যক তাহাও সাধারণকে জ্ঞাত করা হইবে।

ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় বিবিধ। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সামঞ্জস্য আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি এই—

১। জল নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া মশক ডিম্ব নষ্ট করিয়া কিম্বা মশকের চাষ করিয়া মশক বংশ ধ্বংস।

২। ম্যালেরিয়া রোগীকে আবৃত রাখিয়া এবং কুইনাইন সেবন করাইয়া মশকেরা যাহাতে তাহার দেহ হইতে রোগ বীজাণু সংগ্রহ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা। এই উপায়ে ম্যালেরিয়ার সংক্রামকতা নিবারণ করা যায়।

৩। কুইনাইনের সাহায্যে রোগীকে উত্তমরূপে নিরাময় করিবা।

বক্রকীট।—রোগীর মল পরীক্ষা করিয়া এই রোগের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হয় এবং লোক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহা হইলেই এই রোগ

প্রসূতির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জন্ম রেজিষ্ট্রির সুফল বুঝাইয়া দিতে হইবে। মফস্বলের স্থানে স্থানে কতকগুলি গ্রামের শিশুগুলিকে মধ্যে মধ্যে সমবেত করিয়া স্থানীয় চিকিৎসকগণের সহায়তায় শিশুদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে হইবে। শিশুদিগের দৈহিক অবস্থার বা স্বাস্থ্যের দোষ থাকিলে তাহার সংশোধন করিতে উপদেশ দিতে হইবে। শিশু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণভাবে শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

২। স্কুলের স্বাস্থ্য।—শিশুরা স্কুলে আরম্ভ করিলে সেখানে তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধা। পল্লী বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রের দৈহিক পরীক্ষা করিতে হইবে। কেবল যে সকল ছাত্রের পিতামাতা বা অভিভাবক ঐরূপভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা পছন্দ করেন না তাহাদিগকে অবশ্য বাদ দিতে হইবে। পরীক্ষায় যে সকল ত্রুটি ধরা পড়িবে বালকের পিতামাতা ও স্কুলের কর্তৃপক্ষকে তাহা জানানো হইবে। এই সকল ত্রুটির সংশোধনের জন্য সেবিকারা তাহাদের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহাদের বাড়ীর লোকদের বলিবেন যে পারিবারিক চিকিৎসক কিম্বা দন্ত চিকিৎসককে আহ্বান করাইয়া উঁহাদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হউক। যে সকল পিতামাতা অর্থাভাবে চিকিৎসা করাইতে পারিবেন না তাহাদের জন্য স্থানীয় চিকিৎসকগণের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। প্রসূতিদিগকে পুষ্টিকর শিশুখাদ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে।

অপরাপর কাজ

১। সাধারণ ভাবে অঞ্চলে সম্পূর্ণ রূপে জন্মমৃত্যু রেজিষ্টারির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ বিষয়ে স্থানীয় রেজিষ্ট্রার [illegible] ও জনসাধারণের সাহায্য [illegible] যে [illegible] প্রয়োজন হইবে [illegible] আইন প্রচলন [illegible] হইবে।

২। কোন [illegible] বাহির [illegible] স্বাস্থ্য [illegible] চাহিবে [illegible] দিতে [illegible] এ ব্যবস্থা [illegible] বড় জেলা [illegible] উচিত।

৩। কোন [illegible] স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা আবশ্যক হইতে পারে।

৪। [illegible] আবশ্যক ঘটনা নিবারণে [illegible] সাধারণকে নিরাপদ [illegible] ব্যবস্থা করিতে পারেন।

৫। উন্মাদ রোগের [illegible] সম্বন্ধে [illegible] হওয়া উচিত।

৬। স্বাস্থ্য [illegible] রোগের বিবরণ [illegible] লিখিয়া রাখা ও সরকারী আইন অনুসারে [illegible] হইতে বিশেষ [illegible] সাপ্তাহিক মাসিক রোগের বিবরণ [illegible] রাজ্যের প্রধান স্বাস্থ্য বিভাগে পাঠাইতে হইবে।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও সাধারণের ঔদাসীন্য

মানুষের রোগ হইলে তাহাকে নিরাময় করিবার জন্য চিকিৎসকগণকে যে কি পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিতে হয় জনসাধারণ তাঁহার খবর খুব কমই রাখেন। শরীরং ব্যাধি মন্দিরম। মানুষের শরীরে কত রকম ব্যাধির যে আক্রমণ হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সকল রোগ হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার ভার চিকিৎসকদিগকে লইতে হইয়াছে। রোগ আরাম করিতে হইলে রোগের কারণ প্রকৃতি আরোগ্য লাভের

উপায় প্রভৃতি জানা আবশ্যক। এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অনেক গবেষণা, অনুসন্ধান, পর্য্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিতে হয়। যে সকল মানব হিতৈষী ব্যক্তি গবেষণার ফলে রোগের প্রকৃতি বা রোগ নিবারণের উপায় কিংবা ঔষধাদির আবিষ্কার করিয়া থাকেন তাঁহাদের কাছে মানব জাতি যে কতদূর ঋণী তাহা তাহারা জানে না। [illegible] লোকসংখ্যার অনুপাতে এক কোটী লোকের মধ্যে একজন হিসাবে এরূপ নূতন আবিষ্কর্তা আছেন কিনা সন্দেহ। আর চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের সংখ্যার অনুপাতে হাজার করা একজনের বেশী আবিষ্কর্তা পাওয়া যাবে না। যেখানে কোটী কোটী লোকের মধ্যে [illegible]াধিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক আবিষ্কর্তা নাই সেখানে সামান্য জনগণ যে তাঁহাদের খবর রাখিতে পারে না তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। সাধারণের এই ঔদাসীন্যের জন্য কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না।

বিজ্ঞানমাত্রই মানবের আদরের। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান মানবের যতটা উপকার সাধন করে অপর কোন বিজ্ঞান ততটা মানবহিতের দাবী করিতে পারে না। কিন্তু জনসাধারণের বিবেচনায় ইহা অতি নগণ্য। সমর বিজ্ঞানের—মানুষকে হত্যা করিবার বিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে কত অর্থই না ব্যয় করা হইয়া থাকে। কিন্তু কামান বন্দুকের গুলিতে আহত বা রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণকে বাঁচাইবার বিদ্যাটির উন্নতি সাধনের জন্য কত অর্থ ব্যয় করা হয় তাহার হিসাব কেহ রাখেন কি? একটু একটু রাখেন বই কি। সুপ্রসিদ্ধ সার বোল্ডস একজন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক। তিনি চিকিৎসা জগতে অনেক মৌলিক অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি সায়েন্স প্রগেস নামক বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে এই খরচের একটি হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জনসাধারণের কৃতঘ্নতার উল্লেখ করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন যে লোকে ইহাকে অত্যন্ত অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করিয়া থাকে—চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিকে ফিরিয়াও চাহে না। জনসাধারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভিতরকার কোন খবরই লইতে বা রাখিতে চায় না। এ বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ ভার ডাক্তারের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছে। রোগ হইলে তাহারা আরাম হইবার জন্য ডাক্তারের বাড়ী ছুটিয়া যাইবে কিন্তু ডাক্তারী শাস্ত্রে কিসে যে কি হইতেছে—কত ধানে কত চাল হয়—সে খবর একটুও রাখিবে না। সমরতত্ত্ব বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তাহারা কোটী কোটী টাকা খরচ করিবে কিন্তু তদনুপাতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য যে অর্থ ব্যয় করে তাহা যৎপরোনাস্তি সামান্য। ডাক্তার বোল্ডবস বৃটেনের একটা আনুমানিক হিসাবও দিয়াছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানসংক্রান্ত গবেষণার জন্য গ্রেট বৃটেনের লোকেরা বৎসরে ১৩ পাউণ্ড ঐ বাবদে আর এক দফায় ৫ পাউণ্ড একুনে এই ১৮ পাউণ্ড ব্যয় করে। ইংল্যাণ্ড ওয়েলস স্কটল্যাণ্ডের লোক সংখ্যার অনুপাতে লোক প্রতি বছরে এক পেনী বা এক আনা মাত্র দেয়। আর এই বার্ষিক এক আনা দক্ষিণার পরিবর্ত্তে তাঁহারা এমন সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবিষ্কারের আশা করে যাহাবা তাহাদের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাইবে ও তাহারা সুস্থ ও সবল থাকিয়া জীবন উপভোগ করিবে এবং পীড়িত হইলে আরোগ্য লাভ করিবে। চূড়ান্ত কৃতঘ্নতার নিদর্শন আর কি! চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে যে ক্ষেত্রে লোকে এক আনা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত সে ক্ষেত্রে অন্য সকল বিজ্ঞানোন্নতিকল্পে তাহারা পাউণ্ড হিসাবে ব্যয় করিতে মুক্তহস্ত। রাজনীতি সমরনীতি নৌবিদ্যা নগরশাসন ও সাধারণ শিক্ষা ব্যাপারে বৎসর বৎসর কোটী কোটী পাউণ্ড ব্যয় হইয়া থাকে।

কিন্তু সাধারণের আর এ বিষয়ে এতটা উদাসীন থাকা উচিত নয়। কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানের যতটা উন্নতি হইবে সাধারণও ততটা উপকৃত হইবে। অতএব অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্যও তাহাদের মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করা উচিত।

নিম্ব

[কবিরাজ—শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ।]

নিম্ববৃক্ষ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। বঙ্গের প্রাচীনা গৃহিণীগণ ইহার ব্যবহার বিশেষ রূপেই জানেন। নিমবেগুণ নিমপাতা ভাজা ভোজন এদেশে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

নিমের পাতা সিদ্ধ জলে ক্ষত স্থান ধৌত করিলে ক্ষত সত্বর আরোগ্য হয়। খোস পাঁচড়া ও চুলকানি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি এ জলে স্নান করিলে সদাই উপকৃত হইয়া থাকেন।

বাড়ীর নিকটে নিম গাছ থাকিলে বাড়ীর অধিবাসী বৃন্দের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এই বিশ্বাস সর্ব্বত্রই প্রচলিত দেখা যায়। নিম তৈলের সার হইতে প্রস্তুত মার্গো সোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশেও ব্যবহৃত হইতেছে। অধিক পুরাতন বৃক্ষ হইতে একপ্রকার নির্য্যাস নির্গত হয় তাহা খাইতে সুস্বাদু। ইহা পান করিলে সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টি জনিত রোগ নিরাময় হয় এবং সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নত হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ মতে নিম্বের সাধারণ গুণ —

রুক্ষ কটু ভেদী পাকেও কটু অগ্নি ও বাত নাশক এবং শ্রমশক্তি কারক।

নিম্বের প্রয়োগ স্থল —

তৃষ্ণা কাস জ্বর অরুচি ক্রিমি ব্রণ পিত্ত কফ বমন কুষ্ঠ হৃল্লাস ও মেহরোগ নষ্ট করে।

আয়ুর্ব্বেদীয় মতে বিভিন্ন রোগে নিম্বের ব্যবহার —

(১) কুষ্ঠ রোগে —পঞ্চনিম্ব—নিমের পাতা মূল ত্বক পুষ্প ও ফল সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ঘৃত গোমূত্র, জল, আমলকীর জল অথবা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ১ বৎসরের পুরাতন কুষ্ঠ নষ্ট হয়।

(২) নিমের ছাল ও পলতার কাথ পান করাইবে।

(৩) নিমের তৈল প্রয়োগ করিলে [illegible] ফল পাওয়া যায়।

[illegible] চর্ম্মরোগে। —

(১) নিমছাল ও সোনা[illegible] পাশার [illegible] [illegible] [illegible] মর্দ্দন করিলে [illegible] হয়।

(২) নিম [illegible] সহিত সেবন করিলে অথবা [illegible] ও আমলকী একত্রে বাটিয়া ভোজন করিলে নিমের [illegible] পিত্ত [illegible] ও চর্ম্ম রোগ নষ্ট করে।

(৩) [illegible] মাস [illegible] সেবন করিলে স্ফোটক বিষ [illegible] আরোগ্য হয়।

( ) নিম [illegible] ব্যবহার করিলে [illegible] বিস [illegible] চুলকনা পাঁচড়া প্রভৃতি চর্ম্মরোগ আরোগ্য হয়।

মেহরোগে —নিমছালের [illegible] পান করিলে পুরাতন মেহ আরোগ্য হয়।

জ্বরে —নিমছালের [illegible] পান করিলে কফজ্বর নষ্ট হয়। দাহজ্বরে নিমপাতার [illegible] ইক্ষু গুড়সহ পান করিলে বিশেষ [illegible] হয়।

[illegible] —বাতজ [illegible] নিম পুষ্পের উষ্ণ [illegible] ফলপ্রদ হয়।

বাতরক্তে —নিমের উষ্ণ [illegible] লের সহিত পেষণ পূর্ব্বক পান করিলে বিস নষ্ট হয়।

টাক ও কেশের অকাল পক্কতা। —নিম্ব তৈলের নস্য লইলে উপকার হয়।

[illegible] রোগে —নিম্বের [illegible] জলে উত্তম রূপে পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিবে।

ক্রিমিরোগে —নিম্বপত্র রস মধুসহ পান করিবে।

ক্ষতে —নিম্বতৈল ব্যবহার করিলে ক্ষতের জীবাণু নষ্ট হয়।

দান্ত পরিষ্কার —নিমগাছের বিশেষ মহানিম ফলের চূর্ণ ব্যবহার করিবে।

বসন্তরোগ। — নিম বিচি কাটানটে শাকের মূলের ছাল একত্রে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৭ বটি। প্রতিদিন প্রাতে এক এক বটী বসন্তের প্রাদুর্ভাব সময়ে সেবন করিলে বসন্তের ভয় থাকে না। ইহা বসন্তরোগের উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক

পাকস্থলীর ডায়ারি

[শ্রীবিপিনবিহারী বা[illegible]]

একটি ১১ বৎসর বয়স্ক বালকের পাকস্থলী (Stomach) যদি সজীব হইয়া ডায়ারি লিখিতে পারিত তাহা কল্পনা করিয়া লিপিবদ্ধ হইল—ডায়ারির মধ্যে একপাতা উদ্ধৃত করা হইল।

সকাল ৭টা —

কাল প্রায় রাত ১২টার সময়ে আমার বাবু নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। সেই গুরু আহার হজম করতে সারারাত ধরে চেষ্টা করে সবে একটু বিশ্রাম করবো মনে করেছি এমন সময়ে গরম গরম আধসেরটাক দুধ তার সঙ্গে খাবার বিস্কুট এসে হাজির হল। বিশ্রাম আর হল না আবার কাজে লাগলুম।

সকাল ৮টা—

ঐ দুধটাকে অতিকষ্টে ঠেলে ঠেলে নামিয়ে দিয়েছি আবার খানকতক আধসিদ্ধ গরম মটর ডালের বড়া এসে উপস্থিত। জ্বালাতন করলে। দেখি চেষ্টা করে। বাবুর মায়ের বিবেচনাটা খুব। ছেলে রান্নাঘরে গিয়ে মা বড়া ভাজছেন দেখে চাইলেন আর মাও আদর করে দিলেন। অমনি খানকতক গেলা হল।

সকাল ৯টা—

বাবুর ইস্কুলের সময় হয়েছে আর কি—ভাত ডাল আলুভাজা ইলিশ মাছ দুধ আরো কত কি। পোড়া অদৃষ্টে কি আর বিশ্রাম আছে। অসহ্য হয়ে উঠলো দেখছি। এমন করে আর পারা যায় না। কি করি যতক্ষণ রইবে ততক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টা করতেই হবে।

বেলা ১টা—

বাবুর বাড়ী থেকে মা টিফিন পাঠিয়েছেন—৪ খানা লুচি ১টা আলুর দম ২টা সন্দেশ। বাবা বা[illegible] কোচকাচ্ছে থেকে থেকে। আজ সকলে কাবু হয়। দেখে শুনে চুপ জানি না অদৃষ্টে কত কষ্ট ভোগ যে আছে।

বেলা ২টা—

বাবু ক্লাস পালিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ইস্কুলের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে অনুগ্রহ করে আমার জন্যে কতকগুলো আধভাজা আধকাঁচা ছোলা মটর কলাই ইত্যাদি পাঠালেন। এর নাম শুনছি অবাক জলপান — অবাকই বটে। তার ওপরে আবার খানিকটে ভীষণ ঘোলা কাদার মত পচা দুধেতে চিনিতে মেশান কুল্পী বরফ এসে হাজির। আমি আর ত পারিনা। ও অসহ্য হয়ে উঠেছে এইবারে মোচড় দিতে আরম্ভ করব।

বেলা ৩॥টা —

আমার মোচড়ানিতে বাবু ত গ্যাঙ্গাতে আরম্ভ করলেন। তাই দেখে মাষ্টার মশায় তাড়াতাড়ি পাড়ার একটি ছেলে সঙ্গে দিয়ে আমার বাবুকে বাড়ী পাঠালেন। আমি চুপচাপ করে থাকলে আরো কত আমার ওপর চাপাতেন জানি না। এইবার বোধ হয় বাড়ী গিয়ে একটু বিশ্রাম পাবো। দেখা যাক্।

বেলা ৪॥টা—

ও বাবা বিশ্রাম কোথায়। বাবু ত বাড়ী গিয়ে উঃ আঃ করতে করতে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আমি

আবো ২১৪ টা মোচড় দিলাম—বাছাধন ভাল করে বুঝুন আমাব ওপর কি অত্যাচার করছেন তাহলে যদি পোড়া অদৃষ্ট একটু বিশ্রাম লাভ হয়। কিন্তু হল না বাবুর মা এসে ডাইত কি হয়েছে আহা উঃ [illegible] করলেন। তাব পরেই দেখি একগ্লাস ঘোল এসে হাজির। আমি এবাবে ধন্মবট করবো হাত গুটিয়ে বসে রইলুম—বাবা আমাব দ্বাবা আর কিছু হচ্ছে না। দে মোচড় দে মোচড়। ওমা একি? আধ গেলাস ঢল মেটো পাতিলেবুর রস। না [illegible] কোমর বেধে লাগতে হল—আব শুধু মোচড় চলবে না। প্র [illegible] উপর দিকে এক ঠেলা লাগালাম—বাপ তবু থাকিতে হাবকা হয়ে গেল।

বেলা ৫॥৮টা—

বাবুর বাবা আপিস [illegible] আসতেই বাবুর মা তাকে বললেন ছেলের কি [illegible] বমি করছে পট [illegible] কামড় [illegible] এমন [illegible] বুঝতে [illegible] না। [illegible] ডাক বাপ [illegible]

বেলা ৬॥৫

[illegible] উপোস। [illegible] দেবো না [illegible] আশা [illegible] যাবে।

জড় বিজ্ঞানের সহিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের সম্বন্ধ

চিকিৎসা শাস্ত্র এখন সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের এ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কত দিনেব প্রাচীন তাহাব কোন বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য নিদর্শন এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। মিশরে দশ হাজার বৎসরের পুরাতন সভ্যতার আবিষ্কার হইয়াছে কিন্তু তাহাব মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। মিশরেব মমি এখনও যেরূপ অবিকৃত ভাবে পাওয়া যায় তাহাতে অনুমান হয় তৎকালে রসশাস্ত্রের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রাচীন কালেব লোকেরা কতখানি উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিল তাহা এখনও জানিতে পারা যায় না।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রেব বয়স আড়াই হাজার বৎসরের বেশী নয়। পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বিদ্গণ বিবেচনা করেন খৃষ্ট পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীকজাতি চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোচনায় প্রথম প্রবৃত্ত হন। [illegible] হিপোক্রেটিসকে সর্ব চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্মদাতা [illegible] ধন্বন্তরী। ভারতের ধন্বন্তরী ও গ্রীসের হিপোক্রেটস এতদুভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি অগ্রবর্ত্তী ছিলেন তাহা গবেষণাব বিষয় এবং তাহা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচ্য। গ্রীসে তৎপূর্ব্বে চিকিৎসা কার্য্য প্রায় [illegible] ভাবে সম্পন্ন হইত। হিপোক্রেটস [illegible] রোগের লক্ষণ তাহাব উৎপত্তি পরিণাম পরিদর্শন করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সিদ্ধান্ত করিতে আরম্ভ করেন। কার্য্য কারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া যথাসাধ্য ভ্রমশূন্য সিদ্ধান্ত করিবাব প্রণালী হিপোক্রেটসেরই সমসাময়িক এরিষ্টটল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এরিষ্টটলের উদ্ভাবিত পাশ্চাত্য যুক্তিশাস্ত্রের বা তর্কশাস্ত্রেব ভিত্তিব উপর কেবল যে চিকিৎসা বিজ্ঞানই গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই

নয়—এই শাস্ত্র আধুনিক সর্ব্বপ্রকার বিজ্ঞানশাস্ত্রের ভিত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তার পর আসেন গালেন। তিনি জীবদেহ লইয়া বহুবিধ পরীক্ষা করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। গালেন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

কিন্তু গালেনের পর বহুদিন পর্য্যন্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে নূতন কিছু হয় নাই। সপ্তদশ শতকে বেকনের নূতন তত্ত্ব প্রচার এবং উনবিংশ শতাব্দীতে মিলের নূতন যুক্তি শাস্ত্রের অবতারণা হয়। সপ্তদশ শতকে বেকনের তত্ত্বের অনুসরণ করিয়া উইলিয়াম হার্ভে আধুনিক জীব দেহতত্ত্ব (physiology) প্রবর্ত্তিত করেন। তিনিই রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সম্বন্ধে অভিনব তত্ত্ব সমস্তের প্রচার করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে যে সকল পরীক্ষা ও গবেষণা চলিতেছে উইলিয়াম হার্ভেকে তাহার আবিষ্কর্তা বলা চলে। নিম্নশ্রেণীর জীবদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া মানবদেহ সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্য উদ্ঘাটনের প্রথার তিনিই প্রথম প্রবর্ত্তক। তাহারই সমসময়ে সীডেনহাম রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্বন্ধে গবেষণা ও পরীক্ষা করিয়া বহু নূতন তত্ত্বের প্রচার করিয়াছিলেন। রোগোৎপত্তির কারণ লক্ষণানুসারে রোগের শ্রেণীবিভাগ তাঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় এবং তাঁহার প্রদর্শিত পন্থায় চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতি পথে দ্রুত ধাবমান হইতেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতেই জন মেয়ো (John Mayow) চিকিৎসা শাস্ত্রের সহিত রসায়ন শাস্ত্রের সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাঁহার রাসায়নিক পরীক্ষার ফলে অম্লজান বাষ্পের আবিষ্কার হয় এবং বস্তুবিজ্ঞানের (পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের) সহিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়। বস্তুত সাধারণ বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত চিকিৎসা বিজ্ঞানের সম্বন্ধ ঘটিত জ্ঞান যে নিত্য নিয়ত বৃদ্ধি পাইতেছে—তাহার মূলে হার্ভে সীডেনহাম ও মেয়োর আবিষ্কার ও পরীক্ষা প্রণালী বিরাজমান। তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণে অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন ও উইলিয়াম হাণ্টার চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। জন হাণ্টার সমগ্র ব্যাধিবিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচনের পন্থা নির্দ্দেশ করেন। তা ছাড়া পূর্ব্বাবিষ্কৃত পরস্পর বিচ্ছিন্ন তথ্য সমূহের মধ্যে সাধারণ ভাবে সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছিলেন তিনিই। ইংলণ্ডের রয়েল কলেজ অব সার্জ্জন্স নামক বিদ্যালয়ের সংগ্রহাগারে জন হাণ্টারের আবিষ্কৃত সুশৃঙ্খল ভাবে শ্রেণীবদ্ধ ১৪ নমুনা তাঁহার স্বহস্ত লিখিত নাম ও পরিচয় সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি পত্রে ভূষিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। ইহা যে কত পরিশ্রম ও কত বড় অধ্যবসায়ের পরিচায়ক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তিনি জীবজন্তু লইয়া পরীক্ষা করিতে বড় ভাল বাসিতেন। সুপ্রসিদ্ধ জেনার যখন বসন্ত রোগের টিকা সম্বন্ধে তাহার ধারণার কথা একটা সাধারণ সভায় প্রকাশ করিলেন তৎপর দিন হাণ্টার তাহাকে পত্র লিখিয়া পরামর্শ দিলেন যে অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছ কেন? একটা শজারুর উপর পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়া ফেল।

তাহার পর হইতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান পরস্পর পাশাপাশি থাকিয়া কাজ করিতেছে। সুবিখ্যাত রাসায়নিক চিকিৎসক পাস্তুর তাঁহার আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা মানব সমাজের যতখানি উপকার করিয়াছেন তেমন আর কেহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞান চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রয়োগ করিয়া তিনি যে জীবাণুবাদ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার ফলে চিকিৎসা জগতে নবযুগের সঞ্চার হইয়াছে। এই বিষয়ের উন্নতি সাধনে জার্ম্মাণ চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকেরাও বড় অল্প সহায়তা করেন নাই। পাশ্চাত্য চিকিৎসা জগতে অন্যান্যের সহিত জার্ম্মাণীর ভার্চো (Virchow) এবং স্মিডেবার্গের (Schmiedeberg) নামও অমর হইয়া থাকিবে।

গত শতাব্দীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে যে আশ্চর্য্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহার আরও একটা কারণ আছে। সেই কারণটি হচ্ছে কৃত্রিম চক্ষু অর্থাৎ অণুবীক্ষণ যন্ত্র। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে

মানুষের এবং বিশেষ করিয়া বৈজ্ঞানিকের সামনে এ যাবৎ অদৃষ্টপূর্ব্ব এক নূতন জগৎ খুলিয়া গেল। এই নূতন চক্ষু দিয়া মানুষ এমন একটা অদৃশ্য জগতের সন্ধান পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল যাহা এত দিন মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অগোচর ছিল যাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানবের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। মানুষ বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র এমন ক শ্রেণীর জীবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বাস করিতেছিল যাহার কথা তাহারা আগে কিছুই জানিতে পারে নাই সাধারণ চর্ম্মচক্ষে যাহাদিগকে দেখা যাইত না। কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া সেই জীবাণু কীটাণু ও বীজাণু রাজ্য ধরা পড়িয়া গেল মানুষ তাহাদের গতি বিধি জীবনযাপন প্রণালী বংশবৃদ্ধি ও অন্যান্য বহু তত্ত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইয়া উঠিল।

প্রথম প্রথম অণুবীক্ষণ য খেলনকের হিসাবে লোকের কৌতূহল চরিতার্থ করিত মাত্র। কিন্তু ফ্রান্স দেশে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র সমূহ নির্ম্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র জীবাণু রাজ্যের সহিত মানুষের ক্রমে পরিচয় হইতে লাগিল। সেই জন্য জীবাণু ঘটিত গবেষণামূলক অনুসন্ধান কার্য্যে ফরাসী বৈজ্ঞানিকেরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সফলতা লাভ করিয়াছেন এবং তৎপরেই তাঁহাদের প্রতিবেশী জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকগণের অনুসন্ধানের ফল সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অণুবীক্ষণের পরেই এই কার্য্যে সমধিক সহায়তা করিয়াছে রঞ্জন রশ্মি (Roentgen ray)।

কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই অণুবীক্ষণ যন্ত্র সফলতা লাভ করিতে পারিত না। এমন কতক প্রকার জীবাণু ছিল যাহাদের কোন বিশেষত্ব দেখা যাইত না বলিয়া তাহাদিগকে পৃথক শ্রেণীর জীবাণু বলিয়া বুঝা যাইত না। তাহাদের অনেকের বর্ণ এমন যে তাহার দরুণ তাহাদিগকে ধরিতে পারা যাইত না। অবশেষে তাহাদের রঞ্জিত করিয়া তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় করিতে পারা যায়। এই উপায়ে যক্ষ্মা জীবাণু ও অপরাপর জীবাণু ধরা পড়িয়াছে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই সকল বীজাণুর চাষ করিয়া তাহাদের জীবন গতি নিখুঁত ভাবে জানিতে পারা গিয়াছে। কতকগুলি রোগের জীবাণু এমন সংগোপনে শরীরের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া এক দেহ হইতে আর এক দেহে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত যে বহুকাল তাহাদের এই গুপ্ত চাল ধরিতে পারা যায় নাই। রোজেনাউ (Rosenow) তাহাদেরও গতিবিধি পরিষ্কার রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গত যুগে অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে জীবতত্ত্ব বিজ্ঞান গঠিত হইয়াছে। কিন্তু অণুবীক্ষণের কার্য্যশক্তিরও বোধ হয় সীমায় আসিয়া পৌঁছান গিয়াছে। এই যন্ত্র সাহায্যে ০.১ মাইক্রণ বা এক ইঞ্চির আড়াইলক্ষ ভাগের এক ভাগ মাপের বস্তু ধরা পড়ে। এ ক্ষেত্রে আমরা কেবল যে বস্তুটিকে মোটামুটিভাবে দেখিতে পাই তাই নয়—তাহাদের দৈর্ঘ্য গঠন বর্ণ ও অন্যান্য বিশেষত্বগুলি বেশ স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিতে পারি। ইহা হইতে বুঝা গিয়াছে যে জীবাণুগুলি যতই ক্ষুদ্র এবং যতই বিভিন্ন শ্রেণীর হউক না কেন তাহারা কতকগুলি প্রাকৃতিক সাধারণ নিয়মের অধীন। এখন আমাদের সামনে অণুবীক্ষণের অতীত জগৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ইহার পরবর্ত্তী আবিষ্কার colloid bodies বা ধূলিকণা। কোন একটী ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া জানালা কিম্বা দরজায় সামান্য একটু সরু ফাঁক দিয়া সূর্য্য কিরণ আসিতে দিলে নিয়ত সঞ্চরমান এই ধূলিকণা সকল দেখা যায়। অন্য কোন উপায়ে ইহাদের অস্তিত্ব জানা যায় না। ব্রাউন নামক একজন উদ্ভিদ তত্ত্ববিদ প্রথম এই দিকে মনোযোগ দেন। তার পর লণ্ডনের টঙ্কশালার অধ্যক্ষ টমাস গ্রেহাম এই বিষয়ে আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা করিয়া আর একটা জীবজগতের সন্ধান পান। এই সকল জীবাণুর আকার ০.১ হইতে ০.০০১ অর্থাৎ এক ইঞ্চির আড়াই লক্ষ ভাগের এক ভাগ হইতে আড়াই কোটী ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত। আপাত দৃষ্টিতে ইহারা শুষ্ক

আছে। হাইড্রোজেন হইতে য়ুরেনিয়াম পর্য্যন্ত মূল পদার্থগুলির পরমাণু সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধনশীল। এই সংখ্যা বৃদ্ধির একটি ধারা আছে। সেটী এই যে পাশাপাশি দুইটী মূল পদার্থের মধ্যে এক বা একাধিক উদজান বাষ্পের পরমাণুর ভারের পার্থক্য আছে। উদজানের পরমাণুর গঠন হচ্চে একটা মাত্র প্রোটোনের (proton) চতুর্দ্দিকে সতত ঘূর্ণ্যমান একটা ইলেকট্রণ। এই পরমাণুটি সর্ব্বাপেক্ষা লঘু এবং ইহার গঠনোপাদান, ও ইলেকট্রণ ও প্রোটোনের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম বলিয়া ইহাকে একক রূপে ধরিয়া অন্যান্য মূল পদার্থের পরমাণু গঠনের ধারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই ভাবে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে কার্ব্বণের একটা পরমাণুতে ১২টি প্রোটোন ও ১২টি ইলেকট্রণ আছে। সেইরূপ অম্লজানের একটা পরমাণু ১৬টি প্রোটোন ও ১৬টি ইলেকট্রণ লইয়া গঠিত। স্বর্ণের পরমাণুতে প্রোটোন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা ৯৬টি করিয়া এবং পারদের পরমাণু বিশ্লেষণ করিয়া ২ টি হিসাবে প্রোটোন ও ইলেকট্রণ পাওয়া যায়। এই সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল তাহা মাইথি (Miethe) পরীক্ষা দ্বারা চাক্ষুষ ভাবে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিয়াছেন। এমন কি তিনি পারদের পরমাণুকে স্বর্ণের পরমাণুতে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই পরীক্ষা অবশ্য আর্থিক হিসাবে সফল হয় নাই কারণ এক টাকার মূল্যের স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে ও টাকার খরচ পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানের দিক হইতে এই পরীক্ষা যুগান্তরের সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে প্রাচীনকালের alchemistদের পরশ পাথরের কল্পনা বা সীসক হইতে স্বর্ণ প্রস্তুত করিবার কল্পনা নিছক কল্পনা মাত্র নহে। রঞ্জেন আলোকের বৈদ্যুতিক চুম্বক পরিবেগের দৈর্ঘ্য এক ইঞ্চের দশ কোটী ভাগের এক ভাগ হইতে শত কোটী ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ পরমাণুর আয়তন অপেক্ষা কম। এই সত্যের সহায়তায় পরমাণুসকলের আয়তনের হিসাব করা সম্ভবপর হইয়াছে।

রাদারফোর্ড কল্পনা করেন যে কোন মূল বস্তুর পরমাণুভুক্ত যথানির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটোনকে কেন্দ্র করিয়া ইলেকট্রণগুলি তাহার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। এই কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া ড্যানিস বৈজ্ঞানিক বোর পরমাণুবাদকে সৌরমণ্ডলের স্বরূপ বলিয়া কল্পনা করেন। তিনি বলেন সূর্য্য যেন অস্তি (positive) তড়িৎ এবং গ্রহগণ যেন নাস্তি (negative) তড়িৎ। সূর্য্যরূপ অস্তি তড়িতের আকর্ষণে গ্রহরূপ নাস্তি তড়িৎ তাহার চতুর্দ্দিকে অতি বেগে ভ্রমণ করিতেছে। পরমাণুবাদও ঠিক এইরূপ। এই কল্পনার ভিত্তির উপরই বোর হাইড্রোজেন স্পেকট্রামের রঙিন আলোক রেখার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নিরূপণ করেন। রাদারফোর্ড টমসন এ্যাষ্টন ও অপরাপর অনেক পণ্ডিত গবেষণার দ্বারা দেখাইয়াছেন যে ঐ কেন্দ্রের আশেপাশে ইলেকট্রণগুলি তাহার সহিত সংযুক্ত অথবা বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকিয়া ঘুরিতেছে। এই ইলেকট্রণগুলিকে ভ্যালেন্স ইলেকট্রণ (valence electron) নাম দেওয়া হইয়াছে। এই ইলেকট্রণগুলির গতিবিধির পরিবর্ত্তনই রসায়ন বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি।

আবার আরেনিয়াস দেখাইয়াছেন যে ইলেকট্রোলাইট সকল জলে প্রকৃত প্রস্তাবে দ্রবীভূত হইলে ক্ষেত্র বিশেষে তাহা আয়োনিক (ionic) ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। এই আয়োনিক হইতে অস্তি ও নাস্তি আয়নস পৃথক করিলেই তবে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয়। রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের উপরই জীবজগতের জীবন নির্ভর করে। সেইজন্য মানব দেহের শতকরা ৭৫ ভাগ জল ও তরল পদার্থ দ্বারা গঠিত হওয়া আবশ্যক।

বায়ুমণ্ডল জল ও খাদ্যের শতকরা গড়ে ৪৭ অংশ অম্লজান। বিনা অক্সিজেনে মানুষের মস্তিষ্ক ৭ হইতে ১ মিনিটের বেশী চেতন অবস্থায় থাকিতে পারে না। রূপ অবস্থায় জীবের মধ্যে অম্লজান সঞ্চিত করিয়া রাখিবার বা উৎপন্ন করিবার কোন কল কৌশল না থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। দেহের মধ্যে যে অম্লজানের ক্রিয়া হয় তাহার ফলে তথায় রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে তাহাই জীবনীশক্তির মূল। দেহ মধ্যে

অম্লজান সহ নানা বস্তু রাসায়নিকভাবে মিলিত হইয়া যে তাপ উৎপন্ন হয় সেই তাপ ও তেজে জীবনীশক্তি ক্রিয়াশীল থাকে। ইহাকে বৈদ্যুতিক শক্তিও বলা যায়। সকল খাদ্যই প্রধানতঃ কার্ব্বন, উদজান ও অম্লজান ঘটিত পদার্থ। কার্ব্বোহাইড্রেট পদার্থগুলির মধ্যে চিনিকে দেহ এঞ্জিনের কয়লা বলা চলে। ইহা তাপ ও তেজ উৎপাদন করে। অতিরিক্ত হইলে তাহা চর্ব্বিতে পরিণত হইয়া যায়। তাহাতে ঐ কার্ব্বণ অম্লজান ও উদজান আছে। তবে তাদের অনুপাত স্বতন্ত্র। ... চর্ব্বির অত্যল্পাংশে উহা যে যেমন করিয়া ... অনাহারে ও বিনা জলে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে তাহা বেশ প্রতীয়মান হইবে। চিনির মত সহজে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হয় চর্ব্বির উপাদানগুলি উদজান তত শীঘ্র রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না বা কার্ব্বন হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। অম্লজান সহযোগে চর্ব্বি ধীরে ধীরে দগ্ধ হইয়া তাপ তেজ ও জল উৎপাদন করে। জীবনের পক্ষে এইগুলিই প্রধান জিনিস। প্রোটীনজাত দেহোপাদান হইতে যে এমিনো এসিড উৎপন্ন হয় তাহা অতি শীঘ্র চিনিতে পরিণত হয়। প্রোটীন মাত্রেই নাইট্রোজেন আছে। আর অধিকাংশ প্রোটীনেই কিঞ্চিৎ গন্ধকও আছে। ইহাদের দ্বারা স্নায়ু গঠিত হয় ও চ প্রভৃতি ধাতু বিশিষ্ট ও সঞ্চিত হয়।

উক্ত স্নায়ুঘটিত কলোয়ে গুলির মধ্যে উদজানের আণবিক বিশ্লেষণের ফলে কার্ব্বণ ও অম্লজান মিলিত হইবার সুযোগ পায়। তাহাতে তাপ ও তেজ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত সম্মিলিত কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড শিরাবাহিত হইয়া ফুসফুসে আসিয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে বহির্গত হইয়া যায়।

রয়েল কলেজ অব ইংল্যাণ্ডের পার্কিন নামক বৈজ্ঞানিক রঞ্জন দ্রব্যের আবিষ্কার করেন। কিন্তু তিনি দেশবাসীর কাছে কোন উৎসাহ পান নাই। তাঁহার ছাত্র হফম্যান রঞ্জন বিদ্যা জার্ম্মাণীতে লইয়া গেলে তথায় উহা হইতে বহু ঔষধ ও বিস্ফোরক প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। ক্ষুদ্র দ্রব্য দর্শনের পক্ষে এই রঞ্জন দ্রব্য বিলক্ষণ সাহায্য করে। ইহাদেরই সাহায্যে অনেক বিদ্যুত চুম্বক তরঙ্গ অক্ষিগোলকে ধরা পড়ে। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ তরঙ্গগুলি লাল রংয়ের বলিয়া বোধ হয়। তার পর দৈর্ঘ্যের হ্রস্বতা অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে কমলা পীত হরিৎ নীল ও বেগুনী রংয়ের তরঙ্গ দৃষ্ট হয়।

রঞ্জ রসায়ন বিজ্ঞান ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে প্রযুক্ত হওয়ার ফলে অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার সমূহ ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাদের পরীক্ষাগারে টেষ্ট টিউব লইয়া যে যে পদার্থ দিয়া যে সমস্ত পরীক্ষা করেন ও যেরূপ ফল প্রাপ্ত হন চিকিৎসকেরা মানবদেহরূপ ল্যাবরেটরীতে সেই সকল পদার্থ ব্যবহার করিয়া তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বস্তুত মানবদেহ তথা জীবদেহ মাত্রেই (এমন কি আধুনিক জড় বিজ্ঞানানুসারে জড় জগৎও) একটা বিরাট ল্যাবরেটরী। প্রকৃতিদেবী বৈজ্ঞানিক রূপে এই দেহে কত রকম বস্তু রসায়ন বিজ্ঞান ঘটিত ক্রিয়ায় নিযুক্ত আছেন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এই বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রতন্ত্র এমন সূক্ষ্ম ও নিখুঁত এখানকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ যে তাহা মানুষের কল্পনাতেও আসে না। মানব এই বিজ্ঞানাগারের ক্রিয়াকলাপ যতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে তাহারই ফল আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র। এই বিজ্ঞানাগারের স্বাভাবিক ও নিত্য নিয়মিত কাজের কোন ব্যতিক্রম বা বৈলক্ষণ্য ঘটিলে আমাদের পীড়া উপস্থিত হয় এবং চিকিৎসক তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাসানুযায়ী ঐ দোষ ত্রুটির সংশোধন কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য ঔষধাদির দ্বারা প্রকৃতি দেবীকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা এখন তাঁহাদের শাস্ত্রটিকে অনেকটা নিখুঁত করিয়া আনিয়াছেন। বিজ্ঞানাগারে টেষ্ট টিউবে তাঁহারা যে ফল প্রাপ্ত হন দেহের মধ্যেও তাঁহারা ঠিক সেই ফলই উৎপাদন করিতে পারেন। শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত আবর্জ্জনা সঞ্চিত থাকিলে রক্ত পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা তাহার পরিমাণ নিখুঁত রূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। আগে কিন্তু

তাঁহারা দেহ পরিত্যক্ত পদার্থ যথা মূত্র প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহার ফল তেমন নিখুঁত সুন্দর হইত না।

মানব দেহের যে সকল যন্ত্র দিয়া ময়লা বাহির হইয়া যায় তন্মধ্যে বৃক্ক অন্যতম। ইহার মধ্য দিয়া ময়লা বাহির হইবার সময় ইহা অণুগুলি ছাকিবার চালুনীর কাজ করে। ইউরিয়া নামক একটী পদার্থ ক্ষুদ্রতম অণুর সমষ্টি মাত্র। এই পদার্থটি জলে দ্রব হয় না। সুতরাং ইহার আকারেরও পরিবর্তন ঘটে না। রাউনট্রি (Rowntree) ও জেরাফটি (Geraghty) নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক বিশেষ একপ্রকার রঞ্জন পদার্থের সাহায্যে বৃক্কের মধ্য দিয়া ইউরিয়া ছাকিবার কার্য্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। রাউনট্রি আর এক প্রকার রং লইয়া লিভারের কার্য্যেরও সন্ধান লইয়াছেন। মান (Mann) পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে একটা কুকুরের যকৃৎ বাহির করিয়া লইলে তাহার দেহে আর ইউরিয়া উৎপন্ন হয় না। তাহার রক্তেও আর চিনির অস্তিত্ব দেখা যায় না।

সাধারণত কার্ব্বোহাইড্রেটমূলক খাদ্য যে অবস্থায় ভুক্ত হয় সেই অবস্থায় শরীরে গৃহীত হয় না। উহা শরীরের মধ্যে চিনিতে পরিণত হইয়া তবে গৃহীত হইতে পারে। কার্ব্বোহাইড্রেট দেহ মধ্যে যে রূপান্তর প্রাপ্ত হয় তাহাকে গ্লুকোজ বলে। পিচকারী দ্বারা গ্লুকোজ সোডিয়াম ক্লোরাইড ও জল শরীরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিলে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কিছু দিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারা যায়। Mann এই পরীক্ষা করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছেন। শরীর কোন রূপে বিষাক্ত হইয়া পড়িলে এই উপায়ে রোগীর মৃত্যু কিছু কালের জন্য নিবারণ করা যাইতে পারে।

সাধারণ অবস্থায় রক্ত ক্ষারধর্ম্মী। রক্তে ক্ষারের পরিমাণের আধিক্য হইলে তাহাকে alkalosis বলা হয়। আবার ক্ষারের পরিমাণ কমিয়া গেলে তাহাকে বলা হয় acidosis। মেদজাত acid শরীরের মধ্যে শোষিত না হইলে ডায়াবেটিসের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সকল অম্ল পদার্থকে শোষিত করাইতে হইলে চিনি আবশ্যক হয়। এই চিনির পরিমাণ কম হইলে acid শরীরে শোষিত হইতে না পাবায় ডায়াবেটিস রোগ জন্মে। এ কথা অনেক দিন হইতেই জানা আছে যে ডায়াবেটিস রোগীর জন্য অস্ত্র চিকিৎসার পূর্ব্বে এবং পরে যথেষ্ট পরিমাণে কার্ব্বোহাইড্রেট জল খাদ্য আবশ্যক। এই কার্ব্বোহাইড্রেট চিনিতে রূপান্তরিত হইয়া Acid ... অবস্থা নিবারণ করে। Acid ... অবস্থা নিবারণের পক্ষে Insulin চমৎকার ঔষধ। ... ও Insulin সাহায্যে Wilder ডায়াবেটিস রোগীদের অস্ত্র চিকিৎসার পর মৃত্যু সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে কমাইতে পারিয়াছেন। ডায়াবেটিস রোগগ্রস্ত নহে এমন যে সকল লোকের রক্ত acidosis অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাদেরও ঐ প্রণালীতে চিকিৎসা করা হইয়া থাকে। সম্প্রতি Thalhimer Fisher Mensing ও Snell অস্ত্র চিকিৎসার পূর্ব্বে ও পরে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। জলে শর্করা ... গ্লুকোজ দ্রবীভূত করিয়া পিচকারীর সাহায্যে সেই দ্রব চর্ম্ম ভেদ করিয়া রক্তে মিশাইয়া দিয়া এবং ... সহ insulin ব্যবহার করিয়া অসামান্য উপকার পাওয়া গিয়াছে।

শরীর সম্বন্ধীয় রসায়ন বিজ্ঞান (Physico chemistry) ... অধ্যয়ন করিয়াছে। ইহাকে জীবনী শক্তি বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। চিকিৎসক মাত্রেরই এই শাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। যিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হউন না কেন সাধারণভাবে বস্তু রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা প্রত্যেকের পক্ষেই অপরিহার্য্য। আর অস্ত্র চিকিৎসক গণের ত কথাই নাই— তাহাদের জন্য নিত্য নূতন নূতন আবিষ্কার হইতেছে। বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ গণের সহায়তায় অস্ত্র চিকিৎসক অসাধ্য সাধন করিতেছেন। যে সকল রোগ পূর্ব্বে শিবের অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত অস্ত্র চিকিৎসক তাহাদের অনেককেই প্রাণ দান করিতেছেন। অস্ত্র চিকিৎসার শৈশবে বহু

রোগীর এমন চিকিৎসা হইত যাহাতে তাহাদের অধিক দিনই রক্ষা পাইত না। Rehabilitation অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তিকে তাহার পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনা চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল কথা।

অধুনা অনেকে বিজ্ঞান শাস্ত্রের নিন্দা করিয়া বলেন যে বিজ্ঞান এখন মানুষ মারা যন্ত্র নির্ম্মাণে ব্যস্ত সভ্য জগতে বিজ্ঞান চর্চ্চার মূল উদ্দেশ্য—কি উপায়ে অল্প সময়ে ও অল্প চেষ্টায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক নরহত্যা করা যায়। অবশ্য বিজ্ঞানের প্রতি তাহাদের এই অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নহে কিন্তু তাহা নিতান্ত একদেশদর্শী পক্ষপাতমূলক মন্তব্য। বিজ্ঞান যেমন মানুষ মারা কল তৈয়ার করিতেছে তেমনি মানুষের জীবন রক্ষার বিষয়েও কম কাজ করে নাই। বিজ্ঞান যে চিকিৎসা শাস্ত্রের বহুখানি উন্নতি সাধন করিয়াছে—বিগত যুদ্ধে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানের সহায়তায় নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা যেমন অসংখ্য লোক হতাহত হইয়াছে তেমনি লক্ষ লক্ষ আহত মরণাপন্ন লোক প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছে। দেহ হইতে গুলি ও অন্যান্য অস্ত্রের খণ্ড বাহির করিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞান বহু লোককে যে বাঁচাইয়া দিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। কত অঙ্গহীন ব্যক্তি বিজ্ঞানের কৃপায় নষ্ট অঙ্গের স্থলে নকল অঙ্গ ফিরিয়া পাইয়া আবার সাধারণ মানুষের মত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। অস্ত্র চিকিৎসক একজনের দেহের কোন নষ্ট অঙ্গের স্থলে অপরের দেহের সেই অঙ্গ যোড়া দিয়া তাহাকে সহজ মানুষ করিয়া দিয়াছেন। এ সকল কথা স্বীকার না করিলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং বিজ্ঞানের প্রতি অবিচার করা হয়।

চা পান

[শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু]

কি করিবে বক্তা—যদি শ্রোতা না মিলিবে ?
ন্যাংটা সন্ন্যাসীর দেশে ধোপা কি করিবে ?

বহু দিবস হইতে চায়ের আবাদ চলিয়া আসিতেছে কিন্তু সম্প্রতি এই ব্যবসায় যেরূপ লাভজনক হইয়াছে এবং জনসাধারণ চা পানে যেরূপ অভ্যস্ত হইয়াছেন তাহাতে এই সর্ব্বদেশব্যাপী চা পান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

চা এক প্রকার বৃক্ষের পাতা। সেই পাতা তৈয়ারি চায়ের আকারে লোকের নিকট উপস্থিত হয়। চায়ের পাতায় ট্যানিন নামক এক প্রকার অতীব তীব্র কষায় বিষাক্ত পদার্থ আছে প্রায় দ্বাদশ ঘণ্টাকাল পাতাগুলিকে জলে ভিজাইয়া উক্ত রসের পরিমাণ হ্রাস করা হয়।

অনেকে বলেন চীনদেশ চায়ের জন্মস্থান। কেহ কেহ বলেন অতি পুরাকালে বোধি ধর্ম্ম নামক জনৈক বৌদ্ধ সাধু ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে গমনপূর্ব্বক বন এবং তিনিই প্রথমে তথায় চায়ের প্রচলন করিয়াছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৎকালীন চীন সম্রাটের শ্বশুর ওয়া মেং প্রথমত চা পানীয়রূপে ব্যবহার করেন। বহুদিন পর্য্যন্ত ইহা চীন দেশ হইতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরিত হইত। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্ত্তৃক চা ইউরোপে নীত হয়। প্রায় চারিশত বৎসর গত হইল চা সর্ব্বপ্রথম চীন দেশ হইতে ইংলণ্ডে লইয়া যাওয়া হয়। তখন ইহার এক পাউণ্ডের মূল্য প্রায় দুইশত টাকা ছিল। সেই সময় একজন নাবিক ইংলণ্ডের রাজাকে দুই পাউণ্ড চা প্রদান করিলে তিনি অতি উৎকৃষ্ট উপহার প্রাপ্ত হইলেন মনে করিয়াছিলেন।

ভারতে বোধ হয় ইহার প্রচলন সপ্তদশ শতাব্দীর

প্রভৃত অনিষ্ট হইয়া থাকে। তথাপি চারিদিকেই চায়ের জীবন্ত রক্তাভ মূর্ত্তি প্রকটিত। অর্থনীতির দিক দিয়াও ইহা অব্যবহার্য্য। চা পান আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন। তাই আমরা ইহার অনুকরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া এখন চায়ের ক্রীতদাসে পরিণত হইয়াছি। দেশ নিঃস্ব হওয়াই ইহার প্রধান কারণ। দুর্ভিক্ষের দেশে আহার কমাইবার ইহা একটা অমোঘ ঔষধ। সস্তায় ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবার এমন জিনিস আর নাই। দেশে দ্রব্যাদি সস্তা হইলে বোধ হয় চা পানের এরূপ প্রচলন হইত না। এমন ভেতো বাঙ্গালীর পক্ষে চা পান ভাল কি মন্দ—উপকার কি অপকার—সে বিষয়ে সহৃদয় পাঠকগণ সমালোচনা করিতে বোধ হয় কুণ্ঠিত হইবেন না।

হে গঙ্গাবারি দেশ কলিকালের কলুষ ভূষণ উত্তপ্ত সোমরস তোমাকে দূর হইতে নমস্কার করি।।

—

নিদ্রা

[শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র মজুমদার এম এ বি এল]

জীবনের প্রায় এক তৃতীয়াংশ কাল আমরা নিদ্রায় অতিবাহিত করি। সুতরাং নিদ্রা সম্পর্কে একটু আলোচনা করা বোধ হয় অন্যায় হইবে না। জাগ্রত অবস্থায় আমাদের শরীর সর্ব্বদা ক্ষয় পাইতেছে। শরীরের ক্ষয় পূরণ ও পোষণের নিমিত্ত ও মস্তিষ্কের বিশ্রামের জন্য নিদ্রার দরকার। দৈনিক কয় ঘণ্টা নিদ্রা আবশ্যক তাহা আমাদের জানিতে হইবে। ডাক্তারগণ কোন বয়সে কয় ঘণ্টা নিদ্রা আবশ্যক তাহা মোটামুটি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নির্দ্ধারণ মোটামুটি সত্য কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে ঠিক খাটিবে কি না বলা যায় না। দেখা যায় শিশু ও দুর্ব্বল লোকদের অধিক নিদ্রার দরকার। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির ৬।৭ ঘণ্টা নিদ্রা যথেষ্ট। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উপর তাহার নিদ্রার পরিমাণ অনেকটা নির্ভর করে। সমবয়স্ক দুই জনের মধ্যে এক জনের একঘণ্টা নিদ্রা কম হইলেও চলিতে পারে অপর জনের একঘণ্টা বেশীও লাগিতে পারে। তারপর পূর্ব্বদিনের কৃত কাজের পরিমাণের দরুণও নিদ্রা বেশী বা কম দরকার হইতে পারে। পূর্ব্বদিনে অধিক ও কঠোর কাজ করিলে রাত্রে ক্ষয় পূরণের জন্য অধিক নিদ্রা আবশ্যক হইবে। ব্যক্তি বিশেষ সম্পর্কে কত ঘণ্টার নিদ্রা আবশ্যক তাহা তাহার বয়স শারীরিক অবস্থা ও দৈনিক কৃত কার্য্যাদির উপর নির্ভর করে। প্রত্যেকে নিজ অভিজ্ঞতা হইতে তাহা বুঝিতে পারিবে।

এ সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম করা যাইতে পারে না। যে পর্য্যন্ত বিশ্রাম লইতে পারে শরীর যতটুকু নিদ্রা চায় তাহা হইতে বঞ্চিত করা সঙ্গত নয়। কোন ব্যক্তির নিদ্রা না হইলে তার দিবস কাজে কোনই উৎসাহ থাকে না দিবারাত্র এক প্রকার ক্লান্তি বোধ হয়। সুতরাং ব্যক্তি মাত্রেই আনন্দদায়ক নিদ্রার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

কি প্রকারে সুনিদ্রা হইতে পারে? সুনিদ্রার জন্য শয়নকক্ষ স্বাস্থ্যকর হওয়া দরকার বিছানাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত ও নিদ্রা সম্পর্কেও কতকগুলি নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলা আবশ্যক। এই বিষয় গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য নিম্নে আমরা এক একটা বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের উল্লেখ করিয়া যাইতেছি।

(১) বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কুঠরীতে বা ঘরে বিছানা রাখিতে হইবে। প্রত্যহ ঘরটাকে পরিষ্কার করিতে হইবে। আসবাব প্রভৃতি জিনিস দ্বারা ঘরটাকে পূর্ণ করা সঙ্গত নহে। যত কম জিনিস শয়ন গৃহে রাখা যায় ততই মঙ্গল। মৎস্য যেমন জলের জীব মানুষও সেইরূপ বায়ুর জীব সর্ব্বদা এই কথাটি মনে রাখিতে

হইবে। বায়ুই মানুষের জীবন বায়ু ব্যতীত মনুষ্য এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারে না। সর্ব্বদা মানুষ পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ বায়ু চায়। সুতরাং যাহাতে শয়ন কক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে পারে এরূপ বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। দিনের বেলা সমস্ত দরজা ও জানালা খোলা রাখিবে ও রাত্রিতে দুই একটা জানালা খোলা রাখিবে যাহাতে প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু সর্ব্বদা ঘরে প্রবেশ করিতে পারে। দিনের বেলা সূর্য্যের আলো যাহাতে শয়ন গৃহে প্রবেশ করে তাহার ব্যবস্থা করাও আবশ্যক। উক্ত আলো রোগ বীজাণু নষ্ট করে।

(২) [illegible] ওয়াড় চাদর যেন সহজে তাহা ধৌত করা যায়। সর্ব্বদা ঘর্ম্ম দ্বারা ময়লা বাহির হইয়া থাকে। ঘুমের সময় মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হয় ও শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায়। অধিকন্তু সর্ব্বাঙ্গ হইতে ময়লা অধিক পরিমাণে বাহির হইয়া থাকে। সহজেই শরীরের ময়লায় বিছানা দূষিত হয়। মাঝে মাঝে বিছানা ধৌত না করিলে তাহা পীড়ার আকর হইয়া দাঁড়ায়। প্রত্যহ বিছানাগুলি রোদে দেওয়া উচিত ইহাতে অনেক পীড়া দূর হয়।

(৩) রাত্রিতে বাহিরে শীত থাকে [illegible] শারীরিক উত্তাপও [illegible] করে। এই অবস্থায় শরীর কিছু গরম রাখিবার জন্য একখানা [illegible] শরীরের উপর রাখা উচিত। [illegible] কাপড় [illegible] উচিত নয় যেন বাতাস সহজে তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। আমরা বায়ুর জীব—সর্ব্বদা বায়ু আমাদের সর্ব্বাঙ্গে স্পর্শ করা আবশ্যক।

(৪) রাত্রিতে খাওয়ার অব্যবহিত পরেই শয়ন করিতে যাইবে না। আহার ২।৩ ঘণ্টা পরে শয়ন করিবে তাহা না হইলে হজম করিতে অসুবিধা হইবে। অধিকন্তু রাত্রিতে দুঃস্বপ্নাদি দেখিতে হইতে পারে। স্বপ্ন সুনিদ্রার ব্যাঘাতকারী।

(৫) ঘুমানোর সময় এক গ্লাস জল খাইয়া শয়ন করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ইহাতে সহজে ঘুম আসে পাকস্থলী হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস প্রভৃতির কাজ ভাল চলে ও শরীরস্থ ময়লা বাহির করিবার পক্ষে সাহায্য করে। জল খাওয়ারও একটি নিয়ম আছে একেবারে এক চুমুকে খাওয়া খুব উপকারী নহে একটু একটু করিয়া চা খাওয়ার মতন [illegible] সের জল খাইতে হইবে।

(৬) নিদ্রায় কখন যাইবে ও ঘুম হইতে কয়টায় উঠিবে তাহা নির্দ্ধারিত করিবে। অভ্যাস করিলে কিছুতেই কষ্ট লাগিবে না। রাত্রে দশটা কি সাড়ে দশটায় শয়ন করিবে।

দুপুর রাত্রের পূর্ব্বের একঘণ্টা ঘুম পরের দুইঘণ্টা ঘুমের চেয়ে বেশী উপকারী ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

(৭) পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে ঘুমের প্রথম তিন ঘণ্টা খুব ভাল ঘুম হয় তারপর পাতলা ঘুম হয়। সুতরাং ঘুমের প্রথম অবস্থায় কাহাকেও বিশেষ আবশ্যক না থাকিলে জাগ্রত করা উচিত নয়।

(৮) রাত্রিতে চিৎ হইয়া শয়ন করা অনেকের মতে ভাল। ইহাতে খুব শীঘ্র ঘুম আসে। এত সহজে অন্য কোন অবস্থায় ঘুম আসে না। এইরূপ শয়ন করিলে শ্বাস প্রশ্বাসে ও রক্তসঞ্চালনে কোন অসুবিধা হয় না। আবার কেহ কেহ বলেন চিৎ হইয়া শয়ন করিলে রাত্রিতে স্বপ্ন হয়। তাহারা দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া শয়ন করিতে উপদেশ দেন। কখনও বাম পার্শ্বে হেলিয়া শয়ন করিবে না। ইহাতে হৃৎপিণ্ডের কাজ ভাল হয় না এবং পাকস্থলীর উপর যকৃতের চাপ পড়িয়া পরিপাকের ব্যাঘাত হয়।

(৯) বালিশ খুব উঁচু করিবে না উঁচু বালিশে মাথা রাখিয়া শয়ন করিলে রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়।

আমরা এই পর্য্যন্ত কি প্রকারে ঘুমাইলে সুনিদ্রা হয় তাহা বলিয়াছি। কিন্তু অনেকে মাঝে মাঝে অনিদ্রায় খুব কষ্ট পান। আহার না করিয়া অনেক দিন বাঁচিয়া থাকা যায় কিন্তু নিদ্রা না হইলে অল্প কয়দিনের মধ্যেই মানুষ মারা যায়। এক দিন কোন কারণে নিদ্রা না হইলে তৎপর দিন শরীর ও মন অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়। দুচার দিন একাদিক্রমে ঘুম না হইলে শরীর ও মন এক প্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় শরীর

কিছুতেই ভাল লাগে না মন কিছুই ঠিক করিতে পারে না বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি হ্রাস হয়। এইরূপ অধিকদিন চলিলে মৃত্যু অনিবার্য্য। সুতরাং অনিদ্রার উপদ্রব উপস্থিত হইলে কিরূপে তাহা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। নিম্নে কয়েকটি কথা এই সম্পর্কে বলা যাইতেছে। আশা করা যায় অনেক অনিদ্রাগ্রস্ত ব্যক্তি তাহা হইতে উপকার পাইবেন।

(১) যদি সহজে ঘুম না আসে তাহা হইলে মনকে খালি রাখিতে চেষ্টা করিবে এবং সর্ব্ব প্রকার চিন্তা তাড়াইবে কোন চিন্তা মনে উদয় হইলেই তাহাকে ভিতরে অবস্থান করিতে বাধা দিবে। অভ্যাস করিলে ইহা সহজসাধ্য। আবার যেন করিয়া পুন পুন একটী বিষয় চিন্তা করিলেও সহজে ঘুম আসে। এই উভয় উপায় দ্বারাই মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্ত বা ক্লান্ত হয়। তখন সহজে ঘুম আসে।

(২) ঘুমের সময় মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হয়। অতএব যাহাদের ঘুম হয় না তাহারা যাহাতে শয়ন করিলে মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। যে সকল কাজে মন চঞ্চল বা উদ্বিগ্ন হইতে পারে এইরূপ কোন কাজ করিবে না সর্ব্বদা শান্ত ও ধীর থাকিতে চেষ্টা করিবে।

(৩) রাত্রে হালকা (লঘু) আহার করিয়া ঘুমাইবে। ইহাতে মস্তিষ্ক হইতে রক্ত পাকস্থলীতে আসিবে ও মস্তিষ্কে রক্তস্বল্পতা ঘটিবে। সহজেই ঘুম আসিবে। স্মরণ রাখিতে হইবে ঘুমের পূর্ব্বে পূর্ণ (গুরু) আহার করিলে অপাক হইবে ও স্বপ্নাদির দ্বারা নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে।

(৪) শরীর গরম কাপড় দ্বারা আবৃত করিয়া শয়ন করিলেও সহজে ঘুম আসিবে কারণ ইহাতেও মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা হইবে।

(৫) ঘুমের পক্ষে বায়ু ভাণ্ডারের শক্তি আছে। সুতরাং যাহারা অনিদ্রার রোগে ভুগিতেছেন তাঁহারা রাত্রে ঘুমানোর সময় জানালা দরজা খোলা রাখিয়া ঘুমাইলে কতক উপকার পাইতে পারেন। তবে আলো প্রবেশ করিতে না পারিলে তাঁহাদের ঘুম অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে।

(৬) নিয়মিত ব্যায়াম করিবে ইহাতেও ঘুমের সহায়তা করে। যাহারা বৃদ্ধ হইয়াছেন যাঁহারা কোন প্রকার ব্যায়াম করা অনিষ্টজনক মনে করিলে অন্তত দুই বেলা কিছু সময় হাঁটিয়া বেড়াইবেন। যুবকগণও ব্যায়ামের পরিবর্তে রীতিমত দুইবেলা হাঁটার অভ্যাস করিতে পারেন।

প্রশ্ন—

মাননীয় স্বাস্থ্য সমাচার সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

আমি আপনার স্বাস্থ্য সমাচারের গ্রাহক। আপনি নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের সেবা এবং ব্যক্তিগত ভাবে উপদেশ দানে যে মহান উপকার করিতেছেন তাহার পুরস্কার মানবের সাধ্য নাই যে দিতে পারে। সারা বাঙ্গালার বালক বৃদ্ধ যুবা সবাই কোন না কোন প্রকার ব্যাধি লইয়াই জীবন্মৃত অবস্থায় জীবন যাপন

করিতেছে মাত্র। কত কাল পরে আবার আমরা দেবতার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ স্বাস্থ্য আপনার করিয়া ফিরিয়া পাইব জানিনা।

সহর এবং পল্লীবাসী ধীরে ক্রমে অজীর্ণ এবং ম্যালেরিয়াতে জীর্ণশীর্ণ। স্বাস্থ্য হইয়া এ পৃথিবীতে আসা যে কত বড় পাপের কঠোর শাস্তি তাহা বলিবার নাই। দেশব্যাপী ডিসপেপসিয়া রোগে আমরা স্বল্পায়ু হইয়া পড়িতেছি। অগ্নিমান্দ্য যতদিন থাকিবে ততদিন আনুষঙ্গিক অন্যান্য রোগ আক্রমণ করিবেই।

দেশব্যাপী এই রোগের কোন পেটেণ্ট ঔষধ আছে কিনা। থাকিলে সেই ঔষধের নাম ঠিকানা এবং আপনার প্রকাশিত স্বাস্থ্য সমাচারের মাধ্যমে সংখ্যায় ডিসপেপসিয়া রোগ সম্বন্ধে চিকিৎসা প্রণালী প্রকাশ করিলে জনসাধারণের অশেষ উপকার হইবে।

আমিও অনেক ডিসপেপসিয়ার রোগী চিকিৎসা করিয়াছি। এবং আপনার আবিষ্কৃত টাইকোসো ট্যাবলেট এবং বাইস্বুবটে ম্যাগনেসিয়া একোয়া টাইকোটিস আয়ুর্ব্বেদ মতে মহাশঙ্খ ভুবনেশ্বর বৃহৎ শিবঙ্গাদি ইত্যাদি ব্যবহার করিয়াও সন্তোষজনক উপকার পাই নাই। অধিকাংশ রোগীরই রাত্রে হজম হয় না প্রাতে অম্ল বা অজীর্ণ উদ্গার উঠে। ভাত পেটে বা সঞ্চার হয়। এ সব লক্ষণে পেটেণ্ট ঔষধ অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা করিলে উপকার হয় জানাইলে কৃতার্থ হইব।

কোষ্ঠবদ্ধাজীর্ণ এবং উদরাময় সংযুক্ত অজীর্ণের বিস্তৃত চিকিৎসা প্রণালী ও আবার নির্দ্দিষ্ট ঔষধের নাম ইত্যাদি আপনার প্রকাশিত কাগজে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

পেটেণ্ট ঔষধের ব্যবস্থা হইলে নাম ও দাম জানাইলে ভিঃ পিঃতে আনাইতে পারি। আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করিলাম

বশংবদ কবিরাজ—

শ্রীগোবিন্দ লাল কাব্যতীর্থ কাব্যরত্ন কবিভূষণ

গ্রাম পুকুরপার। পোঃ পুকুরপার। (পাবনা)

উত্তর—

দেশব্যাপী ডিসপেপসিয়া রোগের ঔষধ ও চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আপনি অনুরোধ করিয়াছেন। অম্ল অজীর্ণ এবং ডিসপেপসিয়া রোগ আমাদের নিজ নিজ পান ও ভোজনের অনিয়ম হেতু এবং অপকারী দ্রব্য আহার দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। কেবল ঔষধ খাইলে এই রোগ আরোগ্য হইবে না। রোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া ব্যবস্থা দিতে হইবে। ক্লোব বসুর ল্যাবরেটরী দ্বারা প্রকাশিত পারিবারিক ঔষধাবলী ও গৃহ চিকিৎসা নামক পুস্তিকাতে ৪ পৃষ্ঠায় এই রোগের চিকিৎসা কালীন কি কি নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

১। খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ ও লালা মিশ্রিত করিয়া খাইবে।

২। সময়মত ও ক্ষুধামত খাইবে। বরং কিছু ক্ষুধা রাখিয়া খাইলে সহজে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হইয়া যায়।

৩। আহারের সহিত অধিক জল খাইলে পাচক রস সকল নিস্তেজ হইয়া যায় এবং পরিপাকের ব্যাঘাত জন্মায়। এই জন্য আহারের সময় অধিক মাত্রায় জল খাইবে না। আহারের অন্তত ২ ঘণ্টা পরে পুরা এক গ্লাস জল পান করিবে।

৪। প্রত্যহ বৈকালে ও রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে স্বচ্ছ জল পান করিবে। ইহার দ্বারা পাকস্থলী পরিষ্কৃত হয় এবং শরীরের অভ্যন্তরস্থ ময়লা সকল দ্রবীভূত হইয়া মল ও মূত্রের সহিত বহির্গত হইয়া যায় এবং মল ও মূত্র পরিষ্কার থাকে।

৫। অধিক পরিপাণে মশলা বা তৈল বা ঘৃত খাওয়া যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিবে।

৬। আহারের সময় চিত্ত আবেগশূন্য করিবে। মন প্রফুল্ল রাখিবে। রাত্রে কখনও গুরু ভোজন করিবে না।

৭। রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে একটু বেড়াইয়া বেড়াইবে

এবং প্রত্যুষে উঠিয়া খোলা বাতাসে সূর্য্যকর প্রখর না হওয়া পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবে। শয্যাত্যাগ করিয়াই এক গ্লাস জল পান করিতে পারিলে ভাল হয়। রাত্রে নিদ্রার অন্তত দেড়ঘণ্টা পূর্ব্বে আহার করিবে এবং দিবসে আহারের পর অন্তত ১৫ মিনিট হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিবে।

আপনি কয়েকটা দেশীয় ও বিলাতী পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহারে সন্তোষজনক উপকার পান নাই লিখিয়াছেন। এবং কোন ফলপ্রদ পেটেণ্ট ঔষধের নাম জানিতে চাহিয়াছেন। আমি নিজে ... দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত ... এবং টাইকোসোল ... উপরি লিখিত ... মত ব্যবহারে রোগীরা সন্তোষজনক ফল পাইয়াছেন। তবে যদি রোগী নিয়ম পালন না করেন তবে ঔষধে উপকার হয় না।

কোষ্ঠবদ্ধাজীর্ণ এবং উদরাময় সংযুক্ত অজীর্ণের চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধ ১৩৩ ... সালের আষাঢ় মাসের স্বাভাবিক উপায় দ্বারা রোগ আরোগ্য প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। অন্নপ্রণালী দ্বারা কোষ্ঠ বদ্ধ বা উদরাময়ে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধ স ... জানিতে ... নামক পুস্তিকা পাঠ ... প্রকাশিত ... ব্যবহার ... এবং টিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

... ব্যাসিলাই ... এবং ... ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। ... করিতে হইবে ...

স্বাস্থ্য ব্যাপারে ঔদাসীন্য।—

সে দিন পার্লামেণ্টে একজন সদস্য প্রশ্ন করেন যে ভারতে কতগুলি বসন্ত রোগের হাসপাতাল আছে তাহাদের অবস্থাই বা কেমন? এবং যে সকল সহরে মিউনিসিপ্যালিটী আছে সে সকল সহরে বসন্ত রোগের সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষকে প্রদান করা ও রোগীকে স্বতন্ত্র করার কি রকম ব্যবস্থা আছে? ভারতসচিবের সহকারী আর্ল উইণ্টারটন বলিলেন জানি না স্বাস্থ্য শাসন ব্যাপারে প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তারা আর মন্ত্রীরা দায়ী। ইহা অতি আশ্চর্য্যের কথা—ভারতবাসীর পক্ষে নৈরাশ্য জনক ব্যাপার। যেহেতু স্বাস্থ্য ব্যাপারের জন্য প্রাদেশিক লাটেরা ও তাঁহাদের মন্ত্রীরা দায়ী অতএব ভারত-সচিব মহাশয়ের সে সম্বন্ধে কোন খবর রাখিবার দরকার নাই। যেন স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপার অতি তুচ্ছ ব্যাপার ভারত সচিবের গায়ে লাগে না। সুতরাং দেশের স্বাস্থ্য ... থাকিবে তাহার উন্নতির কোন ব্যবস্থা হইবে না ... বিচিত্রতা কি? ভারত সচিবের এই ঔদাসীন্যে আমরা আশ্চর্য হইলাম।

পরলোকে সুরেন্দ্রনাথ।

সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কয়েকদিন হইল সহসা পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর পার হইয়াছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। মৃত্যুর দিন চার পাঁচ পূর্ব্বে তাঁহার সামান্য ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়। পরে তাহাই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গলার পুরুষ সিংহ,

ভারতে রাজনীতিক আন্দোলনের অন্যতম প্রবর্ত্তক কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতায় দেশের সর্বোপরি ... সকলে মুগ্ধ ছিলেন। আজীবন তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা অসাধারণ ছিল। বঙ্গদেশ হইতে প্রথম যে তিনজন বাঙ্গালী যুবক বিলাতে সিবিলসার্ভিস পরীক্ষা দিতে যান সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি সম্মানের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সিবিলিয়ান হিসাবে ছই বৎসর মাত্র সরকারী চাকুরী করিয়াছিলেন। কিন্তু চাকুরী তাঁহার অদৃষ্টলিপি ছিল না দেশসেবাই ছিল বিধিলিপি। তাহার ফলে সব পরে তাঁহার দাসত্বের অবসান ও মুক্তিলাভ ঘটে। তারপর সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপক হন। সংবাদ পত্রের সম্পাদক হন। দেশের সকল রাজনীতিক আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। একবার আদালত অবমাননার অপরাধে তাঁহাকে কিছুদিন কারাবাস দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। সার সুরেন্দ্রনাথ দুইবার কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন তিনি প্রধান নেতা, দেশব্যাপী এমন তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি করেন যে কয়েক বৎসর পরে বঙ্গভঙ্গ রহিত হইয়া যায়। সেই সময়ে তিনি সাধারণের বাঙ্গলার অভিষিক্ত রাজা উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি বজ্রনাদে বিদেশীপণ্য বর্জন ঘোষণা করেন। শেষ বয়সে সুরেন্দ্রনাথের মতামতের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল তিনি স্বায়ত্ত শাসনে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 'সার' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার রাজনীতিক মতামত যাহাই হউক না কেন আমরা একটী বিষয়ে তাঁহার পরম অনুরাগী ছিলাম। অপর নেতৃগণের ন্যায় তিনি নিজ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম চর্চ্চা করিতেন। সেইজন্য তাঁহার দেহ বরাবর সুস্থ ও কার্য্যক্ষম ছিল। অন্যান্য নেতারা ও সর্ব্বসাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার অনুসরণ করিলে ভালই হয়।

বিবর্ত্তনবাদের বিপদ —

ডারউইন সাহেবের বিবর্ত্তনবাদের সহিত আমাদের অধিকাংশ পাঠক পাঠিকারই সম্ভবতঃ কিছু না কিছু পরিচয় আছে। ডারউইন সাহেব অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বানর জাতি মানবের পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ জীব সৃষ্টির বিবর্ত্তন নীতির ফলে বানর জাতি হইতে ক্রমোন্নতির হিসাবে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। ডারউইনের এই সিদ্ধান্ত বৈজ্ঞানিক সমাজে এতই আদৃত হইয়াছে যে ইহাকে ভিত্তি করিয়া অনেক নূতন শাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে (যদিও ইদানীং কোন কোন মহল এই অভিব্যক্তিবাদ বা বিবর্ত্তনবাদ বা evolution theoryতে সন্দেহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন)। কিন্তু ডারউইন সাহেবের বিবর্ত্তনবাদ প্রচারের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র মনুষ্য সৃষ্টি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে God created man after his own image অর্থ ঈশ্বর আপনার অনুরূপ আকারে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। খৃষ্টীয় জগতের সিদ্ধান্তের সহিত খৃষ্টীয় বৈজ্ঞানিক জগতের বিরোধ হইতেছে ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। সম্প্রতি মার্কিন রাজ্যে টেনেসী নামক প্রদেশে এই উপলক্ষে একটা মামলা উপস্থিত হইয়াছিল। অধ্যাপক জন স্কোপেসের নামে এই মামলা উপস্থিত হইয়াছিল যে তিনি ছাত্রদিগকে বিবর্ত্তনবাদ শিক্ষা দিয়াছেন। জজ জুরীদিগকে বুঝাইয়া দেন যে আসামী ছাত্রদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে মনুষ্য জাতি অনুন্নততর জাতি হইতে বিবর্ত্তনের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। এবং এরূপ কথা দেশের আইনের বিরোধী। অতএব আসামী আইন লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং তাহার দণ্ড হওয়া দরকার। জুরীরা ৯ মিনিট আলোচনার পর সিদ্ধান্ত করেন যে আসামী দোষী। তাহার ১০০ ডলার জরিমানা হইয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন তিনি এই দণ্ডের বিরুদ্ধে আপীল করিবেন। এখন উর্দ্ধতন আদালত কি সিদ্ধান্ত করেন—ধর্ম্ম বড় কি বিজ্ঞান বড়—তাহাই দেখিবার জন্য আমরা উদগ্রীব হইয়া রহিলাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য —(১) আগামী আশ্বিন সংখ্যা ২৮শে ভাদ্রের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পাঠকগণের ঠিকানায় প্রেরিত হইবে। (২) তন্ময় কর শ্রীমতী—দত্তের পত্রোত্তর আগামী সংখ্যায় সবিস্তারে প্রবন্ধ লেখক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে।

স্বাস্থ্য সমাচার——

"অন্ত্যজের স্পর্দ্ধা দেখ। গোকুল সিং, ঘাড়ধাক্কা
দিয়ে নিকাল্ দেও শূয়ারবাচ্ছাকে"—

(১০৫ পৃষ্ঠা)

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম"
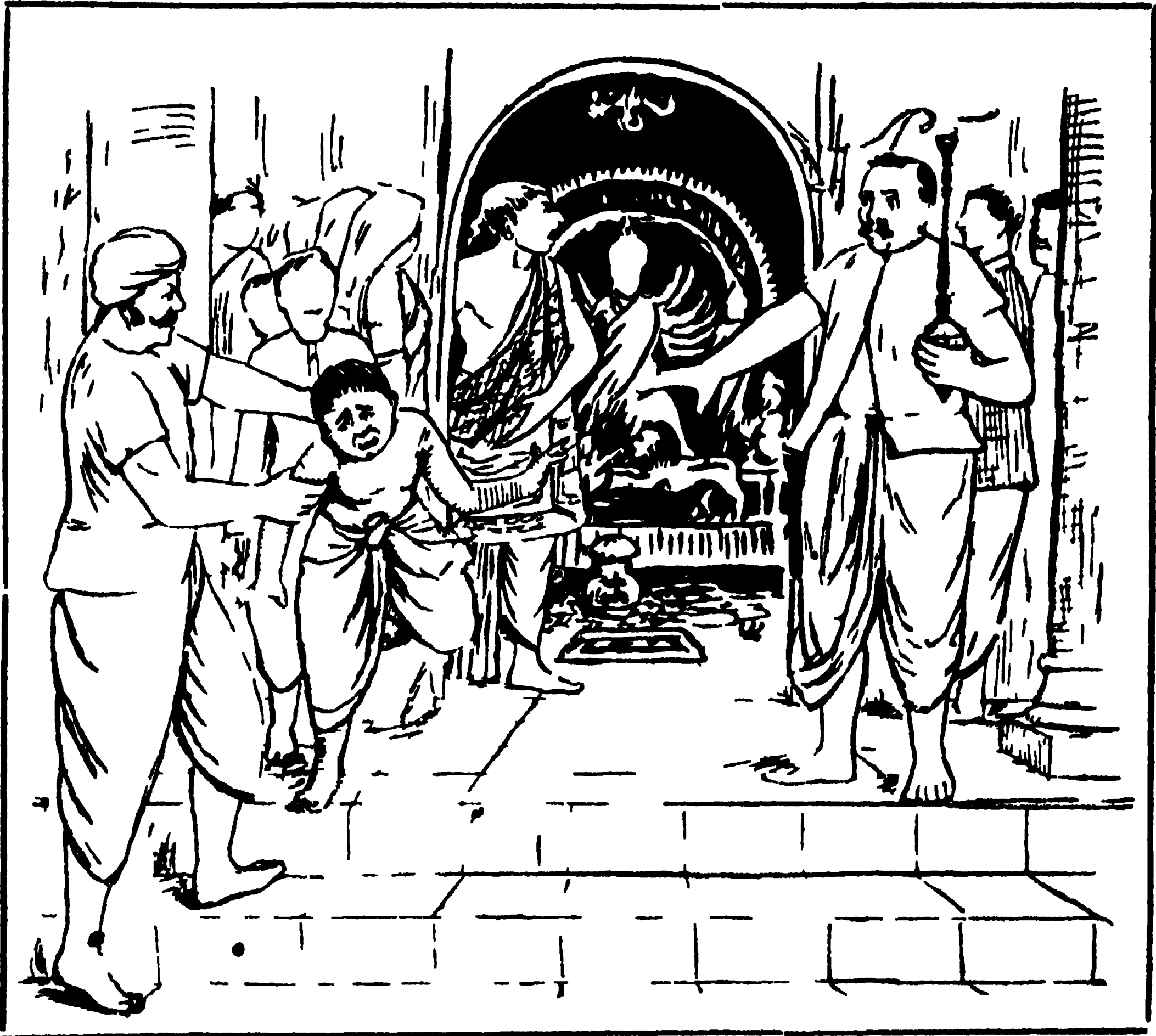
১৪শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৩২ সাল { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বাহুতে তুমি মা শক্তি !

বাঙ্গালী শক্তি পূজক, শক্তির উপাসক। তাই মা আমার আদ্যাশক্তি—যাবতীয় শক্তির আধার। সেই শক্তির উপাসক বাঙ্গালী আমরা আজ শক্তিহীন কেন ? কারণ আমরা মায়ের প্রকৃত পূজা ভুলিয়াছি।

মা আদ্যাশক্তি জগজ্জননী বর্ষে বর্ষে তাঁহার সন্তানগণকে দেখিতে ও দেখা দিতে আসেন। মায়ের সন্তান আমরা সারা বৎসর মায়ের আগমন পথ চাহিয়া বসিয়া থাকি। আনন্দময়ীর আগমনে ধনধান্যপুষ্পভরা শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা বঙ্গভূমি বর্ষে বর্ষে আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু সে আনন্দের মাত্রা দিন দিন কমিতেছে কেন ? কারণ আমরা মায়ের প্রকৃত পূজা ভুলিয়াছি।

আমাদের প্রাচীন কালের জীবনধারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকে সারা বৎসর যেখানে থাকুক না কেন, দুর্গোৎসবের সময় মহানন্দে প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিত। এখন পূজার ছুটীতে প্রায় লোকে গৃহ ছাড়িয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হয়। পূর্ব্বে পূজার সময় সকলে নববস্ত্র পরিধান করিয়া দরিদ্রদিগকে নববস্ত্র দান করিয়া আনন্দ লাভ করিত এখন ঠিক তাহার উল্টা অবস্থা দাড়াইয়াছে। এখন পূজা আসিলেই পূজার খরচ কেমন করিয়া চলিবে, এই ভাবনায় বাঙ্গালী সাধারণ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। মহাপূজা এখন মহানন্দের কারণ না হইয়া মহা নিরানন্দের কারণ হইয়া দাড়াইয়াছে। কেন এমনটা হইল ? কারণ এখন আমরা মায়ের প্রকৃত পূজা ভুলিয়াছি।

আমরা মায়ের প্রতিমা গড়িয়া পূজা করি। মা কি আমার শুধু কাঠ খড়, মাটীর মূর্ত্তি ? না তা নয়। মা আমার চিন্ময়ী—মৃন্ময়ী নন। কিন্তু আমরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা মায়ের চিন্ময়ী মূর্ত্তি ভুলিয়া শুধু মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতেই তাঁহাকে দেখিয়া থাকি। তাই আজ আমাদের এই দুঃখ-দুর্দ্দশা।

মা মহিষমর্দ্দিনী আমাদের শক্তির প্রতীক। মাকে যখন আমরা চিনিতাম, জানিতাম, তখন

আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে মায়ের পূজা করিতাম। সে পূজা কি ? -শক্তি সাধনা। নিজে শক্তিমান না হইলে কেহ শক্তির সাধনা করিতে পারে না। বাঙ্গালীর তখন বাহুতে শক্তি ছিল তাই বাঙ্গালী মায়ের প্রকৃত পূজাও করিতে পারিত। বাঙ্গালা তখন দীর্ঘজীবী নীরোগ, সুস্থ সবল ছিল। বাঙ্গালী তখন লাঠি ধরিত অশ্বারোহণে দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত নৌকারোহণে দেশ বিদেশে বাণিজ্য চালাইত উপনিবেশ স্থাপন করিত।

আজ বাঙ্গালীর জীবন ধারা বদলাইয়াছে। বাঙ্গালী শক্তি চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়াছে। বাঙ্গালীর বাহুতে আর বল নাই। বাঙ্গালী আজ ম্যালেরিয়া। জীর্ণ অনাহারে শীর্ণ। তাই আজ বাঙ্গালা মায়ের পূজা ভুলিয়াছে মায়ের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়াছে। বাঙ্গালীর মা যে শক্তির প্রতীক তাহা ভুলিয়া বাঙ্গালী আজ ভাবিতেছে মা শুধু কাঠ খড় মাটীর মূর্ত্তি মাত্র। তাই মায়ের আগমনে বাঙ্গালী আজ আনন্দের আস্বাদ পায় না মহাপূজায় মহোল্লাসে উন্মত্ত হয় না—পূজা কেমন করিয়া কাটিবে এই ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাই আজ বাঙ্গালী পূজার ছুটীতে প্রবাসে গিয়া আত্ম গোপন করে না হয় কংগ্রেস কনফারেন্স সাহিত্য সম্মিলন করে।

বাঙ্গালী আত্ম বিস্মৃত জাতি। বাঙ্গালী আজ নিজেকে ভুলিয়াছে। বাঙ্গালী যে কি দুর্জ্জয় শক্তির আধার ছিল তাহা ভুলিয়াছে। বাঙ্গালী য একদিন শক্তি চর্চ্চা করিত তাহা আজ সুদূর অতীতের বিস্মৃতপ্রায় স্বপ্ন। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব যে শক্তির সাধনা তাহা আজ বাঙ্গালী ভুলিয়াছে। কোন যাদুকরের মোহিনী মায়ার রূপার কাঠির স্পর্শে আজ বাঙ্গালী যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

বাঙ্গালীকে আবার জাগিতে হইবে—বাঙ্গালীর কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গাইতে হইবে। শক্তিরূপিণী মায়ের প্রকৃত পূজার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। আবার বাঙ্গালীকে বাহুবলের চর্চ্চা করিতে হইবে। বাঙ্গালীর সুপ্ত শক্তিকে আবার জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বাঙ্গালার অসাড় দেহে আবার প্রাণের সাড়া জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আবার দেশে আনন্দের বান ডাকাইতে হইবে।

মায়ের আগমন আসন্ন। এস বাঙ্গালি আজ হইতে আবার আমরা মহাশক্তির পূজা আরম্ভ করি। সে পূজা কি ?—শক্তি লাভ।

মা আমার মা। আমার শক্তিরূপিণী মা। আমার ভক্তিরূপিণী মা। আমার জ্ঞানরূপিণী মা। আমার বিদ্যারূপিণী মা। আমার জগজ্জননী মা। আমার মহিষমর্দ্দিনী মা। আমার পাষণ্ডদলনী মা। আমি সেই মায়ের ছেলে—সেই স্নেহময়ীর আদরের সন্তান—সেই আনন্দরূপিণীর শক্ত সন্তান। আমার দুঃখ কিসের ?

আমি সেই মায়ের পূজা করিব—শক্তি লাভ করিব। স্বাস্থ্য স্বাচ্ছন্দ্য বল লাভ করিব। বাহুবলের চর্চ্চা করিব। ইহাই আমার দুর্গোৎসব। ইহাই আমার মাতৃপূজা। ইহাই আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ। ইহাই আমার ইহকাল পরকাল। ইহাই আমার সাত্ত্বিক মহাপূজা। ইহাই আমার সাধনা।

এস মা জননি পার্ব্বতি ঈশানি আমার হৃদয়ে আসিয়া অধিষ্ঠান কর। আমি তোমার মৃন্ময়ী মূর্ত্তির প্রতিরূপ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া কুলকুণ্ডলিনী শক্তিতে জাগ্রত করিয়া তোমার পূজা করি—শক্তি লাভ করি। স্বাস্থ্য শক্তি আমার সাধনা হউক আমার পূজা সার্থক হউক।

পারিবে কি বাঙ্গালি, মায়ের শক্তি রূপের উদ্বোধন করিয়া তাঁহার প্রকৃত পূজা করিতে— নিজে শক্তিলাভ করিতে ? তোমাকে পারিতেই হইবে। শক্তি স্বাস্থ্য লাভ তোমাকে করিতেই হইবে তোমার বাঙ্গালী নাম সার্থক করিতেই হইবে তোমাকে শক্তিময়ী মায়ের শক্তিময় সন্তান হইতেই হইবে। তবেই তোমার বার্ষিক মাতৃ আবাহন— তোমার দুর্গোৎসব সার্থক হইবে।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিক্ষার কথা।

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্ এম্ এস]

(১) আমরা "গোঁফ খেজুরে" জাতি।

ছেলেবেলায় একটা গল্প শুনিয়াছিলাম সেটা এই — দুইটি লোক অতীব অলস সারাদিন শুইয়া ও ঘুমাইয়া কাটাইত। তাহারা এত বড় অলস ছিল যে আহারের চেষ্টাও করিত না কেহ দয়া করিয়া খাবার মুখের ভিতরে দিয়া দিলে শুধু গিলিয়া খাইত—চর্ব্বণ করিবার কষ্টও তাহারা স্বীকার করিত না। একদিন কোন লোক একটা খেজুর তাহাদিগের মধ্যে একজনকে খাইতে দেয় দুঃখের বিষয় খেজুরটা মুখের ভিতরে না পড়িয়া উপর ঠোঁটের গোঁফের উপরে পড়ে সে লোকটা এত কুড়ে যে গোঁফ হইতে খেজুরটাকে টানিয়া মুখের মধ্যে দিতে পারে নাই। সেই অবধি অতি বড় কুড়েকে "গোঁফ খেজুরে" আখ্যাটি দেওয়া হয়। একদিন এই দুইটি অলস প্রধান ব্যক্তি যথাপূর্ব্ব শুইয়া আছে এমন সময়ে তাহাদের ঘরে আগুণ লাগে। তাহাতে তাহাদের ভ্রূক্ষেপও নাই। ক্রমশ আগুণ যখন একজনের পৃষ্ঠদেশে ঠেকিতেছিল তখন তাহার সহচরকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল— পি—পু। সহচর শুনিয়া উত্তর করিল — ফি—শু। তাহারা অত্যন্ত অলস বিধায়ে কথাও অতি সংক্ষেপে কহিত। পি—পু—মানে পিঠ পুড়িতেছে আর তাহার উত্তর ফি—শু—মানে ফিরিয়া শুইও। বলা বাহুল্য এই দুই জনই পুড়িয়া মরিল তবু ঘরের বাহির হইল না। আলস্যই ছিল তাহাদের স্বধর্ম্ম—এবং সেই ধর্ম্ম বশতই তাহারা মরিল।

এতগুলি কথা যাহা বলিলাম তাহা অলীক রূপক কথা হইলেও বর্ণে বর্ণে আমাদিগের পক্ষে খাটে— অন্তত স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে বাঙ্গালীর প্রতি প্রযোজ্য। হিন্দু বাঙ্গালী ষোল আনা মোহগ্রস্ত ষোল আনা কামিনী কাঞ্চনে প্রলুব্ধ অথচ খাটিয়া টাকা রোজগারের কথা উঠিলই সাংখ্যের পুরুষ সাজিয়া অর্থমনর্থম্ ভাবয়নিত্যং ইত্যাদি বুলি কপচাইয়া থাকেন এবং স্বাস্থ্যকথা পাড়িলেই— নশ্বর দেহ প্রভৃতি বড় বড় কথা বলিয়া ঘোর বৈরাগ্যের অবতারণা করেন। ঐ সঙ্গে ভণ্ডামির মাত্রা বাড়াবার জন্য বলিয়া থাকেন যে হিন্দুর প্রত্যেক নৈমিত্তিক আচারে জীবনের প্রত্যেক নৈমিত্তিক কার্য্যে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত আছে। আছে ত মানি—কাজে করে তোমরা কতটা কর?

পাপে যাহা হয়—তাহা তো কাহারো অবিদিত নাই। এক্ষণে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় আসিয়াছে। এখন হইতে যাহাতে আমাদের সন্তান সন্ততিরা পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া জীবনটাকে সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা বাঙ্গালীরা আজও না সংসারকে পুরা মাত্রায় ভোগ করি—না স্বর্গে স্থান পাই। আমাদের জীবন যাত্রাটা অতি মাত্রায় তিক্ত রসাত্মক। পরাধীনতার জন্য যাহা ভোগ করিতে হয় তাহা তো আমাদিগের আছেই তাহার উপরে স্বাস্থ্যহীনতার জন্য বেশী মাত্রায় কষ্ট পাই। এখন হইতে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা হওয়া উচিত—কিসে আমরা ও আমাদের বংশধরেরা সুস্থ থাকে। সেই চেষ্টার কতকটা সাহায্য করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

(২) [illegible], বৈচিত্র্যের প্রয়োজনীয়তা

ছেলেরা স্বভাবতঃ মারামারি যুদ্ধ শিকার প্রভৃতির গল্প কথা পড়িতে ও শুনিতে ভালবাসে। চিত্ত চমকপ্রদ ঘটনার পর ঘটনা লোমহর্ষণ কার্য্যাবলী আকস্মিক বিপৎপাত ও তাহা হইতে উদ্ধার ইত্যাকার জাতীয় বর্ণনাই ছেলেদের মন সহজে আকৃষ্ট করে। এই জন্যই বাঘ ভালুকের কথা শিকার শিকারীর

কথা যুদ্ধের কথা বীরদের কাহিনী সকল শিশুপাঠ্য গ্রন্থে বেশী বেশী থাকে। যে অসহায় অবস্থায় জন্মাইয়া প্রতিদিনই প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া দেহকে রক্ষা করিয়া শিশুকে বড় হইতে হয় সে কথা তো শিশুকে কেহই শুনায় না—অথচ এই নিঃশব্দ দৈনিক প্রতিকূল ঘটনার প্রতিঘাত সৃষ্টি করা, শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক ধর্ম। কতকটা এই আভ্যন্তরিক সংগ্রামের প্রতিচ্ছায়া হিসাবে কতকটা সংস্কার বশতই শিশুরা এই জাতীয় গল্পে আকৃষ্ট হয়। এ কথাটা সকল শিক্ষক ও অভিভাবক ভাবেন না। তাই আজ এইদিক দিয়া শিশু ও বালক পাঠ্য শিক্ষা পুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা আমার দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। দেশ কি জাগিবে? আমাদের দেশের নন্দগোপালদের জন্য আমরা অবহিত হইব কি?

( ) রোগ ও রোগ জয়ের ইতিহাস।

আমরা উপযুক্তভাবে বই লিখিলে একাধারে গল্প সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান ও ভূগোল শিখাইতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন যে সংক্রামক বর্ত্তমান সময়ে মধ্যে মধ্যে এসিয়া খণ্ডে যে ভীষণ প্লেগের ওলাউঠার আবির্ভাব হয় ঐতিহাসিক কোনও পূর্ব যুগে কোন কোন দেশে তাহা হইয়াছিল সেই দেশগুলির নাম ও অবস্থা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানের সেই সেই ভূখণ্ডের বিবরণ বেশ সরস করিয়া লিখিলে স্বচ্ছন্দে কত কথাই শিখান যায়। সম্প্রতি ভারতবর্ষে কোন সালে প্রথম প্লেগের আবির্ভাব হয় এবং অতীত কোন যুগে ইউরোপে ব্ল্যাক ডেথ নামক মহামারি হইয়াছিল—এতদুভয়ের তুলনা মূলক সমালোচনার মুখে একসঙ্গে চিকিৎসা ও ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করা সম্ভবপর হয়।

কি ভাবে কোন কোন জনপদ ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা, ওলাউঠাবসন্ত কুষ্ঠব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে গৌড় ভুবনেশ্বর উদয়পুর হাসিসহর বৰ্দ্ধমান মালদহ প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী নগর গুলি কি করিয়া শ্মশানে পরিণত হইল—এসকল কথার রসরচনার মুখ রোগ ও রোগের কি অসীম ক্ষমতা বেশ করিয়া বুঝান যায়। একদিকে রোগের এই জনপদ বিধ্বংসী ক্ষমতা অপর দিকে পাস্তুর কক্ লিষ্টার প্রভৃতি মনীষিগণের রোগ জয়ের গৌরবেতিহাস যেমন চিত্তকর্ষক হইবে তেমনিই শিক্ষাকে বদ্ধমূল করিবে। রোগ বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মশা মাছি উকুন প্রভৃতির রোগ বিস্তারে কতটা হাত তাহার বর্ণনাও কম মুখরোচক নহে।

একদিকে এই সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের আলোচনা এবং তৎসঙ্গে অন্যপক্ষে এই বৈজ্ঞানিক তথ্যের কার্য্য কারিতার বিবরণ দেওয়া নিতান্তই সমীচীন। আজ সভ্য জগতে লর্ড লিষ্টারের আবিষ্কৃত পচন নিবারক ঔষধের প্রয়োগের ফলে অস্ত্র চিকিৎসা কতটা উন্নতি করিতে সক্ষম হইয়াছে শুধু এই একটা বিষয়েরই বর্ণনা কত লোমাঞ্চকর। তাহার উপরে বর্ত্তমান কালে আঁতুড় ঘরের উন্নতি সাধন করিয়া শিশুমৃত্যুর হার কত কমিয়াছে শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠানগুলির কল্যাণে কত শিশু পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিতেছে জন মজুরদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান ব্যবস্থাগুলির ফলে তাহাদের জীবন কত সুখের হইয়াছে জল পুলিশের সাহায্যে ছোঁয়াচে রোগগ্রস্ত জাহাজকে আটকানর ফলে কত দেশের লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়া যাইতেছে—এ সকল কথাও বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলে—বালকেরা ইহার মধ্যে অদৃশ্য যুদ্ধের কথা ভাবিয়া মোহিত হইয়া পড়িবে। মানুষকে সুস্থ রাখিবার জন্য বস্ত্রাবরণের প্রয়োজন পাদুকারও প্রয়োজন সুপেয় জলেরও প্রয়োজন উপযুক্ত খাদ্যেরও প্রয়োজন—এতগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের জন্য নিত্য কতই লোক অন্ন পাইতেছে সে কথাও ভাবিবার কথা। ফল কথা ভাল করিয়া লিখিতে পারিলে স্বাস্থ্যতত্ত্বের সঙ্গে সমাজ তত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্ব রাজনীতি—সকল কথারই আভাষ দেওয়া যাইতে পারে। চুলচেরা ভাগকরা ইতিহাস ভূগোল বা স্বাস্থ্যকথা নিতান্ত নীরস—কিন্তু তাহা না করিয়া, সকল বিষয়গুলিকে একত্রে জড়াইয়া উপরি উক্ত এই

ভাবে স্বাস্থ্য কথাব আলোচনার ফলে অতি সরস ভাষায় সরস উপাদানের সমষ্টি সংযোগে যে উপাদেয় পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত হইবে তাহা যেমন শিক্ষাপ্রদ হইবে তেমনি মনোহারীও হইবে।

(৪) পুবাকালের স্বাস্থ্যকথা।

পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বের স্বাস্থ্যকথার আলোচনা কবা অতীব শিক্ষাপ্রদ। এদেশেব ঐ বিষয়ের ইতিহাস পাইবার উপায় নাই বিধায়ে তৎকালে পাশ্চাত্য ভুখণ্ডের কথা আলোচনা করা সমীচীন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে ব্লাকডেথ নামক একটি ভীষণ মড়ক হয়। সেই মড়কে ইয়োরোপ প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় আত্মরক্ষার্থ জিনিস সহব চিকিৎসকগণকে সম্বন্ধ কবিযা রোগ নিবাবণেব চেষ্টায় চেষ্টিত হয়। ইয়োরোপে রোগ প্রতিকারে স বেধে হয় এই প্রথম চেষ্টা। তাহার পরে ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ভীষণ মড়ক হয় এব সেই মড়ক বন্ধ হয় পর ব সবে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের ফলে। ঐ আগুণে ৪ টি রাস্তায় ১৩ বাড়ী পুড়িয়া যায় এবং সেই সঙ্গে মড়কের বীজও পুড়িয়া যায়। কিন্তু ইংলণ্ডে তথনো রোগ প্রতিকারের (অর্থাৎ স্বাস্থ্য চর্চ্চার) ব্যবস্থা হয় নাই। তৎকালে জাহাজে যাহারা যাতায়াত করিত তাহাদেব মধ্যে স্কার্ভি নামক একটি মারাত্মক রোগ ছিল। মাত্র ১৫।২ বৎসর পূর্ব্বে ঐ রোগের প্রতিকার কবিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এক কথায় বলিতে গেলে তখন রোগ হইলে তৎকালোচিত বিধিমত সেই রোগ সারাইবারই ব্যবস্থা হইত—কিসে সে রোগ আর না হয়—অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষাব উপায়—কথা কেহই কল্পনাতেও আনিতেন না। তবে পুরাকালে কাপ্তেন কুক নামক জনৈক নাবিক ১১৮ জন লোকসহ তিন বৎসর জলে জলে প্রায় সমস্ত পৃথিবীই পরিক্রমা কবিয়াছিলেন এমত স্থলে তাঁহার যে মাত্র একটি লোক ব্যারামে মারা পড়ে—তখনকার কালের পক্ষে এটা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা বটে। তিনি তাঁহার জাহাজেব লোকজনেব স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে যে সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য এবং তাঁহার পক্ষে অতি দূরদর্শিতার পরিচায়ক। কিন্তু তাঁহার মত স্বাস্থ্যান্বেষী তৎকালে বিরল ছিল। তদীয় নিয়মাবলী সকলের পাঠ্য।

(৫) মহারথীদিগেব কথা।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান বেশী দিনেব পুরাতন নহে। পাশ্চাত্য মতে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান তাহা হইতেও অধুনাতন। জগতের নিয়মই এই যে মানুষ ক্রমাগতই সুখস্বাচ্ছন্দ্য চায় এব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সঙ্গে বংশ বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। বংশবৃদ্ধি অতি মাত্রায় হইলে, ব্যারামের প্রকোপ বাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে মড়কের প্রাদুর্ভাব হয়। বর্ত্তমানে এই কার্য্যধারা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিপদে পড়িলেই বুদ্ধি বাড়ে আজ তাই মৃত্যুকে জয় করিবার জন্য রোগকে সমূলে ধ্বংস করিবার জন্য আয়ুষ্কালকে বাড়াইবার জন্য দেহকে সুস্থ সবল ও কর্ম্মঠ কবিবার জন্য পাশ্চাত্য মনীষীরা কিরূপ উদ্যমের সঙ্গে কার্য্যে লাগিয়াছেন তাহা ভাবিলেও বিস্ময়ে আপ্লুত হইতে হয়। সেই সকল রণজয়ের ও রণবীরদিগের বার্ত্তা উচ্চকণ্ঠে ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় জগতের সকলকেই শুনান উচিত—শিশুদিগকে ত বটেই।

প্রথমেই ইচ্ছা বসন্তের কথা ধরা যাইতে পারে। ডাক্তার জেনার কি করিয়া গোয়ালাদের নিকট হইতে গো বসন্ত ও ইচ্ছা বসন্তের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তাহা অবগত হইলেন কি করিয়া টীকার শক্তি দিলেন, কেমন করিয়া আপন সন্তানকে টীকা দিলেন এবং সেই টীকা লওয়ার ফলে আজ ইচ্ছা বসন্ত কত কমিয়া গিয়াছে এগুলি অতীব বিস্ময়কর কাহিনী—ইহাদিগের বিবরণ সকলেরই পক্ষে শিক্ষাপ্রদ।

তাহার পর লুই পাস্তুরের কথা। ইনি একজন সামান্য রাসায়নিক ছিলেন ফ্রান্স ইহাঁকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। কি সামান্য অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া ইনি জগতের কত বড় হিতসাধন কবিয়াছেন তাহা

অবর্ণনীয়। অনেকেই জানেন যে দ্রাক্ষার রস হইতে সুরা হয়। দ্রাক্ষার রসকে পচাইয়া (উৎসচন করাইয়া বা গাঁজাইয়া) তবে মদ হয়। এই উৎসেচন ধর্ম্ম বুঝিতে যাইয়া ইনি আজ ফ্রান্সকে মদ্য ব্যবসায়ে জগতের মধ্যে সবচেয়ে বড় করিয়াছেন। তাহার পরে রেসমের গুটি একজাতীয় কীটাণু কর্ত্তৃক ধ্বংস হওয়ায় ফ্রান্সের রেসমের কারবার নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল ইনি সেই কীটাণু ধ্বংসের উপায় বাহির করেন। মেষের গায়ে এক রকম কীটাণু জন্মানর ফলে মেষের মধ্যে মারাত্মক ক্ষত রোগ ও মড়ক হইতে আরম্ভ হইল। এই ব্যারামকে অ্যানথ্র্যাকস কহে। ইহা মনুষ্যের পক্ষেও মারাত্মক। কাজেই মেষবংশ ও মেষপালক একেবারে ধ্বংসের মুখে পতিত হওয়ায় দেশের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছিল। এখানেও পাস্তর দেশের রক্ষা করিলেনই —পরন্তু জীবাণুরা যে অধিকাংশ সংক্রামক রোগের কারণ এবং মৃতজীবাণুদের শরীর রস হইতে টীকা লইলে সেই ব্যারাম হয় না হইলেও সারিয়া যায় এই মহাসত্য দুইটি আবিষ্কার করিয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন। বস্তুত বর্ত্তমান কালের জীবাণুতত্ত্ব ও টীকা চিকিৎসা (ভ্যাক্সীন ও সীরাম) তাঁহারই আজীবন সাধনার ফল। পাস্তর জীবাণুতত্ত্ব বাহির করিলেই লর্ড লিষ্টার জীবাণুধ্বংসের পথ আবিষ্কার করিলেন। মুখ্যত পাস্তর ও গৌণত লিষ্টারের কৃপায় আজ অস্ত্র চিকিৎসার এত শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্নে যাইতেছিল—কেমন করিয়া ল্যাভেরান ম্যানসন রস গর্গাস রজার্স প্রভৃতি তাহার ধ্বংসের পথ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাও বর্ণনা করিবার অতি মনোরম বিষয়। এই ইতিহাস যেমন চমৎকার তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

(৬) স্বাস্থ্যরক্ষার কর্ত্তাদিগের কথা।

গ্রামে গ্রামে মিউনিসিপ্যালিটি না থাকিলেও আজকাল অনেক গ্রামেই মিউনিসিপ্যালিটি নামক একটা কর্ত্তৃত্ব করিবার দল দেখা যায়। ইহারা তিন বৎসর অন্তর কতকটা দেশীয় লোকের দ্বারা ও কতকটা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। যে যে লোকেরা মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য (ইংরাজীতে তাঁহাদিগকে কমিসনার বা কাউন্সিলার বলে) মনোনীত হন তাঁহারা বেতন পান না—তাঁহারা সপ্তাহে পক্ষান্তরে বা মাসে মাসে সকলে একত্রিত হইয়া একমত হইয়া যে যে কার্য্য তালিকা প্রস্তুত করেন সেই সেই কার্য্যগুলিই করা হয়। কাজেই কায করিবার জন্য মাহিনা করা লোক রাখিতে হয়। এই মাহিনা করা লোকদিগের প্রধানকে চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সেক্রেটারী প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। এই বেতনভুক লোকেরা জন সাধারণ ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত অবৈতনিক কমিসনারদিগের আজ্ঞাবহ ভৃত্য। অন্যত্র চাকুরিয়াদের ন্যায় ইঁহারা বরাবরকালের জন্য নিযুক্ত হন—অর্থাৎ তিন বৎসর অন্তর কমিসনারগণ বদল হইলেও কর্ম্মচারী চেয়ারম্যান প্রভৃতি বদল হন না। আবার এই চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে কোন কোন স্থলে কমিসনারদিগের মধ্যে হইতেও বাছিয়া লওয়া হয়—কাজেই ইঁহারা তিন বৎসর অন্তর বদলী হন এবং তাঁহারা বেতন পান না। যাহা হউক এই অবৈতনিক ও তিন বৎসর কালের জন্য নিযুক্ত কমিসনারগণ একত্রে সভাস্থ হইলেই মিউনিসিপ্যালিটি নামে আখ্যাত হন। রাস্তাঘাট দেখিবার জন্য ইঞ্জিনিয়ার ওভারসিয়ার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কায করিবার জন্য হেল্‌থ অফিসার স্যানিটারী ইন্সপেক্টার ফুড ইনস্পেক্টর টাকাদার শ্মশান ঘাটের চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি ছোটখাট কর্ম্মচারীগণ উক্ত চেয়ারম্যানের অধীনে থাকিয়া কায করেন। এই গেল গ্রামে গ্রামে ব্যবস্থা।

কোথাও জেলায় জেলায় জেলাবোর্ড নামক একটি সংঘ দেখা যায়। ইঁহারা রাস্তাঘাট স্বাস্থ্য প্রভৃতি দেখিবার জন্য নিযুক্ত। তাঁহারাও অবৈতনিক কর্ম্মকর্ত্তা এবং তাঁহাদিগেরও অধীনে চেয়ারম্যান প্রভৃতি বেতনভুক্ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। তফাৎ এই যে মিউনিসিপ্যালিটি সুধু সেই গ্রামের কায করেন—জেলাবোর্ড সমগ্র জেলা ধরিয়া কায করেন।

এই জেলাবোর্ডসমূহ ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উপরে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট এবং গবর্ণমেণ্টের মিউনিসিপ্যাল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী ও ডাইরেক্টর অব পাবলিক্ হেলথ এই তিনজন কর্ত্তৃত্ব করেন।

(ক্রমশঃ)

খাদ্য নির্ব্বাচন ও দন্ত রক্ষা।

মানুষের জীবন ধারণ ও শরীর পোষণের উপযোগী খাদ্য কি কি হইতে পারে এবং সাধারণ নিত্য নিয়মিত খাদ্য তালিকা হইতে কোন কোন পদার্থ বর্জ্জন করা উচিত এবং কোন কোন নূতন খাদ্য সেই তালিকায় যোগ করা উচিত ইহা লইয়া বহু পরীক্ষা হইয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। এই সকল পরীক্ষার ফল অতি চমৎকার। পরীক্ষার ফলে অনেক নূতন নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে এত নূতন কথা জানিতে পারা গিয়াছে যে ভবিষ্য খাদ্য ভাণ্ডারে যুগান্তর উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। খাদ্য নির্ব্বাচন ও খাদ্যের পরিবর্ত্তন দ্বারা কত যে নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিতে পারা যাইতেছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষাগারে জীবজন্তুকে বিভিন্ন রকম খাদ্য খাইতে দিয়া তাহাদের কত রকম যে রূপান্তর সাধন করিতেছেন তাহা এই সকল পরীক্ষাগারে গমন করিয়া স্বচক্ষে দর্শন না করিলে কাহাকেও বর্ণনা করিয়া বুঝানো সম্ভব বা সহজ নহে। কোন পশুকে এমন খাদ্য দেওয়া হইতেছে যাহা খাইয়া সে তাহার জাতির স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে। আবার কাহারও জন্য এমন খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে তাহারা স্বাভাবিক আকারের অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার হইয়া উঠিতেছে। খাদ্য নির্ব্বাচনের কৌশলে কাহারও অস্থি কঙ্কালের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করা হইতেছে। আবার কাহারও বা শিরা তন্ত্র প্রভৃতির পরিবর্ত্তন করা যাইতেছে। কাহারও চক্ষু কাহারও দন্তের এই ভাবে বিকৃতি ঘটানো হইতেছে। বস্তুত পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিকেরা যাদুকর সাজিয়া অসাধ্য সাধন করিতেছেন খোদার উপর খোদকারী করিতেছেন ভগবানের সৃষ্টির বিপর্য্যয় ঘটাইতেছেন জীবজন্তুদের দেহ লইয়া ভেলকী বাজী খেলিতেছেন।

উদ্ভিদ রাজ্যেও এক শ্রেণীর উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পণ্ডিত নানারূপ পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছেন নূতন নূতন ধরণের অদ্ভুতদর্শন ও অভিনব গুণসম্পন্ন উদ্ভিদের সৃষ্টি করিতেছেন। এক জাতীয় বৃক্ষের পুষ্প কেশরে অপর জাতীয় পুষ্পের পরাগ নিক্ষেপ করিয়া যৌন সম্বন্ধের ব্যতিক্রম ঘটায় যা অশ্বতরের ন্যায় নূতন জাতীয় বর্ণ সঙ্কর উদ্ভিদের সৃষ্টি হইতেছে। কোন জাতীয় উদ্ভিদ কণ্টকবহুল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে নূতন সার প্রস্তুত করিয়া সেই সার জমিতে প্রয়োগ করিয়া সেই জমিতে ঐ কণ্টকবহুল বৃক্ষের বীজ বপন করিয়া নিষ্কণ্টক ঐজাতীয় বৃক্ষ উৎপাদন করিতেছেন। কাঁটার জন্য ফণী মনসার গাছ পশুর খাদ্য হইবার অযোগ্য ছিল এখন তাহাকে কণ্টকশূন্য করিয়া উৎকৃষ্ট পশু খাদ্যে পরিণত করা হইতেছে। কোন গাছের ফল বীজবহুল বলিয়া মনুষ্যের খাদ্যের অযোগ্য ছিল। সার প্রয়োগ করিয়া ঐ বৃক্ষের ফল বীজশূন্য করা হইতেছে এবং তাহা মনুষ্যের উপাদেয় খাদ্যে পরিণত হইতেছে। কোন ফল অম্লরসাধিক্যবশত অভক্ষ্য ছিল তাহার অম্লরস দূরীভূত করিয়া তাহাকে মিষ্টত্ব প্রদান করা হইতেছে। আবার যাহারা বিক্রয়ার্থ বৃক্ষের বীজ বা কলম প্রস্তুত করে তাহারা সবল সুপুষ্ট বৃক্ষ উৎপাদনের জন্য তাহার বীজের পুষ্টি সাধনে মনোনিবেশ করে। কোন কোন গাছ বা ফল বিষগুণযুক্ত ছিল। কিন্তু কৃষি বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষা ক্ষেত্রের পাল্লায় পড়িয়া তাহা নির্ব্বিষ সুখাদ্যে পরিণত হইয়াছে। কোথাও বা ফলের সাধারণ আকার অনেক বাড়িয়াছে। কোথাও বৃহদায়তনের মূল (আলু প্রভৃতি) উৎপন্ন হইতেছে। বলিতে কি বৈজ্ঞানিকের কার্য্য তৎপরতায় সৃষ্টি রাজ্যে যুগান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

খাদ্যের ত্রুটিতে অনেক সময়ে নানা প্রকার রোগ

জন্মে। এই সকল স্থলে ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা পথ্য চিকিৎসাই সমধিক প্রশস্ত। খাদ্য নির্ব্বাচন নয় ত্রুটির সংশোধন করিয়া অনেক সময়ে এই শ্রেণীর রোগ আরাম করা যায়। পীড়ার অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে বস্তুর প্রয়োগে পীড়া আরোগ্য হইতে পারে সেই বস্তু যাহাতে আছে এমন খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। ভাইটামাইন এইরূপ একটী উপাদান। এই জিনিসটির প্রকৃত স্বরূপ এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় নাই। গুণের তারতম্য অনুসারে ইহাদিগকে প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় যথা এ বি সি। প্রথমটি স্নেহ জাতীয় পদার্থে এবং অপর দুইটী জলে দ্রবনীয়।

শরীরের পুষ্টি সাধনে কেবল খাদ্যই একমাত্র উপাদান নহে। খাদ্য ব্যতীত অপর জিনিসের উপরও পুষ্টি কারিতা বহু পরিমাণে নির্ভর করে। যেখানে দেখা যায় রীতিমত খাদ্য গ্রহণেও শরীরের প্রয়োজনানুরূপ পুষ্টিসাধন হইতেছে না এরূপ অনেক স্থলে সূর্য্যালোকের প্রভাবে এই দোষ কাটিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। রিকেটস এক প্রকার রোগ। গ্রাম্য ভাষায় ইহাকে এড়ে লাগা বলে। ছেলেদেরই প্রায় এই রোগ হয়। ছেলে খায় দায় অথচ শরীরের পুষ্টি সাধন হয় না। এই রোগ স্বভাবত ও হইতে পারে আবার কৃত্রিম উপায়েও ইহা উৎপাদন করা যাইতে পারে। যে উপায়েই হউক এই রোগ হইলে সূর্য্য কিরণ ইহার অব্যর্থ মহৌষধ বলিলেও চলে। বৈজ্ঞানিক তাঁহার পরীক্ষাগারে এই তত্ত্বটির চূড়ান্ত পরীক্ষা করিয়া তবে ছাড়িয়াছেন। কতকগুলি ইন্দুর পালন করিয়া তিনি তাহাদের খাদ্যের ইতরবিশেষ করিয়া দিলেন। কতক গুলিকে যথাচিত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য দিতে লাগিলেন, এবং কতকগুলি ক পুষ্টিকারিতাশূন্য খাদ্য খাওয়াইতে লাগিলেন। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ইন্দুরেরা কয়েক দিনের মধ্যেই কৃত্রিম উপায়ে রিকেটস রোগে আক্রান্ত হইল। তার পর তাহাদের খাদ্যের কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া অর্থাৎ অপুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইয়াই তাহাদিগকে নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে সূর্য্য কিরণে রাখা হইতে লাগিল। রৌদ্র সেবনের ফলে তাহারা কয়েক দিনের মধ্যেই প্রথম শ্রেণীর পুষ্টিকর খাদ্য পুষ্ট ইন্দুরগুলির ন্যায় পুষ্টি লাভ করিতে লাগিল। সূর্য্য কিরণ যে কেবল রিকেটস রোগ আরাম করিতে পারে তাহা নয় তাহা এই রোগ নিবারণ করিয়াও থাকে। যে সকল লোক নিয়মিত ভাবে রৌদ্র সেবন করে তাহাদের রিকেটস রোগ হয় না। এই কারণে আমাদের নব প্রসূতিরা শিশুদিগকে তৈল মাখাইযা কিছুক্ষণ করিয়া রৌদ্রে রাখিয়া দিয়া থাকেন। নব্য বঙ্গ ও ইঙ্গ বঙ্গ সমাজে এই প্রথা অসভ্যতার পরিচায়ক বলিয়া ক্রমশ পরিত্যক্ত হওয়ায় সচরাচর শিশুরা রিকেটস রোগাক্রান্ত হইযা থাকে।

কেবল আসল সূর্য্যালোক নয় কৃত্রিম উজ্জ্বল আলোকেরও এই গুণ আছে। পারদবাষ্প হইতে উদ্ভূত আলোক বা আর্ক লাইট প্রয়োগ করিয়াও রিকেটস রোগে সুফল পাওয়া যায়। সূর্য্য কিরণ প্রত্যক্ষ ভাবেই সমধিক উপকারী। পাতলা কাচাবরণের মধ্য দিয়াও সূর্য্য কিরণের উপকারিতা কিয়ৎ পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু ৩ মিলিমিটার পুরু কাচের ভিতর দিয়া যে সূর্য্য কিরণ আসিতে পারে তাহার রিকেটস রোগ আরাম করিবার ক্ষমতা নাই। আর পারদবাষ্প দীপালোক সাধারণ পাতলা কাচের ভিতর দিয়া আসিলেই তাহার গুণ নষ্ট হইয়া যায়। বস্ত্রও সূর্য্য কিরণের উপকারিতার ইতর বিশেষ করিয়া থাকে। কালো পোষাক অপেক্ষা সাদা পোষাকের ভিতর দিয়া যে সূর্য্য কিরণ গায়ে লাগে তাহাই বেশী উপকারী।

সূর্য্য কিরণের রোগারোগ্যের ক্ষমতা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সকল পরীক্ষা হইয়াছে তাহার ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে সূর্য্য কিরণের অন্তর্গত বেগুনী বর্ণ (ultra violet radiations) এই অপূর্ব্ব গুণ সম্পন্ন। সূর্য্য কিরণ হইতে কোন ক্রমে এই বর্ণ পৃথক হইয়া পড়িলে কিম্বা বাধা পাইলে সূর্য্য কিরণের আর কোন গুণ থাকে না। শিশু দেহে সূর্য্য কিরণের আশ্চর্য্য ফল প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। শিশুদিগকে ঘন ঘন রৌদ্র

সেবন করাইলে তাহাদের রক্তে অজৈব ফসফেটসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সূর্য্যকিরণের গঠন উপাদান সকল সময়ে এক প্রকার থাকে না। ঋতু ভেদে তাহাদের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে বসন্ত গ্রীষ্মকালে সূর্য্য কিরণে বেগুনী রশ্মির পরিমাণ অধিক। আর শীতকালে তাহার পরিমাণ কম। ঋতু ভেদে রৌদ্রশক্তির শিশুর রক্তেও তদনুপাতে ফসফেটের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। পশু দেহেও রৌদ্রের গুণ খুব স্পষ্ট। জুন হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে মেষ গরু প্রভৃতি পশুর thyroid এ আয়োডিন ধাতুর পরিমাণ ডিসেম্বর হইতে মে পর্য্যন্ত ছয় মাসের পরিমাণ অপেক্ষা তিনগুণ বেশী। ঋতুভেদে রক্তের উপাদানের এই পরিবর্ত্তন হইতে বুঝা যায় যে বৎসরের সকল সময়েই রক্তের গঠন একই প্রকার নহে। সুতরাং ইহাও খুবই সম্ভব যে আবহাওয়ার অবস্থা ঋতুর পরিবর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপার সাধারণত মানবদেহের পুষ্টি সাধনের উপর বিলক্ষণ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে মানুষের দেহের পুষ্টি সাধনের খাদ্য ছাড়া অন্য কারণও আছে।

প্রসঙ্গ ক্রমে এইখানে আর একটী কথার অবতারণা করা যাইতেছে। সম্প্রতি একটী নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন খাদ্যে রৌদ্র লাগাইলে কিম্বা আলো লাগাইলে তাহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ গুণ উদ্ভব হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে ইঁদুরের যকৃৎ বাহির করিয়া তাহাতে আলোক প্রতিফলিত করিলে তাহার আয়তন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মাংসপেশীগুলিও এই ভাবে এইরূপ গুণযুক্ত হইতে পারে। যে চর্ব্বি সাধারণ ভাবে রিকেটস রোগ নিবারণ করিতে পারে না তাহাতে আলোক লাগাইলে তাহা এমন গুণসম্পন্ন হয় যে তদ্দ্বারা উক্ত রোগ দ্রুত ও সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য হয়।

বংশানুক্রম

আরও কথা আছে। ইন্দুর লইয়া পরীক্ষার সময় দেখা গিয়াছে অপুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইয়াও কোন কোন ইন্দুরের দেহে কৃত্রিম উপায়ে রিকেটস রোগ উৎপাদন করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু এক শ্রেণীর ইন্দুরগুলিকে এরূপ খাদ্য দিয়া পালন করিতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের সন্তান সন্ততিগণকেও সেইরূপ খাদ্য দিতে থাকিলে এই সন্তানগুলির রিকেটস রোগ হয়। পিতৃমাতৃগণ রোগাক্রান্ত না হইলেও উক্ত খাদ্য তাহাদের দেহে একেবারে নিষ্ফল হয় নাই—তাহাদের সন্তানেরা পিতৃমাতৃ দেহ হইতে রোগপ্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাই তাহারা সহজে রোগাক্রান্ত হইল। ইহাতে এই নূতন তথ্যটি জানা গেল যে রিকেটস রোগ উৎপাদনে বংশানুক্রমের প্রভাবও কম নয়।

ভাইটামিনের আবিষ্কারের পূর্ব্বে পুষ্টিকারিতার বিষয় অন্যভাবে আলোচিত হইত। তৎকালে খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া একটা আদর্শ খাদ্য নির্ব্বাচনের চেষ্টা করা হইত। জড়বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষায় দেখা যায় একটা কল চালাইবার সময় তাহার কর্ম্মশক্তির সহিত তাপ বিকীরণের খুব নিগূঢ় একটা সম্বন্ধ আছে। Joule পরীক্ষা ও হিসাব করিয়া দেখান যে আবদ্ধ কোন জিনিস ৭৭২ ফিট উঁচু হইতে জলের উপর নিক্ষেপ করিলে এক পৌণ্ড ওজনের জলের তাপ ১ ডিগ্রি ফারেনহাইট অর্থাৎ এক কিলোগ্রাম জলের তাপ ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি পায়। কলকারখানায় ইহাই তাপের মানদণ্ড। জীবদেহের তাপমাত্রা প্রকারান্তরে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অর্থাৎ ভুক্ত খাদ্যের কি পরিমাণ হজম হইয়া বা অম্লজানসংযোগে দগ্ধ হইয়া কতটা তাপ উৎপন্ন হয় তাহাও হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে। ইহাকে ক্যালোরি (calorie) নাম দেওয়া হইয়াছে। এতকাল পর্য্যন্ত খাদ্যের গুণ ও পরিমাণ নির্দ্ধারণে এই ক্যালোরিরই অবাধ প্রভুত্ব ছিল। পুষ্টিকর খাদ্য নির্দ্ধারণ করিবার সময় কেবল এইটুকু দেখিলেই যথেষ্ট হইত যে সেই খাদ্যে যথোচিত পরিমাণে ক্যালোরি বা তাপোৎপাদক উপাদান আছে কি না। অবশ্য সকলের পক্ষেই একই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ক্যালোরি উপযোগী না ও হইতে পারে— বিভিন্ন ব্যক্তির

পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যক ক্যালোরির প্রয়োজন হইতে পারে। সাধারণ আকৃতির একজন মানুষ যে বেশী পরিশ্রম করে না তাহার পক্ষে ২৫ ক্যালোরি যথেষ্ট হইতে পারে। কিন্তু খুব পরিশ্রমী একজন লোকের পক্ষে ৫ ক্যালোরি দরকার।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে খাদ্য

প্রোটীন (আমিষ জাতীয় খাদ্য) কার্ব্বোহাইড্রেটস (শালিজাতীয় খাদ্য) ফ্যাটস (মাখন বা স্নেহজাতীয় খাদ্য) ও লবণ—ইহা শরীর রক্ষার জন্য আবশ্যক। মাংস ছানা ডিম প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাদ্য এবং শ্বেতসার প্রভৃতি শালিজাতীয় খাদ্য ঘৃত মাখন চর্বি প্রভৃতি স্নেহজাতীয় খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ইহার সহিত কিছু উদ্ভিজ্জ ও কিছু খনিজ লবণ সমান পরিমাণে হইলেই আমাদের খাদ্যের সকল অভাব মিটিয়া যায়। তবে খাদ্য রুচিরোচক করিবার জন্য কিছু মশলার দরকার। খাদ্য প্রস্তুত করিবার সময় অবশ্য তাহাতে যথোচিত পরিমাণে জল মিশাইয়া লইতে হইবে। ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য উক্তরূপ বিজ্ঞানানুমোদিত খাদ্যের সহিত কিছু বাজে জিনিসও লইতে হয় যাহাতে খাদ্য মানে (ওজনে) বাড়ে ও উদর পূর্ণ করিয়া আহারে তৃপ্তিদান করে।

পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া চলিলেই বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষের খাদ্য নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ হয়। আমিষজাতীয় এক খাদ্য যেমন অপর খাদ্যও তেমনি—উভয়েরই মূল্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একই। অপরাপর বিষয়েও এই একই রূপ নিয়ম। যে কোন খাদ্যই আহার করা যাউক না কেন তাহাতে ঐ কয় জাতীয় উপাদান নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ক্যালোরিতে থাকিলেই হইল।

কিন্তু ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এই সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা বেশ ভাল করিয়াই বুঝা গিয়াছিল। সে সময়ে মাংস দুগ্ধ ও ডিম্ব দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ফরাসী বৈজ্ঞানিকেরা অনেক বিবেচনা করিয়া মাংসের পরিবর্ত্তে জিলেটিন ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনই সুবিধা হইল না। শাকসব্জি, মাংস দুগ্ধ ডিম্ব—কোনটারই স্থান পূরণ করিবার উপযোগী কৃত্রিম খাদ্য পাওয়া গেল না। গত মহাযুদ্ধের সময়ও ঠিক এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। স্বভাবজাত খাদ্যের অভাব কৃত্রিম খাদ্যের দ্বারা পূরণের চেষ্টা সফল হয় নাই। এখন চরম সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে কৃত্রিম খাদ্য স্বাভাবিক খাদ্যের স্থান পূরণ করিতে কিছুতেই পারে না।

বৈজ্ঞানিক খাদ্যের এই নিস্ফলতায় জড়বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। স্বাভাবিক খাদ্য বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা যে যে রাসায়নিক উপাদান পাইয়াছিলেন সেই সেই উপাদান উপযুক্ত মাত্রায় থাকা সত্ত্বেও কেন যে কৃত্রিম খাদ্যভোজীরা পুষ্টিলাভ করিতে পারিতেছে না তাহা ভাবিয়া তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অথচ স্বাভাবিক যে কোন খাদ্য যেমন ভাবেই হউক খাইয়া তাহাদের পুষ্টিলাভে কোনই ব্যাঘাত ঘটিতে দেখা গেল না। এখন বুঝা গিয়াছে কোন একটি মাত্র প্রোটীন খাদ্য মানব দেহের নাই ট্রোজেন ঘটিত উপাদানের অভাব মিটাইতে পারে না। আর কেবল ক্যালোরি দ্বারা মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। কেবল ক্যালোরির হিসাব করিয়া খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ঐ কয় জাতীয় পদার্থ থাকিলেই যথেষ্ট হইল না। ক্রমে অনুসন্ধান করিতে করিতে জানা গেল প্রোটীনের অন্তর্গত আমিনো এ্যাসিড (Amino Acids) নামক একটী পদার্থ শরীর পোষণের জন্য অত্যাবশ্যক। দুইটী কার্ব্বন ৫টা হাইড্রোজেন একটী নাইট্রোজেন ও দুইটা অম্লজান পরমাণুতে এই বস্তুটী গঠিত। মোট ১৮ প্রকার আমিনো এ্যাসিড আছে। প্রোটীন খাদ্য পরিপাক পাইয়া এ্যামিনো এ্যাসিড উৎপন্ন হয়। ইহাতে বুঝা গেল বিজ্ঞানাগারে প্রস্তুত বিশুদ্ধ প্রোটিন এই আমিনো এ্যাসিডের অভাব মিটাইতে সমর্থ নহে।

খাদ্যের গুণাগুণ বিচার গেল বাহিরের ব্যাপার। ইহা ছাড়া একটা ভিতরের ব্যাপার আছে—খাদ্য হজম

করা। শরীরাভ্যন্তরে যে যে যন্ত্রের সাহায্যে যে যে প্রণালীতে খাদ্য পরিপাক পাইয়া শরীর মধ্যে গৃহীত হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে তাহাও বিবেচ্য। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে শরীরের পুষ্টিসাধনে ব্যাঘাত ঘটিলেই রিকেটস রোগ উৎপন্ন হয়। শরীরের অপরাপর অবস্থাতেও এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। দেহ মধ্যস্থ বিভিন্ন গ্রন্থি হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রস বাহির হইয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেও শরীর পোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। কোন খাদ্য ভোজন করিলে তাহা চর্ব্বণ করিবার সময় লালা বহির্গত হয়। তাহা গলাধঃকৃত হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্র বা পাকাশয়ে গমন করিলে অনেক রকম হজমি রস ত বাহির হয়ই তাহা ছাড়া পিত্ত এবং প্যানক্রিয়াস নামক গ্রন্থি রসও বাহির হয়। পূর্ব্বে চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করিতেন যে যে সকল স্নায়ুর ক্রিয়ায় পাচক রস নির্গত হয় তদনুরূপ স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়ায় পিত্ত ও প্যানক্রিয়াটিক রসও নিঃসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলি পরীক্ষায় এই ধারণা ভুল বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কুকুরের ক্ষুদ্র অন্ত্রের নাড়ী কর্ত্তন করিয়া দিয়া দেখা গিয়াছে উক্ত রস নিঃসরণে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। অন্ত্রে খাদ্য যে অবস্থায় গিয়া উপস্থিত হয় তাহা অম্লময়—অর্থাৎ পাকাশয়ের হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিড তৎসহ মিশ্রিত থাকে। এই এসিডের সংস্পর্শে আসিয়া অন্ত্রগাত্র হইতে একপ্রকার রস বাহির হইয়া রক্তস্রোতের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্যানক্রিয়াজে আসিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তথা হইতে আর একপ্রকার রস বাহির করায়। অন্ত্র হইতে নির্গত এই বিচিত্র রস একপ্রকার hormone বা রাসায়নিক দূত। ইহাকে secretin বলা হয়। পুষ্টিলাভের পক্ষে এই রসটির প্রয়োজন আছে। এইরূপে প্যানক্রিয়াজেরও বহির্মুখীন ও অন্তর্মুখীন রস নিঃসৃত হয়। ঐ অন্তর্মুখীন রসই insulin। এই রস প্রত্যক্ষভাবে রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহে চিনির শোষণ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

শরীর পোষণ ক্রিয়ায় endocrine glandsএর প্রভাবও অল্প নয়। শরীর পোষণ ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে thyroid gland অল্প সাহায্য করে না। এই সকল ব্যাপার হইতে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে শরীর পোষণ ক্রিয়ায় অভ্যন্তরীন রসস্রাবের প্রয়োজনীয়তা আছে। এ পক্ষে thyroid glandএর প্রভাব খুব বেশী। গ্রন্থির উপর endocrine gland গুলি প্রত্যক্ষভাবে শরীর পোষণে সহায়তা করে।

আবার মনে কোন ভাব প্রবল হইলে শরীরের উপর তাহার ক্রিয়া হয়। অত্যধিক ভয়ে শরীরের এমন কতকগুলি কার্য্য হয় যাহা স্বাভাবিক অবস্থায় হয় না। উত্তেজনা ক্রোধ বিরক্তি ব্যস্ততা উদ্বেগ—এই সকল ভাব শরীর ক্রিয়ার পক্ষে ক্ষতিকর। ক্রুদ্ধ জননীর বিষাক্ত স্তন্য পান করিয়া শিশুর মৃত্যু হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তের কথাও শোনা যায়। মনে এই সকল ভাব প্রবল হইলে ক্ষুধার উদ্রেক হয় না এবং সে সময় কিছু খাইলে তাহা হজম হয় না হয়ত বমি হইয়া যায় নয়ত উদরাময় হইতে পারে। আবার ইচ্ছা প্রত্যাশা সন্তোষ তৃপ্তি—এ সকল ভাব আহারের পক্ষে হিতকর অর্থাৎ তাহারা দেহের কোন অনিষ্ট করে না। এ সকল ভাবের আবেগের সময় আহার করিলে পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য হইয়া থাকে।

এইখানে একটা কথা ভাবিয়া দেখিবার আছে। জীব মাত্রেই কতকগুলি স্বাভাবিক ক্রিয়াধীন। তন্মধ্যে আহার অন্যতম। জীব মাত্রকে আহার করিতে হয় কারণ তাহার ক্ষুধা পায় এবং ক্ষুধা তাহাকে আহারে প্রবৃত্ত করে। তখন সে ভাবে না যে শরীর পোষণ করাই আহারের উদ্দেশ্য। সে জানে ক্ষুধার নিবৃত্তি করাই আহারের উদ্দেশ্য এবং সেই জন্যই সে আহার করে। শরীর পোষণ ক্রিয়া বলিয়া যে একটা বিদ্যা (science) আছে তাহার সৃষ্টি হইবার বহু কাল পূর্ব্ব হইতেই জীবগণ ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মাত্র আহার করিয়া আসিতেছে। তখন যখন এই বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয় নাই লোকে কেমন করিয়া খাদ্য নির্ব্বাচন করিত ?—শুধু

অভিজ্ঞতা ও স্বাভাবিক সংস্কার (natural instinct) দ্বারা। চলাফেরা শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে শরীরের যে ক্ষয় হয় তাহা পূরণ করিবার জন্য এবং শরীরকে সবল রাখিবার উপযোগী তেজ উৎপাদনের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। ক্ষুধা সেই প্রয়োজনের কথা জানাইয়া দেয়। ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্যই প্রধানতঃ খাদ্য গ্রহণ করা হয়। অনেক সময় লোকে প্রকারান্তর দিক দিয়া খাদ্যের দোষগুণ বিচার করিতে বসে।—তাহা কেবল প্রচুর পরিমাণে থাকিলেই হইল যাহার দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতে পারে। দুর্ভিক্ষের সময় কিম্বা অনির্দিষ্টকাল কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া লোকে আটক পড়ে কিম্বা সমুদ্রে জাহাজ বিপন্ন হইলে লোকে খাদ্যাখাদ্য [illegible] করে না—ক্ষুধার নিবৃত্তি করা চাই—তা সে যে জিনিস দিয়াই হউক।

কিন্তু ক্রমে বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার ফলে মানুষ ভাল মন্দ সুস্বাদ বিস্বাদ উপকারী অপকারী খাদ্যের বিচার করিতে শিখিল। এই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে অবশ্য অনেক সময় লাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎপূর্ব্বে অনুপযুক্ত খাদ্য ভক্ষণ করিয়া লোকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল অনেককে জীবন আহুতি দিতে হইয়াছিল। এরূপ অবস্থা কেবল মানুষেরই হইয়াছিল তাহা নয়। মানবেতর প্রাণীও খাদ্যাখাদ্যের গুণদোষ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ ও অখাদ্য বর্জ্জন করিতে শিখিয়াছে। ইহাও অভিজ্ঞতার ফল বলিতে হইবে এবং বংশানুক্রমে এই অভিজ্ঞতার ফল তাহারা ভোগ করিয়া থাকে।

কিন্তু ইহার মধ্যে আরও একটা কথা আছে। কতক প্রাণী উদ্ভিজ্জভোজী। সকল উদ্ভিদ অবশ্য তাহাদের খাদ্য নয়—কতকগুলি মাত্র তাহাদের খাদ্য। সেই খাদ্য যেখানে সুলভ সেইখানে তাহারা বাঁচিয়া থাকিতে ও সংখ্যায় বাড়িতে পারে। কিন্তু কোন দৈব দুর্ঘটনা ক্রমে সেইস্থানে সেই খাদ্যের একেবারে অভাব হইলে তাহারা যদি অন্য খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে তবেই বাঁচিয়া যায় নচেৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ দেশভেদে আবহাওয়ার ভেদ হেতু বলিয়া একই প্রকার উদ্ভিদ খাদ্য সর্ব্বত্র সুলভ নহে। এক স্থানের এক শ্রেণীর প্রাণীরা যে সুলভ খাদ্য গ্রহণ করে অন্যত্র তাহা দুর্লভ হইলে সেই শ্রেণীর প্রাণী অন্য খাদ্যে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়। আমিষভোজী প্রাণীদের অবস্থাও খাদ্য সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ। স্থানভেদে তাহাদেরও খাদ্য বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে।

মানুষ প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাস করিতেছে এবং তাহারা উদ্ভিজ্জভোজীও বটে আমিষভোজীও বটে। কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একই রকম উদ্ভিজ্জ বা প্রাণিজ খাদ্য জন্মে না—স্থানভেদে ইহাদের বিস্তর প্রকারভেদ হয়। সেই কারণে বিভিন্ন দেশের মানুষকে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইতে হয়। এবং এক স্থানের মানুষ যাহা খাদ্য সুস্বাদু ও সহজ মনে করিতে পারে অনভ্যাস হেতু অন্য স্থানের মানুষ হয়ত তাহা পছন্দ করিবে না কিম্বা তাহা হয়ত তাহার সহ্য হইবে না। তাহা হইলে অবস্থাটা এই দাঁড়াইল যে খাদ্য মানুষের উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত সেইটাই প্রধান কথা নয় যেখানে যে খাদ্য সুলভ সেই স্থানের মানুষের নিজেকে সেই খাদ্যের উপযোগী করিয়া লইতে হয়। নচেৎ সে বাঁচিতে পারে না। এই কারণে বৈজ্ঞানিকেরা খাদ্য বিচার পূর্ব্বক জীবজগৎকে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া খাদ্যানুসারে তাঁহাদের নামকরণ করিয়াছেন— উদ্ভিজ্জভোজী আমিষভোজী নিরামিষভোজী ইত্যাদি। খাদ্য হিসাবে দন্তের গঠনের তারতম্য বিশেষ হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ দন্তের গঠনের অনুযায়ীও করা হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর খাদ্যভোজী জীব যদি সেই খাদ্যের পরিবর্ত্তে অপর এক শ্রেণীর খাদ্য ভোজন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে পুরুষানুক্রমে তাহাদের দন্তের গঠনও পরিবর্ত্তিত হইয়া সেই খাদ্যের উপযোগী হইয়া উঠে। ভল্লুক কুক্কুর ও বিড়াল জীবদেহ তত্ত্বানুসারে একই শ্রেণীর জীব ছিল। তাহাদের খাদ্যও প্রথমে একই প্রকার ছিল অর্থাৎ তাহারা

আমিষভোজী জীব ছিল। কিন্তু ভল্লুক প্রায় নিরামিষ ভোজী হইয়াছে কুকুর মানুষের সংশ্রবে আসিয়া আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্যই ভোজন করিতে শিখিয়াছে আর বিড়াল আমিষভোজীই আছে। এই তিন শ্রেণীর জীবের দন্ত পূর্ব্বে একই প্রকার ছিল কিন্তু খাদ্যের বিভিন্নতায় তাহাদের দন্তের গঠনে পার্থক্য জন্মিয়াছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে না পারায় কয়েক জাতীয় মানুষ ও পশু পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। অল্প কিছুকাল পূর্ব্বে তাসমানিয়ান জাতীয় শেষ ব্যক্তির মৃত্যু হয়—এই জাতীয় আর এক ব্যক্তিও এখন জীবিত নাই। অষ্ট্রেলিয়া আন্দামান প্রভৃতি স্থানের আদিম অধিবাসীরা এই ভাবে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান জাতিরও বোধ হয় এই দশা উপস্থিত।

মানব সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় মানুষ কেবল শরীর পোষণের জন্য খায় না এমন কি আহার কালে সে কথা সে চিন্তাও করে না। সে খায় প্রধানতঃ ক্ষুধার তাড়নায়—ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য—উদর পূরণের জন্য। বিজ্ঞান সম্মত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিয়াই যে আহারে বিরত হয় না—তাহার পেট যত ধরে সে তত খায়। তবে যে মানুষ বাঁচিয়া থাকে এবং পুষ্টিলাভ করে তাহার কারণ সে যাহা খায় তাহাতে তাহার শরীর পোষণোপযোগী উপাদান যথেষ্ট পরিমাণেই থাকে। আর মানুষ বিচার পূর্ব্বক না খাইলেও সে যাহা খায় তাহা কতকটা পুরুষানুক্রমিক সংস্কার বশতঃ।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন মানুষের খাদ্যে প্রোটীন চর্ব্বি ও কার্ব্বোহাইড্রেট যথেষ্ট পরিমাণে থাকা চাই। কিন্তু এই বিধি পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমানভাবে খাটে না। যেমন সন্নিহিত চিরতুষারাবৃত প্রদেশের অধিবাসী এস্কিমো জাতি উদ্ভিজ্জ খাদ্য না খাইয়াও জীবিত থাকে। কার্ব্বোহাইড্রেট তাহার খাদ্য তালিকায় কদাচিৎ স্থান পায়। প্রোটীন ও চর্ব্বিতেই তাহাকে তুষ্ট থাকিতে হয়। কিন্তু প্রাচ্যদেশের লোকদের খাদ্যে কার্ব্বোহাইড্রেটের ভাগই বেশী। সুতরাং দেখা যাইতেছে বৈজ্ঞানিকদের নির্দ্ধারিত খাদ্য তালিকাই আদর্শ নহে। আসল কথা কি খাইব কি খাইব না—ইহাই প্রধান প্রশ্ন নয়। প্রধান প্রশ্ন হচ্চে—কি পরিমাণে খাইব এবং কখন খাওয়া বন্ধ রাখিব। দন্তের পরিষ্কারিতা সম্বন্ধে সমাধান এই প্রশ্ন দুইটীর উত্তরের উপর নির্ভর করিতেছে।

মানুষ আমার খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে সামাজিক আচার ব্যবহার ও প্রথা মানিয়া চলিতে হয়। সভ্যতার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আহার বিষয়েও পরিবর্ত্তন হইতেছে। নিত্য কত নূতন নূতন খাদ্যের উৎপত্তি হইতেছে। আহারের সময় পরিমাণ খাদ্যের প্রকারভেদ প্রভৃতি বিষয়ে সামাজিক বা আবশ্যকমত বাঁধাধরা নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও বাধ্য হইয়া খাইতে হয় আবার প্রচণ্ড ক্ষুধার সময়েও আহারে বিরত থাকিতে বাধ্য হইতে হয়। কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোজন করিয়া উদরকে ভারগ্রস্ত ও পাকস্থলীকে পীড়িত করিতে হয় আবার স্থল বিশেষে ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি না হইতেই আহার বন্ধ করিতে হয়। প্রকৃতির বিধানের এই সকল ব্যতিক্রম—গোদার উপর এই বিষফোঁড়া—ইহার ফল যাইবে কোথায়? আহার বিহার সম্বন্ধে জাতিগত আচার ব্যবহারের ফল সমগ্র জাতির উপর ফলিতে বাধ্য এবং ফলিতেছেও। পুষ্টি কারিতা ও অজীর্ণতার বড় নিকট সম্বন্ধ। আলো ও ছায়ার মত ইহারা পরস্পর বিপরীতধর্ম্মী। যেখানে আলো সেখানে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না কিন্তু আলোর অভাব হইলেই অন্ধকারের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় সেইরূপ শরীর পুষ্টিলাভ করিতে থাকিলে কথাই নাই। কিন্তু পুষ্টিলাভে ব্যাঘাত ঘটিলেই তাহার অনিবার্য্য ফল অজীর্ণতা। অধুনা অজীর্ণ রোগ দেশব্যাপী বলিলেই হয়। সুতরাং জাতির দৈহিক পুষ্টিলাভে যে ব্যাঘাত ঘটিতেছে সে কথাও অবিসম্বাদিত সত্য এবং আহারের দোষেই যে অজীর্ণতা দেশব্যাপী হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ মাত্র নাই।

মানুষ অনেক বিষয়েই নিজেকে বর্ত্তমান কাল দেশ ও পাত্রোপযোগী করিয়া লইয়াছে বটে কিন্তু খাদ্য বিষয়ে আমাদের পুরুষানুক্রমিক সংস্কার এখনও দূর হয় নাই। এখন কিন্তু সেই পূর্ব্ব সংস্কারের পরিবর্ত্তন করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। এখন ক্ষুধার নিবৃত্তি ও উদর পূর্ত্তির জন্য আহার করিলেই যথেষ্ট হইবে না। বিজ্ঞানের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ নির্দ্ধারণ করিয়া যাহা আমাদের দেহের পুষ্টিকার্য্যে সাহায্য করিবে তাহাই মাত্র উপযুক্ত মাত্রায় গ্রহণ করিতে হইবে। যাহা পুষ্টিকর নহে শরীরের পক্ষে যাহা অনাবশ্যক তাহা যতই মুখরোচক ও সুস্বাদু হউক না কেন তাহার লোভ সংবরণ করিতে হইবে। নচেৎ মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি সভ্যতা সবই বৃথা—পশুতে ও মানবে কোন পার্থক্য থাকিবে না। এইটা করিতে পারিলে জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারা যাইবে। যাহারা এটা পারিবে না তাহাদিগকে পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে চির বিদায় লইতে হইবে—সে জাতির অস্তিত্ব পৃথিবীতে থাকিবে না— যেমন অনেক জাতি ধরা পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

এখন আমাদিগকে শত শত সহস্র বৎসরের পুরুষানুক্রমিক অভ্যাস বদলাইতে হইবে। ইহা সাধনসাপেক্ষ। সৈনিকগণ যেমন তাহাদের চিরদিনের চলাফেরার অভ্যাস ভুলিয়া গিয়া নূতন প্রথায় চলাফেরা করিতে অভ্যস্ত হয় আমাদিগকে এখন খাদ্য সম্পর্কে তাহাই করিতে হইবে। আমাদের বিচারশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ণয় পূর্ব্বক তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণাকেও বিচারশক্তি পরিচালন পূর্ব্বক নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। শরীরের পুষ্টিসাধন ও পুষ্টিকর খাদ্য সম্বন্ধে অধুনা যে সকল নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের সন্ধান লইতে হইবে ও তদনুসারে খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে হইবে। পুষ্টিকর খাদ্য কি ভাবে পাক করিলে রসনার পক্ষে তৃপ্তিকর হইবে অথচ শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে না তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। রকমারি খাদ্য যাহা সহজে পরিপাক হয় অথচ পুষ্টিকর তাহাই বাছিয়া লইতে হইবে। তার পর খাদ্য গ্রহণে নিজেকে উপযুক্ত করিতে হইবে। আহার কালে মনের প্রসন্নতা ও প্রফুল্লতা থাকা আবশ্যক। আর ঘড়িধরা সময়ে ক্ষুধার উদ্রেক হউক আর নাই হউক খাইতেই হইবে—এ নিয়ম বদলাইতে হইবে। আপ রোচি খানা। আহার বিষয়ে সামাজিক প্রথার অনুসরণ করিলে বা অপর লোকের কথা চাহিয়া থাকিলে চলিবে না। তাহা ছাড়া আরও আছে। খাদ্যে রুচি জন্মাইবার জন্য দৈহিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করা চাই যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করা চাই প্রত্যহ শীতল জলে যথেষ্ট সময় স্নান করা চাই খোলা যায়গায় প্রচুর টাটকা তাজা বায়ু ও সূর্য্য কিরণ উপভোগ করা চাই।

এই সকল নিয়ম পালন করিলে শরীর সুস্থ থাকিবে এবং সম্ভব করিতে প্রকৃতির প্রতিরোধ সহ্য করিতেই হইবে।

প্রত্যেক চিকিৎসকের কর্ত্তব্য মানব জাতিকে বুঝাইয়া দেওয়া যে জীবন ও স্বাস্থ্যের উপর এই সকল নিয়ম পালনের ফল অপরিহার্য্য। আবার দন্ত চিকিৎসকের এ বিষয়ে একটি বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। দন্ত যাহাতে অকালে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া না পড়ে দাঁতে পোকা পড়িয়া গর্ত্ত না হয় দন্তমূল যাহাতে শিথিল না হয় এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখা দন্ত চিকিৎসকের কাজ। উপযুক্ত ভাবে খাদ্য গ্রহণ করিলে দন্ত ভাল থাকিবে। দন্তোদ্গমের পূর্ব্ব হইতে দন্ত চিকিৎসক সতর্কতা অবলম্বন করিলে এবং শিশুর পিতা মাতাকে যথোচিত উপদেশ দিলে তবে দন্ত চির কাল অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিবে। কেবল তাহাই নয়। কেবল শিশুর দন্ত রক্ষণাবেক্ষণ করিলেই যথেষ্ট হইবে না দন্ত চিকিৎসকের সকল কর্ত্তব্য পালন করা হইবে না। শিশুর পিতামাতা বিশেষত জননীর দন্ত যাহাতে ভাল থাকে তাঁহার খাদ্য যাহাতে সুজীর্ণ হয় তাহা দেখিতে হইবে। তবে তাঁহার সন্তানের দন্ত সুপুষ্ট সুপরিণত ও সুন্দর হইবে।

জন্মের অব্যবহিত পরেই শিশুর দন্তোদ্গম হয় না। দন্তোদ্গমের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শিশু তাহার স্বাভাবিক খাদ্য অর্থাৎ মাতৃস্তনদুগ্ধ খাইবে। সকল স্তন্যপায়ী জীবই এই নিয়ম পালন করে। কেবল মানুষই প্রকৃতির এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া শিশুকে কৃত্রিম খাদ্য দিয়া পালন করিবার চেষ্টা করে। তাহার ফলও হয় তেমনি। কৃত্রিম খাদ্য পুষ্ট শিশুর দন্ত খুবই খারাপ হইতে আরম্ভ হয়।

মাতৃস্তন্যে শিশুর যখন আর কুলায় না তখন তাহাকে এমন খাদ্য দিতে হইবে যাহাতে তাহার দেহের পরিপুষ্টি হয় ও স্বাস্থ্য ভাল থাকে আর দন্তগুলি সুদৃঢ় হইয়া পরিণত হইতে পারে। কোন খাদ্য কোন শিশুর পক্ষে কিরূপ উপযোগী হইতে পারে তাহার সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। শিশুর দন্তের পরিপুষ্টি ও পরিণতির পক্ষে কোন খাদ্য উৎকৃষ্ট—নিম্ন শ্রেণীর জীব জন্তুর উপর তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষার ফল দেখা গিয়াছে খাদ্যে চূণের উপাদান থাকিলেই তাহা প্রত্যক্ষভাবে দন্ত দৃঢ় করে না। খাদ্যের চূর্ণাংশকে অন্যান্য উপাদানের উপর নির্ভর করিতে হয়। দেখা গিয়াছে এ পক্ষে ভাইটামাইন A র উপযোগিতা খুব বেশী। ইহা দন্তের দৃঢ়ীকরণে চূর্ণকে সহায়তা করে। আবার কোন কোন খাদ্যে এমন উপাদান থাকে যাহার দরুণ চূর্ণ দন্তগঠনে সাহায্য করিতে পারে না। ফলে দন্ত নরম ভঙ্গপ্রবণ ক্ষয়শীল হইয়া পড়ে। পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে চাউল ও সাদা ময়দা সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিশু খাদ্য।

দন্তের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব সাধনে পুষ্টিকর খাদ্যের উপযোগিতা কতখানি তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। এ দিকে দন্ত চিকিৎসকগণের গবেষণার যথেষ্ট অবসর রহিয়াছে। মানুষে যা খায় এবং সেই খাদ্য ভোজনের ফলে তাহার কোন দন্ত কত দিনে পড়িয়া যায় কত দিনে তাহার আর একটাও দাঁত থাকে না—এ সকল দন্ত চিকিৎসকের অনুসন্ধানের বিষয়। দন্ত চিকিৎসকের জ্ঞাতব্য ও অনুসন্ধান যোগ্য বহু বিষয়ই এ যাবৎ উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। শিশুদিগের মধ্যে দন্তের ও মাড়ির রোগের যথেষ্ট প্রাবল্য দেখা যায়। বয়স্ক ব্যক্তিদিগেরও দন্তের অবস্থা ঐরূপ। শিশু ও প্রবীণ ব্যক্তিদের দন্তের স্বাভাবিক গঠন যে কিরূপ হওয়া উচিত তাহার কোন আদর্শ এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। দন্তের রোগের এই প্রাবল্যের জন্য দায়ী কি খাদ্য না অন্য কিছু? যদি তাহাই হয় তবে তাহার কারণ কি? দন্তের ভালমন্দ কি খাদ্যের গুণাগুণের উপর নির্ভর করে না খাদ্য চর্ব্বণের প্রণালীর উপর? দন্ত চিকিৎসককে এই সকল বিষয়ে অনুসন্ধান পরীক্ষা ও গবেষণা করিয়া সত্য নির্ণয় করিতে হইবে।

দন্ত চিকিৎসক এখন কেবল রুগ্ন দন্তের চিকিৎসা মাত্র করিয়া থাকেন। অতঃপর তাঁহাদিগকে prevention is better than cure নীতির অনুসরণ করিতে হইবে।

"দুর্গে দুর্গতি-নাশিনী।"

(গল্প)

[শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু]

এক

অসহযোগের জীমূতমন্দ্রভেরী স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তখনও সহরের প্রায় দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় পল্লীসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা জ্ঞাপক বহু যুক্তিবাদপূর্ণ রাশি রাশি প্রবন্ধের বিরাম নাই প্রতি প্রবন্ধেই প্রসঙ্গক্রমে সহরবাসীদিগকে আকুল আহ্বানে আবেদন—ওগো পল্লীতে ফিরিয়া এস

ল্লীকে উন্নত কর নারী ইতে তোমাদের মুক্তি আমাদের মুক্তি ভাবার মুক্তি। ইত্যাদি। প্রবন্ধগুলির মধ্যে বাগাড়ম্বর যে বেশী থাকিত তাহা নহে পল্লী-সংস্কার নব সম্বন্ধে যুক্তি তর্কও কিছু কম থাকিত না তবে সাধারণ শিক্ষিত কে কি রবে কাজ করিবে কেমন করিয়া সীর বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনাকে স্থাপন করতে পারিবে পল্লীর উন্নতি করিতে হইলে কি কি বিধানের দরকার তাহার কোন হিসাব নিকাশ পাওয়া কোন কাগজে হিব হয় নাই সে সকল নিরর্থক তোড়ভাবে বিচার বিবেচনা বা মীমাংসা কম লোকই করিয়া ছিলেন।

একদিন একটা সাপ্তাহিকে কোন অজ্ঞাতনামা পল্লীবাসীর পল্লীসংক্রান্ত একটা মর্মস্পর্শী উচ্ছ্বাস পড়িয়া সহরবাসিনী মঞ্জুলা একেবারে গলিয়া উঠিলেন। সেই দিন আফিস হইতে স্বামী জ্ঞানেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিবা মাত্র কোন আদর আপ্যায়ন না করিয়াই স্ত্রী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন— ওগো শুনছ চাকরী বাকরী ছেড়ে দেও ফিরে চল সহরে আর মন টিকছে না।

স্ত্রীর হঠাৎ এই উক্তি শুনিয়া জ্ঞানবাবু নারবে নাস্তি বিস্মিত হইয়া গেলেন। কারণ তাঁহার স্ত্রী মঞ্জুলা সহরের ক্রোড়েই লালিতপালিতা তাহার পিতৃপিতামহের ভিটা ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় কোন এক সুদূর পল্লীর বুকে এখনও লাগিয়া থাকিলেও সেখানে যাওয়ার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য মঞ্জুলার কপালে খুব কমই ঘটিয়াছে তাই আজ তিনি আদরিনী ভার্য্যার হঠাৎ এ ভাবান্তর দর্শনে অবাক্ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি একটা সোফার উপর শুইয়া পড়িয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন— মঞ্জু গান্ধীজীর শিষ্য হলে নাকি? হঠাৎ পল্লীর উপর এত মমতা যে?

জ্ঞানেন্দ্রনাথের পা দুই খানি আপনার কোলের উপর লইয়া মঞ্জুলা একটু গম্ভীর অথচ করুণ স্বরে কহিতে লাগিল না ঠাট্টা নয়। পল্লীতে আমি যাবই। সহরের ইটপাথরে তৈরী দেওয়ালের অন্ধকারময় ঘেরাটোপে বদ্ধ থেকে প্রাণ অতিষ্ঠ হোয়ে উঠেছে। নিত্য ধরাবাঁধা কাজ—সকালে উঠে চাকরকে বাজারের পয়সা দেওয়া ঠাকুরকে রান্নার তাড়া দেওয়া চাকরদের খাবার গোছানো খাওয়া গল্পের বই পড়া বসনভূষণের পারিপাট্য করে নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়া হয়ত একটু সেলাই করা আর নিশ্চিন্ত আলস্যে নিদ্রা দেওয়া এ রকম একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগছে না। পল্লীর প্রকৃতির মধ্যে— তার অনাবিল স্বাস্থ্যের মধ্যে—তার বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারলে জীবনটার অনেক নূতন রকম খোরাক্ পাওয়া যাবে। তা ছাড়া যদি পল্লীবাসী আমাদের সেবা চায় বা চেয়ে আছে তাদের আমাদের স্বাস্থ্যদান ও জ্ঞানদান করতে হবে—মায়ের মত বুকভরা স্নেহ প্রীতি দিয়ে তাদের ক্ষত বেদনায় প্রলেপ দিতে হবে। দেখে শুনে আমার মনে হচ্ছে আমাদের মত লোকেরই এখন পল্লীতে ফিরে গিয়ে তার পঙ্কোদ্ধারে প্রাণমন ঢেলে দেওয়া উচিত—পতিতোদ্ধারে যেমন করে একদিন নিমাই নিতাই আপন ভুলে লেগে পড়েছিল।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ পত্নীর মুখে আজ এই নূতন কথা শুনিয়া মনে মনে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। তিনিও একদিন এই পত্নীর প্রেমে পূর্ণ প্রকারে চাপায় মুগ্ধ হইয়া এক কথায় গভমেণ্টের উচ্চপদ ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন ও তাঁহার ছোট ভাইকে কলেজ হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া দুইজনে স্বাধীন ব্যবসায় লাগিয়াছিলেন। ব্যবসাটি উত্তরোত্তর উন্নতি করিতেছিল ও সম্প্রতি বেশ লাভজনক দাঁড়াইয়াছে। ছোট ভাই নন্দবাবু বয়সে অপরিপক্ক হইলেও জ্যেষ্ঠভ্রাতার শিক্ষকতায় ও সাহচর্য্যে অল্প দিনের মধ্যেই ব্যবসায় বুদ্ধিতে বেশ তীক্ষ্ণ ও হিসাব পত্রে বেশ পটু হইয়া উঠিয়াছেন। পল্লী ভিটার প্রতি জ্ঞানবাবুর চিরদিনই একটা আন্তরিক টান ছিল দেশে পিতৃ পরিত্যক্ত তিন মহলা চকমিলান ভগ্নপ্রায় দালানটি তিনি দুই বৎসর পূর্ব্বে বহু অর্থব্যয়

করিয়া মেরামত করিয়াছিলেন। নিজেদের অমনোযোগিতা ও রক্ষণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখনও যে কয়খানি তালুক ও [illegible]তি নিলাম বিক্রয়ের কবল হইতে কোন মতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল ফেলিয়া ছাড়িয়া তাহার সবিত আয় দুই তিন সহস্রের কম ছিল না [illegible]তীত বাগান পুষ্করিণী খামার জমী প্রভৃতি ভূসম্পত্তি যাহা আছে খনার উপদেশানুযায়ী খাটিয়া খাটাইয়া বা বাঁধে ছাতি বাগিয়া চালাইতে পারিলে তাহাতে একটা বড় সংসারে খোরাকের অভাব কোন দিনই অনুভব করিতে হয় না।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মনে করিয়াছিলেন আরও বৎসর দশ কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসাটিকে আরও বৰ্দ্ধিতায়তন ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিয়া নন্দকে তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তিনি সপরিবারে পল্লী জননীর স্নেহ শীতল অঙ্কে বিশ্রাম [illegible] লইবেন। প্রিয়তমা পত্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বুঝি তাহাকে আজ সে ইচ্ছা বিলম্বিত সময়ের অগ্রবর্ত্তী করিতে হয়। জ্ঞানেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিবার পর বলিলেন—দেখ মঞ্জু পল্লীতে ফিরে যাওয়ার সার্থকতা কতখানি আমি বুঝি। অবশ্য এ কথা ঠিক্ যে আমাদের মত সহরবাসীর পল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করে গ্রাম গ্রাম নানারূপ অসুবিধা ভোগ কর্ত্তে হবে। তার উপর পল্লীর স্বাস্থ্য সহরের চেয়ে অনেকাংশে নিকৃষ্ট—ম্যালেরিয়া কালাজ্বর আমাশা কলেরা প্রভৃতির লীলাভূমি আমাদের গ্রাম। নিজের জীবনের জন্য তত উৎকণ্ঠিত নই—যত তোমার ও বাণীর জীবনের জন্য চিন্তিত। তোমাদের যদি কিছু হয়—

বাণী ইহাদের তিন বছরের মেয়ের নাম। মঞ্জুলা জ্ঞানেন্দ্রনাথের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—দেখ জীবনটা ত মরণের জন্য আয়োজন। মরব ত একবার। মুক্তি ভোগের মধ্য দিয়ে নয়—ত্যাগের মধ্য দিয়ে। পল্লীতে ফিরে আমাদের ব্রত হবে—জাতিপাত্র নির্ব্বিশেষে মানুষের সেবা ধর্ম্ম হবে—নর নারায়ণের পূজা কর্ম্ম হবে—লোকের হিত সাধন। এতে বিসর্জ্জন দিতে হবে অহমিকার হোম আহুতি দিতে হবে উচ্চ পদের গরিমা অভিমান করে যে শয়তানের শিক্ষা প্রচার [illegible] পয়সা রোজগার করে মানুষ যে চাকরি [illegible] হবেছ [illegible] সুবিবেচনার সঙ্গে পয়সা খরচ করে কি আনন্দ লাভ করা যায়—এস দেখি। সমষ্টির কল্যাণ করতে গিয়ে ব্যষ্টির প্রাণের মায়া রাখলে কি চলে? মঞ্জুলার মুখে একটা স্বর্গীয় জ্যোতি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল ঘুমবিহীন [illegible] সময়ে অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি তাহার [illegible] রক্তিম [illegible] একখানি সুবর্ণ কমলের মত প্রতিভাত হইতে লাগিল। জ্ঞানেন্দ্রের অন্তরাত্মা যেন আজ [illegible] করিয়া তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া [illegible] করিতেছে এবং যেন তাহার মনোভাব জানিবার জন্য ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় উদগ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

এমন সময় হাসির ঘুম ভাঙ্গিয়া শেফালির মত শুভ্র কচি ঠোঁটে বাণী [illegible] প্রবেশ করিল। দুইটি স্নেহ নিবিড় বাহু দিয়া [illegible] বেষ্টন করিয়া আধ কচি আধ বুলিতে প্রাণকাড়া স্বরে বলিতে লাগিল—বাবা মা বললে—আমরা ঠাকুরদাদার দেশে যাব সেখানে নাকি অনেক আম কাঁঠাল লীচু আছে—বড় [illegible] আছে—যারা ঝগড়া করে না। বাবা তুমি নিয়ে যাবে? সেখানে কতদিন থেকে—নদীতে নাইব—পাখীর গান শুনব—চাঁদ মামার জ্যোৎস্না [illegible] তোমার বুকের উপর ঘুমিয়ে পড়ব। [illegible] চল না বাবা—

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাণীর টুলটুলে গালে একটি চুমো খাইয়া তাহাকে কোলে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—[illegible] ফিরে যাওয়াই স্থির। দিন সাতেকের মধ্যে রওনা হব। কালই নায়েব মহাশয়কে চিঠি লিখে দিচ্ছি।

দুই

মধুমালতী গ্রামখানি এককালে যে সমৃদ্ধিশালী ছিল তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থার মধ্যেও তাহা বেশ বুঝা যায়।

এই গ্রামের বর্ত্তমান জমিদার শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জবিহারী রায়। প্রবল প্রতাপশালী জমিদার—সন্দেহ নাই কেন না তাঁহার প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাউক না খাউক নায়েবের হুমকীতে ও পাইকের লাঠির ভয়ে প্রজারা কিস্তিতে কিস্তিতে খাজনার টাকাটি কড়ায়গণ্ডায় কাছারীতে আসিয়া গণিয়া দেয়। নিকুঞ্জবাবু সেকাল ও একালের একটা অপূর্ব্ব খিচুড়ী বিশেষ। তাহার প্রাসাদোপম অট্টালিকায় বিলাতী আসবাবপত্র ও সাজসজ্জা যথেষ্ট আছে আবার ঠাকুরদালানে বারো মাসে নিয়মিত তের পার্ব্বণ হইয়া থাকে এবং কখনও বা তাঁহার মজ্লিসে হরিসংকীর্ত্তন কখনও বা জাব নাচে গজলিস জমিয়া উঠে। তিনি শুনা যায় যে তিনি একজন নিকৃষ্ট চাষার চেয়েও বিশ্বাসী অথচ গ্রামের মধ্যে বা নিকটে কোনো ছোট বড় রাজপুরুষ আসিলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা ও আদর আপ্যায়ন করিবার কোট প্যান্ট পরিয়া সম্পূর্ণ বিদেশী খানা টেবিলে সাজাইয় একান্ত অনুগত ভৃত্যরূপে হাজির থাকেন। যাহা হউক আজকালকার শিক্ষিত পল্লীবাসী আমার তিনি একটি যে উজ্জ্বল জীবন্ত আদর্শ—তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সম্মুখে শ্যামাপূজা আসিতেছে। জমীদারবাড়ী ছুতার প্রতিমা তুই মেটে গড়া শেষ হইয়াছে। পাড়ার ছেলেরা ঠাকুরদালানে আসিয়া দল পাকাইয়া হট্টগোল করিতেছে। প্রৌঢ় পেটসর্ব্বস্ব নায়েব মহাশয় সজিনার ডাটার ন্যায় মোলায়েম গোঁফগুলি উর্দ্ধদিকে পাকাইয়া তুলিবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে মাঝে মাঝে এক একবার চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া ঘুরিয়া যাইতেছেন বাচাল ছেলে পিলেদের এক একবার ধমক দিতেছেন ও পটুয়াদের হাত চালাইতে তাড়া দিতেছেন।

বাবুর বৈঠকখানায় বহু লোকের সমাগম। কেহ ফর্দ্দ করিতেছে কেহ গল্প করিতেছে কেহ টিপ্পনী কাটিতেছে একদল তাস পিটিতেছে আর একদল পোয়া বারো ছ তিন নয়ের তুমুল নাদে আসর সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। বৈঠকখানা ঘরের সম্মুখেই এক প্রকাণ্ড শতরঞ্চের উপর পাঁচ সাত জন পুরোহিত বসিয়া বিরাট রকমের শাস্ত্রালোচনা ও তর্ক জুড়িয়া দিয়াছেন চীৎকার করিয়া করিয়া যাঁহার গলা যত ক্ষীণ কাতর হইয়া পড়িতেছে তিনি তত পৈশাচিক প্রবলতার সহিত নাসা গহ্বরের মধ্যে নস্য ঠাসিয়া দিতেছেন। চাকর বাকরদের এখন হইতেই তামাক সাজিতে ও বাবুর ফরমাইস খাটিতে খাটিতে ঘর্ম্ম ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

কর্ত্তা এক সাড়ে সাত হাত লম্বা ফরাসের উপর মুখ লাগাইয়া তাকিয়ায় ঠেস দিয়া পায়ের উপর পা মুড়িয়া নির্ব্বাকভাবে বসে করিয়া আছেন। মাঝে মাঝে যদ্দকাবীর প্রশ্নে দুই এক কথায় উত্তর দিতেছেন যে দিকে গোলমাল বেশী গড়াইতেছে—সেইদিকে ঈষৎ হাত তুলিয়া ওহে আস্তে সব বলিয়া খুব গম্ভীর গোছের হাত নাড়িতেছেন। পূজা সংক্রান্ত যাহার যাহা উপদেশ শ্রবণ করিবার ছিল আমলা কর্ম্মচারীরা তাহা শুনিয়া একে একে স্বকার্য্য ব্যপদেশে চলিয়া গেল। পূজার উপকরণাদি ছেলে মেয়ে আত্মীয় স্বজনের কাপড় চোপড় পোষাক আশাক বিলাস দ্রব্যাদি ও নিমন্ত্রণের ঘি ময়দা সন্দেশ রসগোল্লা প্রভৃতি ক্রয় করিবার বা বায়না দিবার ভার এক একজন কর্ম্মচারীর উপর পড়িল। অবশেষে নিকুঞ্জবাবু সদর নায়েব মহিমবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন একটা দোয়াত কলম সাদা কাগজ নিয়ে এখানে এসে বস নিমন্ত্রিতদের ফর্দ্দ কর্ত্তে হবে। তারপর বন্ধু বান্ধবদিগের প্রতি চীৎকার করিয়া বলেন ওহে তোমরা এখন গোলাটোপাগুলো বন্ধ কর সব উঠে এসে আমার চার পাশে বস নিমন্ত্রিতদের একটা ফর্দ্দ তৈরী কর্ত্তে হবে—তোমাদেরও পরামর্শ চাই!

সঙ্গে সঙ্গে জমিদারবাবুর কথমত কাজ হইল—সকলে গল্প গাছা ও আড্ডা খেলা ছাড়িয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক ঘেরিয়া মিশ্রীর দানার মত জমিয়া পড়িল। কাহাকে নিমন্ত্রণ করা যাইবে—কাহাকে যাইবে না সেই সূত্রে কে সমাজে বাধে—কাহার জাতি গিয়াছে—

কাহার ছেলে নীচু ঘরে বিবাহ করিয়াছে—কাহার সম্বন্ধীয় কন্যার ননদের কুলত্যাগের সংবাদ শোনা গিয়াছে ইত্যাদি নানারূপ সলা পরামর্শ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হইতে লাগিল। যাহাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল নায়েব মহাশয়ের শ্রীকর ধৃত কাগজের সীটে [illegible] কালি দিয়া তাঁহাদের নামধাম স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া লওয়া হইল। বাহিরের গ্রামগুলি সারিয়া গ্রামের ভিতরকার ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের নামের ফর্দ্দ ধরা হইল।

একজন প্রস্তাব তুলিলেন— গোপাল বসু মহাশয়কে যেন কোন মতে নিমন্ত্রণ করা না হয় কারণ তিনি মুখিয়া কুলীন হইয়া সম্প্রতি পুত্রের বিবাহ এক বিশ্বাসের ঘরে দিয়াছেন। গোপাল বাবুর এক মাতব্বর এই দলের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তিনি জমিদার মহাশয়ের নিকট এই বলিয়া আপত্তি পেশ করিলেন ইহাতে গোপাল ভায়ার কোন দোষ নাই। তাঁহার অবাধ্য পুত্র বি এ পাশ করিয়া নিজেকে একজন কেষ্ট বিষ্ণু জ্ঞানে নিজেই ঐ সম্বন্ধ গোপনে গোপনে স্থির করে ও মেয়ে দেখিয়া পছন্দ হওয়ায় কয়েকজন বন্ধু বান্ধব ও কলিকাতা হইতে একজন পুরোহিত যোগাড় করিয়া বিবাহ করিয়া আসে। গায়ে হলুদের দিন পিতার নিকট এক মার্জ্জনা ভিক্ষা প্রার্থনাপূর্ণ চিঠি আসে। বিবাহ ছেলের মামা বাড়ী হইতে সম্পন্ন হয় গোপাল বিবাহের রাত্রে এক প্রকার অভ্যাগতের ন্যায়ই নিরপেক্ষভাবে অভুক্ত অবস্থায় সেখানে হাজীর ছিলেন। নিকুঞ্জবাবু সপার্ষদ বিচার করিয়া ঠিক করিয়া দিলেন যে যদি গোপাল বসু মহাশয় পুত্রকে অবিলম্বে ত্যাজ্য করিতে প্রতিশ্রুতি দেন তাহা হইলে তাঁহার বাটীতে আগামী পূজায় বা পরবর্ত্তী কোন সামাজিক কার্য্যে তিনি নিমন্ত্রিত হইবেন—নচেৎ নহে।

মনতোষ দাস বহুকাল ধরিয়া বাবুদের সরকারে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। তাহার প্রধান চাকুরী নিকুঞ্জ বাবুর মোসাহেবী করা। অন্দরে বাহিরে তাঁহার অসীম প্রতাপ। ঘোর কৃষ্ণবর্ণের চেহারা বেঁটে খর্ব্বাকৃতি পৃষ্ঠদেশ ধনুকের ন্যায় নাকটি বেশ প্রলম্বিত হইয়া আসিয়া হঠাৎ গোপের উপরে একেবারে চেপ্টা হইয়া গিয়াছে কাণ দুটি দেওয়াল হইতে প্রবর্দ্ধিত ছোট ছোট দুখানি সাইনবোর্ডের মত মাথার মধ্যস্থলে এক গাছও কেশ নাই অথচ চারিপাশ হইতে চুলগুলি আঁচড়াইয়া এমন চমৎকার কায়দায় সেই [illegible] সংগুপ্ত করিয়া রাখা হইয়াছে যে কোন [illegible] তাঁহার কেশ বিন্যাস দেখিয়া পুরাদস্তুর ধাঁধা বাধিতে পারে। মনতোষের একটি ভাগ্নি বিবাহের [illegible] বৎসরের মধ্যে অপুত্রক অবস্থায় বিধবা হইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া আসে। মনতোষের বড় ভাই বহু কাল পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন প্রৌঢ়া ভ্রাতৃবধূ কন্যাকে পা[illegible] দেওয়ার [illegible] কাশীতে তাঁহার বৃদ্ধা মাতার নিকট চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং কন্যাটির একমাত্র অভিভাবক এখন মনতোষ। নিকুঞ্জবাবু মাঝে মাঝে [illegible] মনতোষের বাড়ী গমন করেন জমিদারের আশ্রিত পোষ্যবর্গ বলিতেন— সেখানে দাবা খেলিতে যান কিন্তু দুষ্ট লোকে অন্য একটা বদনাম রটায়। কিন্তু যাহা হউক সে কথার প্রয়োজন নাই এখন। বাবুর বৈঠকখানার চলমান প্রসঙ্গের অনুসরণ করা যাক।

মনে[illegible] ধরিয়া তাহার স্বভাব রীতি অনুযায়ী এ[illegible] কথায় অল্প বিস্তর ফোড়ন দিতেছিলেন। গোপালবাবুর নিমন্ত্রণ বন্ধ হইয়া গেলে মোসাহেব কুল চূড়ামণি বাঘের ন্যায় নিকুঞ্জবাবুর পশ্চাদ্দেশ হইতে লাফাইয়া আসিয়া তাঁহার সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং [illegible] মন্দভাবে ঘর্ষণ করিতে করিতে নিবেদন করিলেন— বাবুমশায় আমার একটা আর্জী আছে। [illegible] গ্রামের হরিশ মিত্রের ছেলের আস্পর্দ্ধা [illegible] বোধ হয় সকলেই জানেন, তার ম্লেচ্ছাচার স্বেচ্ছাচার ও নৈরাকারের কথা বাবু আপনিও অনেক দেখেছেন ও শুনেছেন। কলকাতার হোটেলে সে রোজ [illegible] পক্ষীর মাংস উদরস্থ করে—একথা অনেকে জানে। তা ছাড়া সমাজের চক্ষে ধুলি দিয়ে ছাধন যে কত কাণ্ড করেছেন তার

নামিতে হয় যাহাদের স্ত্রী পুত্রের নিকট শতগ্রন্থিযুক্ত কাপড়ও শাল দোশালার ন্যায় মূল্যবান যাহারা অসুখে ডাক্তার পায় না—ঔষধ পায় না—উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা পায় না তাহাদিগের এ ত দুর্গোৎসব নহে—দুর্গতির উৎসব। এ মহা সমারোহের সূচনা। তাহাদের ম্লান মুখে আজ হাসি গান কই?

জ্ঞানেন্দ্রনাথ সপরিবারে আজ দুই বৎসর কাল স্বগাম মধুমালতীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পল্লীর পুনরুদ্ধারে তাহারা স্বামী স্ত্রীতে একান্ত সমর্পিত প্রাণ হইয়া লাগিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যেই গ্রামে বেশ একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামের প্রধান দৈত্য ছিল ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠা কালাজ্বরও তৎসঙ্গে একটু আধটু দেখা দিতেছে। কলিকাতার একটি পল্লী সবক বিদ্যালয়ে অবসরমত পাঠ সমাপন করিয়া তাহার ছোট ভাই নন্দবাবু বেশ একটি ছোটখাটো ডাক্তার হইয়া উঠিয়াছিলেন ছুটির দিন হইলেই গামে আসিয়া দাদা ও বউদিদিকে তিনি স্বাস্থ্যধর্ম্ম বিষয়ে একটু একটু লেক্‌চার্ দিয়া এব একটা ম্যাজিক লণ্ঠন কিনিয়া তৎসাহায্যে কিরূপ করিয়া ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি কিসে নিবারিত হয় কেমন করিয়া চিকিৎসিত হইতে হয় রোগ জীবাণু কাহাকে বলে কি ভাবে সংক্রামকের হাত এড়াইতে হয়—এই সকল বিষয়ে বেশ সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়া যাইতেন। এই বক্তৃতা শুনিবার আগ্রহ গ্রামের নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং এই বক্তৃতায় যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছু কাজ হইতেছে—তাহা পল্লীর মধ্যে ব্যাধি পীড়িতের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার দ্বারা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল।

জ্ঞানেন্দ্রনাথের এক সম্বন্ধী ঐ মহাকুমার সরকারী হাসপাতালের ডক্তার সুযোগ পাইলে তিনিও আসিয়া জ্ঞানেন্দ্রকে শিক্ষাদান করিয়া যান। জ্ঞানেন্দ্রনাথ একটি আদর্শ গোশালা স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে আট নয়টি গরু রাখা হইয়াছে। তাহাদের পশ্চাতে একটি মাত্র চাকর আছে সে রাত্রের জন্য মাত্র সামান্য খোল্ বিচালি কাটিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখে ও সারা দিন গোচর ভূমিতে মুক্ত বায়ুর মধ্যে গরুগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া রাখে। অন্যান্য কাজ মঞ্জুলাই দেখে। গরু গুলির সেবার জন্য একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি গো চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী।

টোটকা গাছ গাছড়ার পরিচয় ও প্রয়োগ নৈপুণ্যে মঞ্জুলা তাহার মা র নিকট থাকিয়া আগে হইতেই বেশ ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছেন এই সেবাব্রতে লাগিয়া উহার চর্চ্চায় তাহার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। তার উপর তাহার আগ্রহ ও আনুকূল্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথের বাস্তু ভিটা সংলগ্ন এক টুক্‌রা জমীতে একটি গার্হস্থ্য ভেষজ উদ্যান রচিত হইল। একটি মালীর সাহায্যে মঞ্জুলা তাহার সমস্ত তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন। গ্রামে কাহারো কোন সামান্য অসুখ করিলে এই স্থান হইতে লতাপাতা বনৌষধি সহজে সংগৃহীত হইয়া ব্যবস্থা ও পরামর্শসহ অভাবগ্রস্তের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইত।

ম্যালেরিয়ার কুইনাইন্ যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক ও মহৌষধি—তাহা জ্ঞানেন্দ্রনাথ হাতে কলমে ভালো রকমই বুঝিয়াছেন। সেইজন্য এই সময়ে অন্নবস্ত্র অপেক্ষা কুইনাইন বিতরণ অধিক প্রয়োজনীয় জ্ঞানে অকাতরে কুইনাইন দান করেন কখনও বা মঞ্জুলার অগজের প্রেস্ক্রিপসন অনুযায়ী প্রস্তুত জ্বরের মিক্সচার প্রজাদিগকে বিলি করিয়া থাকেন। পাড়ার হোমিওপ্যাথিক ও কবিরাজী হাতুড়েগণ উহাতে উগ্র বিষ আছে বেশী দিন ব্যবহার করিলে মৃত্যু হইতে পারে'—এই কথা বলিয়া অশিক্ষিত গ্রামবাসীদিগকে নিরস্ত করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করে বটে কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারে না। জ্ঞানেন্দ্রনাথ শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিয়া থাকেন— আমার প্রজারা সবাই নীলকণ্ঠ হ য়েছে কালান্তক বিষ হাস্‌তে হাস্‌তে হজম কোরে ফেলতে পারে।

গ্রামে ফিরিয়া মঞ্জুলার খাটুনীর আর অন্ত নাই। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বিশ্রামের অবসর থাকে না —আজ ও পাড়ার নম শূদ্রদের একটি মেয়ের পা

পড়িয়া গিয়াছে তাহার জন্য লতা পাতা সংগ্রহ করিয়া বা মলম প্রস্তুত করিয়া লাগাইতে হইবে। চাষাধোবাদের একটি ছেলে এ বৎসর মাহানা পায় না টাকা যোগাড় করিয়া মাষ্টারের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। বিষ্ণু মাহাতীর মা'র মাথায় পেয়াদা লাঠি মারিয়াছে—তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে। গোয়ালাদের বউ রোগা ছেলে কোলে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহার পথ্য বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাঁচী পাগলী একখানা ছেঁড়া কাপড়ের আশায় বসিয়া আছে—যোগাড় করিয়া দিতে হইবে ব্যবস্থা। আবার কয়টি ছেলে আহার করিবে—তাহাদের নিয়মমত খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। পাড়ার বাগ্দীর একটি ভদ্র গৃহস্থের বধূ নিঃসঙ্গ অবস্থায় টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে। ঘড়ী ধরিয়া তাঁহাকে ঔষধ সেবন করাইয়া ও সুযোগ মত তাহার একটু সুশ্রূষা করিয়া আসার বিশেষ দরকার। এইরূপ সহস্র কাজ করিবার থাকে। তবে তাহার কোনও অতৃপ্তি বোধ নাই। মাত্র নাই চক্রবালের স্নিগ্ধ জ্যোতি কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে হস্ত দুইখানি বিশ্বকল্যাণে আত্মনিয়োগের জন্য পক্ষিণীর পক্ষপুটের ন্যায় চির প্রসারিত। সেবার পরিপূর্ণ উন্মাদনায় সরলা নিজেকে ভুলিয়াছে—এমন কি নিজের স্বামী কন্যাকে পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে বিস্মৃত হইয়া যায়।

জ্ঞানেন্দ্রনাথেরও কাজের কিছু কমতি নাই। কাজ করিতে করিতে প্রায় তিনি স্নানাহারের সময় পর্য্যন্ত পান না—বিশেষত এ সময়। গ্রামের দুই চারিজন গৃহস্থের পাঁচ সাতটি ডানপিটে হতচ্ছাড়া ছেলেকে গড়াইয়া পিটিয়া ঘষিয়া মাজিয়া আপনার কর্ম্মীদল গঠন করিয়া লইয়াছেন—উঁহাদের সহিত চাষাপাড়ার পনের কুড়িটি যুবক আসিয়া জুটিয়াছে। তাহার উপর গ্রামের কয়েকটি কলেজের ছাত্র পূজার ছুটিতে বাটী আসিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথের প্রতি অল্প বিস্তর সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে দুই একজন অগ্রগামী ছোকরা মালকোঁচা বাঁধিয়া তৎপরতার সহিত কাজে লাগিয়াও গিয়াছে। এক দল ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের দিবারাত্র পালা করিয়া শুশ্রূষা করিতেছে ও ঔষধ যোগাইতেছে অন্যদল পুষ্করিণীসমূহের শৈবাল দাম প্রভৃতি পরিষ্কার করিতেছে অথবা ইজারা লইয়া পুষ্করিণীগুলি হইতে মাছ উঠাইতেছে আর একদল জঙ্গল ও রাস্তার দুই পার্শ্বস্থ জল নিকাশের নালীগুলি কাটিয়া গভীর ও ক্রমঢালু করিয়া দিতেছে আর একদল হয়ত যে সকল নিম্ন শ্রেণীর ছোট ছোট ছেলেপিলেরা নৈশ বিদ্যালয়ে পাঠ করে তাহাদিগকে ভাল ভাল শিক্ষাপ্রদ ছবি দেখাইয়া প্রয়োজন মত দেশী তাঁতের বোনা কাপড় জামা চিড়া মুড়কী বাতাসা বা অন্যান্য খাবার বিলাইতেছে। যে সকল কচি ছেলেদের বাপ মার বাড়ীতে গাভী রাখিবার সঙ্গতি নাই—তাহাদিগকে নিয়মিত দুধ যোগান প্রভৃতি নানারূপ কাজ করিয়া বেড়াইতেছে। আনন্দময়ীর আগমনে এই সকল কর্মপাগল প্রাণগুলির আনন্দ কোলাহলের মধ্য দিয়া সচকিত হইয়া উঠিয়াছে।

দক্ষিণ পাড়ায় যাইবার রাস্তাটা বর্ষাকালে বরাবর কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল হয়। গতবারে জ্ঞানেন্দ্রনাথের চেষ্টায় এই স্থানটার সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। কিন্তু এবারে শ্রাবণ মাস হইতে পুনরায় পুরাতন অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার উপর রাস্তার দুই পার্শ্বে এত জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে যে দিনের বেলায়ও অনেকে চলিতে ভীত হয়। আজ পঞ্চমীর প্রভাতে জ্ঞানেন্দ্রনাথের কর্মীসেনা আসিয়া কোদাল কুড়ুল ও দা লইয়া একনিবিষ্ট ব্যগ্রতায় এই কাজের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানবাবু সে শ্রেণীর নেতা ছিলেন না যিনি বা অনুগামীগণকে মাছ ধরিতে জলে নামাইয়া দিয়া নিজেরা কোঁচা দুলাইয়া ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া হুকুম করিবেন ও রগড় দেখিবেন। তিনি নিজে যে কাজ করিতে দুর্ব্বলতা বা অপমান বোধ করেন সে কাজ করিতে কর্ম্মীদলকে কখনও পরামর্শ দেন না—তা হউক না কেন তাহারা বয়সে ছোট জাতিতে ছোট বিদ্যায় ছোট বা ধনে ছোট তাই ছেলেদের সঙ্গে তিনিও আজ গাত্রে কাদা মাখিয়াছেন।

এই সেবা ব্রতধারী শিক্ষিত ধনী সন্তান জ্ঞানেন্দ্রনাথের মাটি মাখা ধুলি ধুসরিত অবয়ব মাধুর্য্য শ্রী আজ সত্যেন্দ্রনাথের মাটি শীর্ষক কবিতাটির কয় ছত্র স্মরণ করাইয়া দিতেছে —

এই যে মাটি এই যে মিঠা
এই যে চির চমৎকার।
মাটির মাঝে প্রাণের খেলা
মাটিই প্রাণের পারাবার।
মাটি আবার প্রাণের কাঠি
মাটির মাঝে উদয় হয়
যে মাটি ভিড়িছে বে
সে মাটি ঐই মানুষ হয়।

যাহাহউক জ্ঞানেন্দ্রনাথের সহিত ছেলেরা আনন্দে উৎসাহে মাটি কাটিতেছে জঙ্গল ঝুড়িতেছে এমন সময় কৈবর্ত্তপাড়ার পাঁচুদাস ব্যস্ত হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া জ্ঞানবাবুর পদপ্রান্তে শুইয়া পড়িল তাহার মাথার একধার হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে সর্ব্বদেশে আঘাতচিহ্ন দেখিয়া বোঝা গেল —বেচারা প্রহারের চোটে অদ্ধমৃত হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি তাহার মাথাটি কোলের উপর উঠাইয়া লইয়া একজন কর্ম্মীকে জল আনিতে ইঙ্গিত করিয়া কাপড়ের অগ্রভাগ দিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

কর্ম্মীরা পাঁচুদাসকে ঘেরিয়া লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত মধুচক্রের ন্যায় গুঞ্জন করিতে লাগিল—মুখে তাহাদের অজ্ঞাত অত্যাচারীর প্রতি অব্যক্ত ক্রোধের আভাস চক্ষে তাহাদের সহানুভূতির সুকোমল প্রস্রবণ বক্ষে তাহাদের রুদ্ধ আবেগের তরঙ্গ হিল্লোল। তাহাদের মধ্যে দুই একজন জ্ঞানেন্দ্রনাথের সহিত মিলিয়া পাঁচুদাসের শুশ্রূষা করিতে লাগিল একজন বাড়ী হইতে একখানা তালবৃন্ত ও অন্য এক জন একবাটি গরম দুধ লইয়া আসিল। পাঁচু কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থ হইবার পর জ্ঞানবাবুর পদদ্বয় ধারণ করিয়া ক্ষীণ কাতর স্বরে কহিতে লাগিল ছোটবাবু আমাকে রক্ষা করুন। জমিদার বাবুর নাইব একটু আগে আমার বাড়ীতে গিয়ে মেরে আমার আধমরা কোরে ফেলেছে।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাহার হাত দুখানি পায়ের উপর হইতে ধীরে ধীরে সরাইয়া দিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার অপরাধ?

পাঁচুদাস নিকটস্থ একটা জিয়লগাছে হেলান দিয়া বসিয়া কহিতে লাগিল বলছি শুনুন বাবু। জানেন বোধ হয় আমি নিকুঞ্জবাবুর ছিটেবাড়ীর প্রজা। আমার অধীনে ও তার কোরে বিঘে চেক জমি বাগি মাটি মাটিতে খেটে খুটে মরে ভাতই কলাই ও সাদা সার করেছি। এখন বলা চলে তার ধান আর শস্য সময়। ভোর থেকে আমরা দুভায়ে দুপুর বেলায় নান কোরে চারটি খেয়ে মাঠে গিয়ে রাত্রি হয়ে যায়। পুজোর সময় বাবুর বাড়ী কদিন বেগার দিতে বলে কাল বিকেলে পাইক ডাকতে গিয়েছিল—পাইনি। আজ ভোরে আমার ছোট ভাই ভুবন আগেই মাঠে বেরিয়ে গেছে আমি তামাক খেয়ে তার পেছু যাব—এমন সময় পাইক এসে আমার হাত ধোরে মনের সাধে গালে ও পিঠে দমাদম বাবোটা ঘুসি ও চড় মারলে। বল্লে—হারামজাদা নবাবের বেটা বেগারে আসিস কোথায়? বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে তোর—না? কাল বিকেলে একবার খোঁজ করে গেছি আজ একটু পরে এলে আর পেতে পাত্তম না। কাল হাজীর না হওয়ার দরুণ নায়েব মশায় এক টাকা জরিমানা করেছেন—এখনই কাছারীতে গিয়ে দিয়ে আসবি চল্। আমি হাতজোড় কোরে বল্লুম—তা আমার ত এখন ব্যাগার দেবার সময় নেই দিন রাত্তির দুই ভাই মিলে ক্ষেতের কাজ করি—না হলে আমরা সারা বচ্ছর অনাহারে মরব। জরিমানার একটা টাকা এখনই দিয়ে দিচ্ছি—গিয়ে সরকারে জমা দিয়ে বলগে—আমি আজ রাতে নায়েবমশায়ের সঙ্গে দেখা করব। এই কথা শুনেই ত পাইক খাপ্পা হোয়ে উঠে আমায় অশ্রাব্য ভাষায় গালগাল্ করতে করতে লাঠির বাড়ি এক ঘা মাথায় বসিয়ে দিলে।

আবার লাঠি তুলতে যাচ্ছিল আমি দুই হাত দিয়ে লাঠি খানা ধোরে মুচড়ে কেড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে আপনার কাছে ছুটে আসচি। আজ আর আমার অব্যাহতি নেই—নায়েবের হুকুমে আমাকে বেইজ্জত — একাদিক্রমে এতগুলি কথা বলিয়া পাঁচু শান্ত হইয়া পড়িল একজন কর্ম্মী জলের গ্লাসটি তাহার মুখের নিকট তুলিয়া ধরিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বলিলেন যতক্ষণ আমরা আছি ততক্ষণ এক ভগবান ব্যতীত কোন পার্থিব শক্তিরই তোমাকে বেইজ্জত করবার সাধ্য নেই—এটা নিশ্চয় জেনো।

অদূরে নায়েবমহাশয় দুই জন পাইক সঙ্গে করিয়া আসিতেছেন—দেখা গেল। কর্ম্মীরা সকলে যেন ব্যূহ রচনা করিয়া জ্ঞানেন্দ্র ও পাঁচুদাসকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল জ্ঞানেন্দ্রনাথ ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্লীহাসর্ব্বস্ব নায়েবমহাশয় উপর ও নীচের পাটির গুটি আষ্টেক দন্তের অভাবে ওষ্ঠ নিষ্পেষণ করিয়া আরক্ত চক্ষে কহিলেন 'জ্ঞানবাবু যদি ভাল চান ত পাচুকে বের করে দিন নচেৎ নিকুঞ্জবাবুর কড়া হুকুম—আপনারও মাথা বাঁচানো দায় হবে।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু হো হো করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন চারিপার্শ্বে অনেক দূর হইতে তাহার প্রতিধ্বনি দ্বিগুণ তীব্রতায় ফিরিয়া আসিল নায়েব ও পাইকদ্বয় এই আকস্মিক অদ্ভুত হাসি শুনিয়া যেন একটু হতভম্ব হইয়া পড়িল। জ্ঞানবাবু বলিলেন যখন এই সৃষ্টিছাড়া স্বার্থ হারা বম ভোলাদলের সরদার হোয়েছি তখন শিবদার সেজে প্রস্তুত হোয়ে আছি—জানবেন। মাথার ভয় করতে গেলে আপনাদের মত বাঘ ভালুকের ভেতর কি এক দিনও বাস করতে পারতুম? এতগুলো সজীব প্রাণের পাচীল ভেঙে আপনার মত নিষ্ঠুর পশু—পাচুদাসকে কখনই টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। পাচুদাস আপনাদেরও প্রজা আমারও প্রজা আপনারা তাকে মারতে এসেছেন আমি তাকে আজ বাঁচাতে দাঁড়িয়েছি। এই কয়টা লোকের মৃতদেহের স্তূপ মাড়িয়ে তবে আপনাদের ওকে ধরবার চেষ্টা দেখতে হবে।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের হাতের কোদাল কুড়ুল দাগুলি এক একে দংশনোদ্যত বিষধরের মত ব্যগ্র হিংসায় কাঁধের উপর আসিয়া উঠিল—তাহাদের চক্চকে ধারালো অগ্রভাগগুলি বর্ণালী জরির মত সূর্য্য কিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাহাদের দিকে চাহিয়া কহিলেন তিনটে কাণ্ডজ্ঞানহীন পশুকে নিরস্ত্র করবার জন্য এতগুলি অস্ত্রের আস্ফালনের কোন প্রয়োজন নেই। আঘাত করবার শক্তি অপেক্ষা আঘাত সইবার শক্তি আমাদের প্রদর্শন করতে হবে। এইসব এ কাজের গোড়ায় কত কলঙ্ক মাথায় নিতে হবে—কত অপমান হজম করতে হবে—কত অত্যাচারের সম্মুখে বুক পেতে দিতে হবে। শেষে জয় আমাদেরই। গীতায় আছে—নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি — সর্ব্বদা মনে রেখো।

এই বলিষ্ঠ ছোকরাদের একটা মিলিত নিশ্বাসে তাঁহার প্রলয়ঙ্করী প্লীহাটি যে কখন সশব্দে ফাটিয়া যাইতে পারে—এ আশঙ্কা নায়েবের মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল তিনি মানে মানে সরিয়া পড়াই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। যাইবার সময় শাসাইয়া গেলেন— আগুন নিয়ে খেলা কচ্ছ জ্ঞানবাবু। কত ধানে কত চাল শীগ্গিরই টের পাবে।

চার

আজ আশ্বিন নব মহা সপ্তমী। আনন্দময়ীর আগমনে নিকুঞ্জবিহারীর বাড়ীতে আজ আনন্দ লহরী উঠিয়াছে। ঠাকুরদালানে লোক গিসগিস করিতেছে উঠানে ছেলে মেয়েরা রঙ বেরঙের কাপড় জামা পরিয়া নাচিয়া কুঁদিয়া বেড়াইতেছে মেয়ে পুরুষের হুড়াহুড়ি বকাবকি তোড়া কঙ্কনের আওয়াজ উচ্চ হাস্যরোলে প্রকাণ্ড বাড়ীখানি যেন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে চাকর বাকরেরা তামাক সাজিতেছে ও ঢালিতেছে বাবুদের কাপড় কোঁচাইতেছে ফাই ফরমাইস খাটিতে খাটিতে তাহারা গলদ ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতেছে। সারা বাড়ী পিপীলিকাটির পর্য্যন্ত আজ অবসর নাই।
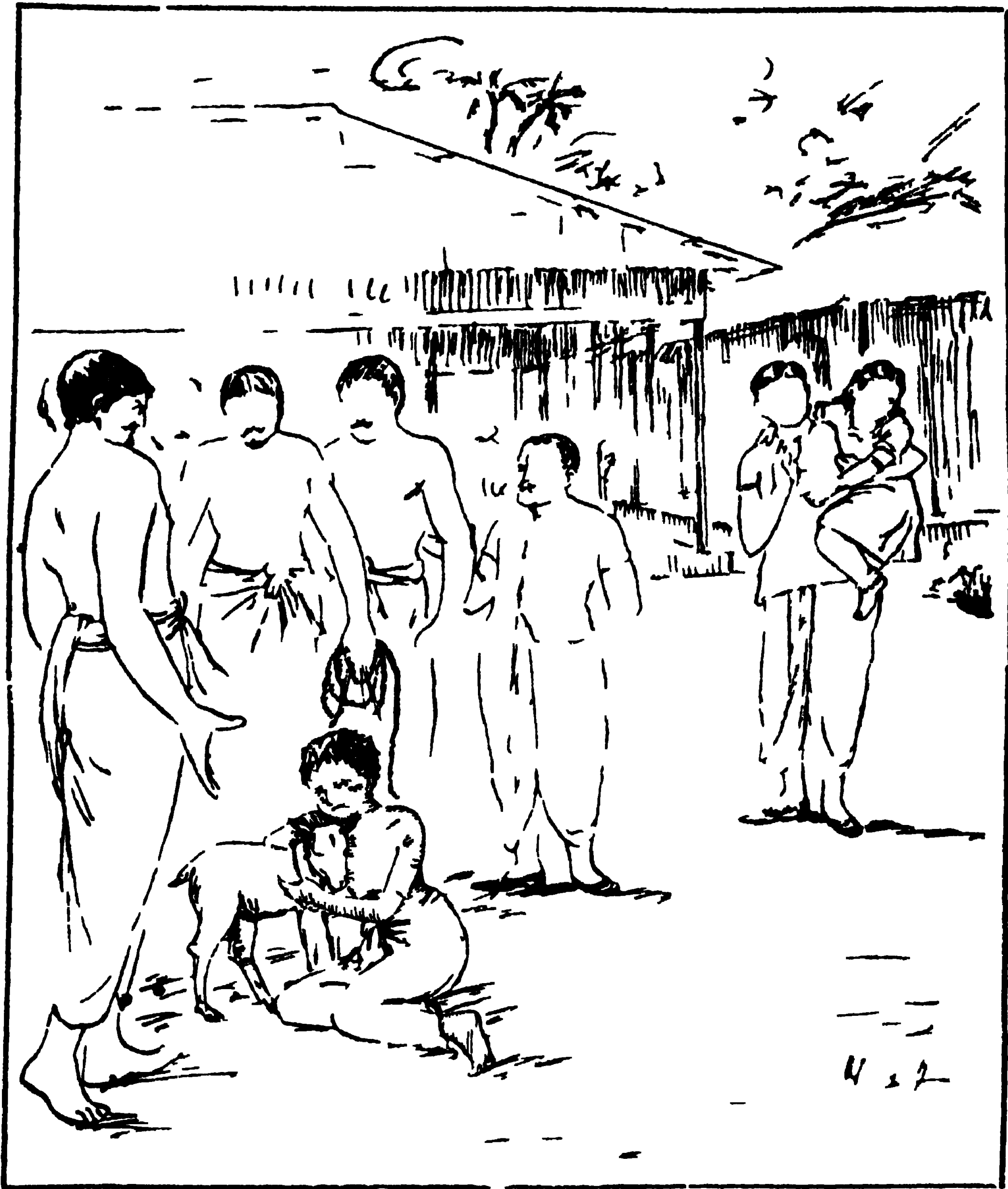
মধু চতুঃপার্শ্বস্থ যমদূত সদৃশ পাইকদিগের উপস্থিতিতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দ্বিগুণ বেগে পাঁঠার গলা জড়াইয়া ধরিল। (১০৪ পৃষ্ঠা)

তবে সাদা কথায় অবসর বলিতে যাহা বুঝি তাহা নিকুঞ্জবাবু ও তাঁহার পারিষদবর্গের যথেষ্ট ছিল কারণ বিরাট সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসিয়া তাঁহারা বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে আমোদ প্রমোদ ও গল্প গাছায় কালাতিপাত করিতে ছিলেন। নিকুঞ্জবাবু ইয়ারবর্গকে বলিতেছিলেন দেখ জ্ঞান ছোক্‌রাকে বেশ রীতিমততাবে শিক্ষা না দিলে আর চলছে না। সে সামান্য একটা তালুকদার হোয়ে আমাকে অগ্রাহ্য করে আমার লোকজনদের অপমানিত করে আমার প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলে—এত স্পর্দ্ধা তার। পরশু দিনকার ঘটনায় আমার এতদূর রাগ চড়েছে যে আমি থানায় ডায়েরী করিয়ে দিয়েছি। এবার একটা কিছু খুঁটিনাটি ঘটনা পেলেই ওর হাতে হাতকড়ী দিয়ে পুলিসে পাঠিয়ে দেব—তখন বাছাধন মজাটা টের পাবেন।

মনতোষবাবু হাঁটুর উপর ভর দিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন তা আর বলতে। তখন বুঝ বন ঠ্যালার নাম বাবাজীবন্। স্ত্রী সেবার বুজরুগী মুড় মুড়িয়ে বেরিয়ে যাবে প্র আরে মশায় যত রাজ্যের ছোট লোকের ছে ডাগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। আড় পারের নগেন রক্ষিত কবিরাজ—আমার মামাতো ভাই বেশ দু পয়সা পাচ্ছিল ব্যাটারছেলে দুনিয়ার লোককে কুইনাইনের পিণ্ডি গিলিয়ে তার পসারটা একেবারে মাটি করে দিয়েছে। আবার মাগিটা শুদ্ধ নাকি কবিরাজী সুরু কোরে দিয়েছে। আমাদের ১।১৫ ঘর মুচী প্রজা রয়েছে ওদের প্রায় খোরাক্ বন্ধ ওই বেটাদের জ্বালায় গো ভাগাড়ে আর গরু পড়ে না। কে ন এক বুড়ো ব্রাহ্মণকে পু ষছে—সে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরীর মত মরণাপন্ন গরুগুলোকে চিকিৎসা করে বাঁচিয়ে তুলছে মুচী ব্যাটার বৎসরান্তে আমাকে এক জোড়া কোরে চটি জুতো নজর দিত এ বছর আর দেয়নি। গরুর চামড়াই পায় না, দেবে কোথেকে?

নৃত্যগোপাল পণ্ডিত সুরু করিলেন্ "আমার ছেলে নলিন্ সেদিন বলছিল—মাসখানেক পূর্ব্বে মুসলমানদের একটা গরু মরেছিল কুশাড়ারা তার হাড়গুলো বের কোরে শুকিয়ে ও গুড়িয়ে গ্রামে কলকর গাছের গোড়াগুলোতে নাকি সার দিয়েছে। ঐ সব গাছের ফল খাওয়াও যা গরুর অস্থি খাওয়াও তা। ছি ছি হিন্দুধর্ম্ম রসাতলে গেল। —এই কথা বলিয়া হিন্দু কুলধ্বজ উঠিয়া বাহিরে গিয়া গলা খাঁকারী দিয়া অনেক কষ্টে একটু নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া আসিলেন। এইরূপ ভাবে সেই সমাজপতিদের বৃহতী সভায় একটি সত্যনিষ্ঠ মহাপ্রাণ দৃঢ়ব্রত যুবকের নানা দিক্ দিয়া বিভিন্ন ভঙ্গীমায় অবাধ আদ্যশ্রাদ্ধ চলিতে লাগিল।

সেদিন মহানবমীর প্রাতঃকাল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাঁহার দলবল সহ গ্রামপার্শ্বস্থ নদীতে কয়েকখানি জেলে ডিঙ্গী লইয়া কচুরী পানা তুলিতে লাগিয়া গিয়াছেন। কচুরী পানা কয়দিনের মধ্যে নদীকে এমন ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে যে তাহাতে নৌকা পর্য্যন্ত উহার প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া সর হইতে পারে না—গ্রামবাসীগণের প্রাণের বিঘ্নও যথেষ্ট হইতেছে। দুর্গা প্রতিমা বিসর্জ্জনের নদীতে বাচ খেলা হয় কিন্তু নদী পরিষ্কার করিবার দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই ঠাকুর দেখিবার ও নিমন্ত্রণ খাইবার আমোদে সকলেই বিভোর হইয়া আছে।

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিনী মঞ্জুলা রাধামাধবের পাট সারিয়া কর্ম্মী ছেলেদের জন্য জল খাবার গুছাইয়া রাখিয়া ঘরের বারাণ্ডায় চরকা লইয়া সূতা কাটিতে বসিয়া গেছেন। তাঁহার মাসী শাশুড়ী অদূরস্থ ঢেঁকীশালে পাড়ার একটি অনাথা বিধবার সাহায্যে চিঁড়া কুটিতেছিলেন। মালী ফুলবাগানে ফুলের কারকিৎ করিতেছিল—তাহার সঙ্গে পাঁচ বছরের মেয়ে রাণী হাতে বোনা লেস্ বসানো একটি সুন্দর রঙীন খদ্দরের ফ্রক্ পরিয়া এক গোছা জাফরান ফুলের তোড়ার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সম্মুখের খিড়কীর রাস্তা দিয়া নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে পাড়ার বউ ঝিরা ভাল ভাল সাজপোষাক পরিয়া, নৃত্য-দোদুল্ কলকণ্ঠ শিশুদের কোলে লইয়া জমিদার বাড়ীতে ঠাকুর দেখিতে যাইতেছে। রাস্তার ধারের একটা

গাছের ডালে পাতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়া একটা দোয়েল্ ক্রমাগত শীষ দিতেছিল সরস স্নিগ্ধ বাতাস বহিয়া উদীয়মান সূর্য্য কিরণের তেজকে বেশ উপভোগ্য করিয়া তুলিতেছিল আজ পৃথিবীর পুঞ্জীভূত শোক দুঃখের উপর কে যেন একটা পুলকের আস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছে।

ঘরর ঘরর্ করিয়া মঞ্জুলার চরকার অশ্রান্ত ঝঙ্কার চলিয়াছে মিহি সুতায় লাটাই ভরিয়া উঠিতে চলিল। এমন সময় একটি ছোট ছাগল তাড়াইতে তাড়াইতে মা ঠাকরুণ বলিয়া কচি গলায় ডাক্ দিয়া একটি দশ বছরের ছেলে হাসিতে হাসিতে আসিয়া দাওয়ার নীচে দাঁড়াইল। চরকা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া— কে রে মধো? আয় উঠে বোস্। দাঁড় এইটুকু লাটাইয়ে জড়িয়ে নিয়ে তোর সঙ্গে কথা কচ্ছি —বলিয়া মঞ্জুলা লাটাই লইয়া সুতা জড়ানোয় মনোনিবেশ করিলেন। মধু দাওয়ার উপর উঠিয়া আসিল ন উঠানে বসিয়া পরম তৃপ্তিতে পাঁঠাটিকে পাতা খাওয়াইতে ও গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

চাড়াল্ পাড়ার নদে চাড়ালের পিতৃহারা ছেলে মধু। নদেরচাঁদ নিকুঞ্জবাবুর পাইক ছিল ও বছর পাথর গাতির চর লইয়া দাঙ্গায় সে আহত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া দুই মাসের মধ্যেই মারা পড়ে। দয়ার অবতার নিকুঞ্জবাবু গরীব পাইকের প্রাণের দাম কুড়ি টাকা ধার্য্য করিয়া উহার বিধবা পত্নীকে দিতে হুকুম করিয়াছিলেন নায়েবের হাত দিয়া ঐ রাশি পঞ্চদশে পরিণত হইয়া অবশ্য অনাথার হাতে পঁহুছিয়াছিল। এক্ষণে চরকা কাটিয়া ধান ভানিয়া বেতের জিনিষ বুনিয়া এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথের সদাব্রতের কল্যাণে বিনা কর্জ্জে ইহাদের সংসার চলে। গত বৎসর ছেলেটা দুই মাস ধরিয়া কালাজ্বরে ভুগিয়া মরিতে পড়িয়াছিল মঞ্জুলার দাদা পাঁচ সাতটি ইনজেকসন্ দিয়া ইহাকে বাঁচার পথে চলিবার সামর্থ্য দান করিয়া গিয়াছেন।

মঞ্জুলা হাতের কাজ শেষ করিয়া মধোর দিকে স্নিগ্ধ নেত্রে তাকাইয়া বলিলেন ওরে রোদ্দুরের মধ্যে গিয়ে বসলি যে? উঠে বোস। ওমা আবার পাঁঠা কোত্থেকে যোগাড় কল্লি? মধো একগাল্ হাসিয়া বলিল, "বাবুদের বাড়ী থেকে ঠাকুর দেখে আসছিলুম পাশের আটচালাটার সাম্‌নে দেখি পাঁচ ছটা পাঁঠা একসঙ্গে বাঁধা রয়েছে আর দড়ী ছেড়ার জন্য গলা চেরা চীৎকার কোরে ছটফট কচ্ছে—এদের বোধ হয় আজ বলি দেবে। মনে বড় কষ্ট হতে লাগল ইচ্ছে হল দড়ীর গেরো খুলে পাঁঠাগুলোকে ছেড়ে দিই কিন্তু চারিদিকে লোক জন—বড্ড ভয় কত্তে লাগল। কি করি মুখ বুজে খানিক ক্ষণ তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলুম। ভগবানের কি কল্ মা তিনি যেন আমার প্রাণের ব্যথা বুঝতে পাল্লেন। এই ছোট পাঁঠাটা ফাঁস্ গলিয়ে কেমন কোরে বেরিয়ে পড়ল আমার হাতে একটা কচি কাঁঠাল পাতার ডাল ছিল—লোভে লোভে বেচারী আমার পাছু পাছু চলে এসেছে।

মঞ্জুলা কহিলেন তুই যে পাঁঠা সঙ্গে কোরে আন্‌লি বাবুরা যদি বকে? বালসুলভ সারল্যের সহিত মধু অবাক্ হইয়া বলিল— বা রে বা আমি সঙ্গে এনেছি বুঝি ও ত আমার সঙ্গে এল। ওর কি প্রাণের ভয় নেই ঠাকরুণ? মা যদি ওর রক্ত দেখে সন্তুষ্টই হবেন তবে ওর গলার দড়ী আল্‌গা কোরে দিলেন কেন? এই সোজা যুক্তির প্রতিবাদ করিবার বুদ্ধি বা বাক্য বাৎসল্যময়ী মঞ্জুলার মোটেই যোগাইল না তিনি হাসিয়া বলিলেন আচ্ছা বেশ কোরেছিস্ যা মাসীমার কাছ থেকে চিঁড়ে বাতাসা চেয়ে নিয়ে খেয়ে বাগানে বাণী আছে—তার সঙ্গে খেলা করগে। ওঁরা ফিরে এলে কাছারীতে আমি পাঁঠার ন্যায্য দাম পাঠিয়ে দেব খন। মধু উৎফুল্ল চিত্তে পাঁঠার ছানাটি কোলে লইয়া ছুটিতে ছুটিতে ঢেকীশালের দিকে চলিয়া গেল।

শুষ্ক করিয়া পোড়াইয়া সার করিবার মানসে উদ্ভৃত্ত কচুরী পানাগুলি ছোট ছোট গাদায় সাজাইয়া জ্ঞানেন্দ্র নাথ সদলে জমীদারবাবুর বাড়ীর পাশ দিয়া আসিতে ছিলেন ছেলেরা গাহিতেছিল—

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলা মাতরম্।
ত্বংহি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিণী
কমলা কমলদল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম —

এমন সময় বহির্বাটীর বারাণ্ডা হইতে নিকুঞ্জবাবু গম্ভীর কণ্ঠে ডাক্ দিলেন জ্ঞান শুনে যাও, কথা আছে। জ্ঞানবাবু সদলবলে প্রাঙ্গনে ঢুকিয়া সরাসর নিকুঞ্জবাবুর সম্মুখে হাজীর হইলেন মুখে তাঁহার নির্লিপ্ত প্রসন্নতা চক্ষে তাঁহার নির্ভীক উৎসাহের দীপ্তি।

নিকুঞ্জবাবু কহিলেন দেখ জ্ঞান হরিশ বাবুর ছেলে তুমি—তোমাকে এতটুকু বেলা থেকে দেখে আসছি। তুমি আজ আমার বিদ্রোহাচরণ কত্তে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছ দেখে আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হোয়ে গিয়েছি। তুমি এ গ্রামে এসে অবধি আমার যথেষ্ট অনিষ্ট করেছ সমাজের শাসন প্রণালী উপেক্ষা করে ছোট লোকদের সঙ্গে মিশেছ তাদের ছেলেপুলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে বিনা সুদে টাকা ধার দিয়ে পুষ্করিণীতে কেরোসিন ছড়িয়ে কুস্তি মুগুর ভাজার আখড়া খুলে লক্ষ্মীছাড়া ছেলেদের খদ্দর পরিয়ে—চর্‌কা কাটিয়ে—গান গাইয়ে একটা উদ্দাম বিশৃঙ্খলার রাজ্য গড়ে তুলেছ। সেদিন পাঁচুদাসকে আমার আইনের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ। আজ আবার তোমার আশ্রিত চাড়াল্ পাড়ার এক্ ছোড়া আমার ঠাকুরের বলির পাঁঠা চুরী করে তোমার বাড়ী লুকিয়ে রেখে দিয়েছে। এ সব ব্যাপার কি বল দেখি? একটা দাঙ্গা ফ্যাসাদ বাধাতে চাও না জেলে যেতে চাও?

জ্ঞানেন্দ্রনাথ অসংক্ষুব্ধ চিত্তে মৃদু অথচ সংযতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন আমাকে যে শাস্তি দিতে আপনার অভিরুচি হয় দিন্ শাস্তির ভয়ে আমি সত্য থেকে বিচ্যুত হব না। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ একদিন সুরজ মন্দ্রে গেয়েছিলেন—

শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান্ ভার
মানুষের নারায়ণে তবুও না কর নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও নাকি—
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবন্।
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান্।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সেদিন জীমূত গর্জ্জনে বলে গিয়েছেন, যাহারা বাস্তবিকই বাঙ্গলা দেশের একাধারে রক্ত মাংস প্রাণ তাহারা বড় কি আমরা বড়? কোন্ সাহসে কিসের অহংকারে তাহাদের জল স্পর্শ করি না? কাছে আসিলে ঘৃণিত কুক্কুরের মত তাড়াইয়া দিই? আমরা কি দেখিয়াও দেখিব না? বুঝিয়াও বুঝিব না? বর্ণাভিমান লইয়া কি এমনি করিয়া মরণের পথে ভাসিয়া যাইব? ঐ যে মা ডাকিতেছেন—সাবধান। সাবধান। উঠ। জাগ। মিথ্যা অভিমানকে বর্জ্জন কর। উহার প্রত্যেকেই য সাক্ষাৎ নারায়ণ। অহঙ্কারী মাথা নোয়াও মাথা নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ।' কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সিংহনাদে গর্জ্জন করে' উঠেছিলেন্ ইচ্ছা হয়—তোর ছুঁৎমার্গের গণ্ডী ভেঙে ফেলে এখনি যাই— কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল্ দীন দরিদ্র আছিস বলে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে ডেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠ্‌লে মা জাগবেন না। সর্ব্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চালন না হ'লে কোনও দেশ কোন কালে উঠেছে দেখেছিস? নিকুঞ্জবাবু আমি এই মহাপুরুষদের উপদেশ বাণী অনুস্মরণ কোরে চলেছি আমি মানুষ তৈরীর মশালা বিলাচ্ছি। আমি এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে কোন বাধা বিঘ্নকেই গ্রাহ্য করব না—নিশ্চয় জানবেন। আর আপনার পাঁঠা চুরীর কথা এই প্রথম শুন্‌ছি, আগে বাড়ীতে গিয়ে না শুনে এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ কর্ত্তে পারব না।

এই সময় মনোতোষবাবু কর্ত্তার কাণে কাণে বলিয়া উঠিলেন বুঝতে পাল্লেম না—একবার গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ কর্ত্তে হবে গৃহিণী সচীব সখি —নিকুঞ্জবিহারী মুখ ফিরাইয়া কহিলেন অসহ্য স্পর্দ্ধা। তাহলে জ্ঞান তুমি প্রকাশ্যভাবেই আমার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ? বেশ জমিদারের ক্ষতিকে সহ্য করতে প্রস্তুত হয়ে থেকো। মনোতোষ যাও এখনিই তুমি আটজন পাইক সঙ্গে নিয়ে জ্ঞানেদের বাড়ী যাও সহজে পাঁঠা না দেয়—জোর করে নিয়ে আসবে। আমার হুকুম এখনি যাও।

মনোতোষবাবু নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও চকাটি বৈঠকের উপর কোনমতে বসাইয়া রাখিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে পাইকের সন্ধানে চলিয়া গেলেন। জ্ঞানেন্দ্র ছেলেদের সহিত গাহিতে গাহিতে বাড়ীর দিকে চলিলেন—

বাহুতে দাও মা শক্তি
হৃদয়ে দাও মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

বাড়ীতে পঁহুছিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেখিলেন—সম্মুখের চত্বরে মধু ও রাণী দুইজনে একাগ্রচিত্তে বসিয়া ছাগল ছানাটিকে কুলপাতা অশত্থ গাছের পাতা প্রভৃতি ভূরি ভোজন করাইতেছে—তাহাদের মুখে মধুর আত্মতৃপ্তির এক দিব্য আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি বহির্বাটির বারাণ্ডায় বসিয়া পড়িয়া কর্ম্মীদিগকে হাত মুখ ধুইয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া জলযোগ সারিতে বলিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিল আপনি যাবেন না ? জ্ঞানেন্দ্রনাথ অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন হ্যাঁ যাচ্ছি বাবুর লোক জনদের হাতে পাঁঠাটাকে প্রত্যর্পণ করেই যাচ্ছি। আর একজন আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল তবে কি আপনি শিশুদের স্নেহ ডোর হতে আশ্রিত ছাগ শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করবার জন্যই পাষণ্ডদের হাতে তুলে দেবেন ?

নিজের হাতে গড়া সৃষ্টির হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলে মায়ের তৃপ্তিসাধন হয় না যার হয় সে মা নয়—রাক্ষসী। মৃণ্ময়ীর বুকে চিন্ময়ীর এক কণা ও যদি নৃত্য করে তাহলে কিছুতেই আজ ছাগের রক্তে যূপকাষ্ঠ কলঙ্কিত হবে না।

যুবকগণ বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে পাইকদলকে সম্মুখভাগে আগাইয়া দিয়া বীর সেনাপতি মনোতোষবাবু সভয় পদবিক্ষেপে জ্ঞানবাবুর বহির্বাটির সম্মুখে আসিয়া হাজীর হইলেন। জ্ঞানবাবু রাণীকে কোলে তুলিয়া বলিলেন মা তোমার দাদাদের সঙ্গে জলখাবার খাবে চল। মধু পাঁঠার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখে কয়েকখানা বাতাসা পুরিয়া দিবার বৃথা চেষ্টা করিতে ছিল তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন ওরে জমিদারবাবুদের পাঁঠা ছেড়ে দে। তোদের কালকে আমি সুন্দর একটা ছোট পাঁঠা এনে দেব। রাণী কাঁদিয়া বলিল না বাবা এ পাঁঠা দিও না। এ আমাদের সঙ্গে ভাব কোরে ফেলেছে আমার সঙ্গে কত কথা বলেছে। ওকে কিছুতেই ছাড়ব না ওরা কেটে ফেলবে। মধু চতুর্পার্শ্বস্থ যমদূত সদৃশ পাইকদিগের উপস্থিতিতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দ্বিগুণ বেগে পাঁঠার গলা জড়াইয়া ধরিল। মনোতোষের ইঙ্গিতে একজন পাইক্ মধোর হাত মুচড়াইয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া পাঁঠার গলায় দড়ী পরাইয়া দিল বেচারা ম্যা ম্যা করিয়া বুক-ফাটা চীৎকার করিতে লাগিল। সেই সময় রাস্তা দিয়া এক পাগল গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল—

বনের মহিষ অজা—মায়ের বাছা
মা ত সে বলি লয় না
যদি বলি দিতে আশ স্বার্থ কর নাশ
বলিদান দাও বিলাস বাসনা।

পাঁচ

নবমী-সন্ধ্যা। জমিদারবাবুর বাড়ী পূর্ব্ব পূর্ব্বদিনের মত হাসিখুশী মুখে আজও সকলে ঠাকুর দেখিতে আসিতেছে। সন্ধ্যারতি এখনই আরম্ভ হইবে। পাড়ার বউ ঝিরা ঠাকুরদালানের একপার্শ্বে আসিয়া জটলা করিতেছে, ছেলে মেয়েরা বাঁশি বাজাইতেছে,

হাততালি দিতেছে নাচিতেছে, আছাড় খাইয়া কাঁদিতেছে কেহ কেহ বা অন্ত লোকের দেখাদেখি ঠাকুরদালানের সিড়ির উপর আসিয়া সরল কুতুহলে টিপ টিপ করিয়া প্রণাম করিতেছে। ঢাকীরা নিজ নিজ যন্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইয়া আছে পুরোহিত ঠাকুর পঞ্চ প্রদীপ শঙ্খ চামর প্রভৃতি ভদারক করিয়া হাতের কাছে গুছাইয়া রাখিতেছেন। নিকুঞ্জবাবু হক হক্তে ঠাকুর দালানে আসিয়া হাঁকডাক করিতেছেন। চারি দিকে হর্ষ কোলাহলের মেলা বসিয়া গিয়াছে।

মধু আজ সকালের পর একবারও ঠাকুর দেখিতে আসে নাই। পাইকের গলা ধাক্কা ও আছাড় খাইয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে রীতি মত বেদনা হইয়াছে—হাত দুইটা ফুলিয়া ব্যথা হইয়াছে। আজ সে সারা দ্বিপ্রহর মায়ের কাছে শুইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিয়াছে এবং পাঁঠার ছানাটির জন্ত অশ্রু ফেলিয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ আশ্বাস দিয়াছিলেন কাল আর একটা পাঁঠা কিনিয়া দিবেন কিন্তু যেমনটি যায়—তেমনটি ত আর আসে না দশ বৎসর বয়সের মধ্যে সে কত পাঁঠা দেখিয়াছে কিন্তু এমন নিবিড় মমতা ত কোনটির প্রতি জন্মায় নাই। সন্ধ্যার সময় সে মোহাবিষ্টের মত মাদুরের উপর উঠিয়া বসিল জননীকে বলিল মা আমি ঠাকুর দেখতে যাব মা দুর্গাকে ডেকে পাঁঠার ছানাটার প্রাণ ভিক্ষা চাইব। বিধবা জননী মঞ্জুলা প্রদত্ত নূতন খদ্দরের কাপড়খানা কোঁচা দিয়া পরাইয়া ছেলেকে ঠাকুর দেখাইতে লইয়া চলিলেন্।

উৎসর্গ করা জমিদার বাড়ীর পাঁঠা ভুলাইয়া লওয়ায় কতখানি দুঃসাহসিক অপরাধ করা হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই মধুর ছিল না। আজ তাহার হৃদয়ের সমস্তখানি জুড়িয়া সেই ছোট্ট ছাগল ছানাটির মঙ্গল চিন্তাই জাগিয়া আছে। তাহার মা ঠাকুর দালানের নীচে দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে ঠাকুর প্রণাম করিয়া পাড়ার কয়েকটি স্ত্রীলোকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। মধু সবাগর ঠাকুর দালানের উপরে উঠিল প্রায় প্রতিমার কোলের নিকটে গিয়া বাঁহাকে প্রণিপাত করিল ও বিড় বিড় করিয়া খানিকক্ষণ কি বকিল। তার পর ঘাড় ফিরাইয়া বাল সুলভ আগ্রহে তন্ময় হইয়া ঝাড়লণ্ঠন জ্বালানো দেখিতে লাগিল। চারিদিকে আলো জ্বলিয়া উঠিতেই পুরোহিত-ঠাকুরমহাশয়ের দৃষ্টি পড়িল—এই মধোর উপর। রাগে তাঁহার শিখা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল চক্ষুর্দ্বয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইবার উপক্রম হইলে সম্মুখে সর্প দেখিলে গুণীন যেরূপ সশঙ্ক ত্রস্ততায় মন্ত্রপূত শিকড় আঁকড়াইয়া ধরে তেমনি করিয়া শুভ্র পৈতার গুচ্ছ দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া, দীর্ঘ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া পরুষ কণ্ঠে তিনি কহিলেন আরে এ চাড়ালের ছেলেটা ঠাকুর দালানের উপর উঠে এসেছে যে! যা প্রতিমা শুদ্ধ অপবিত্র হয়ে গেল। দরোয়ানগুলো কি কেবল মাহিনা গণতেই বহাল্ আছে? সব একেবারে শুচিভ্রষ্ট হ'ল—ছি ছি ছি! কি অদৃষ্টের পরিহাস আজ জগত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি লয় কারিণী ব্রহ্মময়ী জননী চণ্ডালের ছেলের গায়ের বাতাস লাগিয়া অশুদ্ধা হইয়া গেলেন।

অন্দরের দরজা খুলিয়া তন্মুহূর্ত্তেই নিকুঞ্জবাবু খালি গায়ে ভুঁড়ী দুলাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন মধুর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাঁহার মধুময় মুখখানি ক্রোধের আগুনে রক্ত জবার মত হইয়া উঠিল তিনি ব্যাঘ্র হুঙ্কারে বলিলেন এই সেই নদে চাড়ালের ছেলে নধোটা না?—এই হারামজাদাই ত আজ বলির পাঁঠা চুরী করেছিল। এখন আবার ঠাকুর দালানে উঠতে সাহসী হয়েছে! অন্ত্যজের স্পর্দ্ধা দেখ! গোকুল সিং ঘাড় ধাক্কা দিয়ে নিকাল্ দেও শূয়ার বাচ্চাকে— সঙ্গে সঙ্গে প্রভুভক্ত দেশোয়ালী সেই নির্দ্দোষ সরল বাল গোপালের কাণ ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া নীচে নামাইয়া দেউড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া গেল। মধোর মা ছুটিয়া আসিয়া ছেলেকে বুক দিয়া জড়াইয়া ধরিল। হিন্দুস্থানী গালি বৃষ্টির সহিত প্রবল মুষ্ঠ্যাঘাতের করকা পাত সম ধারায় মা শিশুর উপর পতিত হইতে লাগিল। তাহাদের বেদনা বিদ্ধ ব্যাকুল ক্রন্দন সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা ঢকা-নিনাদে নিঃসহায় নিশ্চেষ্টতায় ডুবিয়া গেল।

ঘড়ীতে এগারটা বাজিয়া গিয়াছে সন্ধিপূজা রাত্রি বারোটার ভিতর। বাড়ীর বৈঠকখানায় তখন পুরাদমে বাইজীর নাচ গান চলিতেছিল ও মাঝে মাঝে বীভৎস হাসির হল্লা উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে গান বাজনা থামিয়া গেল আরক্তনেত্রে নিকুঞ্জবাবু বাহিরে আসিয়া ঈষৎ বিজড়িত কণ্ঠে বলিলেন ওরে কে আছিস্ বলির পাঁঠাগুলো নাইয়ে এখানে নিয়ে আয়। খানিক বাদে একজন চাকর ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিয়া ভয় চকিত কণ্ঠে বাবুর কাছে ব্যক্ত করিল আজ্ঞে পাঁচটা পাঁঠাই পাওয়া যাচ্ছে না দড়ীশুদ্ধ লোপাট। বাবু অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন এ্যাঁ এ কি অমঙ্গলের কথা। যা শীগ্গির পাঁঠাগুলো খুঁজে নিয়ে আয়। নইলে আজ তোদের ধরে হাড়ীকাঠে বলি দেব। তৎক্ষণাৎ তিন চারিজন লোক হন্ত দন্ত হইয়া পাঁঠার খোঁজে দৌড়িল।

পুরোহিত ঠাকুর চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন শুষ্ক কণ্ঠে কহিলেন এবার পূজোয় মহা অনর্থ ঘটতে লাগল দেখ্‌ছি। আ এদিকে যে পুজোর সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। ওরে ব্যাটারা শীগ্গির খুজে আন। এমন সময় জ্ঞানেন্দ্রনাথ চারিজন সঙ্গী লইয়া জমিদার ও পুরোহিত ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া নিবেদন করিলেন পাচ পাঁঠাই হাজীর হয়েছে মশাই আর খুঁজতে যেতে হবে না। নিকুঞ্জবাবুর জ্বলমান ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল তিনি দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া বলিলেন ইয়ার্কী করবার আর জায়গা পেলে না? দাঁড়াও কালই তোমাদের কারসাজী ভাঙছি। এই বলিয়া তিনি টবটব করিয়া ঠাকুর দালানে উঠিয়া গেলেন। পুরোহিত ঠাকুর দাঁত কিড় মিড় করিয়া মনে মনে গালি পাড়িলেন আরে মর আবেগীর ব্যাটারা মায়ের বলি নিয়ে রঙ্গ।

যাহাহউক, কিছুক্ষণ পরে জ্ঞানেন্দ্রনাথের বাটির সীমানার ধারে পাচটি পাঁঠাই খুজিয়া পাওয়া গেল। যথারীতি স্নান করাইয়া সিন্দুর পরাইয়া যূপকাষ্ঠের নিকট তাহাদিগকে কড়া নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। ক্রমে ক্রমে সন্ধিপূজা দেখিতে দলে দলে লোক আসিতে লাগিল জনতার ভিড়ে প্রাঙ্গনে তিলার্দ্ধ ধারণেরও ঠাঁই রহিল না। শেষে সন্ধিপূজা আরম্ভ হইল, দানবীয় উল্লাসে ঢাকের বাজনা সুরু হইল চেলীর জোড় পরিয়া এক কৃষ্ণকায় দৈত্য সদৃশ বলিকাটা ব্রাহ্মণ গঙ্গাজলে খাঁড়া ধুইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। স পার্ষদ নিকুঞ্জবাবু ঠাকুর দালানে বসিয়া পুরা দমে আশ্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িলেন।

কিন্তু বলির সময় এক অঘটন ঘটিয়া বসিল। লোক জনে যূপকাষ্ঠে পাঁঠা পুরিতে গিয়া দেখে—জ্ঞানেন্দ্রনাথ সকলের অজ্ঞাতসারে ইতোমধ্যে তাহার মধ্যে মাথা দিয়া শুইয়া আছেন তাঁহার সঙ্গী চারিজন চারি পদে ভর দিয়া পর্য্যায়ক্রমে হাড়ীকাঠের পশ্চাতে স্তব্ধ আগ্রহে দণ্ডায়মান। এই অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া সকলে বিস্মিত রোমাঞ্চিত হইয়া গেল বলিকাটা কসাই খাঁড়া লইয়া দুই পদ পিছাইয়া গেল নিকুঞ্জবাবুর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। পুরোহিত মণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিয়া বলিলেন জ্ঞানবাবু একি কাণ্ড? জ্ঞানবাবু হাড়ীকাঠের ভিতর হইতে হাসিয়া উত্তর দিলেন আজ নিকুঞ্জবাবুর বাড়ী তান্ত্রিক মতে দুর্গাপূজা। প্রথমে পাঁচটি নরবলি পরে পাচটি পাঁঠাবলি। সমবেত জন মণ্ডলী চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নিকুঞ্জবাবু ভাঙা গলায় বলিয়া উঠিলেন জ্ঞান আমার বাড়ীতে অনধিকার প্রবে। কোরে পূজা পণ্ড কত্তে এসেছ? হিন্দু হয়ে হিন্দু দেবীর অপমান্ কচ্ছ? যদি ভালাই চাও ত—

জ্ঞানবাবু তাহার কথায় বাধা দিয়া অস্বাভাবিক উত্তেজনাপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন আজ মায়ের অবিচারের সম্মুখে মাথা পেতে দিয়েছি। আর মা সাধন সমরে দেখি মা হারে কি পুত্র হারে? দেখব—এ মায়ের ব্যথা না মানুষের প্রথা। গোকুল সিং ও জুমজল সিং ব্যাপার সঙ্গীন্ বুঝিয়া সীতারাম জপ করিতে করিতে আগে হইতেই সরিয়া পড়িয়াছে তাহাদের দশ পনেরো বার উচ্চ কণ্ঠে ডাকিয়াও সাড়া পাওয়া গেল না।

পুরোহিত ঠাকুর উপায়ান্তর না দেখিয়া হাড়ীকাঠ হইতে জ্ঞানবাবুকে টানিয়া বাহির করিয়া, তাঁহার সম্মুখে বসিয়া শাস্ত্র বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইতে সুরু করিলেন। বিরক্ত হইয়া জ্ঞানবাবু কহিলেন আমি শাস্ত্র মানি না যুক্তি মানি না তর্ক মানি না আমি মানি—সহজ বুদ্ধি বিবেক আর প্রাণের ডাক। সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের বুকে ছুরী বসিয়ে মায়ের পূজা—উ অসম্ভব। আপনার বুকের শোণিত স্নেহের উত্তাপে জ্বাল দিয়ে সুধারূপে নিখিল বিশ্বের ক্ষুধা নিবারণ কচ্ছেন যে জননী সেই জননী কিনা একটা অকলঙ্ক অসহায় ছাগ শিশুর রক্তপান কোরে আপনার পিপাসা মেটাবেন মা কি দানবী? শাস্ত্র বচন শুনতে চান—তাও কিছু কিছু উদ্ধৃত কত্তে পারি—এই বলিয়া তিনি তন্ত্র পুরাণাদি হইতে বলিদানের বিরুদ্ধ বাদ পূর্ণ ও সঠিক উদ্দেশ্য জ্ঞাপক বহু শ্লোক অনর্গল আওড়াইয়া গেলেন।

আজিকার এই জনমণ্ডলীর মধ্যে এমন খুব কম লোকই ছিল—যাহারা জ্ঞানেন্দ্রনাথের নিকট কোন না কোন প্রকারে উপকৃত বা ঋণী নহে তাহাদের মধ্যে বেশ একটা অসন্তোষের ভাব জাগিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ পাড়ার মুরব্বি শ্রীযুত বিহারী চাটুজ্যের সদ্য বিবাহিত বি এ পাশ করা যুবক পুত্র অগ্রসর হইয়া বুক ফুলাইয়া বলিল সমাজের এই কুসংস্কারের বিপক্ষে আমিও আজ আত্মবলি দিতে প্রস্তুত। কৈবর্ত্তপাড়ার কয়েকজন সমস্বরে বলিয়া উঠিল— আমরা বলি চাই না জ্ঞানবাবুর কথা শুনতে চাই। একজন ভিড়ের মধ্য হইতে বীভৎস কর্কশতায় কহিয়া উঠিল ওই পাষণ্ড পুরোহিতটাকে বলি দেওয়া হোক্ পাঁঠার ল্যাজটি এ জন্মে ওর মাথার পিছনে টিকি হয়ে দেখা দিয়েছে। কে একটি ছোক্‌রা সরু গলায় চীৎকার করিয়া হাত তালি দিতে দিতে বলিয়া উঠিল বলির সময় চলে গিয়েছে। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে।" যাহাহউক বড়ই আক্ষেপের বিষয় এ বৎসর নিকুঞ্জবাবুর বাড়ীতে আসিয়া মা দুর্গা একেবারে নিরামিষাশী রহিয়া গেলেন।

রাত্রি একটার সময় জ্ঞানবাবু বিজয় তাহার মুখে বাড়ীতে ফিরিয়া এক দু সংবাদ শুনিলেন্। সন্ধ্যার সময় মধু নিকুঞ্জবাবুর দরোয়ানের নিকট প্রহার খাইয়া ভীষণভাবে আহত হইয়াছে হতভাগ্যের দুইটি দাঁত খসিয়া গিয়াছে হাত মুখ চক্ষুর্দ্বয় ভীষণভাবে ফুলিয়া উঠিয়াছে সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা অজ্ঞানবৎ পড়িয়া আছে তাহার মা কাঁদাকাটা করিতেছে। দুইজন ছোক্‌রাকে তৎক্ষণাৎ পাশের গ্রাম হইতে সবে ধন নীলমণি গোছের এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া শস্তুদাকে সঙ্গে লইয়া জ্ঞানবাবু চাড়ালপাড়া অভিমুখে উন্মত্তবৎ ছুটিয়া চলিলেন।

* * * * *

বিজয়া দশমীর বৈকাল। বাবুদের বাড়ী হইতে ঠাকুর বাহির হইয়াছে—সানাইয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে শোকের উচ্ছ্বাস গুমরিয়া উঠিতেছে। প্রতিমা সারা গ্রাম ঘুরিয়া তবে ভাসানের জন্য নদী তীরে আসিবে তারপর বাচ খেলা হইবে।

কল্য রাত্রি দুইটার সময় ডাক্তার আসিয়া মধুর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন অক্ষকাস্থি বা গলার হাড় (clavicle) ভাঙিয়া গিয়াছে বাঁচা শক্ত। সকাল হইতে মধুর অবস্থা ক্রমশ খারাপ দাঁড়াইতেছিল। একবার সে যন্ত্রনায় অসহ্য চীৎকার করিয়া উঠিতেছে আবার পরমুহূর্ত্তেই নির্জীব হইয়া পড়িতেছে কখনও বা চক্ষু মুদিয়া বিকারের ঝোঁকে বলিতেছে— আমার পাঁঠার ছানাটা আছে ত? মা কি তাকে নিয়েছেন্? সে যদি যায়—আমিও যাব। বেলা ৪টার সময় এই দেব হৃদয় দরদী বালকের অপাপবিদ্ধ আত্মা দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া মায়ের কাছেই উড়িয়া গেল।

পাড়া ঝাঁটাইয়া সকলে প্রতিমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়াছে—বাড়ীতে আর কেহ নাই। জ্ঞানেন্দ্রনাথ দুইটি কর্ম্মী সাথে করিয়া শ্মশানঘাটে আসিয়াছেন— সম্মুখে মধুর চিতা জ্বলিতেছে। এমন সময় সম্মুখের ঘাটে একখানি ডুপাটি পানসী আসিয়া লাগিল। তাহার মধ্য হইতে উর্দ্দি পরিহিত একজন দারোগা—দুইজন

সিপাহী সঙ্গে লইয়া অবতরণ করিল। মধুর মা অদূরে আছাড় পিছাড়ি খাইয়া কাঁদিতেছে মঞ্জুলা তাহাকে অনেক কষ্টে ধরিয়া রাখিয়াছেন। চিন্তাগ্নি উত্তাপে জ্ঞানেন্দ্রের অশ্রুজল শুকাইয়া গিয়াছে তিনি নির্ব্বাপিত প্রায় অগ্নির দিকে শূন্যমনে তাকাইয় আছেন দারোগার কথায় তাঁহার চমক ভাঙিল— জ্ঞানবাবু আপনার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়াণা আছে।

জ্ঞানেন্দ্রবাবু অবিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন— "অপরাধ?

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ দারোগা গণ্ডদ্বয় ফুলাইয়া ততোধিক নি সঙ্কোচে উত্তর করিল নিকুঞ্জবাবুর বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ শান্তিভঙ্গ দাঙ্গাহাঙ্গাম অবৈধ জনতা এবং পূজার পাঠা চুরী—

ও আচ্ছা কি কর্ত্তে হবে? হাতকড়ির দরকার হবে কি?—বলিয়া জ্ঞানেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত দুইটি বাড়াইয়া দিলেন।

দারোগাবাবু বলিলেন কিছু দরকার হবে না আপনার উপর সে বিশ্বাস আছে। এখনই আমাদের সঙ্গে নৌকায় উঠে থানায় যেতে হবে। মাপ করবেন— এ আমাদের ডিউটি।

চলুন বলিয়া জ্ঞানবাবু নৌকার দিকে অগ্রসর হইতে যাইবেন এমন সময় একজন কর্ম্মী দ্রুতবেগে দৌড়িয়া আসিয়া সংবাদ দিল "প্রতিমা বাহির হবার পর থেকেই নিকুঞ্জবাবুর ভয়ানক ভেদ বমি হচ্ছে তিনি একেবারেই নির্জীব হয়ে পড়েছেন। পাশের গাঁয়ের ডাক্তারটি তিন ক্রোশ দূরে একটা ডাকে গিয়েছেন—তাঁকে পাওয়া যায়নি। অবস্থা বিপজ্জনক।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া ব্যথাবিদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, এ্যা সেকি? তোমরা শীগগির ছুটে আমার বাড়ীতে যাও আমার ওষুধের বাক্স থেকে কর্পূরের আরক ডায়ারিয়া ট্যাবলেট প্রভৃতি নিয়ে সেখানে দৌড়াও। গ্রাম্য ডাক্তারের চেয়ে তোমরা ঢের ভাল চিকিৎসা কর্ত্তে পার্ব্বে। সাবধান! সেবা শুশ্রূষার যেন কোন ত্রুটি না হয়। তোমাদের প্রাণ দিয়েও নিকুঞ্জবাবুকে বাঁচানো চাই—

আগত যুবক ছুটিয়া চলিয়া গেল। তারপর মঞ্জুলার দিকে চাহিয়া অভয়প্রদ মৃদু হাস্যে বলিলেন ভাবনা কি? সমুদ্র মন্থনের বিষ ও অমৃত উভয়কেই আমাদের মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হবে। মধুর মাকে আজ রাত্রে আমাদের বাড়ীতে রেখো অভাগিনীকে সাধ্যমত সান্ত্বনা দিও। মঞ্জুলা চক্ষের জল সযত্ন করিয়া মধুর মাকে বাহু বেষ্টনে ধরিয়া লইয়া যন্ত্র চালিত পুত্তলিকার মত ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দৃঢ়পদে নৌকায় উঠিয়া এক পাশে বসিয়া পড়িলেন। নৌকা ছাড়িয়া দিল। যে দিকে বিজয়ার বাজনা শোনা যাইতেছিল সেইদিকের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন দুর্গে দুর্গতি নাশিনী মাগো—

[সমাপ্ত]

শিশুকে অযত্ন করিও না

কারণ

সে তোমার বার্দ্ধক্যের ভরসা জাতির আশা, সংগ্রামের শক্তি।

স্তন দুগ্ধই শিশুর শ্রেষ্ঠ খাদ্য।—রুগ্না মাতার দুধ দিও না বার্লি ও জল মিশাইয়া গরু বা ছাগলের দুধ খাওয়াইও। দুধ খুব বেশী জাল দিও না নচেৎ কমলা লেবু প্রভৃতি ফলের রস কিছু মিশ্রিত করিয়া লইও। পেটেণ্ট ফুড ও বিলাতী দুধে অনেক সময় বাছার সর্ব্বনাশ করে।

শিশুর খাদ্য যেন টাটকা ও প্রতিবারে অল্প হয় দিনে চারিবার বা আড়াইঘণ্টার বেশী দুধ দিও না। রাত্রি বারোটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কাঁদিলেও মাই খাওয়াইও না। এক বৎসরের পর আর মাই খাওয়ান উচিত নয়, আঠারো মাস বয়স হইতে একবেলা করিয়া ভাত খাওয়ানো অভ্যাস করিবে। মুক্ত বায়ু ও মৃদু সূর্য্যতাপ শিশুর শ্রেষ্ঠ সালসা!

রৌদ্র চিকিৎসা।

আল্পস প্রদেশের লেইসন গ্রাম

ডাক্তার রোলিয়ারের রৌদ্র চিকিৎসালয়।

যক্ষ্মা রোগীদের হাসপাতাল।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম"
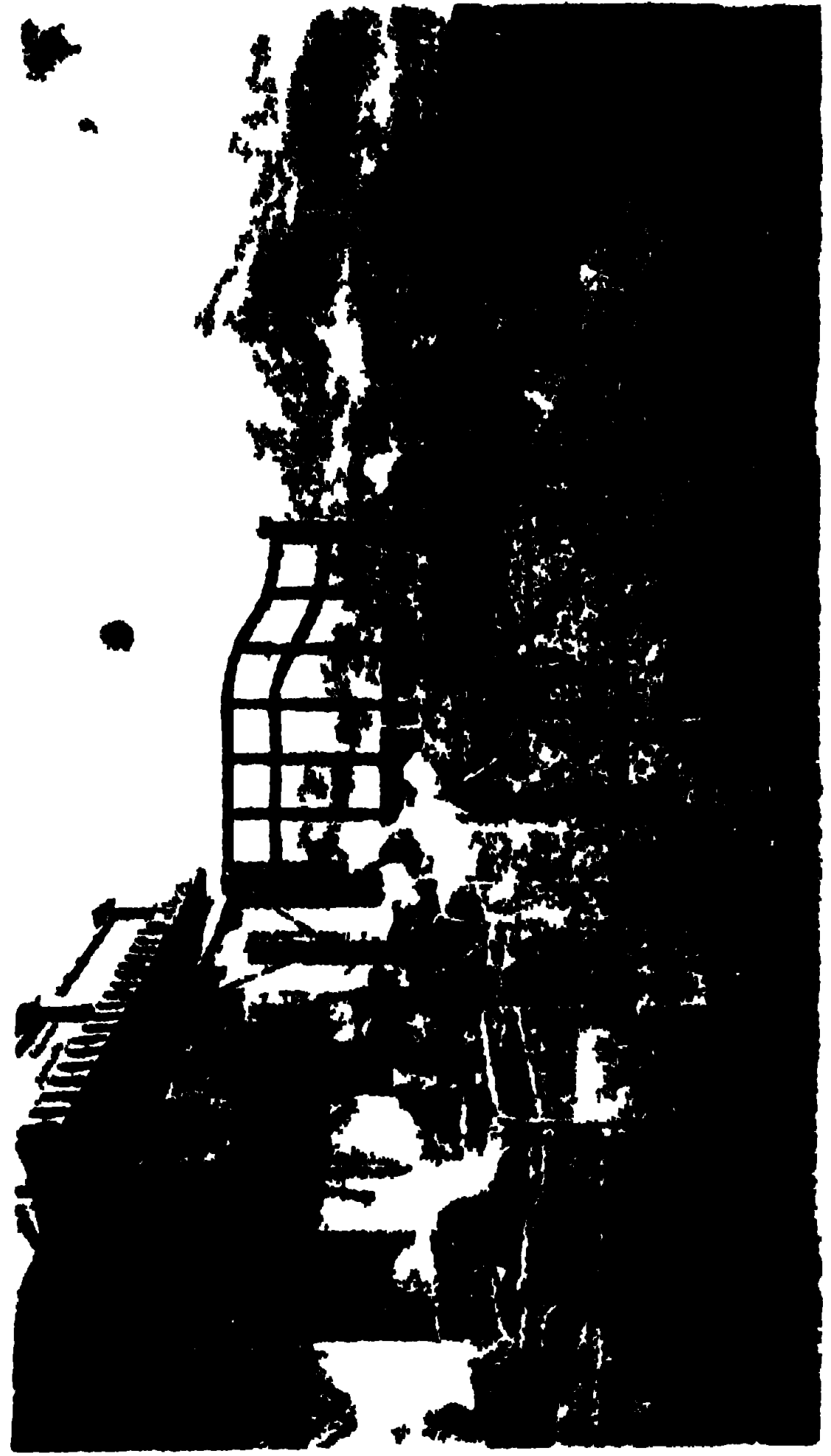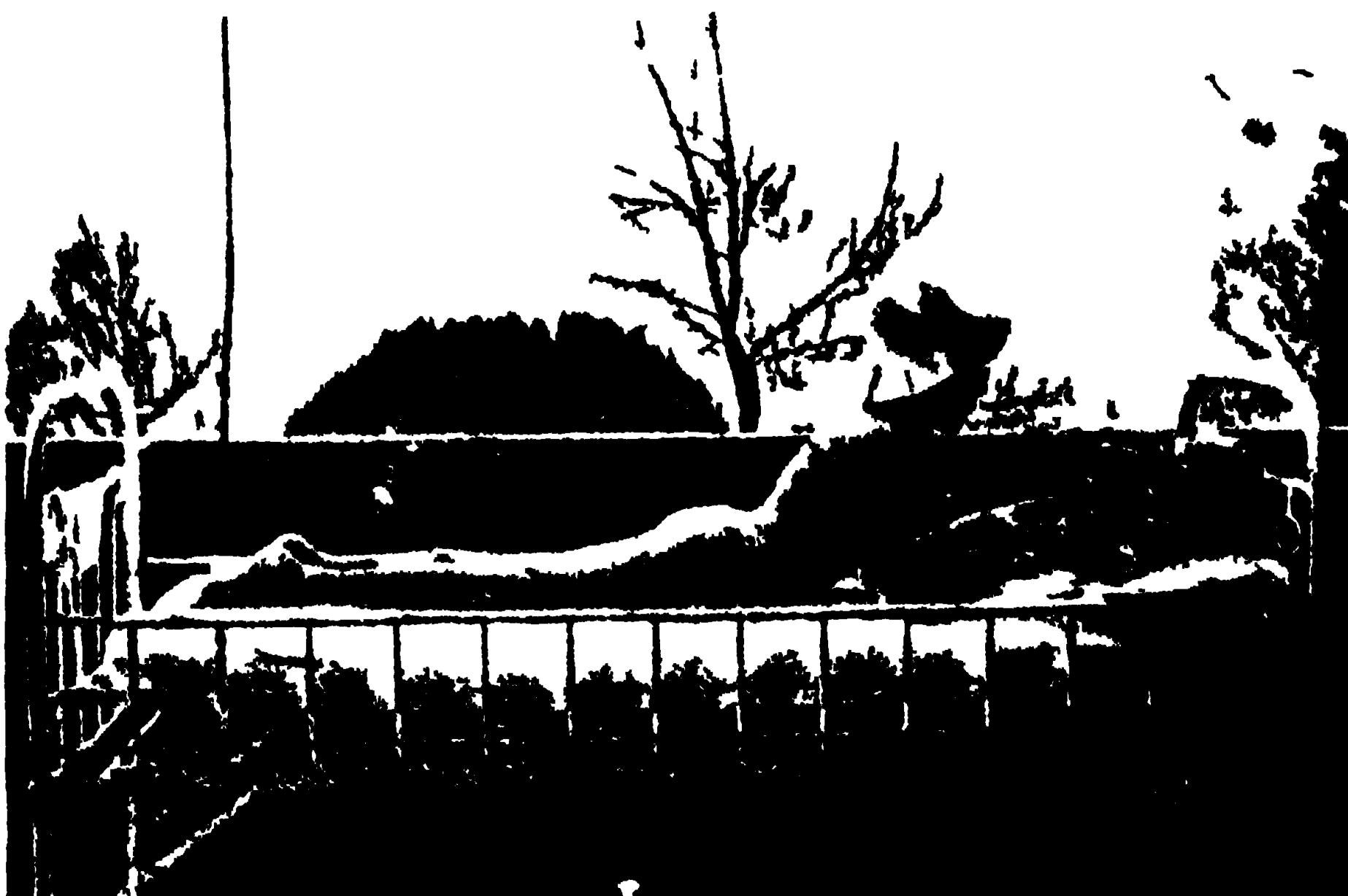
১৪শ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৩২ সাল { ৭ম সংখ্যা

শিশুর আত্মকথা

[শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু]

তোম্‌রা কিসে উচ্চ হবে মোদের যদি তুচ্ছ কর ?
মোরাই তোমার ভাবী পিতা—ছোট হলেও সবার বড় ।
এক লহমার খেয়ালেতে আন্‌ছ মোদের ধরায় টেনে
বংশ রক্ষা করতে তোমরা মরছ কত দেবতা মেনে ।
কিন্তু বল কি সুখেতে ধরার ধূলায় আস্‌ব নেমে ?
স্বর্গলোকের ফুলের কুঁড়ি, ছিলাম ডুবে অতল প্রেমে ।
গড়্ গড়িয়ে দুধ গিলিয়ে যখন তখন চুমো খেয়ে
ইচ্ছামত ঘুম পাড়িয়ে মাসীপিসীর গানটী গেয়ে
কিম্বা নিজের মর্জ্জিমত জুতো জামায় আটক্ করে
ভাবছ বুঝি তোমরা মোদের বড়ই যত্নে তুল্‌ছ গড়ে ?

জন্ম হতে কইতে কথা—বল্‌তে ব্যথা পারি নাকো
সেই সুযোগে কত কষ্টই তোমরা মোদের সদাই রাখো।
কান্না শুনেই মুখের ভিতর অমনি ধর স্তনের বোটা,
ক্ষুধায় কাতর হই বা না হই নাই বা থাকুক্ দুধের ফোঁটা।
কাঁদছি হয় ত গরম লেগে কিম্বা মশার কামড় খেয়ে
সে কষ্ট ত ঘুচবে নাগো মায়ের বুকের পীযূষ পেয়ে।
এই ত সে দিন একটি শিশু দোলায় শুয়ে ঘুমুচ্ছিল
শোয়ের তলায় বিছা ছিল হঠাৎ তারে কামড়ে দিল
জেগে উঠে কাঁদল শিশু কর্ম্মরতা মাতা বেগে—
দুলিয়ে দিতে লাগল দোলা হায় রে কপাল বিষম বেগে
দোলার চাপে দুষ্ট বিছা ছোবল দিল ক্রমাগত
বিষের জ্বালায় বাছা শাহার ঘুমল চিরদিনের মত।
সময়েতে পাই না খেতে আলো হাওয়ায় পাই না যেতে
ছোট্ট ঘরে এক বিছানায় সাতটা মানুষ ঘুমাই রেতে।
মায়ের স্তনে দুধ ঝরে না বাপের আদর ভুলেই আছি
বার্লি জল আর গুড়ের কৃপায় গেছি মরার কাছাকাছি।
রোগে ভুগি সাধ করে কি ? বৈদ্য বলে—বাপের দোষে
খাচ্ছে ঠেসে পিলে জ্বরে হাম আমাশা, পাঁচড়া খোসে।
কুসংস্কার অজ্ঞানতা অত্যাচারের মধ্য দিয়ে
নিত্য মোদের যমের ঘরে কোন প্রাণে গো দাও পাঠিয়ে ?
স্বরাজ নামে পাগলা হয়ে কোমর কসে মিটিং কর
পরের দোরের ময়লা টেনে আপন ঘরে কচ্ছ জড়ো।
স্বদেশ গাছের আমরা কোরক্ জলের ঝারি হেথায় ঢালো
লক্ষ চিত্ত গন্ধী আশু দেখবে এ দেশ করবে আলো।
গার্গী খনা সীতা সতীর হবে নাকো অভাব কভু
টাকার পিছেই ছুটছ মিছে চিনবে না গো মোদের তবু।
আঁতুড় ঘরের মধ্যে থেকেই শিশুর তরে সাজাও চিতা
পালন করার মর্ম্ম বুঝে মেনো স্বজন ধর্ম্ম, পিতা।
তারা যেন হয় নাকো মা আছে যারা মোদের দলে,
সাধনা করে সাধ্য বুঝে নামিও মোদের ধরাতলে।

রৌদ্র-চিকিৎসা

আমাদের দেশে শিশুর জন্ম হইলে তাহাকে তৈল মাখাইয়া দিবসের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া রৌদ্রে রাখা হয়। শিশুপালনের এই প্রথাটি বড় সুন্দর। আজ কাল পশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অনেক বাঙ্গালী জননী আর এ প্রথা পালন করিতে চান না। কারণ সূর্য্য-কিরণের যে কত গুণ তাহা তাঁহারা জানেন না। তাঁহারা মনে করেন এই প্রাচীন প্রথা কুসংস্কার মাত্র। তাঁহাদের ধারণা যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই বর্জ্জনীয়। কিন্তু তাঁহারা যদি আজকালকার প্রতীচ্য চিকিৎসা জগতের খবর রাখিতেন তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতেন তাঁহারা কতবড় ভ্রম করিতেছেন। তাহারা বুঝিতেন যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই মন্দ নয় তাহার মধ্যে ভালও আছে।

প্রতীচ্য চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকেরা সূর্য্যকিরণের এই মহৎ গুণের সন্ধান পাইয়া চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবলম্বন করিয়া অঘটন ঘটাইতেছেন চিকিৎসা জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। ইয়োরোপের স্থানে স্থানে রৌদ্র চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজীতে এই চিকিৎসা প্রণালী Heliotherapy নামে পরিচিত।

ইয়োরোপীয় চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকেরা যে বিশুদ্ধ বায়ু সূর্য্যকিরণ প্রভৃতির রোগ নিরাময়ের ক্ষমতার কথা জানিতে পারিয়াছেন তাহা বেশী দিনের কথা নয়। মাত্র গত শতাব্দীতে প্রতীচ্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বায়ু চিকিৎসার উপকরণ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আর সূর্য্যকিরণ এখনও সর্ব্বত্র গৃহীত হয় নাই—মাত্র কয়েক জন চিকিৎসক অল্প কয়েক বৎসর ইহার উপকারিতা জানিতে পারিয়া ইহার সাহায্যে চিকিৎসা চালাইতেছেন। তাঁহারা সূর্য্যকিরণ বিশ্লেষণ করিয়া, তন্মধ্য হইতে চিকিৎসা কার্য্যের উপযোগী বিশেষ কিরণ বর্ণটি বাছিয়া লইয়াছেন। যেখানে সূর্য্যকিরণ সুলভ নহে সেখানে তাঁহারা কৃত্রিম উপায়ে সূর্য্যালোক উৎপাদন করিয়া সূর্য্যালোকের অভাব মিটাইতেছেন। এই কৃত্রিম সূর্য্যালোকের যে অংশ চিকিৎসা কার্য্যে প্রয়োগ করা হয় তাহাকে ultra violet light বা তীব্র বেগুনী আলো বলা হয়। সূর্য্যকিরণ বিশ্লেষণ করিয়া সাতটী মূলবর্ণ এবং আরও কয়েকটি মিশ্রবর্ণ পাওয়া যায়। রামধনু উদিত হইলে সূর্য্যকিরণের বর্ণ বিন্যাস কিরূপ তাহা বুঝা যায়। ঐ বর্ণ সমুদায়ের মধ্যে যে কিরণ রেখা তীব্র বেগুনী আলো প্রদান করে তাহাই রোগ নিরাময় করিতে পারে।

সূর্য্যকিরণের জীবাণু বিনাশ করিতে সমর্থ তাহা অনেক কাল পূর্ব্বেই লোকে জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু গভীর ক্ষত যেখানে সাধারণত ঔষধ পৌছিতে পারে না সে সব স্থলে সূর্য্যকিরণ পৌছিয়া জীবাণু বিনাশ করিতে সমর্থ এই তত্ত্বটুকু কয়েক বৎসর হইল বহু বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরীক্ষা এবং পরিদর্শনের ফলে নিশ্চিতরূপে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সূর্য্যকিরণ মানবদেহের চর্ম্ম ভেদ করিয়া তাহার রক্তকে এমন তেজসম্পন্ন করিয়া তুলে যে রক্তের স্বাভাবিক রোগ বীজাণু নাশক ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়া যায়। অস্থি চিকিৎসা সাধ্য যক্ষা রোগ ও রিকেটস রোগ আরাম করিবার পক্ষে সূর্য্যকিরণের অদ্ভুত ক্ষমতা। ক্ষত চিকিৎসার্থও সূর্য্যকিরণ প্রয়োগ করিয়া সফলতা লাভ হইয়া থাকে। তাছাড়া দুর্ব্বল শিশুর পক্ষে রৌদ্র অতীব হিতকর। এখন আবার অন্যান্য রোগে সূর্য্যকিরণ প্রয়োগের ফল কিরূপ দাঁড়ায় সে সম্বন্ধে পরীক্ষা হইতেছে। এই পরীক্ষার ফলও সন্তোষজনক বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

Heliotherapy বা Sun Cure বা রৌদ্র-চিকিৎসার ব্যাপারে প্রতীচ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ কত দূর অগ্রসর হইয়াছেন, কিরূপ সুব্যবস্থিত প্রণালী

অবলম্বন করিয়া তাঁহারা চিকিৎসা করিয়া থাকেন এবং তাহাতে কিরূপ ফল লাভ করেন তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় লইবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

ডাক্তার এ রোলিয়ার (Dr A Rollier) এক জন সুইজার্ল্যাণ্ডবাসী বিখ্যাত রৌদ্র চিকিৎসক। ইনি ১৮ বৎসর ধরিয়া এই প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন। সুইজার্ল্যাণ্ডের Leysin প্রদেশে সুউচ্চ আল্‌পস পর্ব্বতের উপর তাঁহার চিকিৎসাগার (Clinics) স্থাপিত। ভূপৃষ্ঠের অব্যবহিত পরবর্ত্তী স্তরের বায়ু ততটা বিশুদ্ধ নহে তাহাতে ধূলিকণা ও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে। এবং ইয়োরোপ মহাদেশে সূর্য্য কিরণ ততটা সুলভ নহে। এই দুই কারণে ডাক্তার রোলিয়ার আলপস পর্ব্বত পৃষ্ঠে উচ্চ স্থানে তাঁহার চিকিৎসাগার স্থাপন করিয়াছেন। কারণ এখানে ঐ দুইটা পদার্থই অপেক্ষাকৃত সুলভ। এরূপ উচ্চ স্থানে চিকিৎসাগার স্থাপনের আরও একটা প্রবল কারণ আছে। সূর্য্য হইতে রৌদ্রের পৃথিবী পৃষ্ঠে আসিয়া পৌঁছিতে অনেকটা বায়ু স্তর ভেদ করিয়া আসিতে হয়। এই বায়ু স্তর সূর্য্যকিরণের কতকটা খাইয়া ফেলে। সেইজন্য সমতল ভূপৃষ্ঠে যে সূর্য্যকিরণ পাওয়া যায় তাহাতে ঐ ultra violet rays সবটা থাকে না। কিন্তু উচ্চ স্থানে আসিতে সূর্য্যকিরণকে অপেক্ষাকৃত কম বায়ুস্তর ভেদ করিতে হয় বলিয়া তথায় ঐ বিশেষ কিরণটি একটু বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। কেবল ধূলিকণা নয় বায়ু অনেক সময়ে আর্দ্র থাকে। সেই শীকর সংপৃক্ত বায়ুও কিয়ৎ পরিমাণে সূর্য্যকিরণ শোষণ করিয়া লয়। আবার লোকালয়ের বায়ু আর একটা কারণে অবিশুদ্ধ হইয়া থাকে। সেটা হইতেছে ধূম। এই সকল পদার্থ সূর্য্যকিরণের কিয়দংশ খাইয়া ফেলিলে বাকীটা মাত্র মানুষ জীবজন্তু ও উদ্ভিদের ভোগে আসে। এই সমস্ত উপদ্রব হইতে সূর্য্য কিরণকে যথাসাধ্য রক্ষা করিবার জন্য উচ্চ স্থানে রৌদ্র চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়া থাকে। চিকিৎসালয়ের স্থানের উচ্চতা ও বায়ুর বিশুদ্ধতার উপর রৌদ্রের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

ডাক্তার রোলিয়ারের বিশ্বাস এইরূপ যে, উচ্চস্থানে রৌদ্র চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া অস্ত্র চিকিৎস সাধ্য যক্ষ্মারোগ—তা সে শরীরের যে কোন স্থানেই হউক না কেন এবং যত দিনের পুরাতন রোগই হউক না কেন —নিরাময় করা যায়।

পূর্ব্বে চিকিৎসকেরা মনে করিতেন অস্ত্রচিকিৎসা সাধ্য যক্ষ্মারোগ স্থানীয় ব্যাধি অর্থাৎ উহা শরীরের যে অংশে হয় কেবল সেই অংশই পীড়িত হইয়া থাকে। অধুনা অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা বলে জানা গিয়াছে যে ঐ ধারণা সত্য নয়। কোন স্থানে রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে শরীর সাধারণভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং সেই দুর্ব্বলতার সুযোগে রোগও প্রবল হইয়া থাকে। অতি শৈশব কাল হইতেই যক্ষ্মা রোগের বীজাণু মানব দেহে বর্ত্তমান থাকে। শরীরের যে স্বাভাবিক রোগ প্রতিষেধ শক্তি আছে তাহারই দরূণ এই বীজাণুগুলি সংযত থাকে প্রবল হইতে পায় না। কিন্তু শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে আর তাহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। কাজেই রোগ প্রবল হইবার সুযোগ পায়। সংক্রামক রোগসমূহের মধ্যে যক্ষ্মা রোগ শারীরিক সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে। অতএব ইহার প্রকৃত চিকিৎসা করিতে হইলে কেবল স্থানিক চিকিৎসা করিলে চলে না শরীরে সাধারণভাবে বলাধান করিয়া তাহার রোগপ্রতিষেধ শক্তি আগে বাড়াইয়া লইতে হয়। উপযুক্ত ভাবে এবং যথোচিত মাত্রায় রৌদ্র প্রয়োগ করিয়া এই উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ রূপে সুসাধ্য ও সুসিদ্ধ হয়। রোগীর সমগ্র উলঙ্গ দেহে প্রত্যক্ষভাবে সূর্য্যরশ্মিপাতে এবং বিশুদ্ধ স্নিগ্ধ পার্ব্বত্য বায়ু সেবনে তাহার স্বাস্থ্যের সমূহ উন্নতি হয়। সূর্য্যকিরণ কেবল যে বেদনা হ্রাস করে তাহা নয় ইহা জীবাণু নাশক ও রোগ প্রশমকও বটে। ডাক্তার রোলিয়ারের চিকিৎসালয়ে বারো মাসেই চিকিৎসা চলিতে পারে এমন সুব্যবস্থা আছে।

মনুষ্যের গাত্রের চর্ম্ম একটী অদ্ভুত জিনিস। ইহা যে কেবল শরীরের ময়লা লোমকূপের ভিতর দিয়া বাহির করিয়া দেয় তাহা নয় ইহা বাহির হইতে নানা বস্তু শোষণও করিয়া থাকে। বায়ুমণ্ডলস্থ অম্লজান এবং জলকণা চর্ম্ম দ্বারা শরীরে শোষিত হয়। বায়ুতে আর একটী পদার্থ আছে—তেজ energy। চর্ম্ম এই atmo pheric energyও শোষণ করে। এই জিনিসটি যে কি তাহা এখনও সঠিক নির্ণীত হয় নাই তবে ইহা আছে এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে। মরু বায়ুতে অবস্থিতি করিয়া এই তেজ শোষণ করিয়া বহুদিনের শয্যাগত রোগী অচিরে বলবীর্য্য লাভ করিয়া থাকে। লেইসিন গ্রামে ডাক্তার রোলিয়ারের চিকিৎসাগারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানে এইরূপে রোগী স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকে।

সকল রোগী একই ভাবে এই চিকিৎসা সহ্য করিতে পারে না। ইহা সওয়াইয়া লইতে ভিন্ন ভিন্ন রোগীর ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ সময় লাগে। ডাক্তার বিবেচনা করিয়া কাহাকে কতক্ষণ কি পরিমাণে সূর্য্য কিরণ খাওয়াইতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

একেবারে সমগ্র দেহে সমস্ত দিন ধরিয়া রৌদ্র লাগানো হয় না। প্রথমে শরীরের সামান্য একটু অংশ অনাবৃত রাখিয়া সামান্য ক্ষণের জন্য রৌদ্র লাগানো হয়। ক্রমে ক্রমে দেহের বেশী বেশী অংশ অনাবৃত করিয়া বেশীক্ষণ সময় রৌদ্র পোহানো হয়। যে রোগী সমতল ভূমিতে বহুকাল শয্যাগত ছিল সে এখানে আসিয়া কয়েকদিন বিশুদ্ধ বায়ু ও রৌদ্র উপভোগ করার পর তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় রক্তের তেজ বৃদ্ধি হয় রক্তের শোণিমা (হিমগ্লবিনের) সংখ্যাধিক্য ঘটে। শরীরে বেদনা আর থাকে না।

সুবিবেচক চিকিৎসক মহাশয় রোগীদের মানসিক খাদ্যেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। নানা রকম খেলাধূলা ও আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্তও আছে। এই প্রবন্ধের পূর্ব্বে প্রকাশিত চিত্রগুলি দেখিলেই তাহা কতক বুঝা যাইবে ছেলেদের জন্য আবার একটী স্কুলও আছে।

রৌদ্র কেবল রোগ আরোগ্যই করে না ইহা রোগ নিবারণও (prevention) করিয়া থাকে। যক্ষ্মা রোগের বীজ প্রায় বাল্যকালেই শিশুদেহে সংক্রামিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার সময়ে স্ত্রী পুরুষ মাত্রেরই দেহে যথেষ্ট পরিমাণে যক্ষ্মারোগের বীজাণু বর্ত্তমান থাকে। সাধারণ স্বাস্থ্যোন্নতি ও শরীরে বলাধান করিয়া ইহাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য দেহে সামর্থ্যের সঞ্চার করা আবশ্যক। বিশুদ্ধ বায়ু ও রৌদ্র স্নান এ পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ।

সূর্য্যালোক।

সূর্য্যালোক কি? তাহার এই রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিল? সূর্য্যালোক সমগ্র সৌরজগতের আলোকের একমাত্র উপাদান। উহা প্রকৃত পক্ষে একটা তেজ মাত্র। ইথারের মধ্য দিয়া এই তেজের তরঙ্গ আসিয়া আলো রূপে আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়। এই তেজ আবার ইলেক্ট্রনের কম্পন হইতে উদ্ভূত। জড়বস্তুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশের বৈজ্ঞানিকেরা নাম দিয়াছেন—ইলেক্‌ট্রণ। একটী কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে ইলেক্‌ট্রণগুলি থাকিয়া কম্পিত হয়। ইলেক্ট্রনের সংখ্যানুপাতে বিভিন্ন বস্তুর সৃষ্টি হয়। ঐ কেন্দ্রটি পজিটিভ তাড়িত ও ইলেক্ট্রনগুলি নেগেটিভ তাড়িত গুণসম্পন্ন। কাজেই উহাদের সমবায়ে ইলেক্‌ট্রণগুলি নিয়ত কম্পিত হইতেছে। কোন বস্তুকে উত্তপ্ত করিলে কম্পনের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। এর বস্তুটি শীতল হইলে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কোন ধাতুকে উত্তপ্ত করিলে তাহা লাল হয় ও তাহা হইতে আলো উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ উহা হইতে তেজের তরঙ্গ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য ও কম্পনের গতিবেগ বিভিন্ন প্রকার। সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ তরঙ্গগুলি বেতার বার্ত্তাবহের কাজে লাগে। যে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যত কম তাহার কম্পন বেগ

তত বেশী। দৈর্ঘ্যে যে তরঙ্গ দ্বিতীয়, তাহার নাম হার্টজিয়ান তরঙ্গ। তৃতীয় তরঙ্গ তাপ উৎপাদন করে। চতুর্থ তরঙ্গ আলোর সৃষ্টি করে। আর কেবল এই তরঙ্গগুলিই মানুষের চোখে ধরা পড়ে। সূর্য্যের কিরণ এই সকল তরঙ্গ সমবায়ে উৎপন্ন। তন্মধ্যে যেগুলি আলোক উৎপাদক তরঙ্গ যাহা আমরা দেখিতে পাই বৈজ্ঞানিকেরা যাহাদের luminous rays বলিয়া থাকেন তাহারা কয়েকটি বর্ণের সমষ্টি। একটী ত্রিকোণাকার কাচের মধ্য দিয়া সূর্য্য কিরণ দর্শন করিলে এই বর্ণগুলি দেখা যায়। রামধনুও এই বর্ণ সমন্বয়ে উৎপন্ন হয়। উক্ত কাচখণ্ডকে spectrum বলে। ইহার মধ্যে যে সকল বর্ণ দেখা যায় তন্মধ্যে এক প্রান্তের বর্ণ infra red rays ও অপর প্রান্তের বর্ণ ultra violet rays। লাল বর্ণটি তাপজনক। আর ভীম বেগুনী বর্ণটি রাসায়নিক বর্ণ। আলোক বেথাটিই ফটোগ্রাফের প্লেটে রাসায়নিক ক্রিয়ার গুণে চিত্র উৎপাদন করে। এই আলোক প্রাণীবের তন্তু বা টিশুগুলিকে উত্তেজিত করিয়া থাকে।

ঋতুভেদে সূর্য্য কিরণের উপাদানের পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরিবর্ত্তনের ফল মানবদেহে প্রত্যক্ষ করা যায়। অর্থাৎ ঋতুভেদে রৌদ্রের উপাদানের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেহের অবস্থারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়। আমাদের শরীরে যে ductless glands আছে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে তাহাদের ক্রিয়া ভাল হয়। গোরুর thyroid glandএ শীতকালের অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে আয়োডিনের পরিমাণ অধিক দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে দেহের রক্তে চুণ ও ফসফরাসের ভাগ বেশী থাকে। রক্তে এই দুই পদার্থ কমিয়া গেলেই শিশু rickets রোগে আক্রান্ত হয়। সূর্য্য কিরণ সম্পাতে এই দোষ শীঘ্রই কাটিয়া যাইতে পারে।

উদ্ভিজ্জগতের উপরও সূর্য্য কিরণের প্রভাব অল্প নহে। বস্তুত রৌদ্র না পাইলে গাছপালা প্রায় বাঁচে না। যদিই বাঁচে তথাপি রুগ্ন অবস্থায় কোনরূপে প্রাণটুকু মাত্র ধারণ করিয়া রাখে। উদ্ভিজ্জ আমাদের অন্যতম খাদ্য। উদ্ভিদ খাদ্যের সহিত আমরা সূর্য্য কিরণ ভক্ষণ করি। যে শাকসব্জি বা তরকারী যথেষ্ট পরিমাণে সূর্য্য কিরণ ভোগ করিতে পায় নাই সেরূপ উদ্ভিজ্জ বস্তু আহার করিলে আমরাও আহারের সম্যক ফল প্রাপ্ত হই না—আমাদের দৈহিক পুষ্টির ব্যাঘাত জন্মে।

সূর্য্য কিরণ যেখানে প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদের ভোগে আসে না রৌদ্র সেবন করিয়াও যে ক্ষেত্রে আমরা উপকার পাই না সে সব ক্ষেত্রে খাদ্যে রৌদ্র খাওয়াইয়া সেই খাদ্য ভক্ষণে প্রভূত উপকার লাভ করা যায়। ইন্দুর শাবকের উপর সূর্য্য কিরণের এই বিশেষ গুণটির চরম পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

সূর্য্যোপাসনা।

প্রাচীন কালের লোকেরা সূর্য্য কিরণের এই মহৎ গুণের কথা জানিতেন। সেই জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতে সূর্য্যোপাসনা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল এবং এখনও কোন কোন স্থলে আছে।

মেক্সিকো ও পেরুদেশে মেগাস ও আজটেক্স নামক প্রাচীন জাতিদ্বয় সূর্য্যোপাসক ছিলেন। বাইবেলে লিখিত আছে যে ইস্রেলাইটস ইজিপ্সিয়ানস আরব্য জাতি চালডিয়ান্স সীরিয়ান ও রোমাণ জাতি পুরা কালে সূর্য্যোপাসনা করিতেন। বর্ত্তমান কালে পার্শীয়া সূর্য্যোপাসনা করেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু উষাস্নান সারিয়া জবাকুসুম সঙ্কাশং মন্ত্র জপ না করিয়া জল গ্রহণ করেন না। খৃষ্টানদের রবিবার বা সূর্য্যবার পবিত্র দিবস বলিয়া গণ্য। প্রাচীন গ্রীকদের দেবতা Aesculapius সূর্য্য ঔষধ ও সঙ্গীতের দেবতা ছিলেন। তাঁহার উদ্দেশে গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কোস (Cos) দ্বীপে একটী স্বাস্থ্যমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল এই মন্দিরের পুরোহিতেরা চিকিৎসক ছিলেন। রোগ নিবাময় কল্পে বাতাস আলো ও জল এখানে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত।

এখন বিংশ শতাব্দীর সভ্যগুলোকে সূর্য্য সেকালের মত না হউক অন্য ভাবেও মানুষের পূজ্য বটে।

ঘণ্টা বাঁধিবে কে ?

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি এ]

শেষ পর্য্যায়।

সভ্যতার তিনটা মাপকাঠির (three standards of civilisation) কথা আমরা পাশ্চাত্য সমালোচকদের মুখে সর্ব্বদাই শুনিয়া থাকি। তাঁহারা বলেন—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ধনবত্তার প্রাচুর্য্য অপাচুর্য্যের উপরেই জাতির উন্নতি ও অবনতি নির্ভর করে। যে জাতির মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা কম, মৃত্যুহার অধিক ও ধনবত্তা (assets) কম সে জাতি বেশী দিন বাঁচিতে পাবে না। এই মাপকাঠিতে আমাদের দেশের অবস্থা পরিমাপ করিতে গেলে দেখা যায় জাতি হিসাবে আমাদের মৃত্যু অতি সন্নিকট।

কর্ণেল ইউ এন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালী জাতি ধ্বংসোন্মুখ বলিয়া যে দিন প্রচার করিলেন সে দিন আমাদের অনেকের মনে হইয়াছিল কথাটা একটু বেশী বলা হইয়াছে।—আমরা নানা প্রকারে প্রমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম যে আমরা সজীব জাতি। আমাদের এই প্রমাণ প্রচেষ্টা সাধু ইহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু আমাদের জাতীয় মৃত্যুর দিন যে আগত প্রায় সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার বিশেষ কিছু কারণ নাই। এখনও বাংলা দেশে শতকরা ১ টী লোকও শিক্ষিত নন। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা ২ জনেরও কম। আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যেও শতকরা ৭ জন শিক্ষিত অথচ আমরা সুসভ্য ইংরাজ শাসনে থাকিয়াও শিক্ষার গর্ব্ব করিতে পারি না।

স্বাস্থ্যের অবস্থা আরো ভয়াবহ। ইউরোপের কোন দেশেই গড় পরমায়ুর হার ৪ বৎসরের কম নহে—আমাদের দেশে মাত্র ২২ বছর। বিলাতে যেখানে হাজারকরা ৭ টী শিশু মরে আমাদের কলিকাতা সহরে সেখানে মৃত্যুর হার ৩ শত। অথচ প্রভুরা আদর করিয়া সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন—Calcutta is London of the East

ধনবত্তার অবস্থার কথা ভাবিলে মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। লর্ড কার্জন (Lord Curzon) সাহেব বলিয়াছেন ভারতবাসীর জন প্রতি বাৎসরিক আয় ৩০ টাকা। সে দিন অর্থনৈতিক কনফারেন্সে সার বিশ্বেশ্বরায়া বলিয়াছেন আমাদের সমস্ত গরু বাছুর সানকী বদনা বিক্রয় করিলে জন প্রতি asset দেখা যায় ১৮০ টাকা। আমেরিকায় ৬ হাজার টাকা।

শিক্ষা স্বাস্থ্য ও ধনের এই অসম্ভব প্রাচুর্য্য দেখিলে সত্যই মনে হয়—

বিশ্বমাঝে নিঃস্ব মোরা অধম ধূলির চেয়ে।

যিনি পল্লীসংগঠন কামী হইবেন তাঁহাকে দেশের এই নগ্ন মূর্ত্তি চোখের সম্মুখে সর্ব্বদা ধরিয়া রাখিতে হইবে। যাঁহারা বলেন এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি তাঁহাদের স্বদেশ প্রেম ও ভাবুকতার প্রশংসা করি কিন্তু দেশ প্রেম যেন আমাদিগকে বাস্তবতার কথা ভোলাইয়া না দেয়। অন্ধ দেশপ্রেম সত্যলাভের অন্তরায় যেন না হয়। Sir Visveswaraya বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের অবস্থাকে যে দুইটী শব্দে প্রকাশ করা যায় উহা দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা। (Condition of India may be summed up in two words—poverty and ignorance)।

এক বিরাট হাহাকার দেশে উঠিয়াছে। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে আনন্দ উৎসব সব লোপ পাইয়াছে, লোকের রুচি ও মতি গতি ফিরিয়া গিয়াছে। পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা চুরি ডাকাতি সবই দারিদ্র্যেরই ফল। যতই দেশ দরিদ্র হইতেছে ততই লোকের জীবনের আনন্দ রস শুকাইয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্রই শোনা যাইতেছে, বাঙ্গালী হইয়া জন্মান বিধাতার অভিশাপ। যুবকের

চোখে আনন্দ দীপ্তি নাই—প্রৌঢ়ের কাছে পুত্র পরিজন ভীতির বস্তু। কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করিতে সাহস পায় না। সন্ধ্যার অন্ধকার যখন পল্লীগ্রামটীকে আবৃত করিয়া ফেলে, মনে হয় মৃত্যুর কাল যবনিকা পাত হইয়াছে আর যেন জাগিতে না হয়। বাঙ্গালী জন্মের উপর ধিক্কার আসিয়া গিয়াছে।

কর্ম্মী আজ তোমাকে এই মৃত্যুর হাত হইতে জাতিকে বাঁচাইতে হইবে। দুই শত বৎসর কেবল শুনিয়াছি—আমরা মিথ্যুক আমাদের ইতিহাস নাই সজীব ধর্ম্ম নাই উন্নত আদর্শ নাই। তোমাকে আজ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিতে হইবে—

বিফল নহে এ বাঙ্গালী জনম
বিফল নহে এ প্রাণ।

যদি জাতিকে অবসন্নতার হাত হইতে বাঁচাইতে চাও তবে প্রাণের ভিতরে প্রথম অনুভব কর আমরা বাঁচিবই বাঁচিব। তবে অন্যকে বাচাইবার বাণী তোমার প্রাণের মধ্যে শুনিতে পাইবে। বিশ্বকে ডাকিয়া বল আমি বাঙ্গালী হইয়া জন্মিয়াছি—এই আমার গৌরব—এই আমার আনন্দ। বল ভাই আমি ইংরাজ নই,—ফরাসী নই আমি বাঙ্গালী। তবে প্রাণের মধ্যে শক্তি আসিবে—কর্ম্মস্পৃহা জাগিবে।

শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন আমার মনে হয় বাঙ্গালী একটী আত্মবিস্মৃত জাতি। আমাদিগকে আজ সেই আত্মশক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে বাঙ্গালী দেশকে ভালবাসতে শিখিয়া স্বদেশ সেবার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছে। দরিদ্র কৃষককে ডাকিয়া বল তুমি আমার ভোটের দিনের সঙ্গী মাত্র নও—তুমি আমার ভাই আমার রক্ত। প্রতিবাসীকে ভালবাসিলে সেবার মধ্য দিয়া তার হৃদয় জয় করিতে পারিবে। পল্লী সংগঠনকামীকে এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—

যদি চাও প্রাণ যদি চাও মান
আগে প্রাণ কর দান।

যুদ্ধের জন্ত যেমন sinews of war—জনবল ও অর্থবল দরকার পল্লী সংগঠনের জন্তও তেমনি কর্ম্মী ও উপযুক্ত অর্থ আবশ্যক। পল্লীসংগঠনও একপ্রকার যুদ্ধই বলিতে হইবে। স্তূপীভূত অভাব দুঃখ ও দৈন্যে পল্লী জীবন জর্জ্জরিত অসংখ্য দুর্নীতিতে পল্লী সমাজ কলঙ্কিত। এই অবস্থার সঙ্গে কর্ম্মীকে যুদ্ধ করিতে হইবে। সে জন্ত কর্ম্মীর দিক দিয়া কি কি অত্যাবশ্যক তাহার কিছু কিছু উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। কর্ম্মীর প্রথম চাই ধৈর্য্য পল্লীবাসীর নিকট কৃত কর্ম্মের জন্ত প্রশংসা লাভ ত দূরের কথা—অনেক সময় তাঁহাকে তিরস্কৃত হইতে হইবে। সেই অভিমানে যিনি সরিয়া পড়িবেন অথবা সেই দুঃখে যিনি মুসড়িয়া পড়িবেন পল্লী সংগঠন তাঁর কার্য্য নয়। বাবে বাবে নিভব বাতি—হয়ত বাতি জ্বলবে না। কিন্তু তা বলে ভাবনা করা চলবে না। আমি অনেক স্থানে লক্ষ্য করিয়াছি যে কর্ম্মীরা কাজ করিয়া গ্রামবাসীর সহানুভূতির আশায় থাকেন এবং সহানুভূতির পরিবর্ত্তে নিন্দালাভ করিয়া বিরক্ত হন। একপ বিরক্তি অস্বাভাবিক নয় কিন্তু উপায় নাই। পল্লীজীবন এমনই দূষিত হইয়াছে যে সৎ কাযকে সৎ কায হিসাবে গ্রহণ করিবার জন্ত যে উদার চিত্তবৃত্তির প্রয়োজন লোকে তাহাও হারাইয়াছে। পল্লীবাসীর এই মানসিক অবনতির কারণ কি সে বিষয়টীও তলাইয়া দেখা দরকার।

ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র ছিল পল্লী অথবা village community ছিল ভারতের বিশিষ্টতা। এই পল্লী মণ্ডলীগুলি এমনই কৌশলে গঠিত ছিল যে রাজ্য বিপ্লব অথবা অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ও পল্লীশ্রী নষ্ট হইত না, অথবা জন সাধারণের জীবন যাত্রার কোন ব্যাঘাত হইত না। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন বিলাতে যদি রাষ্ট্রশক্তি বিপর্য্যস্ত হয় তবে দেশের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় আমাদের দেশে যদি সমাজ পঙ্গু হয়, তবে দেশের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরাও এই বিষয়টী লক্ষ্য করিয়াছেন যে, যখন মোগল সাম্রাজ্যের শেষ ভাগে অন্তর্বিপ্লবে দেশ বিপন্ন, তখনও পল্লী মণ্ডলীগুলি

অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। মুসলমানেরা যখন বাংলার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত—রাজধানী যখন বিপন্ন তখনও নিভৃত পল্লীতে বসিয়া জয়দেব কোমল কান্ত পদাবলী লিখিয়া গিয়াছেন। এমনই সুকৌশলে গঠিত ছিল পল্লী জীবন স্যার জন মালিকম বলিয়াছেন—Considering the incessant wars and revolution in which they had been engaged for a full century after the Moghul empire broke up, it is quite a wonder that there was any Covernment at all Yet in the midst of incessant fightings the civil institutions were undisturbed and almost everywhere the country was flourising

পল্লী মণ্ডলীগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রমূলক রাজ্যের মত ছিল। পল্লীবাসীর জীবনের সমস্ত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সেখানে মিলিত। প্রতি পল্লীর রজক ক্ষৌরকার তৈলিক ও কুম্ভকার ছিল প্রতি গ্রাম স্বরাট অর্থাৎ—Self contained ছিল। Sir Charles Metcalf লিখিয়াছেন —The village communities are little republics having really everything they want within themselves Dynasty after dynasty tumbles down revolution succeeds to revolution but the village communities remain the same The union of village communities each one forming a little separated State in itself has I conceive contributed more than any other cause to the preservation of the people of India through all revolutions and changes which they have suffered and it is in a high degree conducive to their happiness and to the enjoyment of great portion of freedom and independence.

পল্লী সমাজের এই সংহতি শক্তি অথবা solidarity ভারতকে রক্ষা করিয়াছিল প্রতি গ্রামবাসী অপরের জন্য নৈতিক দায়িত্ব বোধ করিতেন একের অভাব ও অস্বাচ্ছন্দ্য অপরকে সহ্য করিতে হইত। প্রত্যেকে পরের জন্য বেদনা অনুভব করিত। আজ আমরা পল্লীবাসী স্ব স্ব প্রধান ও আত্মসুখান্বেষী হইয়াছি বলিয়া যে দুঃখ করি তার জন্য দায়ী কে? সমাজের সেই গঠন আর নাই—এক মহা বিপ্লবে ভারতীয় সমাজতন্ত্র ভগ্ন হইয়াছে। সে প্রীতির বন্ধন আর নাই—সে সামাজিক দায়িত্ব জ্ঞান, লোকের লোপ পাইয়াছে—পল্লীমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া গিয়া দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। Mr G Adams C S তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ Last and Westএ লিখিয়াছেন যে সমাজের প্রতি লোকের দায়িত্বজ্ঞান লোপ পাওয়ার ফলেই স্বার্থত্যাগ করিবার মত উদার মনোবৃত্তিও লোকের আর নাই। মি এডামস লিখিয়াছেন—

In the earlier days each member of the commune was bound up by his own self interest to subordinate his personal desires to the general interest of the community In the new days he began to assert his own private desires and interests because he has nothing to gain by suppressing them The joint and united action of the community was no longer necessary for his protection from outside enemies and he no longer felt himself dependent on the good will and sympathy of his neighbour so he was less and less inclined to give in to them individually or as a body in any matter on which his private interests were opposed to theirs এইরূপে গ্রামবাসীর মধ্যে ঈর্ষা দলাদলি ও স্ব স্ব প্রাধান্য আসিয়া দেখা দিল। দলাদলি

আসিল—হিংসা দ্বেষে পল্লী সমাজ দূষিত হইল। জাতীয় জীবনের প্রতি মমত্ব বোধ গেল—উচ্চ ও মহান্ প্রবৃত্তিগুলি একে একে বিদায় গ্রহণ করিল। আজ আমরা তাই পল্লী সমাজে একদল লোক দেখিতে পাই তাহারা পরস্পর একত্র বাস করিলেও মনের মধ্যে তাহাদের কাজে অপরের প্রতি প্রীতি ও সদ্ভাব নাই। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে পল্লী সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়া একদল স্ব স্ব প্রধান লোক দেখা দিয়াছে—তাহারা একত্র বাস করিলেও কেহ কাহারও প্রতি মমত্ব বোধ সম্পন্ন নহে —The village organism has disintegrated into a multitude of disunited individuals living it i true in mutual proximity but unconscious of their common interests

এ কথা সকলেই জানেন যে উদার মনোভাব পরাধীন জাতির মধ্যে থাকিতে পারে না। দারিদ্র্যের ফলে চিত্তবৃত্তিগুলি নীচ হইয়া যায়—দাদাভাই নৌরজী বলিয়াছেন—With material wealth go also the wisdom and experience of the country জীবনযাত্রার কঠোরতা ও দুঃসাধ্যতা যত বাড়িতেছে আয়ের পথ যতই সংকীর্ণতর হইতেছে, জাতির মধ্যে ঘুষ লওয়ার প্রবৃত্তি অথবা ঠকাইবার ইচ্ছা ততই বাড়িতেছে। অন্নাভাবে শীর্ণ চিন্তা জ্বরে জীর্ণ ও অনশনে তনু ক্ষীণ এই বুভুক্ষু জনসাধারণের নিকট উচ্চ মহান ও উদার মনোবৃত্তির আশা করা বাতুলতা মাত্র। এখনও সদাচারী লোকের অভাব হয় নাই সে আমাদের জাতির পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যের ফল। এই দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ ও বিদেশী শাসনে উচ্চ মনোবৃত্তি বর্দ্ধিত হওয়া স্বাভাবিক নহে। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে—পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চ শ্রেণীস্থ লোক স্বীয় বুদ্ধি শিক্ষা বংশ ও মর্য্যাদানুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। যাহার বিদ্যা ও বুদ্ধি আছে তাহাকে যদি বুদ্ধি সঞ্চালনের ও বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায় তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। জাতীয় গুণের স্ফূর্ত্তি হইতেছে না।

তাহা হইলে দেখা গেল যে পল্লীবাসীর সংকীর্ণতা পরস্পরে বিশ্বাসের অভাব ইহা কিছু অস্বাভাবিক নহে—নানা কারণে এই মানসিক অধঃপতন ঘটিয়াছে। আজ দুঃখ করিয়া কি হইবে যে আমাদের সৎকাজেও তাহারা দোষ ধরে। আমাদিগকে আজ ধীরে ধীরে গ্রামবাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে হইবে। আমাদের কর্ম্ম চরিত্রের মাহাত্ম্য ও সর্ব্বোপরি আমাদের কর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত যখন তাহারা পরিচিত হইবে তখন এই অবিশ্বাসের ভাব তাহাদের থাকিবে না। তাই বলিতেছিলাম যে কর্ম্মীর ধৈর্য্য চাই—কাজে লাগিয়া থাকা চাই।

অনেকে বলেন যে কর্ম্মীদের মধ্যে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। কর্ম্মীরা নাকি ঠিকমত তৈরী হন নাই তাই কাজও অগ্রসর হইতেছে না। কথা কয়টি প্রণিধান যোগ্য।

আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করিয়া থাকি যে কর্ম্মীর আত্মম্ভরিতা ও ব্যক্তিগত প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা অনেক সময় কার্য্য পণ্ড করিয়া দেয়। ভারত যদি উদ্ধার হয় আমার দ্বারাই হৌক্ নতুবা ভারত রসাতলে যাউক—এরূপ মনোভাব আমাদের অনেকের মধ্যেই অল্পবিস্তর আছে। গ্রামে কাজ করিতে যাইয়া আমরা অনেক সময় অভীষ্ট কাজ নিজের স্বভাবের দোষে নষ্ট করিয়া দিয়া থাকি। যদি কেহ আমাদের কথায় আপত্তি করে অথবা যদি কোন ভাবে আমরা দেখি যে আমাদের কথা থাকিল না অমনি অগ্নিশর্ম্মা হই—গ্রামের লোককে নিমকহারাম বলি। বামুন কায়েতেরে কায়স্থও শূদ্রের কথামত কাজ করিতে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন। শুধু তাহাই নহে অনেক সময় রীতিমত বাধাও দেন। একত্র কাজ করিবার মত উদারতা আমাদের বড় কম। কথায় কথায় মন কষাকষি কথায় কথায় আরব্ধ কার্য্য ছাড়িয়া দেওয়া আমাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা সবাই অপরকে বুদ্ধিহীন মনে করি—এই সব আত্মা

ভাব আমাদের মজ্জাগত। আপনি বিশেষজ্ঞ হইয়াও যদি একটা কথা বলেন একদল পল্লীতে আছেন তাহারা ফুৎকারে সব উড়াইয়া দিয়া বলিবেন—এ সব বুজরুগী। আত্মম্ভরিতা আমাদের পাইয়া বসিয়াছে—ক্ষমতাপ্রিয়তা আমাদের কর্ম্মীদের মধ্যেও এত বেশী যে কেহ একটু বাধা দিলেই অসহিষ্ণু হই—মনোভঙ্গ হই এবং কাজ ছাড়িয়া দিয়া বলি— ইহাদের জন্ত কাজ করা মূর্খতা শুধু ইহাই নহে—দল পাকাইয়া অনেক সময় নিজের সাধের কাজটিকে মাটি করিয়া দিতেও আমরা দ্বিধা বোধ করি না। একদিকে ব্যক্তিগত আত্মম্ভরিতা ও অপর দিকে দলগত প্রাধান্ত লাভের চেষ্টা—উভয়ই পল্লীতে লক্ষ্য করিয়া থাকি। যদি বা সৌভাগ্যক্রমে গ্রামে একটা দল গড়িয়া উঠে কিছুদিন পরেই দেখা যায় তাহারা এতই ক্ষমতাপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে অন্যে তাহাদের কার্য্যে যোগ না দিলে তাহারা তাহাদের বিরুদ্ধ দলকে তাচ্ছিল্য করে সময় অসময়ে টিটকারী দেয় তাহাদের মূর্খ স্বার্থপর ও ঘৃণ্য প্রতিপন্ন করাইবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগে। এই মুরব্বিয়ানার ভাব আমাদের মধ্যে বড় প্রবল। লোকে যদি তোমার কার্য্যকে গৌরবের চক্ষে না দেখে অথবা জানিয়া শুনিয়াও তোমাদের বাধা দেয় তাহাতে যদি তুমি অসহিষ্ণু হও এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ কর তাহাতে ত কেবল শত্রু সৃষ্টি হইবে—তোমার বিপক্ষে একটা দল গড়িয়া উঠিবে। অনেক গ্রামে দেখা যায় যে যদি একদল লোক সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া একটা স্কুল করেন এবং অন্ত দলকে না ডাকিয়া তাচ্ছিল্যভরে তাহাদের মতামত অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে সেই অবমানিত দল আগুন দিয়া স্কুলঘর পোড়াইয়া দেয়—বেনামী চিঠি দিয়া সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে সাহায্য বন্ধ করিতে অনুরোধ করে। এইরূপে সংগঠন কামীর অসহিষ্ণুতা, সংসারানভিজ্ঞতা ও আত্মম্ভরিতা কত গ্রামে কত আরব্ধ ও শেষপ্রায় কার্য্য পণ্ড করিয়া দিয়াছে তাহা পল্লীবাসী মাত্রেই জানেন। পল্লীসংগঠন কামী যেখানেই দেখিবেন যে তাঁর মতামত কেহ পছন্দ করিতেছেন না তখনই তিনি সরিয়া দাঁড়াইবেন ব্যক্তিগত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া দেশ কল্যাণের জন্ত নিজেকে দূরে রাখিবেন। কাহাকেও আকারে ইঙ্গিতে তাচ্ছিল্য করিবার প্রয়োজন নাই। কার্য্য মাহাত্ম্যে যদি গ্রামবাসী আকৃষ্ট না হয় ধীরে ধীরে কাজ করিয়া যাইতে হইবে একদিন না একদিন সকলে একত্র হইবেই।

আর একটী দুর্ব্বলতা আমাদের কর্ম্মীদের মধ্যে মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। সেটী সর্ব্বদা পর প্রত্যাশা ও পরের মুখের দিকে সাহায্যের জন্ত চাহিয়া থাকা। কার্য্য আরম্ভ করিয়াই যে পল্লীবাসীর সাহায্য পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা করাও যেমন ভুল ও অসঙ্গত তেমনি আরব্ধ কার্য্যে সরকার অথবা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড সাহায্য না করিলে কাজ চলিবে না, এরূপ মনোভাবও ঠিক নহে। গ্রামবাসীকে ধীরে ধীরে দলভুক্ত করিতে হইবে—তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাদের দ্বারাই কাজ করাইয়া লইতে হইবে।

অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই যে কর্ম্মীরা চালাকী দ্বারা বড় বড় কাজ করিতে চান। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন চালাকী দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। মনে প্রাণে বিবেচনা পূর্ব্বক নিজের সামর্থ্য ও শক্তির পরিমাণ অনুমান করিয়া কাজে নামিতে হইবে। আন্তরিকতার সহিত কাজে লাগিয়া থাকিতে হইবে, যে বিষয় আমার নিজের জানা নাই অথচ অন্তের সে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান আছে সে সব ক্ষেত্রে তাঁহাদের সাহায্য লইতে হইবে। এরূপ আশা করা অন্যায় যে আমি একাই সব কাজের যোগ্য। আর যোগ্যতা থাকিলেই বা কি ? গ্রামের দশজনকে ন্যায্য কাজ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার আমাদের কি যুক্তি আছে ? সংকীর্ণ স্বার্থপরতা একা একা সকলকে উপেক্ষা করিয়া অথবা সকলের সাহায্য না লইয়া গ্রাম সংগঠনের চেষ্টা কখনও সফল হইতে পারে না। সে প্রতিষ্ঠান কখনও গ্রামে স্থায়ী হইতে পারে না, যাহার ভিত্তি সাধারণের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই যে গ্রামের জমিদার গ্রামবাসীর জন্ত অনেক সদনুষ্ঠান করিয়াছেন অথচ গ্রামবাসী উঁহার

সুযোগ ও সুবিধা লইতে অনিচ্ছুক। ইহার কারণ কি? যে জিনিসটা আমার নিজের আগ্রহে ও সহযোগিতায় তৈরী হয় নাই উহা কখনও আমার প্রাণের বস্তু হইতে পারে না উহার উন্নতির জন্ত আমার বাস্তবিক আন্তরিক আগ্রহ থাকাও সম্ভব নহে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, জনসাধারণকে বাদ দিয়া যে সব প্রতিষ্ঠান এদেশে গড়া হইয়াছে তাহার কোনটাই দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই। আমি অনেক যায়গায় দেখিয়াছি যে কোন মহাপ্রাণ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বেশ ভাল ভাল কাজ করিয়া দিয়া যান অথচ তার কোনটাই ঐ কর্ম্মচারীর স্থান ত্যাগের পর বাঁচে না। ইহার একমাত্র কারণ জনসাধারণ ঐ প্রতিষ্ঠানকে নিজের প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করে না। আবার অনেক যায়গায় দেখা যায় কর্ম্মী একাই অর্থ সংগ্রহ ও কাজের ব্যবস্থা সব করিয়া একটা অনুষ্ঠান করেন অন্তকে ডাকেন না। ঐ অনুষ্ঠানটী কর্ম্মীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত দাঁড়ায়। গ্রামের লোকে সর্ব্বদাই বলে এটা সরকারদের স্কুল ওটা বাঁড়ুয্যেদের দাতব্য অর্থাৎ তাহাদের উহা কিছুই নয়।

জনসাধারণের অর্থে—তাহাদের পরামর্শে ও সহযোগিতায় যে কর্ম্মের সূচনা হয়—জনসাধারণের চেষ্টায় যাহা গড়িয়া উঠে সেই সকল অনুষ্ঠান কখনও সহজে নষ্ট হয় না। যে সকল অনুষ্ঠান ব্যক্তিবিশেষের অর্থে ও ইঙ্গিতে চলে তাহা কখনও সাধারণের বস্তু হইতে পারে না। আমাদের গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাই বলিয়াছেন— এক পঞ্চায়েৎ আমাদের দেশের জিনিস ছিল এখন পঞ্চায়েৎ গভর্ণমেণ্টের আফিসে গড়া হইতে চলিল। যদি ফল বিবেচনা করা যায় তবে এই দুই পঞ্চায়েতের প্রকৃতি একেবারে পরস্পরের বিপরীত বলিয়াই প্রতীত হইবে। যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বত প্রদত্ত নহে যাহা গভর্ণমেণ্টের দত্ত তাহা বাহিরের জিনিষ হওয়াতেই গ্রামের বক্ষে একটা অশান্তির মত চাপিয়া বসিবে— তাহা ঈর্ষার সৃষ্টি করিবে—এই পঞ্চায়েৎ পদ লাভ করিবার জন্ত অযোগ্য লোকে এমন সকল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে যাহাতে বিরোধ জন্মিতে থাকিবে। এইরূপে যে পঞ্চায়েৎ গ্রামের বলস্বরূপ ছিল সেই পঞ্চায়েৎই গ্রামের দুর্ব্বলতার কারণ হইবে। এই কথাগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও যেমন সত্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য যে গ্রামবাসী আমাদের কোন প্রতিষ্ঠান তৈরী করার কথা শুনিলেই প্রথমত অবিশ্বাস পরে বিদ্রূপ করে ও শেষে বাধা দেয়। ইহার কারণ এই যে আমরা বহুবার তাহাদের বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছি। আমরা অনেক কাজ আরম্ভ করিয়া শেষ করি না—বহু কাজ পরস্পরের মনোমালিন্যে নষ্ট করিয়া ফেলি সাধারণের অর্থের হিসাবপত্র ঠিকমত দিতে পারি না। কাজেই জনসাধারণও আমাদের বিশ্বাস করে না। দোষ তাহাদের ততটা নয়—যতটা আমাদের।

আজ যিনি এই বিরাট কাজে নামিবেন তাঁহাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও ধীর হইতে হইবে। কর্ম্মী হওয়া বড় শক্ত পরীক্ষার কথা। নেতা অনেক পাওয়া যায় কিন্তু কর্ম্মীর বড় অভাব। নেতা হওয়ার আশা—নাম প্রচারের আশা কর্ম্মীকে ছাড়িতে হইবে। নেতা হওয়ার বড় দুঃখ— নেতা হওয়ার বড় গভীর দায়িত্ব, তাই জগদ্বরেণ্য বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—

যিনি হুকুম তামিল করিতে পারেন তিনিই হুকুম করিতে জানেন। প্রথমে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর।

শিরদার ত সাবদার"—মাথা পেতে দিতে পার ত নেতা হবে। আমরা সকলেই ফাকি দিয়ে নেতা হতে চাই তাইতে কিছু হয় না, কেউ মানে না।

নেতা কি বানাতে পারা যায়? নেতা জন্মায়। লিডারি করা বড় শক্ত—দাসস্য দাস —হাজারো লোকের মন যোগান। ঈর্ষা স্বার্থপরতা আদপে থাকবে না, তবে লিডার।

কর্ম্মীর প্রথমতঃ চাই—আন্তরিকতা। রবীন্দ্রনাথের গুরুগোবিন্দের মত তাঁহাকে বলিতে হইবে

এমনি কেটেছে দ্বাদশ বরষ
আরো কতদিন হবে
চারিদিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে।

কর্ম্মী যেদিন দেখিবেন তার নিজের ভিতরে ডাক আসিয়াছে সে দিন বাহির হইয়া পড়িবেন। কর্ম্মীর দ্বিতীয়ত চাই নির্ভীকতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভাষায় তাঁহাকে বলিতে হইবে—যে সত্য আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছে যাহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইলে যে পাটোয়ারী বুদ্ধি আবশ্যক তাহা আমার নাই। নিন্দাস্তুতি সমজ্ঞান করিয়া বিপদ ও দুঃখকে ভ্রূকুটি দেখাইয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হইবে।

কর্ম্মীর হৃদয়বত্তা চাই—কৃতকর্ম্মতা চাই। কাজ করিতে করিতেই কার্য্যশক্তি বাড়িবে। পরের জন্য ও দেশের জন্য কাজ করিতে গেলে নিজের চিত্তবৃত্তি নির্ম্মল হইবে। ধীরে ধীরে লোকে কার্য্য মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া দলভুক্ত হইবে। একদিন যাহারা বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছিল তাহারাই প্রশংসা করিবে। স্বামী বিবেকানন্দ কর্ম্মীকে লক্ষ্য করিয়া তাই বলিয়াছেন—

দুইটী জিনিস হইতে বিশেষ সাবধানে থাকিবে—ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ঈর্ষা। সর্ব্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর।

আমরা যখন দেশের জন্য কাজ করিতে যাইব তখন আমাদিগকে নিস্পৃহ চিত্তে কাজে লাগিয়া থাকিতে হইবে। বাধা বিপত্তি পদতলে দলিত করিয়া কর্ম্মপথে চলিতে হইবে। গ্যারিবল্ডীর সেই অমর বাক্য সকলকে প্রাণে প্রাণে স্মরণ করিতে হইবে—যখন কর্ম্মী নেতাকে জিজ্ঞাসা করিবেন—এই কার্য্যের জন্য তুমি আমাদিগকে কি দিবে? নেতা উত্তর করিবেন কি দিব? দিব—দুঃখ দিব—অনাহার দিব—শতছিন্ন বস্ত্র দিব—তৃষ্ণা দিব—বিনিদ্র রজনী, দিব—দীর্ঘ অভিযানে ক্ষত বিক্ষত পদতল দিব—সীমাতীত সংখ্যাতীত ক্লেশরাশি আর দিব মহৎ কার্য্যের ফল—বিজয় গৌরব।

What will you offer? they asked Offer! I offer you hardship hunger rags, thirst sleepless nights footsores in long marches privations innumerable and victory in a noble cause

দেশ সেবার পুরস্কার দেশ সেবা। সত্যপ্রিয়তা, কর্ম্মনিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত আমাদিগকে কর্ম্মে অবতীর্ণ হইতে হইবে—দুঃখ দৈন্য নিন্দা প্রশংসা জয় পরাজয় পথিমধ্যে বহুবার ভীতি প্রদর্শন করিবে তথাপি লাগিয়া থাকিতে হইবে। সকল কর্ম্মীকে কবির কথায় বলিতে হইবে—

(মোরা) মঙ্গল কাজে প্রাণ
আজি করিব সকলে দান
(মোরা) লভিব পুণ্য শোভিব পুণ্যে
গাহিব পুণ্য গান।
জয় জয় মঙ্গলময়!
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু অশুভ চিন্তা নয়,
যদি দৈন্য বহিতে হয়, তবু অশুভ কর্ম্ম নয়
যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু অশুভ বাক্য নয়
জয় জয় মঙ্গলময়।

[লেখক প্রণীত পুস্তক পল্লী সংগঠন পাঠে পাঠক অনেক জ্ঞাতব্য কথা পাইবেন। প্রাপ্তিস্থান—স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ। মূল্য চারি আনা।—সম্পাদক]

স্বাস্থ্যচর্য্যা

[শ্রীচক্রধর সাহা]

আমরা ইচ্ছা করিলে জীবনকে সুদীর্ঘ ও সুখপূর্ণ করিতে ও জরা মৃত্যুকে পিছাইয়া রাখিতে পারি। চেষ্টা করিলে ইচ্ছা থাকিলে শরীর মন ও আত্মা নিয়ত স্বভাবের শুভ পরিবেষ্টনের মধ্যে যথাসম্ভব সাত্বিক বাতাবরণের শান্তিময় হিল্লোলে অমৃতধামের যাত্রীরূপেই জীবন পথে পরিচালিত হইতে পারে। আর যদি প্রতি নরনারী সতত যত্নের সঙ্গে তাহারই সুব্যবস্থা করিতে পারে তবে রোগ জরা ও মৃত্যুকে বাধা প্রদান করত বহু পশ্চাতে রাখিতে পারে। সর্ব্বদা শুভবুদ্ধি ও অন্ত দৃষ্টির প্রেরণায় জীবনকে সত্যের পথে ধর্ম্মের পথে স্থির ও দৃঢ় পদে পরিচালনা করা অর্থাৎ দেব ভাবের মধ্যে জীবন যাপন করাই মানুষের প্রকৃত নিয়তি। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্রতা আমিত্বের ভ্রান্ত জ্ঞান এবং দেহাত্মবুদ্ধি জনিত হিংসা বিদ্বেষ আলস্য জড়তা প্রভৃতি যখন আমাদের জীবনের বিঘ্নস্বরূপ হইয়া উঠে তখন আমরা সেই সমস্ত পশুভাবের বিরুদ্ধে সবলে দণ্ডায়মান হইতে চাহিলেই মানসিক ও শারীরিক শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক হয়। তখনই আমাদের দেবভাব সমূহ আমাদের সহায় হয়। সেই মুহূর্ত্তে সবলে শারীরিক ও মানসিক কর্ম্ম শীলতার সঙ্গে দৃঢ় পদে যদি আমরা বাধা প্রদান করিতে না পারি তবে আমাদের পরাজয় অর্থাৎ দেবভাবের হ্রাস ও পশু ভাবের প্রাধান্য আসিয়া পড়িবে। সঙ্কট কালে আমাদের মানবভাবকে যদি দেবভাবের সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া লইতে পারি তবে আমরা জয়ী হইব। এটা পরীক্ষিত সত্য। জীবনে কার্য্যত যাহা ঘটে ধীর চিত্তে তাহা নিরীক্ষণ পূর্ব্বক প্রবুদ্ধ বিজ্ঞান দৃষ্টিতে তাহাই জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ অথবা ত্যাগ করিয়া মৃত্যু ও অমৃতের সংঘর্ষের মধ্যে অমৃতকেই বরণ করিতে এবং অমৃতেই জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট থাকিলে আমরা নিশ্চিতই পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া আত্ম প্রসাদ লাভ ও জগতে সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইব।

শারীরিক স্বাস্থ্য অব্যাহত না থাকিলে মানুষ সংসার কিম্বা সমাজ কিছুরই সেবা করিতে সমর্থ হয় না। অবশ্য দুর্ব্বল দেহ লোকেরাও সংসার পালন ও সমাজ সেবা করিয়া থাকে ও করিবে। কিন্তু সুস্থ ও সবল দেহ লইয়া জীবনের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ করিতে পারিলে অতি অল্প সময়ে ও অনায়াসে মানুষ বহু কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারে। সুতরাং দেহ সুস্থ ও সবল রাখার একটা লাভ এই যে কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা অবলীলাক্রমে যে পরিমাণ খাটিতে ও সফলতা লাভ করিতে পারিব অসুস্থ ও দুর্ব্বল দেহ তাহা পারিব না। বরং আমাদের দুর্ব্বলতা ক্রমশ বৃদ্ধ পাইবে। রোগ বীজ দেহ মধ্যে প্রবেশ করিলে বা দেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মাথা তুলিবার সুযোগ পাইলে ভোগাভোগ নূতন ভাবে আরম্ভ হইয়া হয় তো চিরদিনের জন্য কর্ম্মীকে অক্ষম করিয়া রাখিবে। তখন তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজ তো পড়িয়া থাকিবেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে রোগারোগ্যের জন্য অর্থব্যয় ও পরমুখাপেক্ষা করিতে হইব। পরিবারবর্গের গৃহ কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মিবে। সকলেই রোগীর সেবায় অত্যধিক সময় দান না করিয়া পারিবে না।

পক্ষান্তরে যাহারা সুস্থদেহ, তাহারা অনায়াসে নিজের হস্ত পদ ও বুদ্ধির সাহায্যে খাটিতে পারিলে যেমন কাজও অনায়াসে ও সুশৃঙ্খলায় নির্ব্বাহিত হইতে থাকিবে, পরিবারের অন্য কাহাকেও তাহার জন্য বিব্রত থাকিতে হইবে না। আপনাপন পথে সকলেই কর্ম্মক্ষেত্রে খাটিয়া পরস্পরের সহকারিতায় সংসার ও সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে। রোগের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ ও অর্থ দ্বারা পারিশ্রমিক প্রদানে তাহার সন্তোষ উৎপাদন চেষ্টায় ব্যস্ত হইতে

হইবে না। সেই অর্থে অত্যাবশ্যক পারিবারিক ও সামাজিক কার্য্যে সাহায্য দান করিতে পারিলে সকল দিকেই শুভ ফল ফলিবে।

সুস্থ দেহেই যে সুস্থ মনের বাস এটি একটী চিরাগত অবিসম্বাদিত সত্য। সুতরাং সর্ব্ব প্রযত্নে স্বাস্থ্যের সমস্যা চিত্ত চর্চ্চায় ও সুস্থতার সংরক্ষণে আমাদের সতত প্রবল সচেষ্ট হইতে হইবে। যাহাতে ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক ও সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ও সার্ব্বজনীন কল্যাণ। তাহা না করিয়া গতানুগতিকের ন্যায় আলস্য ও কুঅভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া জীবনের অপব্যবহার করা জীবনকে দুঃখময় ও ভারবহ কলুষিত ও বিষবৎ অস্পৃশ্য করিয়া তোলা মানুষের পক্ষে পুরুষকার তো নহেই বরং তদ্রূপ ব্যবহার অতিশয় নিন্দনীয়।

সুস্থ দেহ মন লইয়া মানুষ তাহার নিয়তির পথে প্রতি মুহূর্ত্ত ও প্রতি সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে অভ্যাস না করিলে আপনা হইতে আকাশ হইতে স্বাস্থ্য সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হইবে না। প্রকৃত সৌভাগ্য লাভ যাহার উদ্দেশ্য তাহাকে সেই উদ্দেশ্যের উপায়ানুসরণে সদা অবহিত সযত্ন এবং দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে হইবে। সঙ্কল্প বিকল্পের সংঘর্ষের মধ্যে তাহাকে স্থিরচিত্ত থাকিয়া একই নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সম্মুখে পর্ব্বত প্রমাণ বাধা বিঘ্ন আসিবে তাহাকে মহাবীর শাক্য সিংহের ন্যায় সিংহ বিক্রমে আপনার গতি পথ হইতে অপসারিত করিতে হইবে। তাহার কোন প্রকার আপাত মধুর প্রলোভনে মুগ্ধ না হইয়া কঠোর আত্ম সংযম ও অবিচলিত ব্রহ্মচর্য্যের সাহায্যে অগ্নিদগ্ধ ধাতুর ন্যায় বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বলতর হইতে হইবে। অবশ্যই এ কথা সত্য যে মানুষ বিজ্ঞানের খুঁটীনাটী ধরিয়া নিরত ব্যস্ত ও বিব্রত থাকিলে আপাতদৃষ্টিতে দূর হইতে দেখা যায় যে তাহার উন্নতির গতি অতি মৃদু ও মন্দ। কিন্তু যদি প্রকৃত পথ ধরিয়া দৃঢ় পদে প্রতি মুহূর্ত্তের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়াস থাকে এবং একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র পথও না রাখিয়া জীবনকে কেবলই অমৃতের উদ্দেশ্যে অমৃতের পথেই সিদ্ধির জন্য পরিচালিত করা যায় তবে ঐ ধীর ও মৃদু গতিতেও এক দিন সে ব্যক্তি বলিয়া উঠিতে পারিবে হে বিশ্ববাসিন্ আমি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছি। সুতরাং আমাদের প্রয়াস ও সাধনার প্রধান মন্ত্র হইবে এই যে আমরা অতি ক্ষুদ্র সত্যকেও উপেক্ষা করিব না। বিন্দু বিন্দু করিয়া বিশাল সমুদ্রের সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণার সমবায়ে বিপুলা পৃথিবীর সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। আমাদের জীবনের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কর্ত্তব্যগুলিকেও আমরা উপেক্ষা করিব না। স্বাস্থ্য অর্জ্জন রোগ প্রতিষেধ প্রভৃতি কার্য্যে অতি ক্ষুদ্র নীতিকেও আমরা যেন অবজ্ঞা ভরে কার্য্যে পরিণত করিতে ত্রুটী না করি। তাহা হইলেই আমরা অজেয় ও অজর হইতে পারিব।

এই স্বাস্থ্য সুখ লাভের জন্য মন হইতে যথাসম্ভব সর্ব্বপ্রকার অসার ভোগ স্পৃহা সমূহকে সর্ব্বপ্রযত্নে নিরন্ত বিদায় করিয়া দিতে হইবে। আলস্য ব্যসন ও বিলাসের বিষয়কে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া যাহা কিছু ভাল যাহা কিছু শুভ ও শ্রেয় তাহাই গ্রহণ করিতে আগ্রহ করিতে হইবে। সত্যকে শ্রেয়কে জীবনের উপাদান অবিভাজ্য অঙ্গ রূপে মিশাইয়া ফেলিতে হইবে। শ্রেয় বিষয়েই নিয়ত আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। আজ এই একটী মন্দ ও ক্ষুদ্র অভ্যাসকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না অথবা ইহাকে চিরদিনের জন্য বর্জ্জন করিবার জন্য বেশী কিছু অধ্যবসায়ের সাহায্য লইলাম না তাহাতে কি? ভবিষ্যতে অবশ্যই ইহাকে পরাজয় করিব অথবা ইহাকে চিরদিনের জন্য বর্জ্জন করিব, এরূপ দীর্ঘসূত্রিতার হিসাবেও তো আমরা অনেক সময় আত্ম প্রতারিত হইয়া থাকি। আজ যাহা ত্যাগ বা যাহা গ্রহণের সুযোগ আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল অথবা আজ আমার শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মনের শক্তি ও সঙ্কল্প যতটা দৃঢ় ছিল কাল হয় তো স্বভাবের কোন নিয়মেই আমার পক্ষে সে সব অনুকূলতা থাকিবে না। সুতরাং সে কর্ত্তব্য আমার পক্ষে হয় তো সম্ভবপর হইবে না।

স্বাস্থ্য সুখ লাভের জন্য আমাদের যে সমস্ত বিষয়ে

নিয়ত অবহিত থাকিতে হইবে তাহার মধ্যে পান ভোজনই প্রধান ও অত্যাবশ্যক বিষয়। এই জগদ্ব্যাপী দুর্দিনে আমাদের দৈনিক আহার পানে অধিকতর সংযত ও মিতাচারী হইতে হইবে। অন্যথা আমাদের অভ্যাস ও আমাদের আর্থিক সংস্থানের মধ্যে প্রায়শঃই সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। কেবল সুমিষ্ট ও সুস্বাদ পাদ্যই সদা স্বাস্থ্যপ্রদ ও হিতপ্রদ তাহা নহে। তিক্ত ও বিস্বাদ বস্তুও অনেক সময় আমাদের জীবনের পক্ষে অধিকতর হিতকর। মূল্যবান অথচ দুষ্পাচ্য আহার্য্য বা পানীয় গরীবের তো উপযোগী নহেই, ধনবানের পক্ষেও তাহা স্বাস্থ্যনীতি ও ধর্ম্মনীতি বহির্ভূত। ভূরি ভোজন আজকাল আমাদের জাতির একটা অতি কু অভ্যাস দাঁড়াইয়াছে। আহারের অব্যবহিত পরে প্রায় সকল লোকেই একটু বিশেষভাবে বিশ্রাম আলস্য বা নিদ্রাসুখের আস্বাদন না লইয়া পারে না। কিন্তু ভোজন লঘু হইলেই এই দায়িত্বটা আমরা এড়াইতে পারি। আমাদের পাকযন্ত্রের পক্ষে কোন খাদ্যটি উপযোগী ও কোনটা উক্ত যন্ত্রে সহজ পরিপাচ্য তাহার বিচার না করিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানাপ্রকার রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য আকণ্ঠ ভোজন দ্বারা পাকযন্ত্রসমূহকে দুর্ব্বল অক্ষম ও রুগ্ন অবস্থায় আনিয়া আমরা যে দিন দিন ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে একান্ত মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেছি তাহা বলাই বাহুল্য।

ইহা কি কম পরিতাপের বিষয় যে আমাদের দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা প্রায় সকলেই আহার সম্বন্ধে ক্রমশ অত্যধিক অমিতাচারী ও অমিতব্যয়ী হইয়া উঠিতেছে। শিশু ও বৃদ্ধদের কথা ছাড়িয়া দিলেও যুবক যুবতী ও সুশিক্ষিত প্রৌঢ় ও প্রবীণ উপার্জ্জনক্ষম অথবা উপার্জ্জনে অক্ষম বা ভগ্নমনোরথ ভদ্রসন্তানের মধ্যেও আহারের অত্যাচার ও অনাচার এবং কেবলমাত্র রসনা পরিতৃপ্তির জন্যই উন্মাদনা দেখা যায়। গরীব ও মধ্যবর্ত্তী অবস্থার লোকের মধ্যেও অতিভোজনের দৃষ্টান্ত বিস্তৃত হইয়া তাহাদের অবস্থাকে দিন দিন অধিকতর শোচনীয় করিয়া তুলিতেছে। যে পরিমাণে আহার করিলে, যে দ্রব্য আহার করিলে সুস্থ দেহে সুস্থ মনে নিজের পরিবারের ও সমাজের জন্য সর্ব্বদা সৎপথে খাটিয়া দেশের মুখ ফিরাইয়া দিতে পারে, মাতৃভূমির দুর্দ্দশা ও দৈন্য দূরীভূত করিতে পারে ও মনুষ্য নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে তাহার বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়া প্রাণের গৃহের ও সমাজের অশেষ অনর্থ আনয়ন করা হইতেছে।

আহার বিষয়ে আমাদের ভারতীয় ঋষি ও মনীষিগণ অতি শুদ্ধাচার ও মিতাচার প্রচার করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও চিকিৎসকগণের মধ্যে যাহারা ভারতীয় ঋষিগণের প্রচারিত ও আচরিত আয়ুর্বিজ্ঞান সরল ও নিরপেক্ষ বিচারের সঙ্গে অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই ভারতের আহার নীতির পূর্ণ সমর্থন করিতেছেন। সাত্বিক ও লঘু আহারে পরিতৃপ্ত ও গৃহ প্রস্তুত মোটা কাপড়ে দেহ আবৃত করিয়াও তাঁহারা উচ্চ চিন্তায় সদা নিরত থাকিয়া বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতির চর্চ্চা ও তত্ত্বাবিষ্কারে জগতের এত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন যে, আজ পাশ্চাত্য ঋষিগণও তাহার সমর্থন করিতেছেন। আর আমরা কি না আমাদের জাতীয় গৌরব ভুলিয়া আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার অসারাংশ ও বিকৃত বুদ্ধির পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ও আমাদের দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে ঘোর অশুভ অশান্তি আনয়ন করত আত্মার আত্মীয়ের ও সমাজের কতই ক্ষতি করিতেছি। আমাদের দৃষ্টান্তে সুকুমারমতি বালক বালিকা ও নিরক্ষরা মহিলাগণ দিন দিন অধঃপাতের গভীর আবর্ত্তে পতিত হইয়াছে। আজ সর্ব্বত্রই দেখিতেছি কিসে রসনার পরিতৃপ্তি ও অতিভোজনের পরে জড়ের মত নিদ্রালস চক্ষে ও জীবন্মৃত অবস্থার মধ্যে দিন রাত্রি কাটাইয়া দিতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা। মরণের শেষ মুহূর্ত্ত না দেখিয়া কেহই নিবৃত্ত নহে। এই যে দারিদ্র্য এই যে অধীনতা এই যে অধঃপাত এ সকলই তো আমাদের নিজকৃত অনাচার ও অপরাধের ফল। যাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন যে আমরা ক্ষুদ্র

এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের অবহেলার জন্যই আপনার ও সমাজের কি ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়াছি ও করিতেছি। যদি প্রত্যেক শিক্ষিত ও চিন্তাশীল গৃহকর্ত্তা আপনার বিদ্যাবুদ্ধি ও শ্রেয় সংকল্পের দৃষ্টিতে সংসারকে দেখিতে ও স্ত্রীপুত্রদিগকে দেখিতে শিখাইতে সচেষ্ট হন ও প্রকৃত শুভ কামনা ও শুভ বুদ্ধির দ্বারা স্বপর সাধারণের ও আপনার গৃহের নিরক্ষরা মহিলা বৃন্দের সম্মুখে নিজের সদ্দৃষ্টান্ত ধরিতে থাকেন তবে অতিবড় নির্ব্বোধ ও অজ্ঞ লোকও আপনাপন স্বার্থবুদ্ধির খাতিরেই অল্পাধিক পরিমাণে তাঁহাদের শুভ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে। একটা দুটা করিয়া লোকের মতি গতি ফিরাইতে পারিলেও আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণের উচ্চশিক্ষার সার্থকতা দেখিয়া দেশ ধন্য ও কৃতার্থ হইবে।

এত দিনে স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী অবশ্য পাঠ্য বিষয় বলিয়া গণ্য হইতে চলিল ইহা অতি সুখের বিষয়। কিন্তু সুখের সঙ্গে একটু দুঃখের আশঙ্কাও বিদ্যমান। স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যপদেশে সরকারী সাহায্যে অথবা সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের নিজ হস্তে যে সমস্ত বহ্বারম্ভ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায় তাহা সকল সময়ে আমাদের দেশের ও জাতির উপযোগী নহে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অতি বড় আয়োজনে মশক দমনের জন্য কামান পাতিয়া যে স্বাস্থ্য সংগ্রামের অভিনয় হইয়া থাকে তাহার ফলে প্রায়শঃই অতি অধিক মূল্যে অতি অল্প স্বাস্থ্য ক্রীত হইয়া থাকে। সে স্বাস্থ্য ক্রয় অপেক্ষা তাহা ভোগ করাই অধিক দুরাশার বিষয় হইয়া পড়ে। খাইয়া বাঁচিবার পয়সাগুলি কর স্বরূপ দিয়া খালিপেটে স্বাস্থ্য সুখ ভোগ বোধ হয় আমাদের দেশবাসীর খুব স্পৃহনীয় হইবে না। স্বাস্থ্যরক্ষার মূল ও স্থূল বিষয়গুলির সাধারণ জ্ঞান ও ব্যবহারিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের সূত্রগুলি বেশ করিয়া অভিনিবেশসহকারে ও সুস্থ চিত্তে অধ্যয়ন ও চিন্তা করিয়া যদি সহজ ভাষায় ও সোজা কথায় গ্রাম্য পাঠশালা ও নিম্ন স্কুলের বালকদিগকে ও কথকতা প্রভৃতি উপায়ে গ্রাম্য মেলা স্থান ও সামাজিক অনুষ্ঠানে আমোদ প্রমোদের সময় যাত্রা অথবা নাটকাভিনয় প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণকে শিখাইয়া লওয়া যায় তবে যে সকল বিষয়ে কেবল জ্ঞানের অভাব হেতু সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হইয়া আসিতেছে সে সকল বিষয়ে জনসাধারণ অনেকটা সতর্ক ও সাবধান হইতে পারিবে।

সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক নিয়মে বৃহত্তর উপায়াবলম্বনে ম্যালেরিয়া ওলাউঠা প্রভৃতির নিবারণ ও দূরীকরণ ব্যাপারও চলিতে পারে। ম্যালেরিয়া ওলাউঠা ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি মারিভয় হেতু স্থানে স্থানে সময় বিশেষে যে বহু লোকের মৃত্যু ঘটে তাহা ছাড়া আমাদের দৈনিক পানাহার স্নান ব্যায়াম নিদ্রা ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া আমরা অবিরাম যেরূপ রোগময় পতিত হইয়া থাকি তাহার সময় অসময় বা আর কোন বিচার বিবেক নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই শরীর চেষ্টা ও জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের সুপ্রয়োগে আমাদিগকে অবহিত ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইয়া চলিতে হইবে।

মানুষের শরীরাভ্যন্তরে পাকস্থলী একটা প্রধান যন্ত্র। তাহার সুস্থতা অসুস্থতা কেবলই খাদ্য ও পানীয়ের মাত্রা ও গুণাগুণের উপরেই অধিক নির্ভর করে। এই পাকস্থলী রুগ্ন বা অক্ষম হইলে তাহার যথেষ্ট বিশ্রাম ও আরোগ্য ব্যতীত পান ভোজনের সুফল আমরা কিছুতেই লাভ করিতে পারিব না। বরং দুর্ব্বল ও বিকল পাকস্থলীতে নিয়মিত দৈনিক খাদ্য পানীয়ও বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শরীরের রক্তকে বিষাক্ত করিয়া ফেলিবে। বস্তুত আমাদের দেশের অনেক লোকেরই যে সেই সঙ্কটাবস্থা নিয়ত বর্ত্তমান তাহা লেখকের ব্যক্তিগত জীবন ও অন্যান্য লোকের দৃষ্টান্ত হইতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা দ্বারা ধ্রুব দৃঢ়তার সহিত সাক্ষ্য দান করিতে পারা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি সুস্থদেহ ও সুস্থমন না হইলে সমাজদেহ সুস্থ ও সবল হইতে পারে না জাতিও গড়িয়া উঠিতে পারে না। বরং অধঃপতনের গতি ক্রমশ দ্রুততর হয়। সেজন্য জনসাধারণের মধ্যে বাল্যকাল হইতে অতি ক্ষুদ্র ও স্থূল স্বাস্থ্যবিধিসমূহের সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচার ও ব্যবহারিক জীবনে সেই সকল বিধির যথাসম্ভব প্রয়োগের জন্য শিক্ষিত দেশবাসিগণকে পথপ্রদর্শক হইতে হইবে।

চরিত্র-গঠন

Spare the rod and spoil the child — সন্তানের চরিত্র গঠনে এই নীতি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র অনুসৃত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা অতি ভ্রান্ত ধারণা। শিশুর স্বভাব ভাল হওয়া বা খারাপ হওয়া তাহার স্বাস্থ্যের উপর প্রধানত নির্ভর করিয়া থাকে। শিশুর স্বাস্থ্য আবার তাহার জনক জননীর বিশেষত জননীর স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং শিশুর চরিত্র আদর্শ ভাবে গঠন করিতে হইলে তাহার জন্মের বহু দিন পূর্ব্ব হইতে তাহার জননীর স্বাস্থ্যের উপর লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং ভাবী জননীকে সন্তান পালন বিদ্যা উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে হয়। তার পর শিশু জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার স্বাস্থ্যচর্য্যার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নীতি শিক্ষা দিয়া তাহার চরিত্র গঠনের চেষ্টা করিতে হয়। এ বিষয়ে শিশুর জননীই তাহার প্রধান শিক্ষয়িত্রী। সচ্চরিত্র ও দুশ্চরিত্র উভয় শ্রেণীর লোকের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে সদসৎ চরিত্র গঠনে তাহার জননীর চরিত্র প্রভাবই প্রধানত কাজ করিয়াছে। জননী নিজে সৎ স্বভাবা হইলে তাঁহার সন্তানও তাঁহার শিক্ষা গুণে সৎ স্বভাব হইয়া উঠে। আর জননী যদি নিজে সুশীলা না হন তিনি যদি দুঃশীলা কলহপরায়ণা কুটিলা মন্দ স্বভাবা হন তবে তাঁহার সন্তানও দুশ্চরিত্র হইবেই। অবশ্য শিশুর চরিত্র গঠনে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও কতকটা পরিমাণে সাহায্য যে করে না তাহাও নহে। কিন্তু জননী যদি দৃঢ় চরিত্রা রমণী হন তবে তিনি মন্দ পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব কতকটা কাটাইয়া উঠিতে পারেন। কিন্তু শিশুর স্বাস্থ্য দুর্ব্বল হইলে পারিপার্শ্বিক প্রভাব তাহার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর কার্য্য করিয়া তাহার চরিত্র বিকৃত করিয়া ফেলিতে পারে। আবার শিশুর স্বাস্থ্যের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিলে তাহার জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিলে যথেষ্ট পরিমাণে সূর্য্যের কিরণ উপভোগ করিবার ব্যবস্থা করিলে এবং তাহাকে নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিতে অভ্যাস করাইলে সে যাহাতে দিবসের মধ্যে অধিকক্ষণ খোলা বাতাসে থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলে তাহার মনুষ্যত্ব বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে সে বহু মহৎ গুণের অধিকারী হইতে পারে।

ছেলে মেয়েরা ইদানীং যে তাদের পিতা মাতার মনের মতন কিম্বা সমাজের উপযুক্ত সন্তান হইয়া উঠিতেছে না তাহার আরও কারণ থাকিতে পারে। তাহাদের লেখাপড়া শিখাইবার জন্য যতটা যত্ন করা হয় তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি যে যৎকিঞ্চিৎ মনোযোগ দেওয়া হয় তাহাদের নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য ততটুকুও চেষ্টা করা হয় না। ছেলে মেয়েদের নীতিশিক্ষা দেওয়া কতকটা মনস্তত্বের ব্যাপার। এদিকে আমাদের এখনও দৃষ্টি পড়ে নাই বলিলেই হয়। মনস্তত্বের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সবে অধ্যাপনা সুরু হইয়াছে মাসিক ও সাময়িক পত্রে ইহার সামান্য ভাবে আলোচনাও আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু উহা এখনও সাধারণের আয়ত্তাধীন হয় নাই।

সচ্চরিত্রতা জন্মগত হইতে পারে কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তবে ইহা শিক্ষা ও অভ্যাস সাপেক্ষ। সমাজবদ্ধ মানুষের কতকগুলি সদগুণ থাকা অপরিহার্য্য। সেগুলি না থাকিলে সে সমাজের দশজনের একজন হইয়া থাকিবার অযোগ্য। এরূপ লোককে সমাজ প্রায়ই সহ্য করিতে পারে না—অবশেষে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থ তাহাকে সমাজ হইতে বিতাড়িত করিতে বাধ্য হয়। যাহার এই সকল গুণ স্বভাবজ নহে শিক্ষা পাইলে অভ্যাস করিলে সে সেই সকল গুণ অর্জ্জন করিতে পারে।

এই সকল গুণাবলীর মধ্যে কয়েকটী প্রধান গুণের এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথম গুণ—কর্ত্তব্য পালন। যে যে-কাজেই নিযুক্ত থাকুক তাহার কর্ত্তব্য

সুশৃঙ্খলে পালন করিবার চেষ্টা করা উচিত। প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে যাহা করে তাহাতে তাহার শুধু ব্যক্তিগত হিতাহিত নয় সমাজেরও হিতাহিত নির্ভর করে। কেহ তাহার কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করিলে কেবল সে নিজে নয় সমাজও তাহার ফলভোগ করিতে বাধ্য হয়।

সেইরূপ নিঃস্বার্থপরতা একটী গুণ। সমাজে বাস করিতে হইলে এ গুণটিও অভ্যাস করিতে হয়। সততা আর একটী গুণ যাহা মানব মাত্রেরই পক্ষে অপরিহার্য্য। রাজ্যের আইন মান্য করিয়া চলা সামাজিক লোক মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। অতমিকতা মানব মাত্রেরই বর্জ্জনীয়। সুখে দুঃখে অবিচলিত থাকা একটী মহৎ গুণ। সহিষ্ণুতা গুণ থাকিলে মানুষ পরিণামে জয়যুক্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য আমাদের দেশে একটা প্রবচন প্রচলিত হইয়াছে—যে সয় সেই রয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলাও একটী মহৎ গুণ। এই গুণের অনধিকারী ব্যক্তির দুঃখের সীমা থাকে না। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে নাগরিকোচিত এই সকল গুণ অভ্যাস করাইতে হয়। কেবল সুমাতাই এই কার্য্যটি দক্ষতা সহকারে সম্পাদন করিতে পারেন। Child is the father of the man শিশু চরিত্র যে ভাবে গড়িয়া উঠে পরিণত বয়সেও মানুষ সেইরূপ চরিত্রেরই লোক হইয়া উঠে। বাল্য শিক্ষা ও বাল্য অভ্যাস পরিণত বয়সেও পরিবর্ত্তিত হয় না। শিশু বাল্যাবস্থা হইতে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইলে তাহার আর চরিত্র সংশোধনের সুযোগ উপস্থিত হয় না। কাঁচায় নয়ন বাঁশ পাকলে করে ট্যাস ট্যাস। বুড়ো ময়না পড়ে না। পরিণত বয়সে কি মানুষ কি পশু পক্ষী—বাল্যকালের অভ্যাস ত্যাগ করিয়া নূতন কিছু শিখিতে পারে না। বাল্য অভ্যাস কখনও ভোলাও যায় না। অতএব পিতামাতা সন্তানকে যে ভাবে গড়িয়া তুলিতে ইচ্ছা করেন আঁতুড় ঘর হইতেই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। শৈশব হইতে স্বাস্থ্য রক্ষায় উদাসীন হইলে বার্দ্ধক্যে শত ঔষধেও কেহ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে না। শিশুর চিত্ত কোমল থাকিতে থাকিতে তাহাকে সকল প্রকার সদ্‌গুণ অভ্যাস করাইয়া দিতে হইবে।

শিশু চিত্তের গতি তাহার হাসি কান্না তাহার অঙ্গভঙ্গী হস্ত চালনা প্রভৃতি অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে শিশুর চরিত্রগঠনে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। শিশু যাহাতে আনন্দ পায় পুনঃ পুনঃ তাহাই করিতে ভালবাসে। আর সে যাহাতে দুঃখ পায় বেদনা বোধ করে তাহা সে স্বভাবতই এড়াইবার চেষ্টা করে। এই জন্য শিশুর চারিদিকে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হয় যে সে সদ্‌গুণাবলীর অভ্যাসে আনন্দ লাভ করিতে পারে। তাহা হইলে সে নিজের অজ্ঞাতসারেই ঐ সকল সদ্‌গুণ অর্জ্জনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে। শিশু সাধারণত যাহা দেখে তাহাই শিক্ষা করে। তাহার জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিতামাতার আচার ব্যবহার তাহার আদর্শ হইয়া পড়ে। সে পিতা মাতার আচার ব্যবহার অতি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকে। অতএব শিশুকে সচ্চরিত্র করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্ব্বাগে পিতামাতার চরিত্রবান হওয়া আবশ্যক।

পিতা মাতার পর শিশুর জ্যেষ্ঠ ভাই ভগিনী বা আত্মীয় স্বজন প্রায় তাহার আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়। তার পর দাস দাসী এবং সর্ব্বশেষে পাড়া প্রতিবাসী—বিশেষত শিশুর সমবয়স্ক বালক বালিকারা। এই আদর্শ ভাল হইলে শিশুও সৎ হয় আর মন্দ হইলে শিশুও প্রায় মন্দ হইয়া দাঁড়ায়।

অত্যধিক স্নেহশীল পিতামাতা সন্তানের প্রতি অতিরিক্ত স্নেহবশত শিশুকে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করিতে সর্ব্বদা উন্মুখ হইয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় শিশুর পরনির্ভরশীল না হইয়া গত্যন্তর থাকে না—সে কোন ক্রমেই আত্মনির্ভরশীল হইতে শিখে না—সর্ব্বদা সকল বিষয়ে পরের সাহায্য বা পরের পরামর্শের অপেক্ষা করিয়া থাকে। স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করিতে বা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে সে শিখে না।

কিন্তু স্নেহান্ধ পিতামাতা শিশুকে যতটা অল্পবুদ্ধি বা অসহায় মনে করেন বাস্তবিক সে ততটা নয়। শিশু যখন প্রথম হাটিতে শিখে তখন তাহার অঙ্গ সঞ্চালনের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এটা বেশ বুঝা যায়। দেখা যায় যে হাটিবার ইচ্ছায় সে পদ সঞ্চালন করিতেছে। যেরূপ ভাবে পদ সঞ্চালন করিয়া সে বিফল হইতেছে—হাটিতে না পারিয়া পড়িয়া যাইতেছে সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া নূতন পন্থা অবলম্বন করিতেছে। এইভাবে শিশুকে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে দিলে সে পরিণত বয়সে স্বাবলম্বী হইবে। নয় ত, হাটিতে গিয়া পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া মা কিম্বা বাবা কি ভাই বোন কিম্বা অপর কেহ যদি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে হাটিতে সাহায্য করে তবেই শিশুর মাথাটি একেবারে খাওয়া হইল—প্রত্যেক কাজে সে পরের সাহায্য খুজিবে।

শিশুর কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা হইলে সে কাঁদিয়া অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। যদি অসুবিধা নিতান্ত কেশদায়ক বা ক্ষতিজনক না হয় তাহা হইলে শিশু কাঁদিবামাত্র তাহাকে সাহায্য করিতে যাইতে নাই। কারণ কাঁদিবামাত্র তাহার সকল অসুবিধা দূর হইলে তাহার এই শিক্ষা হইবে যে যখনই তাহার কোন কিছুর দরকার হইবে তখনই সে তাহার ঐ ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিয়া তাহার সুবিধা আদায় করিবে। এরূপ অভ্যাস একবার দাঁড়াইয়া গেলে—তাহার চরিত্র সকলের পক্ষেই বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে।

শিশুকে যখন তখন আদর করা কোলে লওয়া চুমা খাওয়া শিশু চরিত্র গঠনের উৎকৃষ্ট পন্থা নহে। কিম্বা কাঁদিলেই তাহাকে কোলে করিয়া আদর করিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। এমনভাবে পালিত ছেলে পুলে বড় হইয়া দশজনের একজন হইতে পারে না—তাহার চরিত্র বিগড়াইয়া যায়।

ইতর প্রাণীরা যাহা কিছু করে তাহা তাহাদের স্বভাব বশতঃ করিয়া থাকে—তাহাদের কাজে কর্ম্মে, চলা ফেরায় আচারে ব্যবহারে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায় না। শিশুর অবস্থাও কিছু দিনের জন্য এইরূপই থাকে—তাহারা যাহা কিছু করে তাহা তাহাদের অজ্ঞাতসারেই করিয়া থাকে। এই অবস্থাটা তাহাদের পশুবৎ সংস্কারের অবস্থা।

ক্ষুধা পাইলে শিশুরা কাঁদে। তাহার কান্না শুনিয়া তার মা আসিয়া তাহাকে মাই দেন। অমনি শিশুর কান্না থামিয়া যায়। মা যদি নিকটে না থাকেন কিম্বা কার্য্যে ব্যস্ততা বশত আসিতে না পারেন তাহা হইলে হয় ত শিশুর কোন ভাই ভগিনী তাহাকে আদর করিয়া ভুলাইবার জন্য তাহার চুমা খাইতে গেলে তাহার নাক যদি শিশুর ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে তবে শিশু ঐ নাকটিকেই মায়ের মাই মনে করিয়া চুষিতে আরম্ভ করে এবং তখনকার মত কাঁদিতে ভুলিয়া গিয়া চুপ করে। কিন্তু তাহার যদি যথার্থই প্রবল ক্ষুধা পাইয়া থাকে তবে নাক চুষিয়া দুধ না পাওয়ায় তাহার ক্ষুধার শান্তি হয় না বলিয়া সে আবার কাঁদিয়া উঠে। আবার শিশু যদি একলা থাকে তবে অনেকক্ষণ কাঁদিয়াও মাকে না পাইলে নিজের হাত ই চুষিতে আরম্ভ করে এবং একটুখানি সান্ত্বনা পাইতে চেষ্টা করে। শিশুর এই যে সব কাজ—এ সকলই তাহার সংস্কারের ফল। বয়স্ক ব্যক্তির ক্ষুধা পাইলে সে কখনও আহারের শূন্য পাত্র কামড়াইয়া ক্ষুধা শান্তির চেষ্টা করে না। কিন্তু শিশু ক্ষুধার সময় হাতের কাছে যা পায় তাই খাইবার চেষ্টা করিয়া ক্ষুধাশান্তির প্রয়াস পায়। সেইরূপ তাহার শরীরের কোন স্থানে বেদনা বোধ হইলে তাহার হাত তাহার অজ্ঞাতসারেই সেই বেদনার স্থানে গিয়া উপস্থিত হয়। শিশুদের প্রায়ই কাণ কট কট করে তাহার হাতও প্রায় সর্ব্বদা সেইখানে থাকে। অবশেষে বেদনার শান্তি হইলে শিশু আর কাণে হাত দেয় না। এই সকল কাজই স্বতই (automatically) হইয়া থাকে। শিশুর এই কাজগুলি করিবার শক্তি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই লব্ধ—উহা কোনরূপ বুদ্ধি বিবেচনা বা বিচার বিতর্কের ফল নহে। ঘড়িতে দম দিয়া পেণ্ডুলামটী দোলাইয়া দিলে তাহা যেমন আপনি চলিতে থাকে শিশুর কাজ কর্ম্মও প্রায় সেইরূপ ভাবে চলে।

কিন্তু ইহার মধ্যেও আবার কথা আছে। শিশু, জীব জন্তু এমন কি বয়স্ক মানবের মধ্যে আত্ম রক্ষার প্রবৃত্তিটি খুব স্বাভাবিক। ইহা কাহাকেও শিখাইতে বা বুঝাইতে হয় না। এ বিষয়ে শিশু এবং বয়স্ক ব্যক্তির অবস্থা প্রায় সমান। শারীরিক বিপদের আশঙ্কা দেখিলে সকলেই স্বত ই নিজের অজ্ঞাতসারেই আত্ম রক্ষার্থ প্রস্তুত হয়। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটি না থাকিলে কত অসংখ্য প্রাণী ও মানুষ যে অকালে প্রাণ হারাইতে বাধ্য হইত তাহার সংখ্যা করা যায় না। আরও কতকগুলি বিষয়ে ইতর প্রাণী মানব শিশু ও পূর্ণ বয়স্ক মানব প্রায় একই প্রণালীতে কাজ করে। যেমন ভয় পাইলে পলায়নের প্রবৃত্তি কৌতূহল ক্ষুধা ক্রোধ স্ত্রী সঙ্গম প্রভৃতি। এ সকলেরই মূল কিন্তু আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এমন কি বংশ বৃদ্ধিরও। কারণ বংশ বৃদ্ধি আর কিছুই নয়—পুত্র পৌত্রাদিতে নিজেকেই বজায় রাখা। কারণ এই আত্ম রক্ষার প্রবৃত্তিটি না থাকিলে বংশলোপ অবশ্যম্ভাবী। বংশেই মানুষ এবং জীবজন্তু অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে। এই সকল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা সংস্কারের উপর অনুকরণ প্রবৃত্তিকেও এই সংস্কারের তালিকায় ফেলা যায়। অনুকরণ প্রবৃত্তি অনেকটা বংশগত তার পর জাতিগত। কারণ প্রাণীরা শৈশবে নিজ নিজ পিতামাতার পরে বয় প্রাপ্ত হইলে নিজ নিজ জাতির অনুকরণ করিয়া থাকে।

মানব শিশুরা শৈশবে আপন আপন সংস্কারানুসারে কাজ করে। তার পর বয় প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বৃত্তির যেমন বিকাশ হইতে থাকে তদনুসারে তাহার কার্য্য করিবার ধারারও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। ঠিক এই সময়টিতে পিতামাতার সন্তানের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয় যেন সে কুশিক্ষা না পায় এবং কুঅভ্যাস করিতে না শিখে। তাহার হৃদয়ে যাহাতে সৎপ্রবৃত্তির উন্মেষ হয় এমনিভাবে তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিতে হয়। এই সময় হইতে পিতামাতার ব্যবহার ও আচরণ শিশুর আদর্শ হইয়া উঠে। সে পিতামাতাকে যাহা করিতে দেখে নিজেও তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। পিতামাতা যদি সদাচারসম্পন্ন হন, তাহা হইলে সন্তান তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া অনায়াসে সদাচারসম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে। Example is better than precept একেত্রে বড় সত্য ও সমীচীন কথা। সন্তানের চরিত্র গঠনে সদাচার সম্পন্ন পিতা মাতার চরিত্রের দৃষ্টান্ত যে কতখানি শক্তি-সম্পন্ন তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু পিতামাতা যদি নিজে সদাচারপরায়ণ না হন তাহা হইলে কেবল সদুপদেশ দিয়া সন্তানকে সচ্চরিত্র করিয়া গড়িয়া তোলা কঠিন এমন কি অসম্ভব বলিলেও চলে। অবশ্য দুশ্চরিত্র পিতামাতার পুত্র কন্যা যে একেবারেই চরিত্রবান হইতে পারে না তাহাও নয়। কিন্তু তাহা সাধারণ নিয়ম নহে বরং তাহাকে নিয়মের ব্যতিক্রম বলা চলে।

জ্ঞান বুদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শিশু অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন নানা কাজ করিবার তাহার ইচ্ছা হয় এবং সে সকল কাজেই হাত দিবার চেষ্টা করিতে থাকে। এইরূপ চেষ্টার ফলে কোন্ কাজে সে সুখ পায় কোন কাজটা দুঃখের মূল তাহা সে অল্প দিনের মধ্যেই আবিষ্কার করিয়া ফেলে। তখন সে যাহাতে সুখ আনন্দ পায় সেই কাজগুলি অভ্যাস করিতে আরম্ভ করে। আর যাহাতে দুঃখ পায় সেগুলি সযত্নে পরিহার করিয়া চলে।

শিশুর এই বয়সটা তাহার জননী বা ধাত্রীর পক্ষে অতি সঙ্কট কাল। সন্তান পালনে অনভিজ্ঞ জননীরা এই সময়ে সন্তানকে সুপথে পরিচালিত করিতে না পারিলে সে ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। এ সময়ে ছেলের কাজে উৎসাহ দেওয়াও যেমন দোষের বাধা দেওয়া ততোধিক দোষের। এ বয়সে শিশুর কর্ম্মোৎসাহ খুব প্রবল। কিন্তু যদি সে কোন কু কর্ম্ম করিতে অত্যন্ত হয় তবে তাহাকে উৎসাহ দিলে তাহার ফল যে কি ভীষণ হইতে পারে সে কথা না বলিলেও চলে। তাহাকে কুকর্ম্ম করিতে নিবারণ করিতেই হইবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে বাধা দেওয়াও নিরাপদ নহে।

কারণ বাধা দিতে গেলে শিশু সহজে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া সেই কাজটি করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইবে। তাহাকে এই কর্ম্ম হইতে নিবারণ করিবার জন্য যদি কঠোর শাসন বা তাড়না করা হয় তাহা হইলে সে প্রকাশ্যে সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সাহস না করিলেও গোপনে করিবার চেষ্টা করিবে এবং ছলনা কপটতা করিতে শিখিবে। লুকাইয়া কুকর্ম্ম করিতে শিখিলে তাহার কাজ পিতামাতার কাছে গোপন করিতে শিখিলে সে ছেলে ভয়ানক কুটিল হইয়া পড়িবে। তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নহে।

তবে এক্ষেত্রে উপায় কি? উপায় অবশ্যই আছে। সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাধা পাইয়া উত্তেজিত হইয়া শিশু দ্বিগুণ উৎসাহে গোপনে কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয় এই উদ্দেশ্যে একটু সুবিবেচনা একটু কৌশল সহকারে কাজ করিতে হইবে।

এই সময় শিশু যে সব কাজ করে তাহা প্রায় ঝোঁকের মাথায় করে। সে সকল কাজের ভাল মন্দ ফলাফলের কথা বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের থাকে না। সেইজন্য যে কাজ করিলে শিশুর অহিত হইবে বলিয়া পিতা মাতা বুঝিতে পারেন সেই কাজ করিতে শিশুকে নিষেধ করিলে সে মনে করিবে, পিতা মাতা অন্যায় ভাবে তাহাকে নিষেধ করিতেছেন।

মনে করুন বাড়ীতে একটা পোষা বিড়াল আছে। সেই বাড়ীতে একটী শিশুও আছে। শিশু বিড়ালের সঙ্গে খেলা করিতে চায়। বিড়াল শিশুর অত্যাচার সহিতে চায় না পলাইয়া যায়। শিশু তাহাকে ধরিতে ছুটে। পলায়মান বিড়ালের লাঙ্গুলের নাগাল ধরিতে পারিয়া শিশু তাহাই ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিল। বিড়াল তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপ টানাটানিতে শিশু বিলক্ষণ আমোদ পাইল। সে যখন তখনই বিড়ালের ল্যাজ ধরিয়া টানিয়া খেলা করিতে লাগিল। শিশুকে যদি এই খেলা হইতে নিবৃত্ত না করা যায় তবে পরিণামে সে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হইয়া উঠিবে। তাহাকে সোজাসুজি নিবারণ করিতে গেলে সে অধিকতর উৎসাহে বিড়ালের ল্যাজ ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকিবে। অবশ্য বিড়াল নিতান্ত বিরক্ত হইয়া দুই একবার আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া দিলে শিশু এই নিষ্ঠুর আমোদ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু সেটা বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব শিশু যাহাতে বিড়ালের নাগাল না পায় এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরে সে আপনিই এই খেলা ভুলিয়া গিয়া নূতন নতন খেলায় আকৃষ্ট হইবে।

অনেক জননী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহার সন্তানকে নিতান্ত শিশু অসহায় ভাবিয়া থাকেন। তিনি শিশুকে সকল কাজে সাহায্য করিতে ছুটিয়া যান। সামান্য সামান্য কাজও শিশু করিতে অক্ষম বিবেচনা করিয়া তাহার তত্ত্বাবধানের জন্য অপর লোকের উপর ভার দেন। বস্তুত কিন্তু শিশু এতটা অসহায় নয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার বুদ্ধিবৃত্তিরও স্ফুরণ হইতে থাকে এই কথাটি অতিরিক্ত সন্তান বাৎসল্যবশত অনেক শিশুর জননী ভুলিয়া গিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা করা উচিত নয়। শিশুকে নিজের বুদ্ধিতেই চলিতে দেওয়া উচিত তবে তাহার উপর লক্ষ্য রাখা উচিত, যেন সে ভুল পথে না চলে। তাহার ভুল হইতে দেখিলে তাহাকে সংশোধন করিতে হইবে।

শিশু আপন খেয়ালে কোন কাজে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে অক্ষম বিবেচনায় জননী তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটা ঠিক কাজ হয় না। শিশুকে কাজ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। শিশুর সকল কাজে বাধা দিতে গেলে সে সকল বিষয়ে পরনির্ভরশীল হইয়া উঠিবে। তবে কোন কাজটা ভাল কোনটা মন্দ তাহা তাহাকে কাজ করিতে দিয়া ঐ কাজের ভাল মন্দ ফল প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ করাইয়া শিশুকে শিক্ষা দিতে হয়। ইহাই পাকা রকমের শিক্ষা। এই শিক্ষা চিরকাল তাহার মনে থাকিবে। তবে এমন কাজ অনেক আছে যাহার অব্যবহিত ফল আনন্দদায়ক কিন্তু ভবিষ্যতে তাহা হইতে অনিষ্টের সম্ভাবনা। এরূপ

ক্ষেত্রে অবশ্য তাহাকে নিবারণ করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ ভাবে তাহাকে নিবারণ করা সম্ভব না হইলে শিশুর মন বিষয়ান্তরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। দুই বৎসরের কম বয়স্ক শিশুকে যুক্তি দেখাইয়া কোন কিছু বুঝানো সম্ভব নহে। তাহাকে ভালবাসিয়া স্নেহ করিয়া যতটুকু নিবারণ করিতে পারা যায় সে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাতে ফল না ফলিলে বিষয়ান্তরে তাহার মনোনিবেশ করানো ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাহাকে ধমক চড় কসাইয়া দিয়া তখনকার মত তাহাকে নিবারণ করা গেলেও সে তাহার গোঁ সহজে ছাড়িবে না এবং সুযোগ পাইলেই পুনরায় সেই কাজ করিয়া বসিবে।

ছোট ছোট শিশু তাহার মাকেই বেশী জানে। কোন কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইলে সে তাহার সমাধানের জন্য মায়ের কাছে যায়। এই সময়ে জননীর ব্যবহার এমন হওয়া উচিত যাহাতে শিশুর সমস্যার সমাধান হয় সে আনন্দ লাভ করে। মা যদি তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন কিম্বা তাহাকে ধমক দেন তাহা হইলে সে নিজেই সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয় এবং জননীর প্রতি তাহার আস্থা কমিয়া আসে। সে আর মায়ের কাছে সমস্যার মীমাংসার জন্য যায় না এমন কি সে মায়ের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধেই নিজের চেষ্টা প্রয়োগ করিতে পারে। এরূপ করিতে গিয়া যদি সে বাধা পায় তখন সে গোপনতা মিথ্যাচারের আশ্রয় লইতে শিখে।

এই সময়ে শিশুর প্রকৃতি খুব চঞ্চল থাকে। সে সকল কাজই করিবার চেষ্টা করে। জনক জননীর এ সময়ে শিশুকে কাজে উৎসাহ দেওয়া উচিত। জনক জননী সুবিবেচনাপূর্ব্বক—যাহাতে শিশুর কোন ক্ষতি না হয় এবং তাহার সামর্থ্যে কুলায় এমন কাজ নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাকে করিতে দিলে কেমন করিয়া সেই কাজ করিতে হয় তাহা তাহাকে শিখাইয়া দিলে এবং তাহার ক্ষমতার উপর নির্ভর করিলে শিশু আনন্দের সহিত সেই কাজে প্রবৃত্ত হয়। বলা বাহুল্য জনক জননীর এইরূপ আচরণের ফল খুব ভালই হইয়া থাকে।

শিশু চরিত্রের একটা বিশেষ দিক—তাহার অনুকরণ প্রবৃত্তি। শিশুদের দিকে নজর রাখিলে দেখা যায় তাহারা পিতামাতার চালচলন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতেছে। এজন্য শিশুর সামনে নিজ নিজ আচরণে পিতামাতাকে ত সাবধান হইতেই হইবে কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়। শিশু অপরের নকলও করিয়া থাকে। প্রায় দেখা যায় ছোট ভাই সকল কাজে বড় ভাইয়ের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে। অন্য আত্মীয় স্বজন বা বাড়ীর অপরাপর লোকদের আচরণও শিশুর মনোযোগ এড়ায় না। অতএব কেবল পিতামাতা সাবধান থাকিলেই চলিবে না। অপর লোকদেরও সাবধান থাকিতে হইবে। তাহা সম্ভব না হইলে শিশুকে যথাসাধ্য তাহাদের নিকট হইতে তফাতে রাখিতে হইবে। শিশুর প্রায় সকল কাজই অনুকরণ প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শিশুর আচরণে কোন দোষ দেখিলে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে হইবে শিশু কাহারও না কাহারও অনুকরণ করিতে গিয়া সেই অপ্রিয় আচরণ করিতে শিখিয়াছে। অমনি সে বিষয়ে অনুসন্ধান লইতে হইবে এবং সতর্কতা সহকারে তাহার সঙ্গ হইতে শিশুকে তফাতে রাখিতে হইবে। শিশু যত দিন অনভিজ্ঞ থাকে যত দিন না তাহার বিচারশক্তি পরিস্ফুট হয় তত দিন শিশুর এই অনুকরণ প্রবৃত্তির সাহায্যে তাহাকে পালন করিবার বেশ সুযোগ পাওয়া যায়। তখন তাহার সামনে নিজেরা সদাচরণ করিলেই যথেষ্ট হয়। এই সময়ে বিশেষ করিয়া শিশু তাহার জননীর কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী সামান্য ইঙ্গিতটি পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া তাহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু শিশুকে বেশী দিন এই প্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলিতে দেওয়া ঠিক নয়। কারণ তাহা হইলে সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখে না তাহার বিচারবুদ্ধি সম্যক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না বেকায়দায় পড়িলে সে নিজে বিবেচনা করিয়া কোন কাজ করিতে

সমর্থ হয় না। সর্ব্বদা পরের পরামর্শ উপদেশ ইঙ্গিত পরিচালনার প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। তাহার চিন্তাশক্তি বিচারবুদ্ধি এবং সাধারণ জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে এমনভাবে শিক্ষা দিতে হইবে যেন সে অপরের অনুকরণ না করিয়া নিজে বিবেচনা করিয়া কাজ করিবার চেষ্টা করে। তাহাতে কাজ ভালই হউক আর মন্দই হউক তাহাতে কিছু যায় আসে না। এইভাবে নিজের বিবেচনানুসারে কাজ করিতে করিতে—সকল সময় সফলতা লাভ না হইলেও—যে অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাহার মূল্য বড় কম নয়। এই স্বয়ংলব্ধ অভিজ্ঞতা তাহার পরিণত জীবনে তাহাকে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়া থাকে। ইহাতে জীবনের সব কাজে তাহার আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা হয়। সঙ্কটকালে কাহারও সাহায্য না লইয়া সে আপনা আপনি কোন না কোন উপায় করিয়া লইয়া সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে।

বয়স অনুসারে মানব জীবন বহু স্তরে বিভক্ত। মোটামুটি আমাদের দেশে মানব জীবনকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়—শৈশব যৌবন প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্য। এই এক একটা স্তর আবার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তরে বিভক্ত। শাস্ত্রীয় হিসাব মত ২৫ বৎসর বয়সে আমাদের দেশে যৌবন আরম্ভ হয়। কিন্তু লোক ব্যবহারে ষোড়শ বর্ষ যৌবনারম্ভ কাল। তদনুসারে পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত শৈশব তৎপরে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর। কিন্তু আবার চাণক্য পণ্ডিত উপদেশ দিতেছেন—লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণ দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ প্রাপ্তেতু ষোড়শবর্ষাণি পুত্রমিত্র বদাচরেৎ। এখানে আবার পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত এক ভাগ দশম বর্ষ পর্য্যন্ত আর এক ভাগ আর ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত তৃতীয় ভাগ।

পুরাণে কথিত আছে মাণ্ডব্য নামক একজন মহাতেজা ঋষি ছিলেন। তিনি যখন নিজ আশ্রমে তপস্যায় নিযুক্ত থাকিয়া মৌনী ছিলেন সেই সময় একদল চোর গৃহস্থ বাড়ী চুরি করিয়া পলাইয়া আসিয়া তাঁহার আশ্রমে আশ্রয় লয়। চোরেদের অনুসরণ করিয়া গৃহস্থ ও নগরপালের লোকেরাও সেই আশ্রমে আসিয়া চোরদের ধৃত করে এবং চোরদের সহচর মনে করিয়া মুনিকেও ধরিয়া লইয়া যায়। রাজ বিচারে চোরেরা দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাহাদের প্রতি শূল দণ্ডাদেশ হয়। এ যাবৎ মাণ্ডব্য মুনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন—এত যে কাণ্ডকারখানা হইয়া গেল তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। অবশেষে যখন তাঁহাকে শূলে দেওয়া হইল তখন তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল। ক্রমে তাঁহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িলে রাজা অত্যন্ত ভীত হইলেন যে একে নিরপরাধ তায় অমন তেজস্বী মুনি—তাঁহার এই দণ্ড। মুনি যদি ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দেন তাহা হইলে রাজাকে সবংশে ভস্ম হইয়া যাইতে হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ মুনির দেহ হইতে শূল খুলিয়া লইবার আদেশ দিলেন এবং মুনিবরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মুনি তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন বটে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় শূল খোলা গেল না। তখন অগত্যা শূলের যতটুকু অংশ মুনির দেহের বাহিরে ছিল তাহাই কাটিয়া ফেলা হইল অবশিষ্টাংশ মুনির দেহের মধ্যেই রহিয়া গেল।

বিনা দোষে তাঁহার কেন এই দুর্দ্দশা হইল—মুনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। বিধাতার সূক্ষ্ম বিচারে পাপ না হইলে দণ্ড হয় না। এ ক্ষেত্রে মুনির কোন পাপে এই দণ্ড হইল মুনি কিছুতেই তাহা স্মরণ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার প্রতি অবিচার হইয়াছে মনে করিয়া ক্রুদ্ধ মুনি কৈফিয়ৎ তলব করিবার জন্য যম রাজার দরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মহামুনিবরকে নিজ আলয়ে উপস্থিত দেখিয়া যমরাজ তটস্থ হইয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনির সংবর্দ্ধনা করিয়া তাঁহার এই অনুগ্রহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুনি শূলের বিবরণ বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার কোন পাপে তাঁহার এই গুরুদণ্ড হইল। যমরাজের আদেশে পাপ পুণ্যের হিসাব রক্ষক চিত্রগুপ্ত খাতা পত্র উল্টাইয়া পাল্টাইয়া আবিষ্কার করিলেন যে শৈশবে মাণ্ডব্য মুনি এক ফড়িঙ ধরিয়া তাহার উদরে খড়কে বিদ্ধ করিয়াছেন। এই

নিষ্ঠুরতার ফলে ফড়িঙ্গ বেচারীর প্রাণ বিয়োগ ঘটে। সেই পাপে মুনিকে শূলদণ্ড ভোগ করিতে হইল। মুনি বলিলেন তখন আমি অত্যন্ত শিশু—পাপ পুণ্যের কি জানি। ধর্ম্মরাজ কহিলেন তাঁহার ধর্ম্মাধিকরণের সূক্ষ্ম বিচারে উহা পাপ বলিয়াই গণ্য এবং উহার দণ্ড ভোগও অপরিহার্য্য। মুনিবর তখন নিয়ম করিয়া দিলেন যে পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানব শিশুর হিতাহিত পাপ পুণ্যের বোধ জন্মে না। ঐ সময় পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত ভাল মন্দ কোন কার্য্যের জন্যই শিশু দায়ী নহে। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশু যতই অন্যায় কাজ করুক না কেন, তাহা পাপ বলিয়া বিবেচিত হইবে না এবং সেজন্য তাহাকে কোন দণ্ডভোগও করিতে হইবে না। সেই মহর্ষির প্রবর্ত্তিত নিয়ম একাল পর্য্যন্ত হিন্দু মানিয়া আসিতেছে। পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুরা সকল পাপ পুণ্যের অতীত।

এই পৌরাণিক উপাখ্যান হইতে ইহাই বুঝিতে হয় যে এতদ্দেশে পাচ বৎসর বয়সের সময় হইতে শিশুর বুদ্ধির উন্মেষ হইতে আরম্ভ হয়। সেজন্য ঐ বয়স হইতে তাড়না এবং বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। তবে সকল শিশুর পক্ষেই যে এই নিয়ম নিখুঁতভাবে খাটে তাহাও নয়। কোন কোন শিশুর পাচ বৎসরের পূর্ব্বেই বুদ্ধির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। আবার কাহারও কাহারও বা বুদ্ধির বিকাশ হইতে আরও বেশী সময় লাগে। যাহা হউক গড়পড়তা পাচ বৎসর বয়স এদেশে বুদ্ধির বিকাশারম্ভের কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অন্যান্য দেশে বিশেষত পাশ্চাত্য দেশে চারি বৎসর বয়সেই শিশুর বুদ্ধির বিকাশ আরম্ভ হয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

হিতাহিত জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে ভাল মন্দ কাজের পার্থক্য ও তাহাদের ফলাফলও কতক কতক বুঝিতে পারে। হঠাৎ কোন অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিলে সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং যথাসম্ভব নিজেকে সংযত রাখিবার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে কোন ভাল কাজ করিলে সে বিলক্ষণ আনন্দ ও আত্ম প্রসাদ লাভ করে। এখন হইতে তাহার সকল কাজই ভাল মন্দ হিসাবে আনন্দ ও বিষাদের কারণ হইয়া থাকে। এই সময় হইতে শিশুর সকল কাজ ভাল কিম্বা মন্দর দিকে যায়। যদি ভালর দিকে যায় (সব কাজই যে সব সময়েই ভালর দিকে যাইবেই, তাহা অবশ্য সম্ভব নহে। তবে অধিকাংশ কাজ,যদি ভালর দিকে যায়) তবে ভবিষ্যতে সে ব্যক্তি দেবতুল্য মহা পুরুষ হইয়া উঠে। আর যদি মতি গতি মন্দর দিকেই বেশীর ভাগ ধাবিত হয় তাহা হইলে পরিণামে সে যে মহা পাপী হইয়া উঠিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ছেলের মতি গতি যদি মন্দর দিকেই যাইতে দেখেন ত পিতামাতা চেষ্টা করিলে তাহাকে কতকটা ভালর দিকেও ফিরাইতে পারেন। একপ লোক ভবিষ্যতে দোষে গুণে জড়িত হইয়া থাকে এবং সংসারে একপ লোকের সংখ্যাই বেশী। তবে অভ্যাস করাইলে কতক লোককে যে ভালর দিকে ফিরাইতে পারা যায় তাহাও নিঃসন্দেহ। যে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে শিশুর মন ভালর দিকে যায় সে ক্ষেত্রে সে ত স্বভাবতই ভাল লোক হয়। কিন্তু একপ লোকের সংখ্যা খুবই কম। ইহা কতকটা বংশানুক্রম, কতকটা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর ফল। অনেক সময়ে মনের স্বাভাবিক গতি মন্দর দিকে হইলেও লজ্জা ভয় প্রভৃতি মানুষকে সংযত রাখিতে পারে। সাধুতা সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক না হইতে পারে সে ক্ষেত্রে সমাজ শাসন লোকাচার মানসিক দুর্ব্বলতা লোককে সদাচার পরায়ণ করিয়া তুলিতে পারে অন্তত সে মন্দ কাজ হইতে বিরত থাকিতেও পারে।

কোন বালক কোন একটা ভাল কাজ করিয়া যদি মাতার কিম্বা অপর কাহারও কাছে প্রশংসা পায় তাহা হইলে তাহার মনে খুব আনন্দ হয় নিশ্চয়ই কিন্তু সেই সঙ্গে একটু গর্ব্ব একটু আত্মম্ভরিতাব ভাবও আসিয়া থাকে। তখন তাহার মনে হয় এই রকম কাজ করিলে সকলে তাহাকে প্রশংসা করিবে। এইরূপ বিবেচনার ফলে সে নূতন নূতন কাজে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া

উঠে যে শেষকালে তাহা বাড়াবাড়িতে গিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সর্বমত্যন্তং গর্হিতং। কোন কাজেরই অতি কখনও ভাল হয় না তা সে যতই ভাল কাজ হউক। কারণ, বাড়াবাড়ি হইতে দিলে শিশুর মনে অহঙ্কার প্রভৃতি দোষের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। আবার কোন মন্দ কাজের জন্য অনুতপ্ত হওয়া ভাল বটে কিন্তু ইহারও বাড়াবাড়ি ভাল নয়। কারণ তাহার ফলে শিশু মনমরা বিমর্ষ হইয়া থাকিবে মনে যে একটু অভিমানের ভাবও থাকিবে না এমন নয়। তাহার ফলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হওয়াও অসম্ভব নয়। এই দুই দিকের দুই অতির মাঝামাঝি অবস্থাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। সাধারণ লোকের অবস্থা এ রূপই। তবে ইহার কোন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা সম্ভব নয়। ভাল কাজে কতখানি উৎসাহ দেওয়া উচিত এবং কোনখানে তাহা বন্ধ করা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করা কিম্বা মন্দ কাজের জন্য অনুতাপের মাত্রা নির্দ্দেশ করা সহজ কথা নয় এমন কি অসম্ভব বলিলেও চলে। কারণ প্রত্যেক শিশুরই নিজ নিজ বিশিষ্টতা আছে এবং উৎসাহ ও অনুতাপের মাত্রার অনুপাতও তদনুরূপ হওয়া চাই। তবে শিশু শিক্ষার ভার যাঁহাদের হাতে তাঁহাদের একটা মধ্য পন্থা নির্দ্দেশের চেষ্টা করা উচিত।

শিশুর মনে উচ্চাভিলাসের প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহার স্বাভাবিক সৎপ্রবৃত্তিগুলির উন্মেষ ও বিকাশের ধারা লক্ষ্য করিয়া যে পথে অগ্রসর হইলে ভাবী জীবনে তাহার গৌরব লাভের সম্ভাবনা সেই বিষয় পরিমিত মাত্রায় তাহাকে উৎসাহিত করিতে থাকিলে তাহার মনে উচ্চাভিলাষ জাগ্রত হইয়া মহত্ত্বের পথে তাহাকে পরিচালিত করিতে পারিবে। সৎ কাজের জন্য পুরস্কার ও অসৎ কাজের জন্য তিরস্কার মন্দ ব্যবস্থা নয়। কিন্তু এই তিরস্কার পুরস্কারের ব্যাপারের ভিতর প্রতিযোগিতা বা অপদস্থ হওয়ার ভাব আমদানী করার ফল ভাল হয় না। যে যখন যে কোন ভাল কাজ করিবে তখনই তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে পুরস্কৃত করা কর্ত্তব্য—এই পুরস্কারটা তাহার নিজেরই meritএর উপর নির্ভর করিবে। অপর কাহারও কোন ভালমন্দ কাজের বিচার বিবেচনা এ ক্ষেত্রে করা উচিত নয়। সে বিবেচনা অপর শিশুর বেলা স্বতন্ত্রভাবে ও ব্যক্তিগত ভাবে করিতে হইবে। একজনের অপেক্ষা আর একজন বেশী ভাল কাজ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে পুরস্কার দেওয়া হইতেছে এরূপ ভাব শিশুদের মনে জন্মিতে দেওয়া ভাল নয়। ইহাতে শিশু ভাল কাজ করিতে কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হইতে পারে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার মনে গর্ব্ব অহঙ্কার অপরের শক্তির উপর অশ্রদ্ধা হিংসা প্রভৃতির সৃষ্টি হইতে পারে। ফলে পরিণামে যথার্থ আত্মোন্নতির দিকে তাহার যতটা লক্ষ্য থাকুক আর নাই থাকুক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিবার ইচ্ছাটা তাহার মনে প্রবল হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে অসৎ পন্থার আশ্রয় লওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে না। এই প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব মানব মনের একটা স্বাভাবিক দুষ্প্রবৃত্তি। ইহাকে সংযত না করিয়া প্রশ্রয় দিলে আনুষঙ্গিকভাবে আরও অনেক অসৎ প্রবৃত্তি মনে প্রবল হইয়া মনুষ্যত্ব নাশ করিয়া থাকে। আবার কাহাকেও তিরস্কার করিবার সময় তাহাকে যাহাতে অপদস্থ না হইতে হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার করার উদ্দেশ্য সংশোধন করা এবং একের দৃষ্টান্ত দিয়া অপরকে মন্দ কাজে বিরত থাকিতে শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু কাহারও কোন মন্দ কাজের জন্য ঘটা করিয়া আরও অনেক শিশুকে জড় করিয়া তাহাদের সকলের সামনে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ায় তাহার সংশোধনের আশা খুব কমিয়া যায় এবং সকলের কাছে তাহাকে অপদস্থ করিবার ভাবটাই প্রবল হয়। ইহাতে অপরাধীর কোন উপকার হয় না—চরিত্র সংশোধনের কথা তাহার মনে উদয় হয় না। তাহার মনে কেবল অপমানের কথাই জাগিয়া থাকে—হিংসা প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা তাহার মনে প্রবল হয়। আর অপরাপর বালকেরাও ইহাতে কোন উপকার পায় না। তাহারা নিজেরা অন্যায় করিলে ঐরূপভাবে শাস্তি পাইবে অতএব তাহাদের ও

রকম অন্যায় কাজ করা উচিত হইবে না—এই শিক্ষাটুকু তাহারা লাভ করিতে পারিবে না। অপরাধীর শাস্তি দেখিয়া প্রথমত তাহারা মনে মনে বিলক্ষণ আমোদ পাইবে। তারপর অপরাধীর হীনতা অপমান এব নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের ভাব মনে হইয়া তাহাদের মনে অহঙ্কার জন্মিবে। ফলে দণ্ড পুরস্কারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অন্যায় কাজের জন্য বেত্রাঘাত অপমান অপেক্ষা অনুতাপই সমুচিত দণ্ড এবং একমাত্র ইহাই যথার্থ ফলপ্রদ। অপরাধী নিজের কাজে নিজে লজ্জিত হইলে তাহার সংশোধনের যথার্থ আশা থাকে। অপরের সামনে তাহাকে লজ্জা দিলে সে আশাটুকু নষ্ট হইয়া গিয়া তৎস্থলে ক্রোধ জিঘাংসা বিদ্রোহ প্রভৃতি অবাঞ্ছনীয় বিষয়ের সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া অন্যায় কাজের জন্য সাধারণের কাছে নিন্দিত হইবার ভয়টাই যথার্থ সংযমের রশ্মি কিন্তু সাধারণের কাছে অপ্রস্তুত অপদস্থ লজ্জিত করিয়া সে ভয়টা একবার কাটাইয়া দিলে অপরাধ সংশোধনের বাহিরে চলিয়া যায় আর তাহাকে সংযত রাখা অসম্ভব হইয়া উঠে। তবে অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে ইচ্ছাপূর্ব্বক কেহ কোন অন্যায় কাজ করিলে বা অপর কাহারও ক্ষতি করিলে তাহাকে দণ্ড দিয়া নিবারণ করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এই দণ্ড অপরাধের অনুপাতে পরিমিত মাত্রায় হওয়া উচিত। এবং অপরাধীকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য যে ন্যায় বিচারানুসারে তাহাকে দণ্ড দেওয়া হইতেছে। দণ্ড দান কালে দণ্ডদাতা ক্রুদ্ধ হইবেন না তাঁহার মনে যেন হিংসার কিম্বা প্রতিশোধের ভাব না থাকে। অপরাধী বালক যদি অপর কাহারও পরামর্শে কিম্বা উত্তেজনায় অপরাধ করিয়া থাকে তবে পরামর্শদাতাকেও দণ্ডিত করা কর্ত্তব্য। তবেই ইহা ন্যায়বিচারমূলক দণ্ড হইবে। আর দণ্ড এমনভাবে দিতে হইবে যেন বালক পুনরায় ঐ অপরাধ না করে। কারণ বারবার অপরাধ ঘটিলে এবং বারবার দণ্ড দিতে হইলে দণ্ড দেওয়া নিরর্থক হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থা—শিশুকে উত্তমরূপে লালনপালন করা। জনক জননী বা ধাত্রী যদি শিশুদের ভাল করিয়া লালন পালন করিতে পারেন তাহাদের অধিকারের গণ্ডী নির্দ্দেশ করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন তবে শিশুরা স্বতই অপরাধে বিরত থাকে তাহাদিগকে দণ্ড দিবার প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যদি কেহ কোন দোষ করে তবে তাহা উপেক্ষা করা উচিত নয়। উপেক্ষা করিলে অপরাধের মাত্রা বাড়িয়াই যাইবে। আবার দণ্ডের মাত্রা ন্যায় বিচার মূলক না হইলে দণ্ডের মাত্রা অতিরিক্ত হইলে, শিশু তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া ফেলিবে যে তাহার প্রতি সুবিচার হয় নাই। অবিচার হইয়াছে বুঝিলেই দণ্ডের ও দণ্ড দাতার প্রতি তাহার আর শ্রদ্ধা থাকিবে না সে বিদ্রোহী হইবে দণ্ড গ্রাহ্য করিবে না। ক্রমে সে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিবে।

পিতামাতার একমাত্র সন্তান অত্যধিক আদরে প্রায়ই বিগড়িয়া যায়। তবে একমাত্র পুত্রকে যিনি সৎ বালকে পরিণত করিতে পারেন তিনি সুজননী ও সুগৃহিণী। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বড় বিরল। একমাত্র পুত্রের জননী যদি কড়া শাসক হন তাহা হইলেও ছেলের মঙ্গল হয় না আর যদি বেশী মাত্রায় আদর দেন তাহা হইলেও ছেলের আর কোন ভরসা থাকে না। ছেলের উপর নজর রাখিতে হইবে কিন্তু ছেলে যেন জানিতে না পারে যে তাহার উপর নজর রাখা হইতেছে। সৎ কাজে তাহাকে উৎসাহ দিতে হইবে এবং অসৎ কাজ হইতে নিবৃত্ত রাখিতে হইবে বটে কিন্তু সেটা কেবল হুকুম তামিল করার হিসাবে নয়। শিশু যেন বুঝিতে পারে যে এটা ভাল কাজ তাই এটা করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে এবং এটা মন্দ কাজ তাই তাহাকে নিবারণ করা হইতেছে। শিশু যেন বুঝে যে ভাল মন্দ কাজই তাহার অধিকার অনধিকারের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে—পিতামাতার হুকুম মাত্র নয়।

অনেক জনক-জননী আছেন যাহারা ছেলেপুলেকে সংসারের কোন কাজেই হাত দিতে দেন না। সর্ব্বদাই

নিবারণ সর্ব্বদাই না—না—না। ইহার ফলও ভাল হয় না। ছেলেপুলেরাও সংসারের অঙ্গ। সংসারের কাজে তাহাদেরও একটা অধিকার আছে। সন্তানের ক্ষমতায় অবিশ্বাস—তাহারা সংসারের কাজে হাত দিলে তাহার ফল ভাল হইবে না এইরূপ ধারণা হইতে ঐ ধরণের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। কিন্তু শিশু শীঘ্রই বুঝিতে পারে যে মাতার আশঙ্কা অমূলক এবং যে কাজ তাহাকে করিতে বারণ করা হইতেছে সেই কাজ বাড়ীর অপর লোকে কিম্বা স্বয়ং জননী করিলেও কোন ক্ষতি হয় না—কেবল তাহার বেলা যত দোষ। শিশুর মনে এই ধারণা জন্মিলে সে আর নিষেধ মানিবে না। শিশুর নবোন্মেষিত কর্ম্মোৎসাহ একেবারে দমাইয়া না দিয়া তাহাকে কিছু কিছু কাজ করিতে দেওয়া উচিত। তাহা হইলে সে কাজও শিখিবে এবং একটা কাজে নিবিষ্ট থাকায় অন্যায় কাজে মন যাইবে না।

ছেলেদের ভূতের ভয় জুজুর ভয় হ্যাজবোলার ভয় হুতুমথুমোর ভয় কাবুলীওয়ালার ভয় বর্গির ভয় দেখানো উচিত নয়। এই সকল কাল্পনিক ভয় শিশু চিত্তকে এমন অভিভূত করিয়া রাখে যে সে কাপুরুষ না হইয়াই পারে না। অন্ধকারে কন্ধকাটা মস্কিল আসান জটে বুড়ো প্রভৃতির ভয় দেখাইয়া বাপ মা চাকর দাসী ছেলে পুলেদের শাসনে রাখিতে বশীভূত রাখিতে বাধ্য রাখিতে চেষ্টা করেন কিন্তু ইহার পরিণাম কেহই চিন্তা করিয়া দেখেন না। ইহাতে কত যে অনিষ্ট হয় তাহার কল্পনা করিবারও ইঁহাদের ক্ষমতা নাই।

আবার শিশুর কৌতূহলের মাত্রা এত অধিক পৃথিবীর সহিত পরিচিত হইবার স্বাভাবিক ইচ্ছা এতই প্রবল যে তাহারা প্রথম প্রথম নিষেধ বিধি মানিয়া চলিলেও উহার অযাথার্থ্য বুঝিতে তাহাদের বেশী দিন বিলম্ব হয় না। তখন তাহাদিগকে সামলাইয়া রাখা কঠিন হয়। ফলে শিশুর অবাধ্যতা অদম্য হইয়া উঠে।

শিশু পালনের ভার যাহাদের লইতে হয় তাঁহাদিগকে এই কয়টা প্রশ্নের উত্তর আগে নিজের মনে স্থির করিয়া লইতে হয়—

(১) যে শিশুর পালন ভার তাঁহার হস্তে অর্পিত হইয়াছে তাহাকে অপর শিশুরা পছন্দ করে কি না অপর শিশুদের সঙ্গে তাহার বনিবনাও কিরূপ?

(২) সে সত্য কথা বলে কি না অপর শিশুদের সুখ দুঃখের কথা সে ভাবে কি না?

(৩) সে সর্ব্বদা বাধ্য কি না?

(৪) ঘর গৃহস্থালীর ছোট ছোট কাজ সে নিজে করিতে পারে কি না? ঘরের কাজে তাহার উৎসাহ আছে কি না কিম্বা সে কাজ করিতে বিরক্তি বোধ করে কি না?

(৫) সে নিজেই আনন্দলাভ করে কি না কিম্বা অপরের তাহাকে আনন্দ দিতে হয় কি না?

(৬) তাহার ন্যায়ান্যায় বোধ আছে কি না?

(৭) সে স্বার্থপর কি না কিম্বা অপরের অধিকার অনধিকারের কথা বিবেচনা করে কি না? খাবার জিনিষ খেলনা প্রভৃতি পাইলে একলা ভোগ করিতে চায় কি না কিম্বা অপরের সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়া লয় কি না?

(৮) অন্ধকারে সে ভয় পায় কি না?

(৯) সে স্বেচ্ছায় খাবার দাবার খায় না তাহাকে উপরোধ অনুরোধ জবরদস্তি করিয়া খাওয়াইতে হয়?

(১০) তাহার প্রতি তোমার নিজের মনের ভাব কি রকম? তাহাকে তুমি অপরের তত্ত্বাবধানে বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পার কি না কিম্বা সর্ব্বদা তাহাকে তোমার নিজের চোখে চোখে রাখা দরকার বিবেচনা কর কি না?

(১১) তাহাকে শাস্তি দিতে হয় কি না? একই রকম অপরাধের জন্য তাহাকে পুন পুন শাস্তি দিতে হয় কি না?

এই প্রশ্নগুলি এবং এরূপ ধরণের আরও নানা প্রশ্ন নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিজের মনে মনেই তাহাদের যথাসাধ্য মীমাংসা করিয়া লইয়া সেই আলোকে শিশু চিত্ত অধ্যয়ন করিলে শিশুপালন অনেক সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে এবং তাহার ফলও খুব ভাল হইবে।

দাঁতের কদর

[শ্রীজগদীশচন্দ্র মজুমদার এম এ বি এল]

দাঁতের উপকারিতা —

দাঁত থাকিতে আমরা দাঁতের মর্য্যাদা বুঝি না। ডাক্তার অসলার (William Osler) বলিয়াছেন—If I were asked whether more physical deterioration was produced by Alcohol or by defective teeth I would say unhesitatingly— Defective Teeth আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন মদ কি খারাপ দাঁত এই দুইটার কোনটীতে মানুষের স্বাস্থ্য অধিকতর নষ্ট করিয়াছে আমি ইতস্তত না করিয়া বলিতাম খারাপ দাঁত। সাধারণত দাঁতের দ্বারা আমরা তিনটী উপকার পাই—

(১) প্রধান উপকার—দাঁত আমাদের খাদ্যগুলি চর্ব্বণ করিয়া সহজপাচ্য করে। খাদ্য রীতিমত হজম হইলে অধিকাংশ রোগ নিকটে আসিতে পারে না। নীরোগ শরীর কার্য্যে উৎসাহ দেয় ও জীবনে শান্তি আনয়ন করে। অপর পক্ষে রুগ্ন শরীর যন্ত্রণাদায়ক ও অকেজো।

(২) দাঁত আমাদিগকে স্পষ্টরূপে কথা বলিতে সাহায্য করে। যাহাদের কতক দাঁত নাই তাহাদের কথা অস্পষ্ট হয় ও শ্রুতি মধুর হইতে পারে না। কথা বলার প্রধান উদ্দেশ্য অন্যকে সন্তুষ্ট রাখা ও নিজ মতে আনয়ন করা। দন্তহীন লোকেরা এই দুইটী কাজের কোনটীতেই বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

(৩) মুখের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করাও দাঁতের একটা কাজ। কোন দাঁত পড়িয়া গেলে মুখখানা বিশ্রী দেখায়।

শতকরা কয় জনের দাঁত খারাপ তাহা সঠিক ভাবে বলা অসম্ভব। অনেকে মনে করেন পরীক্ষা করিলে প্রায় অর্দ্ধেক লোকের দাঁতে নানা প্রকার ত্রুটী বাহির হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একবার ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় মন দিয়া ছিলেন এবং এক কমিটী (Students' Welfare Committee) গঠন করিয়া তাহা দ্বারা অনেক ছেলের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও করিয়াছিলেন। দাঁত পরীক্ষা সম্পর্কে তাঁহাদের ফল কি আমরা ঠিক জানি না। যাহা হউক দাঁত দ্বারা যখন আমরা এত উপকার পাই, তখন আমাদের কর্ত্তব্য দাঁতের খুব যত্ন লওয়া।

দাঁতের সাধারণ বিবরণ —

দাঁত আমাদের জীবনে দুইবার উঠে। শৈশবে একবার উঠে তাহাদিগকে দুধে দাঁত বলে। শিশুর বয়স যখন ৬।৭ মাস তখন হইতে দুধে দাঁত উঠিতে আরম্ভ করে এবং আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত উঠে। এই দাঁতগুলির মোট সংখ্যা ২০টী প্রত্যেক সারিতে দশটী করিয়া। এই দাঁতগুলি সাধারণত দেখিতে খুব সুন্দর ও ছোট ছোট। স্থায়ী দাঁত না উঠা পর্য্যন্ত এই দাঁতগুলি থাকিবে।

৬।৭ বৎসর বয়স হইতে দুধে দাঁত পড়িতে থাকে ও স্থায়ী দাঁত উঠে। স্থায়ী দাঁতের মোট সংখ্যা ৩২টী, অর্থাৎ প্রত্যেক মাড়িতে ১৬টী করিয়া। এই দাঁতগুলি দুধে দাঁত হইতে বড় হয়। এই দাঁতের মধ্যে কয়েকটিকে বলে আক্কেল দাঁত। তাহা ১৭ হইতে ২১ বৎসরের মধ্যে বাহির হয়। এই দাঁতগুলি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুস্থ ও সবল থাকার কথা।

সব দাঁতগুলি দেখিতে এক প্রকার নয়। কোনগুলি ধারাল কোনগুলি চোখা কতকগুলির উপরিভাগ প্রশস্ত ইত্যাদি। প্রত্যেক রকম দাঁতের পৃথক পৃথক নাম আছে। দাঁতের নানা রকম কাজ করিতে হয় বলিয়া দাঁতও নানা ধরণের। কতকগুলি দাঁতের দ্বারা খাবার জিনিস কর্ত্তন করিবার সুবিধা হয় কোনগুলি শক্ত খাদ্য

দ্রব্য সহজে ছিঁড়িতে পারে আর কতগুলি ভক্ষ্যদ্রব্য সহজে পিশিতে পারে। দাঁতগুলির উপরিভাগ সমতল নহে, তাহাও কাজের সুবিধার জন্ত। শারীর বিধান তত্ব সম্পর্কীয় পুস্তকে (ফিজিওলজি) দাঁতের গঠন ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আছে।

দাঁত রক্ষা —

দাঁতগুলি রীতিমত ব্যবহার না করিলে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অপরিষ্কারের দরুণ দাঁতের গায়ে এক প্রকার পাথরের ন্যায় শক্ত জিনিস জন্মে তাহাও দাঁতের পক্ষে অনিষ্টকর। অনেকে বলেন দাঁত দিয়া যে রক্ত পড়ে ইহাই তাহার কারণ। দাঁত রীতিমত পরিষ্কার না করিলে খাদ্য দ্রব্যের টুক্‌রা দুই দাঁতের মধ্যে থাকার দরুণ দাঁত ক্রমশ ক্ষয় হইয়া যায়। দাঁত রক্ষা সম্পর্কে কতকগুলি কথা নিম্নে বলা হইবে। আশা করা যায় তাহা অনেকের উপকারে আসিবে।

(১) শিশুকাল হইতেই ছেলে মেয়েদিগকে দাঁত পরিষ্কার রাখার অভ্যাস করাইতে হইবে। এইটী মা র কাজ। Habit is second nature। একবার অভ্যাস হইলে দাঁত পরিষ্কার করিতে কোনও ক্ষটী কি অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। শৈশবে অনেকের দাঁত পরিষ্কার করার অভ্যাস না থাকায় বড় হইয়াও তাহারা দাঁতের প্রতি মনোযোগী হইতে পারে না ফলে অল্প বয়সে দাঁত নষ্ট হইয়া যায়।

(২) যখন দুধে দাঁত পড়িয়া স্থায়ী দাঁত উঠিতে থাকে তখন মাতা ছেলে মেয়েদের দাঁতের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। দাঁত নড়িলে যাহাতে যথা সময়ে উঠান হয় তাহা করিতে হইবে। অনেক ছেলে মেয়ে বেদনার ভয়ে যথা সময়ে নড়া দাঁত উঠায় না ফলে দুধে দাঁত থাকার অবস্থায়ই স্থায়ী দাঁত উঠে ইহাতে মুখ দেখিতে বিশ্রী ও দাঁতগুলি বেঁকাতেড়া হয়। পরে চেষ্টা করিলেও এই দাঁতগুলি পরিষ্কার করা যায় না।

(৩) খুব গরম কিম্বা খুব ঠাণ্ডা দ্রব্য আহার করিবে না কারণ উভয়ই দাঁতের পক্ষে অনিষ্টকর।

(৪) নিম বট প্রভৃতি গাছের কোমল শাখাগ্রকে ব্রাসের মতন করিয়া দন্ত মার্জ্জন করিবে। ব্রাস ব্যবহার করিলে খুব শক্ত ব্রাস ব্যবহার করিবে।

(৫) দাঁতন বা ব্রাস দ্বারা দাঁতের বাহির ভিতর ও মাড়ির সমস্ত স্থানই মার্জ্জনা করিবে। মাড়ি হইতে রক্ত বাহির হইলে ভীত হইবে না আরও দৃঢ়তার সহিত মার্জ্জনা করিবে।

(৬) দাঁত মাজিবারও নিয়ম আছে। উপরের পাটির দাঁত মাজিবার সময় মাড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে মাজিবে। নীচের পাটির দাঁত মাজিবার সময় মাড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া উপরের দিকে মাজিতে থাকিবে। এইরূপ দাঁত মাজিলে সহজে দাঁত পরিষ্কার হয়। অন্যভাবে মাজিলে সহজে দাঁত পরিষ্কার হয় না। এইরূপ দাঁত মাজার অভ্যাস হইলে কয়েক দিন পরে কোনই কষ্ট অনুভব হইবে না।

(৭) দিনে দুইবার দাঁত মাজিবে। প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া একবার আর রাত্রে খাওয়ার পর শয়নের পূর্ব্বে একবার। আমরা সাধারণত প্রাতে দাঁত মাজিয়া রাত্রে প্রায় কেহই দাঁত মাজি না। দুই দাঁতের মধ্যস্থিত ছিদ্রের ভিতর খাদ্য দ্রব্যের টুক্‌রা থাকে তাহা রাত্রে পচিয়া দাঁতগুলির অনিষ্ট করে। ঘুমাইবার পূর্ব্বে দাঁত পরিষ্কার করিলে খাদ্যাবশিষ্টগুলি বাহির হইয়া যায় ও রাত্রে দাঁতের কোন অনিষ্ট হইতে পারে না।

(৮) দাঁত মাজিবার জন্য মূল্যবান দন্তমঞ্জনের বিশেষ কোন আবশ্যকতা নাই। সামান্য একটু লবণ ও ফটকিরির মিহি গুড়ার সহিত পরিষ্কার চকের গুড়া দ্বারা মাজিলেই চলে।

(৯) কোন দাঁত নষ্ট হইয়া থাকিলে তাহা উঠাইয়া ফেলিবে কিম্বা তাহার ছিদ্রগুলি উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা পূরণ করিয়া ফেলিবে। কখনও তাহা ডাক্তার না দেখাইয়া রাখিবে না, বেদনা না থাকিলেও ডাক্তার দেখাইবে।

(১) দাঁত পুড়িয়া গেলে কি উঠাইয়া ফেলিলে

কৃত্রিম দাঁত বসাইয়া লইবে ইহাতে বিলম্ব করা সঙ্গত নয়।

(১১) কতকগুলি খাদ্য আছে যাহা সহজে দাঁত পরিষ্কার করে যথা, নানা প্রকার শাক ফল প্রভৃতি। খাবার শেষে এইরূপ দাঁত পরিষ্কারক খাদ্য খাইলে ভাল হয়।

(১২) ' মল মূত্র পরিত্যাগের সময় দন্তে দন্তে একটু জোরে চাপিয়া ধরিবে। যতক্ষণ মলমূত্র নি সারণ হয় ততক্ষণ ঐরূপ করিয়া থাকিলে শীঘ দাঁত পড়িবে না এবং বহুকাল কার্য্যক্ষম থাকিবে। (নিগমানন্দের ব্রহ্মচর্য্য সাধন]

শেষ কথা —

আমাদের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে এই বিষয়ের গুরুত্ব পুন স্মরণ করাইতেছি ডাক্তার হার্ম্মাণ ওয়েবার (Dr Hermann Waber M D F R (P) বলেন— As proper mastication is one of the most powerful and beneficial means of maintaining health it is self evident that the organs of mastication especially the teeth and the jaws ought to be carefully attended to from early life to old age

যখন পরিষ্কার বুঝা যায় যে স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে হইলে খাদ্য উপযুক্তরূপে চর্ব্বণ খুব কার্য্যকরী উপায়, তখন চর্ব্বণযন্ত্র বিশেষত দাঁত ও মাড়ির শৈশব হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত যত্ন লওয়া সঙ্গত।

—

জন্ম স রোধ।—

কৃত্রিম উপায়ে জন্ম সংরোধ করা উচিত কি না এই বিষয় লইয়া বিলাতে বিলক্ষণ আন্দোলন চলিতেছে। সম্প্রতি বিলাতে বিশপ অব উইঞ্চেষ্টারের নেতৃত্বে একটা কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে পাদরী চিকিৎসক আইন ব্যবসায়ী এবং সম্ভ্রান্ত সাধারণ ভদ্রলোকেরা ছিলেন। কমিটির বিচারে স্থির হইয়াছে যে ধর্ম্ম সমাজ ও অর্থ সমস্যার দিক হইতে জন্ম সংরোধ সঙ্গত নহে। উহাতে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হয়। উহা প্রকৃতির নিয়মের ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই নয়। জন্ম সংরোধের উপায় অবলম্বন করিতে হইলে আত্ম সংযম ইন্দ্রিয় সংযমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। জন্ম সংরোধের জন্য কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য লওয়া পাপ। কিন্তু জন্ম সংরোধ করিবার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে স্বাস্থ্য হানি ঘটে কি না এ বিষয়ে কমিটি ইচ্ছা করিয়াই কোন মত প্রকাশ করেন নাই। সেই জন্য বৃটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের কাউন্সিলের একটা বৈঠকে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রস্তাবকারী বলেন যে কৃত্রিম উপায়ে জন্ম সংরোধ করা স্বাস্থ্যহানিকর কি না—সভা সে বিষয়ে একটা নিশ্চিন্ত মত প্রকাশ করুন। কিন্তু

অন্য কোন কোন সদস্য আপত্তি করিয়া বলেন যে সভা এ বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন না। জন্ম সংরোধের কৃত্রিম উপায় স্বাস্থ্যহানিকর কি না এ বিষয়ে চিকিৎসকগণের মধ্যে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। অনেকে ইহা নির্দোষ বিবেচনা করেন আবার অনেকে ইহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। উভয় পক্ষই যুক্তি প্রদর্শন করিয়া নিজ নিজ মতের সমর্থন করিয়া পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। যাঁহার ইচ্ছা তিনিই এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া ইহার অনুকূল বা প্রতিকূল মত গঠন করিতে পারেন এবং কেহ তাঁহাদিগের নিকট পরামর্শ চাহিলে তাঁহার সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু বৃটিশ মেডিক্যাল এসোসিয়েসন এ বিষয়ে প্রতিকূল বা অনুকূল এমন কোন মত প্রকাশ করিতে পারেন না যাহা সর্ব্ব সাধারণ এবং বিশেষ করিয়া চিকিৎসক সম্প্রদায় আদর্শ মতবাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। বলা বাহুল্য এমন একটা যুক্তির পর সভা কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই।

মাতৃ হাসপাতাল।—

অস্থায়ী বড়লাট মহিষী লেডী লীটন সাহেবা সংবাদপত্রে আবেদন প্রচার করিয়া লেডী ডফারীণ হাসপাতালের জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া ভারতবাসীদের নিকট হইতেই তিনি সাহায্যপ্রার্থিনী হইয়াছেন কারণ, তিনি বলেন ভারতবাসিনীদের জন্যই এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার সুখ সুবিধা যখন ভারতবাসীরা একলা ভোগ করে তখন ইহা পরিচালনের ব্যয় ভারতবাসীদেরই দেওয়া উচিত। গত ইংরেজী বর্ষের (১৯২৪ সালের) ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত এক বৎসরে হাসপাতালের আয় হইয়াছিল ৫১৮৫৯ টাকা। তন্মধ্যে ভারতবাসীরা মাত্র ২৭৪ টাকা চাঁদা দিয়াছে। প্রায় ৫২ হাজার টাকার সঙ্গে তুলনায় প্রায় তিনশত টাকা যথার্থই অতি নগণ্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই এবং ইহা ভারতবাসীদের পক্ষে অতি লজ্জার বিষও বটে। কিন্তু ভারতবাসী ছাড়া ভারতের বাহিরের লোকেরা কত টাকা চাঁদা দিয়াছে তাহা যখন প্রকাশ নাই তখন ভারতবাসীর অপরাধের মাত্রা ও গুরুত্ব কতখানি তাহা ভাল বুঝা গেল না। সে যাহাই হউক উক্ত ৫২ হাজার টাকার মধ্যে ১১ টাকা কলিকাতা কর্পোরেশন প্রদত্ত। এই টাকা কাহাদের দেওয়া তাহা আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? ভারতবাসী প্রত্যক্ষ চাঁদা হিসাবে বেশী টাকা দিতে না পারুক কর্পোরেশনের দান কি প্রকারান্তরে ভারতবাসীরই দেওয়া নয়? তা ছাড়া হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সময় যিনি যত টাকা দিয়াছিলেন তাহা ঐ হাসপাতালের দেওয়ালের গায়ে মার্ব্বেল পাথরের দান তালিকায় উৎকীর্ণ আছে। ভারতবাসী কত টাকা দিয়াছে ভারতবাসী নয় এমন অন্য লোকেই বা কত টাকা দিয়াছে তাহাও সেই তালিকায় লেখা আছে। তাহাতে ভারতবাসীর দানের পরিমাণ কি এতই নগণ্য ও নিন্দার্হ? সে যাহা হউক আমাদের বিশ্বাস ভারতবাসীদের কাছে বোধ হয় ঠিকমত চাঁদা চাওয়া হয় না। চাহিলে বোধ হয় তাহারা আরও বেশী চাঁদা দিতে পারিত। লেডী লীটন সাহেবার আবেদন পত্র আমরা ইংরেজ পরিচালিত ইংরাজী সংবাদপত্রে দেখিলাম। দেশী বা রেজী ভাষায় প্রচারিত কোন ভারতীয় সংবাদপত্রে এই আবেদন পত্রখানি আমাদের নজরে পড়ে নাই। তাই আমাদের মনে হয় ভারতবাসীদের নিকট হইতে রীতিমত চাঁদার তাগাদা করা হয় না।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম"

১৪শ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ সাল { ৮ম সংখ্যা

টাকা কোথায় ?

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি এ]

পণ্ডিতেরা বলেন*—

অর্থানাং অর্জ্জনে দুঃখ অর্জ্জিতানাং চ রক্ষণে

আয়ে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং কষ্ট সংশ্রয়ম।

অর্থ উপার্জ্জনে দুঃখ রক্ষণে দুঃখ, রোজগারেও গলদ ঘর্ম্ম হইতে হয় আবার উহার ব্যয়েও কষ্ট হয়। অতএব অর্থকে ধিক্।

পণ্ডিত মহাশয়েরা যতই ধিক্' ধিক্ করুন না কেন 'অর্থ বিনা গতিরন্যথা।' বাঁচিতে হইলে—মানুষের মত থাকিতে হইলে—টাকা চাই। টাকার দৌলতে কত জনশূন্য স্থান জনাকীর্ণ হইয়াছে কত স্বাস্থ্যহীন দেশ স্বাস্থ্যবান হইয়াছে তাহার প্রমাণ ইতিহাসে আছে। ম্যালেরিয়া দূর করিতে হইলে টাকা চাই কারণ ম্যালেরিয়ার মুখ্য কারণ দারিদ্র্য—"mala ria is a hunger disease" দেশের নৈতিক স্বাস্থ্য উন্নত হইতেছে না তারও কারণ জনসাধারণের মর্ম্মগত দারিদ্র্য। দারিদ্র্য জীবনের রস শুকাইয়া দেয়—Poverty freezes the genial current of the soul দারিদ্র্যের ফলে মনের বৃত্তিগুলি হীন হইয়া যায়। পণ্ডিত কাশীদাসেরও যদি ঘরে চাল না থাকিলে কবিতা জমিত না। কবিরা তাই বলেন "দারিদ্র্য দোষো গুণরাশি নাশী।" দাদাভাই নৌরজী মহাশয় বলেন—আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের ফলে জাতীয় জ্ঞান ও বুদ্ধি লোপ পায় with material wealth go also th wisdom and experience of the coun try। তাই বলিতেছিলাম টাকা চাই।

চৈত্র বৈশাখে যখন দেশে জল 'দে জল রব উঠে', তখন স্বদেশী বক্তৃতার অপেক্ষা টিউব ওয়েলের (tube well) প্রয়োজন বেশী এ কথা বক্তারাও স্বীকার করিবেন। পল্লীগ্রামে যখন 'ম্যালেরিয়া জ্বরে' এই পরিবার কুইনাইন সেবন করে নাই ছবির মত বাস্তব

চিত্র ঘরে ঘরে প্রকট হয় তখন আলোক্ষিলিস কিউ লেরে'র হুক্ষ প্রভেদ লইয়া প্রবন্ধাদি না লিখিয়া ঘরে ঘরে কুইনাইন দিলে যে বেশী কাজ হয় ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। জনসাধারণ যখন ভাবস্বরে বলে অন্ন পথ্য দাও আমরা তখন বলি অপেক্ষা কর—দিন আসিতেছে। গণমণ্ডল অর্থ ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করা (To the masses the problem is one of bread and salt)। এ কথা ভুলিলে চলিবে না— মনকে চোখ ঠারিয়া লাভ কি? কথাটা দাঁড়াইল এই যে টাকা চাই কিন্তু টাকা কোথায়?

টাকার কথা উঠিলেই বিজ্ঞ লোকেরা বলেন কেন টাকার অপ্রতুল কি? Government's money is people's money সরকারী তোষাখানা—ও ত আমাদেরই। আসুন দরখাস্ত করি—agitation করি —আবেদন ও নিবেদন চালাই—টাকা আসিবেই।

অপেক্ষাকৃত অল্প বিজ্ঞেরা অর্দ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান যথা District Board local boardএর দিকে তাকাইয়া দিনাতিপাত করেন। অর্থ না মিলিলে অভিমান করেন।

রায়ত বন্ধুরা জমিদারের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজেদের আত্ম প্রবঞ্চনা করেন—জমিদার প্রজার বাকী খাজনার বহরের উল্লেখ করিয়া বলেন আমারই দিন চলে না প্রজার দিকে তাকাইলে আমার উপায় কি হইবে?

এইরূপে কখনও সরকারের নিকট কখনও জমিদারের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়া আমরা দিনাতিপাত করিতেছি আর অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছি। অর্থ ভিক্ষা করিয়া বিরাট এই ক্ষুধা মিটাইবার প্রয়াস না করিয়া অর্থ সৃষ্টির চেষ্টা করিলে আমরা এতদিন অর্থের মুখ দেখিতাম।

এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি—'যেমন তেমন চাকরী ঘৃত ভাত।' ঘৃত ত সহজে পাওয়াই যায় না—চাকরী করিয়া দুবেলা দুই মুঠো ভাতও অনেকের জুটিতেছে না— ইহা ত প্রত্যহ দেখিতেছি। চাকরীর মোহ আমাদের যায় নাই তবে চাকরী না জোটাতে অনেকে গত্যন্তরের কথ—অর্থসৃষ্টির কথা ভাবিতেছেন। ইহা শুভলক্ষণ।"

অর্থসৃষ্টির কথা মনে হইলেই আমাদের Bibleএর Talentএর গল্পটী মনে হয়। কৃষক পুত্রেরা যেমন নিরাশ হইয়া আবিষ্কার করেন যে, Talent মাটীর নীচে পোঁতা নাই—উহা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অন্তর্নিহিত আছে—আমরাও যতদিন না বুঝিব যে কোন গৌরীসেন অর্থদান করিয়া আমাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না—আমরাই অর্থসৃষ্টি করিয়া বাঁচিব ততদিন মুক্তি নাই। প্রথম কথাটী হইতেছে—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

অর্থসৃষ্টি করিতে হইবে। সে জন্ত উদ্যম চাই— চেষ্টা চাই। ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগা। কেবল উদ্যমেই হইবে না—বিষয়বুদ্ধি চাই, tact চাই। এই বাংলায় আমরা কেরানীগিরি করিয়া মরি আর মাড়োয়ারী ভাটিয়া ক্রোড়পতি হয়—ইহাকে অদৃষ্টের পরিহাস ভিন্ন আর কি বলিব? আমরা যখন Scheme করি—ভাবনা চিন্তা করি— তখন মাড়োয়ারী কাজে নামিয়া পড়ে। কাজে নামিয়া একটা ধাক্কায় আমরা মুইয়ে পড়ি। তখনও দেখি মাড়োয়ারী বাংলার সুদূর পল্লীতে তার ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটী লইয়া আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে। অর্থসৃষ্টির জন্ত উদ্যম ও বিষয়বুদ্ধি চাই।

নিন্দুক তখনি বলিয়া উঠিবেন—মশায় অর্থ সৃষ্টি ত আপনি করিতেছেন—ক্ষেত্র কোথায়? হাওয়ায় ত ব্যবসা ফাঁদিতে পারি না—তাতে যে Alnascarএর অবস্থা হইবে। তাঁহাদের নিকট আমার একমাত্র কথা—

মন তুমি কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জনম রইল পতিত
আবাদ করলে ফল্‌ত সোণা।

আমরা কৃষিকাজ জানি না—তাই সোণা ফলে না। ক্ষেত্র আছে। (ক্রমশঃ)

বাংলার মাটী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার]

২। **জমির রাসায়নিক উপাদান**—সাধারণত মাটিতে আমরা নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত হই।

মৃত্তিকায় প্রধানত নিম্নলিখিত রূঢ় পদার্থগুলি নিম্ন লিখিত পরিমাণে থাকে যথা—

১।	অক্সিজেন	৪৪	৫৮
২।	সিলিকন	২৪	৩৬
৩।	য়্যালুমিনিয়ম	৫	১
৪।	লৌহ	২	১
৫।	ক্যালসিয়াম	১	৬
৬।	ম্যাগ্নেসিয়াম	১	৩
৭।	সোডিয়ম্	১	১
৮।	পোটাসিয়াম	১	১
৯।	অন্যান্য পদার্থ	১	১
		১	

৩। **মৃত্তিকার রস সঞ্চালন**—মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ভিজ্জগৎ পর্য্যন্ত দেখা যায় সকলের শরীর মধ্যে রক্ত বা রস সঞ্চালনের ব্যবস্থা আছে। সেই রস সঞ্চালনের গতি কোন প্রকারে রুদ্ধ হইলে, জীব হউক বা উদ্ভিদ হউক—অধিকক্ষণ সতেজ না জীবিত থাকিতে পারে না। মনুষ্যের লোমকূপগুলিকে কোন রং অথবা ভস্ম দ্বারা একেবারে লেপিয়া দিলে সে কতক্ষণ বাঁচিতে পারে? উদ্ভিদের পত্রদলকে ঐরূপে প্রলিপ্ত করিয়া দিলে উদ্ভিদও বাঁচিতে পারে না। মৃত্তিকার রস সঞ্চালনের শক্তি আছে। রস গ্রহণের ও বর্জ্জনের পথ আছে। অধিক কি প্রাণীদিগের ন্যায় জীবনও আছে। মৃত্তিকার শক্তি বা কার্য্যকারিতা—উদ্ভিদ শরীর দ্বারা প্রকাশিত হয়।

মনুষ্য বা জীব দেহে যেমন শোণিত সঞ্চালনের (circulation of blood) ব্যবস্থা আছে, মৃত্তিকার মধ্যেও সেইরূপ রস সঞ্চালন (circulation of moisture) ক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে। উক্ত সঞ্চালনী শক্তির মূলে উত্তাপের কার্য্য দেখা যায়। জীব শরীরে যতক্ষণ উত্তাপ থাকে ততক্ষণ তাহাতে শোণিত সঞ্চালিত হয়। কিন্তু যেমন উহা উত্তাপবিহীন হয় অমনই সঞ্চালন ক্রিয়া স্থির হয়। মরণোন্মুখ ব্যক্তির হস্ত পদাদি ক্রমে ক্রমে অবশ বা স্থির হইয়া আসে। তখন সেই সকল অঙ্গে আর উত্তাপ পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা কেহ এরূপ বুঝিবেন না যে সঞ্চালন ক্রিয়াই উত্তাপের মূল। উত্তাপই সঞ্চালনের মূল। মাটির মধ্যে যে রস থাকে তাহা সূর্য্যোত্তাপে সঞ্চালিত হয়। সূর্য্যোত্তাপ যখন না থাকে তখন ভূগর্ভস্থিত রস স্থির থাকে। মেঘাচ্ছন্ন দিবসে এবং রাত্রিকালে সূর্য্যের অভাব বশত মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ রস অল্লাধিক জলহীন ভাবে অবস্থান করে। তবে সামান্য পরিমাণ সঞ্চালন থাকে তাহা ভূগর্ভস্থিত উত্তাপের ফলে।

যাহা হউক মৃত্তিকা মধ্যে কিরূপে রস সঞ্চালিত হয় তাহা একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব। গৃহস্থ যখন কটাহে করিয়া দুগ্ধ জ্বাল দিয়া থাকেন তখন যদি সেই কটাহের ভিতরে লক্ষ্য রাখা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে দুগ্ধ যত গরম হইতে থাকে ততই তাহা উলট পালট হয়—নিম্নের দুগ্ধ উপরে, উপরের দুগ্ধ নিম্নে যাইতে থাকে। সুপরিষ্কৃত কটাহে জল রাখিয়া যদি উত্তাপ দেওয়া যায় তাহা হইলে ইহা আরও স্পষ্ট দেখা যায়। নিম্নের জল যত গরম হইতে থাকে ততই উপরে ঠেলিয়া উঠে উপরের জল কাজেই নিম্নে চলিয়া গিয়া আবার উত্তপ্ত হয়। সেই প্রণালীতে

সূর্য্যোত্তাপে ভূমির উপরিভাগ উত্তপ্ত হইয়া উঠিলে মৃত্তিকার অণুপরমাণুসমূহ দ্বারা বাহিত হইয়া সেই উত্তাপ ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকে এবং তাহাতেই ভূগর্ভ মধ্যে রস সঞ্চালিত হয়।

৪। সারের প্রয়োজনীয়তা —ভারতের মৃত্তিকা চিরকাল সুফলা বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং প্রকৃত পক্ষে তাহাই। এই জন্য অতি অল্প ব্যয় ও পরিশ্রমে ভারতীয় কৃষকগণ স্বীয় অভাবোপযোগী ফসল প্রাপ্তি পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে। পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া ক্ষেত্রে সার প্রদান করা যে একান্ত কর্ত্তব্য তাহা সাধারণ কৃষকের এখনও বোধগম্য হয় নাই। যত দিন কৃষকগণ সার বিষয়ে ঈদৃশ হতাদর প্রদান করিবে এবং তাহার উপকারিতা বা উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিবে তত দিন তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর নহে এবং ক্ষেত্রেরও উর্ব্বরতা স্থায়ী হওয়া অনিশ্চিত। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃত কথা লইয়া বিচার করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সারের সহিত মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের কতদূর নিকট সম্বন্ধ। একখণ্ড অব্যবহৃত ও পতিত জমি লইয়া বৎসরের পর বৎসর বিনা সারে আবাদ করিলে নিশ্চিত বুঝিতে পারা যাইবে যে প্রথম আবাদ হইতে যতই দূরে যাওয়া যায় ততই ফসলের পরিমাণ ও গুণ হ্রাস হইয়া আসে। প্রথম বৎসর যে প্রকার ফসল আদায় হয় পরবর্ত্তী বৎসরে কখনই সেরূপ হয় না কিন্তু সাধারণ কৃষকে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না কিম্বা করে না। তাহার কারণ এই যে কতকগুলি স্বাভাবিক সুযোগে জমির উর্ব্বরতা সাধিত হয় এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে বর্ষাকালে যে সমুদায় ক্ষেত্র ডুবিয়া যায় তাহাতে অন্য স্থান হইতে পলিরূপে অনেক সার স্বতই আসিয়া পড়ে ও স্থানীয় উদ্ভিজ্জাদি পচিয়া সারে পরিণত হয়। এইরূপ স্বাভাবিক কারণে জমির কথঞ্চিৎ উর্ব্বরতা রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ক্ষেত্রে সার পদার্থ সঞ্চিত হয় দ্বিতীয়তঃ— উল্লিখিত স্বাভাবিক উপায়ে যে যে পদার্থ আসিবার তাহাও আসিয়া থাকে।

জমিতে একবার ফসল হইলে তাহার সহিত জমির অনেক সার চলিয়া যায়। জমিতে যদি সেই অংশ কৃত্রিম উপায়ে সংরক্ষিত করা না যায় তাহা হইলে ক্ষেত্রের সার বরং আরও হ্রাস পাইয়া থাকে। এই জন্য বিনা সারে একই ক্ষেত্রে বারম্বার আবাদ করিলে জমি ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং অবশেষে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। পাঠক যাহাতে বুঝিতে পারেন এজন্য এস্থলে একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কয়েক বৎসর হইতে একখণ্ড জমিতে গহমার আবাদ হইত। তাহাতে কোন রূপ সার কখনও দেওয়া হয় নাই বা হইত না। সুতরাং উক্ত জমির পরিণাম কিরূপ হয় তাহা দেখিবার নিমিত্ত উহার প্রতি আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি যে সেই জমি উচ্চতল ও বর্ষায় ডুবিয়া যায় না। অথবা অন্য স্থানের জল আসিয়া তথায় পড়ে না। যাহা হউক প্রথম বৎসর দেখা গেল গহমার গাছগুলি ৮৯ হাত দীর্ঘ হইল এবং তাহার শ্রীও সুন্দর হইল। দ্বিতীয় বৎসর—তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষুদ্র ও ক্ষীণ হইল। আর দুই বছর পরে যাহা হইবে পাঠক তাহা বুঝিয়া লউন। একেই ত গহমার গাছ ইক্ষুর ন্যায় জমিকে এক বছরেই সার হীন করিয়া ফেলে তাহাতে বারম্বার বিনাসারে উহার আবাদ হইলে যে উহার সারাংশ একেবারেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ কি? সকল ফসল সমভাবে জমির সার পদার্থ অপহরণ করে না। কোন ফসল অধিক পরিমাণে কোন ফসল অল্প পরিমাণে জমির সার শোষণ করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বাংলা গভরমেণ্টের কৃষি বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সহকারী ডিরেক্টার বাবু নৃত্য গোপাল মুখোপাধ্যায়ের মত উদ্ধৃত করা গেল।

এক বিঘা জমিতে যদি ৮ মণ ধান হয় তবে সেই ধান ও তাহার খড় পোড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিলে ঐ ছাইয়ের ওজন আন্দাজ অর্দ্ধ মণ হইবে। এক বিঘা জমিতে ৫ মণ আলু হইলে প্রায় দশ সের নাইট্রোজেন জমি হইতে খরচ হইয়া যায় কিন্তু আট

মণ ধান্ত দ্বারা কেবল /৩ সের নাইট্রোজেন খরচ হয়। ঐ রূপ ধান্ত ফসল দ্বারা বিঘা প্রতি /৪ সের আন্দাজ পটাস খরচ হয়। কিন্তু আলু ফসলের দ্বারা বিঘা প্রতি গড় দেড় সেব। কিন্তু আলু ফসলেব দ্বাবা /৪ সেব চুণ খবচ হইয়া যায়।

জমি হইতে যেমন ফসল লওয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে তাহাব সেই অংশ পূরণ কবিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। গাভীকে না খাওয়াইলে উহা দুধ দিতে পাবে না। মধু ভাণ্ড হইতে যে পবিমাণ মধু বাহির কবিয়া লওয়া যায সেই পবিমাণে উহা পূর্ণ কবিযা না দিলে শীঘ্রই ভাণ্ড শূন্য হইয়া পড়ে। গাভীকে অনাহারী রাখিযা নিত্য দোহন মধু ভাণ্ডকে পুন পূরণ না কবিয়া ক্রমাগত মধু আহবণ এব বিনাসাবে এককেত্রে পুন পুন আবাদ করা একই কথা মৃত্তিকা মধ্যে যে সাব বস্তু আছে তাহাকে আমবা মূলধন মনে কবি। সেই মূলধনেব যাহা উপস্বত্ব তাহাই ব্যবহাব কবা বিচক্ষণতাব কার্য্য। ক্ষেত্র হইতে ফসল লইযা তাহাতে সাব প্রদান না করিলে মূলধন খবচ হইযা থাকে। কিন্তু পুনবায় যদি যথা পবিমাণে উপযুক্ত সাব দ্বাবা ক্ষেত্রেব অভাব পূবণ কবিযা দেওয়া যায় তাহা হইলেই উপস্বত্ব ভোগ করা যায়। এই কথাটী বিশেষ করিয়া মনে বাখা উচিত। এব তদনুসাবে কার্য্য কবিলে ক্ষেত্রেব সারবস্তু কথনই নষ্ট হয় না। সুতরাং তাহাব উর্ব্বরতাও চিবদিন স রক্ষিত হইয়া থাকে। যাহাবা ইহা দ্বাবা লাভবান হইতে ইচ্ছা কবেন যাঁহাবা স্থায়ীভাবে এক স্থানে কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত রাখিতে চাহেন তাঁহাদিগের পক্ষে বিশেষরূপে এ কথাটী স্মরণ বাখিয়া কার্য্য কবা নিতান্ত উচিত।

আমাদেব দেশে সাবেব প্রথা তাদৃশ প্রচলিত না থাকায় দেশেব প্রায় সমুদায় সার নষ্ট হইয়া যাবে। ভাবতেব ন্যায় কৃষি-প্রধান দেশের সার নষ্ট হওয়া অলক্ষণেব বিষয়। আমরা দেখিতে পাই কি সহবে কি পল্লীগ্রামে যাবতীয় উদ্ভিজ্জেব আবর্জ্জনা এবং পুরিষাদি সমুদায় সাব—প্রায় অপচয় হইয়া থাকে। বড় বড় সহরেব যাবতীয় আবর্জ্জনা গাড়ি বোঝাই করিয়া স্থানান্তরে ফেলিয়া দেওয়া হয় কিন্তু এ সকল যদি কৃষিকার্য্যেব জন্ত ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে দেশের কত যে উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায় এবং মিউনিসিপালিটীগণও প্রতি বৎসর কত লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন তাহাব ইয়ত্তা নাই।

জাপানবাসী প্রায় বিনা সারে কোন ফসলের আবাদ কবে না। তাহাদের বিলক্ষণ বিশ্বাস যে "without continuous manuring there can be no continuous production A small portion of what I take from the soil is replaced by nature (atmosphere and rain), the remainder I must restore the ground" অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নরূপে সার প্রদান ব্যতীত বারোমাস ফসল জন্মিতে পারে না। ক্ষেত্র হইতে যাহা আমি গ্রহণ কবিয়া থাকি তাহার কিয়দংশ প্রকৃতি হইতে সঞ্চিত হয় অবশিষ্ট অংশ আমাকে দিতে হইবে। এই কয়টী কথা অমূল্য সত্য এবং প্রত্যেক কৃষকেরই তদনুসাবে কার্য্য করা উচিত। অনুর্ব্বরা জমি হইলে সাব ত দিতেই হইবে আব উর্ব্বরা জমি হইলে তাহাতে যথা পবিমাণে সার প্রদান কবিলে পূর্ব্ব সঞ্চিত সার হ্রাস না হইয়া সমভাবেই থাকে।

সার প্রয়োগ দ্বারা যে ক্ষেত্রেব কেবল উর্ব্বরতা রক্ষিত হয় তাহা নহে। ক্ষেত্রে সার দিবার আর একটী উদ্দেশ্য আছে। সাব দ্বারা ফসলেব পবিমাণ পুষ্টি আকার বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সাব প্রয়োগ দ্বারা সাধারণত ফসল মাত্রেই উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে এব বিশেষ সাব দ্বারা ফসল বিশেষেব প্রভূত উপকাব হইয়া থাকে। কিন্তু মৃত্তিকাব অভাব ফসলেব প্রয়োজন ও সারেব কার্য্য না জানিয়া যথেচ্ছ ভাবে সাব প্রয়োগ করিলে অনেক স্থলে ইষ্ট না হইয়া অনিষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ যে দুর্ঘটনা ঘটে তাহা সাব জমি বা ফসলের দোষে নহে, ক্ষেত্রস্বামীর অনভিজ্ঞতাই তাহার একমাত্র কারণ। পীড়িত ব্যক্তিকে ঔষধ সেবন কবাইতে হইলে যেরূপ সর্ব্বাগ্রে

তাহার রোগ নির্ণয় করিতে হয় এবং ধাতু ও ঔষধের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হয়, ক্ষেত্রে সার দিবার সময় ঠিক সেই প্রকার বিবেচনা আবশ্যক। অম্ল বিশিষ্ট জমিতে (calcarious soil) স্বভাবত ই চূণের আধিক্য থাকে কিন্তু তাহাতে চূণের প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও যদি তাহাতে চূণ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ফসলের অনিষ্ট হয়। আবার ক্ষেত্রে যদি এক মণ চূণ দিলে জমির অভাব পূরণ হয় তাহাতে দুই তিন মণ চূণ দিলে জমির ক্ষতি হইবে। এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া অবিমৃষ্য ভাবে সার প্রদান করা হয় বলিয়া সার সম্বন্ধে সময় সময় অনেক গ্লানি শুনা গিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুত চিরকালই সারের প্রয়োজনীয়তা আছে ও থাকিবে। পূর্ব্বে সারের যে গুণ ছিল এক্ষণেও তাহা আছে এবং ভবিষ্যতেও তাহা থাকিবে। সকল দিক স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া সার দিতে পারিলে মুষ্টিযোগের কার্য্য হইয়া থাকে।

৫। অকৃত জমির উর্ব্বরতা —যে জমি বহুকাল পতিত ও অনাবাদী তাহাকে অকৃত বা আচোট জমি বলে। আচোট জমিকে ইংরাজীতে (virgin soil) কহে। বাংলা দেশের নানা স্থানে এরূপ পতিত জমি বিস্তর দেখা যায়। ঈদৃশ জমি যে পতিত থাকে তাহার দুইটী কারণ আছে প্রথমত স্থানীয় প্রদেশ বা জেলায় লোকাভাব এবং দ্বিতীয় চাষবাসের পক্ষে মৃত্তিকার অনুপযোগিতা।

যে সকল মৃত্তিকায় স্বাভাবিক গঠন আবাদোপযোগী অথচ নানা কারণে পতিত থাকিয়া গুল্ম লতাদি দ্বারা বহু দিবস হইতে আবৃত তাহা সমধিক পরিমাণে উর্ব্বর হইয়া থাকে। একেই ত চাষের আবাদ না হইলে জমির পূর্ব্ব সঞ্চিত বা স্বাভাবিক সার পদার্থ সমূহ ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকে তাহাতে আবার বহু দিবসের জঙ্গল থাকায় সেই জঙ্গলের পাতা লতা শাখা প্রশাখাদি পচিয়া গিয়া জমিতে মজুত থাকে। অনেকে মনে করিতে পারেন, যে ফসল লয় আবাদ করিলে যেরূপ জমির উর্ব্বতা হ্রাস পায় তদ্রূপ জঙ্গল জন্মিয়াও ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা অনেক পরিমাণে নষ্ট করে। এরূপ ধারণা একেবারে অমূলক তাহা নহে, কারণ ক্ষেত্রে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহাতেই জমির সারাংশ ন্যূনাধিক পরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে সমুদায় উদ্ভিজ্জাদি তন্মধ্যে জন্মিয়া থাকে তাহা যদি ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া লওয়া না যায় তাহা হইলে ক্ষেত্রের পূর্ব্ব সঞ্চিত সারাংশ নষ্ট না হইয়া রূপান্তরিত হইয়া পুনরায় ক্ষেত্র মধ্যেই স্থান পায়। অধিকন্তু সেই সকল উদ্ভিদের দ্বারা বায়বীয় পদার্থও ক্ষেত্রে সংযোজিত হয়। এতদ্ব্যতীত সেই উদ্ভিদগণ মৃত্তিকার অভ্যন্তর দেশ হইতে নানাবিধ সার পদার্থ উপরিভাগে আনয়ন করিয়া ক্ষেত্রকে সজীব রাখে। অকৃত জমিতে সচরাচর নাইট্রোজেন নামক পদার্থের পরিমাণ অধিক থাকে। এই কারণে উহাতে যে ফসল বপন করা যায় তাহাই সুচারুরূপে বর্দ্ধিত হয়।

জমি যতই অধিক দিনের পতিত হয় ততই জঙ্গলময় হয়, ততই সারবান হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রের জঙ্গল মধ্যে মধ্যে কাটিয়া স্থানান্তরে ফেলিয়া দেওয়া হয় তাহার উর্ব্বরতা হ্রাস হইয়া থাকে। সুতরাং অনাবশ্যক স্থলে ক্ষেত্রের জঙ্গল কাটিয়া অন্যত্র ফেলিয়া দেওয়া কোন মতে উচিত নহে। আর যদি নিতান্তই জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হয় তাহা হইলে ক্ষেত্র মধ্যেই পচিয়া যাইতে দেওয়া উচিত। ইহাতে জমির সার পদার্থ জমিতেই বর্ত্তমান থাকে। অধিকন্তু ঐ সকল উদ্ভিদ সংগৃহীত নানাবিধ সার জমিতে সংযোজিত হয়।

রৈইসবাগ মধ্যে কিয়দংশ জমি বহুকাল হইতে অনাবাদী ছিল এবং তাহাতে এতই উলুঘাস ও জঙ্গলাদি জন্মিত যে তন্মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ছিল। গত ১৮৯২ সালে উপরিউক্ত জমির জঙ্গল মুক্ত করতঃ কোদাল দ্বারা কোপাইয়া তিন চারি মাস তদবস্থাতেই ফেলিয়া রাখা হয়। তদনন্তর তাহা ত পাটের তৎপরে সরিষার আবাদ করা হয়। বলা বাহুল্য যে, আবাদী ক্ষেত্র অপেক্ষা নূতন ক্ষেত্রে প্রায় দ্বিগুণ অধিক ফসল হইয়াছিল এবং জঙ্গলাদি পরিষ্কার ও জমি

কোপাইবার খরচাদি বাদে ছট ফসলে বিঘা প্রতি ২৫ টাকা লাভ ছিল।

যে সকল জমি লবণ ক্ষার, চূণ প্রভৃতির আতিশয্য বশত অনেক দিবসাবধি পতিত আছে তাহাও সারবান সন্দেহ নাই কিন্তু সে সকল জমিতে সমধিক পরিমাণে উদ্ভিজ্জ পদার্থ সংযোজিত করিলে তাহা অধিকতর সারবান হইয়া উঠে নতুবা তদবস্থাতেই চাষ করিলে ধাতব পদার্থের প্রাচুর্য্য বশত তাদৃশ আশাজনক ফসল উৎপন্ন হয় না। তবে ইহা স্থির যে যে কোন প্রকার জমিই হউক আবাদী অপেক্ষা পতিত জমির উর্ব্বরতা অধিক।

৬। উদ্ভিদের আহার—মনুষ্য ও জীব জন্তুর যেমন আহারের প্রয়োজন হয় উদ্ভিদেরও তেমনি আহার্য্য আবশ্যক। মূল কাণ্ড পত্র ও পুষ্প উদ্ভিদের এই চারিটী অঙ্গ থাকে। উদ্ভিদের মূলই তাহার মুখ। মূল মৃত্তিকা হইতে আহার সংগ্রহ করে কাণ্ড তাহা বহন করিয়া পত্রে লইয়া যায় পত্রে সেই ভুক্ত পদার্থের পরিপাক কার্য্য সম্পন্ন হয়।

মৃত্তিকায় উদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চিত থাকে। উদ্ভিদের আহারোপযোগী সার প্রধানত চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যেমন নাইট্রোজেন প্রধান ফস্ফরাস প্রধান পটাস প্রধান ও চূণ প্রধান সার। পোটাসিয়াম নাইট্রেট আমোনিয়ম ক্লোরাইড্ প্রভৃতি ধাতব পদার্থ মৎস্য-রক্ত প্রভৃতি জান্তব পদার্থ খৈলাদি উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে উদ্ভিদেরা আহারোপযোগী নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।

হাড়চূর্ণ, হাড়ভস্ম অথবা এপেটাইট ও সুপার প্রভৃতি ধাতব পদার্থ কিম্বা গুয়ানো হইতে উদ্ভিদ ফস্ফরাস সংগ্রহ করে। গোময়, কাঠ কিম্বা চারা গাছ ভস্ম অথবা কাইনাইট পোটাসিয়াম সলফেট বা মিউরিয়েট প্রভৃতি ধাতব পদার্থই পটাস প্রাপ্তির উপায়। এদেশের মৃত্তিকায় চূণও অল্পবিস্তর বিদ্যমান আছে। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ তাহাদের নিজ প্রয়োজন অনুরূপ দ্রব্য সংগ্রহ করে। অনাহার বা অল্পাহারে মানুষের যেমন কষ্ট হয় উদ্ভিদেরও সেইরূপ হয়। অল্পাহারে তাহারা ক্ষীণ হয় এবং অনাহারে মরিয়া যায়।

কিন্তু কি প্রকারে উদ্ভিদ তাহাদের আহার সংগ্রহ করে? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মূল দ্বারা তাহারা আহার করে। মনুষ্য ও অধিকাংশ জন্তু যেমন মুখ দ্বারা তাহাদের খাদ্য ভাল করিয়া চর্ব্বণ করে ও লালা মিশ্রিত করিয়া লয়—উদ্ভিদ তাহা পারে না। উদ্ভিদ মূল দ্বারা কেবল মাত্র মৃত্তিকাস্থিত রসাকর্ষণ করিতে সমর্থ। সুতরাং উদ্ভিদের পোষণোপযোগী সমুদায় খাদ্য এই রসে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। জলই উদ্ভিদের খাদ্য সমূহ দ্রব করে। জল দ্বারা দ্রব না হইলে উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং জলই উদ্ভিদের আহারের প্রধান সহায়। মৃত্তিকার কঠিন পদার্থ উদ্ভিদের শরীরে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না উদ্ভিদ প্রথমে সেগুলি জলের সাহায্যে তরল করিয়া পরে গ্রহণ করে। এই জন্য প্রায়ই দেখা যায়—জল না পাইলে উদ্ভিদ প্রায়ই নিস্তেজ হইয়া পড়ে শেষে মরিয়া যায়।

ধান যব প্রভৃতি গুচ্ছমূলধারী শস্যের মূল মৃত্তিকার নিম্নে অধিক দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাদের ভাসা শিকড় জল না পাইলে শীঘ্র মরিয়া যায়। বড় লম্বা মূলধারী উদ্ভিদ মৃত্তিকার খুব নীচে প্রবেশ করিয়া জল সংগ্রহ করে তাই অতি রৌদ্রেও মরিয়া যায় না। সুতরাং বেশ বুঝা যায় যে উদ্ভিদ মূল দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করে। মূল এবং কাণ্ড অসংখ্য কোষে গঠিত। উহা কোষ সমষ্টি মাত্র। বায়ু মূলাস্থকোষে প্রবেশ করিয়া কোষ হইতে কোষান্তরে নীত হয়। অবশেষে কাণ্ডের নবজাত অংশ পথ বাহিয়া পত্রে বিস্তৃত হয়।

উদ্ভিদ মানুষের ন্যায় মূল দ্বারা আহার গ্রহণ করে, পত্রের দ্বারা তেমনি শ্বাস প্রশ্বাস লয়। বায়ুস্থিত অক্সিজেন শ্বাস প্রশ্বাসে গ্রহণ না করিলে কোন প্রাণীই জীবিত থাকিতে পারে না। প্রচুর আহার সত্ত্বেও জলাভাবে যেমন প্রাণী বাঁচে না, বায়ু অভাবেও তেমনি

বাঁচে না। বিশুদ্ধ অক্সিজেন কিন্তু আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের উপযোগী নহে। অক্সিজেন সকল বস্তুকে দগ্ধ করে কিন্তু অক্সি জন বাষ্প বায়ুমণ্ডলস্থিত নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া উহা প্রাণী মাত্রেরই গ্রহণে যোগী থাকে। পত্রান্তর্গত রস ও পত্রাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট অক্সিজেন বাষ্প এতদুভয়ের মিলনে উদ্ভিদের দেহ নির্ম্মাণের উপাদান সমূহ উৎপন্ন হয়। জল ও বায়ুর ন্যায় উদ্ভিদ জীবনে আর একটি অত্যাবশ্যক পদার্থের প্রয়োজন। সেটী সূর্য্যালোক। সূর্য্যালোক দ্বারাই উদ্ভিদের পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উহার পত্রকোষে এক প্রকার হরিদ্বর্ণ পদার্থ দৃষ্ট হয়। এই হরিদ্বর্ণ খণ্ডগুলি দ্বারা উদ্ভিদের পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ইহার অভাবে পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে। সূর্য্যালোকের অভাব হইলে হরিদ্বর্ণ খণ্ডগুলি সাদা হইয়া যায় তখন সেগুলিতে পরিপাক কার্য্য হয় না। সূর্য্যালোকেই হরিদ্বর্ণ খণ্ডগুলির জন্ম এবং তাহাতেই তাহার কার্য্যকারিতা।

প্রাণী মাত্রেই কেবল জীবিত থাকিয়া সন্তুষ্ট নহে নূতন জীব সৃষ্টি করিতে ব্যগ্র। উদ্ভিদে এইগুণ বিদ্যমান। সেইজন্য তাহারা তাহাদের অঙ্গ বিশেষে পুষ্টিকর পদার্থসমূহ সঞ্চিত রাখে। ধান যব গম মটর মসুর প্রভৃতি ও অধিকাংশ ফলের গাছের বীজে এই পুষ্টিকর অংশ সঞ্চিত থাকে এবং তাহা হইতে আবার গাছ হয়। কতকগুলি মূলজ খন্দর যথা— গোলআলু লাল আলু মূলা শালগম বীট গাজর প্রভৃতির পুষ্টিকর পদার্থ মূল কিম্বা কাণ্ডে সঞ্চিত হয়।

উদ্ভিদের আহার ও পরিপাক ক্রিয়ার বিষয় অবগত হইলে মৃত্তিকায় উদ্ভিদের আহারোপযোগী কি কি পদার্থ আছে তাহা দেখিব। কোন উদ্ভিদের কি খাদ্য তাহারও বিচার করিব। জমিতে রসাভাব না হয় তাহার ব্যবস্থা করিব এবং জল সেচনের ব্যবস্থা করিব। ক্ষেতে বা বাগানে কখনও বায়ু চলাচলের পথ রোধ না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিব। এবং উদ্ভিদ কখনো সূর্য্যালোকের অভাব অনুভব না করে—তাহার যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করিব। কিম্বা ছোট গাছগুলিকেও প্রচণ্ড সূর্য্যতাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ছায়া প্রদান করিব। তবেই উদ্ভিদের পরিপাক ও পোষণ সম্পূর্ণ হইবে ও এই উদ্ভিদ পরিপুষ্ট হইবে এবং যথোপযুক্ত ফল ফুল প্রদান করিবে।

৭। পটাস সারের উপকারিতা —পটাস অথবা পটাস সারের উপকারিতা অনেকটা জমির উপর নির্ভর করে। কাদা জমিতে প্রায়ই পটাস্ থাকে এবং এরূপ জমিতে পটাস দিয়া বড় একটা উপকার দর্শে না। এরূপ জমিতে বরং পটাস বিহীন সার দিলে জমির অপর সব উপাদান উদ্ভিদের পোষণযোগ্য হয়। ক্ষার যুক্ত সার (যেমন সোডা চূণ প্রভৃতি) অদ্রবণীয় সিলিকেসমূহকে বিশ্লেষণ করিয়া পটাসকে মুক্ত করিয়া দেয়। নাইট্রেটসমূহ ব্যবহার করিলে উদ্ভিদের শিকড় মৃত্তিকার অনেক দূর প্রবেশ করে এবং তজ্জন্য আবশ্যক রস শোষণ করিবার অনেক স্থান প্রাপ্ত হয়।

নাইট্রোজেন ব্যবহারে উদ্ভিদের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ফসফেটে শীঘ্র শীঘ্র ফল পাকে। পক্ষান্তরে পটাস্ উদ্ভিদের উৎকর্ষতা সাধন করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গোধুমের কথা বলা যাইতে পারে। এ স্থলে নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফেট শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পটাস দ্বারা শস্য মোটা ও উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত হয়। শুটীর জন্য যে সকল ফসল চাষ হয় যেমন চীনের বাদাম ছোলা প্রভৃতি কিম্বা পাতা ফসল (তামাক বাঁধাকপি প্রভৃতি) অথবা মূল ফসল যাহা শ্বেত সারের জন্য চাষ করা হয় (আলু মেটে আলু প্রভৃতি) এই সমস্ত ফসলে পটাস প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ফলের গাছে পটাস সার দিলে ফলের রং এবং স্বাদ উভয়ই ভাল হয় টক্ স্বাদযুক্ত ফলে পটাসের উপকারিতা বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। বঙ্গ দেশের কৃষকেরা কদলীর জন্য কাঠের ছাই উৎকৃষ্ট সার বলিয়া বিবেচনা করে। চুরুটের তামাকে কে পটাস প্রয়োগে তামাক পাতা ভাল হয় তাহা অনেকেই জানেন। ধান, গম প্রভৃতি গাছে পটাস সার দিলে ডাঁটা শক্ত হয়, ইহাতে

শস্য ভাল হয় এবং পশু খাদ্য হিসাবে উঁটার মধ্য বৃদ্ধি পায়। পটাস সারের আর একটী উপকারিতা এই যে ইহার প্রয়োগে গাছের ছত্রক রোগ কম হয়। গমের বষ্ট নামক রোগ পটাস সারে উপশম হইতে দেখা গিয়াছে। তিন প্রকারের পটাস সার প্রধানত পাওয়া যায়। কুইনাইট ফসফেট অব পটাস ও পটাস ক্লোরাইড। প্রথমোক্ত সার জার্মাণ দেশ হইতে আমদানী হয়। কিন্ত এ পর্য্যন্ত এ সকল সারের এতদ্দেশে অধিক চলন হয় নাই। এখানে ছাইই পটাস সার রূপে অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। সোরা ও ভেমূর কিন্ত মূল্যবান পটাস সার এবং উহাদের অধিক প্রচলন হওয়া আবশ্যক।

৮। গোবর সার —ঘোড়া বা ভেড়া প্রভৃতি কৃষি ক্ষেত্রের পালিত পশুর মল মূত্রকে আমরা গোবর রূপে বর্ণনা করিব। সকল পশুর গোবর একরূপ নহে। খাদ্য বয়স ও স্বাস্থ্য অনুসারে পশুদিগের গোবরের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। গরু ও ঘোড়ার মলের মধ্যে ঘোড়ার মল অধিক সারবান কারণ ঘোড়া অধিক পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করে। অল্প বয়স্ক বর্দ্ধনশীল বা কৃশাঙ্গ পশুর পুরীষ অপেক্ষা বয় প্রাপ্ত বা স্থূলকায় পশুর পুরীষ অধিক মূল্যবান। ইহার কারণ এই যে বর্দ্ধনশীল বা কৃশাঙ্গ পশুর দেহ গঠনের নিমিত্ত অধিক পরিমাণে সার পদার্থের প্রয়োজন হয় এবং শেষোক্ত পশুদিগের খাদ্যের প্রায় সমস্ত সার পদার্থ মল মূত্রের সহিত বহির্গত হইয়া যায়। জিভাস বলদ এবং ঠাবা গাইয়ের গোবর পরিশ্রমী বলদ এবং দোয়াস গাভীর গোবর অপেক্ষা উত্তম সার। পরিশ্রমী বলদের খাদ্যের শত করা ৯ —৯৫ ভাগ সার পদার্থ নিঃসৃত হয়। কিন্ত বর্দ্ধনশীল পশু ও দোয়াস খাদ্যের ৫ —৭৫ ভাগ সার পদার্থ মল মূত্রের সহিত পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। মূল কথা যাহাদের জীবন ধারণ করিতে অল্প মাত্রায় পুষ্টিকর পদার্থের প্রয়োজন তাহারাই অধিক সারবান জিনিষ মল মূত্রের সহিত পরিত্যাগ করে।

মল মূত্র রক্ষার ব্যবস্থা এদেশে একেবারেই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গোময়াদি সাধারণতঃ গোশালার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ফেলিয়া রাখা হয়। তথায় রৌদ্র বৃষ্টিতে ইহার অনেক সার পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। বিলাতের রাজকীয় কৃষি সমিতির সুপ্রসিদ্ধ ভূতপূর্ব্ব রাসায়নিক ডাক্তার ভোলকার পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ৭ মাস মধ্যে এইরূপ রক্ষিত সারের প্রায় এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন বিলুপ্ত হয়। কিন্ত সুব্যবস্থায় সার রক্ষা করিলে ইহার এক পঞ্চমাংশের অধিক নাইট্রোজেন বিলুপ্ত হইতে পারে না। অন্য দিকে তাজা গোবর জমিতে দিলে ইহা শীঘ্র পচিয়া দ্রবনীয় হয় না এমন কি এটেল মাটিতে ইহার কতক ৩। ৪ বৎসর পর্য্যন্ত অদ্রবনীয় ভাবে অবস্থিতি করে।

গোয়ালের মূত্র রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যহ শুষ্ক মাটী, শুষ্ক পাতা বা ঘাস ছড়াইয়া দিতে হয়। চারি বা পাঁচ মাস অন্তর এই সকল পদার্থ জমীতে দেওয়া যাইতে পারে।

সার রক্ষা করিবার সুবন্দোবস্ত না থাকিলে, ইহা জমিতে প্রয়োগ করিয়া কর্ষণ দ্বারা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। গোময় সার প্রয়োগ করিলে এটেল এবং বেলে উভয়বিধ মৃত্তিকারই প্রাকৃতিক গঠন পরিবর্ত্তিত হইয়া সুচাষোপযোগী হয়।

তাজা গোবর প্রয়োগে গাছের ডালপালা ও পাতারই বৃদ্ধি হইয়া থাকে কিন্ত বীজ উৎপন্ন করিবার শক্তি ইহার বড় নাই। উত্তম তামাক ও আলু ইহার দ্বারা উৎপন্ন হয় না।

তাজা গোবর প্রয়োগে ভূমিতে অনেক কীটের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। সুতরাং আলু প্রভৃতি দুর্ব্বল গাছে তাজা গোবর কখনও দেওয়া উচিত নয়। তাজা গোবর দ্বারা জমিতে আগাছারও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বেলে মৃত্তিকায় গোবর সার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। প্রস্তুত সার শস্য বপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রয়োগ করিয়া লাঙ্গল দ্বারা মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিতে হয়।

তাজা সার শস্য বপনের প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে প্রয়োগ করা উচিত।

৯। চূণ সার —জমিতে চূণ প্রয়োগ করিতে হইলে দুই তিনটী বিষয় লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে এবং জানিতে হইবে যে—

(১) খুব আটাযুক্ত এঁটেল মাটিতে চূণ বিশেষ ফলপ্রদ।

(২) নরম বেলে মাটিকে চাষের উপযুক্ত করিতে হইলে চূণই একমাত্র উপায়।

(৩) অম্লরস বিশিষ্ট বোদ মাটির (humsis) সংস্কার চূণেই হয়। নিতান্ত আটাল এঁটেল মাটি চাষের উপযুক্ত নহে। সেই মাটি সহজে গুড়া হয় না বা তাহার ভিতর সহজে জল প্রবেশ করিতে পারে না। চূণ কিম্বা চূর্ণাত্মক ক্ষার ব্যবহারে ঐরূপ জমির মাটীর দোষ বিনষ্ট হয় এবং তখন উহা কর্ষণ দ্বারা গুড়া করিয়া চাষের উপযুক্ত করা যাইতে পারে। তখন উহাতে জল প্রবেশের সুবিধা হয়।

উদ্ভিদ ও জান্তব পদার্থ বিশিষ্ট বোদ মাটিতে উদ্ভিদের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে থাকে কিন্তু যতক্ষণ না সেগুলি পচিয়া খাদ্যের উপযুক্ত হয় ততক্ষণ কার্য্যত তাহাদের দ্বারা কোন উপকার হয় না। অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে এই বোদ মাটিতে অম্লরসের প্রাচুর্য্য থাকায় জান্তব বা উদ্ভিজ্জ পচনকারী জীবাণুগণ তথায় থাকিতে পারে না বা থাকিলেও কোন কাজ করিতে পারে না। চূণ জমির এই অম্লরস নাশ করিয়া উদ্ভিদ্ শরীর পোষণে সহায়তা করে। চূণ দ্বারা উদ্ভিদ শরীর পোষণের কোন কার্য্য না হইলেও ইহা যে কৃষি কার্য্যের একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় সার তাহা চাষীরা বা সাধারণে কিছুতেই ধারণা করিতে পারে না। এদেশের মাটীতে চূণের অভাব নাই, সেই জন্য কোন চাষী জমিতে চূণ সার না দিলেও কিছু ক্ষতি হয় না।

এদেশের অধিকাংশ লোকের জমিই একমাত্র ভরসা, সুতরাং তাহাদের জমির সদ্ব্যবহার জন্য সারের ব্যবহার শিখিতে হইবে। সুতরাং চাষীদের আটাল এঁটেল মাটি নরম অকেজো মাটিকে চূণ দ্বারা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। জলা অকেজো জমিতে চূণ ছিটাইয়া জলজ উদ্ভিজ্জ সমূহ পচাইয়া উহা ধান চাষের উপযুক্ত করিতে হইবে। কোন কোন ধান্য ক্ষেত্রে এক প্রকার ঝাজি কিম্বা সেওলা জন্মিয়া উহাকে অকেজো করে। চাষীরা কি করিবে তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না তাহারা যদি চূণের ব্যবহার জানিত তবে শুষ্ক অবস্থায় সেই জমিতে চূণ ছিটাইয়া বারম্বার মাটি ভাঙ্গিয়া শেওলা বা ঝাজি মূল সমেত পচাইয়া ফেলিত। শুটী দাবী শস্যের পক্ষে চূণ উত্তম সার ফসফরাস ও পটাসের ন্যায় চূণও গাছের ফুল ও ফল প্রসবে সহায়তা করে।

এই বার চূণের দোষের কথাও বলিতে হইবে। বৃক্ষাদিতে সদ্যোজাত চূণ কদাপি ব্যবহার করা উচিত নহে। গাছ উহা সহ্য করিতে পারে না। সেই জন্য চূণে পাথর পোড়াইয়া ব্যবহার না করিয়া অদগ্ধ অবস্থায় ব্যবহারে অনেক উপকার হয়। চূণ ব্যবহার না করিয়া চূণপ্রধান সার জিপসম খড়িমাটি বা মার্ব্বেল পাথর চূর্ণ ব্যবহার করিলে উপকার হয়। এ সকলে যথেষ্ট চূণ আছে। কিন্তু চূণের তেজ নাই। নূতন চূণ অপেক্ষা পুরাতন চূণ দিলে তেমন ক্ষতি হয় না। চূণের তেজ সহজে যায় না সেই জন্য পুরাতন চূণ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু নিতান্ত এঁটেল মাটিকে নরম করিতে কিম্বা অম্ল রসাত্মক বোদ মাটিকে সংস্কার করিতে কিম্বা জল জমির পুনরুদ্ধার করিতে সদ্যোজাত তেজস্কর চূণ চাই। চূণ প্রয়োগে ভূমিতে সঞ্চিত "উদ্ভিজ্জ" খাদ্য সমূহ উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী অবস্থায় থাকে। এরূপ অবস্থায় ঘন ঘন চূণ দিলে ভূমির উর্ব্বরতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য তিন চারি বৎসর অন্তর চূণ ব্যবহার করা উচিত।

জমিতে চূণ ছড়াইবার একটী পরিমাণ ঠিক করা বড় সহজ নহে। কোন জমিতে কত চূণ আবশ্যক তাহা ঠিক করিতে হইলে সেই জমির মাটিতে কি পরিমাণ চূণ আছে তাহা ঠিক করিতে হয়। কিন্তু সাধারণ চাষীর পক্ষে জমির বিশ্লেষণ কঠিন ব্যাপার। ইহার একটী

সহজ উপায় আছে। জমি হইতে কিছু মাটী আনিয়া জলে গুলিতে হয় এবং ক্ষণকাল একটী কাঠির দ্বারা তাহাকে নাড়িয়া মাটি বেশ গুলিয়া গেলে এই জল আধ ঘন্টা থিতাইতে দিলেই সমুদায় মৃত্তিকার স্থুল অংশ জলের তলায় পড়ে, এইবার জলমধ্যস্থ মৃত্তিকা একখানা ছুরির ফলা দিয়া উঠাইয়া একখণ্ড সবুজ 'লিটমস' কাগজ দ্বারা ৪।৫ মিনিট চাপিয়া রাখিবে যদি সে মাটিতে চুণের ভাগ থাকে তবে সবুজ লিটমস লাল হইবে। এইরূপে অম্লাক্ত বা লবণাক্ত জমি চিনিয়া লওয়াও যায়। অম্লের বা লবণের অস্তিত্ব পরীক্ষা করিতে হইলে সেই কাদা লাল 'লিটমস কাগজে চাপিতে হইবে ইহাতে কাগজ সবুজ হইবে। লিটমস (Litmus paper) বাজারে দুষ্প্রাপ্য নহে। যে জমিতে চুণ নাই তাহাতে চুণ দিতে হয় কিন্তু কতখানি চুণ দিতে হয় তাহা বিশ্লেষণ ব্যতীত জানা যায় না। মৃত্তিকা বিশেষে প্রতি বিঘায় দুই হইতে ছয় মণ চুণ দিতে হয়। চুণ মাটির উপর সমভাবে ছিটাইয়া চাষ দিতে হয়। উহা না করিলে কোথাও অল্প কোথায় বেশী পড়িয়া ক্ষতি হয়।

যদি দেখ যে নাইট্রোজেন প্রধান গোময়াদি সার পাইয়া বৃক্ষগণ একবারে নাচিয়া উঠিয়াছে চারিদিকে ডাল পালা ছাড়িতেছে ফল ফুল প্রসবের নামটি নাই— একটু চুণ বা সাধারণ লবণ প্রয়োগ করিলে তাহাতে শীঘ্র ফল ফুল ধরিবে। চুণ যে প্রত্যক্ষ ভাবে সকল ফসলে দিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। ফস্‌ফরাস প্রধান সারেও চুণের ন্যায় ফল ফুল বাড়ায়। হাড় চূর্ণ বোন সুগার জান্তব কয়লা ও এপেটাইট নামক খনিজ পদার্থে চুণের পরিমাণ শত করা ৩।৪ গুণ অধিক বিদ্যমান থাকে। সুতরাং যে সকল শস্যে এই সকল সার দেওয়া হইয়াছে তাহাতে চুণ দেওয়ার আবশ্যকতা নাই।

চুণের সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা উচিত। পোড়া চুণের দাম অধিক। তৈয়ারী সিলেট চুণের দামও অনেক। কাজেই এই সব চুণ অপেক্ষা ঘুটিং চুণ (unburnt lime stone) বা চুণা পাথর ব্যবহারে অনেক অল্প খরচে অনেক বেশী কাজ হয়। পোড়া চুণ অপেক্ষা চুণা পাথরের দাম কম, ইহার তেজও কম এবং মাটীতে ধীরে ধীরে কার্য্য করে। এই প্রকার চুণ ব্যবহারে মাটী শীঘ্র নিস্তেজ হইয়াও পড়ে না।

পাথর গুড়া করিয়া ছাঁকিয়া দেওয়াই উচিত। যেখানে আশু কোন কার্য্য সারিতে হইবে বা পতিত জমির উদ্ধার করিতে হইবে সেখানে পোড়া চুণ দেওয়াই উচিত।

দরিদ্র কৃষকদের জন্য এই প্রথা ব্যবস্থেয় — গোভাগাড় হইতে হাড় সংগ্রহ করিয়া তাহা নিজ ক্ষেত্রে পচাইয়া পরে চূর্ণ করিয়া তাহা ব্যবহার করা আবশ্যক। ইহাতে একটী প্রধান ফস্‌ফরাস বিশিষ্ট সার ব্যবহার করা হইল সঙ্গে সঙ্গে চুণের কার্য্যও হইল। শামুক চূর্ণেও চুণের কাজ বেশ হয়।

চুণের আরও দু একটী বেশ গুণ আছে —জমি হইতে শামুক গেঁড়ি গুগলি তাড়াইতে হইলে চুণের মত আর কিছুই নাই। চুণে পচা দুর্গন্ধ যুক্ত জল পরিষ্কৃত হয়। জলে চুণ দিলে ম্যালেরিয়ার জীবাণুসমূহ মরিয়া যায়। চুণের দ্বারা যেমন চাষের উন্নতি হয় তেমনি ম্যালেরিয়াও নষ্ট হইয়া যায়।

অম্লকে ক্ষারে পরিণত করিতে হইলে চুণই একমাত্র উপায়। চুণ কি পদার্থ তাহা জানিয়া রাখা উচিত। ইহা একপ্রকার ধাতু কিন্তু ইহা বিযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। কার্ব্বনিক এসিডের সহিত মিলিত ক্যালসিয়ম কার্ব্বনেট বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। ঘুটিং শামুক, খড়িমাটি চুণাপাথর প্রবাল মুক্তা ইত্যাদি দগ্ধ করিয়া চুণ হয়। ক্যালসিয়ম উদ্ভিদের খাদ্য। ইহা আবার ভূমিস্থে উদ্ভিদের খাদ্য রক্ষা করিতে পারে। ক্যালসিয়ম বিশিষ্ট জমির নাইট্রোজেন ও ফসফরাস রক্ষা করিবার ক্ষমতা আছে। এই দুইটী উদ্ভিদের খাদ্য। ধান গম প্রভৃতির ভস্মে শতকরা ৬ ভাগ চুণ থাকে।

পাকা ঘর বাড়ী যখন নির্ম্মাণ করিতে হয় তখন বালির সহিত যে চুণ দেওয়া হয় তাহার একমাত্র কারণ ইহার আলগা ভাব নষ্ট করা। চুণের দ্বারা উহাকে জমাট

স্বাধীন হয়। চুণ বিহীন এটেল মাটীতে জল দিলে উহা সেই জল টানিতে পারে না, কিন্তু উহার সহিত অল্প চুণ মিশাইলে সেই কঠিন ভাব দূর হয় এবং এটেল মাটি সরল ও ধারণক্ষম হয়। মৃত্তিকাতে চুণের অস্তিত্ব হেতু উদ্ভিদগণ উহা আহরণ করিয়া নিজ শরীরে সঞ্চার করে। এই সমস্ত উদ্ভিদ শরীর বা তৎ প্রসূত ফল শস্যাদি জীবগণ উদরস্থ করে বলিয়া চুণ তাহাদেরও শরীরে স্থান পায়।

চুণ দুই প্রকারে উৎপন্ন হয় —প্রথমত বিশেষ বিশেষ প্রকারের প্রস্তর ও ঘুটিং বা কঙ্কর হইতে দ্বিতীয়ত শামুক গুগলি হইতে। যে পাথর হইতে চুণ উৎপন্ন হয় তাহাকে চুণা পাথর (Lime stone) বলে।

চুণের প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম। ইহা একপ্রকার ধাতু বিশেষ। কার্ব্বনিক এসিডের সহিত মিলিত হইলে ক্যালসিয়ম কার্ব্বনেটরূপে ঘুটিং পাহাড় প্রবাল, মুক্তা প্রভৃতিতে বিদ্যমান থাকে। ঘুটি পাথর বা শামুক পোড়াইলে কার্ব্বনিক এসিড উড়িয়া গিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই সাধারণ চুণ। ইহাই ক্যালসিয়ম অকসাইড। যাহাতে শত করা ৫ ভাগের অধিক চুণ আছে তাহাই চুণ সার। সেই হিসাবে চুণা শামুক ঝিনুক ঘুটি চুণসার মধ্যে পরিগণিত।

চুণের সহিত ফস্ফরিক এসিড মিশ্রিত হইয়া আর একটী প্রধান সার উৎপন্ন করে। সেটী ক্যালসিয়াম ফস্ফেট। ইহা জমির প্রধান সার। হাড়ে প্রায় শত করা ৫ ভাগ ক্যালসিয়াম ফস্ফেট আছে। ইহা এসিডে দ্রব হয়। সোরা কিম্বা লবণ জলে ইহা কথঞ্চিৎ দ্রব হয়। হাড়ের গুড়াকে সহজে উদ্ভিদের কার্য্যে লাগাইতে হইলে সুপার প্রস্তুত করাই রীতি। হাড়ের গুড়া প্রথমতঃ জলে আর্দ্র করিয়া ইহাতে অল্পে অল্পে সলফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিতে হয়। হাড়ের গুড়ার পরিমাণ যত হইবে তার অর্দ্ধেক পরিমাণ এসিড মিশাইতে হয়।

সদ্যোজাত চুণ বড়ই উত্তাপ সংযুক্ত এজন্য উহা ভাঁটি হইতে আনিয়াই জমিতে না দিয়া কোন স্থানে পাতলা ভাবে ছড়াইয়া রাখিলে, বায়ু মণ্ডল হইতে বায়ু ও কার্ব্বনিক এসিড উহাতে প্রবেশ করিয়া উহার উত্তাপের হ্রাস করে ও স্বভাব পরিবর্ত্তন করে। ইহাতে উহার দহন শক্তিও কমিয়া যায়। বলা বাহুল্য, দুই চারি দিবসের অধিক ঐরূপ অবস্থায় রাখা উচিত নয়। কারণ অধিক দিবস অনাবৃত থাকিলে শিশিরে চুণের জমাট বাঁধিতে কিম্বা বৃষ্টি লাগিলে সমস্ত চুণই ডেলা বাঁধিয়া যাইতে পারে। ডেলা বাঁধিয়া গেলে উহার শক্তি ও কার্য্যকারিতা হ্রাস পায়। এই অবস্থায় উহা ক্ষেত্রে দিলে বিশেষ ফল হয় না।

বর্ষাকালের এক মাস আগে বা বর্ষা উত্তীর্ণ হইলে যখন মৃত্তিকার আর্দ্রতা না থাকিবে এরূপ সময় ক্ষেতে চুণ দিতে হয়। আর্দ্রাবস্থায় চুণ দিলে মাটি ও চুণে মিলিত হইয়া কঠিন ডেলা বাঁধিয়া যায়। চুণ কর্দ্দম প্রধান জমিকে হালকা এবং বালু প্রধান জমিকে— অপেক্ষাকৃত সরস করে। চুণের স্বভাবই এই যে উহা কালক্রমে মৃত্তিকার নিম্নস্তরে তলাইয়া যায়। ক্ষেত্রে চুণ দিবার একটী বিশেষ প্রণালী আছে। ক্ষেত্র যখন শুষ্ক থাকিবে তখন উহার উপরে আস্তে আস্তে চারিদিকে সম পরিমাণে চুণ ছড়াইতে হইবে। চুণ দেওয়া হইয়া গেলে উহাকে মৃত্তিকার সহিত সমভাবে ও সূক্ষ্মরূপে মিলিত করিবার জন্য বারম্বার জমিকে চষিয়া দেওয়া দরকার। এক দিন বারম্বার লাঙ্গল না দিয়া চারি দিন অন্তর লাঙ্গল দেওয়া উচিত।

চুণের সাক্ষাৎ অপেক্ষা পরোক্ষ ক্রিয়াই অধিক। মাটির মধ্যে এমন অনেক পদার্থ থাকে যাহা সার হইয়াও উপকারে আসে না। তাহারা চুণের প্রভাবে উদ্ভিদের আহারোপযোগী হয়।

হিউমস (Humus) নামক মৃত্তিকায় যে অঙ্গারক পদার্থ থাকে—তাহাও চুণের অভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে না। বরং যেখানে হিউমসের আধিক্য থাকে— অথচ চুণের অভাব থাকে সে স্থলে প্রথমোক্ত পদার্থের অল্পপ্রাচুর্য্য বশতঃ জমির ও উদ্ভিদের বিশেষ ক্ষতি হয়। এই অম্ল প্রধান জমিকে অম্ল জাম (Sour

land) কহে। অম্লাক্ত জমিতে চুণ দিলে জমির অম্লদোষ কাটিয়া যায়।

মৃত্তিকায় চুণ সংযুক্ত হইলে তন্মধ্যস্থিত অনেক যৌগিক পদার্থকে উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী করিয়া দেয়। সুতরাং প্রথম প্রথম ইহার দ্বারা চাষের বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু সেই জমি অল্প দিন মধ্যে (দুই চারি বছর) এমন ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে যে তখন উহাতে কোন রকম পোষণোপযোগী শক্তি থাকে না।

চুণের তীক্ষ্ণতা বা উগ্রতা এবং প্রয়োগের পরিমাণ অনুসারে বিশ বছর পর্য্যন্ত উহার কার্য্যকারিতা থাকে। এই জন্য চুণ প্রয়োগে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক।

চুণের তীব্রতা থাকিতে উহাতে কোন ফসলই জন্মিতে পারে না। তবে যদি আবাদ করিবার পূর্ব্বে অধিক সময় পাওয়া যায় তবে তীব্র চুণ দিতে আপত্তি নাই। বরং ইহা দ্বারা আরও উপকার হয় মাটিতে যে সমস্ত কীট থাকে তাহা মরিয়া যায়।

। সবুজ সারের উপকারিতা—শন ধইঞ্চা জয়ন্তি প্রভৃতি শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদের সারকেই সবুজ সার বলে। ইহা অনায়াস লভ্য এবং অল্প খরচায় ক্রয় করা যাইতে পারে। ধান পাট ইক্ষু ও আলুর ক্ষেতে উক্ত শস্য সমূহ লাগাইবার পূর্ব্বে বিঘাপ্রতি ২ সের বীজ (শিম্বী জাতীয়) ছিটাইয়া ১ হাত পরিমিত গাছগুলি উচ্চ হইলে উহা জমির সহিত চাষ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। কোন কোন স্থলে আউশ ধানের সহিত এই উদ্দেশ্যেই অরহড়ের (শিম্বী জাতীয়) গাছ লাগান হয়। কচি কচি শিম্বী জাতীয় বৃক্ষের ডাল পাতা জমির সহিত মিলিত হইয়া যেমন জমির যেমন উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে উক্ত ধঞ্চে বা জয়ন্তী ও অরহড় প্রভৃতি শিম্বী জাতীয় গাছ জমির উপর জীবিত থাকিলেও উহাদের পাদমূলে বায়ুমণ্ডল হইতে ও সূর্য্যকিরণ হইতে নাইট্রোজেন সার সংগৃহীত হয়। তাই আমরা ধঞ্চে ও জয়ন্তী গাছে পিপুলের লতা উঠাইয়া দিয়া বিঘা প্রতি আড়াই শো তিন শো টাকার পিপুল পাইয়া থাকি। যেখানে হাড়ের গুঁড়া, রেড়ির খৈল ও গোবর সার দুষ্প্রাপ্য—সেই খানেই আমরা কৃষকগণকে সবুজ সারের জন্য সর্ব্বদা অনুরোধ করি। আর ইহার কার্য্যকারিতাও হাড়ের গুঁড়া, রেড়ির খৈল ও গোবর অপেক্ষা কম নহে।

ক্ষেতে সার পরীক্ষার নিয়ম।—আমরা দেখাইয়াছি যে শস্যের পুষ্টির জন্য চারিটী বস্তু ফাসরূপে প্রয়োগ করা স্থলভেদে দরকার হয় যথা—নাইট্রোজেন পটাস, ফসফরাস্ এবং চুণ। পরীক্ষা স্বরূপ অল্প পরিমাণ জমিতে অল্প পরিমাণ এই সকল বস্তু প্রয়োগ করিয়া ফসল সম্বন্ধে তাহার ফল দেখিয়া সেই শস্যের জন্য সেই জমিতে কোন কোনটী ফাসরূপে ব্যবহার করা উচিত তাহা স্থির করা যায়। মনে কর তোমার জোত হইতে তুমি এক বিঘা জমি পাটের ফাস পরীক্ষার জন্য পৃথক করিয়া লইলে। সেই জমিটী সমানভাবে ছয়টী অংশে বিভক্ত কর। প্রথম অংশে বিনা ফাসে পাটের চাষ কর। দ্বিতীয় অংশে ওজন করিয়া অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন খৈল রূপে অল্প পরিমাণ পটাস সাধারণ ছাই রূপে এবং অল্প পরিমাণ চুণ প্রয়োগ কর। চতুর্থ অংশে পটাস বাদে বাকী ৩টী প্রয়োগ কর। এবং ষষ্ঠ অংশে চুণ বাদে বাকী ৩টী প্রয়োগ কর। চাষ বীজবপন জল সেচন প্রভৃতি সম্বন্ধে সব অংশে সমান রূপে ব্যবহার করিবে। প্রত্যেক অংশের শস্য পৃথক পৃথক ওজন কর। ফসলের পরিমাণের তুলনা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইবে তোমার জমিতে কোন বস্তুর অভাব এবং কি ফাস দিতে হইবে। মনে কর প্রথম অংশে ২ সের দ্বিতীয় অংশে ৪ সের তৃতীয় অংশে ২৫ সের, চতুর্থ অংশে ৪ সের পঞ্চম অংশে ৩৫ সের এবং ষষ্ঠ অংশে ৩৫ সের পাট হইয়াছে। প্রথমাংশে ফাস না দিয়া ফসল মাত্র ২ সের হইল অতএব ফাস দেওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় অংশে চারি প্রকারের বস্তুই—প্রয়োগ করিয়া ফসল পাইলাম ১ মণ। চতুর্থ অংশে পটাস না দিয়া পাইলাম ১ মণ। অতএব পটাস দিবার কোন প্রয়োজন নাই। আবার ৬ষ্ঠ অংশে চুণ দিলাম না, তাহাতেও

১ মণ ফসল পাইলাম। অতএব চূণ দিবার প্রয়োজন নাই। আবার পঞ্চম অংশে ফসফরাস্ দিলাম না ফসল /৫ কমিয়া গেল অতএব ইহা দিবার প্রয়োজন আছে। সেই রূপ তৃতীয় অংশে নাইট্রোজেন দিলাম না। ফসল ১৫ সের কমিয়া গেল। অতএব উহা দিবার প্রয়োজন আছে। এইরূপে পরীক্ষা করিয়া প্রতিপন্ন হইল যে পাটের জন্য জমিতে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা কৃষক অল্প ব্যয়েই আপনার জমিব জন্য কোন শস্যের কি ফাস দেওয়া প্রয়োজন স্থির কবিতে পারেন। আবার ফাস ঠিক হইলে ভিন্ন ভিন্ন পবিমাণে তাহা ব্যবহার কবিয়া পরীক্ষা দ্বারা স্থির কবিতে পাবেন কোন শস্যের জন্য কোন জমিতে কি পবিমাণ ফাস ব্যবহাব করিতে হইবে। আমাদের দেশে কৃষকদের জন্য ফাস ঠিক কবিবার এই উপায়ই প্রশস্ত।

১১। নাইট্রোজেন জীবাণুজ সার —মটর সীম অরহড় প্রভৃতি শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদের মূলে কতিপয় জীবাণু দৃষ্ট হয়। এই সকল জীবাণু নাইট্রোজেন সঞ্চয় করিয়া জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি কবে। জীবাণু দ্বাবা নাইট্রোজেন সঞ্চয়েব বিষয় বৈজ্ঞানিক ভাবে পবিজ্ঞাত না হইলেও এতদ্দেশে এবং ইয়োবোপে ইহা কার্য্যত জানা ছিল। আমাদের দেশে সাধারণ কৃষকসমূহেব শস্য পর্য্যায়ের পদ্ধতি দেখিলে বুঝিতে পাবা যায় যে তাহারাও শিম্বী ফসলের উপকাবিতা কতক পরিমাণে অবগত আছে।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিখ্যাত বোসিগো প্রমাণ করেন যে জমি হইতে মূল দ্বাবা শোষাই উদ্ভিদেব নাইট্রোজেন সংগ্রহের একমাত্র উপায়। তাঁহাব সিদ্ধান্ত বিলাতে সুপ্রসিদ্ধ কৃষিক্ষেত্রে—রথামেষ্টেডে ও লস্ ও গিলবার্ট এবং পিউর পরীক্ষাবলী দ্বারা দৃঢ়ীভূত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় শিম্বী জাতীয় বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি কিন্তু উক্ত theory দ্বারা সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায় না। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে হেলবিগেল মত প্রকাশ করিলেন যে উক্ত জাতীয় উদ্ভিদ নিশ্চয় বায়ু মণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। দুই বৎসর পরে তিনি এবং উইল ফ্রোথ প্রমাণ করেন যে শিম্বী জাতীয় গাছ একবারেই নাইট্রোজেন বিহীন মৃত্তিকায় জন্মিতে পারে। কিন্তু উহাদের মূলে গুটিকা সদৃশ স্ফীতাংশ—যাহাকে আমরা ভবিষ্যতে গুটি বলিব—বহু দিবস হইতে অনেক বৈজ্ঞানিকের নিকট পরিচিত ছিল। সুপ্রসিদ্ধ শরীর তত্ত্ববিদ ম্যালাপিঘি সর্ব্বপ্রথমে উহার উল্লেখ করেন এবং তাঁহার দ্বারা ইহা রোগ সম্ভূত বলিয়া বিবেচিত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে রুশীয় ওরোনীন সর্ব্ব প্রথমে এই সমুদায় গুটির গঠন বর্ণনা করেন এবং প্রসঙ্গ ক্রমে বলেন যে এই গুটী সমূহে এক প্রকার জীবাণু দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বোক্ত গুটিসমূহ যে জীবাণু দ্বারা গঠিত হয় তাহা নিঃসন্দেহ রূপে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সুবিখ্যাত উদ্ভিদ রোগবিৎ মার্শাল ওয়ার্ড নানাবিধ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে সীম গাছের মূলে গুটি জীবাণু দ্বারা গঠিত হয় মৃত্তিকা অথবা বালি পূর্ব্বে গরম না করিয়া তাহাতে সীম বীজ পুঁতিলে একমাসের মধ্যে গুটী দেখা দেয় (২) পূর্ব্বে গরম করা কোন প্রকার উপাদানে (মৃত্তিকা জিলাটিন প্রভৃতিতে) গুটি জন্মায় (৩) মূলাণু সমূহের মধ্যে পুরাতন গুটি রাখিয়া নূতন গাছের মূলে গুটি উৎপাদন করিতে পারা যায়। এবং জীবাণুর কাণ্ড তন্তুকে (hypha) মূলাণু বাহিয়া ত্বকে প্রবেশ করিতে দেখা গিয়াছে।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বিজারিনিক গুটি হইতে জীবাণু পৃথক করিয়া উহার নাম দেন ব্যাসিলাস র‍্যাডিসিকোলা (Bacillus Radicicola)। পরবর্ত্তী অনুসন্ধান দ্বারা এইরূপ থাকে জীবাণু পৃথকীভূত হয়। এবং অবশেষে প্রমাণ হয় যে শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদের উপকারিতার প্রধান কারণ এই যে উহাদের মূলে এই সকল নাইট্রোজেন সঞ্চয়কারী জীবাণু বাস করে। এই জন্যই যে সকল জমিতে মুক্ত অবস্থায় নাইট্রোজেন না থাকায় অন্য অপর জাতীয় উদ্ভিদ জন্মিতে পারে না, সেরূপ স্থলে শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদ জন্মিতে পারে।

প্রত্যেক বৎসরে বহু পরিমাণ নাইট্রোজেন এই সমস্ত উদ্ভিদ্ দ্বারা সংগৃহীত হয়।

নাইট্রোজেন জীবাণু দ্বারা জমির দুই প্রকার উপকার সাধিত হইতে পারে। প্রথমত শিম্বী জাতীয় ফসল নিজে কোন প্রকার নাইট্রোজেনযুক্ত সার গ্রহণ না করিয়া জন্মিতে পারে এবং দ্বিতীয়ত যে জমিতে উক্ত শিম্বী ফসল জন্মে সে জমিও সার বহুল হইয়া উঠে। কি প্রকারে এই জীবাণু নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে তাহা এখনও সবিশেষ জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু বেসিলাস রেডিসিকোলা—অথবা Pseudomonas Radicicola—ইহার নূতন নাম—ও উদ্ভিদের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে কয়েকটী বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যথা (১) মূল জীবাণুযুক্ত মৃত্তিকার সহিত সংস্পৃষ্ট হওয়া আবশ্যক (২) জমিতে অধিক পরিমাণে নাইট্রেট থাকিলে চলিবে না, সোরার আধিক্যে জীবাণুগুলি পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই তাহা দেখা গিয়াছে (৩) লবণ ফসফেট ও পটাস উপযুক্ত পরিমাণ থাকা আবশ্যক (৪) জমি উত্তমরূপে বায়ুযুক্ত হওয়া প্রয়োজনীয়।

নাইট্রোজেন জীবাণু বিষয় অনুসন্ধান করিতে করিতে অনেক পণ্ডিতের মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাহা এই এক জাতীয় জীবাণুই সকল প্রকার শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদের মূলে গুটি উৎপাদন করে কিম্বা বিভিন্ন জাতীয় শিম্বী ফসলের বিভিন্ন প্রকার জীবাণু আছে।

জীবাণুজ সারের বিশেষত্ব এই যে ইহার বীজ প্রস্তুত করিয়া ইহার দ্বারা অনুর্ব্বর মৃত্তিকাকে টীকা দেওয়া চলে। শিম্বী ক্ষেত্র হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া নূতন আবাদী জমিতে টীকা দিয়া ব্রেমনের মূর কালচার এক্স পেরিমেন্ট ষ্টেষনে সবিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার দুইটি অসুবিধা আছে—প্রথমত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহু পরিমাণ মৃত্তিকা বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয় এবং দ্বিতীয়ত এই প্রকার মৃত্তিকার সহিত অনেক জাতীয় পোকা ও উদ্ভিদ রোগ চলিয়া যাইতে পারে।

এই জীবাণুসার অনেক প্রকারে প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম বিশুদ্ধ culture, নাইট্রোজিন (Nitrogin)। জার্ম্মাণ সওদাগর হট ইহা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাতে সুফল না হওয়ায় নব এবং হিলনার নামক পণ্ডিতদ্বয় উহা পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন আকারে বাহির করেন। ইহা দ্রবীভূত জিলাটিনের দ্বারা প্রস্তুত। জার্ম্মাণীর অনেক স্থলে ইহা ব্যবহৃত হয়। ১৯০৪ সালে মার্কিন কৃষি বিভাগের মূর সাহেব কোন প্রকার দ্রাবণে জীবাণুর চাষ করিয়া তাহাতে তুলা ভিজাইয়া উক্ত তুলা শুষ্ক করত বিভিন্ন স্থানে টীকা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু এইরূপ শুষ্ক করায় জীবাণুর তেজ অনেক কমিয়া যায়। তজ্জন্য সকল সময় উত্তম ফসলও পাওয়া যায় না। সম্প্রতি মার্কিন কৃষি বিভাগ এই প্রথা পরিত্যাগ করিয়া দ্রব অবস্থায় জীবাণুর বীজ প্রেরণ করিতেছেন।

বিলাতে লণ্ডনের কিংস কলেজের অধ্যাপক বটমলি মূর সাহেবের প্রস্তুত দ্রাবণের ন্যায় নাইট্রোব্যাকটিরিন নামক একপ্রকার দ্রাবণ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা দ্বারাও বিলাতে অনেক স্থলে পরীক্ষা হইতেছে। আমরা এস্থলে তৎসমুদায়ের ফলাফল নয় একটা মোটামুটী হিসাব দিলাম।

নাইট্রোজেন জীবাণুজ সার সম্বন্ধীয় পরীক্ষাবলীর মধ্যে বিলাতের সুবিখ্যাত রয়েল হর্টিকালচারাল উইসলি উদ্যানের পরীক্ষা সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। এই পরীক্ষা অধ্যাপক বটমলির নাইট্রোব্যাকটিরিন সাহায্যে পরিচালিত হয়। এস্থলে নাইট্রোব্যাকটিরিন সম্বন্ধে কয়েকটী অত্যাবশ্যক বিষয় বিবৃত করা আবশ্যক। নাইট্রো ব্যাকটিরিনের সহিত একটি পুস্তিকা গ্রাহকের নিকট প্রেরিত হয়। উহার সারাংশ নিম্নরূপ—যে স্থলে স্বভাবত প্রচুর পরিমাণে শিম্বী ফসল উৎপাদিত হয় সেরূপ স্থলে নাইট্রোব্যাকটিরিন প্রয়োগে কোন ফল হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে নাইট্রো ব্যাকটিরিন চূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে তিনটী পুরিয়া থাকে।

প্রয়োগের সময় একটী টব বিশেষরূপে পরিষ্কার করিয়া তাহাতে পরিস্রুত জল রাখিতে হয়। বৃষ্টির জল ফুটাইয়া শীতল করিয়া লইলে ভাল হয়। তৎপরে ১নং পুরিয়ার চূর্ণগুলি উক্ত টবে ফেলিয়া দিয়া গলিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত বেশ করিয়া নাড়িতে হয়। তাহার পর দ্বিতীয় নম্বর পুরিয়া সাবধানের সহিত খুলিয়া উহার মধ্যস্থিত তুলা এবং চূর্ণ টবে ফেলিয়া বেশ করিয়া নাড়া আবশ্যক। ইহার পর একটি আধ তোয়ালে দ্বারা টব ঢাকিয়া গরম স্থানে উহা রাখিয়া দিতে হইবে। উনুনের ধারে টব রাখিয়া দিতে পারা যায় কিন্তু উত্তাপ ৭৫ ৮০° ডিগ্রি ফারেনহিটের অধিক হইলে বীজ খারাপ হইয়া যাইতে পারে। ২৪ ঘটা এইরূপ অবস্থায় থাকার পর ৩নং পুরিয়া স্থিত চূর্ণ টবে দিয়া আবার নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে হইবে। ক্রমশ জল ঘোলা হইয়া যায়। উত্তাপ উপযুক্ত পরিমাণ হইলে ২৪—৩৬ ঘণ্টার মধ্যে জল ঘোলা হইয়া যাইবে। যদি ঐ সময়ের মধ্যে জল ঘোলা না হয় তাহা হইলে ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। জীবাণু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিলেই জল ঘোলা হয়। এস্থলে তিনটী পুরিয়াতে কি কি দ্রব্য থাকে তাহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল হইতে পারে। তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা যাইতে পারে যে ১ নং পুরিয়াতে অল্প মাত্রায় ইক্ষু শর্করা পটাসিয়ম সলফেট এবং ম্যাগ্নেসিয়ম সলফেট থাকে। ২ য় পুরিয়াতে মৃত্তিকার কণাবৎ পদার্থ তুলার সহিত জড়িত থাকে। ঐ কণাগুলিতেই জীবাণু অবস্থান করে। ৩ নং পুরিয়াতে কেবল সলফেট অব অ্যামনিয়া থাকে।

জমির টিকা দিতে হইলে পূর্ব্বে বায়ুতে মৃত্তিকা শুষ্ক করিয়া উক্ত মৃত্তিকা পূর্ব্বোক্ত জীবাণুদ্রাবণের সহিত সমান পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে সিক্ত করিয়া লইতে হয়। এই মৃত্তিকা পুনর্ব্বার আরও কতক পরিমাণ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া জমির উপর ছড়াইয়া দিতে হয় এবং তৎপরে কোদালি দ্বারা বেশ করিয়া ক্ষেত্রস্থ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। বীজ টিকা দেওয়া আবশ্যক হইলে একটি চালুনির উপর বাজ রাখিয়া উক্ত চালুনি দ্রাবণে ডুবাইয়া লইলে বীজ পাত্র দ্রাবণ দ্বারা আর্দ্র হইয়া যায়। সামান্য সময় দ্রাবণ সংস্পর্শে রাখিয়া উহাদিগকে তুলিয়া শুষ্ক করিতে হয়। শুষ্ক করিবার সময় একেবারে শুষ্ক করাই ভাল। কারণ আলোক লাগিলে জীবাণুসমূহের ক্ষতি হয়।

উইসলি উদ্যানে কয়েক জাতীয় মটর দ্বারাই পরীক্ষা নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। পরীক্ষার জন্য একখণ্ড পতিত জমি ও একখণ্ড আবাদি জমি নির্ব্বাচিত হয়। এস্থলে পরীক্ষা সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব ও অনাবশ্যক কিন্তু মোটের মাথায় রয়েল হর্টিকালচারাল্ সোসাইটির উদ্যান পরিদর্শক চিটেনডেন সাহেব যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন সেগুলি ভ্রমপ্রমাদ মুক্ত নহে। তাঁহার মতে নাইট্রোব্যাকটিরসে বিশেষ কোন ফল হয় নাই। বিলাতের অনেক বৈজ্ঞানিকই তাঁহার সিদ্ধান্তগুলির ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি যে জমিতে নাইট্রো ব্যাকটিরিস প্রয়োগ করেন তাহাতে স্বভাবতঃই নাইট্রোজেন জীবাণুর সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে ছিল। সুতরাং সেরূপ জমিতে সুফল না হইবার কথা। কিন্তু এই প্রকার জমি ছাড়িয়া দিলে তিনি যে আর একখণ্ড সার বিহীন জমিতে নাইট্রোব্যাকটিরিসের পরীক্ষা করেন তাহা হইতে আশাজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। এই প্রকার জমিতে বৃদ্ধির মাত্রা শত করা ১৫ গুণ। বিলাতে সুপ্রসিদ্ধ রিভিউ অব রিভিউজ পত্রিকার সম্পাদক ষ্টেড সাহেব ১৯১৮ সালে তদ্দেশে নাইট্রো ব্যাকটিরিস সম্বন্ধে যে সমুদায় পরীক্ষা হয় তাহার ফলাফল সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে শতকরা ৬৭ ভাগ পরীক্ষায় উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। এস্থলে ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে এই সমুদায় পরীক্ষা সকল রকমের জমিতে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল এবং অনেকেই সর্ব্ব প্রথমে এই সার ব্যবহার করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বিলাতের সুপরিচিত বীজ ও গাছ বিক্রেতা কার্টার এণ্ড কোম্পানি কয়েক জাতীয় সিম্ মটর ক্লোভার ও তেচ্ লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহার ফলে গড়ে ফসলের পরিমাণ শতকরা ৬ গুণ বৃদ্ধি পায়।

এই সমুদায় পরীক্ষার ফলে বুঝিতে পারা যায় যে নাইট্রোব্যাকটিরিস ভবিষ্যতে সার জগতে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিবে। বিঘা প্রতি বিলাতে ৭॥ টাকার পশ্বাদির মল আবশ্যক হয়। সেই স্থলে ।৵ আনার নাইট্রোব্যাকটিরিস হইলে সমান অথবা অধিক পরিমাণ ফসল পাওয়া যায়। আবার নাইট্রোব্যাকটিরিস শুধু শিম্বী জাতীয় ফসলের জন্য নহে অপরাপর ফসলেও ইহা দ্বারা অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও এই নাইট্রোব্যাকটিরিসের পরীক্ষা চলিতেছে। কিন্তু যে সকল স্থানে সাধারণ নাইট্রোজেন জীবাণুর সংখ্যা অধিক সেইরূপ স্থলেই পরীক্ষা নির্ব্বাহিত হওয়ার ফলাফল উত্তমরূপ বুঝা যায় না। যদি অনাবাদি ও স্বভাবত অনুর্ব্বর জমিতে পরীক্ষা হয় তাহা হইলে ইহার গুণাগুণ সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

১২। বাঙ্গলার কয়েকটী ফসলের সারের তালিকা—(ক) ধানের সার—বিঘা প্রতি ১৭ মণ গোময় অথবা /২ সের ধঞ্চে বীজ বুনিয়া সারে পরিণত করা পরীক্ষার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ।

(খ) পাটের সার—বিঘা প্রতি ৩৩/ মণ গোবর কিম্বা ৩/ মণ রেড়ির খৈল। পাটের সহিত কলাই বা অড়র পালটী চাষ বিশেষ ফল জনক।

(গ) আলুর সার—বিঘা প্রতি ৭ মণ রেড়ির খৈল অথবা ৬ মণ গোবর ও ১/ মণ সুপার ফস ॥ অর্দ্ধমণ সোরা উত্তম সার।

(ঘ) ইক্ষুর সার—৬৫ মণ গোবর ও ২॥ মণ রেড়ির খৈল বিঘা প্রতি প্রযুজ্য।

(ঙ) তুলার সার—বিঘা প্রতি ১॥ মণ সোরা ও ২/ মণ হাড় চূর্ণ বা ॥ মণ খৈল ছাই ২ মণ ও সোরা গোবর ১২ মণ।

(চ) পেঁপের সার প্রতি গাছে একসের ছাই এক সের জলের তলের পচা মাটি চূর্ণ ও পচা পাতা চূর্ণ এক সের চূণ ৵ ছটাক প্রতি বর্ষে।

(ছ) কলাগাছের সার—প্রতি গাছে /২ সের মাছের আইস বাটা বা পচা মাছ গোড়ায় পুতিয়া দিবে।

(জ) আদার সার—বিঘা প্রতি ১ মণ ছাই ৫ মণ পচা পাতা বা /২ সের ধঞ্চা বীজ ছড়াইয়া গাছ হইলে চাষ করিয়া দিবে।

(ঝ) হরিদ্রার সার—বিঘা প্রতি চূণ /২ সের হাড়ের গুড়া অর্দ্ধমণ গোবর ১ মণ রেড়ির খৈল ২ মণ এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া জমি চাষের সময় দিবে।

(ঞ) তামাকের সার—বিঘা প্রতি ১ মণ গোবর বা ৫ মণ সবুজ সার। অন্যান্য সারের বিবরণ সার শস্য নামক পত্রিকায় দ্রষ্টব্য।

সামাজিক প্রহসন

সামাজিকতা এখন আমাদের দেশে প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। পুত্র কন্যার বিবাহ একটা মস্ত বড় সামাজিক ব্যাপার ছিল কিন্তু কাল ধর্ম্মে এখন তাহা ব্যবসাদারীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া দেনা পাওনার ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। আগেকার মত এখন আর পুত্র কিম্বা কন্যার বিবাহ দিবার সময় ভাবী পুত্রবধূ বা জামাতার কুল, শীল বংশ প্রভৃতির পরিচয় লওয়া হয় না ঠিকুজী কুষ্টিরও কেহ অনুসন্ধান করেন না। যাহাদিগের বিবাহ সংস্কার হইবে তাহাদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবাহিত জীবনের অনুকূল হইবে কি না তাহার অনুসন্ধান লওয়াও কেহ আবশ্যক মনে করেন না। পুত্রের বিবাহ দিবার সময় পিতা এখন কেবল ভাবেন

যে, কন্যা পক্ষ হইতে যথেষ্ট বরপণ—নগদ টাকা অলঙ্কার, বরসজ্জা আসবাব প্রভৃতি পাওয়া যাইবে কি না। আর কন্যার বিবাহ দিবার সময় তিনি দেখেন ভাবী জামাতার কয়টি ইউনিভার্সিটীর ডিগ্রি আছে এবং সন্তান পালিতে পারিবে কি না। আজকাল আর সে বিজ্ঞ বহুদর্শী কুলাচার্য্যগণকে দেখা যায় না। তাঁহাদের স্থলে এখন এক শ্রেণীর পেশাদার ঘটক ও ঘটকীর আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদের জাতি বর্ণের কোনই ঠিক ঠিকানা নাই। প্রায়শ ইহারা ঝি বা চাকর শ্রেণীর লোক। ইহাদের বাক্‌চাতুরী অসাধারণ। সত্যকে মিথ্যা করিতে ও মিথ্যাকে সত্য করিতে ইহাদের নিপুণতা অদ্বিতীয়। ইহারা বরপক্ষের অতিরঞ্জিত ঐশ্বর্য্যের ও গুণের বর্ণনা করিয়া কন্যাপক্ষকে মোহিত মুগ্ধ ও বশীভূত করে এবং vice versa। ফলে ইহাদের পাল্লায় পড়িয়া কুটুম্বিতা করিয়া পরিণামে উভয় পক্ষকেই আপশোষ করিতে হয়।

এই যে আমাদের একটী সুন্দর সুচিন্তিত বহুদর্শিতাসিদ্ধ প্রথা ছিল আমরা হেলায় তাহা উপেক্ষা করিতেছি আর পাশ্চাত্য দেশে চিকিৎসক ও পণ্ডিত সমাজের অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা যতই বাড়িতেছে ততই তাঁহারা সমাজে এই প্রকার প্রথার প্রবর্ত্তন করিতেছেন। আমরা পূর্ব্বে একবার এই বিষয়ে আলোচনার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলাম। কিন্তু সমাজের দিক হইতে এখনও কোন প্রকার সাড়া পাওয়া গেল না। এক্ষণে আবার পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজের চোখের সামনে ধরিতেছি। আজকাল পাশ্চাত্যের ছাপ না পড়িলে হতভাগ্য বঙ্গসমাজের কোন বিষয়েই সাড়া পাওয়া যায় না। দেখি এবার সমাজ কি বলেন।

বিলাতে যৌবন বিবাহ প্রথা প্রচলিত। সেখানে যুবক যুবতীরা স্বয় নিজ নিজ স্ত্রী বা স্বামী নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। কিন্তু সামাজিক হিসাবে জাতি হিসাবে তাহার ফল সকল সময়ে আশানুরূপ হয় না অনেক সময়েই অযোগ্য যৌন সম্মিলনের ফলে সমাজের পক্ষে অবাঞ্ছনীয় সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। তা ছাড়া অপরিণত বুদ্ধি যুবতী বা যুবকেরা নিজের বা তাঁহার জীবন সহচর বা জীবনসঙ্গিনীর স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। সামাজিক হিসাবে ইহার ফল সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা শুভকর না হওয়ায় চিকিৎসক মণ্ডলী ও চিন্তাশীল সমাজহিতৈষী পণ্ডিতবর্গ বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সার্টিফিকেট লইবার প্রস্তাব সমাজের সমক্ষে উপস্থাপন করিয়াছেন, এবং এই বিষয়টি বাধ্যতামূলক করিবার জন্য আইনের আবশ্যকতাও তাহারা উপলব্ধি করিতেছেন। অর্থাৎ তাঁহারা এমন একটী আইন চান যে বিবাহার্থী যুবক যুবতীরা তাহাদের স্বাস্থ্য যে উত্তম এই বিষয়ে উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট না লইলে এবং সেই সার্টিফিকেট বিবাহের রেজিষ্ট্রার ও পাদরী সাহেবকে দেখাইতে না পারিলে তাঁহারা বিবাহ দিবেন না।

বিলাতী সমাজপতিদের যুক্তি এই যে বিবাহার্থী যুবক বা যুবতী কাহারও গণোরিয়া সিফিলিস প্রভৃতি যৌন রোগ থাকিলে তাহাদের যৌন সম্মিলনের ফলে তাহাদের সুস্থদেহ mateও (জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনী) ঐ রোগে আক্রান্ত হইবে, এবং তাহাদের পুত্র কন্যাতেও ঐ রোগ সংক্রামিত হইবে। কিম্বা যদি বর বা কনে কাহারও মানসিক বিকৃতি রোগ থাকে তবে তাহাদের দাম্পত্য জীবন দুর্ব্বিষহ হইবে। ইংল্যাণ্ডে ইয়োরোপে এবং আমেরিকায় কিছুদিন ধরিয়া এই বিষয়টির আলোচনা চলিতেছে। আমেরিকার সাতটি রাজ্যে Eugenic Marriage Law নামে একটী আইনও প্রচলিত হইয়াছে। আরও চৌদ্দটি রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় এই আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু অধিকাংশ সদস্য আপত্তি করায় আইন পাশ হয় নাই। যে সকল রাজ্যে আইন পাশ হইয়াছে সে গুলিতে কিন্তু ইহার কাজ ভাল চলিতেছে না। সে যাহাই হউক, আইন হউক আর নাই হউক বিবাহের পূর্ব্বে বর-কন্যার স্বাস্থ্য পরীক্ষার আবশ্যকতা সকলেই একবাক্যে

স্বীকার করিতেছেন। তবে কি ভাবে আইন রচনা করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুফল পাওয়া যায় অথচ লোকের ঘর সংসার পাতিয়া সুশৃঙ্খলে সুখে স্বচ্ছন্দে শান্তিতে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহে ব্যাঘাত না ঘটে তাহাই স্থির করিতে পারা যাইতেছে না এই যা কথা। অনেকের বিবেচনায় বাধ্যতামূলক আইন রচনা না করিয়া বিবাহার্থী যুবক যুবতীগণকে ও তাহাদের অভিভাবকগণকে এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করাইয়া, তাহাদের নিজেদের সুবিবেচনার উপর নির্ভর করাই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত। কারণ বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে গেলেই তবে এই আইনের সার্থকতা দেখা যায়। অথচ ঐ সব দেশে বিবাহ না করিয়াও শত শত যুবক যুবতী পরস্পরের সম্মতি অনুসারে যৌন সম্মিলনে মিলিত হইবার সুযোগ পায় অথচ তাহাদের উপর আইন খাটানো যায় না। এরূপ স্থলে যৌন রোগ এক দেহ হইতে অপর দেহে সংক্রামিত হওয়া নিবারণ করা যায় না। আইন এখানে একেবারেই ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

আইনসঙ্গত ভাবেই হউক অথবা সামাজিক ভাবেই হউক বিবাহের পূর্ব্বে বিবাহার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যে খুবই আবশ্যক তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। বর বা কনে কাহারও কোন সংক্রামক রোগ থাকিলে ঐ রোগ যদি দুরারোগ্য হয় তবে রোগগ্রস্ত ব্যক্তির বিবাহ করা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। যদি ঐ রোগ চিকিৎসাসাধ্য হয়, তবে চিকিৎসার দ্বারা রোগীকে নিরাময় করিয়া তবে তাহাকে বিবাহ করিতে অনুমতি দেওয়া উচিত। আর যাহারা স্বাস্থ্য পরীক্ষায় দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাদের সম্বন্ধে ত কথাই নাই—তাহাদের বিবাহ করা ঘোর সামাজিক পাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। দাম্পত্য জীবনের একটা গুরুতর দায়িত্ব আছে। সন্তানের জন্মদান নূতন নূতন জীবসৃষ্টি বড় সহজ কথা নহে। সুস্থদেহ সন্তানের জন্ম দিতে না পারিলে সমাজের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়। অতি প্রাচীন কালেও এক সময়ে সমাজ রক্ষার্থ স্পার্টানরা আইন করিয়াছিল যে কাহারও রুগ্ন বা বিকলাঙ্গ সন্তান জন্মিলে সে তাহাকে প্রতিপালন করিতে পাইবে না—ঐরূপ সন্তানকে মাংসাশী পক্ষিগণের ভোজনার্থ উচ্চ পর্ব্বতশিখরে ফেলিয়া দিয়া আসিতে হইবে।

বিবাহার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অনেক উপকার আছে। পরীক্ষায় স্বাস্থ্য খারাপ বলিয়া বুঝা গেলে সে চিকিৎসা করাইয়া ও সাবধানে থাকিয়া পীড়া হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ও নষ্ট স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারে। সামান্য একটা জীবন বীমা করাইতে গেলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা না করাইলে চলে না। তাহা হইলে বিবাহের মতন এত বড় একটা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে যাইবার পূর্ব্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো আরও কত বেশী দরকার বলুন দেখি! আমরা আশা করি পুত্র কন্যার ভাবী জীবন যাহাতে দুঃখময় না হয় এই উদ্দেশ্যে তাহাদের অভিভাবকেরা অত পর তাহাদিগকে দাম্পত্য জীবনে আবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করাইবেন। নচেৎ বিবাহ সংস্কারের ন্যায় পবিত্র সামাজিক প্রথা প্রহসন মাত্রে পর্য্যবসিত হইবে।

স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতা

[শ্রীদুর্গাদাস ঘোষাল]

প্রফুল্লতা ভগবদ্দত্ত গুণ। আনন্দময় অবস্থা লাভ করাই প্রত্যেক জীবনের চরম উদ্দেশ্য। নীতি ধর্ম্ম স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধীয় যে কোন নিয়মই কর্ত্তব্যবোধে আমরা প্রতিপালন করি—আমাদের আত্মা সংসারে যাহার জন্য ছুটাছুটি করে আনন্দ লাভই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। নিরবচ্ছিন্ন স্বাভাবিক আনন্দলাভ হইলে

আমাদের কোন অভাব আকাঙ্খাই থাকে না। মানব জীবনের চরম সার্থকতা বা ভগবদবস্থা লাভ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্বাস্থ্যের সহিত প্রফুল্লতার কতটুকু সম্বন্ধ আছে তাহাই আমরা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

স্বাস্থ্যের সহিত প্রফুল্লতার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে স্বাস্থ্যের উপর ইহার প্রভাব কত বেশী তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলে অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হয়। সুকুমার শিশু হইতে যুবক বৃদ্ধ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই আমরা ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে পাই। যে শিশু সদা কলহাস্য পূর্ণ সদা প্রফুল্ল সে দিন দিন শশিকলার মত বাড়িতে থাকে তাহার লাবণ্য কান্তি সমধিক বর্দ্ধিত হয় অন্য পক্ষে যে শিশু ক্রন্দনপর বিমর্ষ তাহার দৈহিক অবনতি অতি দ্রুত হয় এবং সে রুগ্ন মেদাক্ষেব ও রোগপ্রবণ হইয়া থাকে। যুবক বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই ঐ কথা। আমরা চারিদিকেই ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। উপযুক্ত খাদ্য পরিচ্ছদাদি না পাইয়াও এই প্রফুল্লতার গুণে অনেকের স্বাস্থ্য কত সুন্দর থাকিতে দেখা যায়। অন্য পক্ষে যথোচিত খাদ্যাদি খাইয়া এবং স্বাস্থ্যের অন্য নিয়ম পালন করিয়া ও এই প্রফুল্লতার অভাবে অনেকের স্বাস্থ্য দিন দিন ক্ষয় হইতে থাকে। এইজন্য মনে হয় ইহা যেন ওষধ অপেক্ষাও ঔষধের কাজ করে। আমাদের দেহের সহিত শরীরের অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে ইহা আমরা অনেকেই জানি। সুতরাং এই মনের সুস্থ সুন্দর প্রফুল্ল অবস্থা হইতে যে শরীরের উন্নতি বিধান হইবে ইহাতে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। যখন মন নির্ম্মল ও প্রফুল্ল থাকে তখন সমস্ত হৃদয় যন্ত্রে ও রক্তের মধ্যে এমন এক রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধিত হয় যাহাতে সর্ব্বাঙ্গে রক্তের গতি প্রবল হয় এবং মাংসপেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীর বিশিষ্ট পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। ইহা আমাদের রক্তের শ্বেতকণা সমূহকে বর্দ্ধিত ও পুষ্ট করিয়া আমাদের জীবনীশক্তি ও পরমায়ু বর্দ্ধিত করে। ইহা অনুমান মাত্র নহে— সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। একটু মনোযোগ পূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে ইহার সত্যতা সকলেই অন্তরিন্দ্রিয় উপলব্ধি করিতে পারেন।

যখন দুশ্চিন্তা দ্বারা হৃদয় অবসন্ন, শরীর নিস্তেজ, ও মস্তিষ্ক দুর্ব্বল বোধ হয় তখন যদি হঠাৎ প্রফুল্ল হইবার কোন কারণ উপস্থিত হয় বা যত্ন পূর্ব্বক মনকে প্রফুল্ল করিতে পারি, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই উপলব্ধি করিব— আমাদের হৃদয় যন্ত্র ও মস্তিষ্কের মধ্যে কেমন এক প্রশান্ত ভাব বোধ হইতেছে অন্য একরূপ রক্তের ক্রিয়া হইতেছে এবং তখনই শরীরের গ্লানি ও অবসন্নতা দূরীভূত হইবে। এই আনন্দ অবস্থা যত নির্ম্মল প্রশান্ত ও উন্নত রকমের হইবে রাসায়নিক ভাবে আমাদের শরীরের সমুদায় যন্ত্রের ও রক্তের উপর ততই তাহার প্রভাব পরিদৃষ্ট হইবে।

আমাদের সর্ব্বাবস্থায় সকল সময়ে প্রফুল্ল থাকিতে হইবে। তন্মধ্যে আহার ব্যায়াম ও নিদ্রা এই তিন সময়ে প্রফুল্লতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই তিনটী সময়ে প্রফুল্ল থাকিলে স্বাস্থ্যের বিশিষ্ট উন্নতি হইবে। যথা নিয়ম কিছুদিন চলিলে সকলেই ইহা লক্ষ্য করিতে পারিবেন। আহারের সময় মন সরস ও প্রফুল্ল থাকিলে রক্তের গতি ও রাসায়নিক ক্রিয়া হিসাবে ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের অনুকুল ও সমধিক পুষ্টি সাধনোপযোগী হয়। অন্যপক্ষে বিষণ্ণ মনে বা ক্রোধ ভয় ইত্যাদিতে অচ্ছন্ন অবস্থায় আহার করিলে অমৃত তুল্য খাদ্যও উদরে গিয়া বিষবৎ ক্রিয়া করিয়া থাকে। এইজন্য আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে প্রশান্ত মনে ভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক নীরবে আহারের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সনাতন নিয়ম অনেকেই বুঝিয়া দেখিতে চেষ্টা করি না। আহারের সময় মন হইতে হিংসা ক্রোধ দ্বেষাদি অসৎ প্রবৃত্তি সকল দূর করিয়া দিবে মন শান্ত সুন্দর ও প্রফুল্ল রাখিবে এবং আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ভোজ্যদ্রব্য যাহাই হউক না কেন তাহাই আমার পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বর্দ্ধন করিবে, আমার পরম মঙ্গলের হইবে ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিবে। এইরূপ করিলে শাক ভাত যাহাই খাই না কেন তাহাই অমৃত

তুল্য কাজ করিবে। প্রফুল্লতা ও ইচ্ছাশক্তির এমনই অদ্ভুত ক্ষমতা।

আহারের ন্যায় ব্যায়ামের সময় প্রফুল্ল থাকাও একান্ত আবশ্যক। ব্যায়ামের সময় সর্ব্বাঙ্গে রক্তের গতি দ্রুত হইতে থাকে পেশী ও স্নায়ু সমূহের পরিচালনা হয়, সুতরাং এসময় প্রফুল্ল থাকিলে রক্তের অবাধ স্বাধীন গতি হয় এবং উহা রাসায়নিক উৎকর্ষতা লাভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে তাহার কাজ করিয়া থাকে। এই জন্য যে ব্যায়ামশীল ব্যক্তি প্রফুল্ল ভাবে নিয়মিত ব্যায়াম করেন তিনি অত্যল্পকাল মধ্যেই আশাতীত ফল লাভ করিবেন। পরন্তু বিষণ্ণ মনে ও অন্যমনস্ক অবস্থায় যদি ব্যায়াম করা যায় তাহা হইলে তদ্দ্বারা রক্তের ও স্নায়ু প্রভৃতির তেমন উৎকর্ষতা লাভ হয় না এবং উহাদের স্বাধীন চালনা অনেকটা প্রতিহত হয়। এইজন্য পরিশ্রমের দ্বারা শরীর ক্ষয় মাত্রই হইয়া থাকে বিশেষ কোন ফললাভ হয় না। বরং অনেক সময় ক্ষতিই হইয়া থাকে। ব্যায়ামের সময় মনে করিবে আমি আমার সমগ্র শক্তি ইচ্ছামত প্রয়োগ করিতেছি। আমার মাংসপেশী স্নায়ু প্রভৃতি সম্যক পুষ্টিলাভ করিতেছে। আমার দেহের প্রত্যক্ষ উন্নতি হইতেছে। এরূপ অন্যান্য বিষয় ভাবিবে যাহাতে মানসিক তেজস্বিতা ও ফুর্ত্তিলাভ হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিবে ততক্ষণ ঠিক মনের এই অবস্থা রাখিতে হইবে। এইরূপ স্ফূর্ত্তি ও ইচ্ছাশক্তির সহিত ব্যায়াম করিলে ব্যায়ামের অভূতপূর্ব্ব ফল পাইবে ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।

বিশ্রাম আনন্দজনক হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় এবং নিদ্রার সময় যাহাতে মন সুস্থ ও প্রফুল্ল অবস্থায় থাকে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রফুল্ল মনে গাঢ় নিদ্রা হইলে শরীরের যাবতীয় ক্লান্তি দূরীভূত হয় এবং নিদ্রার পর যেন পুনর্জ্জীবন লাভ হইয়া থাকে।

শয়নের সময় মন হইতে সকলবিধ চিন্তা দূর করিয়া দিয়া প্রশান্তভাবে ভগবানের ধ্যান করিবে এবং ঘুমাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে শেষচিন্তাটীও যেন সেই দিকেই থাকে তাহাতে লক্ষ্য রাখিবে। এই ভাবে কাজ করিলে আমাদের শান্তিপূর্ণ সুনিদ্রা হইবে কোন দুঃস্বপ্নাদি ঘুমের সময় কোন বিঘ্ন বিড়ম্বনা ঘটাইতে পারিবে না। গাঢ় ও শান্তিপূর্ণ নিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং নিদ্রার সময় মন যাহাতে স্থির প্রফুল্ল থাকে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

সেকালের খাদ্য-তালিকায় মধু

আমাদের দেশে এইরূপ একটী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে একদা রাণী ভবানীর ভবনে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন হইয়াছিল। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে বসিয়াছেন। রাণী ভবানীর বিষয় সম্পত্তির ম্যানেজার মহাশয় রাণীর প্রতিনিধি স্বরূপ গলবস্ত্র হইয়া ব্রাহ্মণ ভোজনের স্থলে উপস্থিত থাকিয়া কাহার কি চাই তাহার তদারক করিতেছেন। নিকটে চিকের অন্তরালে স্বয় রাণী ও অন্যান্য পুরমহিলারা উপবিষ্ট থাকিয়া ব্রাহ্মণদিগের ভোজন দর্শন করিতেছেন।

ভোজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রথামত ম্যানেজার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন আর কাহারও কিছু চাই কি? সেকালে সামাজিক ভোজের একটু বিশেষত্ব ছিল। রাণী ভবানীর ন্যায় সম্ভ্রান্ত ধনী গৃহে ভোজের আয়োজন যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। সাধারণ গৃহস্থ গৃহেও ভোজে

যথেষ্ট আড়ম্বর করিতে হইত। আর একটি নিয়ম এই ছিল যে কর্মকর্তা বা তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা যখন ভোজে উপবিষ্ট ব্যক্তিগণকে কাহারও কিছু চাই কি না জিজ্ঞাসা করিতেন তখন ভোক্তাদের মধ্যে কেহ কোন কিছুর প্রার্থনা করিলে গৃহস্বামী যদি তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া হাজির করিতে না পারিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে বিলক্ষণ অপ্রস্তুত ও অপদস্থ হইতে হইত। তবে এ কথা অবশ্য সত্য যে ভোক্তারা গৃহস্থের পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব এমন কোন দুর্লভ পদার্থ প্রার্থনা করিত না।

রাণীর ম্যানেজার ভোজের শেষ অবস্থায় যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে আর কাহারও কিছু চাই কি না তখন সকলেই একবাক্যে ভোজের আয়োজনের প্রচুর প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে এমন উত্তম ভোজ্য পদার্থ তাঁহারা জীবনে কখনও খান নাই এবং সকলেই তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করিয়াছেন আর কাহারও কিছু প্রার্থনীয় নাই। কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ বলিলেন চাক চুষিয়া মধু খাইতে ইচ্ছা হইতেছে। এই কথা শুনিয়া চিকের আড়ালে রাণী প্রমাদ গণিলেন— সমস্ত আয়োজন বুঝি বা পণ্ড হয়! অপমানেরও শেষ থাকে না কারণ সামাজিক প্রথানুসারে উক্ত ব্রাহ্মণের প্রার্থনামত মধু চক্র কেবল ঐ ব্রাহ্মণকে আনিয়া দিলে চলিবে না— সমবেত সকল ব্রাহ্মণকে দিতে হইবে। রাণী ভাবিলেন তাঁহার ভাণ্ডারে এক আধটা মধুপূর্ণ মধুচক্র থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু এই সমবেত সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণকে দিতে পারা যায় এত মধুচক্র থাকা অসম্ভব। কিন্তু রাণীর ম্যানেজার বিলক্ষণ সপ্রতিভ ভাবে কহিলেন আজ্ঞে এখনি আনাইয়া দিতেছি। বলিয়া তিনি একজন পরিবেশনকারীকে ভাণ্ডারের চাবি দিলেন এবং সকল ব্রাহ্মণের জন্ম এক একটী করিয়া মধুচক্র আনিবার আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ মধুচক্র আনীত হইল সকল ব্রাহ্মণকে এক একটী করিয়া মধুচক্র দেওয়া হইল। সেই পূর্ণাহারের পর সেই সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ চাক চুষিয়া মধু খাইয়া রাণীর জয় জয়কার করিতে করিতে ভোজন দক্ষিণা লইয়া প্রস্থান করিলেন। এই অপূর্ব্ব ভোজের বিবরণ দেশবিদেশে রটিয়া গেল।

ভোজ শেষ হইলে রাণী ম্যানেজারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ম্যানেজার আসিলে রাণী বলিলেন "তুমি আজ আমার মান রক্ষা করেছ বাবা! তোমায় কি বলে আশীর্ব্বাদ করব ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু তুমি এত মৌচাক পেলে কোথায়? ম্যানেজার সবিনয়ে কহিলেন 'মা আপনার আশীর্ব্বাদে আর আপনার পুণ্যবলে আপনার অক্ষয় ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব হতে পারে না। এ সকলই আপনার পুণ্যবলে সংগৃহীত হয়েছে।' বস্তুত দূরদর্শী ম্যানেজার ভোজের আয়োজন নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে কোন ত্রুটি করেন নাই।

বহুকালের প্রাচীন এই জনশ্রুতির সত্য মিথ্যা এতকাল পরে নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু এই উপাখ্যানটি হইতে এই কথাটী বেশ বুঝা যায় তখনকার কালে মধু আমাদের সাধারণ খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নচেৎ পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণটী মধু খাইতে চাহিত না এবং ম্যানেজারও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের আহারোপযোগী মধুচক্র সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন না। কিন্তু আজ আর এ প্রথা দেখা যায় না। মধু আমাদের খাদ্য তালিকা হইতে আজকাল বাদ পড়িয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

বস্তুত মধু অতি উপাদেয় খাদ্য। মানবের খাদ্য তালিকায় ইহার স্থান অতি উচ্চে অবস্থিত। অতি প্রাচীন কাল হইতে মানুষ মধুমক্ষিকাগণের বহু পরিশ্রমে ও সযত্নে সঞ্চিত মধু অপহরণ করিয়া নিজেদের ভোগে লাগাইয়া আসিতেছে। দেশ বিদেশের কাব্যে সাহিত্যে মধুর বহু গুণকীর্ত্তন দেখা যায়।

মধু যে কেবল তাহার মিষ্ট আস্বাদের জন্যই মানবের প্রিয় খাদ্য তাহা নয়। মধু অতি পুষ্টিকর পদার্থ। মধু নানাবিধ ঔষধ গুণসম্পন্নও বটে। আমাদের কবিরাজ মহাশয়েরা ঔষধের অনুপান হিসাবে মধু ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা দেন। সে যে কেবল তিক্ত ঔষধকে মিষ্টত্ব দিয়া তাহা সহজে সেবনযোগ্য করিবার জন্য তাহা নয়, অনুপানরূপে ব্যবহৃত মধু ঔষধের গুণ ও

কার্য্য কারিতা বৃদ্ধি করিয়াও থাকে। শিশু জন্মগ্রহণ করিলে আমাদের দেশে নবজাত শিশুকে অল্পপরিমাণে মধু খাওয়ানো হয়। মাতৃদুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে মধুও কিছু দিন শিশুর প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণ খাদ্যরূপে মধুর ব্যবহার প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। যাঁহারা কবিরাজী ঔষধ ব্যবহার করেন তাঁহারাই কেবল ঔষধের অনুপান রূপে সামান্য পরিমাণে মধু সেবন করেন। তাহা এত সামান্য যে তাহাকে কোনরূপেই খাদ্য বলা যায় না। অথচ মধু অতি উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য। আমাদের দেশে বন জঙ্গলে মধু যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্নও হয়। তথাপি কেন যে উহার খাদ্যরূপে ব্যবহার পরিত্যক্ত হইল তাহার কারণ ভাল বুঝা যায় না। হয় ত আমাদের রুচির বিকার ঘটিয়াছে কিম্বা হয় ত কৃত্রিমভাব প্রভাবে মধুর গুণ ও স্বাদের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে অথবা কষ্ট সাধ্য বলিয়া মধু যথেষ্ট পরিমাণে হয় ত সংগৃহীত হয় না আবার রপ্তানীর দরুণ মূল্য বৃদ্ধিও হয় ত ইহার ব্যবহার সংযত হইবার অন্যতম কারণ হইতে পারে। যে কারণেই হউক আমরা আপাতত একটী প্রাচীন পুষ্টিকর স্বাস্থ্যানুমোদিত স্বদেশী খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছি। এদিকে অন্য দেশে মধুর আদর যথেষ্টই বাড়িতেছে। একখানি ইংরেজী স্বাস্থ্যবিষয়ক সাময়িক পত্রে মধুর বিষয়ে একটী সুন্দর আলোচনা পাঠ করিলাম। লেখক একজন কৃতবিদ্য চিকিৎসক। তিনি মধুর ব্যবহার সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া উহার গুণবর্ণনায় শত মুখ হইয়াছেন।

তিনি বলেন স্মরণাতীত কাল হইতে মধু পৃথিবীর নানা দেশে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বাইবেলে মধু পানের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। প্রাচীনদের খাদ্যতালিকায় মধু প্রধান স্থান অধিকার করিত। ভ্রমণ কারীদের ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাঠ করা যায় যে, প্যালেষ্টাইনে এক সময়ে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মধু উৎপন্ন হইত। আরব দেশের উত্তরাঞ্চলের পাহাড়গুলিতে এখনও প্রচুর মধু উৎপন্ন হয়। মধুমক্ষিকাদের দ্বারা উৎপন্ন মধু ছাড়া আরও কয়েক প্রকার পদার্থ এই সকল দেশে মধু নামে ব্যবহৃত হইত। এই সকল পদার্থ অনেকাংশে মধুরই অনুরূপ। আরব দেশে আঙ্গুর ফলের রস হইতে একপ্রকার কৃত্রিম মধু উৎপন্ন হইত। গুণে ও স্বাদে তাহা মধুর অনুরূপ বলিয়া সারিয়ানদের মধ্যে ইহার খুব আদর ছিল। মেসোপটেমিয়া দেশের সিনাই উপদ্বীপে একপ্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস মধুরূপে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ইহাদের সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম মধু অবশ্য মধুচক্র হইতেই পাওয়া যাইত।

রাসায়নিক বিশ্লেষণে মধু হইতে নানা বস্তু পাওয়া যায় যথা ডেক্সট্রোজ লেভুলোজ ডেক্সট্রিণ প্রোটিন মোম তৈল খনিজ পদার্থ প্রভৃতি। ইক্ষু চিনি গাঁজাইয়া মধুর ন্যায় একপ্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা সহজ পাচ্য।

প্রাচীনেরা প্রচুর পরিমাণে মধু পান করিতেন। তৎকালে ইহা অন্যতম প্রধান মিষ্টান্ন ছিল বলিলেই হয়। ঔষধার্থেও ইহার ব্যবহার অল্প ছিল না। মধু হইতে নানাবিধ পানীয় প্রস্তুত হইত। তাহাদের মধ্যে কয়েকটী মাদকতা গুণসম্পন্ন ছিল। আরবেরা আজও মধু মাখাইয়া রুটী খায়। আমরা বাল্যকালে মুড়ির সহিত মধু মাখিয়া খাইতাম। সে বড় উপাদেয় খাদ্য ছিল।

অনেক স্থানে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে চিনির পরিবর্ত্তে মধু ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে মধু চিনির অপেক্ষা পরিমাণে অনেক কম লাগে। বিলাতী খাদ্য তালিকায় মধুযুক্ত বহু খাদ্যের নাম পাওয়া যায়। মধুতে ডুবাইয়া অনেক স্থলে নানাবিধ ফল ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ দীর্ঘকাল অবিকৃত ভাবে রক্ষিত হয়। এইগুলিকে মোরব্বা বলাও যাইতে পারে।

বিলাতী বৈদ্যশাস্ত্রে টাটকা মধু বিরেচক গুণসম্পন্ন। পুরাতন মধুর গুণের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে। ঔষধকে সুগন্ধযুক্ত করিবার জন্য বিলাতী ঔষধে অনেক সময় মধু মিশ্রিত করা হয়। গলা জ্বালা করিলে লেমনেডের সহিত মধু মিশাইয়া পান করিলে জ্বালার উপশম হয়।

ইয়োরোপে মধু তেমন সুলভ না অথচ তাহার ব্যবহার যথেষ্ট। এই কারণে খাঁটি মধুর পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম মধু প্রস্তুত করিবার জন্য বহু চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু সর্ব্বাংশে খাঁটি মধুর অনুরূপ নকল মধু এ যাবৎ কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। এই জন্য মধুতে কোন ভেজালও চলে না। মধু খাঁটি কি না তাহার সাক্ষী মৌমাছি। মৌমাছি কৃত্রিম মধু কখনও স্পর্শও করিবে না।

মৌমাছিরা যে ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করে তদনুসারে মধুর স্বাদ ও গুণে বিভিন্নতা ঘটে। মধু মক্ষিকারা ফুল হইতে মধু আহরণ করে বটে কিন্তু তাহাদের দ্বারা মধুর অনেক পরিবর্ত্তন হয়। অনেক ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় মধুর ন্যায় একপ্রকার মিষ্ট স্বাদযুক্ত পদার্থ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা স্বাদে বর্ণে বা গন্ধে মধু হইতে অনেকটা বিভিন্ন। মধু মক্ষিকারাও ইহাই সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায় বটে কিন্তু প্রকৃত মধু তাহারাই উহা হইতে প্রস্তুত করিয়া লয়। মানুষ শত চেষ্টা করিয়াও ফুলের মধু হইতে চাকের মধু প্রস্তুত করিতে পারে নাই কখনও পারিবেও না।

কোন স্থানে কোন ফুলের গাছ প্রচুর পরিমাণে থাকিলে মধুমক্ষিকারা কেবল সেই ফুল হইতেই প্রায় মধু সংগ্রহ করে। তাহাদের সংগৃহীত মধুও ঐ ফুলের নামেই পরিচিত হয়। যথা কমলার মধু, পদ্ম মধু মহুয়ার মধু প্রভৃতি। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে গুণের যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। যেখানে একপ্রকার ফুলের গাছ বহু পরিমাণে থাকে না নানাপ্রকার ফুলের গাছ থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্য মৌমাছিরা সকল প্রকার ফুল হইতেই মধু সংগ্রহ করিয়া চাকে সঞ্চয় করে। এইপ্রকার মধুর কোন বিশেষ ফুলের নামে নামকরণ হয় না এবং বিশেষ কোনপ্রকার ফুলের নামে বিশিষ্ট মধুর গুণও ইহাতে বর্ত্তে না। ইহারা সাধারণত মধু নামেই পরিচিত এবং সাধারণ কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়।

শিশুর কৃত্রিম খাদ্য

[ডাক্তার—শ্রীবসন্তকুমার চৌধুরী]

মাতৃস্তন্যই শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য। তদ্ব্যতীত অপর সমস্ত খাদ্যই শিশুর কৃত্রিম খাদ্য নামে অভিহিত করিলে বোধ হয় দোষের কথা হয় না। এদেশে দিনে দিনে নানাবিধ কৃত্রিম খাদ্যের আমদানী এবং তাহার ব্যবহার ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে।

এদেশে দরিদ্র ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যেই শিশুর কৃত্রিম খাদ্যের প্রচলন অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ এই শ্রেণীর অনেক লোকে মনে করে—তাহারা খুব সুশিক্ষিত ও সভ্য এবং সাহেবিয়ানা ধরণে চলা ফেরা করার ইচ্ছাও তাহাদের বেশী। অথচ জ্ঞান ও অর্থের অভাব জন্য প্রকৃতভাবে বাসনা পূর্ণ না হওয়ায় কৃত্রিম খাদ্যকে আরো কৃত্রিম করিয়া সুব্যবস্থা কুব্যবস্থা করিয়া বিষম অনিষ্ট সাধন করিয়া বসে। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্রদিগের মধ্যে এখনও শিক্ষায় অভিমান হয় নাই। বিলাসিতার প্রবৃত্তি আসে নাই। তাহারা সভ্যতার স্পর্দ্ধা করে না। সুতরাং স্তন্য দুগ্ধ অভাবে স্বদেশজাত সদ্য গো দুগ্ধ ছাগ দুগ্ধ মেষ দুগ্ধ গর্দ্দভী দুগ্ধ তাহার অভাবে ভাত ভাতের মাড চিঁড়ের মাড ইত্যাদি শিশুকে যত্ন করিয়া খাওয়ায়। সে জন্য তাহাদের মধ্যে শিশু মৃত্যু সংখ্যা কম। অথবা মৃত্যু হইলেও খাদ্যদোষে তাহাদের মধ্যে শিশু কম মরে। দ্বিতীয়ত মধ্যবিত্ত দরিদ্র ভদ্রলোকদিগের মধ্যে বিলাসিতার আধিক্য হওয়ায় মাতৃগণ সন্তান পালন শিক্ষাহীনা এবং অধিকাংশই পীড়াগ্রস্তা। তাহাদের

পাচক শিশুখাদ্য প্রস্তুত করে অপরিষ্কার ভেজাল খাদ্য সংযুক্ত আহার্য্য তাহারা প্রস্তুত করিতে দ্বিধা বোধ করে না। তাঁহা সুসিদ্ধও হয় না। সেই খাদ্যই শিশু মাতা স্বচ্ছন্দে শিশুকে আহার করাইয়া থাকেন। তাহা খাইয়া যে শিশু রোগগ্রস্ত হয় তাহা শিশু মাতার ধারণাই নাই। অধিকাংশ অবস্থাপন্ন মাতারাই আলস্যপরায়ণা রোগগ্রস্তা দুগ্ধহীনা অথবা স্বল্প বিকৃত দুগ্ধ যুক্তা। এই সকল গৃহে কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রসূতির মৃত্যু হইলে আর সে শিশুর স্তন দুগ্ধ প্রাপ্তির সম্ভবনা থাকে না অথবা পালন কর্ত্রীর অভাবে কৃত্রিম খাদ্যের উপরেই নির্ভর করিতে হয়। দেশে অনেক সুপথ্য থাকিলেও বিদেশী খাদ্যের পক্ষপাতী ডাক্তার বাবুরা সেই পথ্যেরই ব্যবস্থা করিয়া বসেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এদেশে শিশুর সুখাদ্য মোটেই নাই বা হইতেই পারে না। তাহার ফলে মৃতবৎসা শিশু চিররুগ্ন পেট রোগা ক্রমে বড় হইলে অজীর্ণ রোগ হয়। তাহাদের যকৃত দূষিত থাকে এবং সামান্য অনিয়মেই রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং বার বার বিদেশী উত্তেজক ঔষধ ও পথ্যের ব্যবহারে ক্রমে শৈশব কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে উপস্থিত হইলে তখন আর কতকগুলি দুষ্ট প্রবৃত্তি ও বন্ধু আসিয়া যোগ দেয়। সুতরাং আর হৃষ্ট, পুষ্ট মেধাবী ও সুশ্রী হইতেই পারে না। ক্রমে প্রৌঢ়ে অকাল বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়া পীড়াগ্রস্ত হয়। ও অকালে ভবলীলা শেষ করে। এই কারণেই শৈশবে চঞ্চলতা, কৈশোরে স্ফূর্ত্তি, যৌবনে প্রফুল্লতা শক্তি সামর্থ্য প্রৌঢ়ে সাহস অধ্যবসায় একাগ্রতা হারাইয়া ভীরু ও কাপুরুষরূপে আখ্যাত হয়। আর পল্লীবাসী দরিদ্র নিরক্ষর অসভ্য চাষা, চাঁড়াল ধীবর শিশু যুবা প্রৌঢ় লোকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর দেখিবে তাহারা দৃঢ়কায় শক্তিশালী কর্ম্মপটু সাহসী নীরোগ ও দীর্ঘজীবী। তাহাদের শিশু খাঁটি দুধেভাতে, পান্তাভাতে পুষ্ট। তাহাদের শৈশব পথ্য-নির্দিষ্ট। কিন্তু তাহারা তবু চাষা।

সহজ প্রাপ্য যে সকল কৃত্রিম খাদ্য আমাদের হাটে বাজারে মুদির দোকানে ও ঔষধের দোকানে আমদানী হইয়া আমাদিগকে প্রলোভনে মুগ্ধ করিতেছে তন্মধ্যে মিষ্টযুক্ত গাঢ় দুগ্ধ একটী। এই টিনবদ্ধ বিলাতী দুগ্ধ বায়ু রোধক টিন কৌটায় বিক্রয় হয়। ইহা ক্ষীরের মত ঘন। জলের সহিত সহজে মিশিত হয়। ডাক্তার ডেলি বলেন (ল্যানসেট ১৮৭২।২রা নবেম্বর) ইহার উপাদান

ছানা	১৪ ৩১
মেদ	১ ৮
দুগ্ধ শর্করা	১৪ ৫
ইক্ষু শর্করা	২৭ ৪৩
ভস্ম (Ash)	২ ৪
ফস্ফরিক এসিড	৭
জল	৩ ৭

ইহার মধ্যে শর্করা অধিক পরিমাণে থাকাতে শিশুর শরীরে মেদ বৃদ্ধি হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যবহার করিলে বলক্ষয় হয়। শরীরের সঞ্জীবনী শক্তি ক্ষীণ হয় সে জন্য শিশু রোগপ্রবণ হয়। ইহা সেবনে শিশু মোটা হয় বটে কিন্তু মাংসপেশী নিস্তেজ হয়। সে জন্য শিশু শীঘ্র হাঁটিতে পারে না। দাঁড়াইতে পারে না পেটটী বড় হয় মস্তকাস্থির মধ্যস্থিত ফাঁক শীঘ্র জোড়া লাগে না। প্রায়ই পেটের পীড়া হয়। অধিক মিষ্ট না দিলে অন্য খাদ্য খাইতে চায় না।

ডাক্তার রমেরণ সাহেব বলেন—মিষ্টযুক্ত গাঢ় দুগ্ধ, সুলভ মূল্য দীর্ঘকাল রক্ষা করা যাইতে পারে (এ দেশে বিশেষত গরমের দিনে নহে) এবং প্রয়োগ জন্য সহজ প্রস্তুত করা যায়। চা চামচের এক চামচ পূর্ণ এই দুগ্ধের সহিত তিন আউন্স জল মিশ্রিত করিলে তাহাতে শতকরা—

মেদ	১ ভাগ
প্রেটীন	১ ভাগ
শর্করা	৫ ভাগ

বর্ত্তমান থাকে। দুই মাস বয়স্ক শিশু অনেক স্থলে গাভী দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে না। অধিক মেদময় পদার্থ পরিপাক করিতে না পারাই তাহার কারণ, এইরূপ স্থলে

শিশু দুগ্ধ পানের পর সে বমি করে তাহাতে বমিত পদার্থ মধ্যে সংযত খণ্ড খণ্ড আকারে দুগ্ধ নির্গত হয়। কিন্তু মেদময় পদার্থের পরিমাণ অল্প ও শর্করার পরিমাণ অধিক হইলে তাহা বেশ পরিপাক করিতে পারে এবং তদ্রূপ পরিমাণের দুগ্ধ পান করিলে শিশু অল্প সময় মধ্যে বেশ পরিপুষ্ট হয়। কেবল এইরূপ স্থলেই অধিক শর্করা যুক্ত গাঢ় দুগ্ধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ দুগ্ধ পান করানোর কিছুদিন পরেই শিশুর উদরাধ্মান যুক্ত অজীর্ণ পীড়া উপস্থিত হয়। শিশুও মিষ্ট দুগ্ধ খাইতে অভ্যস্ত হওয়ায় অধিক মিষ্ট না দিলে অন্য দুগ্ধ খাইতে চায় না। মিষ্ট অধিক ও মেদের পরিমাণ ক্রমে হ্রাস হওয়ার ফলে শেষে শিশু রিকেট পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

মিষ্ট বিহীন গাঢ় দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিলে তাহার উপাদান সমূহ সাধারণ গো দুগ্ধের পরিমাণেরই অনুরূপ হয় কিন্তু গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অল্প সময় মধ্যেই তাহা নষ্ট হইয়া পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয়। মিষ্ট গাঢ় দুগ্ধ অধিক পরিমাণে শর্করা মিশ্রিত থাকা হেতু শীঘ্র পচিতে পারে না সেজন্য বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া দীর্ঘকাল তাহা মুক্ত বাতাসে খোলা না থাকিলে তাহার পচন হয় না। সেই জন্যই তাহা পান করানয় আমাদের দেশে আপত্তি হয় না। কিন্তু ঐ দুগ্ধের কৌটা বার বার খুলিয়া দুগ্ধ বাহির করায় তাহার ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিয়া প্রথমে মৃদু পচন ও পরে দ্রুত পচন জন্মায়। এতদ্ব্যতীত জগতের সমস্ত দ্রব্যই পরিবর্ত্তনশীল সকল দ্রব্যেই অল্পাধিক পরিমাণে পচন ক্রিয়া হইয়া থাকে। সুতরা বিদেশী শর্করাযুক্ত জমান দুগ্ধেও যে দীর্ঘ দিনে কিছু পরিবর্ত্তন হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তারপর আমরা মৃদু পচনযুক্ত পদার্থের পচন বুঝিতে না পারিয়া তাহাই ব্যবহার করিয়া নিয়ত অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া ফেলি। ইত্যাদি কারণে ঐ দুগ্ধ যদ্যপি বিদেশজাত না হইয়া অন্তত এদেশজাত হয় তাহাও মন্দের ভাল। কিন্তু "তিন নকলে আসল খাস্তা" সাধারণত হইয়া থাকে, সুতরাং বিশেষরূপ বিপন্ন না হইলে বা নিরুপায় না হইলে কদাচ কেহ যেন এই দুগ্ধ ব্যবহার না করেন।

নিম্নলিখিতরূপে আমরা আমাদের দেশে সহজে গো দুগ্ধ সংরক্ষা করিতে পারি।

দুগ্ধ সংরক্ষা।

১। একটী পরিষ্কার বোতল সদ্য-গো দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহা কোন একটী গরম জলের পাত্র মধ্যে রাখিয়া জ্বাল দিতে হইবে। যখন দুগ্ধ ফুটিতে আরম্ভ হয় তখন একটী ভাল ছিপি দিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিতে হইবে। এর ছিপির উপর গালা, মোম বা রজন লাগাইয়া উত্তমরূপে বন্ধ করিতে হইবে। ঐ দুগ্ধে একটু চিনি দিলে আরো ভাল হয়। যদি বোতলের পরিবর্ত্তে টিন পাত্রে দুগ্ধ ফুটান যায় এবং তদবস্থায় রাংঝালা দিয়া উত্তমরূপে বন্ধ করা যায় তবে এইরূপ দুগ্ধ বহুকাল ভাল থাকে। রাংঝালা সম্পূর্ণ বায়ুরোধক হওয়া ও ঐ টিন পাত্র শুধু রাং ঝালা দিয়া প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। এইরূপ দুগ্ধ রেল ষ্টিমার বা দূর স্থানে যাতায়াতে ব্যবহার করা সুবিধাজনক অথচ অনিষ্ট জনক নহে।

২। দুগ্ধ গরম করিয়া তাহার মধ্যে একটু কার্ব্বনেট অব সোডা ও চিনি দিয়া উত্তমরূপে বোতলে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিলে বা ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিলে ৮।১ দিন সত্ত্ব অবস্থায় থাকে।

৩। দুগ্ধ প্রথমে উষ্ণ করিয়া শীতল হইলে সোডা ওয়াটারের কল দিয়া অঙ্গারায় বায়ু উহাতে দ্রব করিয়া উত্তমরূপে বোতলের মুখ ছিপি দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিলে অনেক দিন দুগ্ধ ভাল থাকে।

৪। দুগ্ধ মৃদু তাপে বা গরম বাষ্পে ঘন করিয়া তাহাতে চিনি দিয়া একটী টিনপাত্র উষ্ণ করতঃ তাহার মধ্যে ঐ ঘন দুগ্ধ পূর্ণ করিয়া টিন পাত্র টিন ঝালা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিলে এই ঘন দুগ্ধ বহুকাল পর্য্যন্ত উত্তম অবস্থায় থাকে।

যে স্থলে শিশু মেদময় খাদ্য পরিপাক করিতে অক্ষম,

অথচ যথেষ্ট পরিমাণে শর্করা পরিপাক করিতে পারে, অধিক পরিমাণে শর্করা সেবনে তেমন অসুস্থতার লক্ষণ উপস্থিত হয় না অথচ মেদের পরিমাণ অধিক হইলেই শিশুর অজীর্ণ পীড়া উপস্থিত হয় সেইরূপ স্থলেই সুমিষ্ট গাঢ় দুগ্ধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাহা টাট্‌কা ও স্বদেশজাত গাভী দুগ্ধের হইলেই ভাল হয়।

কি প্রকারে দুগ্ধ কৃত্রিম হয়।

১। গো দুগ্ধ দোহনের পর বহুক্ষণ রাখিয়া দিলে তাহা সমক্ষারায় বা ক্ষার গুণ বিশিষ্ট থাকে না। তাহা বায়ু হইতে অম্লজান বাষ্প শোষণ করিয়া ল্যাকটিক এসিড ও অন্যান্য অম্ল উৎপাদন করে এবং তাহা হইতে অঙ্গারক বাষ্প নির্গত হইয়া উহার ছানা জমিয়া যায়। উদ্ভিদ, জন্তু অথবা খনিজ বস্তু হইতে প্রস্তুত অম্ল মিশ্রিত হইলেও দুগ্ধ জমিয়া যায়। বিশেষ প্রকার যবক্ষারীয় পদার্থ—পেপসিন বা পাকরসেও দুগ্ধ সংযত হয়। দুগ্ধ অনেকক্ষণ রাখিয়া দিলে আপনা হইতেই জমিয়া যায়, এজন্য যে সকল পাত্রে দুগ্ধ রাখা হয় তাহা ভাল করিয়া ধৌত না করিয়া পুনরায় তাহাতে নূতন দুগ্ধ রাখিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের দেশে দুগ্ধের ভাঁড় শুধু ধৌত করে এমত নহে তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া রাখে। দুগ্ধের ভাঁড়ে ধূম দিলে তাহাতে দুগ্ধ অনেক ক্ষণ রাখিলেও নষ্ট হয় না কারণ কাষ্ঠ দগ্ধ হইলে যে ধূম নির্গত হয় তাহাতে ক্রিয়োজোট ও এসিটিক এসিড কিয়ৎ পরিমাণে থাকে। এই দুইটী বস্তু উত্তম পচন নিবারক। এইজন্য দুগ্ধ শীঘ্র নষ্ট হয় না। কিন্তু দুগ্ধ ধূম গন্ধ বিশিষ্ট হয়। তাহা পানে অনেকের অস্থাকার উপস্থিত হইতে পারে। উষ্ণতা রাসায়নিক পরিবর্তনের সহায় বলিয়া উষ্ণ স্থানে দুগ্ধ রাখিলে শীঘ্র নষ্ট না হইলেও সেই দুগ্ধের পোষকতা গুণ কম হয় এবং সে দুগ্ধ পানে শিশুর অজীর্ণ পীড়া জন্মে।

২। দুগ্ধ দোহনের পর তিন ঘণ্টা বা এক প্রহর কাল সে দুগ্ধ ভাল করিয়া ঢাকিয়া রাখিলে বা গরম করিয়া রাখিলে ভাল থাকে নতুবা তাহাতে লবণ ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সে দুগ্ধ পান করিলে শিশুর পেটের পীড়া জন্মে।

৩। তাম্র সীসা, দস্তা, পিত্তল, কাঁসা প্রভৃতি ধাতু পাত্রে দীর্ঘ সময় দুগ্ধ রাখিলে, বা জ্বাল দিলে, ঐ ধাতুর কতকাংশ দুগ্ধে দ্রব হইয়া দুগ্ধ কলঙ্কিত ও বিষ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। শিশু খাদ্য দুগ্ধ সেরূপে রক্ষা করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। পাথরের পাত্র বা মাটীর পাত্রে দুগ্ধ রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

৪। ঝড় বৃষ্টি হইলে বায়ুতে অধিক বিদ্যুৎ পরিচালিত হয় তাহাতে বায়ুর কতকাংশ এক প্রকার বিশেষ অবস্থা (ওজন) প্রাপ্ত হয়। ঐ বায়ুতে দুগ্ধ থাকিলে দুগ্ধ অম্লীকৃত হয়। এজন্য ঝড় বৃষ্টির দিনে দুগ্ধ শীঘ্র নষ্ট হয়।

৫। অম্ল দুগ্ধ কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলেই তাহা প্রথমে অম্ল ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। আরো অধিকক্ষণ রাখিলে তাহাতে এক প্রকার নীচ শ্রেণীর উদ্ভিদ্ জীবাণু (ফাঙ্গাস) উৎপন্ন হয় ও দুগ্ধের বর্ণ নীলাভ হয়। এই প্রকার দুগ্ধ শিশু পান করিলে অজীর্ণ, পাকস্থলীর নানাপ্রকার পীড়া শূল বেদনা কোষ্ঠ কাঠিন্য অথবা অতিসার ও ওলাউঠা পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই প্রকার দুগ্ধ পানে শিশুদের মুখে ও জিহ্বায় এক প্রকার সাদা সাদা ঘা হয়।

৬। অস্বাভাবিক অবস্থায় (ফুঁকা দিয়া) দুগ্ধ-দোহন করিলে দুগ্ধের গুণ অনেক পরিবর্ত্তিত হয়।

৭। দুগ্ধ বিক্রেতারা যথা তথায় জল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া অত্যধিক লাভের বশবর্ত্তী হইয়া নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধি শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া বিষম অনর্থ ঘটাইয়া থাকে। বাজারের দুগ্ধ বা অন্য স্থানের দুগ্ধ বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া ব্যবহার করা উচিত। যে স্থানে বা গ্রামে ওলাউঠা, বসন্ত, হাম আমাশয় প্রভৃতি পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় বা যাহার গৃহে বা যে পাড়াতে উক্ত পীড়া থাকে সেরূপ স্থানের দুগ্ধ বিষবৎ জ্ঞান করা উচিত।

৮। অনাবৃত দুগ্ধ, বায়ুর অম্লজান বা অঙ্গারক

গন্ধাদিযুক্ত-মলমূত্রযুক্ত বা তাহাদের সংস্পৃষ্ট এবং বিড়াল কুকুরের ভুক্তাবশিষ্ট দুগ্ধ বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত।

৯। গাভী দুর্গন্ধময় স্থানে বাস ও পচা গলিত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, এবং অপরিষ্কার থাকিলে নিশ্চয়ই দূষিত দুগ্ধ উৎপাদন করে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া সে দুগ্ধ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

১। জাতি, শরীরের বর্ণ আকার শৃঙ্গারাদির অবস্থা ভেদেও গো দুগ্ধের গুণ ও তাহার উপাদানের তারতম্য হয়। কালবর্ণ গাভীর দুগ্ধই উত্তম।

১১। প্রসবের পরেই গাভীর যে দুগ্ধ নির্গত হয় তাহা অত্যন্ত পাতলা। তাহাকে (কলষ্ট্রম) গাদ্‌ড়া কহে। ইহা কখন কখন আঠাল পীতাভ ও অধিক অস্বচ্ছ হয়। এই দুগ্ধ ছানা অপেক্ষা অণ্ডলালের পরিমাণ অধিক থাকে এজন্য উষ্ণ করিলে জমিয়া যায়। গো দুগ্ধ ন্যূনাধিক এক মাস পর্য্যন্ত এই অবস্থায় থাকে। ইহার গন্ধও বিশেষ প্রকার এব পান করিলে উদরাময় হয়। সচরাচর আমাদের দেশে গাভী প্রসব হইবার পর ২১ দিন পর্য্যন্ত গো দুগ্ধ দোহন ও তাহা ব্যবহার করে না। বর্ত্তমান সময়ে দুগ্ধের দুস্মূল্যতা হেতু এরূপ দুগ্ধও বাজারে বিক্রয় হয়। ক্রেতাগণের বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দুগ্ধ ক্রয় করা কর্ত্তব্য।

১২। গো দুগ্ধের শতকরা ১৪ অংশ কঠিন পদার্থ অবশিষ্ট জল আছে। তন্মধ্যে—

যবক্ষার জান ঘটিত	৪.১
মেদময় পদার্থ	৩.৯
দুগ্ধ শর্করা	৫.২
বিবিধ লবণ	৮
	১৪
অবশিষ্ট জল	৮৬
মোট	১০০

কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে খাদ্য দ্রব্যের গুণ ও তারতম্যানুসারে দুগ্ধ নির্ম্মাণকারী দ্রব্যের ইতর বিশেষ হইয়া থাকিলেও সাধারণ নিয়মের অধিক পরিমাণে ব্যতিক্রম দেই তাহাকে কৃত্রিম বলা যাইবে।

১৩। প্রথমে যে দুগ্ধ দোহন করা হয় তদপেক্ষা শেষের দোহা দুগ্ধে অধিক নবনীত থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে দুগ্ধ দোহন করিলেই তাহা স্পষ্ট পরীক্ষা করা যায়।

১৪। প্রাতঃকালের দোহা দুগ্ধ অপেক্ষা বৈকালের দুগ্ধে অধিক ছানা ও নবনীত থাকে।

৫। গাভী ব্যাপ্ত খাদ্য না পাইলে দুগ্ধের গুণ অনেক কম হয়। শুষ্ক ও উত্তম খাদ্য এবং খইল খাইলে দুগ্ধে কঠিন পদার্থের পরিমাণ অধিক হয়। কাঁচা ঘাস খাইলে নবনীত অধিক হয়। যে সকল গাভী ফাঁকা ময়দানে হরিৎ ঘাস খায় তাহাদের দুগ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা সুস্বাদু সুগন্ধযুক্ত ও পুষ্টিকর।

১৬। খাদ্য দ্রব্যের গুণ ও ধর্ম্ম অনুসারে দুগ্ধের গুণও পরিবর্ত্তিত হয়। মঞ্জিষ্ঠা ও জাফরাণ ভক্ষণে দুগ্ধের বর্ণ লালচে বেউচিনি ভক্ষণে দুগ্ধ রঞ্জিত তিক্ত ও রেচক গুণ প্রাপ্ত হয়। পিয়াজ ও বান্ধা কপি গো রসুন ভক্ষণে দুগ্ধে তদনুরূপ গন্ধ হয়। গন্ধক দ্রাবক (সালফিউরিক এসিড) সেবনে দুগ্ধের আস্বাদ বিকৃত হয়। বিষাক্ত ঘাস ও বৃক্ষাদি ভক্ষণে তাহার দুগ্ধ বিষ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। তেঁতুল টক আম খাইলে দুগ্ধ অম্লগুণ বিশিষ্ট হয়। আফিং খাইলে দুগ্ধ বিষাক্ত হয়।

১৭। গাভী ভীত চকিত, তাড়িত প্রহারিত হইলে তাহার দুগ্ধের গুণের পরিবর্ত্তন হয়।

৮। দুগ্ধবতী গাভী গর্ভবতী হইলে তাহার দুগ্ধ অত্যন্ত বিকৃত হয়।

১৯। দুগ্ধ বিক্রেতারা অন্যায় লাভের প্রত্যাশায় ছাগ মেষ গর্দ্দভ ঘোটক প্রভৃতি জন্তুর দুগ্ধ গো দুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া অনেক সময় বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। দুগ্ধের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু অনেকেই সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে পারেন না, ফলে কঠিন পীড়াগ্রস্ত হন। কিন্তু দুগ্ধ পরীক্ষা দ্বারা এরূপ দুগ্ধ সহজেই ধরা যাইতে

পারে। সেজন্ত ঐ সকল জন্তুর দুগ্ধের উপাদান দিয়ে দেওয়া গেল।

	গাভী	ছাগ	মেষ	গর্দ্দভ	ঘোটক
খেতসার ন ঘটিত পদার্থ ও অদ্রবণীয় লবণ	৪ ৫৫	৪ ৫	৮	১ ৭	১ ৭২
নবনীত	৩ ৭	৪ ১	৬ ৫	১ ৪	২
দুগ্ধ শর্করা ও দ্রবণীয় লবণ	৫ ৩৫	৫ ৮	৪ ৫	৬ ৪	৮ ৭৫
জল	৮৬ ৪	৮৫ ৬	৮১ ০	৯ ৫	৮৯ ৩৩

এতদ্ব্যতীত ছাগ দুগ্ধে এক প্রকার বিশেষ গন্ধযুক্ত অম্ল আছে। এই দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১ ৩২ হইতে ১ ৩৬। এই দুগ্ধই গো দুগ্ধের সহিত ভ্যাজালরূপে অধিক পরিমাণে বিক্রয় হয়।

২০। আমাদের দেশে প্রবঞ্চক গোয়ালাগণ দুগ্ধে গরমজল দিয়া দুগ্ধ আলোড়ন করিয়া তাহা হইতে মাখন তুলিয়া লয় তাহাতে দুগ্ধ মধ্যস্থ মেদময় পদার্থের অপ্রচুরতা হেতু তদ্দ্বারা পোষণ ক্রিয়া কম হয়। এই মেদ বর্ত্তমান থাকাতেই দুগ্ধ শুভ্র বর্ণ দেখায়। সুতরাং দুগ্ধে মেদের অভাব হইলে দুগ্ধে বর্ণের তারতম্য দেখিয়া তাহা ধরা যাইতে পারে।

২১। দুগ্ধ মধ্যে একপ্রকার চিনি বর্ত্তমান থাকায় দুগ্ধ মিষ্ট লাগে। চিনি সুরোৎসেচক সুতরাং কোন প্রকার জান্তব বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রণে ঐ চিনি দ্বারা দুগ্ধে সুরা উৎপন্ন হওয়ায় দুগ্ধ অম্লস্বাদযুক্ত হয় ও শেষে দধিরূপে দেখা যায়। এরূপ দুগ্ধ পানে শিশুর উপকার হয় না।

২২। গো দুগ্ধে মনুষ্য দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক ছানা ও নবনীত থাকে এবং শর্করা কম থাকে। গো দুগ্ধ কৃত্রিম উপায়ে মনুষ্য দুগ্ধের অনুরূপ করিতে হইলে ⅔ ভাগ গো দুগ্ধে ⅓ ভাগ গরম জল মিশাইয়া উহার প্রতি সেরে ২ কাঁচ্চা দুগ্ধ শর্করা মিশাইলে অনেকটা মনুষ্য দুগ্ধের অনুরূপ হয়। মনুষ্য দুগ্ধের অভাবে গো দুগ্ধ এইরূপে সদ্যোজাত শিশুকে পান করান যাইতে পারে। গর্দ্দভীর দুগ্ধে মনুষ্য দুগ্ধ অপেক্ষা অধিক শর্করা ও অল্প নবনীত আছে। এজন্য ইহা মনুষ্য দুগ্ধের ন্যায় হিতকর নহে। সমভাগ গো দুগ্ধ ও গর্দ্দভ দুগ্ধ মনুষ্য দুগ্ধের প্রায় অনুরূপ।

মনুষ্য দুগ্ধ কি প্রকারে কৃত্রিম ও শিশু খাদ্যের অনুপযোগী হয় তাহা ১৪শ বর্ষের ১ম সংখ্যা স্বাস্থ্য সমাচারে শিশু-খাদ্য প্রবন্ধে বলা হইয়াছে।

হরলিক্স মিল্ক ফুড এলিনবেরিজ ফুড প্রভৃতি খাদ্য বিলাত হইতে আমদানী হইয়া আমাদের দেশে বিস্তৃত ভাবে শিশুপথ্য ও রোগীর পথ্যরূপে বহুলভাবে আজ কাল ব্যবহৃত হইতেছে। এগুলি—কোন উত্তপ্ত ধাতু পাত্রের উপর দুগ্ধ প্রক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ ঐ দুগ্ধ শুষ্ক ও চূর্ণরূপে পরিণত হয়। এইরূপ প্রস্তুত দুগ্ধ চূর্ণ সদ্য দুগ্ধের উপাদানেরই অনুরূপ। তবে সদ্য দুগ্ধের সহিত ইহার পার্থক্য এই যে সদ্য দুগ্ধ মধ্যে নানাপ্রকার জীবাণু যত অধিক বর্ত্তমান থাকে এইরূপ শুষ্ক দুগ্ধ চূর্ণ মধ্যে তাহাপেক্ষা অল্প পরিমাণ বর্ত্তমান থাকে। শুষ্ক দুগ্ধ চূর্ণ দীর্ঘ দিন রাখিবার জন্য ইহার সহিত মাল্ট-সুগার মিশ্রিত করা হয়। ইক্ষু শর্করা কর্ত্তৃক অন্ত্র মধ্যে উৎসেচন ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় কিন্তু অন্য প্রকার মিল্ক সুগার স্যাকারিণ প্রভৃতি শর্করায় তাহা কম হয়। এজন্য যে সকল দুগ্ধ চূর্ণে ইক্ষু শর্করা মিশ্রিত থাকে তাহা সেবন করাইলে শিশুর পেটের পীড়া জন্মে ও স্কার্ভি রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

এই প্রকার দুগ্ধ চূর্ণে মেদের ভাগ কম থাকে। যে সকল শিশু মেদময় গাভী দুগ্ধ পান করিয়া পরিপাক করিতে পারে না অথচ শর্করাময় পদার্থ বেশ পরিপাক করিতে পারে সেই সকল শিশুর পক্ষে এরূপ খাদ্যে উপকার হইতে দেখা যায়। এরূপ স্থলে সদ্য গো দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া সেবন করাইলেও সেরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং গো দুগ্ধ সহজে পাওয়া গেলে এরূপ শুষ্ক দুগ্ধ চূর্ণ দেওয়া অবিধেয়। যদি সময় ক্রমে সদ্য গো দুগ্ধ অপ্রাপ্য হয় তাহা হইলে যে কয়েক দিবস সদ্য দুগ্ধ অপ্রাপ্য হয় কেবল সেই কয়েক দিবস মাত্র এইরূপ দুগ্ধ চূর্ণের উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য।

নতুবা শুধু এরূপ দুগ্ধ চূর্ণের উপর নির্ভর করা অনুচিত ও অনিষ্টকর। যে সমস্ত শিশুর বয়স অনুপাতে অধিক ও যাহারা হৃষ্টপুষ্ট তাহাদিগকে ঐরূপ মেদ হীন ও শর্করাময় দুগ্ধ চূর্ণ খাইতে দিলে অনিষ্টই হয়।

শিশুর সাত মাস বয়সের পূর্ব্বে শ্বেতসারযুক্ত খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য নহে কারণ ঐ বয়সের পূর্ব্বে শিশুর শ্বেতসারময় খাদ্য পরিপাকের উপাদান তাহার পাকস্থলীতে জন্মে না সুতরাং তৎপূর্ব্বে শ্বেতসারযুক্ত বিলাতী দুগ্ধ চূর্ণ বা তদনুরূপ কোন খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। পরন্তু নয় মাস বয়স উত্তীর্ণ হইলে শ্বেতসার সংশ্লিষ্ট খাদ্য দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। বিলাতী অনেক শিশু খাদ্য শ্বেতসার সহ মল্ট শর্করা ও ফারমেণ্ট মিলাইয়া প্রস্তুত করা হয়। এই সকল খাদ্য জল বা দুগ্ধ সহ উত্তমরূপ ফুটাইলে ইহার মধ্যস্থ শ্বেতসারময় পদার্থ শর্করায় পরিণত হয়। এইরূপ শর্করায় পরিণত না হইলে শিশু তাহা পরিপাক করিতে পারে না সুতরাং অজীর্ণ পীড়া জন্মে। আমাদের একটু কুসংস্কার আছে যে বিলাতী পথ্য একটু গরম জলে বা গরম দুগ্ধে মিশাইলেই খাদ্যোপযোগী হয়। কিন্তু তাহা যেমন তেমন একটু উত্তাপ না দিয়া বেশ ফুটাইয়া লইতে হয় যেরূপ বিলাতী পথ্য যে যে পদার্থ সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয় সেই সেই পদার্থের প্রকৃতি অনুসারে ও শিশুর পরিপাক শক্তি অনুযায়ী সেই সকল পথ্য নির্ব্বাচন করিতে হয় নতুবা সকল বিলাতী শিশুখাদ্যই সকল শিশু পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না। তাহাতে এক দিকে অর্থ অন্য দিকে জীবন নষ্ট হয়।

অনেক শিশুর পাকাশয়িক উৎসেচন জনিত পেটের পীড়ায় সবুজ বর্ণ জলের ন্যায় দাস্ত হইতে থাকে। বমন পেটে বেদনা, পাছায় ঘা ও অনিয়মিত জ্বর হইয়া থাকে। সেরূপ স্থলে অনেক ডাক্তার বাবুই শর্করাযুক্ত বিলাতী পথ্যই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তাহাতে উপকার না হইয়া বরং অপকারই অধিক হয় কারণ এই শিশুর শর্করা পরিপাক করার শক্তি নাই বা শর্করা সেবনেই পেটের পীড়া উৎপন্ন হইয়াছে। তদুপরি ঐ বিলাতী শর্করাযুক্ত পথ্য দিয়া রোগোৎপত্তির সহায়তা করা হইল। এরূপ [illegible] ঘোলের জল, ছানার জল পথ্য দিলে শিশু তাহা [illegible]ক করিতে পারে।

অনেক শিশুর পিপাসায় জল না দিয়া বিলাতী শর্করা মিশ্রিত দুগ্ধ চূর্ণ পথ্য দিয়া তাহার পিপাসার শান্তি করিতে চেষ্টা করা হয়, ফলে তখন তখন পিপাসার শান্তি হইলেও উক্ত শর্করাযুক্ত খাদ্যে অতিসার, বমন ও ঘর্ম্ম উপস্থিত হইয়া শরীর হইতে জলীয় পদার্থ বহির্গত হইয়া পিপাসা আরো অধিক হয়।

আমরাও সদ্য গো দুগ্ধ হইতে এদেশে অসময়ের জন্য বিলাতী শর্করা মিশ্রিত দুগ্ধচূর্ণের অনুরূপ দুগ্ধ চূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারি। একটু আয়াস স্বীকার করিলেই এরূপ খাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে প্রস্তুত থাকিতে পারে। প্রথমে সদ্য গো দুগ্ধ হইতে কিয়ৎ পরিমাণ মাখন অন্তরিত করিয়া কোন জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে অন্য কোন পাত্রে দুগ্ধ রাখিয়া জ্বাল দিলে ঐ দুগ্ধ ক্রমে ঘন ও পরে শুষ্ক হইয়া গেলে তৎসহ স্যাকারিণ, দুগ্ধ শর্করা অথবা মল্ট শর্করা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে ঢাকিয়া রাখিয়া দিলে দীর্ঘকাল তাহা অবিকৃত অবস্থায় থাকে। এবং অসময়ে সদ্য দুগ্ধ প্রাপ্তির অভাব হইলে মহৎ উপকার সাধন করিতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার— কোন লৌহ নির্ম্মিত পাত্রের মধ্যে দুগ্ধ রাখিয়া তাহার দুই মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করত বহুসংখ্যক নলের মধ্য দিয়া উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প প্রয়োগ করিলে দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া নলের গাত্রে লাগিয়া যায়। তাহা উত্তমরূপে বাহির করিয়া তৎসহ দুগ্ধ শর্করা স্যাকারিণ বা মল্ট শর্করা অথবা দোবরা চিনি মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে বায়ু রোধাবস্থায় রাখিলে দীর্ঘ দিন ভাল থাকে ও অসময়ে মহৎ উপকার সাধন করে।

যেরূপ স্থলে শিশুর মেদজ খাদ্য পরিপাক হয় না ও পেটের পীড়া বমন ইত্যাদি উপসর্গ হয় সেরূপ স্থলে, ঘোল বা মাঠা অর্থাৎ মেদ রহিত দুগ্ধ পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

ইয়োরোপে ম্যালেরিয়া কনফারেন্স —

ইয়োরোপের স্বাস্থ্য বৈজ্ঞানিকদিগের চেষ্টায় ইয়োরোপ হইতে ম্যালেরিয়া প্রায় দূরীভূত হইয়াছে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থান সকল স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে লোকে সেই সকল স্থানে নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে নিরাপদে বাস করিতেছে। তথাপি ইয়োরোপ সন্তুষ্ট নয়। যাহাতে ইয়োরোপে ম্যালেরিয়ার চিহ্নমাত্র না থাকে ইয়োরোপ এখনও সেই চেষ্টা করিতেছে। ইয়োরোপকে সম্পূর্ণরূপে ম্যালেরিয়াশূন্য করিবার জন্য এখনও তথায় ম্যালেরিয়া কনফারেন্স বসিতেছে, ম্যালেরিয়া তাড়াইবার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বনের পরামর্শ হইতেছে। ইয়োরোপ কেবল পরামর্শ করিয়াই ক্ষান্ত নয়। তাহারা কাজের লোক। পরামর্শের ফলে যে সকল সিদ্ধান্ত হইতেছে যে সকল উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে, সেগুলি তথায় তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইতেছে। ইয়োরোপের গবর্ণমেন্ট সকল ম্যালেরিয়া বিতাড়ন করিবার জন্য নিজেরা ত অর্থ ব্যয় করিতেছেনই, অধিকন্তু চিকিৎসক কর্ম্মী ও জনসাধারণকে নানারূপ উৎসাহ, পরামর্শ ও সাহায্য দান করিতেছেন। ফলে ইয়োরোপ অচিরে সম্পূর্ণরূপে ম্যালেরিয়াশূন্য হইবে এমন সম্ভাবনা হইয়াছে।

আর আমাদের ভারতবর্ষ? এখানে প্রতি বৎসর দশ-বারো লক্ষ লোক ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বরে মরিতেছে। কিছু অর্থব্যয় করিলে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায় সকল অবলম্বন করিলে এই নিবার্য্য ব্যাধির প্রকোপ অনেকটা পরিমাণেই হ্রাস করা যাইতে পারে প্রতি বৎসর বহু লোককে অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু এই অভিশপ্ত ভারতবর্ষে কার্য্যত সেরূপ কোন চেষ্টাই হইতে দেখা যায় না। এদেশের গবর্ণমেন্ট যেমন উদাসীন, দেশের জনসাধারণ আবার ততোঽধিক। জনসাধারণ একেবারে নির্ব্বিকার। আর গবর্ণমেন্ট পোষ্ট আপিসে কুইনাইন বিক্রয়ের হুকুম দিয়াই নিশ্চিন্ত। সে কুইনাইনও আবার সব সময়ে পোষ্ট আপিসে পাওয়া যায় না বলিয়া অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ যেন এ পৃথিবীর কোন দেশ নয়—পৃথিবীর কোন দেশের কোন নিয়মই এখানে খাটে না। আর কত কাল এরূপ অবস্থা চলিবে?

পল্লী সংগঠন।—

রাজনীতির মোহ হইতে আপনাদের কোন রকমে উদ্ধার করিয়া কতকগুলি লোক পল্লী সংগঠনে মন দিয়াছেন কিছু কিছু কাজও আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া শুনিতেছি। ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। পল্লী সংগঠন বড় সোজা কাজ নয়। ভারতের প্রকৃত জীবন পল্লীতেই অবস্থিত। ভারতের শতকরা ৯৫ হইতে ৯৮ জন পল্লীতে বাস করে। পল্লীই ভারতের প্রাণ। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক পল্লী একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—পল্লীজীবন মুমূর্ষপ্রায়। এই ভাঙ্গা পল্লীকে প্রায় নূতন করিয়া গড়িতে হইবে।

পূর্ব্বকালে পল্লীরক্ষার প্রধান উপায় ছিল পল্লীসমাজ। সেই পল্লী সমাজ এখন নাই বলিলেই চলে। যাহারা

পল্লী সমাজের সমাজপতি শ্রেণীর লোক ছিলেন, তাঁহারা এখন নানা প্রলোভনে পড়িয়া সহরবাসী হইয়াছেন। তাঁহারা পল্লীবাসে ফিরিবেন কি না, তাহা জানি না। তাঁহাদের পল্লীবাসে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা বা আশা আছে কি না, তাহাও অনিশ্চিত। এরূপ অবস্থায় যাহারা এখনও পল্লীতে পড়িয়া আছে, তাহাদিগকে লইয়াই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। কিরূপে এই কাজ কিয়ৎপরিমাণে করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে স্বাস্থ্য সমাচারে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। এবং সেই প্রবন্ধগুলির মধ্য হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়া সংস্কৃত, এবং কোন কোনটা পুনর্লিখিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি 'স্বাস্থ্য সমাচার পুস্তক বিভাগে পাওয়া যায়। পল্লী সংগঠন কামী কর্ম্মীরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে তাঁহাদের কার্য্যের অনেকটা সুবিধা হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রবন্ধগুলি পল্লীগ্রামে এই সংগঠনমূলক বহু বৎসরব্যাপী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল।

পল্লী সংগঠন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে, জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ করার অপেক্ষা সমবায় প্রণালীতে কাজ করা অধিকতর সুফলপ্রদ উপায় বলিয়া আমাদের মনে হয়। প্রথমত পল্লীবাসীদের পল্লীসংগঠন কার্য্যের উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের দ্বারা সমবায় সমিতি গঠন করাইয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, পল্লীবাসীদের মনে কাজ করিবার জন্য একটা স্বাভাবিক আগ্রহ জন্মিবে। কিন্তু জনসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কাজ করিতে গেলে পল্লীবাসীর ঔদাসীন্য ঘুচিবে বলিয়া মনে হয় না এবং তাহার ফলও তাদৃশ সুন্দর হইবে না। পল্লী সংগঠনকারীদের সুতরাং প্রধান কাজ হইবে—পল্লীবাসীদের মনে সংগঠন কার্য্যে একটা interest create করা। এই আগ্রহটি জন্মাইয়া দিতে পারিলে কাজ কতকটা automatically অর্থাৎ স্বয়ং চালিত ভাবে চলিবে, এখন কর্ম্মীরা উপদেশ ও পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিলেই হইবে। সর্ব্বাগ্রে পল্লীবাসীদের জড়তা দূর করা আবশ্যক—এইটী মনে রাখিয়া কর্ম্মীগণকে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে হইবে।

কালাজ্বর কনফারেন্স—

কয়েক দিন ধরিয়া লাট প্রাসাদে কালাজ্বর কনফারেন্সের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গেল। লাট সাহেব এই কনফারেন্সের উদ্বোধন করেন। পরে স্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্টার মহাশয় সভায় কালাজ্বরের সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করেন। কনফারেন্সটি বেসরকারী কনফারেন্স হইলেও সদাশয় গবর্মেণ্ট কনফারেন্সকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন কালাজ্বরের ইতিহাস, দেশময় ইহার বিস্তৃতি আসামের কালাজ্বর, বাঙ্গলার কালাজ্বর কালাজ্বরে অসংখ্য লোকক্ষয় প্রভৃতি বহুবিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। গবর্মেণ্ট কনফারেন্সকে আশ্বস্ত করিয়াছেন যে সরকারী কর্ম্মচারীদের চেষ্টায় কালাজ্বর সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে ইহার ফলপ্রদ চিকিৎসা প্রণালী ও ঔষধাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গবর্মেণ্ট এইবার বেসরকারী চিকিৎসকগণকে কালাজ্বরের চিকিৎসাপ্রণালী শিখাইয়া দিবেন এবং সরকারের সংগৃহীত তথ্য সকল তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিবেন। তারপর দেশ হইতে কালাজ্বর তাড়াইবার ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু গবর্মেণ্টের সকল কাজেই যেরূপ দীর্ঘসূত্রিতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে, কবে দিনে যে সরকারের প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের মনে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কালাজ্বরের ত একরকম ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। কিন্তু ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইতেছে? তাহাও কি কোন প্রতিষেধক উপায় অবলম্বিত হইবে না?

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৪শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৩২ সাল { ৯ম সংখ্যা

স্বাস্থ্যকর গৃহ ও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য

সুখে স্বচ্ছন্দ দীর্ঘায়ু হইয়া জীবন যাপন করিতে হইলে ব্যক্তিগত ও শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করার ব্যবস্থা করা যেমন দরকার সেইরূপ যে গৃহে বাস করা যায় সেই গৃহের স্বাস্থ্য এবং পরিবারের অপরাপর ব্যক্তিগণের শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করার ব্যবস্থা করা তদপেক্ষা একটুও কম প্রয়োজনীয় নহে। 'স্বাস্থ্য সমাচারে' ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের কথার প্রায়ই আলোচনা হইয়া থাকে। কিন্তু বাসগৃহের স্বাস্থ্য রক্ষার কথার যথোচিত আলোচনা হয় না অথচ ইহা খুবই আবশ্যক।

সহর অঞ্চলে বাসগৃহের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য মিউনিসিপ্যালিটীর কড়া আইন আছে। তদনুযায়ী সহরের বাসগৃহ সকল নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পল্লী অঞ্চলে সকল স্থলে মিউনিসিপ্যালিটীও নাই যেখানে আছে সেখানেও স্বাস্থ্যকরভাবে বাসগৃহ নির্ম্মাণ সংক্রান্ত আইন তেমন কঠোরভাবে পরিচালন করা হয় না। সুতরাং যাহার যে ভাবে ইচ্ছা ও সুবিধা সে সেই ভাবে গৃহ নির্ম্মাণ করে। তার পর নূতন নূতন প্রয়োজনের খাতিরে নূতন নূতন অংশ পুরাতনের সঙ্গে সংযোজিত হইয়া থাকে। এই ভাবে পল্লীগ্রামে বাসগৃহের যেরূপ পরিণতি ঘটিয়া থাকে তাহার ফলে পরিণামে বাস গৃহগুলি অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিবার খুবই সম্ভাবনা।

উন্নতিশীল দেশসমূহে কি সহরে কি মফস্বলে স্বাস্থ্য সম্মত বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতে লোককে বাধ্য করিবার জন্য অনেক কঠোর আইনকানুন প্রচলিত আছে এবং সেই সকল আইন কঠোরভাবে পরিচালিত হয়। আইনের সহস্র বিধি নিষেধের দরুণ লোকে ইচ্ছামত ও সুবিধামত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে না পারিয়া বিরক্ত হয় বটে কিন্তু পরিণামে দেখা যায় কঠোর আইনের ব্যবস্থার ফলে সমাজের মঙ্গলই হইয়া থাকে। আইন পরিচালিত হইবার পূর্ব্বে যত্র তত্র যেমন তেমন ভাবে

গৃহ নির্ম্মাণের ফলে সাধারণের মধ্যে বিবিধ রোগে মৃত্যু সংখ্যা যেরূপ ছিল আইন পরিচালিত হইবার পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই দেখা যায় যে সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে মৃত্যু সংখ্যাও যথেষ্ট কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিলাতে ১৮৭১ ৮ সালে হাজার করা ২১ জনের মৃত্যু হইত ১৯২৪ সালে ঐ সংখ্যা হাজার করা ১২ দাঁড়ায়। সেইরূপ ১৮৭১ ৮ সালে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা ছিল হাজারকরা ৪ ১৯২৪ সালে দাঁড়ায় ৭৫। এ সকলই আইন পরিচালনের সুফল বলিতে হইবে। অন্যান্য রোগেও মৃত্যু সংখ্যা এই অনুপাতে কমিয়া গিয়াছে।

এই আইন অনুসারে প্রধানত বাসগৃহের স্বাস্থ্য রক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। গৃহের আয়তন প্রত্যেক গৃহের লোক সংখ্যা জল সরবরাহ জল নিকাশ আবর্জ্জনা স্থানান্তর করা খাদ্যদ্রব্যের বিশুদ্ধিতা রক্ষা সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র করা প্রভৃতি বিষয়ে আইনে বিশেষ রকমের ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া প্রসূতি ও নবজাত শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা স্কুলের ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং যৌনরোগ ও যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের উপর দৃষ্টি রাখাও আইনের অন্তর্গত বিষয়।

প্রত্যেক মানুষের দেহের মধ্যেই রোগ প্রতিষেধক একটা বিশেষ এবং স্বাভাবিক শক্তি আছে। সেই শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখাই পূর্ণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সেই শক্তি ক্ষুণ্ণ হইলে অর্থাৎ কমিয়া আসিলে শরীর সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং শরীরের এই অবস্থাটিকে অস্বাস্থ্যের পূর্ব্ব সূচনা বলিতে হইবে। মানব দেহের রোগ প্রতিষেধক শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকা তাহার বাস গৃহের স্বাস্থ্যের উপর প্রধানত নির্ভর করে। অর্থাৎ বাসগৃহ স্বাস্থ্যকর হইলে ঐ শক্তি পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে। আর বাসগৃহ অস্বাস্থ্যকর হইলে ঐ শক্তিও কমিয়া যায়।

কিরূপ গৃহকে স্বাস্থ্যকর বলা যায়? যে গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা আছে যথায় সূর্য্যকিরণ বাধা পায় না, যে গৃহে বিশুদ্ধ জল ব্যবহৃত হয়, যে গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যে গৃহের আসবাবপত্র সুশৃঙ্খলে সুন্দরভাবে সজ্জিত যেখানে বিশুদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবহৃত হয় তাহাই স্বাস্থ্যকর গৃহ। যে গৃহ সুনির্ম্মিত যে গৃহের মেঝে বা দেওয়াল ভিজা স্যাঁৎসেঁতে নয়—শুষ্ক, খট্‌খটে যে গৃহে মশা মাছি পোকা মাকড়ের উপদ্রব নাই যে গৃহের জলনিকাশের সুবন্দোবস্ত আছে তাহাকেই স্বাস্থ্যকর গৃহ বলা যাইতে পারে। যে গৃহের চারিদিকের স্থানবেষ্টনী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আবর্জ্জনা ও ধূলিবর্জ্জিত যেখানে যাতায়াতের পথঘাট সুনির্ম্মিত যথায় বর্ষাকালে জল জমে না আগাছা গুল্ম বা ক্ষুপ বৃহৎ বৃক্ষ যে গৃহে বায়ু ও আলোক প্রবেশের ব্যাঘাত জন্মায় না তাহাই আদর্শ বাসগৃহ।

বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিবার সময় অনেক দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয় অনেক বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। আবার সকল সময়ে নূতন বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিবার সুবিধা হয় না—পূর্ব্বে নির্ম্মিত গৃহ যেমন অবস্থায় পাওয়া যায় সেইরূপ অবস্থায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ স্থলে এই সকল তৈরী বাড়ী স্বাস্থ্যকর কি না তাহা বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োজনীয় সংস্কারাদি করিয়া লইতে হয়। কলিকাতার মতন সহরে অল্প পরিমিত স্থানে অনেক লোককে বাস করিতে বাধ্য হইতে হয়। এখানে নানা কারণে বাড়ীঘর খরিদ বিক্রী হইয়া থাকে। তা ছাড়া অনেক ভাড়াটে বাড়ীও আছে। যাঁহারা কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করেন তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে বাড়ী বদলাইতে হয়। জমি কিনিয়া নূতন বাড়ী তৈয়ার করিয়াও অনেকে বাস করেন। তবে সহরে বাসগৃহ নির্ম্মাণোপযোগী জমির পরিমাণ এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। খালি জমি আর নাই বলিলেই হয়। আর, থাকিলেও তাহা পরিমাণে এত কম যে স্থানের সঙ্কীর্ণতাবশত মনের মত বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিবার সুবিধা খুব কম। কাজেই বাসগৃহগুলি যেমনভাবে পাওয়া যায় সেইভাবে গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

প্রায়ই দেখা যায়, বাড়ী কিনিয়া বা ভাড়া করিয়া

বাস করিতে গেলে নূতন গৃহস্থকে প্রথম প্রথম কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। পূর্ববর্ত্তী বাসিন্দা—তিনি বাড়ীর মালিকই হউন কিম্বা ভাড়াটিয়াই হউন পরবর্ত্তীর জন্য বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া যাইবার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে বাড়ীর স্বাস্থ্য রক্ষায় উদাসীন হইয়া পড়েন। হয় ত গৃহ কোণে বা উঠানে অথবা সিঁড়ির নীচে স্তূপাকার আবর্জ্জনা জমিয়া থাকে। হয় ত ড্রেন আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইয়া জলনিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া থাকে। হয় ত ছাদের নর্দ্দমা এমনভাবে বুজিয়া গিয়াছে যে একটু বৃষ্টি পড়িলেই ছাদে জল দাঁড়ায়। হয় ত দেওয়ালে অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়া দেওয়ালগুলিকে ভিজা স্যাঁৎসেঁতে করিয়া ফেলিয়াছে। নূতন বাসিন্দাকে প্রথমে এই সকল অসুবিধা দূর করিয়া গৃহখানিকে স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিতে হইবে তবে তিনি সেই বাড়ীতে বাস করিতে পারিবেন। নচেৎ তাঁহার পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। যদি আইনের বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে কলিকাতা সহরের অধিকাংশ বাড়ীই আইনানুমোদিত ভাবে স্বাস্থ্যকর নহে। বাসগৃহের অবস্থা স্বাস্থ্যকর কি না তাহা পরিদর্শনের ভার যে সকল কর্ম্মচারীর উপর অর্পিত আছে সেই সকল স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীরা যদি কোন বাড়ী পরিদর্শন করিতে আসেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন অধিকাংশ বাড়ীই একেবারে বাসের অযোগ্য। আবার এই সহরে এমন অনেক পুরাতন বাড়ী আছে গৃহস্বামী সযত্নে তাহার বাহ্য আবরণ বালি ধরাইয়া চুণকাম করাইয়া এমনভাবে সুদৃশ্য করিয়া রাখিয়াছেন যে বাহির হইতে তাহার কোন ত্রুটি সহজে ধরা পড়ে না কিন্তু সেই বাড়ীতে নূতন কোন পরিবার বাস করিতে আসিলে দুই চারি দিনের মধ্যেই সেই বাড়ীর অস্বাস্থ্যকর অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। বাড়ীগুলি কেবল যে অস্বাস্থ্যকর, তাহা নয়—বিপজ্জনকও বটে। কোন কোন বাড়ীর অবস্থা এমন যে কখন ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। এরূপ বাড়ীতে প্রাণ হাতে করিয়া বাস করিতে হয়। সময় সময় এমন অবস্থা ঘটে যে বড় রাস্তা দিয়া যে সকল ভারী মোটর লরী রাস্তা কাঁপাইয়া যাতায়াত করে তাহাদের সেই কম্পনের ফলে ঐ রাস্তার ধারে কোন কোন পুরাতন বাড়ী ভূমিসাৎ হয়। আবার বর্ষাকালে উপর্য্যুপরি দুই চারি দিন একটু চাপিয়া বৃষ্টি পড়িলেই অনেক বাড়ী পড়িয়া যায়। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ছাড়া এই সকল বাড়ীতে স্বাস্থ্য হানির বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখা যায়। কারণ এইরূপ পুরাতন বাড়ীতে উই ইঁদুর, আরশুলা, মশা, মাছি, ছারপোকা পিপীলিকা বিছা এবং সময়ে সময়ে সর্পেরও উপদ্রব হইয়া থাকে। কীটপতঙ্গাদি অসুবিধার কারণ ত বটেই অধিকন্তু ইহারা অনেক রোগেরও বাহন। আবার পুরাতন বাড়ীর ড্রেন প্রায় ভাল অবস্থায় থাকে না। ফলে টাইফয়েড ডিপথিরিয়া বসন্ত কলেরা প্লেগ প্রভৃতি মারাত্মক রোগের বীজ ড্রেনের ভিতর মৌরসী পাট্টা লইয়া বসবাস করে। নূতন পরিবার এরূপ বাড়ীতে বাস করিতে আসিলে প্রথম প্রথম তাঁহাদের রোগাক্রান্ত হইবার আশঙ্কা অধিক থাকে। এই বাড়ীতে acclimatized হইতে অর্থাৎ সেই বাড়ীর আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে তাঁহাদের কিছু সময় লাগে।

তা ছাড়া অল্প স্থানে অধিক সংখ্যক লোক বাস করিতে বাধ্য হওয়ায় বাড়ীগুলি বড় ঘেসাঘেসি করিয়া নির্ম্মিত। আলো ও বায়ু প্রবেশের স্থান নাই বলিলেই হয়। বাড়ীতে উঠান প্রায় থাকে না—থাকিলেও অতি ছোট। কাজেই ঘরগুলি অন্ধকার ও বায়ু চলাচলের অভাবে ড্যাম্প বা স্যাঁৎসেঁতে। সহরের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ইহার প্রতিকারের জন্যই ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সহর কতকটা পরিষ্কার ও খোলা হইয়া আসিয়াছে। তথাপি এখনও বহু সংখ্যক বাড়ী স্বাস্থ্যানুমোদিত অবস্থায় নাই। বাড়ী হঠাৎ ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া তৈয়ার করিয়া লওয়া সুবিধাজনক নহে। সুতরাং বাড়ীগুলি যেমন অবস্থায় আছে উহারই মধ্যে যতটা পারা যায়, উহাদের

যথাসাধ্য সংস্কার করিয়া এবং স্বাস্থ্যানুমোদিত ব্যবস্থা করিয়া ঐগুলিকে বাসযোগ্য ও নিরাপদ করিয়া তুলিতে হইবে।

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কাজ ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। সহরের অনেক ঘন বসতি পূর্ণ পল্লীর অস্বাস্থ্যকর বাড়ী গুলি ভাঙ্গিয়া নূতন নূতন রাস্তা নির্ম্মিত হওয়ায় সহরের মধ্যভাগ কতকটা ফাঁকা হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল বাড়ীতে পূর্ব্বে যাহারা বাস করিত তাহারা সহরের উপকণ্ঠে ছড়াইয়া পড়িতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল সীমানার বাহিরে অনেক বাগান ও বাগান বাটী ছিল। এখন সে সকল উদ্যানের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। প্রায় সেই সব স্থলে নূতন নূতন কোটা বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে। আজ কাল অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব নূতন যায়গায় লোকে যে সকল বাড়ী তৈয়ার করিতেছে তাহা কতকটা স্বাস্থ্যানুকূল হইলেও যাহাদের অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নহে তাহাদের পূর্ব্বস্বভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইতেছে না। তাহারা সেই অল্প কিঞ্চি জমিতে বহু পরিবারের বাসোপযোগী আলো বাতাস শূন্য ক্ষুদ্র অপরিসর অস্বচ্ছ গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের আলোকে কলিকাতার ন্যায় প্রধান সহরে নূতন যে সকল বাড়ী তৈয়ার হইতেছে সেগুলি এমন ভাবে নির্ম্মিত হওয়া আবশ্যক যেন বৎসর কয়েক পরেই সেগুলি আবার অস্বাস্থ্যকর না হইয়া পড়ে যাহাতে দ্বিতীয় ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। এখন এমন ভাবে বাড়ী তৈয়ার করিবার অনুমতি দিতে হইবে যেন ছোটই হউক আর বড়ই হউক প্রত্যেক বাড়ীর চারিদিকে যথেষ্ট খোলা জমি থাকে এবং জমির আয়তনের অনুপাতে ঘরের সংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকে। বাস গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে ইয়োরোপীয়ানদের রুচি সুন্দর ও স্বাস্থ্যানুকূল। তাই সহরের সাহেবপাড়ার বাড়ীগুলির চারিদিকে কিছু না কিছু খোলা জমি থাকে ঘরগুলিও বড় বড়, তাহাতে যথেষ্ট সংখ্যক জানালা দরজা থাকে এবং বায়ু ও আলো ভালরকমই খেলে। ইহাদের সুন্দর ব্যবস্থা দেখিয়া বাসগৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে আমাদের শিক্ষা লাভ করা উচিত।

কলিকাতা নগর অতি অল্প সময়ের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। নানাসূত্রে দেশের সকল স্থান হইতে বহু লোক আকৃষ্ট হইয়া সহরে বাস করিতে আসিয়াছে। তাই কলিকাতা সহর যদৃচ্ছাক্রমে বাড়িয়া উঠিয়াছে। এবং সেই জন্য এখানে বাড়ীগুলি অত্যন্ত গায়ে গায়ে নির্ম্মিত খোলা জায়গার অত্যন্ত অভাব এবং অল্প স্থানে অনেক বেশী লোক বাস করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু বঙ্গদেশে কলিকাতা ছাড়া আরও অনেক সহর আছে। সেই সকল সহরের বাড়ীগুলি এত ঘেসাঘেসি ভাবে নির্ম্মিত নহে। প্রায় বাড়ীর চারিদিকে কিছু খালি জমি বা বাগান থাকে। তবে এই সকল স্থলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার দোষে বাড়ীগুলি তেমন স্বাস্থ্যকর নয়। যত্নের অভাবে বাগানগুলি প্রায় জঙ্গলে পরিণত। জল নিকাশের সুব্যবস্থার একান্ত অভাব। আবর্জ্জনা প্রায় বাড়ীর নিকটেই নিক্ষিপ্ত হয় সেগুলি স্থানান্তর করিবার সুব্যবস্থা নাই। যে সকল সহরে জবরদস্ত অল্পবিত্ত মিউনিসিপ্যালিটী আছে সেই সকল মিউনিসিপ্যালিটী অর্থ লোভে সহরের আবর্জ্জনা গৃহস্থ লোকদের বিক্রয় করিয়া থাকে। ঐ আবর্জ্জনা ক্রেতার গৃহ সংলগ্ন উদ্যানে জমির সার রূপে ব্যবহৃত হয়। বলা বাহুল্য আবর্জ্জনা সার হিসাবে যতই মূল্যবান হউক বাসগৃহের নিকটস্থ উদ্যানে তাহা সার রূপে ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। যদি আবর্জ্জনার সার ব্যবহার করিতেই হয় তবে তাহা লোকালয় হইতে দূরবর্ত্তী কৃষি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইতে পারে।

সহর অঞ্চলের বাসগৃহগুলি দুই কারণে অস্বাস্থ্যকর হইতে পারে। প্রথম গৃহনির্ম্মাণের দোষে। দ্বিতীয় বাটীর স্থায়ী বা অস্থায়ী অধিবাসীদের অবজ্ঞা অবহেলা উপেক্ষা অনভিজ্ঞতা, অভাব প্রভৃতি কারণে। প্রথম দোষটী নানাকারণে প্রায় অপরিহার্য্য। অল্প চেষ্টায় যদি তাহা সংশোধিত করিবার সুযোগ থাকে, ভালই। নচেৎ সহ্য করিয়া যাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই। কিন্তু

বাড়ীর বাসিন্দাদের ব্যবহারের দোষে যে অস্বাস্থ্যকর অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহা সংশোধনাতীত নহে এবং তাঁহাদের সংশোধন না হওয়াই অন্যায়। গৃহস্বামীর মূর্খতা বা অজ্ঞতার দরুণ বাসগৃহ অস্বাস্থ্যকর হইলে তাহাকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। স্বাস্থ্যকর আচার ব্যবহার পালন না করার দরুণ তাহাদের নিজেদেরই যে স্বাস্থ্যহানি ঘটে তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিলে তাহারা নিজেরাই সংশোধন করিয়া লইতে পারে। কিন্তু তাহা তাহারা করিতে না চাহিলে আইনের দ্বারা তাহাদিগকে বাধ্য করা আবশ্যক। মিউনিসিপ্যালিটীর স্বাস্থ্য কর্ম্মচারীদের মধ্যে মধ্যে সহরের বাড়ীগুলি পরিদর্শন করিয়া অস্বাস্থ্যকর অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাহা সংশোধনের জন্য বন্ধুভাবে গৃহের অধিবাসাদের উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য। কেবল উপদেশ দিলেই যথেষ্ট হইবে না এটি সংশোধনের উপায় আবিষ্কার করিয়া তাহাও গৃহস্বামীকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এবং তাহা যত অল্পব্যয়সাধ্য হয় সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গৃহস্বামীর আচার ব্যবহারের ত্রুটিতে তাহার স্বাস্থ্যের কি ক্ষতি বৃদ্ধি হইতেছে তাহা বুঝাইয়া দিতে পারিলে গৃহস্বামী সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু খরচ পত্র করিয়া ভবিষ্যতে প্রচুর ডাক্তার ও ঔষধের খরচ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে।

আমাদের দেশে সামাজিক রীতি নীতি আচার ব্যবহারের উপর গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী কিয়ৎ পরিমাণে নির্ভর করে। অবরোধ প্রথার অনুসরণ করিয়া শুদ্ধান্ত পুরমহিলাগণকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার জন্য, যাহাতে সূর্য্যও পুরস্ত্রীবর্গকে দেখিতে না পান এমনভাবে গৃহ নির্ম্মাণ করা হয়। সেই জন্য অন্তঃপুরিকাগণের একটী বিশেষণেরই সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে যে তাঁহারা "অসূর্য্যম্পশ্যরূপা"। সম্ভ্রান্ত ধনী সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রকাণ্ড ইমারত মহা আড়ম্বর সহকারে নির্ম্মাণ করেন বটে, এবং গৃহ নির্ম্মাণে ও তাহার সাজসজ্জায় যথেষ্ট অর্থ ব্যয়ও করেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সকল অট্টালিকাকে স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল কোন ক্রমেই বলা চলে না। জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে এক একজনের গৃহ দুই দশ বিঘা জমির উপর নির্ম্মিত দেউড়ী, কাছারী বৈঠকখানা, চণ্ডীমণ্ডপ, সদর মহল, অন্দর মহল, ঠাকুরবাটী প্রভৃতি অসংখ্য অট্টালিকা পাশাপাশি বা কাছাকাছি নির্ম্মিত হয়। মহলের পর মহল, সারি সারি কক্ষশ্রেণীর পর কক্ষশ্রেণী। কিন্তু তাহাতে যথেষ্ট ও যথেচ্ছ পরিমাণে সূর্য্যকিরণ ও বায়ু প্রবেশের অধিকার থাকে না।

মফস্বলে ধনী সম্প্রদায়ের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য যথেষ্ট জমির অভাব নাই। সুতরাং তথায় কক্ষ ও প্রকোষ্ঠগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র না হইতেও পারে। কিন্তু বিলাসিতার আকর্ষণে সহরের প্রলোভনে পড়িয়া তাঁহারা যখন পল্লীবাস ছাড়িয়া সহরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনও তাঁহারা পরিবার বর্গের অবরোধ বজায় রাখিয়া এবং পদোচিত মর্য্যাদা ও আশ্রিত এবং আত্মীয় স্বজনগণের বাসোপযোগী বহু কক্ষ সমন্বিত অট্টালিকা সকল সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হওয়ায় সহরের অট্টালিকাগুলি আরও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। সহরের বাটীর কক্ষগুলি ক্ষুদ্র, প্রাঙ্গণ ও অঙ্গন অতি সঙ্কীর্ণ হইতে লাগিল। তাহার উপর ত্রিতল চৌতল পঞ্চতল অট্টালিকা সমূহ নির্ম্মিত হওয়ায় বায়ু ও আলোকের আরও অভাব হইয়া পড়িল।

পূর্ব্বকালে, যখন লোকে স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারিত না, কেবল অবরোধ প্রথার অনুসরণ করিয়া চলিত, এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই যেখানে সেখানে যেমন তেমন ভাবে গৃহ নির্ম্মাণ করিত, ভবিষ্যতের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবিয়া দেখিত না, কোনরূপ বিচার বিবেচনা করিত না, সেরূপ ভাবে গৃহ নির্ম্মাণ এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকিত যুগে আর চলিতে পারে না। এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে সকল গৃহ এখনও বর্ত্তমান আছে সেগুলিকে যতদূর সম্ভব এখনকার

কালের উপযোগী করিয়া সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। যেগুলি খুব পুরাতন হইয়া গিয়াছে, সেগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে পারিলেই ভাল হয়। অধুনা প্রায় সকল সহরেই এবং কোন কোন বড় গ্রামেও মিউনিসিপ্যালিটী আছে। মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে কতকগুলি স্বাস্থ্যকর নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু এই সকল মিউনিসিপ্যাল আইনও আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয় কারণ তাহা হইলে কলিকাতা বোম্বাই প্রভৃতি সহর এত অস্বাস্থ্যকর হইত না, এবং ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টেরও প্রয়োজন হইত না। তা ছাড়া, কেবল নির্ম্মাণ করিবার দোষেই যে বাসগৃহ অস্বাস্থ্যকর হয় তাহাও নয়। বাড়ী পুরাতন হইয়া গেলে, যথা সময়ে তাহার উপযুক্তরূপ সংস্কারাভাবেও বাসগৃহ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে এবং গৃহস্বামীকে অন্যান্য নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাসগৃহের এইরূপ কতকগুলি ত্রুটি আমরা নিম্নে দেখাইয়া দিতেছি। এগুলির সংশোধন না হইলে বাড়ীর লোকদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে না, অসুবিধারও সীমা থাকে না—

উঠান।—অনেক বাড়ীর উঠানের স্থানে স্থানে সিমেণ্ট, কংক্রিট প্রভৃতি উঠিয়া গিয়া স্থানে স্থানে গর্ত্ত হইয়াছে। উঠান ধুইবার সময় কিম্বা বর্ষাকালে এই সব গর্ত্তে জল জমিয়া থাকে, ঝাটা দিয়া ঝাটাইয়া এই জল সম্পূর্ণরূপে বাহির করিয়া দেওয়া যায় না। সেই জন্য বারসরা উঠান ও ঘরের মেঝে স্যাঁতসেঁতে হইয়া পড়ে। ক্রমে সেখানে পাঁক জমে এবং নানা রোগের বীজ তথায় আশ্রয় লইয়া থাকে। এইগুলি মেরামত করিতে হইবে—স্বাস্থ্যের জন্যও বটে, অসুবিধার প্রতিকারের জন্যও বটে। কারণ, এই সকল গর্ত্তে পা পড়িয়া সময়ে সময়ে আঘাত লাগিতেও পারে।

ছাদ।—ছাদ ফাটিয়া কিম্বা ছাদের কংক্রিটের খোয়া উঠিয়া গিয়া অথবা টালি আল্‌গা হইয়া কিম্বা ছাদের কড়ি বরগা পচিয়া গিয়া বর্ষাকালে ছাদ দিয়া জল পড়িয়া ঘরের জিনিস পত্র বিছানা ইত্যাদি ভিজিয়া যাইতে পারে। ইহা কেবল যে অসুবিধাজনক ও অস্বাস্থ্যকর, তাহা নহে—বিপজ্জনকও কম নয়। অল্পস্বল্প ফাটা হইলে পিচ গরম করিয়া ঢালিয়া দিয়া ফাট মেরামত করা যাইতে পারে। কিন্তু বেশী রকম ফাট ধরিলে উত্তমরূপে মেরামত না করিলে চলে না। পচা কড়ি বরগা না বদলাইলে কোন্ দিন ছাদ ভাঙ্গিয়া মাথায় পড়ে তাহার কিছুই ঠিক নাই। বালির চাপও যখন তখনই মাথায় পড়িতে পারে।

দেওয়াল।—দেওয়াল পুরাতন হইয়া গেলে তাহার বাহিরের ভিজা বায়ুর গতি রোধ করিবার শক্তি থাকে না। অনেক সেকেলে বাড়ীর দেওয়াল মাটীর গাঁথুনি। এ সকল দেওয়াল সহজেই বায়ুমণ্ডল হইতে জল টানিয়া ভিজিয়া উঠে। তা ছাড়া পুরাতন দেওয়াল বিছা, ইঁদুর, সর্প ও অন্যান্য কীট পতঙ্গের আশ্রয়। এরকম দেওয়াল বদলাইয়া ফেলিতে পারিলেই ভাল। অন্তত ভিতরে বাহিরে উত্তমরূপে বালি ধরাইয়া চুণকাম করাইয়া রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ঘরের মেঝে।—উঠানের ন্যায় অনেক ঘরের মেঝেতেও গর্ত্ত হয়। ইহাও কম অস্বাস্থ্যকর নয়। তা ছাড়া অসুবিধাও বিস্তর। চলাফেরার অসুবিধা ত আছেই, তাহার উপর ঘর নিয়ত অপরিষ্কার থাকে যতই ঝাট দাও বা ধোও ধুলা বালি কাদা জমিয়া থাকিবেই, কোন মতেই সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা যায় না। মেরামত না করিলে এ ঘরে বাস করিতে অনেক দুঃখ পাইতে হয়।

সিঁড়ি। বহুদিনের ব্যবহারে সিঁড়ির গাঁথুনির ইঁট প্রায় অর্দ্ধেক ক্ষয় হইয়া যাওয়াতে অনেক সময়ে পড়িয়া গিয়া হাত পা ভাঙ্গিতে পারে। সিঁড়ির ধারে যদি রেলিং থাকে তবে তাহা ভাঙ্গিয়া গেলে শিশুদের পড়িয়া গিয়া হাত পা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা।

জানালা। জানালার চৌকাঠ বা কপাট পচিয়া ভাঙ্গিয়া গেলে জানালা ভাল করিয়া বন্ধ করা যায় না। যদি খড়খড়ি হয় তবে হয় ত তাহার পেনেল ভাঙ্গিয়াছে

কিম্বা সার্সির কাঁচ ভাঙ্গিয়াছে অথবা কপাটের কবজা ভাঙ্গিয়াছে। এগুলা দেখিতে যেমন বিশ্রী, তেমনি স্বাস্থ্যহানিকর ও অসুবিধাজনক।

দরজা। দরজার চৌকাটের নীচের দিকের কাঠ প্রায়ই পচিয়া ক্ষইয়া গিয়া কপাট এমন ভাবে নামিয়া যায় যে, কপাট প্রায় বন্ধ করা যায় না। কবজা ও খিলও প্রায় ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

রান্নাঘর। আমাদের দেশে রান্নাঘরের বড় দুর্দ্দশা। ধূম নির্গমনের জন্য চিমনীর ব্যবস্থা প্রায় কোন গৃহস্থ ঘরেই থাকে না। উনুনে আগুন দিলে সেই ধোঁয়া ঘরের ভিতর জমিয়া দেওয়ালগুলি বিশ্রী কালো হইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে সেই কালো বিশ্রী ঝুল ভিজিয়া ঈষদারক্ত জল খাদ্য দ্রব্যের উপর পড়িয়া খাদ্য দূষিত হয়। দুধ ত প্রায়ই নষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন বাড়ীতে রান্নাঘরের ধূম বাহির হইবার জন্য ছাদের নীচে দেওয়ালের গায়ে ঘুলঘুলি থাকে। কোন বাড়ীতে ছাদের উপরই ধূম নির্গমনের পথ থাকে। এরূপ ব্যবস্থা ভাল। কিন্তু প্রায় দেখা যায় বাড়ী তৈয়ার করিবার সময় যে ঘরটা রান্নাঘররূপে ব্যবহার করিবার জন্য এইরূপ ধূম নির্গমনের পথ রাখা হইয়াছিল, কালক্রমে প্রয়োজনানুরোধে সেই ঘর অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতেছে, এবং রান্নাঘর অন্যত্র সরাইয়া লওয়া হইয়াছে, যেখানে এরূপ সুব্যবস্থা নাই। এরকম রান্নাঘরের ঝুল ও ময়লা নিয়মিত ভাবে মধ্যে মধ্যে ঝাড়িয়া ফেলা উচিত।

নর্দ্দমা। অনেক পুরাতন বাড়ীর নর্দ্দমার গাঁথুনি ভাঙ্গিয়া ক্ষইয়া কিম্বা অন্য কারণে জল নিকাশ ভালরূপ হয় না। এ সকল বাড়ী ডিপথিরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের খনি। নর্দ্দমা সর্ব্বদা মেরামত অবস্থায় রাখা আবশ্যক। বিলাতী মাটি দিয়া উত্তমরূপে পলস্তরা করিয়া না রাখিলে সে বাড়ীর গৃহস্থকে অনেক দুঃখ পাইতে হয়। রোগ সে বাড়ীতে লাগিয়াই থাকে।

পায়খানা। এখন কলিকাতায় প্রায় সকল বাড়ীতেই ড্রেনের পায়খানা হইয়াছে। ইহাতে স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকিবার কথা। কিন্তু পায়খানা ঠিক মেরামত অবস্থায় থাকা চাই। ট্যাঙ্ক হইতে রীতিমত জল যেন বাহির হয় ও রোজ যেন ধোওয়া হয়। মফস্বলের সহরে এখনও খাটা পায়খানা আছে। সেগুলা প্রায়ই উপেক্ষিত হইয়া থাকে। গামলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নর্দ্দমা বুজিয়া গিয়াছে দেওয়ালের বালি খসিয়াছে, কিম্বা ছাদ দিয়া জল পড়ে। এগুলি মেরামত করা দরকার।

গার্লী। বৃষ্টির জল বা ঘরের ব্যবহৃত ময়লা জল বাহির হইবার গার্লী ঠিক মেরামত অবস্থায় রাখা আবশ্যক। ভাঙ্গিয়া গেলে বদলাইয়া ফেলা উচিত।

ইক্ষু (Sugarcane)

[শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার]

শর্করা (চিনি)—Saccharum officinasum নানা জাতীয় উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন হয়। আরবী ও পারসীতে চিনির নাম শকর গ্রীকে সাক্কারণ (Sakcharon) সংস্কৃতে শর্করা, এবং ইংরাজীতে সুগার (Sugar) নাম শর্করারই অপভ্রংশ। সর্ব্বাদৌ ভারতবর্ষে ইক্ষুচিনির ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপরে চীন পারসীক আরব ও রোমান জাতিরা ইহার তথ্য অবগত হয়। কথিত আছে, মহাবীর অলীকসুন্দরের (Alexander) দিগ্বিজয়

কালে গ্রীকেরা ভারতবর্ষে আগমন করিলে সর্ব্বপ্রথম বৃক্ষদণ্ডের (ইক্ষুদণ্ড) মধ্যে মধুর ন্যায় মিষ্ট রস দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। সম্রাট নিরোর রাজত্বের অনেক পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জাতীয়েরা চিনির ব্যবহার করিত কিন্তু বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইংরাজেরা চিনির অধিক ব্যবহার করিত না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভিনিসই (Venice) ইয়ুরোপের প্রধান চিনির বন্দর ছিল।

ইক্ষু বিট খর্জ্জুর তাল আরেঙ্গা (Aranga) ক্যারিওটা (Caryota) নারিকেল মহুয়া মেপল্ (Acer) ভুট্টা নীল এবং নিম্ব প্রভৃতি উদ্ভিদ হইতে চিনি পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাদিক্রমে চিনির উৎপন্নের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতে ক্রমশ অল্প। অধুনা ইক্ষু পৃথিবীর সকল দেশেই জন্মিতেছে তন্মধ্যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ (West Indies) জামেকা (Jamaica) দক্ষিণ আমেরিকা (South America) ডেমারারা (Demarara) ফিজি (Fiji) জাভা (Java) প্রণালী উপনিবেশ (Strait Settlement) মরিসাস (Mauritius) প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক ধনী কোম্পানী ব্যবসায় হিসাবে ইহার প্রচুর চাষ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষ পারস্য (Persia) মিশর (Egypt) গ্রীস (Greece) ইতালি (Italy) ফ্রান্স (France) স্পেন (Spain) আমেরিকা (America) জাপান (Japan) চীন (China) ব্রহ্ম (Burma) প্রভৃতি দেশে যে চিনি উৎপন্ন হয় তাহা প্রায়ই তত্তৎ দেশীয় অধিবাসীদিগের ব্যবহারেই পর্য্যবসিত হয় অন্য কোন দেশে অধিক পরিমাণ রপ্তানী হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে আজকাল ইহার বিপরীত হইতেছে। ফ্রান্স (France) জার্ম্মানী (Germany) নেদারল্যাণ্ড (Netherland) ও অষ্ট্রীয়াতে (Austria) প্রচুর পরিমাণ বিট চিনি উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে ইক্ষু ব্যতীত খর্জ্জুর তাল নারিকেল বৃক্ষ হইতেও চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে খর্জ্জুর চিনির পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মহুয়া এবং নিম্ব হইতে চিনি বাহির হইলেও তাহার পরিমাণ অতি সামান্য। কেবল মাত্র মদ্য ও ঔষধের নিমিত্ত ব্যবহার হইয়া থাকে। এ দেশের খর্জ্জুরের ন্যায় সিংহলে ক্যারিওটা ইউরেনস্ (Caryota urens) এবং আন্দামান ও ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে আরেঙ্গা স্যাকারীফেরা (Arenga Saccharifera) নামক তাল জাতীয় দুই প্রকার এবং আমেরিকা ও জাপানে মেপল (Maple Acer) নামক উদ্ভিদ হইতেও চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে ত্রয়োদশ জাতীয় মেপল জন্মে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহাদের ভিতর হইতে চিনি বাহির করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। এই সকল উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। এজন্য ব্যবসায় হিসাবে ইহাদের চাষ লাভজনক নহে।

সর্ব্বপ্রকার চিনির মধ্যে ইক্ষু চিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নির্দ্দোষ ও স্বাস্থ্যের কোনরূপ হানিকর নহে। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইক্ষুরস, গুড় (মৎস্যণ্ডিকা) পাটালি ফানিত (বাতাসা) খণ্ড শর্করা সিতোপলা (মিছরি) প্রভৃতি এই কয়েকটী ইক্ষু বিকার উত্তরোত্তর গুণাধিক পিত্ত নাশক ও বলকর। চিনি বলিলেই আদিম উপায়ে প্রস্তুত শুভ্র দলুয়া চিনিই বুঝিতে হইবে। আমরা আজকাল যে সকল শুভ্র দানাদার বিলাতী আমদানী বিট বা ইক্ষু চিনি ব্যবহার করি তাহার মিষ্টত্বও কম অধিকন্তু তাহারা শরীরের পক্ষে অপকারক। আধুনিকেরা আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করিতে চাহেন না সুতরাং বিলাতী প্রমাণই উদ্ধৃত হইল, পাঠক তদ্দৃষ্টে দানাদার শুভ্র চিনির অপকারিতা বুঝিতে পারিবেন H Drury (ড্রুরি সাহেব) তাঁহার গ্রন্থে লিখিতেছেন— Sugar when simply sucked from the canes is highly nutritious The alimentary properties of sugar are much lessened by crystallisation The common brown sugar is more nutritious than what has been refined —To persons disposed to dyspepsia and bilious habits sugar in excess becomes

more hurtful than otherwise এ স্থলে Brown sugar অর্থে খাড় গুড় ও দৈবালাদি পরিষ্কৃত শর্করাই বুঝিতে হইবে দন্ত নিষ্পীড়িত ইক্ষুরস পানই সর্ব্বাপেক্ষা বলকারক।

অতি প্রাচীন কাল হইতে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ স্বীয় আবশ্যক মত চিনি উৎপাদন করিয়াও অতিরিক্ত অংশ বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে। কিন্তু বিগত ৩।৪ বৎসরের মধ্যে বিদেশী সুলভ চিনি আমদানী হইয়া দেশীয় চিনিকে বাজার হইতে বিতাড়িত করত দেশীয় ইক্ষুর চাষ ও চিনির ব্যবসায় লোপপ্রায় করিবার উপক্রম করিয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়—

১। আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা সভ্য ও সৌখীন হইয়াছি দেশীয় দোলো বা খাড় গুড়ে আমাদের তৃপ্তি হয় না সুতরাং দানাদার সাদা চিনির আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে।

২। ইক্ষুদণ্ড হইতে রস নিষ্পীড়ন এবং গুড় ও চিনি প্রস্তুত কালে পূর্ব্বতন অনুন্নত উপায়াবলি অনুসৃত হওয়ায় অনেক পরিমাণ চিনি নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য চিনির পরিমাণ অল্প হয় অথচ খরচা অধিক পড়ে কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে বিজ্ঞানসম্মত উন্নত প্রণালী অবলম্বিত হওয়ায় রসে চিনির ভাগ নষ্ট হইতে পায় না সুতরাং চিনি অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বিশেষত যন্ত্রবলে বৈদেশিক চিনির কারখানা চালিত হওয়ায় খরচা কম পড়ে এজন্য স্বল্পমূল্য বৈদেশিক চিনির আমদানী বাড়িতেছে।

৩। জার্ম্মাণীর রহিত শুল্ক ও রাজসাহায্য প্রাপ্ত— (Bountyfed) বিট চিনি সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে বাজারে বিক্রীত হওয়াতে ভারতের চিনি ত গিয়াছেই সঙ্গে সঙ্গে মরিসাসের ইংরাজী চিনির ব্যবসাও অবসন্ন হইয়াছে। তবে লর্ড কার্জ্জনের নূতন শুল্ক নিয়ম (Countervailing duty) প্রবর্ত্তিত হওয়ায় জার্ম্মাণীর বিট চিনির আমদানী রোধ হইলেও আবার মরিসাস ও জাভা চিনির আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। বরং এস্থলে স্বল্পমূল্য বিট চিনির আমদানীতে ভারতের কিছু লাভ আছে কিন্তু এই নূতন শুল্ক নির্দ্ধারণে ভারতের ক্ষতিই হইয়াছে। যদি মরিসাস বা জাভা চিনির উপর অতিরিক্ত মাশুল বসে তবেই ভারতীয় ইক্ষুর চাষ ও চিনির কারবার উন্নতি লাভ করিতে পারিবে নচেৎ নহে।

৪। বৈদেশিক চিনি মাত্রই কোন না কোন স্থানের মিষ্টরসপূর্ণ ইক্ষু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা অল্পব্যয়ে অধিক উৎপন্ন হয় বলিয়া ভারতীয় চিনি অপেক্ষা সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। শামসাড়া, হেমজা পুঁড়ী প্রভৃতি দেশীয় ইক্ষু এইরূপ মিষ্ট ও রসবহুল। সুতরাং ইহাদের চাষ বৃদ্ধি করিতে পারিলে দেশীয় চিনির ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইতে পারে।

আজকাল একটী জনরব উঠিয়াছে যে ভারতীয় ইক্ষু বিদেশীয় তাড়নে অবসন্নপ্রায় হইয়াছে ইহার চাষ লোপের বিলম্ব নাই সুতরাং বিদেশ হইতে নূতন বীজ আনাইয়া চাষ করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের জানা উচিত বিগত ৫।৬ বৎসর ধরিয়া বঙ্গ ও বিহার প্রদেশে নানা জাতীয় বিদেশী ইক্ষু পরীক্ষিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। কিন্তু পরীক্ষা এখনও সফল হয় নাই কদাচিৎ ২।১টা জাতি কষ্টে সৃষ্টে জীবন ধারণ করিতেছে। কিন্তু উন্নত উপায়ে চাষ করিতে পারিলে বিদেশী ইক্ষুর সমকক্ষতা করিতে পারে বিস্তৃত ভারত সাম্রাজ্য মধ্যে এমন অনেক জাতীয় উৎকৃষ্ট ইক্ষু আছে। আমাদিগকে কেবল উক্ত কয়েকটী কারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইক্ষুর উপযুক্ত স্থান নির্দ্ধারণ এবং গুড় ও চিনি প্রস্তুতের উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। কিছু সখের মায়াও কাটাইতে হইবে। তাহা হইলে আর আমাদিগকে অমেধ্য বিলাতী চিনির জন্য পরের দ্বারস্থ হইতে হইবে না অপিচ আমরা বিদেশে চিনি পাঠাইতেও সক্ষম হইব। কীট পতঙ্গ উই হাজা শুকা নানাবিধ রোগ ও অসাত্ম্য ভূমিতে রোপণ প্রভৃতি বিবিধ কারণে বিদেশী ইক্ষুর চাষ এ দেশে সফল হয় নাই পরীক্ষা করিতে করিতে যদি কোন উৎকৃষ্ট জাতীয় বৈদেশিক ইক্ষু এ দেশে সাত্ম্য হইয়া যায়, তবে

তদ্দ্বারা উপকার হইতে পারে। কিন্তু তাহার আশায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বিদেশীর আশা বৃথা। যদি কিছু হয় ত দেশ হইতেই হইবে।

ইক্ষু শর খাগড়া ইত্যাদির ন্যায় জলাভূমির উদ্ভিদ। শত ভাগ সরস ইক্ষুদণ্ড শুষ্ক করিলে ২৫ ভাগ দৃশ্যমান সৌত্রিক পদার্থ (Arborous matter) পাওয়া যায়। এ জন্য ইহার চাষে জলই প্রধান আবশ্যক বুঝিতে হইবে। ইক্ষুর সফল চাষ করিতে হইলে বৃহৎ জলাশয় নদী বা বিল বা ইন্দারা প্রভৃতি সমীপে স্থান নির্ব্বাচন করা উচিত। জলাভাব ঘটিলে রোপণের দিবস হইতে ১৬ ভাগ জলের মধ্যে ৩।৪।৫।৪ ভাগ জল প্রতি তিন মাস অন্তর আবশ্যক মত সেচন করিতে পারিলে ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। ইক্ষু জলাভূমির গাছ হইলেও মানব ইহার মিষ্ট আস্বাদ পাইয়া ইহাকে ইচ্ছানুযায়ী নানা দেশে ও নানা অবস্থায় চাষ করিয়া প্রচুর উন্নতি প্রাপ্ত করাইয়াছে। কোথাও কোথাও বিশেষ উন্নত প্রণালী মতে উৎপাদিত হইয়া ইহা এরূপ রূপান্তরিত হয় যে তখন আর ইহাকে পূর্ব্বতনদিগের বংশধর বলিয়া জ্ঞান হয় না। তখন সে তাহার আদি জন্ম স্থানে আর কোনরূপে জন্মিতে চাহে না। জন্মিলেও সহসা দুর্ব্বল ও রোগাক্রান্ত হইয়া ইহার মৃত্যু হয়। এই কারণ বশতই বিদেশী ইক্ষুর চাষ এ দেশে সফল হয় নাই। মরিসাস ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও জাভার ইক্ষু ভারতবর্ষজাত হইলেও, বিগত ২ শত বৎসরের মধ্যে তত্তৎ স্থানে এরূপ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে এ দেশের জল বায়ু এখন তাহাদের অসহ্য। তবে বিভিন্ন প্রকৃতি, ঋতু ও স্থানীয় অবস্থায় ভারতবর্ষের কোথাও না কোথাও কালে ইহাদের চাষ সফল হইতে পারে। মানব ইহাকে আবার এরূপ প্রকৃতি দ্বন্দ্বসহ করিয়াছে যে কি উচ্চ কি নিম্ন কি সরস, কি নীরস কি এটেল (clay) কি চিক্কণ (Deep loam), কি দোয়াশ কি বালীয়াশ সকল প্রকার ভূমিতে নানা জাতীয় ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। অত্যন্ত সরল ও নিম্ন হইতে উচ্চ ও মধ্যম নীরস ভূমির উপযোগী ভেদে ইক্ষু সাধারণত দুই প্রকার। ইহারা কোমল ও দৃঢ়ত্বক ভেদেও তদ্রূপ দ্বিবিধ। শুষ্ক ভূমিজাত ইক্ষু স্বতই কঠিন স্বল্পকায় ও স্বল্পরস হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন এরূপ জাতীয় ইক্ষুতে চিনির অংশ অধিক থাকে কিন্তু তাহা ঠিক নহে। ইক্ষু যতই কোমল বা দৃঢ়ত্বক হউক না কেন, রসে শর্করার পরিমাণ উভয়েরই প্রায় সমান। এজন্য যে জাতি হইতে অধিক পরিমাণ রস পাওয়া যাইবে তাহা হইতেই অধিক চিনি জন্মিবে এবং যাহার ত্বক যত কোমল সে ততই রসপূর্ণ। স্থূল ও বৃহৎকায় ইক্ষু আবার কীট এবং রোগাদি কর্ত্তৃক অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। কোন কোন জাতীয় ইক্ষু এরূপ কোমল ও বৃহৎকায় যে তাহাতে জলের অংশ অত্যন্ত অধিক মিষ্ট সামান্য মাত্র সুতরাং ইহারা ফলমূলাদির ন্যায় খাইবার উপযুক্ত। যে জাতীয় ইক্ষু কোমলত্বক ও স্থূলকায় এবং যাহার অভ্যন্তরে ছিবড়ার ভাগ (fibrous matter) অল্প তাহা হইতেই অধিক পরিমাণ রস পাওয়া যায়। অর্থাৎ ছিবড়া যত অধিক থাকিবে রসও সেই অনুপাতে অল্প হইবে। ওটাহিটী (Otaheite) ও দেশীয় ইক্ষুর বিশ্লেষণে এই কথাটী বিলক্ষণ প্রমাণিত হয়। ইহাতেই বুঝা যায় বৈদেশিক ইক্ষু হইতে চিনি কেন অধিক জন্মে।

	ওটাহিটীর ইক্ষু	দেশীয় ইক্ষু
জল (water)	৭২	৩৩
চিনি (sugar)	১৮	১৭½
ছোবড়ার ভাগ (fibrous matter)	১	১৬½
	১	১

দৃঢ়ত্বক্ ও ছিবড়া স্থূল ইক্ষুর রস কিছু অল্প হইলেও ইহারা সাধারণত কঠিন প্রাণ স্বল্পরোগ ও অল্প কীট প্রবণ সুতরাং ইহাদের মধ্যে যাহা অধিক রসপূর্ণ ও কলে চড়াইলে স্বল্পায়াসেই যাহা হইতে অধিক রস নির্গত হয় তাহাই লাভজনক চাষের উপযোগী বুঝিতে হইবে। কারণ কোমলত্বক্ ইক্ষু রোগ ও কীটপ্রবণ হওয়ায় অনেক সময় ক্ষেত্রের গাছ উজাড় হইয়া যায়। আবার

অনেকে পথ করিয়াও চুরি করে। তাহার উপর শৃগাল বরাহ ভল্লুক হাতী প্রভৃতি বন্য জন্তুর উপদ্রব আছে সুতরাং চাষে বিস্তর ক্ষতি হয়। কিন্তু দৃঢ়ত্বক জাতিতে এসকল কোন দোষ না থাকায় চাষে অল্প ক্ষতি হয় লাভ সমানই থাকে অথচ পরিশ্রম বা ব্যয়বাহুল্য নাই এজন্য অনেকে দৃঢ়ত্বক্ জাতীয় ইক্ষু রোপণের পক্ষপাতী।

ভারতবর্ষে বহুজাতীয় ইক্ষু জন্মে। তাহাদের মধ্যে বহু পরিমাণ রস উৎপাদনকারী দৃঢ়ত্বক জাতীয় ক্ষুও বিস্তর দেখা যায়। চিনির ব্যবসায়ে উন্নতি ও বিদেশীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে চাষের নিমিত্ত আমাদিগকে এই সকল বিশিষ্ট জাতির পরিচয় লইতে হইবে পাঠক বর্গের অবগতির জন্য নিম্নে ভারতবর্ষীয় ও প্রসঙ্গক্রমে বিদেশীয় নানাবিধ উৎকৃষ্টজাতীয় ইক্ষুর বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি চাষের বিশেষ উপযোগী বুঝিতে হইবে।

১। কাজলা—শুষ্ক দোয়াশ ভূমিতে ভাল জন্মে চাষে জলসেচনের আবশ্যক হয়। এই জাতীয় ইক্ষু বেগুনের এর দৃঢ়ত্বক বটে কিন্তু শামসাড়া অপেক্ষা কিছু কোমল ও ৫৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। রসের পরিমাণ অল্প হইলেও মিষ্টতা অধিক ইহা হইতে উৎকৃষ্ট জাতীয় গুড় উৎপন্ন হয়। নীলের সিটী গোময়াদি পশুবিষ্ঠা ও উদ্ভিজ্জসারে ইহা ভাল জন্মে। নদীয়া, যশোহর বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বিস্তর কাজলা আখের চাষ হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি ১৫।২ মণ গুড় উৎপন্ন হয়।

২। কাজলী—রাজসাহী জেলায় এই ইক্ষু জন্মে। নাম কাজলী খাগড়া। বর্ণ লালচে অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক ও সরুজাতীয় দৈর্ঘ্যে ৪ হস্ত। সরস দোয়াশ মৃত্তিকাতে সুন্দর বর্দ্ধিত হয়। রাজসাহী জেলার অনেক স্থানে বিনা সারেই এই ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি ১৪।১৫ মণ গুড় পাওয়া যায়। ইহা কাজলারই প্রকার ভেদ। দক্ষিণ বিহার অঞ্চলেও উচ্চ ভূমিতে ইহার চাষ হইয়া থাকে।

৩। খড়ি—এই জাতীয় ইক্ষু বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ—উভয়ত্রই জন্মে ও সর্ব্বাপেক্ষা অল্প রোগপ্রবণ। বর্ণ সবুজের উপর সাদাটে থাকিলে ফিকা হরিদ্রা বর্ণ। কঠিনপ্রাণ (Hardy)। ঈষৎ সুস্থকায় ও শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক বলিয়া সহজে রোগ বা কীটাক্রান্ত হয় না। ৪।৫ বৎসরকাল সমভাবে ফলিয়া থাকে এব উচ্চ দোয়াশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে। ইহার রসে মিষ্টতা অধিক বিঘা প্রতি ১৫।২ মণ উৎকৃষ্ট গুড় উৎপন্ন হয়। বর্দ্ধমান পরীক্ষাক্ষেত্রে কয়েক বৎসরের পরীক্ষায় বঙ্গদেশের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী ও লাভজনক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

৪। ধলসুন্দর—কেহ কেহ ঢালাসুন্দরও বলিয়া থাকেন যশোহর খুলনা বরিশাল পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে অল্পবিস্তর চাষ হইয়া থাকে। গাছ ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। সাদাটে বর্ণ। সরস দোয়াশ মৃত্তিকায় ভাল জন্মে। ইহা হইতে উত্তম গুড় উৎপন্ন হয়।

৫। ইখড়ী—ফরিদপুর অঞ্চলে জন্মে। বর্ণ শ্বেতাভ হরিৎ। অত্যন্ত কঠিনত্বক দুই হাত জলে ডুবিয়া থাকিলেও গাছ মরে না। বিঘা প্রতি ১।১২ মণ বা শর দানার ন্যায় শুষ্ক গুড় পাওয়া যায়।

৬। খাগী—পূর্ব্ব বঙ্গে ইহা নিম্ন জলাভূমিতেই জন্মিয়া থাকে।

৭। কুশোড়—বঙ্গদেশের অনেক স্থানে পূর্ব্বে এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ হইত। সরস ও অত্যন্ত স্নিগ্ধ ভূমিতেই ভাল জন্মে। বর্ণ মেটে খড়ি রং গাছ ৩৪ হস্ত দীর্ঘ ও সরু জাতীয় এবং ঘন সন্নিবিষ্ট গ্রন্থিপূর্ণ। বিঘা প্রতি ৮।১ মণ উত্তম গুড় পাওয়া যায়।

৮। শামসাড়া—উচ্চ দোয়াশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে। গাছ ৫৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। ফিকা হরিদ্রা বর্ণ মোটা জাতি দৃঢ়ত্বক। ত্বকের কোন অংশ এক প্রান্ত হইতে টানিলে সমস্তটা গাঁট শুদ্ধ সহজেই উঠিয়া আইসে ইহাই ইহার বিশেষত্ব। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। পুড়ী ইক্ষুর ন্যায় ইহা হইতে প্রচুর রস পাওয়া যায়। রসে মিষ্টতা অধিক।

বৈদেশিক বসবহুল ইক্ষু হইতে গড়ে একার প্রতি ৬ টনের উপর গুড় পাওয়া যায় না (এক একাব প্রায় তিন বিঘা জমি এক টন ২৭ মণ)। এত পবিমাণ ফলন না হউক সাধাবণত সাব দিয়া রীতিমত চাষ কবিতে পাবিলে শামসাড়ায় বিঘা প্রতি ৭ মণের উপব গুড় পাওয়া যায় ইহা প্রত্যক্ষ। ইহাব চাষ বিশেষ লাভজনক আমাদেব দেশে শামসাড়াব নিম্নে কাজলা ও খড়ি ইক্ষু পরিগণিত হয়।

৯। পুড়ী—শাস্ত্রে ইহার নাম পৌণ্ড্রক বঙ্গদেশের মধ্যে সব্জী চাষে পুঁড়োদেব ন্যায় কেহ উৎকর্ষ দেখাইতে পাবে না। সম্ভবত মালদহেব পুঁড়ো (পৌণ্ড্রক) জাতিবাই ইহাব উন্নতিসাধন কর্ত্তা। এজন্য ইহাব পুড়ী নাম হইয়াছে। বর্ণ ফিকা হবিদ্রা, পাকিলে গাঢ় হবিদ্রাবর্ণ। ত্বক অত্যন্ত কঠিন নহে। স্থূলকায় ও বস বহুল এবং প্রচুব সাবযুক্ত সবস ভূভাগেই ভালরূপ জন্মে। বিঘা প্রতি ২ মণেবও উপব গুড় পাওয়া যায়। সাহাবানপুব অঞ্চলে, এই জাতীয় পুবী বা পুণ্ডা নামক একপ্রকাব ইক্ষু জন্মে, তাহা সাধারণত ৮ হস্তেব উপব দীর্ঘ হইয়া থাকে। ইহা হইতে অতি উৎকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন হয়। অনেকে এই জাতীয় ইক্ষু গুড় অপেক্ষা খাইবাব নিমিত্ত মনোনীত কবেন।

১০। পুবাকুড়িয়া—আসামে সাদা ও লালচে বর্ণেব এতন্নামক দুই প্রকাব ইক্ষু জন্মে। ইহাবা ২½ ইঞ্চি।

১১। বোম্বাই—ইহা শামসাড়াবই মত, তবে কিছু স্থূলকায়, কোমলত্বক এবং কীট ও বোগাদি কর্ত্তৃক শীঘ্র আক্রান্ত হইয়া পাড়ে দোয়াশ মাটিতে ভাল জন্মে। এ দেশে সাধারণত কাঁচা খাইবাব জন্য ইহার ব্যবহার হয়।

১২। সাচকুশর—কেহ কেহ সাচবোম্বাইও বলিয়া থাকেন। ২৪ পবগণাব দক্ষিণ অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষুব অল্পবিস্তর চাষ হয়। রং উজ্জ্বল সোণালী, মধ্যমরূপ দৃঢ়ত্বক, মোটা জাতীয় ও অত্যন্ত বসপূর্ণ। গাছ ৩।৩½ হস্তেব উপব লম্বা হয় না। উচ্চ দোয়াশ ও মেটেল জমিতে সুন্দব বর্দ্ধিত হয়। বসে মিষ্টতা অধিক ও অতি উৎকৃষ্ট জাতীয় দানাদাব গুড় উৎপন্ন হয়।

১৩। লাল ইক্ষু—আসামে এই জাতীয় ইক্ষু জন্মে, অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক ও কঠিনপ্রাণ। ইহাতে বসেব পবিমাণ ও মিষ্টতা অধিক ও উৎকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন হয়। সকল প্রকার ইক্ষু অপেক্ষা ইহা নিম্নভূমিতে ভাল জন্মে।

১৪। কেতারী—বিহার হইতে সাঁওতাল পরগণা পর্য্যন্ত প্রায় সকল স্থানেই ইহাব অল্পবিস্তর আবাদ হইয়া থাকে। গাছ ৩।৪ হাতেব উপব দীর্ঘ হয় না। বর্ণ ফিকা হবিদ্রাভ সবুজ। অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক, কঠিন প্রাণ ও অঙ্গুষ্ঠ অপেক্ষা কিছু স্থূল। রস পবিমাণে অল্প জন্মিলেও মিষ্টতা অধিক ও উৎকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন হয়। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইহাব বস স্বল্পায়াসেই গাঢ় হয়। উচ্চ এটেল দোয়াশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে, ইহাব চাষে লাভ আছে।

১৫। খোলোই—অত্যন্ত স্থূলকায় এবং লালচে

রং। রস প্রচুর কিন্তু মিষ্টের ভাগ অল্প। অত্যন্ত বিলম্বে বৃদ্ধি পায়। নাগপুর অঞ্চলে ইহার চাষ হয়।

১৬। পানশাহী—গাছ ৪।৫ হস্তের উপর দীর্ঘ হয় না। বর্ণ সাদাটে, সরু জাতীয় ও অত্যন্ত কঠিন প্রাণ। অত্যন্ত উর্ব্বরা ও উচ্চ ভূমিতেই ভাল জন্মে। বিঘা প্রতি ১৫।১৬ মণ গুড় পাওয়া যায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চাকী গুড়ের জন্য ইহার প্রচুর চাষ হইয়া থাকে ইহার চাষে লাভ আছে। বাদশাহদিগের পানের নিমিত্ত ইহার চাষ হইত, এজন্য পানশাহী নাম হইয়াছে।

১৭। রেওড়া—গাছ ৭।৫ হস্ত দীর্ঘ হয়। হরিদ্রা বর্ণ, পাকিলে পাঁশুটে ব ও অপেক্ষাকৃত মোটা জাতীয় উচ্চ দোয়াশ ভূমিতে ভাল জন্মে। বিহারের প শ্চমা ঞ্চলস্থ দেশসমূহে ইহা হইতে উৎকৃষ্ট সার গুড় প্রস্তুত হয়। ইহার চাষ লাভজনক।

১৮। মাঙ্গা—ত্রিহুতের প িচমাঞ্চলে সর্ব্বত্রই ইহার প্রচুর চাষ হয়। গাছ ৪।৫ হস্ত উচ্চ হয়। মধ্যম কোমলত্বক ও মোটা জাতীয় উচ্চ দোয়াশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে এব নিতান্ত নীরস ভূমিতেও সহজে মরে না। কিন্তু সহজেই কীটাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহা দানাদার চিনি প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বিঘা প্রতি ১ ।১২ মণ গুড় পাওয়া যায়।

১৯। ভূর্ণী—বিহার অঞ্চল ইহার প্রচুর চাষ হয়। ইহা পুর্ব্বোক্ত রেওড়া ও পানশাহীর মত তবে দৈর্ঘ্যে আরও বর্দ্ধিত হয়। পত্রও কিছু বৃহত্তর ও কঠিন প্রাণ উচ্চ চিকণ মৃত্তিকাতে সুন্দর জন্মে এব প্রচুর জল সেচনের আবশ্যক হয়। এতদুৎপন্ন গুড় উৎকৃষ্ট জাতীয়।

২ । লাল গেণ্ডা—গাছ ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। রক্তবর্ণ কোমলত্বক ও স্থূলকায়, কিন্তু তত দৃঢ়প্রাণ নহে। বেতিয়া চম্পারণ অঞ্চলে উচ্চ দোয়াশ মৃত্তিকাতে ইহার চাষ হইয়া থাকে। ইহা হইতে সুন্দর গুড়ও প্রস্তুত হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলে গুড় অ পক্ক কাঁচা খাইবার জন্য ইহার অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে।

২১—২২। ধাউর ও মাত্তনা—এই দুই জাতীয় ইক্ষু সাজাহানপুর অঞ্চলে প্রচুর উৎপন্ন হয়। গাছ ৩।৪ হস্ত দীর্ঘ ও কঠিনপ্রাণ এটেল মাটীতে ভাল জন্মে। প্রচুর জল সেচনের আবশ্যক হয়। বিঘা প্রত ১ ।১২ মণ গুড় পাওয়া যায়। ইহার রসে উৎকৃষ্ট মিছরী প্রস্তুত হইয়া থাকে।

২৩। দিকচর—সাজাহানপুর অঞ্চলে উচ্চ দোয়াশ মৃত্তিকাতে এই জাতীয় ইক্ষু জন্মে। গাছ ৭।৮ হস্ত দীর্ঘ হয় স্থূলকায় ও কোমলত্বক এজন্য কীটাদি কর্ত্তৃক শীঘ্রই আক্রান্ত হয়। ইহার চাষ সুবিধাজনক নহে।

২৪। িবাবি—গোরক্ষপুর অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ হয়। এটেল নিম্নভূমিতেই সুন্দর জন্মে। গাছ ৫।৬ হস্ত দীর্ঘ হয়। বর্ণ ফিকা সবজা হলুদে, অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক ও সরু জাতীয়। ইহা হইতে প্রচুর পরিমাণ রস পাওয়া যায় এব উৎকৃষ্ট শুষ্ক গুড় প্রস্তুত হইতে পারে। নিম্নভূমির পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী।

৫। ধানী—উত্তরপশ্চিম ও সাজাহানপুর অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষু জন্মে। গাছ দীর্ঘকায়, দৃঢ়ত্বক ও সরু জাতীয় এটেল অথচ নিম্নভূমিতেই সুন্দর জন্মে। রসের পরিমাণ অল্প হইলেও মিষ্টতা অধিক এব উৎপন্ন গুড় উৎকৃষ্ট জাতীয়।

২৬—২৭। কালকাড়ু (Grass cane) এবং হলুদে উখ (Straw cane)—বোম্বাই অঞ্চলে জন্মে। ইহারা দৃঢ়ত্বক, কঠিনপ্রাণ ও সরুজাতীয় এটেল নিম্নভূমিতেই ভাল জন্মে। জলে প্লাবিত হইলেও গাছ মরে না। গুড় উৎকৃষ্ট জাতীয়।

২৮—২৯। রেস্তানি, পুটপুটি—মান্দ্রাজ ও মহীশুর অঞ্চলে এই দুই জাতীয় ইক্ষু জন্মে। উহারা দোয়াশ ভূমিতেই সুন্দর উৎপন্ন হয় ও গুড় উৎকৃষ্ট জাতীয়। এতদ্ব্যতীত কটে কবো ও মাবাকেবো নামক আরও দুই জাতীয় ইক্ষু জন্মে ইহাদের চাষ সুবিধা জনক নহে।

৩ । চীনা (China)—বিদেশী ইক্ষুর মধ্যে ইহাই এদেশের জলবায়ু সাত্ম্য হইয়া গিয়াছে। অত্যধিক বৃষ্টি

বা শুকায় ইহার কোন হানি হয় না যেখানে কোন জাতীয় ইক্ষু জন্মে না, তথায় ইহা সুন্দর জন্মিয়া থাকে। অত্যন্ত দৃঢত্বক বলিয়া কীট বা শৃগালাদি পশু কর্ত্তৃক ইহার কোন ক্ষতিব আশঙ্কা নাই। ইহা প্রচুব রসপূর্ণ। বিঘা প্রতি ২ শত মণ পীড়নযোগ্য ইক্ষুদণ্ড পাওয়া যায়। বিহাবেব নীলকবেবা এই জাতীয় ইক্ষুর চাষে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষুর প্রচুব চাষ হয়।

৩১। হেমজ—গোবক্ষপুব অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষু জন্মে। চেষ্টা কবিলে বঙ্গদেশেও ইহা জন্মিতে পারে। বিঘা প্রতি ২৫ মণের উপব গুড় পাওয়া যায়। ইহাব চাষ তত বিস্তৃতি লাভ কবে নাই।

৩২। কেথাব—দেহলী (Dehli) অঞ্চলে এই জাতীয় ইক্ষুব প্রচুর চাষ হইয়া থাকে। ইহা হইতে উৎকৃষ্ট পাকা চিনি প্রস্তুত হয়।

৩৩। কোচীন—দাক্ষিণাত্যের কোচীন প্রদেশে এই জাতীয় ইক্ষু জন্মে। ইহা অত্যন্ত স্থূলকায়, ৮।১ হস্ত দীর্ঘ ও অতি শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। পাবেব ব্যাস প্রায় ৮ ইঞ্চি। বসে মিষ্টতা অল্প, গুড় বা চিনিব জন্য, ইহাব চাষ সুবিধাজনক নহে। কাঁচা খাইবাব উপযোগী। বিশেষত এরূপ বিপুলকায় ইক্ষু দর্শনীয় দ্রব্যও বটে।

৩৪। বর্ম্মা—ইহা কোচীন ইক্ষুবই মত তবে অনেক সূক্ষ্মকায়, কিন্তু দেশীয় সকল ইক্ষু অপেক্ষা স্থূল। সবস দোয়াশ মৃত্তিকাতে ভাল জন্মে। অত্যন্ত ভঙ্গুব এজন্য কলে পীড়নেব সুবিধা হয় না। বসে মিষ্টতা অল্প সুতবাং গুড় বা চিনি অপেক্ষা কাঁচা খাইবাব অধিক উপযোগী।

৩৫—৩৬। বোববোঁ (Bourbon) এবং ওটাহিটী (Otaheite)—জ্যামেকা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ এবং দক্ষিণ আমেরিকায় এই দুই জাতীয় ইক্ষুর প্রচুব চাষ হইয়া থাকে। এ দেশে ইহাবা ভাল জন্মে না। উপবোক্ত স্থান সমূহে অসংখ্য ইক্ষু চিনিব কাবখানা আছে।

৩৭। মবিসাস (Mauritiu) প্রধানত মরিসাস দ্বীপেই এই জাতীয় ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে বোরবোঁ জাতীয় বলিয়া থাকেন, কিন্তু অনেকের মতে মালাবার উপকূল প্রদেশ হইতেই প্রথমে মরিসাস দ্বীপে নীত হয়। পশ্চাৎ তথায় অসম্ভব উন্নতি লাভ কবিয়াছে। এই জাতীয় ইক্ষু বংশদণ্ডের ন্যায় স্থূল ও অত্যন্ত মিষ্টরসপূর্ণ। এদেশে ইহার চাষ নিষ্ফল হইয়াছে।

৩৮।৩৯।৪০।৪১। ইয়োলো ভায়োলেট (Yellow violet), পার্পল ভায়োলেট (Purple violet), ষ্ট্রাইপড রিবণ (Striped ribon cane) এবং শিঙ্গাপুব (Singapore) নামক কয়েক জাতীয় ডোবাকাটা ইক্ষু জাভা, ফিজি, মালয়, শিঙ্গাপুব প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুব উৎপন্ন হয়। ইহাবা ভারতবর্ষজাত ইক্ষু বটে, কিন্তু বিশেষ রূপান্তবিত হইয়াছে। আজকালকার আমদানী জাভাচিনি ও ব্রাউনসুগাব (Brown sugar) এই কয়েক জাতীয় ইক্ষু হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। গোদাববী নদীব তীরবর্ত্তী প্রদেশে এই জাতীয় অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মকায় ইক্ষু সামান্য পরিমাণে জন্মিয়া থাকে সম্ভবত চেষ্টা কবিলে ইহাদের চাষ এদেশে সফল হইতে পারে।

উল্লিখিত তিন শ্রেণীর বিদেশীয় ইক্ষু আদৌ ভারতবর্ষজাত ইক্ষু হইতে উৎপন্ন হইলেও, দেশান্তরে গিয়া ইহাদেব আকৃতি প্রকৃতি সম্পূর্ণ পবিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এই কয়েক জাতীয় ইক্ষু অত্যন্ত স্থূলকায়, কোমলত্বক, দীর্ঘাকার ও প্রচুব মিষ্টরসপূর্ণ। এজন্য ইহা হইতে প্রচুব পবিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ দেশে ইহারা শীঘ্রই কীট ও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে বহু চেষ্টাতেও ইহাদেব চাষ সফল হয় নাই। সমুদ্রগর্ভস্থ দ্বীপ সমূহেই ইহাদেব চাষ হয় কিন্তু এ দেশে সমুদ্র হইতে বহু দূর অন্তবর্ত্তী ভূভাগেই ইহাদের চাষ হইয়াছে। এজন্য জলবায়ু ও ভূমির প্রকৃতিগত বিভিন্নতা বশত সম্ভবত ইহাদেব চাষ বিফল হইয়াছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহে ইহাদের সফল চাষেব আশা করা যায়।

এতদ্ব্যতীত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বারখা, রেওড়া,

নিবাড়, কেবাহী, ধাবী প্রভৃতি নানা জাতীয় ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। এগুলি তত বিখ্যাত বা ইহা হইতে উৎপন্ন গুড় তত ভাল নহে। সমগ্র ভারতবর্ষজাত ইক্ষুর সংখ্যা একশতেরও উপর হইতে পারে কিন্তু সবগুলিই যে পরস্পর বিভিন্ন জাতি, এরূপ নিশ্চয় বলা যায় না। দেশভেদে এবং উৎকৃষ্ট কর্ষণপদ্ধতি অনুসারে পুষ্টিনিবন্ধন একই ইক্ষু ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রূপান্তরবর্তি হইয়া বিভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়াছে। আবার একই ইক্ষু বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইক্ষু সাধারণতঃ রক্ত রক্তাভকৃষ্ণ সুবর্ণ, পীত, হরিত, বাজীমন্ত (ডোবাকান্ত), শ্বেতাভ পীত ও হরিতাভপীত এই কয়েক বর্ণের দেখা যায়।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইত কিন্তু বিট ও মরিসাসের চিনির আমদানী ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া গত ৪ বৎসরের মধ্যে দেশীয় চিনির কারখানা লোপের সহিত ইক্ষুর আবাদও অনেক হ্রাস পাইয়াছে। এখন যশোহর ও নদীয়া জিলায় সামান্য ২।৪ টা চিনির কারখানা দেখা যায়। বঙ্গের তুলনায় ত্রিহুত বিহার ও উত্তর পশ্চিমে ইক্ষুর চাষ যেরূপ অপর্য্যাপ্ত, চিনিও তদ্রূপ প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাশী, গাজীপুর, গোরক্ষপুর ও অযোধ্যা এই দেশী চিনির প্রধান বাণিজ্য স্থান। এই চিনি অতি উৎকৃষ্ট ও সূক্ষ্ম ভাবে চূর্ণিত। চিনি বা গুড় মাত্রই বর্ষকালে একটু গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে কিন্তু গোরক্ষপুরের চিনির এ দোষ মাত্রই নাই। এজন্য ইহার আদর অধিক। সমগ্র যুক্তপ্রদেশ বিহার এবং বঙ্গদেশের ভাগলপুর মালদহ ও রাজসাহী জিলায় এই চিনির অল্পাধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। অধুনাতনকালে ভারতবর্ষের আর কোথাও এত চিনি উৎপন্ন হয় না।

চিনির কারবারের উন্নতি ও বিদেশের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টীর প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে যথ—

১। ভূমি সার প্রয়োগ বা অন্য কোন উপায়ে চাষের উপযোগী হইলেও, ভূমির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করা সাধ্যাতীত কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় ইক্ষু হইতে ভূমি ও স্থানীয় জল বায়ুর উপযোগী জাতি নির্ব্বাচন করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত।

২। জাতি বিশেষে ইক্ষুর যে মিষ্টতার সামান্য তারতম্য থাকিলেও জাতি বিশেষে কাহারও অধিক কাহারও বা অল্প রস নির্গত হইয়া থাকে। এ জন্য যে সকল জাতীয় ইক্ষু অধিক মিষ্ট ও বহু রসপূর্ণ আমাদিগকে সেইগুলির চাষ বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

৩। যে জাতীয় ইক্ষুর চাষ করিতে হইবে, তাহা কোমল বা দৃঢ়ত্বক, স্বল্পপ্রাণ (delicate) বা দৃঢ়প্রাণ (hardy), কলে চড়াইলে সহজেই সমস্ত রস নির্গত হয় বা বহুক্ষণে অতি কষ্টে অপেক্ষাকৃত অল্প রস নির্গত হয় এটীও—নিরূপণ করা আবশ্যক।

৪। গুড় ও চিনি প্রস্তুতের জন্য উন্নত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যেন প্রস্তুত কালে কোন অংশ নষ্ট না হয়।

৫। যেরূপ মিষ্টরসবহুল ইক্ষুর কাজ বাড়াইতে হইবে নানাবিধ সহজ উপায়ে যাহাতে গুড়ে মাত অপেক্ষা সারের ভাগ বেশী জন্মে তাহারও চেষ্টা করিতে হইবে।

৬। কলে যেরূপ চিনি প্রস্তুত হইবে, চিনির পরিত্যক্ত অংশ হইতে সেইরূপ মাতগুড়, চিটা মিথ ইলেটেড স্পিরিট, (Methylated Spirit), ভিনিগার (Vinegar), রম (rum), প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া কলের লাভ বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

৭। কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে কোন নির্দ্দিষ্ট জাতীয় ইক্ষু একাদিক্রমে ৫।৭ বৎসরকাল চাষ করিলে ভূমি যেরূপ অবসন্ন হইয়া পড়ে, ইক্ষুও তদ্রূপ অপকর্ষ ভাব প্রাপ্ত হয়। এ নিমিত্ত ৪।৫ বৎসর অন্তর নূতন ভূমিতে ভূমির উপযোগী নূতন ইক্ষুর চাষ করিতে হইবে বা পুরাতন বীজ পরিত্যাগ করত তাহাই অন্য কোন দূরস্থান হইতে আনাইয়া চাষ করিতে হইবে।

৮। যে স্বল্প স্থানে প্রচুর ইক্ষুর চাষ হয়, তথায়

সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ কল বসাইয়া চিনি প্রস্তুত করিতে হইবে।

৯। বিট চিনির উপর যেরূপ শুল্ক (Counter vailing duty) বসিয়াছে মরিসাস জাভা প্রভৃতি দ্বীপজাত ইক্ষু চিনির উপরও যাহাতে সেইরূপ শুল্ক বসে তাহার চেষ্টা করিতে হবে।

ভূমি—জাতি বিশেষে ইক্ষু সর্ব্ববিধ ভূমিতেই জন্মিতে পারে এবং ইহার চাষে প্রচুর জলের আবশ্যক হয় কিন্তু তাহা বলিয়া ইক্ষুক্ষেত্র যে সর্ব্বদাই জলে প্লাবিত করিয়া রাখিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। এজন্য ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে সিক্ত হইয়া অতিরিক্ত জল যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাহার সুচারু বন্দোবস্ত করিতে হইবে। জাতিভেদে ইক্ষু সকল প্রকার ভূমির উপযোগী হইলেও, উচ্চ, সরস ও অত্যন্ত উর্ব্বরা দোয়াশ মৃত্তিকায় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম জন্মে। অত্যন্ত শুষ্ক কঠিন এবং বালুকাশূন্য এঁটেল মাটিতে ইক্ষু সুবিধাজনক ভাবে জন্মে না। অভাব পক্ষে ইহাতে আবশ্যক মত বালুকা, গোময়াদি পশু বিষ্ঠা, উদ্ভিজ্জ সার প্রভৃতি মিশ্রিত ও প্রচুর জল সেচন করিয়া চাষ করিতে হইবে। এরূপ ভূমি সর্ব্বদা সরস থাকা আবশ্যক, যেন কোনমতে শুষ্ক হইয়া ফাটিয়া না যায়। লবণ চূণ এবং ক্ষার ইক্ষুর নিমিত্ত সামান্য প্রয়োজনীয় হইলেও ইহারা এবং সোডা (Soda) ম্যাগনেসিয়া (Magnesia) প্রভৃতি মৃত্তিকাতে প্রচুর বিদ্যমান থাকিলে ইক্ষুর চাষ করা বৃথা ঐসব মৃত্তিকা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। ফসল ত ভালই হয় না অধিকন্তু উৎপন্ন গুড় ও চিনি লবণ বা ক্ষার স্বাদ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যে সকল ভূমিতে ভাদুই ধান, তামাক, আলু, অড়হর তিসি, গোধূম, বুট কলায়, সীম প্রভৃতি ফসল জন্মে, তাহাতে ইক্ষুর চাষ হইতে দেখা যায়। বস্তুতঃ এপ্রকার ভূমি সর্ব্বদা কর্ষিত হওয়ায় ইক্ষু সুন্দর জন্মে। ছায়াযুক্ত স্থানের ইক্ষুরস মিষ্টও অল্প হয় এবং গাছও বেশী তেজ করে না। এজন্য ক্ষেত্রে যাহাতে অব্যাহত ভাবে বাতাতপের প্রবেশ হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে সকল ভূমি সর্ব্বদা সরস ও শিথিল ভাবাপন্ন, তাহাতে চৈত্র বৈশাখ মাসে সামান্য জল সেচনের আবশ্যক হইলেও, অন্য সময়ে আদৌ জলের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে সকল ভূমি এরূপ অবস্থাপন্ন নহে, তাহাতে জল সেচনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। মূলত ইক্ষুর ভূমি সর্ব্বদা সরস থাকিলেও, যাহা দিবা ভাগে রৌদ্রতাপে শুষ্ক ও প্রাতে আর্দ্র বোধ হইবে, তাহাতেই ইক্ষু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বর্দ্ধিত হয়।

ভূমি প্রস্তুত—চৈত্রের ফসল উঠাইয়া লইবার পর নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে অন্য কোন শস্য বপন করা উচিত নহে। বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রতি মাসে অন্তত একবার হিসাবে হলকর্ষণ করত মৃত্তিকা উত্তমরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া দিলে, বায়ু ও জলের সারভাগ গ্রহণ করত ক্ষেত্র স্বভাবত ই উর্ব্বরা হইয়া উঠে এবং জঙ্গলাদি আগাছা মাসে মাসে উৎপাটিত হইয়া বর্ষার জলে পচিয়া যাওয়ায় সারের ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে জঙ্গল জন্মিবারও সম্ভাবনা থাকে না। বৃষ্টির জলেও অন্যান্য সারভাগ যাহাতে বহির্গত হইতে না পারে এজন্য ভূমির চতুর্দ্দিকে আল বাঁধিয়া জল ধরিয়া রাখা কর্ত্তব্য। যে সকল ভূমি নিম্নতাবশত সর্ব্বদা জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া যায় ও পরিষ্কার করিতে অত্যন্ত খরচ পড়ে, আমন ধান্যের ভূমি প্রস্তুতের ন্যায়, ভাদ্র মাস বরাবর প্রচুর বৃষ্টিপাত হইলে, সে সকল ভূমি যদি জলের উপরই উত্তমরূপ কর্ষণ করত ঘনকাদার মত করা যায়, তাহা হইলে তাহার জঙ্গল মরিয়া যায় ও জমি অত্যন্ত উর্ব্বরা হইয়া উঠে। পশ্চিমাঞ্চলে এই প্রথাকে "গজর" বলে। আশ্বিন মাস বরাবর আকাশ মেঘ শূন্য, ভূমি শুষ্ক ও রৌদ্র তেজ প্রবল হইলে, যে পরিমাণ সার প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহার চারিভাগের দুই ভাগ সমস্ত ক্ষেত্রে সমভাবে ছড়াইয়া—৫।৭ দিবস কাল উত্তমরূপ শুষ্ক করত অগ্রহায়ণের শেষ পর্য্যন্ত অন্তত ৪।৫ বার গভীরভাবে, কর্ষণ করিয়া মৃত্তিকা ধূলিবৎ চূর্ণিত ও সমতল করিতে হইবে। ইহার পর সমস্ত পৌষ মাস (অর্থাৎ, বীজ বপনের একমাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত)

ভূমিকে বিশ্রাম দিতে হইবে, কোনরূপ কর্ষণ, সার প্রয়োগ বা নাড়াচাড়া করিবার আবশ্যক নাই। অবশিষ্ট যে দুই ভাগ সার থাকিবে তাহাই ইক্ষু রোপণকাল হইতে বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে ব্যবহারের জন্য রাখিতে হইবে। কোথাও কোথাও ভাদোই ফসল উঠাইয়া সার প্রয়োগে কথিত উপায় মত ভূমি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এ প্রথাও সুন্দর কিন্তু ইক্ষু চাষে প্রচুর সারের আবশ্যক হয়। এজন্য মধ্যে একটি ফসল উৎপাদন করত সারভাগ না কমাইয়া সম্বৎসর পতিত রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত।

সার—ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে সারভাগ গ্রহণ করিয়া ভূমিকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। এজন্য সার প্রয়োগ আবশ্যক কিন্তু সার অধিক দিলেই যে গুড় বা চিনি অধিক জন্মিবে এরূপ কোন কথা নাই। তবে সার প্রয়োগে গাছ সতেজ হয় ও মাতিয়া উঠে, ইক্ষু দণ্ডের সংখ্যাও বর্দ্ধিত হয় এজন্য গুড়ের পরিমাণ অধিক হয়। যাহা হউক, ইক্ষু ক্ষেত্রে পরিমিত সার প্রয়োগ করাই নিয়ম, অতিরিক্ত সার প্রয়োগ বৃথা অর্থব্যয় মাত্র। এ দেশের কোন কোন জেলাতে বিনা সারেও ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। যদি বিনা সারে বিঘা প্রতি ১৫ মণ গুড় পাওয়া যায়—তবে পঞ্চাশ টাকা সারের জন্য ব্যয় করিয়া ২৫ মণ গুড় পাইবার জন্য সার খরচ না করাই উচিত। বিঘা প্রতি ক্ষার (ছাই) ৫।৭ মণ ও গো মহিষাদির বিষ্ঠা ৭।৮ মণ বা অশ্ব বিষ্ঠা ৪ মণ বা রেড়ী ও সর্ষপ খইল ২। মণ বা অস্থি চূর্ণ মণ বা সোরা ৫।৬ মণ বা নীলের সিটী ৪ মণ বা পচা মৎস্য ১ মণ বা তুলাবীজ চূর্ণ ৩ মণ প্রয়োগ করিলে সুন্দর ইক্ষু জন্মে। ইক্ষুতে যেরূপ প্রচুর পরিমাণ সৌবর্চ্চলজনের (Nitrogen) প্রয়োজন হয়, বায়ু ও ক্ষারেরও সেইরূপ আবশ্যক হইয়া থাকে, বিঘা প্রতি আধমণ সৌবর্চ্চলজন দিবারই নিয়ম, কিন্তু ইহার অধিকাংশ বিগলিত অবস্থায়, বর্ষার জলের সহিত বাহিত হইয়া বা ভূমির নিম্নে চলিয়া যাওয়ায়, মূলকর্ত্তৃক আকর্ষিত না হইবার জন্য গাছের বৃদ্ধির সহায়তা করে না। এজন্য দ্বিগুণ, ত্রিগুণ পরিমাণে ইহার প্রয়োগ আবশ্যক। মৃত্তিকা জমিয়া কঠিন হইলে মূলে বায়ু সঞ্চার রোধ করাতেও গাছের বৃদ্ধি হয় না। ইক্ষুর চাষে গো, মেষ, মহিষাদির বিষ্ঠা বিশেষ সুলভ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার। কারণ ইহাতে প্রচুর পরিমাণ ইক্ষুর প্রাণধারণ ও বর্দ্ধনোপযোগী সৌবর্চ্চজন বিদ্যমান আছে। ইহাদের প্রয়োগে ভূমি শিথিল ও বায়ুপ্রবেশশীল হইয়া উঠে। সুতরাং ভূমির অবিগলিত কঠিন পদার্থ সকল দ্রবীভূত ও বৃক্ষমূল দ্বারা আকর্ষিত হইয়া তাহার বর্দ্ধনের সহায়তা করে। গোময়াদি পশুবিষ্ঠা ও বৃক্ষপত্রাদি অর্দ্ধবিগলিত (আধ পচা) অবস্থায় প্রয়োগ করিলে সারভাগ পচিয়া গাছের উপযোগী হইতে বিলম্ব হয়। সুতরাং সারগত সৌবর্চ্চলজন (Nitrogen) ভূমির নিম্নে বা অপর কোন দিক দিয়া বহির্গত হইতে সক্ষম হয় না, ধীরে ধীরে গাছ সমস্ত অংশই গ্রহণ করে। আপাং, তিলডাটী, কানাসনা, কুমড়াডাটী, নারিকেল বা অপর কোন লতা পাতা ভস্মাদি বিঘা প্রতি ৫।৭ মণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ক্ষার প্রয়োগেও ভূমি শিথিল ও বায়ুপ্রবেশশীল হইয়া উঠে অধিকন্তু ভূমি ও সারের অদ্রবনীয় পদার্থ সকল বিগলিত হইয়া গাছের সদ্য ব্যবহারোপযোগী হয় এবং কীটাদির উপদ্রবের অল্পতা ঘটে। উদ্ভিজ্জ সারের মধ্যে নীলের সিটী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সকল স্থানে ইহা পাওয়া যায় না। কিন্তু যথায় পাইবার সুবিধা আছে, তথায় ইহা শুদ্ধ বা গোময়াদির সহিত বা আধাআধিভাবে প্রয়োগ করিলে সুন্দর ফসল জন্মিয়া থাকে। ইহাদিগের ন্যায় ইক্ষুর উপযোগী ব্যয়স্বল্প উৎকৃষ্ট সার দেখা যায় না। গো মহিষাদির বিষ্ঠা ৬ হইতে ৯ মাসের মধ্যে পচিয়া সার হয় কিন্তু অশ্ব বিষ্ঠা দেড় বৎসরের পুরাতন না হইলে প্রয়োগ করা উচিত নহে ইহা অপেক্ষা অল্প দিনের হইলে সারের তেজে গাছ ঝান খাইয়া যাইতে পারে। ইয়োরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্র এবং উত্তর পশ্চিমেও কোথাও কোথাও বিঘা প্রতি ২ শত মণ হিসাবে নরবিষ্ঠা ইক্ষুর সাররূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা

অমেধ্য প্রয়োগ না করাই উচিত, কারণ গবাদি পশু বিষ্ঠা ইহা অপেক্ষা শত গুণে উপকারী ও স্বাদবর্দ্ধক। খৈল, সোরা, অস্থিচূর্ণ, পচা মৎস্য প্রভৃতি ইক্ষুর উপযুক্ত সার হইলেও ব্যয়াধিক্য আছে। এগুলি উপরিউক্ত সারগুলির সহিত আনাআধি পরিমাণে মিশাইয়া ব্যবহার করিলে ব্যয় অল্প পড়ে। রেড়ী ও সরিসার খৈল ইক্ষু মাত্রেরই পক্ষে উপকারক। রেড়ীর খৈলে শামসাড়া ইক্ষুর সুন্দর ফলন হইয়া থাকে। বিশেষত খৈল প্রয়োগে গাছের শিকড়ের সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় গাছ অত্যন্ত বলবান হয় ও ঝাড় বান্ধে এবং ঝড়ে বা বাতাসে সহজে পড়িয়া যায় না। সূক্ষ্ম চূর্ণিত সোরা বর্ষার শেষ বরাবর গাছের গোড়ায় দিতে পারিলে ভাল হয়। ভূমি শুষ্ক থাকিলে সোরা দেওয়ার পর জল সেচন করিতে হইবে নচেৎ সোরা শীঘ্র উদ্ভিদের আহারোপযোগী হয় না। অস্থি স্থূল ও সূক্ষ্ম চূর্ণ ভেদে দুই প্রকারে ব্যবহৃত হইতে পারে মরিসাস প্রভৃতি স্থানে অস্থিচূর্ণই ইক্ষুর প্রধান সাররূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম অস্থিচূর্ণ (bone dust) গাছের গোড়ায় বরাবর দিতে পারিলে শীঘ্রই বৃক্ষোপযোগী আহারে পরিণত হয় কিন্তু স্থূল অস্থি চূর্ণ (bone meal) বিলম্বে কার্য্য সাধক এজন্য চাষের সময় হইতেই জমিতে ছিটাইয়া চাষ করিতে হইবে। ইক্ষুর মূল জমির অধিক নিম্নে যায় না এজন্য মূলের নিকটবর্ত্তী স্থানে সার প্রয়োগ করিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলে সর্ব্বতোভাবেই সারের সার্থকতা হইতে পারে। খৈল, সোরা, অস্থিচূর্ণ প্রভৃতি সার মূল্যবান। যদি গবাদি পশু বিষ্ঠা ও উদ্ভিজ সার অর্দ্ধ পরিমাণে দিয়া জমি প্রস্তুত করত গাছ রোপণের পর পাইট করিবার সময় অর্দ্ধ পরিমাণ খৈল অস্থি চূর্ণ প্রভৃতি বারে বারে অল্প পরিমাণে গাছের গোড়ায় দেওয়া যায়, তাহা হইলে সারে অল্প খরচ পড়ে, অথচ ইক্ষু সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া পুরা ফসল প্রদান করে। সারের মধ্যে সোরা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সুতরাং ইহার প্রচলন নাই বলিলেই চলে। ২।৩ মণ সোরা ও ৮।১০ মণ রেড়ীর খৈল একত্র মিশাইয়া আশ্বিন মাস বরাবর গাছের গোড়ায় দিতে পারিলে ফলন ভাল হইয়া থাকে। সোরা একক অপেক্ষা অন্য সারের সহিত মিশ্রিত ভাবে প্রয়োগে অধিক ফল দর্শে। অস্থি চূর্ণ প্রয়োগে জমির অম্লিত ফস্ফরাস, চূণ, ক্ষার প্রভৃতি পদার্থের পূরণ হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান পরীক্ষাক্ষেত্রে বিঘা প্রতি ৭ মণ গোবর ও ৩ মণ খৈল এই উভয় সার প্রয়োগ করিয়া ৩ মণেরও অধিক গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। এই সকল সারের মধ্যে খৈল ও গোময়াদি পশুবিষ্ঠা বা খৈল, গোময় ও অস্থি চূর্ণ বা তূলাবীজ, সোরা ও অস্থি চূর্ণ একত্র প্রয়োগে ইক্ষু সুন্দর জন্মিয়া থাকে। ইক্ষুক্ষেত্রে যত পরিমাণ সার দিতে হইবে, তাহার তিন ভাগের দুই ভাগ হলকর্ষণকালে এবং অবশিষ্টভাগ, রোপণকাল হইতে বর্ষার পূর্ব্বে যত দিন না গাছ বিশেষ তেজ ধরে তত দিন ৩।৪ বারে সামান্য পরিমাণে প্রতিবার নিড়াইবার সময় গাছের গোড়ায় মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে পারিলে ফসল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উৎপন্ন হয়। ইহার পর বর্ষায় গাছ জোর করিতে থাকিলে আর সার দিবার আবশ্যক হয় না। বিশেষত এ সময়ে শিকড় নাড়াচাড়া করিলে গাছের হানি হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ আশ্বিন, কার্ত্তিক বরাবর গাছের গোড়ার মাটী আলগা করিয়া দিয়া বিঘা প্রতি ৫।৭ মণ রেড়ী বা সরিষার খৈল দিয়া থাকেন। ইহাতে রসের গাঢ়ত্ব হয় ও দানাদার চিনি জন্মিয়া থাকে। পচা গো মূত্র সঞ্চিত থাকিলে জল মিশাইয়া এ সময়ে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করিলে গাছের ফলন বিশেষ বর্দ্ধিত হয়। কারণ গো মূত্রে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেন বিদ্যমান আছে। গোময়াদি পশু বিষ্ঠা এবং ধঞ্চে ভুরা প্রভৃতি কাঁচা উদ্ভিজ্জসার একত্রে ক্ষেত্রে দিলে ইক্ষুর আবশ্যকীয় সৌবর্চ্চলজান ত প্রযুক্ত হয়ই, তদ্ব্যতীত জমি এরূপ শিথিলভাবাপন্ন ও বায়ুপ্রবেশশীল হয় যে অন্য সার দ্বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু জমি শুষ্ক ও উচ্চ দোয়াশ হইলে জল ধারণশক্তি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। ধঞ্চে জমিকে

সর্ব্বাপেক্ষা সারবতী করিয়া তুলে কারণ শিম্বিজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে ধঞ্চেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ নাইট্রোজেন সার সঞ্চয়কারী। ইক্ষুর চাষে নাইট্রোজেন সার অত্যাবশ্যক। এজন্য ক্ষেত্রে ধঞ্চে জন্মাইয়া পশ্চাৎ ইক্ষুর চাষ করিলে অনেক সময়ে বিনা সারেই ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। শণ ও অড়হরও জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে কিন্তু ধঞ্চের মত নহে।

কীট ও রোগ নিবারক ঔষধ—ইক্ষু অত্যন্ত রোগ প্রবণ। তদ্ব্যতীত ক্ষেত্রে উই ও নানাবিধ কীটাদির উপদ্রব আছে। শৃগালাদির ত কথাই নাই। নির্দ্দোষ ইক্ষুবীজ রোপণ করিলেও সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, ক্ষেত্রটী কীট বা উই বা পিপীলিকাক্রান্ত ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। নীরস জমিতে বিশেষত গাছের কল বাহির হইবার সময় উইয়ের উপদ্রব বেশী হয়। গাছ সতেজ ও সরল অবস্থায় থাকিলে সহসা রোগাক্রান্ত হয় না। চৈত্র, বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রটী গভীররূপে ৫।৬ বার লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করত মৃত্তিকা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে পারিলে উই বা পিপীলিকা সমূহ মরিয়া যায় বা অন্যত্র পলায়ন করে। রোপনের প্রাক্কালে নিম্নলিখিত ঔষধ গুলিতে ইক্ষুখণ্ড ডুবাইয়া রোপণ করিলে কীট ও রোগ অনেক সময় নিবারিত হইয়া থাকে।

১। লবণ ৪ সের, হেনরো (স্বল্প মূল্য হি) আধপোয়া এবং সূক্ষ্ম চূর্ণ সেঁকো বিষ ২॥ তোলা এর আবশ্যক মত জল।

২। হেনরো আধপোয়া সরিসার খৈল ৮ সের পচা মৎস্য ৪ সের বচ বা আকন্দমূল চূর্ণ ২ সের সমস্ত একত্রে আবশ্যক মত জলে মিশাইয়া তরল পঙ্কবৎ করত অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে ইক্ষুদণ্ড তাহাতে ডুবাইয়া পরে ভূমিতে রোপণ করিতে হইবে।

৩। শাখা পত্রাদি সহিত বাসক (বাকস) পত্র সিদ্ধ করত তাহাতে সরিসার খৈল মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ ব্যবহার্য্য।

৪। সেঁকোবিষচূর্ণ ১ তোলা, খানিকটা ময়দা ও গুড় একত্রে মিশাইয়া বড় বড় গুলি পাকাইয়া নারিকেলের মুচিতে ভরিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে রাখিয়া দিলে গুড়ের গন্ধে আকৃষ্ট কীটাদি তাহা খাইয়া মরিয়া যায় উই ও পিপীলিকা নিবারণের ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

৫। ঘোল, হেনরো এবং অধিক পরিমাণ সরিসার খৈল একত্র জল মিশাইয়া ঘন লেহবৎ করত ইক্ষুদণ্ড ডুবাইয়া রোপণ করিলে উই নিবারিত হয় মধ্য ভারতবর্ষে এখনও এই আদিম উপায় প্রচলিত আছে।

৬। তুতিয়া /। পোয়া, হি ২॥ তোলা সূক্ষ্ম সেঁকো বিষ ⁄৶ পোয়া মুসব্বর /১ পোয়া, ঝুল /১ সের, ছাই /২ সের চূণ /॥ আধসের চূর্ণ সরিসার খৈল ১/॥ দেড়মণ ও জল ২/ম। একত্র মিশ্রিত করত ইক্ষুখণ্ড ডুবাইয়া রোপ। করিলে সর্ব্ববিধ কীট নিবারিত হয়। ইহা ত ৪।৫ বিঘা জমির রোপণ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। খৈল সংযোগ বশত ইহা শীঘ্র নষ্ট হয়, অতএব ইহার সদ্য ব্যবহার করা উচিত।

৭। এই মিশ্রিত দ্রব্য হইতে সেঁকো বাদ দিয়া ইক্ষুদণ্ডে পোচড়া লাগাইলে ধোসা পোকা নিবারিত হয়। ধোসা পোকা লাগিলে ইক্ষুদণ্ডে পিপীলিকা আশ্রয় করত ফোপরা করিয়া ফেলে। এজন্য আক্রান্ত ঝাড়গুলি উঠাইয়া পোড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ইহা আর অন্য ঝাড়ে সংক্রামিত হইতে পারে না। ধোসা আক্রান্ত ইক্ষুগুলির বৃদ্ধির হ্রাসের সহিত রসও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ধোসা পোকা নিবারণের জন্য ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে অড়হরের বেড়া দিবার প্রথা আছে ইক্ষু রোপণের পূর্ব্বে সীম ধঞ্চে, কলাই প্রভৃতি শিম্বী জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করিলেও এই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে।

৮। সোডা (Soda Bicarb)এর জল দিয়া ইক্ষুদণ্ডে পোঁচড়া লাগাইলে ধোসা ও অন্যান্য কীট নিবারিত হয়।

চারা প্রস্তুত করণ—বিছনের নিমিত্ত রোগগ্রস্ত ইক্ষুদণ্ড কোনরূপেই গ্রহণ করা উচিত নহে। যাহা কোনপ্রকারে কীট ভক্ষিত বা যাহার পত্র শুষ্ক হইয়া

উই কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ য়াছে বা যে ইক্ষুর অভ্যন্তরস্থ মাংসভাগে লালচে দাগ পড়িয়াছে বা যে সকল জাত সহজেই কীটাক্রান্ত হয়, বীজের নিমিত্ত তাহারা গুরুভার, বীজের নিমিত্ত তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। নিম্নলিখিত চারিটী নিয়মে ইক্ষুর চারা প্রস্তুত হ য়া থাকে আমাদের দেশে কর্ত্তিত অগ্রভাগ রোপণেরই প্রথা দেখা যায়।

১। সরস আর্দ্র ছায়াময় স্থানে আবশ্যকমত দীর্ঘ ও প্রস্থ এব ১ বা ১॥ হস্ত গভীর গহ্বর কাটিয়া পুরাতন গোবর ও জল মিশাইয়া ঘন কর্দ্দমের মত করত ইক্ষুর অগ্রভাগগুলি তাহাতে অর্দ্ধশায়িতভাবে বসা যা উপরে লতা পাতা বা বিচালি বা চাটাই দিয়া আবৃত করিতে হ বে এই উপায়ে ১৫। দিনের মধ্যে প্রত্যেক গ্রন্থি হইতে কল ও নূতন শিকড় বাহির হইয়া থাকে। এই অবস্থায় উঠাইয়া ক্ষেত্রে রোপণ করাই নিয়ম।

২। অগ্রভাগ ব্যতীত সমগ্র ইক্ষুদণ্ড হইতেও চারা প্রস্তুত হইতে পারে যা াতে কল (Bud) গুলি কোনরূপে নষ্ট না য় এব মধ্যে ৩।৪টী কল যুক্ত গ্রন্থি থাকে, এইরূপ ভাবে ইক্ষুদণ্ডগুলি ১ ফুট আন্দাজ দীর্ঘে খণ্ড খণ্ড কাটিতে হইবে পরে দীর্ঘে প্রস্থে তিন হস্ত ও দুই হস্ত গভীর একটী গহ্বর কাটিয়া নিম্নে ভিজা খড় ও ছাই একস্তর বিছাইয়া তদুপরি কর্ত্তিত খণ্ডগুলি ঘন ভাবে পাতিয়া ভিতরে প্ররে। হয় এইরূপ ভাবে ছাই ছড়াইয়া উপরে আবার ভিজা খড় ও ছাই চাপা দিতে হইবে যতক্ষণ না গহ্বরটী পূর্ণ হয় এইরূপে উপর্য্যুপরি সাজাইয়া সর্ব্বোপরি ঘন খড় দিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে এই উপায়ে ১০।১২ দিনের মধ্যে ইক্ষুর নূতন কল ও শিকড় বাহির হইয়া ক্ষেত্রে রোপণোপযোগী হইয়া উঠে।

৩। ইক্ষুদণ্ড ১ হস্ত পরিমাণ খণ্ড কাটিয়া একেবারেই ভূমিতে রোপিত হইতে পারে এইরূপ ভাবে রোপিত হইবার পূর্ব্বে সমস্ত ক্ষেত্রটী একবার সেচ দিয়া উত্তমরূপ ভিজাইয়া লইয়া ইক্ষুখণ্ড মৃত্তিকার ভিতর ৩।৪ ইঞ্চ গভীরভাবে বসান কর্ত্তব্য। নতুবা সকল গ্রন্থি হইতে কল বাহির হয় না। ইক্ষুর গ্রন্থি হইতে কল ও শিকড় বাহির হইলেই অবিলম্বে ক্ষেত্রে রোপণ করা কর্ত্তব্য।

৪। মরিসাস, জামেকা প্রভৃতি স্থানে ইক্ষুর বীজ হইতেও গাছ উৎপন্ন করিয়া চাষ হইয়া থাকে অনেকের মতে বীজোৎপন্ন চারা রোগশূন্য হয়, ইক্ষু বীজ অনেকটা যব গোধূমের আকৃতিবিশিষ্ট,—কোন জাতীয় বীজ ছোট, কোনটী বা বড়। ভারতবর্ষে বীজোৎপন্ন ইক্ষুর চাষ প্রায় দেখা যায় না। যুক্ত প্রদেশের কোথাও কোথাও বীজ হইতে ইক্ষুর চাষ হইতে দেখা যায়।

রোপণকাল—মাঘমাসের শেষ বরাবর একটু উষ্ণ ভাব উপস্থিত হইলেই ইক্ষু রোপণের সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। দ্বাদশ মাসের মধ্যেই ইক্ষু পরিপক্ক হয় এব শীত যত দিন বর্ত্তমান থাকে, তত দিন উৎকৃষ্ট গুড় জন্মে। এজন্য মাঘমাসের শেষ বরাবর গাছ রোপিত হইলে সতেজে বর্দ্ধিত হইবার সময় পায় এব পরবর্ত্তী শীতের মধ্যেই পরিপক্ক হইয়া উঠে বলিয়া অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট গুড় পাওয়া যায়। জলাভাব বা ভূমি প্রস্তুতের বিলম্ব নিবন্ধন কোথাও কোথাও এই বপন ক্রিয়া ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত পিছাইয়া পড়ে। ইহাতে দোষ এই হয় যে গাছ ভালরূপ বাড়িবার সময় পায় না এবং গ্রীষ্মকালে ইক্ষু পরিপক্ক হয় বলিয়া গুড়ও ভাল জন্মে না। রাজসাহী জেলায় ভূমির রস থাকিলে আশ্বিন, কার্ত্তিক হইতেই ইক্ষুর রোপণ হইয়া থাকে। ফলে অন্য ইক্ষুর যখন বাল্য বা মধ্যাবস্থা, ইহার তখন পূর্ণাবস্থা। সুতরা পরবর্ত্তী কার্ত্তিকের মধ্যে নূতন গুড় বাজারে দেখা দেয় এব দামেও বিক্রয় হয়। এজন্য অগ্রেই ইক্ষুর রোপণ উত্তম, পরে কিছু নয় এব মাঘী চাষই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভূমি উচ্চ ও সরস হইলে এব জল নির্গমনের বন্দোবস্ত থাকিলে, সম্বৎসর ধরিয়াও ইক্ষুর চাষ চলিতে পারে।

রোপণ ও চাষ—সমস্ত ক্ষেত্রে লম্বালম্বি ভাবে দুই হস্ত অন্তর কোদাল দ্বারা মুটম হাত চওড়া ও ৯ ইঞ্চ গভীর নালা কাটিয়া মৃত্তিকা দুই পার্শে উঠাইয়া ফেলিতে হইবে এবং পূর্ব্ব হইতে রক্ষিত অবশিষ্ট সারের তিন ভাগের দুই ভাগ পরিমাণ নালার মধ্যস্থ মৃত্তিকার সহিত উত্তমরূপে মিলিত করত শিকড় শুদ্ধ কলবাহিয়ান এক এক খণ্ড ইক্ষু ১৫ ইঞ্চ অন্তর বসাইয়া যে মৃত্তিকা উভয় পার্শ্বে উঠাইয়া ফেলা হইয়াছে, তাহাই ১৪ ইঞ্চ পুরু করিয়া চাপা দিয়া ঈষৎ দাবিয়া অবশিষ্ট মৃত্তিকা উভয় নালার মধ্যস্থ ভূমি ভাগে ছড়াইয়া দিতে হইবে। রোপণকালে ভূমি শুষ্ক থাকিলে আবশ্যকমত জল সেচনে সরস করা কর্ত্তব্য, নতুবা উই লাগিয়া চারা নষ্ট করিতে পারে।

স্বাস্থ্য-পঞ্চক

[ডা শ্রীঅশ্বিনীকুমার বসু বর্ম্মা]

১

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শুষ্ক উচ্চস্থান।
আবর্জ্জনা রাশি হ তে স্থিত ব্যবধান॥
বহে চতুষ্পার্শ্বে ব্যাপ্ত বিমুক্ত প্রান্তর।
এ হেন গৃহস্থ বাটী স্বাস্থ্যের আকর॥

২

হ ক গঙ্গোদক কিম্বা মহাতীর্থ জল।
পান পূর্ব্বে যেবা করে সুসিদ্ধ সকল॥
হিন্দু বৌদ্ধ হ ক কিম্বা যবন খ্রীষ্টান্।
মানবগণের মাঝে সেই স্বাস্থ্যবান॥

৩

উদয়াস্ত গৃহে যার সূর্য্যরশ্মি প ।
ববে দূ ম া মাছি নাশে তমোরাশি॥
নিশীথে সুধা শু র শ্মি স্পর্শে শয্যাস্থান।
গৃহস্থগণের ম ঝে সেই স্বাস্থ্যবান॥

৪

অহোরাত্র গৃহে যার দেব সমীরণ।
কল্যাণ প্রসাদ সুখে করি বিতরণ॥
আনন্দ উজ্জ্বল আয়ু করি যায় দান।
গৃহস্থগণের মাঝে সেই স্বাস্থ্যবান॥

৫

খু ল গৃহদ্বার কিম্বা দাড়া য়ে অঙ্গনে।
সীমাহীন নভ নীল নেহারে নয়নে॥
প্রকৃতির কোলে বসি শুনে কলতান।
গৃহস্থগণের মাঝে সেই স্বাস্থ্যবান্।

৬

ক্ষিতি অপ তেজ আর মরুৎগণ।
এই পঞ্চ জড়ভূতে দেহের গঠন॥
শুদ্ধ দেহে এর সাথে যোগ রাখে যেই,
স্বাস্থ্যরাজ্য অধিপতি ভাগ্যবান্ সেই॥

টাকা কোথায় ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি এ]

চিকিৎসার পূর্ব্বে রোগ নির্ণয় করা (diagnosis) যেমন চিকিৎসকের পক্ষে অত্যাবশ্যক তেমনি কি করিয়া এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশে এমন মর্ম্মভেদী দারিদ্র্য উপস্থিত হইল তাহাও জানা দরকার। কবি বলিয়াছেন—'অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল আর এখন ?

সূচ সুতা পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
দেয়াশলাইর কাঠি তাও আসে পোতে
খেতে শুতে যেতে প্রদীপটী জ্বালিতে
কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন।

কেন এমন হইল ? এই নদীমাতৃক দেশে জলাভাবে শস্য ক্ষেতে পুড়িয়া যায় দুগ্ধের অভাবে শিশু শুকাইয়া মরে চাকরী চাকরী করিয়া বাঙ্গালীর ছেলে পাগল হইয়া যায়। সায়েস্তা খাঁর সময়ে টাকায় আটমণ চাল হইয়াছিল ইতিহাস বলে আর এখন বিকায় পশারি। পূর্ব্বে নাকি ২৲ টাকার চাকরী পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা বাড়ীতে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন আর এখন হাজার টাকা মাইনের বাবু অথবা হাজার টাকা আয়ের জমিদারও মায়ের পূজা করিতে সাহস করে না। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা একবার হিসাব বাহির করিয়াছিলেন যে ৷৷৴ তে নাকি দুর্গোৎসবের পূজার বাজারের ফর্দ্দ আগে হইত এর তাহারা সেই আয়োজনে ইতর ভদ্র সকলকে ভোজন করাইতেন। সে সব দিন কোথায় গেল কেন গেল ?

এখন বিলাতে বেকার সমস্যা ভারতে বেকার সমস্যা (unemployment problem) জগৎব্যাপী এক রব উঠিয়াছে—টাকা কোথায় ? অন্যান্য দেশের লোকের আয়ের ও assetsএর সহিত তুলনা করিলে কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয় যে আমরা কি করিয়া বাঁচিয়া আছি। পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে জার্ম্মানীর মাথা পিছু বার্ষিক আয় ৩৬৲ ফ্রান্সের ৮৩৫৲ আমেরিকার ৫৮৫৲ আর ভারতবর্ষের কত জানেন ? ৩৲ মাত্র। এই ৩৲ বাৎসরিক আয় হইতে রাজস্ব জমিদারের খাজনা পূজা পার্ব্বণ মেয়ের বিবাহ ছেলের পড়ার খরচ সব চালাইতে হইবে। ৩৲ আয়ে ভদ্রস্থতা রক্ষা ত দূরের কথা প্রাণধারণ করাই কঠিন। তাই এই দেশের এক পঞ্চমাংশ লোক একবেলা খাইয়া থাকে এক তৃতীয়াংশ লোক রোগ হইলে ডাক্তার কবিরাজের সাক্ষাৎও পায় না নীরবে মরিয়া যায়। ম্যালেরিয়ার কারণ দারিদ্র্য শিশু মৃত্যুর কারণ দারিদ্র্য চুরি ডাকাতির কারণ দারিদ্র্য জাতীয় নৈতিক চরিত্র হানিরও কারণ এই আত্মঘাতী দারিদ্র্য। এক দিন যে জাতি বলিয়াছিল অর্থ অনর্থ —এক দিন যে জাতি বলিয়াছিল যেনাহং মৃত নাস্যাম তেনাহ কিং কুর্য্যাম —এক দিন যে জাতির মধ্যে বুনো রামনাথ পণ্ডিত তেঁতুল ও ভাত খাইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে টোলে সাহায্য গ্রহণের প্রস্তাবে নিজের প্রাচুর্য্যের গর্ব্ব করিয়াছিল আজ সেই দেশে এমন টাকা কোথায় রব উঠিল কেন ? আমরা কি হঠাৎ অভাব বাড়াইয়াছি না বাস্তবিকই প্রয়োজন বাড়িয়াছে ? আজ দেখিতে হইবে এই হাহাকারের ও অভাবের মূল কোথায়।

ইংরেজ যখন এ দেশে আসিলেন তখন দেখিলেন, প্রতি গ্রামে বণিক ক্ষৌরকার তৈলিক কুম্ভকার আছে। প্রতি গ্রামে মন্দির পাঠশালা আছে তাহারা সমস্বরে বলিলেন যেন—The Indian village community is a little republic। কিন্তু কিছু কাল এ দেশে বাস করার পর তাঁহারা দেখিলেন কর্ম্ম চারী চাই দোভাষী (interpreter) চাই। এইরূপে কেরাণীকুলের সৃষ্টি হইল। পরে ইংরেজের জাত ভাইরা

ব্যবসার এই উপযুক্ত ক্ষেত্র মনে করিয়া দলে দলে আসিলেন সরকারের তরফ হইতেও চেষ্টার ত্রুটি হইল না শিল্পপ্রধান এই দেশ চাষী ও চাকুরীজীবী প্রধান দেশে পরিণত হইল—জাত ব্যবসা ছাড়িয়া সকলে কেরাণী হইল তাঁতশালা ঘানি বন্ধ হইল। ঠুনকো বিলাতী দ্রব্যসম্ভারে গৃহস্থালী পূর্ণ হইয়া গেল। লোকের কাল্পনিক অভাবের সৃষ্টি হইল। জাত ব্যবসা যাওয়াতে

তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার

এই কবিতাও কবিকে লিখিয়া দেশের অবস্থা বোঝাইতে হইল।

আজ দেশে আমরা কি দেখিতেছি ? বাঙ্গালাদেশে প্রতি সহস্রের মধ্যে ৭৮৭ জন কৃষি দ্বারা ৭৮ জন খনি কল কারখানা প্রভৃতি প্রভৃত শ্রমসাধ্য ব্যবসা দ্বারা ৫ জন সাধারণ ব্যবসা দ্বারা এবং ২৩ জন উকীল ডাক্তার প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসা ও সরকারী চাকরী দ্বারা প্রতিপালিত হয়।

কোথায় বা গেল

চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম্মবিভাগশ —

সমস্ত জাতি চাকরীতে মাতিয়া উঠিল—

চাকরী তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি
এই আফিসের কাজটী যেন বজায় রেখে মরি।

চা চুরুট হ তে চাকরী পর্য্যন্ত সকলই একদিন ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে আমরা সখ করিয়া গ্রহণ করিয়া ছিলাম—এখন উহা জগদ্দল পাথরের মত বুকে চাপিয়া বসিয়াছে। পল্লীগৃহ ঠুনকো কাঁচের জিনিষে ভরিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের মত ভাল কাঁসার পিতলের অথবা রূপোর বাসন আজকাল খুব কম গৃহস্থের বাড়ীতেই পাওয়া যায়। একদিকে আর্থিক অসঙ্গতি অপর দিকে বিলাসিতার দায়ে এই রুচি বিপর্য্যয় হইয়াছে। টাকার অভাবই যে এই দুর্গতির একমাত্র কারণ নহে—এজন্য বিলাসিতার মোহও দায়ী। গরিব চাষীর ছেলে যে জাত ব্যবসা ছাড়িয়া পেয়াদাগিরি করে উহার কারণ আর্থিক অনটন নহে সহর বাসের লোভও আছে। চাষী চাষবাস দেখিলে যা আয় হইত পেয়াদাগিরিতে তার বেশী হয় না অথচ নিত্য মনিবের চোকরাঙ্গানীও সহ্য করিয়া পেয়াদা সহরেই থাকে। তার কারণ সেখানে ইয়ারকির সুবিধা আছে বিলাসিতার মোহ আছে। জাতব্যবসা অনেকেই এমনি করিয়া ছাড়িয়া দিল। ইংরাজ সহর পত্তন করিলেন—দেশীয়েরা মহানন্দে বাস্তুভিটা ছাড়িয়া সহরে হইলেন। কোথায় ভাসিয়া গেল পৈতৃক ব্যবসা কোথায় বা গেল বাস্তুভিটার মোহ। সহরবাস আর্থিক অসঙ্গতির জন্য দায়ী—এ কথা বলিলেই চতুর ও বিজ্ঞজন বলিবেন ম ায় সহর আছে বলিয়াই দুমুঠা করিয়া খাইতেছি পল্লীতে থাকিলে উপবাস করিতে হইত। তাহাদের এই সহর বাসের স্বপক্ষ যুক্তি খুব বৈজ্ঞানিক বলা যায় না। সহর যে পল্লীর আয়েই চলে তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন কি না জানি না। বড় বড় পিতলের লেবেল মারা কোম্পানী যে পল্লীগ্রামের কাঁচা মালেরই ছাপ দিয়া ব্যবসা করিতেছেন মাত্র তাহা ত বালকেও জানে। সহর সৃষ্টির ফলে ও চাকুরীর লোভই আর্থিক এই দুর্গতির কারণ। অধ্যাপক বেইলী (Prof Bailey) মহাশয় বলেন—

The city sits like a parasite running out its roots into the open country and draining it of its substance The city takes everything to itself—materials money men—gives back only what it does not want

সহর সৃষ্টির পরই কাঁচা টাকা আমরা এত ভাল বাসিতে শিখিয়াছি কারণ সহর বাস করিতে হইলেই নিত্য নূতন অর্থ চাই।

আমাদের দেশে এক জাতীয় লোক আছেন—তাহারা বলেন সভ্যতা মানুষের অভাব বাড়াইয়া থাকে এবং সভ্যতার অন্য নাম বেশী রোজগার করা এবং বেশী খরচা করা। তাঁহাদের যুক্তি এই যে অভাব বোধ না আসিলে মানুষ কোন দিন নিজে উপার্জ্জনের চেষ্টা দেখে না এবং ফলে জাতীয় ধনও বৃদ্ধি পায় না। ইঁহাদের এই যুক্তি একেবারে অকাট্য বলা চলে না।

প্রামত পি।াসি। আমাদের যত বাড়িবে—বিদেশী বণিকের তত লাভ হইবে—জাতীয় ধন বাড়িবে না। আমরা ত এখন লক্ষ লক্ষ বিলাতি জিনিষের ব্যবসা করিতে শিখিয়াছি কৈ কয়টা জিনিষ আমরা তৈরী করিতে নিজেরা পারি? আমরা কাপড়ের জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারের দিকে ছুরী কাঁচির জন্য সেফিল্ডের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া থাকি। আমাদের পাট বিলাতে যাইয়া বং হইয়া যখন আসে তখন আমরা উহার আলোয়ান গায়ে দিই আমাদের সিল্ক বিলাতে যাইয়া finished হইয়া আসিলে উহা বিলাসিনীদের পোষাকে ব্যবহৃত হয়। অভাব ত সহস্র সৃষ্টি করিয়াছি কৈ উদ্ভাবনী শক্তি ত বড় দেখা যাইতেছে না। পাশ্চাত্য পরিদর্শক বিলাতের ভূতপূর্ব মন্ত্রী Ramsay Mac donald মহাশয়ের চোখে এই বিসদৃশ চিত্রটী পড়িয়াছে। তাঁর কথার সার মর্ম্ম এই যে লোকে অভাব সৃষ্টি করিয়া কেবল নিঃশেষ হইয়াই যাইতেছে—সভ্য হইতেছে না। তিনি লিখিয়াছেন—

The peoples wants—too many of them debased—are becoming more costly to meet As evidence of increased prosperity I place little reliance on them They simply show that people are running after cheap luxuries tha their sources of satisfaction are changing that they are spending more money upon themselves Better clothes are being worn cigarettes are taking the place of the hooka alcohol is being more widely consumed shoes are more general umbrellas are becoming more common

তাই বলিতেছিলাম যে অভাব বোধ আমাদের নিঃশেষই করিতেছে—শ্রীসম্পন্ন করিতেছে না। আমরা প্রতি পদে কেবল পরমুখাপেক্ষী হইয়া "হা টাকা কৈ টাকা" করিতেছি। কেবল নিজের অভাব বাড়াইয়া—অতৃপ্তি বোধ করার কোন সার্থকতা নাই। দেশব্যাপী এই হাহাকার থামাইতে হইলে চাল চলনও কিছু বদলাইতে হইবে—কাল্পনিক অভাবগুলির মাত্রা না কমাইলে এই অভাববোধ হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব' কেবল বাড়িয়াই যাইবে লোকের জীবনভার অধিকতর দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। তাই আর্য্য ঋষিরা বলিয়াছেন—'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'। জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কল্পনিক অভাবই বেশী—ভাত কাপড়ের অভাবও এখন মধ্যবিত্তের মধ্যে বেশ দেখা দিয়াছে। কিন্তু অনেক জায়গায়ই দেখা যাইতেছে যে ভাত কাপড়ের জোগাড় করার অপেক্ষা মানুষকে কাল্পনিক অভাবগুলির তাড়নায়ই বেশী অস্থির হইতে হয়। অভাবগুলি একটু কমাইলে শান্তি পাওয়া যাইতে পারে। অভাব যত বাড়িবে বিদেশীর পকেট তত ভরিয়া উঠিবে—আমরা মনে ও ধনে নিঃশেষ হইয়া যাইব। তাই কবি বলিয়াছেন—

মোটা খাব ভাইরে পরবো মোটা
চাইনে ল্যাভেণ্ডার চাইনে অটো।

অনেকেই বলিবেন মহাশয় এই বৈষ্ণব সুলভ মনোবৃত্তিই আমাদের পরাধীনতার কারণ। আমরা কি এই বিশ্বের আন্দোলনের বাহিরে থাকিব? আমরা কেন নিজেকে বঞ্চিত করিব? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—আমরা বীরের মত উপার্জ্জন করিব এবং মুক্তহস্তে ব্যয় করিব। টাকার অন্বেষণে আমরা পাগল হইব—কবির মত আমাদেরও মন্ত্র হইবে—

যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে
বায়ু উল্কাপাত বজ্র শিখা ধরে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

আমরা এই বিংশ শতাব্দীতে মরার মত পড়িয়া থাকিব না— আগে চল আগে চল ভাই।

ইহাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত—ইহারা বিশ্বময় তোলপাড় করিতে প্রস্তুত। আমরা কিন্তু বলি—বাহিরে যাইতে হইবে না—আমার বাংলা মায়ের মাটিতেই সোণা আছে—ক্ষেত্রও আছে এই খানেই অর্থ সৃষ্টি করিতে হইবে। বিশ্বময় অর্থের

অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ান খুব সাধু ও মহান উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু আগে ঘর সামলান ই বেশ বুদ্ধিমানের কাজ। বাংলায় জমি অনাবাদী পড়িয়া আছে চাষী নাই শিল্প আছে শিল্পী নাই ক্ষেত্র আছে মানুষ নাই—ফলন নাই। গ্রামে গ্রামে শিল্প অর্থাভাবে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে লোপ পাইয়া যাইতেছে। গোলাবাড়ি লোপ পাইতে বসিয়াছে। জাতা ঘানি বন্ধ হইয়া গেল। আমরা টাকা টাকা করিয়া নগর হইতে নগরে ছুটিতেছি কিন্তু টাকা যে গৃহ কোণেই লুকাইয়া আছে তা জানিয়াও জানিতে চাহিতেছি না। তাই বলিতেছিলাম—তোরা ঘরের পানে তাকা।

(ক্রমশঃ)

অজীর্ণ রোগের কারণ ও প্রতিকার

অজীর্ণ রোগের সম্বন্ধে আমাদের স্বাস্থ্য সমাচারে কত সহস্রবার যে আলোচনা হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। কিন্তু এই রোগ এত বহুবিস্তৃত, এত অসংখ্য লোক এই রোগে ভুগিতেছে, যে, ইহার পুন পুন আলোচনা করা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

কেবল আমাদের দেশে নয়, সমস্ত পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ত এই রোগে কষ্ট পাইতেছে। এক মাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ইহার প্রসার কতখানি, তাহার একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমেরিকার এক পেটেন্ট ঔষধের কারখানার মালিকরা কেবল মাত্র অজীর্ণ রোগের পেটেন্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনের জন্য বৎসরে ৪ লক্ষ ডলার খরচ করেন। এক ডলার আমাদের প্রায় সওয়া তিন টাকার সমান। সুতরাং ইহাদের কারবার কত বড়, অজীর্ণ রোগের ঔষধের কাটতি কেমন, কত রোগী এই পেটেন্ট ঔষধটি ব্যবহার করে, তাহা আপনারা মনে মনে একটা আনুমানিক হিসাব করিয়া দেখুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন।

অজীর্ণ রোগ হয় কেন ?

এত লোকে যে অজীর্ণ রোগে কষ্ট পায়, তাহা শুধু নিজেদের বুদ্ধির দোষে। একটু হিসাব করিয়া চলিলে, খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে একটু বিবেচনা করিয়া চলিলে এই রোগ কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারে না। মানুষ নিজের শরীরের উপর যত রকম অত্যাচার করিতে পারে, তাহার মধ্যে পাকস্থলীর উপর অত্যাচারের গুরুত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অজীর্ণ রোগটা আর কিছু নয়—যাহা আহার করা যায়, পাকস্থলীতে তাহা জীর্ণ হয় না, পাকস্থলী তাহা পরিপাক করিতে পারে না। কাজেই পাকস্থলী, অযথা ভারাক্রান্ত, শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে। জীবনে কখনও অজীর্ণ রোগে কষ্ট পায় নাই—পৃথিবীতে এমন লোক একজনও নাই বলিলেও বোধ হয় বেশী বলা হয় না।

অজীর্ণ রোগের লক্ষণ।

পেট ভার ভার, পেট ফাঁপা, উদরে বায়ুর প্রকোপ, অপান বায়ুর উৎপত্তি, চোঁয়া ঢেকুর উঠা, বুকজ্বালা, উদ্গার, গলনালীতে অম্লস্বাদের অনুভূতি, ক্ষুধামান্দ্য, জিহ্বা ময়লা ও জিহ্বায় জড়তা, প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, মুখে বিশেষত দন্তে দুর্গন্ধ, পেটব্যথা, পেট কামড়ানো, মেরুদণ্ডে কোমরের কাছে বেদনা, গা বমি বমি করা প্রভৃতি অজীর্ণ রোগের কতকগুলি লক্ষণ। এই সকল লক্ষণই যে একেবারে দেখা যায়, তাহা নহে। ইহাদের মধ্যে একটা, দুইটা বা কয়েকটা একসঙ্গে দেখা দিতে পারে এবং তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেই দেখা যাইবে—অজীর্ণতাই তাহাদের মূল কারণ।

চিকিৎসার দুরবস্থা।

কিন্তু লোকে তাহা বোঝে না। উপরিউক্ত লক্ষণগুলির কোন একটী বা দুইটি দেখা দিলে, তাহাকে একটী স্বতন্ত্র রোগ ভাবিয়া লোক কেবল সেই লক্ষণটির বা লক্ষণগুলির চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়,—নানা ঔষধ সেবন করিতে থাকে। অথচ কিয়ৎক্ষণের জন্য যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ হ্রাস ছাড়া পায়া রোগী উপকার পায় না। কাজেই এক ঔষধের পর আর একটা ঔষধ এই ভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু উপকার পাইবে কোথা হইতে? চিকিৎসা হয় শুধু একটা লক্ষণের, রোগের মূল কারণে হাত পড়ে না। কাজেই কোন উপকারও হয় না।

আবার রোগী যত, বৈদ্য তদপেক্ষা বহুগুণ বেশী। একজনের দেহে অজীর্ণ রোগের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, তাহার পরিবারের প্রত্যেক লোকে, তাহার প্রত্যেক পরিচিত লোক, তাহার প্রত্যেক বন্ধু বান্ধব একটা না একটা ঔষধের নাম করিয়া তাহা ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিবেই। সংসারে এইরূপ সবজান্তা লোকেরও যেমন সংখ্যা করা যায় না, তদ্রূপ তাহাদের প্রত্যেকেরই এক একটা বিশেষ বিশেষ ঔষধেরও সংখ্যা করা যায় না। আর রুগ্ন ব্যক্তির অবস্থা তখন "Any port in the storm"। কোন ঔষধেই উপকার পায় না বলিয়া, রোগের যন্ত্রণায়, যে যা ঔষধ ব্যবহার করিবার পরামর্শ দেয়, সেও বিনা বিচারে তাহাই সেবন করিয়া থাকে।

বলা বাহুল্য এই সকল ধন্বন্তরির প্রেসক্রিপসনে কোন উপকার ত হয়ই না, পক্ষান্তরে, তাহাতে অপকার যথেষ্ট হইয়া থাকে। ডাক্তারী মতে অজীর্ণ স্থলে আফিম, oxalate of cerium, বিসমাথ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এই সকল ঔষধে কিয়ৎক্ষণের জন্য রোগের যন্ত্রণা হ্রাস হয় বটে, কিন্তু ইহা হইতে, রোগের উপশম হইয়াছে, এরূপ মনে করা ভুল। ঐ সকল ঔষধ ক্ষণকালের জন্য পাকস্থলীকে অসাড় করিয়া ফেলায় রোগের যন্ত্রণা কিয়ৎক্ষণের জন্য অনুভূত হয় না মাত্র। আসল অজীর্ণ রোগ বা তাহার কোন লক্ষণের উপশম করিবার ইহাদের একটুও সামর্থ্য নাই। পুন পুন এই ঔষধগুলি ব্যবহার করিলে পাকস্থলী অবশেষে একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে, এবং রোগ পুরাতন হইয়া দাঁড়ায়। তখন আর আরোগ্য লাভের কোন আশাই থাকে না।

অবসাদক ঔষধ ব্যবহারে যখন আর কোন উপকারই পাওয়া যায় না, তখন উত্তেজক ঔষধ, যথা, আর্সেনিক নক্স ভমিকা, কিম্বা ষ্ট্রিকনাইন প্রভৃতির ব্যবহার আরম্ভ হয়। তখন রোগীর অবস্থা দাঁড়ায় ঠিক—"from the frying pan to the fire"। অবসাদক ঔষধ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করার ফলে পাকস্থলী ও তদানুষঙ্গিক যন্ত্রাদি যখন অবসন্ন, অকর্মণ্য হইয়া পড়ে, তখনই কি না এই সকল বিষগুণসম্পন্ন ঔষধ ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। ইহার ন্যায় অবিবেচনার কাজ আর কি হইতে পারে? উত্তেজক ঔষধে ক্ষণকালের জন্য শারীর যন্ত্রগুলি কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইতে পারে বটে, কিন্তু উহারা ত অজীর্ণ রোগের ঔষধ নয় কাজেই রোগ পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান থাকে তাহার উপর পাকস্থলীকে অযথা উত্তেজিত করায় যখন প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তখন রোগীর অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায় তাহা সহজেই অনুমেয়। সুস্থ শরীরেই এই সকল উগ্রবীর্য্য ঔষধ জীর্ণ করা কঠিন। তাহার পরিবর্ত্তে এখন ত রুগ্ন, দুর্ব্বল, কাহিল অবস্থা।

অজীর্ণ রোগের তৃতীয় শ্রেণীর ঔষধগুলি ক্ষারগুণ সম্পন্ন, যথা, সোডা, ম্যাগনেশিয়া প্রভৃতি। যেখানে অজীর্ণতার ফলে অম্লোদ্গার প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয় তথায় ক্ষারগুণসম্পন্ন ঔষধে অম্লনাশ করে বটে, কিন্তু এই সকল ক্ষারধর্ম্মী ঔষধগুলিকে জীর্ণ করিবার জন্য আরও অধিক পরিমাণে অম্লধর্ম্মী পাচক রস বাহির হইয়া আসে। ফলে হিতে বিপরীত অবস্থা ঘটে। খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জে, এইচ, কেলগ পরীক্ষা দ্বারা এই সত্যটি অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পেটেন্ট ঔষধ।

ইহার পর রোগী হতাশ হইয়া পড়ে। তখন সে যে কোন পেটেন্ট ঔষধের খবর পায়, তাহাই কিনিয়া আনিয়া সেবন করিতে থাকে। পেটেন্ট ঔষধের ভিতরের কথা যাহারা জানেন, তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত সাক্ষ্য দিতে পারিবেন যে, এই সকল পেটেন্ট ঔষধ প্রস্তুত করিবার মশলাগুলি অতি সামান্য ও তুচ্ছ জিনিস। কোনটা হয় ত কিঞ্চিৎ খড়ির গুড়া কিঞ্চিৎ পুরাতন বর্ণচোরা কালো মাতগুড়, কিম্বা ঐরকম কোন কিছু। এই সব ঔষধ প্রস্তুত করিবার ব্যয় দুই এক পয়সার বেশী কিছুতেই নহে, অথচ ইহারা একটাকা দেড়টাকা দামে স্বচ্ছন্দে বিকাইয়া যায় কেবল সুদৃশ্য শিশি বা কৌটা, সুদৃশ্য লেবেল ও মনমজানো বিজ্ঞাপনের জোরে। যদি গুণের জোরে এই সকল ঔষধকে বাজারে চলিতে হইত, তাহা হইলে দুইচারি দিনের মধ্যে ইহাদের বিক্রয় বন্ধ হইয়া যাইত। কোন ঔষধ কিছু দিন চলিবার পর যদি তাহার বিক্রয় কমিয়া আসে, তবে সেই জিনিসই ভিন্ন নামে, নূতন ধরণের লেবেলে সজ্জিত হইয়া ভিন্ন ঠিকানা হইতে বাহির হয়, এব এইভাবে আরও কিছু দিন চলিয়া থাকে। ইহাদের নামগুলি এমন গালভরা ও শ্রুতিসুখকর যে, স্থায়ী অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের কর্ণে ইহা মধু বর্ষণ করে। ইহাদের লেবেলের নক্সাও অতি সুন্দর। এব বিজ্ঞাপনে ইহাদের গুণ বর্ণনা বঙ্কিম বাবুর আয়েসার রূপ বর্ণনাকেও হারাইয়া দেয়।

অজীর্ণ রোগের সুচিকিৎসা।

অজীর্ণ রোগীদের জানিয়া রাখা উচিত যে, সকল প্রকার অজীর্ণ রোগ একই কারণে উৎপন্ন হয় না। সুতরাং একই ঔষধে সকল প্রকার অজীর্ণ রোগ আরাম হইতে পারে না। অথচ, পেটেন্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনে ঔষধের গুণ এমন ভাবে বর্ণনা করা হয়, যেন তাহা ব্যবহার করিলে "জুতা গড়া হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত" সকল প্রকার অজীর্ণ রোগ আরাম হইতে পারে এমন কি, গোঁফ হারাইলেও পাওয়া যায়।

অজীর্ণ রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হইলে শুধু লক্ষণগুলির চিকিৎসা করিলে কোন উপকার পাওয়া যায় না—একেবারে গোড়া ধরিয়া টান দিতে হয় অর্থাৎ যে স্থলে যে কারণে অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই স্থলে সেই কারণ সর্ব্বাগ্রে নিবারণ করিতে হয়। অতএব প্রথমে দেখিতে হইবে, অজীর্ণ রোগ হয় কেন? তার পর তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে।

অজীর্ণ রোগের মূল কারণ—পাকস্থলীর উপর অযথা অত্যাচার। যা তা ঔষধ খাওয়াও পাকস্থলীর উপর একটা অত্যাচার বটে। এই অত্যাচার দমন করিতে হইবে—প্রথমেই খাদ্য বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। বিবেচনা পূর্ব্বক খাদ্য গ্রহণ করিলে কিছু দিনের মধ্যেই অজীর্ণ রোগ অনেকটা উপশম হইয়া আসিবে।

অজীর্ণ রোগের কারণ

একটা নয়—অনেক। সকল লোকেরই ঠিক একই কারণে অজীর্ণ রোগ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন লোকের বিভিন্ন কারণে এই রোগ হইয়া থাকে। অতএব অজীর্ণ রোগের কারণ নির্ণয় করিতে হইলে রোগীকেই তাহা করিতে হইবে। আহার্য্য দ্রব্য, আহারের নিয়ম, আহারের সময়, পাকস্থলীর বিশ্রাম প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর তাহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এবং ইহার ফলাফলও লক্ষ্য করিতে হইবে। চিকিৎসক মোটামুটি কয়েকটি উপদেশ দিতে পারেন। তদনুসারে চলিলে অজীর্ণ রোগের কারণ সহজেই ধরিতে পারা যাইবে। তখন উহার প্রতিকারও সহজসাধ্য হইয়া আসিবে।

খাদ্য গ্রহণের প্রণালী—

১। তাড়াতাড়ি আহার।

আফিসের কেরাণীবাবু, স্কুল কলেজের ছাত্র, ডেলি প্যাসেঞ্জার প্রভৃতি শ্রেণীর লোককে বাধ্য হইয়া তাড়া তাড়ি গোগ্রাসে আহার করিতে হয়। সময়ের তাড়া না

থাকিলেও অনেকে আবার স্বভাব দোষে তাড়াতাড়ি আহার করে। খুব গরম ভাতে খুব গরম ডাল বা ঝোল খানিকটা ঢালিয়া লইয়া সপ সপে করিয়া মাখিয়া এক এক গ্রাস মুখে তুলে এবং একটু গরম তরকারী টাক্‌না দিয়া তৎক্ষণাৎ ভাতের গ্রাস গিলিয়া ফেলে—মোটেই চিবায় না। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—গম যেমন যাতায় কিম্বা রোলার মিলে ফেলিয়া চূর্ণ করিয়া আটা ময়দা প্রস্তুত করিতে হয়, তদ্রূপ ভাতও সূক্ষ্মভাবে গুঁড়াইয়া না লইলে তাহা তাড়াতাড়ি উদরস্থ করিলেও পরিপাক করা যায় না। আমাদের যে দুই পাটী সুদৃঢ় দন্ত আছে, তাহাকে যাতা বলিতে পারা যায়। সেই যাঁতায় ভাতগুলিকে পিষিয়া সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিয়া লইতে হয়। তবে ভাত জীর্ণ করিবার উপযোগী হয়। খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করিলে, উহা প্রকৃতপক্ষে খাদ্যে পরিণত হয় না। খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ কালে মুখের ভিতর যে রস সঞ্চার হয় তাহা শুধু যে খাদ্যকে তরল করিয়া গলাধঃকরণের উপযোগী করে তাই নয়—কার্ব্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে উহা কতকটা জীর্ণ করিয়া ফেলে। বিনা চর্ব্বণে খাদ্য গিলিয়া খাইলে উহা পাকস্থলীতে গিয়া পাচক রসে জীর্ণ হইতে পারে না।

আমাদের এই দেহটী একটী প্রকাণ্ড রসায়নাগার বা ল্যাবরেটরী। এখানে নিয়ত রাসায়নিক যোগ বিয়োগ চলিতেছে। খাদ্য পাচক রসের সহযোগে জীর্ণ হইয়া রূপান্তরিত হইয়া শরীর পোষণের উপাদান সৃষ্টি করিতেছে। মানব দেহে কি ভাবে রাসায়নিক কার্য্য চলে, তাহা একটা দৃষ্টান্ত হইতে বেশ বুঝিতে পারিবেন।

আপনি এক টুক্‌রা খয়ের লউন। আর এক ডেলা শুষ্ক চূণ লউন। দুইটী জিনিস পরস্পরের সঙ্গে মিলিত করুন। তার পর দেখুন, উহাদের কোন রূপান্তর হইল কি না। দেখিবেন, কোনই রূপান্তর হয় নাই। আপনি ইচ্ছা করিলেই খয়েরের ডেলা ও চূণের ডেলা পৃথক করিতে পারিবেন। কিন্তু আপনি যদি খয়েরের ডেলাটীকে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া জলে গুলিয়া লয়েন, এবং চূণের ডেলাটিকেও জলে ভিজাইয়া চূণের জল প্রস্তুত করিয়া লয়েন, তাহা হইলে খয়েরের জল ও চূণের জল পরস্পর মিশ্রিত করিলেই চূণ ও খয়ের রাসায়নিক ভাবে মিলিত হইয়া রক্তবর্ণ হইয়া উঠিবে। তখন আর আপনি ইচ্ছা করিলেই চূণ ও খয়েরকে পৃথক করিয়া লইতে পারিবেন না। পানে চূণ মাখাইয়া তাহাতে এক টুক্‌রা খয়ের ও কিঞ্চিৎ সুপারি দিয়া পান সাজিয়া রাখা হইল। ইহাতে চূণ বা খয়েরের কোন রূপান্তর হইল না। ইচ্ছা করিলেই পান খুলিয়া খয়েরের ডেলাটি তুলিয়া লইতে পারা যায়, এবং পান হইতে চূণটুকুও মুছিয়া লইতে পারা যায়। কিন্তু পানটী মুখে পুরিয়া কিছুক্ষণ চর্ব্বণ করিলে খয়েরের ডেলা চূর্ণ হইয়া লালার সহিত মিশিয়া চূণের সঙ্গে রাসায়নিক ভাবে মিলিত হইয়া রূপান্তরিত হইবে—লাল টুক্‌টুকে হইয়া উঠিবে।

খাদ্য সম্বন্ধেও ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা। চর্ব্বণ করিয়া লালার সহিত মিশ্রিত করিয়া উহার যথোচিত রূপান্তর ঘটাইয়া উহাকে পাকস্থলীতে প্রেরণ না করিলে পাকস্থলীর পাচক রসগুলি উহাকে জীর্ণ করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিয়া শরীরকে অযথা পীড়িত ও উৎপীড়িত করিবে মাত্র। অবশেষে উহা যথাকালে মলদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া যাইবে। এইরূপ অচর্ব্বিত খাদ্য শরীর পোষণে ত কোনই সহায়তা করেনা; অধিকন্তু, পাচক রস উহাকে জীর্ণ করিতে অপারগ হওয়ায় অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়। এখন বুঝিয়া দেখুন এরূপ অবস্থায় ঔষধ কেমন করিয়া অজীর্ণ রোগ নিবারণ করিতে পারে? এই কারণে যাহার অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়, সে যদি ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইতে অভ্যাস করে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, বিনা চিকিৎসায় তাহার অজীর্ণ রোগ আপনা আপনি আরাম হইয়া আসিতেছে।

২। গুরু ভোজন।

পেটুক ব্যক্তিরা লোভে পড়িয়া বেশী খাইয়া পরিণামে অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হয়। পাকস্থলীতে স্থানও

সীমাবদ্ধ। পাচক রসের পরিমাণ এবং হজমী শক্তিও সীমাবদ্ধ। কিন্তু পেটুকেরা সর্ব্বদা ইহার অধিক খাদ্যে পাকস্থলী বোঝাই করিয়া রাখে। কাজেই তাহা হজমও হয় না। সুতরাং রোগও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অতিরিক্ত খাদ্য জীর্ণ করিবার চেষ্টায় অতিরিক্ত পরিশ্রমে পাকস্থলী অবসন্ন, নিস্তেজ হইয়া পড়ে। বেশী পরিমাণে খাওয়া যেমন দোষের, খুব ঘন ঘন খাওয়া ঠিক সেই রকম দোষের। একবারে গৃহীত খাদ্য জীর্ণ হইয়া শরীরে শোষিত হইবার পর পাকস্থলীকে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম দিতে হয়। তা না দিয়া তৎপূর্ব্ব পুনরায় ভোজন করিলে অজীর্ণ উৎপন্ন না হইয়া যায় না।

কি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার কোন সাধারণ নিয়ম স্থির করা যায় না। আব হাওয়া, ঋতু এর আরও অনেক আনুষঙ্গিক অবস্থার উপর খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরা একজনের পক্ষে যাহা লঘু আহার, অপর একজনের পক্ষে তাহাই হয় ত গুরু আহার হইয়া পড়িতে পারে। তবে সকলের পক্ষেই যে নিয়ম সমানভাবে খাটিতে পারে তাহা এই যে, কিছু ক্ষুধা থাকিতে আহারে নিবৃত্ত হওয়া। আহার শেষ হইয়া আসিবার সময় যখন মনে হইবে আরও কিছু খাইতে পারা যায়, এমনি সময় আহার বন্ধ করিতে হইবে। তবে অবশ্য পেটুকদের কথা স্বতন্ত্র। পূর্ণ আহার করিবার পর, যখন পেটে আর এককণা খাদ্য ধারণেরও স্থান নাই, এমন অবস্থাতেও তাহারা মনে করে যে, তাহাদের পেট সম্পূর্ণ ভরে না —আরও কিছু পাইলে ভাল হয়। এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে কোন নিয়মই খাটে না। কিছু ক্ষুধা থাকিতে আহারে নিবৃত্ত হওয়ার নিয়ম সাধারণ লোকের পক্ষে। কোন খাদ্য খুব মুখরোচক হইলেও লোভে পড়িয়া বেশী খাইতে নাই, এ লোভ সম্বরণ করিতেই হইবে।

৩। বহুবার খাওয়া।

দুগ্ধপোষ্য শিশুদের খাদ্য নিয়ম করিয়া নির্দ্ধারিত সময়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। বালক ও যুবকদের দিন চারবার খাইলেই যথেষ্ট—সকালে জলখাবার, মধ্যাহ্নে পূর্ণাহার অপরাহ্নে জলখাবার ও রাত্রে লঘু মাত্রায় পূর্ণাহার। বয়স্ক ব্যক্তিদের দুইবার—মধ্যাহ্নে ও রাত্রে—পূর্ণাহার যথেষ্ট। ইহার অধিকবার আহার করা অজীর্ণ রোগকে ইচ্ছা করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আনা মাত্র। অনেকের অভ্যাস আছে—যখন তখন খাওয়া। খাদ্য জুটিলেই কোন বিষয় বিবেচনা না করিয়া খাওয়া। বলা বাহুল্য, এইরূপ ভোজনের ফল—পাকস্থলীকে অতিশ্রমে ক্লান্ত করিয়া ফেলা।

৪। দুষ্পাচ্য খাদ্য।

সকলের দেহে সকল খাদ্য সহ্য হয় না। সাধারণত পুষ্টিকর বলিয়া পরিচিত খাদ্যও অনেকে হজম করিতে পারে না। কোন কোন খাদ্যে কাহারও কাহারও পাকস্থলীর একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা দেখা যায়। অর্থাৎ কোন একটা বিশেষ খাদ্য তাহার সহ্য হয় না। এরূপ লোকের খাদ্য নির্ব্বাচন সাবধানে করা কর্ত্তব্য। যাহা তাহার সহ্য হইবে না, সে খাদ্য গ্রহণ না করাই ভাল। আবার কোন কোন খাদ্য সকলের পক্ষেই সমান দুষ্পাচ্য। এরূপ খাদ্য কাহারও গ্রহণ করা উচিত নহে। রন্ধনের দোষে খাদ্য দুষ্পাচ্য হইয়া পড়িতে পারে। অধিক মশলা দেওয়া, অর্দ্ধসিদ্ধ, অপক্ব খাদ্য সকলের পক্ষেই দুষ্পাচ্য। খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধির জন্য বেশী মশলা দেওয়ার অন্য অসুবিধাও আছে—লোভে পড়িয়া গুরু ভোজন করিতে হয়। যাহারা নিত্য দুষ্পাচ্য খাদ্য গ্রহণ করিয়া অজীর্ণ রোগে পীড়িত হয়, তাহাদের খাদ্য সংস্কার না করিয়া, হাজার চিকিৎসা করিলে কোন ফল ফলিবে না। দুষ্পাচ্য খাদ্য খাইতে থাকিলে দেহটিকে ডিসপেপ্সিয়াবীতে পরিণত করিয়াও অজীর্ণ রোগের হাত নিস্তার পাওয়া যাইবে না।

৫। বিরুদ্ধ ভোজন।

অজীর্ণ বোগের আর একটি কাব।—বিরুদ্ধ ভোজন। অর্থাৎ প বস্পব বিবোধী খাদ্য একসঙ্গে ভোজন কবিলে পবিপাক ক্রিয়াব ব্যাঘাত ঘটে। কয়লা, গন্ধক ও সোবা যতক্ষণ আলাদা আলাদ থাকে, ততক্ষণ তাহাবা নিবাপদ। কিন্তু চূর্ণ আকাবে নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রিত হইলে গান্ পাউডাব বা বাবদরূপে ভয়ানক বিপদজনক বস্তু হইয়া উঠে। সেইরূপ অনেক খাদ্য আছে যাহা উদবস্থ হইয়া মিশ্রিত হইলে, এব তাহাতে পাচক রস সংযুক্ত হইলে বাবদেব ন্যায় বিপজ্জনক রূপ ধাবণ করে। আবার, আবও এক রূপে খাদ্য পবিপাক হওয়াব বিবোধী হইয়া উঠিতে পাবে। যে খাদ্য যখন ভোজন কবা যায়, তখন সেই খাদ্য জীর্ণ কবিবাব উপযোগী পাচক বস নিঃসৃত হয়। মনে কবন, মাংস ভোজন কবিলে তাহা জীর্ণ কবিবাব জন্য একপ্রকাব পাচক বস নিঃসৃত হয়। আবাব দুগ্ধ পান কবিলে প্রথমোক্ত পাচক রসেব ঠিক বিপবীত ধর্ম্মী আব একপ্রকাব পাচক বস নির্গত হয়। এই দুইপ্রকাব পাচক বসেব পবস্পবেব মধ্যে সামঞ্জস্য হয় না। কাজেই মাংস ও দুগ্ধ একত্র ভোজন করা নিষিদ্ধ করিলে, শরীবেব অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী।

কোন্ কোন্ খাদ্য এক সঙ্গে ভোজন করিলে বিরুদ্ধ ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহার তালিকা অতি দীর্ঘ—বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে তালিকা দেওয়া সম্ভবপর নহে। তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধেব বিষয়, এব সুবিধা হইলে স্বতন্ত্র ভাবে তাহার আলোচনাব চেষ্টা করা যাইবে।

আহাবকালে কুঅভ্যাস।

আহাবেব সময় অত্যধিক জল পান করায় পবিপাক ক্রিয়াব ব্যাঘাত জন্মিয়া অজীর্ণ বোগ উৎপন্ন হয়। আমাদেব অধিকাংশ খাদ্যই তবল, সেই খাদ্যে যে পরিমাণ জল থাকে পবিপাকেব পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। তাহাব উপব আহাব কালে শুধু জল আব পান না কবিলেও কোন ক্ষতি হয় না। খুব গবম গরম খাবাব খাওয়া, গবম খাদ্য খাইবাব অব্যবহিত পবেই ববফ দেওয়া জল পান কবা—এ সকলই পরিপাক ক্রিয়াব ব্যাঘাতজনক, এব সর্ব্বথা পবিত্যজ্য।

পরলোকে স্যাণ্ডো

(Eugen Sandow)

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি এ]

অকালে—মাত্র ৫৮ বৎসব বয়সে—বীব স্যাণ্ডো গত ১৪ই অক্টোবব তাবিখে পবলোকে গমন কবিযাছেন। তাঁহাব মৃত্যুতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যেব বৈজ্ঞানিক শবীব চর্চ্চাব বিশেষ ক্ষতি হইল।

স্যাণ্ডোর জীবন কাহিনী অতীব বিস্ময়জনক। রাইট অনারেবল টি পি ওকোনাব এম পি (Right Honorable T P O conner M P) মহাশয় তাঁহাব স্মৃতিব উদ্দেশে লিখিযাছেন—His life was a romance He was of mixed parentage Russian on the fathers and German on the mothers side জাতিতে জার্ম্মাণ এই বীর কিরূপে ইংলণ্ডেব এবং পরিশেষে সমস্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতেব শ্রদ্ধা ও বিস্ময় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে কাহিনী একাধাবে শিক্ষাপ্রদ ও চমকপ্রদ।

বাল্যে স্যাণ্ডো কৃশকায় ও দুর্ব্বল ছিলেন। তিনি নিজে পববর্ত্তী জীবনে বলিয়াছিলেন যে I was a pale and even a weakly child স্যাণ্ডোর পিতা

তাঁহাকে রোমে আনয়ন করেন সেখানে একটী গ্রীক্ প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ঐরূপ পুষ্ট সুদর্শন ও শক্তিশালী হইবার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পরে ক্রমাগত শরীর চর্চ্চা ও সাধনার ফলে এই কৃশকায় বালক বীর স্যাণ্ডো হন। আমাদের এই শক্তিহীনের দেশে বীর স্যাণ্ডোর জীবন কথা প্রচারিত হইলে শরীরের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ জন্মিতে পারে এই আশায়ই এই জীবনী আলোচনা।

অত পর স্যাণ্ডো শারীর বিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং এই সময় হইতেই তাঁহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। কি করিয়া স্যাণ্ডো ইংলণ্ডে পরিচিত হইলেন সে কাহিনীও অতীব বিস্ময়কর।

তখন প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে কুস্তিগীরদিগের প্রতিযোগিতা হইত। ইংলণ্ডে তখন সামসনের (Samson) এর খুব নাম। সামসন ও তাঁর শিষ্য Cyclops তখন লণ্ডন প্রদর্শনীতে প্রতি রজনীতে তাঁহাদের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় জ্ঞাপক ব্যায়ামাদি দেখাইতেন। এক দিন Samson গর্ব্বভরে সকলকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিয়া বলিলেন, কে আছ যুবক আমার সহিত প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হও।' বিরাট জনমণ্ডলী নিস্তব্ধ—কাহারো মুখে শব্দ নাই। এমন সময় এক বলিষ্ঠ সুদর্শন ভীমকান্তি যুবক রঙ্গভূমে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি আপনার সহিত লড়িব। দর্শকমণ্ডলী নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সেই অদ্ভুত বার্ত্তা শ্রবণ করিল। পরে যথা সময়ে—নির্দ্দিষ্ট দিনে স্যাণ্ডো বীর সামসনকে সশিষ্য পরাজয় করিয়া ইংলণ্ডে ও জগতে সুপরিচিত হইলেন।

স্যাণ্ডো একবার ভারতে আগমন করেন। কলিকাতায় তাঁহার অদ্ভুত ব্যায়াম দেখিবার জন্য লোকে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে। তদনুসারে থিয়েটার রয়ালে (Theatre Royal) একাধিক রজনীতে তিনি সমগ্র ভারতের পালোয়ানদিগের সমক্ষে নিজ শৌর্য্যের পরিচয় দেন। তাঁহার ও তাঁর স্ত্রীর আদর্শ লইয়া বহু বাঙ্গালী সেই দিন হইতে শরীর চর্চ্চায় মন দেন। অত পর এই দেশে স্যাণ্ডো আবিষ্কৃত Spring Dumbellsএর খুব প্রচলন হয়।

স্যাণ্ডো পেশাদার সার্কাসওয়ালা ছিলেন না। তিনি বৈজ্ঞানিক ছিলেন। শারীর বিজ্ঞানে তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি নিজে এক বিশিষ্ট ব্যায়াম প্রণালী আবিষ্কার করেন। উক্ত প্রণালী সর্ব্বসাধারণের উপযোগী এবং অল্পব্যয়সাধ্য। ঘরে বসিয়া বালক বৃদ্ধ যুবা ও যুবতী সকলেই স্যাণ্ডোর প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে ব্যায়াম করিতে পারেন। স্যাণ্ডো পরবর্ত্তী কালে একটী বীর সাধনার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে সম্রাক উহাতে অধ্যাপনা করেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর অসংখ্য ছাত্র ও ছাত্রী বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষা লাভ করেন।

স্যাণ্ডো সর্ব্বদা বলিতেন যে স্বাস্থ্যবানের দেহে রোগের এক্তিয়ার নাই—Healthy body is non conductor to disease আমাদের দেশের কোটর গতচক্ষু মাথায় ছোট বহরে বড় বাঙ্গালী বীরেরা স্যাণ্ডোর এই সার বাক্য গ্রহণ করিয়া শরীর চর্চ্চায় মন দিলেই স্যাণ্ডোর যথার্থ স্মৃতিপূজা হইবে।

স্বাস্থ্য নিবাসের স্বাস্থ্য।—

কঠিন রোগে, কিম্বা চিকিৎসায় তেমন ফল দেখা না পেলে চিকিৎসকগণ অনেক সময় রোগীকে হাওয়া বদলাইতে অর্থাৎ কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া কিছু দিন বাস করিতে পরামর্শ দেন। ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীতও অনেক লোকে সখ করিয়া বা অসুস্থ শরীর

সারাইবার জন্ত কিম্বা স্বাস্থ্যকর হাওয়ায় কিছু দিন বিশ্রাম করিবার জন্ত চেঞ্জে” গিয়া থাকেন। এইভাবে দার্জ্জিলিঙ্গ দেওঘর রাচি নৈনিতাল মধুপুর শীমুলতলা ওয়ালটেয়ার গিরিডি পুরী প্রভৃতি স্থান স্বাস্থ্য নিবাসে (health resort এ) পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা স্বাস্থ্য লাভার্থ এই সকল স্থানে যান তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা স্বাস্থ্যলাভ করিয়া ফিরিয়া আসেন কেহ বা মারাও গিয়া থাকেন। সুস্থ শরীরে কেবল বিশ্রাম লাভার্থ যাঁহারা হাওয়া বদলাইতে যান তাঁহাদের কথা ধরি না কিন্তু এমন অনেক রোগী স্বাস্থ্য নিবাসে গিয়া কিছুদিন বাস করিয়া আসেন যাঁহাদের রোগ সংক্রামক রোগের তালিকাভুক্ত যেমন যক্ষ্মা রোগী। এই ধরণের রোগী যে সকল স্থানে কিছু দিন বাস করেন তাঁহারা নিজেরা সুস্থ হইয়া উঠিলেও সেই স্থানটি তাঁহাদের দেহ পরিত্যক্ত রোগবীজে দূষিত হইয়া উঠে। তার পর তাঁহারা সেখান হইতে চলিয়া গেলে হয় ত অপর কোন সুস্থ লোক সেই বাড়ী ভাড়া লইয়া কিছুদিন বাস করিতে করিতে ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে পারেন এবং খুব সম্ভব হয়েনও। স্বাস্থ্যনিবাসের ভাড়াটিয়া বাড়ীর মালিকরা প্রায়ই স্থানান্তরে বাস করিয়া থাকেন। হয় ত তাঁহাদের কোন কর্ম্মচারী কিম্বা কোন প্রতিবাসী ঐ বাড়ীর তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় কোন সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি কোন বাড়ীতে কিছু দিন বাস করিয়া রোগবীজ সংক্রামিত করিয়া চলিয়া যাইবার পর ঐ সকল বাড়ী রীতিমত ধৌত ও ঔষধাদির দ্বারা বিশোধিত হয় কি না সন্দেহ স্থল। এরূপ প্রবাসে অস্থায়ী ভাড়াটিয়া বাড়ীগুলির উপর সংক্রামক রোগ সংক্রান্ত আইনের প্রভাব কতখানি এবং সে প্রভাব রীতিমত পরিচালিত হয় কি না তাহাও বিবেচ্য। আমরা এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের এবং স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কর্ত্তৃপক্ষের উচিত—একজন ভাড়াটিয়া উঠিয়া গেলে বাড়ীখানি রীতিমত সংশোধিত করাইবার জন্ত এবং সম্ভব হইলে একবার কলি ফিরাইবার জন্ত কঠোর আদেশ প্রদান করা। এবং স্বাস্থ্যান্বেষী ব্যক্তিদের উচিত—পূর্ব্ববর্ত্তী ভাড়াটিয়া কোনরূপ সংক্রামক রোগগ্রস্ত ছিল কি না এবং সে উঠিয়া যাইবার পর বাড়ী সংশোধিত হইয়াছে কি না তাহার খোঁজ লওয়া এবং বিনা সংশোধনে ঐরূপ বাড়ীতে বাস করিতে না যাওয়া।

পর্দ্দার নিন্দা।—

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা সুযোগ পাইলেই আমাদের সামাজিক রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের নিন্দা না করিয়া জল গ্রহণ করে না। নিন্দা করা উহাদের স্বভাব—উহারা নিন্দক। কাঁহেই তাহাদের কথার প্রতিবাদ না করিলেও হানি ছিল না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে প্রতিবাদ না করাই অন্যায়। কলিকাতা কর্পোরেশনের তরফ হইতে দুই একটা ক্ষয়রোগের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। একদল লোক এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন পর্দ্দানশীন মেয়েদের জন্ত কোন ব্যবস্থা হইতেছে না—ইহা বড় দুঃখের বিষয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাঁহারা যে পর্দ্দা প্রথার নিন্দা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। তাঁহারা বলেন যেখানে একটী যুবকের যক্ষ্মা রোগে মৃত্যু হয় সেখানে এই রোগে পাঁচটি যুবতী মারা গিয়া থাকে। এবং অনুপাতের এরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ কি? না পর্দ্দা প্রথা। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ভুল—একেবারে ভুল। এই ১৫ হিসাবে মৃত্যু কেবল সহর অঞ্চলেই ঘটিয়া থাকে—মফস্বলের অবস্থার সন্ধান লইলে হিসাবে অনুপাত ঠিক উল্টাইয়া যাইবে। অথচ পর্দ্দা প্রথা কেবল সহরের প্রথা নয়—উহা সমগ্র দেশব্যাপী—সমগ্র সমাজব্যাপী প্রথা। এই প্রথাটাই যদি রোগের কারণ হইত, তাহা হইলে দেশের সর্ব্বত্রই মৃত্যুর অনুপাত একই রকম হইত। কিন্তু তাহা ত নয়। সুতরাং মৃত্যুর কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে অর্থাৎ সহরের ঘনবসতিই এই রোগের জন্ত দায়ী। এই ভাবে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানো হয় বলিয়াই প্রকৃত পক্ষে প্রতিকারের ব্যবস্থাও হয় না—সমস্ত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সদনুষ্ঠান গোলে হরিবোল দিয়া কাটিয়া যায়। সহরের ঘনবসতি কেবল যে যক্ষ্মার কারণ তাহা ত নয়—আরও অনেক রোগের (যেমন প্লেগ) কারণ। নচেৎ ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট গড়িয়া সহর ভাঙ্গিয়া সহরবাসীকে উদ্বাস্তু করিতে হইত না।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"

১৪শ বর্ষ | মাঘ, ১৩৩২ সাল | ১০ম সংখ্যা

শক্তির অপব্যবহার

[শ্রীদুর্গাচরণ ঘোষাল]

কর্ম্মময় জীবন আমাদের। মুহূর্ত্তমাত্র আমাদের কর্ম্ম না করিয়া থাকার উপায় নাই। যখন আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া অলসভাবে কালযাপন করিতেছি যখন আমরা স্থির, নিশ্চল, মনে হয় কোন কাজই করিতেছি না, তখনও আমাদের অজ্ঞাতে আমরা কত কাজ করিতেছি—তখনও আমাদের কত শক্তি ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। দৈহিক কাজ হইতে যখন আমরা বিরত থাকি, তখনও আমরা নিষ্কর্ম্মা থাকি না, মানসিক কাজ অর্থাৎ চিন্তার কার্য্য সতত্তই চলিতে থাকে। এইজন্য বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা একবাক্যে বলিয়াছেন যে, আমাদের জীবনের চারি ভাগের তিন ভাগ কাজই এই চিন্তা জগতের মধ্যে। দৈহিক কাজ যখন চলিতে থাকে, তখনও আমাদের মন নিশ্চেষ্ট থাকে না। পরন্তু যখন দৈহিক কাজ হইতে বিরত থাকি, তখন মনের কাজ আরও দ্রুতভাবে হইতে থাকে। সুতরাং জীবন সংগ্রামে যে শক্তি আমাদের অনবরত ব্যয় হইয়া যাইতেছে, তাহা দৈহিকভাবেও যেমন মানসিকভাবেও তেমনি। কিন্তু হায়! দৈহিক কাজ ও শক্তি ব্যয়ের কথা যদিও আমরা সময়ে সময়ে চিন্তা করিয়া উহার সদ্ব্যবহারের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করি, কিন্তু মানসিক শক্তিব্যয় ও চিন্তা জগতের কাজের কথা, যাহা দৈহিক অপেক্ষাও অনেক গুণে বেশী, তাহার সম্বন্ধে আমরা অনেকেই একেবারে উদাসীন।

দৈহিক কাজ অপেক্ষা মানসিক কাজের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত। কোন বিখ্যাত দার্শনিক বলিয়াছেন—All that we are is made up of our thoughts it is founded on our thoughts, it is made up of our thoughts" আমাদের চিন্তা দ্বারাই আমরা গঠিত, চিন্তার উপরে আমরা প্রতিষ্ঠিত, চিন্তাই আমাদের জীবন। সুতরাং এই চিন্তাশক্তি ব্যয়ের সম্বন্ধে আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগী হইতে হইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলে

সত্যই বিস্মিত হইতে হইবে যে, কত অপরিমিত শক্তিই আমাদের এক একটী জীবনে ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। যদি ইহার সদ্ব্যবহার হইত যদি যথাবিচারে মূল্যবান কাজে সেই শক্তি ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে আমরা আমাদের জীবনের আদর্শ কত সাফল্যে মণ্ডিত করিতে পারিতাম। কিন্তু হায়! নিষ্ফল চেষ্টাতে, বৃথা কাজেই সে শক্তির অধিকাংশ এবং অনেকের জীবনে প্রায় সমস্তই ব্যয়িত হয় শেষে যখন পরিণত অবস্থায় সংসার হইতে চিরবিদায়ের দ্বারে গিয়া দণ্ডায়মান হই, তখন অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অনুতাপে ও অবসাদে আমাদের সমস্ত প্রাণ ভরিয়া উঠে। কিন্তু তখন আর সেখান হইতে ফিরিবার বা প্রতীকারের কোন উপায় থাকে না, আদর্শভ্রষ্ট ব্যর্থ জীবন লইয়াই সংসার রঙ্গমঞ্চ হইতে বিদায় লইতে হয়।

আমাদের জীবন কাল যত ক্ষুদ্র ও যত সীমাবদ্ধই হউক না কেন, তদনুযায়ী আদর্শ বা লক্ষ্যে পৌছিবার পক্ষে তাহা যে যথেষ্ট নয়, তাহা নহে। চাই শুধু জীবনীশক্তির বা কাজের সদ্ব্যবহার করা। জীবনের আদর্শ বা প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জ্জন এই কার্য্যের গুণাগুণের উপরই নির্ভর করে। আমাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শকে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে এবং প্রত্যেক কার্য্যটী একটু প্রণিধান পূর্ব্বক বিচার করিয়া করিলে সকলেই দেখিতে পাইব, কত কাজ বা শক্তির অপব্যবহার রহিত হইলে আমাদের জীবন কত সাফল্যময়, কত মধুময় হইতে পারে।

সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রযত্নে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ঐকান্তিকভাবে ও সম্যক ইচ্ছাশক্তির সহিত সংকল্পিত কার্য্য পরিচালিত না হইলে সেই কার্য্যে ও কার্য্যশূন্য অবস্থাতে বড় বেশী তফাৎ হয় না। শক্তির অপব্যবহার তাহাকেই বলা যায়। আমাদের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ও অন্যবিধ উন্নতিসাধনের জন্য কিছু কিছু দৈহিক কাজ সকলকেই করিতে হয়, কিন্তু এই সকল কাজ আমরা পূর্ণ ইচ্ছার সহিত ও মন সংযোগ করিয়া করি না। অধিকাংশ কাজই আমরা করিতে হয় বলিয়া করি, অথবা অভ্যাসবশে কোনমতে করিয়া যাই। তাহার ফল এই হয় যে, ঐ কাজ তেমন সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় না, অভিপ্সিত ফলও পাওয়া যায় না এবং ইচ্ছাশক্তির পরিচালনার অভাবে ঐ শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি না হইয়া ক্ষয় হইতে থাকে। অতি তুচ্ছ কাজও যখন আমরা করি, তখনও আমাদের তাহাতে পূর্ণ মনঃসংযোগ প্রয়োজন। তাহা হইলে একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তি ক্রমশ বর্দ্ধিত হইবে এবং ক্রমে ক্রমে তাহা লইয়া আমরা নূতন নূতন কাজে অধিকতর সাফল্য লাভ করিতে পারিব। কাজের গুরুত্ব একটু কম বোধ হইলে এবং কাজ অনায়াসসাধ্য হইলে আমরা তাহা অনেক সময়ে অন্যমনস্ক ও উদাসীন ভাবেই করি কিন্তু তাহা ঠিক নয়। ছোট কাজে একাগ্র ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে না পারিলে বড় কাজে আমরা তাহা করিতে পারিব না সুতরাং আদর্শ হইতে আমাদিগকে দূরে পড়িয়া থাকিতে হইবে। একাগ্রতা ও ইচ্ছাশক্তির উন্নতি সর্ব্বতোভাবে অভ্যাসসাপেক্ষ এবং দৈনন্দিন প্রত্যেক কাজের উপরই তাহার সাধনা নির্ভর করে। একই কর্ম্মক্ষেত্রে একজন উন্নতির চরমস্তরে উপনীত হয়, অন্যজন কিছুই করিতে পারে না, ইহার কারণও এই মন সংযোগ ও ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের তারতম্য। কি শিক্ষাক্ষেত্রে, কি ব্যবসাক্ষেত্রে, কি রাজনীতি ও অন্যান্যক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই ইহার অনন্ত দৃষ্টান্ত বিদ্যমান।

কোন একটি কাজ করিতে গিয়া যখন আমরা ক্লান্ত ও বিফলমনোরথ হই, যখন কাজটী ছাড়িব ছাড়িব ভাবিতেছি, তখন যদি মন সংযোগ পূর্ব্বক ভাবিতে পারি "এই কাজের মধ্যে মহাসত্য আছে, ইহা আমাকে করিতেই হইবে, এবং আমি অমৃতের সন্তান, অনন্ত শক্তি আমাতে প্রতিফলিত, আমি অনায়াসেই ইহা করিতে পারিব" তাহা হইলে, পূর্ব্বে যাহা অসাধ্য মনে হইয়াছিল তাহাও অনায়াস সাধ্য হইবে—একাগ্রতার শক্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইব। ক্ষুদ্র মহৎ সকল কাজেই ইহার পরীক্ষা

আমরা সর্ব্বদা করিতে পারি। তাহা হইলে, এই মাপকাঠিতে যদি এখন আমাদের জীবনের কাজ সকল বিচার করি, তাহা হইলে দেখিব, কত কাজ আমরা হেলায় নষ্ট করিতেছি, জ্ঞানের অভাবে কত শক্তি আমাদের অপব্যবহৃত ও নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয়ত, আমরা অনেক সময়ে নিশ্চেষ্ট ও অলস ভাবে হাস্য পরিহাস, বাজে গল্প ও পরচর্চ্চা করিয়া মূল্যবান সময় অতিবাহিত করি। এটা যেন একটা নেশার মত হইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত, সকলেই অল্পাধিক এ দোষে দুষ্ট। সময়ের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া গতানুগতিক ভাবে যা তা কাজে মূল্যবান জীবনকে নষ্ট করি। জীবনের উচ্চ আদর্শের কথা—কত মহৎ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় না। ইহা কি যথেষ্ট পরিতাপের বিষয় নহে? সুদুর্লভ মনুষ্য জীবন কি নিরর্থক ভোগব্যসনের জন্য? কোন সৎ ও কর্ত্তব্য কার্য্যের কথা উঠিলে অনেকের মুখেই শুনিতে পাই—"আমার সময় নাই" ও সব এখন হইয়া উঠে না। কিন্তু কত সময় আমাদের বৃথা কাজে ব্যয়িত হইয়া যাইতেছে। প্রতিদিন ২ মিনিট করিয়া দৈহিক ব্যায়াম করিলে, অর্দ্ধ ঘণ্টা মাঠে বা নদীর ধারে গিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে, এক ঘণ্টাকাল সঙ্গীতাদি নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিলে, আমাদের স্বাস্থ্য উন্নত হয়, কত রোগ বিড়ম্বনার হাত হইতে আমরা অব্যাহতি পাইতে পারি। প্রত্যহ এক ঘণ্টা শিল্প বা কৃষিকার্য্য অভ্যাস করিলে, একটা জীবনের কত অর্থ সমস্যার সমাধান হয়। নিয়মমত ভাবে প্রত্যহ আধ ঘণ্টা মাত্র ভগবানের ধ্যানে নিয়োজিত করিলে আমরা আধ্যাত্মিক জীবনে কত উন্নতি লাভ করিতে পারি। কিন্তু হায় শতকরা কয়জনের জীবনে ইহা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, প্রকৃত জ্ঞানের অভাব। "মিথ্যা কথা বলা বড় দোষ" এইটী জানার নামই সত্যবিষয়ক জ্ঞান নহে। যখন মিথ্যা বলা পাপ, সর্ব্বতোভাবে সত্য কথাই বলা উচিত, প্রাণের পরতে পরতে ইহা অনুভব করিব, সুতরাং তদনুযায়ী ইচ্ছা ও কার্য্য স্বাভাবিক ভাবেই পরিস্ফুট হইবে, তখনই বুঝিব যে, সত্য-মিথ্যা ভেদ জ্ঞান আমার হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে নহে। আমরা জ্ঞানের অভিমান শিক্ষার অভিমান কতই করি, কিন্তু যদি আমরা প্রকৃতপক্ষে বুঝিতে পারি শারীরিক মানসিক নৈতিক, আধ্যাত্মিক—এই চতুর্ব্বিধ উন্নতি সাধনই মনুষ্য জীবনের পরম উদ্দেশ্য ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব, আর ইহার অন্যথাই ঐহিক, পারলৌকিক অশেষবিধ কষ্টের কারণ, যদি এই সত্য আমাদের হৃদয়ে প্রাণময় হইয়া উঠে, তাহা হইলে এমন এক ইচ্ছাশক্তি হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইবে যাহাতে তদনুযায়ী কার্য্য করা একান্ত স্বাভাবিক ও সহজ হইয়া পড়িবে। কিন্তু হায়, ঠিক সেই জ্ঞানের মত জ্ঞান কয়জনের আছে? জীবনের সর্ব্বোচ্চ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া প্রতিমুহূর্ত্তের কাজকে সেই মাপকাঠিতে অতি নিপুণ ভাবে বিচার করিতে হইবে এবং প্রতি কার্য্যটি ঠিক সেই ভাবে মিলাইয়া করিয়া যাইতে হইবে। এইভাবে বিচার করিয়া কাজ করিলে দেখিবে দৈনন্দিন কার্য্যসমূহের চারিভাগের তিনভাগ কাজই নিরর্থক ও অসার, যাহা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আমাদের চিন্তার মধ্যেই আসে না এবং যাহা যথারীতি পরিচালনা করিতে আমাদিগকে প্রতিমুহূর্ত্তে সাবধান ও সচেষ্ট হইতে হইবে। তখন দেখিব, সর্ব্বদাই মনের অভ্যন্তরে প্রবল আন্দোলন চলিতেছে। যে কোন দুইটী কার্য্যকে লইয়া বিচার করিতে বসিলে জ্ঞানের অতি সূক্ষ্ম পরিচালনার প্রয়োজন হইবে এবং এইখানেই আমরা আমাদের নিজস্ব, স্বাধীন ইচ্ছা ও আভ্যন্তরীণ ভগবদ শক্তি একত্র উপলব্ধি করিতে পারিব।

তারপর চিন্তা জগতের কথা। আহারের সময়, শয়নের সময় রাস্তায় ভ্রমণাদি নানা সময়ে আমাদের চিন্তা স্রোত অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে। আমরা ঐ সব সময় বৃথা স্বার্থ চিন্তা—হিংসা দ্বেষাদির চিন্তা—অথবা পারিপার্শ্বিক জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়াদির সম্মুখে

যে কোন নৈসর্গিক বিকা। ধরিয়া দেয় তদনুযায়ী চিন্তা নির্ব্বিচারে করিয়া যাই। কখন যদিও কোন সুচিন্তা আইসে তা । স্থায়ী হয় না, একটী চিন্তা হইতে অন্য চিন্তা Laws of association দ্বারা আমাদিগকে বহুবিধ নিরর্থক চিন্তার ধারার মধ্যে লইয়া যায়। এই চিন্তাতে আমাদের সামান্য শক্তি ক্ষয় হয় না সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে এই চিন্তাস্রোতকে সংযত করিতে হইবে। আহার, ভ্রমণ, স্নানাদি সময়ে, শিক্ষার্থী তাহার শিক্ষার চিন্তা করিতে পারে, স্বাস্থ্যকামী তাহার স্বাস্থ্যবিষয়ক সংকল্প চিন্তা করিতে পারে। অর্থকামী তাহার অর্থোপার্জ্জনের উপায় ভাবিতে পারে। সকল শ্রেণীর সকল লোকেই ধর্ম্ম জগতের কথা ভাবিয়া পরম পুণ্যলাভ ও অনাবিল শান্তি উপভোগ করিতে পারে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। কোন বিষয়ে সংগ্রাম হইতে হইলে সর্ব্বদা আমাদিগকে সেই চিন্তা করিতে হইবে। এই চিন্তা হইতেই সংকল্প ও কার্য্য আসিবে এবং সিদ্ধি আমাদের আয়ত্তাধীন হইবে। চিন্তাই কার্য্যের জন্মদাতা অবস্থা ও ঘটনাক্রমে মানুষ কর্ম্ম করিবার সুযোগ সকল সময় না পাইতে পারে কিন্তু তাহার ঐকান্তিক ইচ্ছা বা চিন্তা ঠিক যদি তদনুযায়ী থাকে, তাহা হইলে সেই কর্ম্মফলের পুরস্কারই চিন্তার ফলে লাভ করিয়া থাকে। এই জন্য কোন প্রসিদ্ধ নীতিবিদ বলিয়াছেন, The happiness of your life depends upon the quality of your thought"—তোমাদের চিন্তার গুণাগুণের উপরই সুখের তারতম্য নির্ভর করে। বাস্তবিক আমরা যে কার্য্যে বিফল মনোরথ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হই, ইহার কারণ আর কিছুই নহে একমাত্র আমাদের চিন্তাশক্তির অপব্যবহার। সকল সাধনা সকল শক্তির মূলই এই চিন্তা। অলস চিন্তার সময় ঘণ্টায় দু মিনিট করিয়াও সেই সকল চিন্তার মূলাধার সর্ব্ব শক্তিমানকে একমনে যদি চিন্তা করি, আমাদের অভাব, আবেদন জানাই, তাহা হইলেও আমাদের জীবনের অনেক সমস্যাই সহজ হইয়া আসে এবং ঐহিক পারমার্থিক বহু নির্ম্মল আনন্দ আমরা অনুভব করিতে পারি।

যক্ষ্মারোগ কি নিবার্য্য ব্যাধি ?

মানব সমাজ হইতে যক্ষ্মারোগ দূর করা যায় কি না, যক্ষ্মারোগের আক্রমণ হইতে মানব জাতিকে রক্ষা করিতে পারা যায় কি না—ইহাই এখন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক মণ্ডলীর প্রধান বিচার্য্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। চিকিৎসক সমাজ অনেক রোগের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, বহু রোগের প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছেন, অনেক লোকক্ষয়কর ব্যাধির টীকা, ভ্যাক্সিন, সেরাম, এণ্টিটক্সিন প্রস্তুত করিয়া রোগের প্রভাব কমাইয়া মানুষকে কতকটা নিরাপদ করিতে পারিয়াছেন। যক্ষ্মারোগের সম্বন্ধে এখনও তেমন কোন আশ্বাসপ্রদ ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয় নাই।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ বড়ই অনিশ্চিত। আজি হইতে শত বর্ষ পরে মানব সমাজে স্বাস্থ্যের অবস্থা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অবস্থা, কিরূপ দাঁড়াইতে পারে তাহা কেহ দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন না। চিকিৎসা বিজ্ঞান শাস্ত্রে নিত্য যে সকল নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে, পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান ছেলে খেলা বলিয়াই মনে হয়। অতি প্রাচীন কালে রোগ নিরাময় করিবার জন্য যে সকল

উপায় অবলম্বিত হইত, বর্ত্তমানকালের তুলনায়, সে সকল কথা স্মরণ করিলে হাস্য পায়। তথাপি বলিতে হয়, চিকিৎসক রোগ নিবারণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিয়া থাকিলেও, তিনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন, চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি কোন নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারেন না। তাহার কারণ, চিকিৎসা বিজ্ঞানে, নিত্য এত নূতন সত্যের আবিষ্কার হইতেছে যে, অল্প দিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত তথ্য সকলও উল্টাইয়া কিম্বা বদলাইয়া যাইতেছে।

বৈজ্ঞানিককে কত যে আয়াস সহকারে, কত সতর্কতা সহকারে যে এক একটী সত্য নির্দ্ধারণ করিতে হয়, সাধারণে তাহার ধারণাও করিতে পারিবে না। কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তাহা ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে তাহার সকল সম্ভাবিত প্রতিকূল যুক্তির খণ্ডন করিতে হয়, সকল প্রকার অসামঞ্জস্যের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় দুর্গ রচনা করিতে হয়, সিদ্ধান্তগুলি কালসহ হইবে কি না তাহা নির্ণয়ের জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হয় তবে একটী সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এক অবস্থায় যাহা সত্য, অন্য অবস্থায় তাহা মিথ্যা হইয়া দাঁড়াইবার সম্ভবনা থাকায়, প্রত্যেক সত্যকে বিভিন্ন এবং পরস্পর বিরোধী অবস্থার মধ্য দিয়া যাচাই করিয়া লইতে হয়। প্রতিষ্ঠিত সত্য যাহাতে কোন তর্ক যুক্তিতেই খণ্ডিত হইতে না পারে, এমন ভাবে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। তবে এক একটী সত্য বৈজ্ঞানিক সমাজে আদৃত, সম্মানিত, গৃহীত হয়। হস্তী যেমন অগ্রসর হইবার সময়, প্রত্যেক পদক্ষেপে, তাহার পায়ের নীচের মাটী দৃঢ় কি না, তাহার প্রকাণ্ড শরীরের ভার গ্রহণ করিতে সমর্থ কি না কোথাও কোন ক্রমে পদস্খলন হইবার সম্ভাবনা আছে কি না এ সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া তবে পদক্ষেপ করে এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, বৈজ্ঞানিককেও সেইরূপ সত্যের রাজ্যে সত্যের সন্ধানে অতিরিক্ত সতর্কতা সহকারে প্রত্যেক ইঞ্চ ভূমি পরীক্ষা করিয়া তাহার দৃঢ়তা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া তবে অগ্রসর হইতে হয়। গন্তব্য পথ প্রকৃত পথ কি না, সেই পথে চলিলে নিশ্চিত লক্ষ্যস্থলে পৌছান যাইবে কি না, পথ-ভ্রান্তি ঘটিয়াছে কি না, এ সকল বিষয় পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা না করিয়া বৈজ্ঞানিক এক পা ও অগ্রসর হইতে পারেন না। এই সকল কথা বিবেচনা করিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, বৈজ্ঞানিকের কাজ বড় সহজ বা সরল নহে। প্রতি পদে তাঁহার অপদস্থ হইবার সম্ভাবনা। তথাপি কি তাঁহার নিস্তার আছে? আজ তিনি যাহা সত্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন, কাল হয় ত নূতন সত্যের আলোকে তাঁহারই আজিকার আবিষ্কৃত সত্য মলিন, এমন কি মিথ্যা হইয়াও যাইতে পারে। আজ যে পন্থা তিনি সরল বলিয়া অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হইতেছেন, কাল তাহা জটিল বা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া অপেক্ষাকৃত অধিকতর সরল পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে। তাই বলিতেছি, বিজ্ঞান শাস্ত্রের ভবিষ্যৎ বড় অনিশ্চিত, এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নহে।

তথাপি, একটু ভবিষ্যদ্বাণী যে একেবারেই করা না যায়, তাহা নহে। অতীত কালে লব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে কার্য্য কারণের সম্বন্ধ বিচার করিয়া কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করিলে, তাহার সমস্তটাই যে একেবারে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে, এমন নাও হইতে পারে। আজ কেবল মাত্র যক্ষ্মারোগ আমাদের আলোচনার বিষয়। সেই জন্য আমরা অন্যান্য রোগের কথা ছাড়িয়া দিয়া, শুধু কেবল যক্ষ্মারোগের ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইতে পারে, তাহাই বিচার করিবার চেষ্টা করিব।

যক্ষ্মারোগের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান হইয়াছে। এই রোগ কোন্ কোন্ সূত্রে মানব শরীরে সংক্রামিত হয়, কি ভাবে ইহার বৃদ্ধি ও পরিণতি ঘটে, কিরূপ অবস্থায় এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভের আশা থাকে, এবং কিরূপ অবস্থায় থাকে না, এই সকল বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে অনেক কথাই জানা গিয়াছে। অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা অনুসন্ধান

ও হিসাবের ফলে জানা গিয়াছে যে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই রোগের বিশেষ বিশেষ পরিণতি ঘটে, এবং কোন যক্ষ্মারোগীর সেরূপ কোন অবস্থা ঘটিলে, তাহার পরিণাম কি হইতে পারে, তাহাও অনেকটা বলা যায়, এবং তাহা প্রায় ঠিকই হয়। বহুকাল ধরিয়া যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা করিয়া বুঝা গিয়াছে যে, কোন কোন চিকিৎসা প্রণালী একেবারেই নিষ্ফল আর কোন রকমেই সেই বিশেষ চিকিৎসা প্রণালী কোন ক্ষেত্রেই সফল হইবার সম্ভাবনা নাই, এবং সেইরূপ চিকিৎসা পদ্ধতি পরিত্যাজ্য। আবার যক্ষ্মারোগের কোন কোন অবস্থা একেবারেই অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। সেরূপ অবস্থায় ভবিষ্যৎ ফলাফল একেবারে অনিশ্চিত। কাজেই এ ক্ষেত্রে নিশ্চয় করিয়া কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না এবং এ সকল স্থলে নূতন নূতন পরীক্ষার যথেষ্ট অবসর রহিয়াছে। আরও অনেক পরীক্ষা হইলে এই সকল অজ্ঞাত ও অনিশ্চিত অবস্থার সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে, এবং তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে সফল চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বনের যথেষ্ট সুবিধাও হইতে পারে।

প্রায় ত্রিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বে রিচার্ড মর্টন নামক এক ব্যক্তি যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া অনুমান করেন যে, যক্ষ্মারোগের প্রকৃতি এবং প্রকার যেরূপ, তাহাতে বোধ হয়, মানব শরীরে যক্ষ্মারোগের একটা স্বাভাবিক প্রতিষেধক শক্তি আছে। তাহা না হইলে এত দিনে মানবজাতি উজাড় হইয়া ধরাবক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইত। এখন তাঁহার অনুমান সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই প্রতিষেধক শক্তির কতকটা স্বাভাবিক আর কতকটা অর্জ্জিত। যক্ষ্মা রোগের বীজাণুর সংস্রবে আসিয়া মানুষের দেহের তন্তুগুলি এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। স্বাভাবিক প্রতিষেধক শক্তির পরিমাণ তেমন বেশী নয়—খুব বেশী সংখ্যক যক্ষ্মাবীজাণু একেবারে মানব দেহে প্রবেশ করিলে, এই শক্তি তাহাদের বাধা দিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় না। কিম্বা যদি অবস্থা বিশেষে যক্ষ্মারোগ বীজাণু কোন লোককে পুন পুন আক্রমণ করে, তবে ঐ প্রতিষেধক শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া শেষে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে রোগবীজাণুরা সংখ্যায় কম কিম্বা দুর্ব্বল হইলে, অর্জ্জিত প্রতিষেধক শক্তি বাড়িয়া গিয়া থাকে। বস্তুত ইহাই প্রকৃত প্রতিষেধক শক্তি। এ তত্ত্বটুকু অবগত হইয়া চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকেরা বিচার করিতে বসিলেন যে, যক্ষ্মারোগ একেবারে নিবারণ করা বাঞ্ছনীয় কি না। কারণ, অল্পমাত্রায় রোগ সংক্রামণ না থাকিলে উত্তেজনার অভাবে প্রতিষেধক শক্তিও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া শেষে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। তখন যদি হঠাৎ কোন ব্যক্তি প্রবলভাবে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা অন্যান্য সুস্থকায় লোকের দেহে যক্ষ্মারোগ সংক্রামিত হইবে এবং প্রতিষেধক শক্তির অভাবে তাহারা সকলেই মরিয়া যাইবে। এইরূপে এক একটী মানব সমাজের অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। তবে আশ্বাসের কথা এই যে, যক্ষ্মারোগ একেবারে নিবারণ করা অসম্ভব। একটু আধটু সংক্রামণের সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবেই এবং তাহার ফলে রোগ প্রতিষেধক শক্তিও একেবারে বিলুপ্ত হইবে না।

ব্যাধি নানাপ্রকারে সুস্থ দেহে সংক্রামিত হয়। কতক স্থলে মানুষের মধ্যবর্ত্তিতায় এবং কতক স্থলে মানুষ ছাড়া অন্য উপায়ে। এই শেষোক্ত উপায়ে যে সকল স্থলে রোগ সংক্রামিত হয়, সে সকল স্থলে চিকিৎসা বিজ্ঞান রোগ নিবারণের ও রোগ নিরাময়ের অনেক কৃত্রিম ও সফল উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। সান্নিপাতিক জ্বর প্রধানত এই রোগবীজদুষ্ট জল কিম্বা দুগ্ধের সহায়তায় সংক্রামিত হয়। জল শোধিত করিয়া লইলে কিম্বা দুগ্ধ কিছুক্ষণ ধরিয়া ঈষৎ উত্তপ্ত করিলে অর্থাৎ পাস্তুরীত করিলে সান্নিপাতিক জ্বর সংক্রামিত হইবার আশঙ্কা তিরোহিত হয়। গৃহ পালিত পশু অর্থাৎ গো মহিষাদির মধ্যস্থতায় যক্ষ্মা রোগ সংক্রামিত হয়। এই উপায়ে প্রধানত দুগ্ধ পোষ্য

শিশুরাই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। এস্থলে দুগ্ধ শোধিত করিয়া লইলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। মশক বংশ ধ্বংস করিলে ম্যালেরিয়া নিবারিত হয়। ইন্দুর বংশ ধ্বংস করিলে বিউবোনিক প্লেগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কিন্তু যক্ষ্মারোগ যখন মানুষের দ্বারা মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়, তখনই উহা বড় গুরুতর, এমন কি অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কারণ, মানুষের গতি বিধি সংযত ও চিকিৎসা বিজ্ঞানানুমোদিত ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সহজ ব্যাপার নহে—একেবারে অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রত্যেক মানুষের একটা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা—তাহার ইচ্ছার স্বাধীনতা—তাহার চলাফেরার স্বাধীনতা—সামাজিকভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিলনের স্বাধীনতা আছে। যদি এই সকল স্বাধীনতার সঙ্কোচ ঘটাইতে পারা যায় তাহা হইলে যক্ষ্মারোগের সংক্রামকতাও অনেকটা হ্রাস করা যায়। কিন্তু মানুষ তাহার এই সকল অধিকার যে সহজে ছাড়িতে সম্মত হইবে এমন সম্ভাবনা আদৌ নাই এমন কি মানব সমাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও নয়। ফলে যক্ষ্মা রোগে লোকে মরেও তেমনি।

তবে উপায় কি? মানুষের দ্বারা যে সকল ক্ষেত্রে রোগ সংক্রামিত হয়, সে সকল ক্ষেত্রে কোন কৃত্রিম উপায় কার্য্যকর হয় না। মানুষ নিজে সংযত না হইলে সংক্রামণ নিবারণ করা অসম্ভব। তবে কি কোনই আশা নাই? আছে—একটা আশা অবশ্যই আছে। সেটা—লোকশিক্ষা। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংশ্রব হইতে আত্মরক্ষা, নিজে রোগাক্রান্ত হইলে সুস্থ দেহ লোককে সংশ্রবে আসিতে না দেওয়া, যাহাতে রোগবীজ সংক্রামিত না হইতে পারে এমন উপায় অবলম্বন করা—এই সকল বিষয় প্রত্যেক নরনারীর, বালক বালিকার, বৃদ্ধ ও শিশুর অবশ্য শিক্ষনীয় বিষয় হওয়া চাই।

কিন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এই শিক্ষা প্রচার করা বড় কঠিন। এখন কাহারও কোন সংক্রামক ও কঠিন রোগ হইলে তাহার আত্মীয় স্বজনরা তাহাকে দেখিতে যায়, তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে। ইহা সামাজিক প্রথা—আত্মীয়তা রক্ষা। যদি কেহ সংক্রামিত হইবার ভয়ে রুগ্ন আত্মীয়কে দেখিতে না যায়, কিম্বা যাইয়াও তফাতে থাকে বা আত্মরক্ষার চেষ্টায় সাবধান হয় তাহা হইলে তাহাকে হৃদয়হীন ভাবিয়া রোগীর পরিজনবর্গ তাহার নিন্দা করিবে। এই নিন্দার ভয়ে আত্মীয়েরা দেখিতে না গিয়া পারিবে না এবং নিজ দেহে রোগ সংক্রামিত করিয়া ফিরিয়া আসিবে ও অপরের দেহে রোগ সংক্রামণের কারণ হইয়া উঠিবে। কিন্তু লোককে রোগ সংক্রামণের ও তাহা নিবারণের গূঢ় তত্ত্বগুলি শিক্ষা দিতে পারিলে রোগী কিম্বা তাহার বাড়ীর লোকেরা সুস্থ আত্মীয়কে কাছে আসিতে নিষেধ করিবে—পাছে সেও রোগে আক্রান্ত হয়। এরূপ ব্যাপকভাবে শিক্ষা দান সহজ সাধ্য নহে এরূপ শিক্ষা গ্রহণও শক্তিসাপেক্ষ—সকলের মানসিক সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সংক্রামক রোগ মানব সমাজ হইতে একেবারে সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভবপর নহে। ইহার একটা সুবিধা এই যে, সংক্রামিত হইবার অল্পস্বল্প সম্ভাবনা থাকায় রোগ প্রতিষেধক শক্তিও কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিবে। সেটা একটা লাভ বলিতে হইবে। বাকীটুকু কৃত্রিম উপায়ে সাধন করিতে হইবে।

যক্ষ্মারোগ সম্পর্কে সেই সকল কৃত্রিম উপায়ের মধ্যে কয়েকটির এখানে আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথম উপায়—যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ঘন বসতিপূর্ণ লোকালয় হইতে দূরে কোন স্যানাটোরিয়া বা রোগনিবাসে স্থানান্তরিত করা। দ্বিতীয় উপায়—টিকা। চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকেরা আশা করিতেছেন, বসন্ত রোগের ন্যায় যক্ষ্মা রোগেরও টীকা দিয়া সংক্রামকতা নিবারণ করা খুবই সম্ভব। তবে এযাবৎ এদিকে বিশেষ কোন সফলতা এখনও লাভ করিতে পারা যায় নাই। এ পর্য্যন্ত যতগুলি যক্ষ্মা রোগের টিকা বাহির হইয়াছে,

ও তাহারা এখনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, সুতরাং নির্ব্বিবাদে নিশ্চিন্তে গ্রহণযোগ্য এখনও হয় নাই। পরীক্ষায় ফল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে এখনও বিলক্ষণ দশ বিশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু যক্ষ্মারোগ এমন ব্যাধি যে তাহার কোন প্রতিষেধক টিকা বাহির হইতে পারে, এমন আশা করিতে সাহস হয় না। কারণ যে সকল রোগের ফলপ্রদ প্রতিষেধক টিকা বাহির হইয়াছে—যক্ষ্মা রোগের প্রকৃতি তাহাদের প্রকৃতি হইতে অনেক বিভিন্ন। তবে একেবারে নিরাশ হইবার মত অবস্থাও এখনও ঘটে নাই।

যক্ষ্মা রোগের এমন কোন ঔষধ বা সেরামও এখনও বাহির হয় নাই, যাহাকে অব্যর্থ বলা যায় এবং যাহা নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করা যায়। ঔষধ আবিষ্কারকেরা অবশ্য নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া নাই—প্রতি বৎসরই বহু সংখ্যক নূতন নূতন যক্ষ্মা রোগের ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে কিন্তু তাহাদের কোনটিই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। যক্ষ্মা রোগের বীজাণুর প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহারা কোন রকমেই বাগ মানিতে চায় না—কোন ঔষধকেই তাহারা আমল দেয় না। আবার, এই রোগের বীজাণু একবার মানব দেহে প্রবেশ করিলে শরীরা ভ্যন্তরস্থ তন্তুগুলি সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর মত তাহার চারিদিকে এমন দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া বসে যে, সেই ব্যূহ ভেদ করিয়া ঔষধ তাহার নাগাল পায় না। শরীরের স্বাভাবিক প্রতিষেধক শক্তিসকল যক্ষ্মারোগ বীজাণুকে ধ্বংস করিতে না পারিয়া ঐরূপ ব্যূহ রচনা করিয়া থাকে। সে ব্যূহ এত দৃঢ় হয় যে, সুচিকা বিদ্ধ করিয়া ঔষধ ইন্‌জেক্ট করিয়া রক্তের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াও ব্যূহ ভেদ করিতে পারা যায় না। ব্যূহ মধ্যস্থ যক্ষ্মাবীজাণুকে আক্রমণ করিবার উপায় আবিষ্কারের চেষ্টায় কোন ত্রুটী হইতেছে না—সফলতা অবশ্য ভবিতব্যতার হাতে।

যক্ষ্মারোগ নিবারণের কোন কৃত্রিম প্রতিষেধক উপায় যদিই কখনও আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলেও তাহা যে সর্ব্বতোভাবে সফল হইবে, এমন আশা এখনও করা যায় না। বসন্ত রোগের টিকা ত বাহির হইয়াছে, এবং সর্ব্বত্র ব্যবহৃতও হইতেছে। তথাপি মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে বসন্তরোগ সংক্রামক ভাবে দেখাও দেয়, এবং তাহাতে লোকও যথেষ্ট মরিয়া থাকে। বসন্তরোগ প্রকাশ পাইলে খুব চট করিয়া ধরা পড়িয়া যায়। তখন রোগীকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠাইলে অন্য লোক অনেকটা নিরাপদ হইতে পারে। বসন্ত রোগের স্থায়িত্ব কালও দীর্ঘ নয়। কিন্তু যক্ষ্মার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহা সহজে ধরা পড়ে না। এবং রোগী দীর্ঘকাল রোগভোগ করে বলিয়া তাহাকে কোয়ারেন্টাইনে পাঠাইবারও সুবিধা হয় না। অতএব ইহার প্রতিষেধক উপায় আবিষ্কারের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা আবশ্যক।

যক্ষ্মারোগ পুরাতন হইলে তাহার চিকিৎসা প্রায় সফল হয় না। যক্ষ্মাজীবাণু ফুসফুস বা তন্তুর অনেকটা অংশ এমনভাবে খাইয়া ফেলে যে কোন ঔষধই সেই ক্ষয় প্রাপ্ত অংশগুলির পুনর্গঠন করিতে পারে না। এ পর্য্যন্ত যক্ষ্মা রোগের যত ঔষধ বা সেরাম বাহির হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই রোগের তরুণ অবস্থায় ব্যবহার্য্য। রোগের প্রথম অবস্থায় ব্যবহৃত হইলে কোন কোন ঔষধে কিছু কিছু ফল পাওয়া যায়। কেবল যক্ষ্মারোগ কেন, অন্য অনেক কঠিন পীড়ার ঔষধের অবস্থাও এইরূপ—অর্থাৎ তরুণ অবস্থায় ফলপ্রদ। ম্যালেরিয়ার স্পেসিফিক কুইনাইন, সিফিলিসের স্পেসিফিক কালাজ্বরের সার, ডিফথিরিয়ার স্পেসিফিক এন্টিটক্সিন—এ সকলই রোগের তরুণ অবস্থায় ব্যবহার করিলে কিছু ফল পাওয়া যায়—রোগ পুরাতন হইয়া গেলে এই সকল ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। কাজেই যক্ষ্মারোগের সম্বন্ধে চিকিৎসকগণের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে, তাহার তরুণ অবস্থার লক্ষণ গুলি আবিষ্কার করিয়া লোককে শিক্ষা দেওয়া যেন রোগ আক্রমণ করিবামাত্র তাহারা চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিতে পারে।

কার। এই রোগ এত অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করে ও এত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় যে, তাহা ধরা পড়িতে না পড়িতে পুরাতন রোগে পরিণত হয়।

যক্ষ্মা রোগের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে এখনও অনেক বাকী আছে। সুযোগ্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকগণ ইহার সম্বন্ধে বিচক্ষণভাবে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। দিন দিন অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। আশা হয় অচির ভবিষ্যতে যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে অধুনা অজ্ঞাত এমন অনেক তত্ত্ব জানিতে পারা যাইবে, যে জ্ঞানালোকের সাহায্যে তাহার সহিত সংগ্রাম করা সহজসাধ্য ও সুফলপ্রদ হইবে। ইতোমধ্যে আমরা যতটা জানিতে পারিয়াছি তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক। মনে রাখিতে হইবে যক্ষ্মারোগ অতি ভয়ানক রোগ। অসংখ্য লোকের এই রোগে মৃত্যু হইয়া থাকে। প্রধান প্রধান মারাত্মক ব্যাধি সমূহের মধ্যে যক্ষ্মা রোগের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। মানব জীবনের যে অংশ পূর্ণ ভোগের কাল, যক্ষ্মারোগ প্রায় সেই সময়েই প্রবল হইয়া জীবন ব্যর্থ করিয়া দেয়। ভবিষ্যতে যাহা আবিষ্কৃত হইবে তাহার জন্য বসিয়া না থাকিয়া, বর্ত্তমানে যে জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাহারই সাহায্যে যতদূর সম্ভব যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা ও তাহা নিবারণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আরো মনে রাখিতে হইবে—লোক শিক্ষাই যক্ষ্মারোগ নিবারণের এবং তাহার সহিত সংগ্রাম করিবার শ্রেষ্ঠতম উপায়। যক্ষ্মারোগ সংক্রান্ত সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সাধারণকে শিক্ষা না দিলেও চলিবে মোটামুটি সকল কথা সাধারণকে জানাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। এই জ্ঞান এবং আত্মরক্ষার সহজ বুদ্ধি—এই দুইয়ের সাহায্যে যক্ষ্মা রোগের সহিত সংগ্রাম চালাইতে হইবে। জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, যক্ষ্মারোগ চোরের মত গুপ্ত ভাবে আসিয়া মানুষের দেহে প্রবেশ করে। কাসি, জ্বর, শরীর ফ্যাকাসে হইয়া যাওয়া প্রভৃতি যক্ষ্মা রোগের নিশ্চিত লক্ষণ দেখে প্রকাশ। শরীরের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এই রোগ দেহের মধ্যে আস্তানা গাড়িয়া বসিয়া থাকে। অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ করা শরীরের ওজন কমিয়া যাওয়া—এ সকল মারাত্মক লক্ষণ। গোড়ায় রোগ ধরা পড়িলে, যক্ষ্মা রোগীকে একেবারে নিরাময় করিতে না পারা গেলেও তাহার অকাল মৃত্যুর দিন দুই দশ বছর পিছাইয়া দেওয়া যায়। কোন্ কোন্ লক্ষণ দেখিয়া যক্ষ্মা রোগের প্রথম আক্রমণ বুঝা যায় তাহাও লোককে শিখাইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে লোকে সতর্ক থাকিবে, এবং সেরূপ কোন লক্ষণ দেখিবামাত্র চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবে। যক্ষ্মারোগ যে কত বিশ্বাসঘাতক রোগ তাহার প্রমাণ এই যে, তাহার প্রথম লক্ষণগুলিকে চিকিৎসকেরাও অন্য রোগের লক্ষণ মনে করিয়া ভুল চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া থাকেন। সুতরাং সাধারণের পক্ষে সতর্কতা অবলম্বন করা কত বেশী আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য।

বাংলার পল্লী

[শ্রীবিনোদবিহারী চৌধুরী]

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা, নদীমাতৃক এই বাংলা দেশের পল্লীসমূহের বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিলে হৃদয়বান ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় দুঃখে অধীর হইয়া উঠে। পূর্ব্বে পল্লী যে প্রকৃতই সমৃদ্ধ ছিল শুধু তাহার অতীত স্মৃতির নিদর্শন রাখিয়া কালের আবর্ত্তনে বর্ত্তমানে সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। যেমন এখন পল্লীতে নদী

নাই—আছে কেবল তাহার রেপাটি জমিদার বা ধনাঢ্য মহাজন নাই—আছে তাঁহাদের পরিত্যক্ত ভগ্ন অট্টালিকা, জনবহুলতা নাই—আছে উজাড় বাস্তু বা পোতি ভিটা প্রতুলতা নাই—আছে অভাবের তাড়না।

দেশে রেলওয়ে বিস্তারের কল্যাণে শাখা নদীগুলি মজিয়া যাওয়ায় নদীর উপকূলবাসী জনসাধারণের সুপেয় জলাভাব ঘটিয়াছে। তার পর আবার কচুরী পানার আবির্ভাবে গোদের উপর বিস্ফোড়ার স্থায় অবস্থা আরও ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নদী মজিয়া যাওয়ায় নদীতে স্রোতবেগ না থাকা হেতু বর্ষার সময় কচুরী পানা দূরে ভাসিয়া গিয়া নদী পরিষ্কারের উপায় হয় না বা নিরুৎসাহ অদৃষ্টবাদী পল্লীবাসী সমবেত চেষ্টায় উহা পরিষ্কারেরও ব্যবস্থা করে না। ফলে বর্ষার শেষে পানা আবৃত লোহিত ও দুর্গন্ধযুক্ত জল পান করিয়া নদীকূলবাসী কলেরা আমাশয় টাইফয়েড ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে আক্রান্ত হইয়া অকালে ভবলীলা সম্বরণ করিয়া অব্যাহতি পায়।

মজা নদীগুলি যখন বন্যার জলে ভরিয়া উঠে এবং কূল ছাপিয়া জল পার্শ্বস্থিত শস্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন জলের সহিত বায়ু প্রবাহে সঞ্চালিত হইয়া ধব স কচুরীপানা শস্য ক্ষেত্র প্রবিষ্ট হয় এবং হতভাগ্য কৃষকের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমোৎপন্ন ফসল নষ্ট করিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ আশায় ছাই ঢালিয়া দেয়।

পল্লীর ভিতরে যে দুই একটি পুরাতন পুকুর আছে সে গুলি নামে তাল পুকুর কিন্তু ঘটী ডুবে না। উহার কোন কোনটিতে কচুরীপানা না থাকিলেও অন্য প্রকারের পানা শৈবাল ও বিভিন্ন প্রকারের জলজ লতা গুল্মাদিতে বার মাস আচ্ছাদিত থাকে এবং তাহার নিম্নস্থ জলের অবস্থাও ঠিক নদীর অনুরূপ। পুকুরের পাড়ে ও জলের ধারে ছোট বড় যে সকল গাছপালা জন্মে, তাহার স্খলিত পল্লবাদি প্রায় সমস্তই পুকুরের জলে পড়িয়া পচে। তার উপর ঐ জলে পল্লীবাসিনী মহিলাদের বাসন মাজা ক্ষার কাচা, শৌচাদি ও মূত্রাদি কার্য্য অবাধে চলে এবং কদাচিৎ গ্রীষ্মকালে কৃষকের গো মহিষাদি ঐ পুকুরে ডুবিয়া তাহাদের রৌদ্রতপ্ত দেহ শীতল করে। আবার কোন কোন খোস পাঁচড়া আশ্রিত দেহের সাবান ঘর্ষিত অবগাহনও নির্ব্বিবাদে চলে সুতরাং ঐ সকল পুকুরের জল নামধেয় দ্রব্যটিতে প্রকৃত জল যে কতটুকু থাকে তাহা রাসায়নিক পরীক্ষা ব্যতীত নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় ঐ জল পল্লীবাসীর পানীয়রূপে নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতঃপর পল্লীর প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গে গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য একটী করিয়া মেটেল বা ডোবা আছে উহাও পুকুরের মতই যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহৃত হয় উপরন্তু বাড়ীর যত আবর্জ্জনা ঐ ডোবার পাড়ে স্তূপীকৃত ভাবে ফেলা হয়। কোন কোন ডোবার জল এতই স্নাকারোদ্দীপক দুর্গন্ধযুক্ত হয় যে উহার পাড়ের রাস্তা অতিক্রম কালে নাসিকা বস্ত্রে কাপড় চাপিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। উক্ত ডোবা ও তথাকথিত পুকুরের জলে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর বাহন মশককুল ডিম ছাড়িয়া তাহার বংশ বৃদ্ধির বেশ সুবিধা পায়। গ্রীষ্মের সময় সন্ধ্যার একটু পূর্ব্ব হইতেই দুই একটি করিয়া মশক কুলের অগ্রদূতের দর্শন পাওয়া যায়। তারপর সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি অসংখ্য মশকের তাড়নায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলে। সে এক যম যন্ত্রণা! একে দারুণ গ্রীষ্মে গলৎ ঘর্ম্ম অবস্থায় একরূপ নির্ব্বাত স্থানে অবস্থান তার উপর সেই অনাবৃত দেহে অসংখ্য মশকের হুল ফুটান ব্যথা। বিনা মশারীতে নিদ্রা যাইবার ত উপায়ই নাই পরন্তু বাহিরের কার্য্য গতিকে একটু বসিবার বা দাঁড়াইবার প্রয়োজন হইলেও মশারীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়।

বসত বাড়ীর চারিধারে কেবল ঘরের ভিটা ছাড়া প্রায় সব স্থানেই পল্লীবাসীর পিতৃ পিতামহগণ যে সকল আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন সে গুলি এক্ষণে কাল প্রভাবে এক একটি মহীরূহে পরিণত হইয়া পল্লীবাসীর পূর্ব্ব পুরুষের ফলোদ্যান রচনা রূপ সাধু প্রবৃত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আবার প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই দুই তিনটি করিয়া বাঁশ

বাড় আছে, ফলে বর্ত্তমান পল্লীবাসী বাড়ীতে মুক্ত সূর্য্য কিরণ ও নির্ম্মল মুক্ত বায়ু আর পায় না। পক্ষান্তরে নির্ম্মল বিশুদ্ধ জল, মুক্ত সূর্য্য কিরণ ও নির্ম্মল মুক্ত বায়ু যাহা মানবের জীবন রক্ষার এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত আবশ্যক সেগুলিতে পল্লীবাসী বঞ্চিত হইয়া আছে। মাঠ বা গ্রামের বাহির হইতে দৃষ্টি করিলে পল্লীগুলিকে এক একটি বিশাল অরণ্য বলিয়া অনুমিত হয়। উহার ভিতর যে মানবের আবাস আছে বা থাকিতে পারে তাহা কল্পনায় আনা যায় না।

কলেরা ম্যালেরিয়া ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা কালা জ্বর প্রভৃতি রোগে বহু পল্লীবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় পল্লীর জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন কোন পল্লীতে জনসংখ্যা অর্দ্ধেকেরও কম হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কালা জ্বর নামক ব্যাধিটি পল্লীতে একরূপ অপরিচিতই ছিল কিন্তু এখন পল্লীর অনেকেরই গৃহে উহার দর্শন পাওয়া যায়। যাহাদের অবস্থায় কুলায় তাহারা আধুনিক আবিষ্কৃত ইন্‌জেক্‌শান করাইয়া আরোগ্য লাভ করে অশক্ত রোগী পল্লীর হাতুড়ে চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

পল্লীতে হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসার প্রচলনই অধিক। তাঁহাদের চিকিৎসা নৈপুণ্যে রোগ আরোগ্য হ'ক বা না হ'ক জটিলতার বৃদ্ধি পায় ভাল। কিন্তু পল্লীবাসী তাহা বুঝিবার অবকাশ পায় না। যে হেতু তাহারা দরিদ্র অল্প খরচে চিকিৎসিত হইবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না। রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইলে, নিকটে অল্প পয়সায় যাহাকে পায় তাহাকেই ডাকিতে বাধ্য হয়। পল্লীর ডাক্তার বাবুর জ্ঞান ভাণ্ডারে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় জ্ঞান আদৌ না থাকিলেও তাঁহার ডাক আসিলে তিনি গিয়া তাঁহার চিকিৎসারূপ মৃত্যুবাণ ত্যাগ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। প্রকৃতির অনুকম্পায় রোগী আরোগ্য হইলে ডাক্তার বাবুর খুব সুখ্যাতি রটে কিন্তু রোগীর মৃত্যু হইলে রোগীর অদৃষ্টই ধিক্কৃত হয়। এই ছদ্মবেশী ডাক্তারদের চিকিৎসা যে পল্লীর জনসংখ্যার হ্রাসের অন্যতম গূঢ় কারণ নহে তাহা কে বলিবে?

পল্লীর বালকগণের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও নৈরাশ্য দ্যোতক। কৃষক প্রধান গ্রামগুলিতে ত উহার কোন বালাই নাই তবে যে গ্রামে দুই দশ ঘর নিঃস্ব ভদ্রলোক এখনও না মরিয়া বাঁচিয়া আছেন তাঁহাদের ক্ষীণ উৎসাহে উদ্যোগে জীর্ণ ঘরে নামে মাত্র দুই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দর্শন পাওয়া যায়। বালকগণ বর্ণ পরিচয়ের সহিত পরিচয় অল্পেই প্রায় সরিয়া পড়ে এবং পিতা মাতার ঔদাস্য প্রযুক্ত সে ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কদাচিৎ কেহ কেহ বর্ণ পরিচয়ের পরবর্ত্তী ২।১ খানি পুস্তকের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হয়।

নীতি শিক্ষার অভাবে পল্লীর যুবকবৃন্দের নৈতিক অবনতিও মর্ম্মস্পর্শী চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। প্রত্যেক পল্লীতে দুই একটি করিয়া গাঁজার আড্ডা থাকিতে দেখা যায়। সন্ধ্যার পর নিয়মিত ভাবে ঐ আড্ডায় গ্রামের নিকর্ম্মা লম্পট গাঁজাখোর ব্যক্তিগণ যোগদান করত গঞ্জিকা প্রসাদে উন্মত্ত হইয়া অনেক কল্পনাতীত কুকর্ম্ম কদাচিৎ তাহারই জল্পনা কল্পনা করিয়া তাহাদের সান্ধ্য সম্মিলন উদ্‌যাপিত করে। বর্ত্তমান নারী হরণের প্রাদুর্ভাব ও আধিক্য ঐ সম্মিলনের অক্ষয় কীর্ত্তি।

কৃষকের সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ায় তাহারা চাষ আবাদের জন্য গরু মহিষ খরিদ করিতে পারে না সেই কারণে মাঠে বহু অকর্ষিত জমি পড়িয়া থাকে। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের ইহাও অন্যতম কারণ। পল্লীবাসী কৃষকগণ অন্নাভাবে শীর্ণ ও রোগ ভোগে জীর্ণ দেহ লইয়া কোনরূপে জীবন্মৃতাবস্থায় কালাতিপাত করিতেছে। পল্লীর কৃষক কুল প্রকৃত পক্ষে দেশের অন্নদাতা। তাহাদের সমৃদ্ধি ও সুখ দুঃখের সহিত দেশের ইষ্টানিষ্ট অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত, সুতরাং তাহাদের এই দৈন্য

জাত এই অধোগতি প্রকৃতই দেশের অশুভ লক্ষণ রূপে গণনীয়।

জমিদার ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় যাঁহারা পল্লীর আশা ভরসার স্থল তাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান মার্জ্জিত রুচির অনুযায়ী দ্রব্যাদি ও বিলাস ব্যসন সম্ভাত ভ্রান্তিমূলক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পল্লীতে না পাওয়ায় এবং কেহ কেহ বা চাকুরী ও ব্যবসায়ের মোহে সহরবাসী হইয়াছেন এবং এই পল্লীর জন্য এই জন্মভূমির জন্য তাঁহাদের অন্ততঃ কোন কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মতঃ কোন দায়িত্ব আছে কি না তাহাও তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না। এখন এই পল্লীর সমূহ সঙ্কট কালে তাহার দিকে করুণামাখা আঁখিতে মুখ তুলিয়া চাহিবার আর কে আছে? সরকার বাহাদুর ত পল্লীতে চৌকিদার দফাদার প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়াই তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ করিয়াছেন। সম্প্রতি স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্কল্পিত পল্লী সংস্কার নামে যে একটি আন্দোলনের ধুয়া উঠিয়াছে তাহার বিস্তৃতি ও আনুকুল্য বাংলার প্রত্যেক সুদূর পল্লীতেও যে অনুভূত হইবে তাহারই বা ভরসা কি? সুতরাং বড়ই মর্ম্ম বেদনায় ও নিরাশার তপ্ত শ্বাসের সহিত পল্লীবাসীকে সেই কবির কথায় বলিতে হয়—

যদি কেও না আসে তোমার ডাকে
তবে একলা চলরে।
(ও ভাই) পথের কাঁটা রক্ত মাখা চরণ তলে
তুমি একলা দলরে॥

স্বাস্থ্যকর গৃহ ও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গতবারে আমরা সহরের বাড়ীগুলির স্বাস্থ্যের কথার আলোচনা করিয়াছিলাম এবার পল্লী গৃহের স্বাস্থ্যরক্ষার কথার আলোচনা করিব।

ঘর গৃহস্থালীকে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে রক্ষা করিতে হইলে আমাদের কয়েকটি অতি সরল ও সহজপ্রাপ্য জিনিস দরকার—বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে রন্ধন করা খাদ্য, বিশুদ্ধ জল ও সুনির্ম্মিত বাসগৃহ।

সহরের নূতন ও পুরাতন গৃহ সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করা দরকার তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সহরের বাড়ীগুলি প্রায় কোটা বাড়ী। মধ্যে মধ্যে ক্বচিত দুই একখানা খোলার বাড়ী দেখা যায়। খোলার বাড়ীগুলির ফ্রেম প্রায় বাঁশ ও গরাণের দ্বারা নির্ম্মিত। আর দেওয়াল প্রায় মাটীর। কোথাও কোথাও মাটীর গাথনি ইটের দেওয়ালের উপর খোলার চালও দেখা যায়।

খোলার বাড়ীগুলিতে আলোকের ও বায়ুর অভাব বেশী দেখা যায় না। তাহার কারণ, খোলার ঘরগুলি সারির পর সারি ভাবে নির্ম্মিত হয় না। একটী ছোট উঠানের চারিদিকে একসার করিয়া ঘর তৈয়ার করা হয়। কোথাও কোথাও রাস্তার ধারে শুধু এক সারি ঘর থাকে। কোথাও উঠানের তিনদিকে বা দুইদিকে মাত্র ঘর থাকে, বাকী পাচীল দিয়া ঘেরা থাকে। এই কারণে আলো ও বাতাস খেলিবার যথেষ্ট জায়গাও থাকে। তবে অবশ্য যেখানে অল্প জায়গায় অনেক লোকের বাসের জন্য অনেক ঘর তৈয়ার করিতে হয়, সেখানে ঘরগুলি ছোট ছোট, অন্ধকার, আলোক ও বায়ুহীন হওয়া বিচিত্র নহে।

খোলার ঘরের মেঝে প্রায় মাটীর। কাজেই ড্যাম্প বা স্যাঁতসেঁতে। তবে কলিকাতার ন্যায় বড় সহরে পুরাতন বাড়ীভাঙ্গা রাবিশ দুষ্প্রাপ্য না হওয়ায় অনেকে ঘরের মেঝে রাবিশ দিয়া শক্ত করিয়া

পিটিয়া হইতে পারে। তাহার উপর এক পোঁচ সিমেণ্টের পলস্তারা লাগাইয়া লইলে স্যাঁতসেঁতে ভাবটা অনেকটা দূর হইতে পারে। উঠানটিও রাবিশ পিটিয়া বিলাতী মাটী দিয়া বাঁধাইয়া জল নিকাশের জন্য ড্রেনের দিকে ঢালু করিয়া নির্ম্মাণ করিলে এবং পাকা ড্রেন থাকিলে খোলার বাড়ী তত অস্বাস্থ্যকর হয় না। তবে মধ্যে মধ্যে বাড়ী গুলির জীর্ণ সংস্কার করাইয়া লওয়া অতীব আবশ্যক।

কিন্তু বাঙ্গালার পল্লীগ্রামের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ গৃহই মাটীর দেওয়ালের উপর খড়ের চাল। কচিৎ কোথাও কোথাও দুই একখানা কোটাবাড়ী দেখা যায়।

পল্লীগ্রামের ভূমির অবস্থা সর্ব্বত্র সমান নহে। কোথাও জমি উঁচু—বাসগৃহ নির্ম্মাণের উপযুক্ত কোথাও জমি নীচু—বাসগৃহ নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ অযোগ্য অথচ বাধ্য হইয়া লোককে ঐ সকল স্থানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে হয়।

পল্লীর লোকদের অবস্থা এতই দরিদ্র, এতই হীন যে, অনেকেই খড়ের ঘরও ঠিক উপযুক্তভাবে নির্ম্মাণ করিতে পারে না। সেইজন্য বহু লোককে সামান্য ছিটে বেড়ার ঘরে বাস করিতে হয়। যাহাদের অবস্থা উহারই মধ্যে একটু ভাল, সে মাটীর দেওয়ালের উপর খড়ের চাল নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে পারে।

দেওয়াল তুলিবার জন্য মাটী প্রায়ই বাস্তুজমিরই কোন না কোন অংশ হইতে লওয়া হয়। এক হাত কি দেড় হাত চওড়া করিয়া মাটী স্তরে স্তরে জমাইয়া দেওয়াল তোলা হয়। যাহার অবস্থা কিছু ভাল, সে পার্শ্ববর্ত্তী জমি হইতে দুই তিন হাত উঁচু পোতা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর দেওয়াল তুলে। কিন্তু যাহার সে সামর্থ্য নাই, সে জমি যেমন অবস্থায় পায়, তাহারই উপর ঘর তুলিয়া থাকে। ইহাদের দুরবস্থা অবর্ণনীয়। বর্ষাকালে তাহাদের ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত এবং মেজে, উঠান প্রভৃতি জলে ডুবিয়া যায়। এমন কি বেশী বৃষ্টি হইলে এই জলে দেওয়াল গলিয়া গিয়া ঘর পড়িয়া যায়।

যাহারা উচ্চ পোতা নির্ম্মাণপূর্ব্বক গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ, তাহারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। জল খুব বেশী হইলেও এবং তাহাদের বাড়ীর উঠান জলে ডুবিয়া গেলেও ঘরের ভিতর প্রায় জল দাঁড়ায় না। তবে জলপ্লাবনকালে অবশ্য স্বতন্ত্র অবস্থা। সে সময়টা জাতীয় বিপদ—ধনী দরিদ্র সকলের ভাগ্যেই প্রায় সমান দাঁড়াইয়া যায়।

পল্লীগ্রামের খড়ের ঘরের মাটীর মেঝে এবং দেওয়ালের কিয়দংশ প্রায় বারমাসই কিছু না কিছু স্যাঁতসেঁতে থাকে। তবে উচ্চ জমিতে গৃহনির্ম্মাণ করিলে ড্যাম্পের পরিমাণ কিছু কম হয়। এই স্যাঁতসেঁতে অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায় ঘরের মেঝে হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চে দেওয়াল হইতে একটু তফাতে মাচা নির্ম্মাণ করিয়া শয়নের ব্যবস্থা করা। জল নিকাশের পাকা রকম বন্দোবস্ত করিতে পারিলে নীচু জমিও কতকটা শুষ্ক রাখা যাইতে পারে বটে, কিন্তু জলনিকাশের সুব্যবস্থা করাই কঠিন। পল্লীগ্রামের দরিদ্র গৃহস্থের বাস করিবার জমির পরিমাণ এত কম এবং এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত যে একজন গৃহস্থের বাটীর জল নিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইলে অপরের জমির উপর দিয়া ভিন্ন ড্রেন নির্ম্মাণ করা যায় না। অধিকাংশ গ্রামেই মিউনিসিপ্যালিটী নাই, সর্ব্বসাধারণের যাতায়াতের পথ নাই, সকলের একযোগে সাধারণ ড্রেন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবার সুবিধাও পাওয়া যায় না।

পল্লীগ্রামের খড়ের ঘরগুলির প্রধান দোষ এই যে, ঘরের দেওয়ালে জানালা রাখিবার প্রথা নাই। প্রায় প্রত্যেক ঘরে একটীমাত্র দ্বার থাকে। দ্বিতীয় দ্বার বা জানালা প্রায়ই থাকে না। তবে খুব সৌখিন লোক হইলে হয় ত আধ হাত চওড়া ও একহাত লম্বা একটী গবাক্ষ মাত্র থাকে। দরজাও এত অপ্রশস্ত যে, সাধারণতঃ সেই দরজা দিয়া যাতায়াতের সময়

মাথা নীচু করিয়া না গেলে চৌকাটে মাথা ঠুকিয়া যায়। এরূপ গৃহে অন্ধকারের অবাধ রাজত্ব এবং বায়ুর প্রবেশ নিষেধ। এই কারণে গৃহগুলি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। কক্ষে জানালা না রাখিবার কারণ, কতকটা অবরোধ প্রথা, কতকটা জানালা রাখা ব্যয়বহুল বলিয়া। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে অবরোধ প্রথা একটু সঙ্কুচিত না করিলে চলে না। এবং মানুষের প্রাণের অপেক্ষা অর্থ নিশ্চয়ই বড় নহে, এইটী বিবেচনা করিয়া জানালা নির্মাণে কিঞ্চিৎ ব্যয় স্বীকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পরিবারের লোক সংখ্যার অনুপাতে কক্ষের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে থাকা স্বাস্থ্যকর বাসগৃহের অন্যতম লক্ষণ। কিন্তু দরিদ্র গৃহস্থ প্রায় স্বাস্থ্যরক্ষার এই অতি অবশ্য পালনীয় নিয়মটী মানিয়া চলিতে পারে না। একই ঘরে বহু লোককে বাস করিতে বাধ্য হইতে হয়। তাহার উপর আবার ঘরগুলিতে জানালা দরজা খুব কমই থাকে। এরূপ ব্যবস্থা যে কোন মতেই স্বাস্থ্যানুমোদিত হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। এক একটী কক্ষে দুই তিন জনের বেশী লোককে শয়ন করিতে হইলেই স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইবে। যেখানে নিতান্ত নিরুপায়, ঘরের সংখ্যা কম, পরিবারে লোক সংখ্যা বেশী, সে স্থলে ঘরে যথেষ্ট সংখ্যক দরজা জানালা রাখিতেই হইবে, এবং দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় জানালা দরজা খুলিয়া রাখিতে হইবে। নচেৎ পরস্পরের শ্বাস প্রশ্বাসে ও শরীরের গরমে ঘরের বায়ু শীঘ্রই দূষিত হইয়া সকলেরই স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিবে। আর, শয়ন কক্ষে আসবাবাদির উপদ্রব যত কম থাকে, ততই ভাল। সঙ্কীর্ণ গৃহ আসবাবে অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া থাকিলে, লোকের বাস করিবার যেমন অসুবিধা, ঘরের বায়ু দূষিত হইবার সুযোগও তত বেশী।

আবার আসবাব বেশী থাকিলে, ঘর রীতিমত পরিষ্কার রাখা যায় না। তা ছাড়া, মশা মাছি কীট পতঙ্গ পোকা মাকড় বিছা প্রভৃতি আসবাবের আসেপাশে ও পিছনে লুকাইয়া থাকিবার বেশ সুবিধা পায়।

যদি এক কক্ষে অনেক লোককে থাকিতে হয়, তবে ঘরের আয়তন বড় করিলে ততটা অসুবিধা নাও হইতে পারে। প্রত্যেক স্বাস্থ্যবান লোকের জন্য ১ ঘন ফিট বায়ু হইলেই যথেষ্ট হয়। এই অনুপাতে লোকসংখ্যা বুঝিয়া কক্ষের আয়তন নির্দ্ধারণ করিলে একরকম করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া বাস করা যায়। পীড়িত লোকদের জন্য অবশ্য ইহার অপেক্ষা বেশী আয়তনের বায়ু আবশ্যক হয়। তবে আমাদের পল্লীগ্রামের কুটীর ও সহরের খোলার বাড়ীগুলির দেওয়াল ও চালের মাঝে প্রায়ই কিছু না কিছু অবকাশ থাকে, এই যা রক্ষা। এরূপ স্থলে এরূপ গৃহে প্রত্যেক লোকের জন্য অন্যূন ৪ ঘন ফিট বায়ু হইলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। মেঝে হইতে ছাদের উচ্চতা ৮ ফিটের কম হইলে সে কক্ষ অস্বাস্থ্যকর। উচ্চতা দশ বার ফিট হইলে অবশ্য ভালই হয়। পল্লী কুটীরগুলির চালের শীর্ষদেশ যথেষ্ট উচ্চ থাকায় তাহার ফল ভালই হয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে যে অতীব আবশ্যক ব্যাপার, এ কথা এ দেশের আপামর সাধারণ, ইতর ভদ্র সকলেই জানে। নিত্য ঘর ঝাঁট দেওয়া ছড়া ঝাঁট দেওয়া, জঞ্জাল পরিষ্কার করা সকল বাড়ীতেই প্রায় অনুষ্ঠিত হয়। সহরে এই সকল জঞ্জাল বাড়ীর বাহিরে আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং মিউনিসিপ্যালিটীর ময়লার গাড়ী আসিয়া প্রত্যহ তাহা উঠাইয়া লইয়া গিয়া লোকালয় হইতে বহু দূরে স্থানান্তরিত করে। পল্লীগ্রামে যে সব যায়গায় মিউনিসিপ্যালিটী আছে সেখানে আস্তাকুড়ের জঞ্জাল স্থানান্তরিত হয় বটে কিন্তু নিত্য নহে। অথচ, প্রত্যহই আবর্জ্জনা লোকালয় হইতে দূরে পাঠাইতে পারিলে উত্তম হয়। যে সকল স্থলে মিউনিসিপ্যালিটী নাই, সেখানে কিন্তু গৃহস্থের বাড়ীর বাহিরে বাগানে কিম্বা পুকুরধারে এই সকল আবর্জ্জনা দিনের পর দিন ধরিয়া জমিয়া জমিয়া স্তুপাকার হইতে থাকে।

এইরূপ অব্যবস্থা গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ। যথাসম্ভব এই আবর্জনা গ্রামের বাহিরে নীচু কৃষিক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলে পল্লীবাসীর স্বাস্থ্য রক্ষাও হইতে পারে, জমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। আবর্জনা স্থানান্তর করিতে যদি কিছু খরচ পড়ে, তবে গ্রামবাসীরা সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া এই ব্যয়ভার বহন করিলে কাহারও গায়ে লাগে না, অথচ একটা মহৎ জনহিতকর কার্য্যও হইতে পারে। পালা ক্রমে এক একজন কৃষকের ক্ষেত্রে আবর্জনা নিক্ষেপ করাইলে খরচটা ষোল আনা উসুল হইয়াও আসিতে পারে।

সহরের ন্যায় পল্লীগ্রামে ভূমি ততটা দুর্লভ নহে। সেখানে ধনী দরিদ্র সকলেই ইচ্ছা করিলে বাস গৃহের নিকটে একটু বাগানের মত করিতে পারে। এই বাগানে গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় শাকসব্জি উৎপাদন করিলে গৃহস্থের সংসার খরচ কতকটা কমিতে পারে। দরিদ্র গৃহস্থ উদ্বৃত্ত শাকসব্জি বিক্রয় করিয়া কিছু কিছু অর্থলাভও করিতে পারে। শাকসব্জি ছাড়া কিছু কিছু ফুলের গাছও লাগানো যাইতে পারে। শশা, সিম, লাউ, কুমড়া, লঙ্কা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুণ প্রভৃতি প্রয়োজন বুঝিয়া উৎপাদন করা যায়। বেল যুঁই, গোলাপ প্রভৃতি ফুলের চাষ করিলে বায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গৃহস্থের চিত্তবিনোদনের সহায়তাও হয়। পেয়ারা, আতা, ডালিম প্রভৃতি যে সকল ফলের গাছ খুব বড় হইয়া বায়ু বা আলোকের অবাধ গতির বাধা জন্মায় না, সেই সকল ফলের গাছও গৃহ সংলগ্ন জমিতে লাগানো যায়। তবে কলাগাছ কিছু দূরে লাগাইতে হয় কেন না কলা গাছে ভূমি আর্দ্র স্যাঁতসেঁতে থাকে। আর আম, কাঁটাল প্রভৃতি বড় গাছ, যাহার দ্বারা আলো ও বায়ুর গতি রোধ হয়, বাড়ীর কাছ হইতে সুদূরে রোপণ করা কর্ত্তব্য। ভিটা সংলগ্ন জমিতে বড় গাছের মধ্যে নিম ও বেল প্রভৃতি দুই একটী গাছ রোপণ করিলে কোন ক্ষতি হয় না বরং এই সকল গাছে বায়ু বিশুদ্ধ হয়।

সহরে আজকাল জলের কল হওয়ায় জলাভাব অনেকটা নিরাকৃত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার পল্লী গ্রামে জলাভাব পল্লীবাসিগণের একটা মস্ত দুর্ভোগ। প্রায় গ্রামে পানীয় জলের, স্নানের রন্ধনের উপযোগী জলাশয়ের অত্যন্ত অভাব উপস্থিত হইয়াছে। সেকালে ধনী লোকেরা জন সেবার উদ্দেশ্যে পুণ্য ও ধর্ম্মলাভের প্রলোভনে পুষ্করিণী, বৃক্ষ, মন্দির প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিতেন। কালধর্ম্মে লোকের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন নূতন জলাশয় বেশী খনিত হয় না, পুরাতন জলাশয় সংস্কার ও যত্নাভাবে মজিয়া গিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। খাল বিল ক্ষুদ্র নদী প্রভৃতি জলাশয়ের অবস্থাও ভাল নয়। অথচ, জলের অভাবে মানুষের এক দিনও চলিতে পারে না। প্রত্যেক গ্রামে পানীয় জল ও রন্ধনার্থ জল সঞ্চয়ের জন্য অন্তত একটী করিয়া রিজার্ভ ট্যাঙ্ক থাকা আবশ্যক। স্নানের জন্য স্বতন্ত্র পুষ্করিণী থাকা চাই। অন্যান্য গৃহ কর্ম্ম, ঘর দোর ধোওয়া, গৃহপালিত পশুদিগের স্নান প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র পুষ্করিণী রাখা আবশ্যক। গ্রামের জমিদারেরই গ্রামের জলসংস্থানের ভার লওয়া কর্ত্তব্য। জমিদার এই কার্য্যে উদাসীন হইলে, প্রজারা সম্মিলিত ভাবে নূতন পুষ্করিণী খনন বা পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করাইয়া লইতে পারে এবং ঐ সকল পুষ্করিণীতে মাছের চাষ করিয়া পুষ্করিণী খনন বা তাহার পঙ্কোদ্ধারের ব্যয় যথাসাধ্য তুলিয়া লইতে পারে। পুষ্করিণী খনন অসাধ্য হইলে ইন্দারা খনন করানো চলে। অথবা টিউব ওয়েল বসাইয়া লইলেও জলাভাব অনেকটা দূর হইতে পারে। এ বিষয়ে জেলাবোর্ড বা লোক্যাল বোর্ড গ্রামবাসীদের কতকটা সাহায্য করিতে পারেন।

জলসংস্থান বিষয়ে আমাদের পল্লীবাসীদের একটী বড় বদ অভ্যাস আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কুটীর নির্ম্মাণের সময় দেওয়াল তুলিবার জন্য বাস্তু সংলগ্ন জমি

হইতেই মাটী তুলিয়া লওয়া হয়। এইরূপে প্রায় প্রতি পরিবারের বাস্তুর নিকটে এক একটী ছোট ডোবার মত গড়িয়া উঠে। বর্ষাকালে এই ডোবায় জল সঞ্চিত হয়। যত দিন না ডোবার জল সম্পূর্ণ শুকাইয়া যায়, তত দিন এই ডোবার জলে গৃহকর্ম্ম এমন কি স্নান রন্ধন এবং পান কার্য্য চলে। আবার ঘর দোর ধোওয়া জল এই ডোবায় আসিয়া সঞ্চিত হয়। পর্দানশীন পরিবারের কুলনারীদের এই ডোবার জলই এক মাত্র অবলম্বন বলিলেও চলে। তাঁহাদের ব্যবহারের সুবিধার জন্য বাড়ী ঘেরাও করিবার সময় ডোবাটিও প্রাচীর দিয়া কিম্বা দরমা বা ছিটা বাঁশের বেড়া দ্বারা ঘিরিয়া লওয়া হয়। তাঁহারা এই ডোবার জলে স্নান করেন, মল ত্যাগ করেন, বাসন মাজেন এবং প্রায় সকল রকম গৃহকর্ম্ম করিয়া থাকেন। অথচ এই ডোবার জল সাক্ষাৎ বিষ বলিলেই হয়। গৃহস্থের আবর্জ্জনার অধিকাংশ এবং পরিত্যক্ত যাবতীয় জল এই ডোবায় আসিয়া সঞ্চিত হইয়া ইহাকে নানা রোগের আকর করিয়া তুলে। আবার ম্যালেরিয়াবাহী মশকের ইহাই জন্মভূমি—বিহারক্ষেত্র—breeding ground। এই ডোবাগুলি যে কত শত শত লোকের অকাল মৃত্যুর কারণ তাহার সংখ্যা করা যায় না। পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে এই ডোবা খননের প্রথা বন্ধ করিতেই হইবে। যে সকল ডোবা আছে, সে গুলি অচিরে ভরাট করিয়া ফেলিতে হইবে এবং নূতন ডোবা খনন রহিত করিতে হইবে। গৃহ নির্ম্মাণের মাটী সংগ্রহ করিবার জন্য ডোবার পরিবর্ত্তে কূপ খনন করিলে চলিতে পারে। বেশী মাটীর দরকার হইলে কূপ গভীর করিয়া খনন করা যাইতে পারে অথবা একাধিক কূপ খনন করা যায়। কূপে বারো মাস জল পাওয়া যাইবে এবং তাহাতে গৃহ কার্য্যের জন্য জলাভাব বহু পরিমাণে দূর হইতে পারিবে অথচ ডোবায় যে ক্ষতির সম্ভাবনা কূপ হইতে সে আশঙ্কা ততটা থাকিবে না। কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের আক্রমণের সময় কূপের জল দূষিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে, মধ্যে মধ্যে পার্ম্মাঙ্গানেট অব পটাশ ব্যবহার করিয়া সে আশঙ্কা অনেকটা নিবারণ করিতে পারা যাইবে।

অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে গোরু, ভেড়া ছাগল, ঘোড়া হাঁস প্রভৃতি পোষা হয়। গৃহপালিত পশু পক্ষীর বাসস্থান বাসগৃহ হইতে যথাসম্ভব দূরে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। অন্তত গোয়াল বাসগৃহ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে ভিটার অপর কোন অংশে নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। আর গোয়াল ঘর প্রত্যহ রীতিমত পরিষ্কার ও ধৌত করা আবশ্যক, যেন গোবর বা চোনা গোয়ালের মধ্যে পচিবার অবসর না পায়।

পল্লীবাসে মশামাছির উপদ্রব অত্যন্ত বেশী। ময়লা আবর্জ্জনা প্রভৃতি ইহার প্রধান কারণ। বাড়ী পরিষ্কার রাখিলে এই উপদ্রবের হাত হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বিছানা প্রত্যহ রৌদ্রে দিলে এবং ঝাড়িয়া লইলে ছারপোকার উপদ্রব থাকে না।

ফল কথা, বাসগৃহের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী জানা না থাকার দরুণ আমাদের দেশে অকালমৃত্যুর পরিমাণ অনেক বেশী। জেলাবোর্ড, লোক্যালবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতির নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবাসীদের বাসগৃহের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী তাহাদিগকে শিখাইয়া দেওয়া এবং তাহার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশে গো জাতির অধোগতি

[শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী এম আর এ এস]

বঙ্গদেশে গো জাতির যেরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি সেরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না। তজ্জন্য বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র দুগ্ধ মহার্ঘ হইয়া পড়িয়াছে এবং জল মিশ্রিত দুগ্ধ অবাধে খরিদ বিক্রয় হইতেছে। খাঁটি দুগ্ধ পল্লীগামেও মেলা দুর্ঘট—মিলিলেও ইহার মূল্য প্রতিসেরে চারি বা পাঁচ আনা কদাচ দ। পয়সা বা তিন আন য নামে। কলিকাতার ন্যায় সহরের আরও শোচনীয় দুরবস্থা। টাকায় আড়াই সের করিয়া খাটি দুগ্ধ বিক্রয় হয়। এমন দুর্ম্মূল্য দুগ্ধ ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে নাই। অন্যান্য প্রদেশের পল্লীগ্রামে এবং অধিকাংশ সহরে দুগ্ধের মূল্য টাকায় আট সের হইতে ষোল সের কিন্তু বঙ্গদেশে এমন দুরবস্থা কেন ঘটিল তাহার আলোচনা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

বঙ্গদেশে গাভীর সংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় যে অনেক অধিক তাহা নিম্নস্থ তালিকা দেখিলে প্রতীয়মান হইবে।—

প্রদেশ	গাভীর সংখ্যা (লক্ষ)	মহিষ গাভীর সংখ্যা (লক্ষ)	মোট লক্ষ
বঙ্গদেশ	৮১	৩	৮৪
বিহার ও উড়িষ্যা	২	১	৩
আগ্রা	৪১	২৫	৬৬
অযোধ্যা	২		২
পঞ্জাব	২৭	২৪	৫১
বোম্বাই	১৬	১	২৬
মাদ্রাজ	৫৭	২৫	৮২

উপরিউক্ত তালিকা হইতে দেখিতে পাই যে গাভীর সংখ্যা বাঙ্গলা দেশে অধিক লোক সংখ্যার অনুপাতেও বঙ্গদেশে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা গাভীর সংখ্যা কম নহে। তথাপি বঙ্গদেশে দুগ্ধ দুর্ম্মূল্য। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে বাঙ্গলায় গাই উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ দেয় না।

ইয়োরোপে আহারের নিমিত্ত প্রত্যহ অসংখ্য গো বধ করা হইলেও তথায় দুগ্ধ সুলভ এবং প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে তিন পোয়া দুগ্ধ গ্রহণ করে আমরা কিন্তু গড়ে অর্দ্ধ ছটাক দুধও পাই না। ইয়োরোপে সহরের বাহিরে দুগ্ধ টাকায় অন্যূন ৮ সের ও সহরে ৪ সের। তাহারা গো খাদক হইলেও গরুর যত্ন করিয়া থাকে। আর আমরা হিন্দু অন্ধ বিশ্বাসে গাভীকে মাতৃজ্ঞানে এবং ষাঁড়কে পিতৃজ্ঞানে পূজা করিলেও উহাদিগকে যত্ন করি না ও উপযুক্ত পরিমাণে আহার দিই না। আহার অভাবে বাঁটের দুগ্ধ শুষ্ক হয় তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না ও প্রতিকারের চেষ্টা করি না।

বঙ্গদেশে দুগ্ধ সঙ্কটের দ্বিতীয় কারণ এই যে বাঙ্গলার গরু অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা সাধারণতঃ দৈনিক অর্দ্ধ হইতে একসের দুগ্ধ প্রদান করে। পাঁচটা গাভীও এক পরিবারের দুগ্ধ যোগাইতে সমর্থ হয় না। ইয়োরোপের এক একটী গাভী সাধারণতঃ ৫ জনকে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের একটি গাভী ১ জনকে উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ প্রদান করে কিন্তু বাঙ্গলার গাভী হইতে একজন লোকেরও উপযুক্ত দুগ্ধ পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞদিগের মতে বেহারের ও বাঙ্গলার গরু একই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু আকৃতি ও দুগ্ধের কথা বিবেচনা করিলে উহারা যে একই শ্রেণীভুক্ত তাহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হইবে না। বাঙ্গলার গরুর অধঃপতনের প্রধান কারণ দুইটি—একটী খাদ্যের অভাব অন্যটী ষাঁড়ের অভাব। ইহাদের মধ্যে কোনটী প্রধান তাহা আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি না। প্রকৃতপক্ষে দুইটীই প্রধান

[বাঙ্গালার গাই]

এবং দুইটাই সমতুল্য। খাদ্যাভাবে বলিষ্ঠ জীবজন্তু দুর্ব্বল ও অকর্ম্মা হইয়া পড়ে তাহা কাহাকেও বলিতে হইবে না। অপুষ্টিকর অখাদ্য খাইয়া কোন জাতি কোন কালে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। জীব জন্তুর আহারের অভাব না থাকিলেও বলিষ্ঠ সুপুষ্ট সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত সুবীজের প্রয়োজন। কোন সাবধান ক্ষেত্রেও অপক্ক কিম্বা নষ্ট বীজ অঙ্কুরিত হয় না অপক্ক বীজ অঙ্কুরিত হইলেও উহা নিস্তেজ হইবে ও অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে নতুবা উহার বীজে জীবনীশক্তি থাকিবে না ইহা ধ্রুব সত্য কথা। বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামে ষাঁড় দেখিতে পাওয়া যায় না। অপরিণত বয়স্ক ষাঁড় দ্বারা পাল বক্ষা হইতেছে। এই অপক্ক বীজ দ্বারা উৎপন্ন বাঙ্গলার গো জাতি শীর্ণ খর্ব্বাকৃতি হইয়া ধ্বংস মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।*

উৎকৃষ্ট গাভী হইতে নিকৃষ্ট ষাঁড় দ্বারা নিকৃষ্ট বৎসই উৎপন্ন হয় অন্যদিকে নিকৃষ্ট গাভীও উৎকৃষ্ট ষাঁড় দ্বারা উৎকৃষ্ট বৎস প্রদান করিয়া থাকে। নিকৃষ্ট ষাঁড় দ্বারা প্রচুর দুগ্ধবতী গাভীর বৎসা তেমন দুগ্ধবতী হইবে না।

[বাঙ্গালার অপরিণত বয়স্ক বৃষ]

---

* বাঙ্গলায় গোরুর যে কি ঘোর দুরবস্থা তাহা আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি। দেশে দেশে বাঙ্গলার গোরুর দুর্নাম রটিয়াছে যে বাঙ্গলার গোরু দুধ দেয় না। ইহাতে গোরুর একটুও দোষ নাই। দোষ সম্পূর্ণ তাহার যে গোরু পোষে অথচ তাহার পালনে অবহেলা করে। আমাদের নিজ অভিজ্ঞতা হইতে ইহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন দোষ কার— গোরুর না যে পালে তাহার।
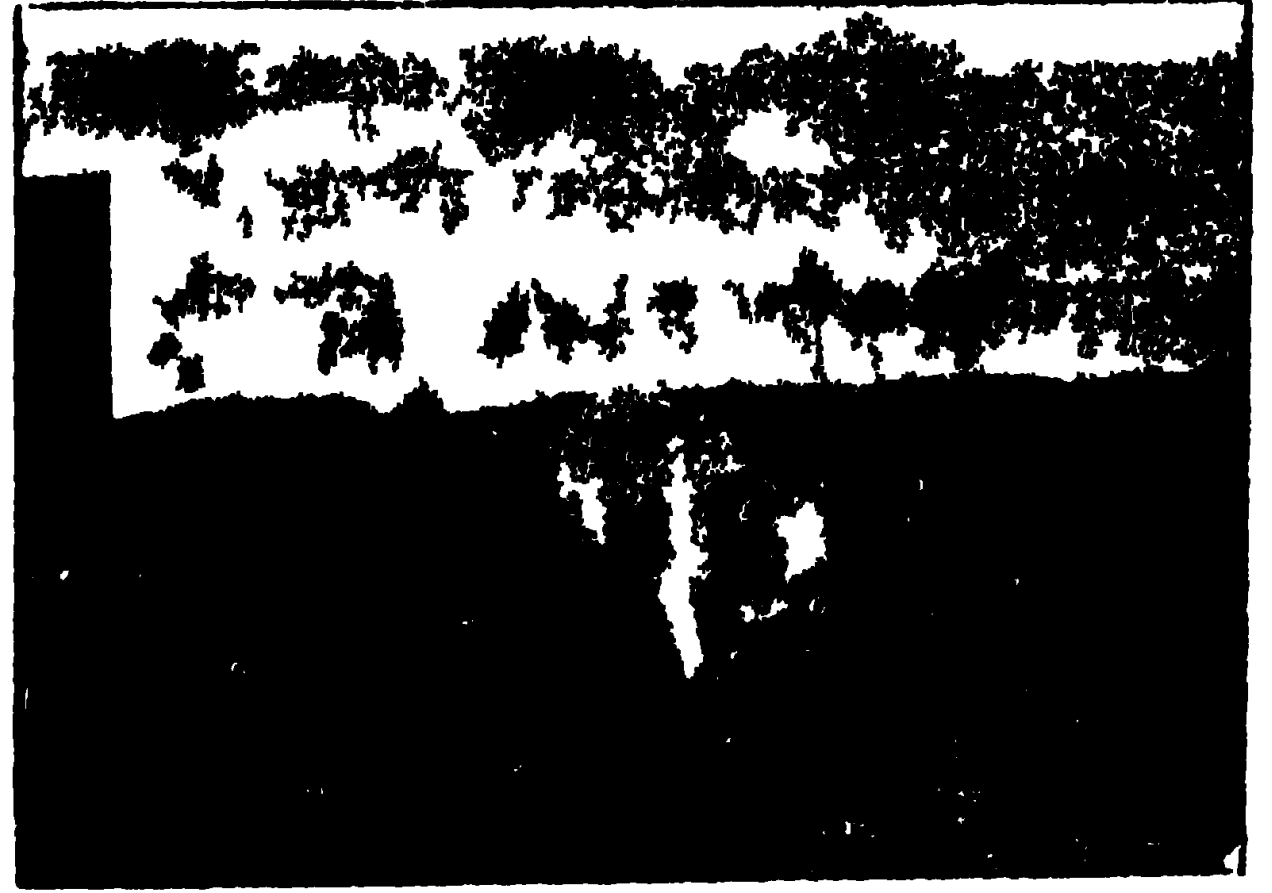
কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। এক দিন দেখিলাম একজন কৃষক ও তাহার একটী কিশোর বয়স্ক পুত্র একটা গাভী ও তাহার একটা সাদা বাছুর লইয়া আমাদের গলি দিয়া যাইতেছে। এদোর ওদোর ঘুরিয়া সে আমাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল বাবু গোরু কিনবেন? আমরা গোরু পুষি না কিনবার ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু সে ব্যক্তি বড় কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। কথায় কথায় শুনিলাম সে সকাল হইতে গোরু লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বিক্রয় করিতে পারিতেছে না। তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত। কৃষকটি তার পুত্র গোরুটি ও তাহার বাছুর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বড় ক্লান্ত হইয়াছে বোঝা গেল। আমার মন ভিজিল আমি গোরু কিনিতে রাজী হইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম কত দুধ দেবে? সে বলিল রোজ আড়াই সের করিয়া দুধ দেয়। আমি ভাবিলাম যখন কৃষক বলিতেছে যে গোরুটি রোজ আড়াই সের করিয়া দুধ দেয় তখন প্রকৃত পক্ষে পাঁচ পো আশা করিতে পারা যায়। তার পর দর জিজ্ঞাসা করিলাম। সে প্রথমে কত দর বলিয়াছিল তাহা আমার মনে নাই। সম্ভবত যাহা বলিয়াছিল তাহা বেশী বোধ হওয়ায় এবং আমার গোরু পুষিবার তেমন ইচ্ছা না থাকায় আমি তাহা দর বেশী মনে করিয়া কিনিতে অস্বীকৃত হই। অবশেষে অনেক কথার পর গোরুটির দর স্থির হয় পোনেরো টাকা। বোধ হয় লোকটি খুব দুরবস্থায় পড়িয়াছিল—টাকার তাহার খুব দরকার তাই সে ঐ পনেরো টাকায় গোরু ও বাছুরটি আমাকে বিক্রয় করিল। আমি তাহাকে টাকা দিলাম। সে যাইতে উদ্যত

এক জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কোন কোন বিশেষত্ব আছে ঐ বিশেষত্ব নানা কারণে ঘটিয়া থাকে। একই পিতা মাতার সন্তান একই স্থানে লালিত পালিত হইলেও তাহাদের মধ্যে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। উত্তম ষাঁড় নির্ব্বাচন দ্বারা পালের উন্নতি হইবে, ইহাতে ভুল নাই। নির্ব্বাচন প্রথা অবলম্বন করিয়াই ইয়োরোপের গো জাতির অসীম উন্নতি ঘটিয়াছে। ২ বৎসর পূর্ব্বে ইয়োরোপের কোন জাতীয় গাভী দৈনিক ৪৫ সেরের অধিক দুগ্ধ প্রদান করিত না। বর্ত্তমানে তথাকার গাভীগণ দৈনিক গড়ে ২ হইতে ৩ সের দুগ্ধ দিয়া থাকে। যে গাভী হইতে অর্দ্ধ মণের অধিক দুধ পাওয়া যায় না সে গাভী তাহারা পালন করিবে না এবং ইহার বংশ রক্ষা করিবে না।—যে ষাঁড়ের বাচ্চা দুগ্ধবতী গাভীতে পরিণত হইবে না সেই ষাঁড় এবং তাহার বাচ্চা

হইলে আমি তাহাকে বসাইয়া তাহাকে ও তাঁহার পুত্রকে ভাত খাওয়াইলাম। যাইবার সময় সে অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া গেল। গোর আড়াই সের দুধ দেয়—তাহার এই আশ্বাসে আমি সন্দেহ প্রকাশ করায় সে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া বলিল গোরুটি যথার্থই আড়াই সের করিয়া দুধ দেয় বটে। কিন্তু তাহার কথা যাচাই করিয়া লইবার সুযোগ ছিল না কেন না সেদিনকার সকাল বেলাকার দুধ দোহা হইয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক আমার মন হইতে সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর হইল না। আমি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া গোরু কিনিলাম। আমার মনে বিশ্বাস ছিল যে যদি গোরুটি বাস্তবিকই আড়াই সের করিয়া দুধ দিত তাহা হইলে কৃষক কখনই পনেরো টাকায় গরু ও বাছুর বিক্রয় করিতে রাজী হইত না।

যা হোক গোরু ত কিনিলাম। আগে গোরু কখনও পুষি নাই—গো পালন সম্বন্ধে আমার কিম্বা বাড়ীর অপর কোন লোকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। আমাদের পাশের বাড়ীর এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে গোরু ছিল। তাঁহাদের পরামর্শানুযায়ী গোরুর সেবার ব্যবস্থা হইল। দুধ দুহিবার জন্য একজন গোয়ালাও তিনিই ঠিক করিয়া দিলেন। সেই দিন বেকালে দোহন করিয়া সামান্য দুধ পাওয়া গেল।

পল্লীগ্রামে গো পালনের সুবিধা অসুবিধা কিরূপ তাহা আমরা কিছুই জানি না—আমরা চির দিন কলিকাতাবাসী—সহরে। তবে কলিকাতায় গোরু পোষার অসুবিধা বিস্তর এবং তাহা বিলক্ষণ ব্যয় সাধ্যও বটে। আর আমরা ধনী নই—মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মাত্র। এবং কলিকাতায় বিনামূল্যে একগাছি তৃণও পাওয়া যায় না। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও যখন গোরুটি কেনা হইয়াছে তখন যথাসাধ্য তাহার সেবা করিতে লাগা গেল।

আমাদের বাড়ীর কাছে কোন মাঠ বা খোলা যায়গা ছিল না যেখানে গোরু চরিতে ও ঘাস খাইতে পারে। ভরসার মধ্যে খড় খোল ভুসি ও রন্ধনশালার তরকারীর খোসা ও ভাতের ফেন। যাহা উচ্ছিষ্ট হইত তাহা আমরা তাহাকে আদর করিয়া খাওয়াইয়া দিতাম।

যে দিন গোরু কেনা হয় সে দিন দুধ বিশেষ পাওয়া যায় নাই। পর দিন দুই বেলা দুধ দোহন করিয়া দেখা গেল বিক্রেতা ঠকায় না — মিথ্যা কথা বলে নাই গোরুটি যথার্থই আড়াই সের করিয়া দুধ দেয় বটে।

বাছুরটির চেহারা রোগা ছিল—বেশ বুঝিলাম কৃষক তাহাকে রীতিমত খাইতে দিত না কিম্বা দিতে পারিত না। বাছুরটির বয়স বেশী নয় খুব হৃষ্ট পুষ্ট না হইলেও নিতান্ত রোগাও ছিল না—বোধ হয় কিঞ্চিৎ মায়ের দুধ পাইত বলিয়া কারণ সে তখনও জাব খাইতে শিখে নাই।

যাহা হউক গোরু পুষিতে লাগিলাম ও যথাসাধ্য যত্নও করিতে লাগিলাম। দুই চারি দিনের মধ্যে গোরুর চেহারা ফিরিতে আরম্ভ করিল গায়ে মাংস গজাইতে লাগিল। ক্রমে দেখা গেল দুধেরও পরিমাণ একটু একটু করিয়া বাড়িতেছে। দুই তিন মাসের মধ্যে গোরু দৈনিক পাঁচ সের পর্য্যন্ত দুধ দিতে লাগিল। তাহার দুধ খুব মিষ্ট ছিল। গোয়ালার কাছ হইতে যে দুধ আগে আমরা কিনিয়া লইতাম তাহাতে কখনও এতটা মিষ্টতা দেখি নাই। দুধ জ্বাল দিবার পর তাহার উপর বেশ পুরু পীতবর্ণের একটা সর পড়িত দুধের রঙও ঈষৎ পীত ছিল। গোরু ও বাছুর দুইই কিছু দিনের মধ্যেই বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া প্রতিবেশীগণের দৃষ্টি ও বাহবা অর্জ্জন করিয়াছিল।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন বাঙ্গলার গোরুর দোষ কি এবং কোথায়? মিছামিছি দেশ বিদেশে তাহার এত দুর্নাম রটে কেন? কলিকাতার মধ্যবিত্ত ঘরে নানা অসুবিধার মধ্যে গোরু পুষিয়া ও সমস্ত জিনিস কিনিয়া খাওয়াইয়া এবং অতি সামান্য মাত্র যত্ন করিয়া যখন এমন সুন্দর ফল পাওয়া যায় তখন পল্লীগ্রামে খোলা মাঠে চরিতে পাইলে রীতিমত খাইতে পাইলে এবং যথোচিত যত্ন পাইলে বাঙ্গলার গোরু সাধারণত যে পরিমাণ দুধ দেয় তাহার অপেক্ষা আরও অনেক বেশী দুধ যে দিতে পারে ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এখন বুঝিয়া দেখুন যাহাদের গোরু আছে প্রধানত তাহাদের অযত্নেই বাঙ্গলার গোরু দুর্দ্দশার চরম শিখরে উঠিয়াছে

মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল সপ্তাহ

[শ্রীকালীপ্রসন্ন রায় এম এ]

এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও উপকারিতার বিষয়ে প্রায়ই তীব্র সমালোচনা শুনিতে পাওয়া যায়। সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন ইহাতে দেশের বিশেষ কোনরূপই উপকার হইবে না ইহা কেবল একটা হুজুগ মাত্র এবং যে অর্থ এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয় উহা তাহার চেয়ে অনেক ভালরূপ ব্যয়িত হইতে পারিত। এই সকল প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে যে সকল অনুষ্ঠানে মানবজাতির মঙ্গল হয় তাহা একেবারে হুজুগ বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। যখন আমরা বাঙ্গলা দেশে মাতৃমৃত্যুর ও শিশুমৃত্যুর হার আলোচনা করি তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বাঙ্গলা দেশে ৬ হইতে ৭৫ মাতার প্রসবকালীন মৃত্যু ঘটিয়া থাকে ও প্রায় ২ এর উপর শিশুমৃত্যু ঘটে। ইহার কারণ খুঁজিয়া দেখিলে দেখা যায় যে প্রসবের সময় দুর্ঘটনা আঁতুড় ঘরের অব্যবস্থা ও কুসংস্কার সূতিকা রোগই প্রসূত ও প্রসূতির মৃত্যুর বিশেষ কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য ইহা ছাড়াও অন্যান্য অনেক কারণ আছে যাহাতে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর সংখ্যা বাড়াইয়া দেয়। ঘটনা মাত্রেরই হেতু উপস্থিত থাকে তন্মধ্যে কয়েকটি অনিবার্য্য ও কয়েকটি নিবার্য্য। অনিবার্য্য হেতুগুলির উপর আমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারি না কিন্তু নিবার্য্য হেতুগুলি জানিয়া শুনিয়া যদি আমরা দেখিয়াও না দেখি তাহা হইলে সে দোষ আমাদেরই অপরের নহে। অপরাপর সভ্যজাতি এ বিষয়ের উদাহরণস্থল। মাহোদয়া লিটন একস্থলে বলিয়াছেন যে ২৫ বৎসরের মাতৃ ও শিশুমঙ্গল বিষয়ক অভিজ্ঞতা বাঙ্গলার মাতৃমণ্ডলীকে জানানই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ইহা হইতে বোঝা যায় যে ইংলণ্ডেও ২৫ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের কাছাকাছি অবস্থা ছিল কিন্তু উপর্যুপরি চেষ্টায় ও বিজ্ঞানের সাহায্যে তাঁহারা নিবার্য্য কারণগুলির উপর হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যদি আমরা মাতা ও শিশুদের অকালমৃত্যু হইতে বাঁচাইতে চাই তবে সে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করিতে হইবে। অপরাপর কারণের উপর যতই জোর দিই না কেন ইহা নিশ্চিত যে যত দিন আমাদের মাতাগণ তাঁহাদের মাতৃত্বের দায়িত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিবেন তত দিন অকালমৃত্যু তাঁহাদের ও তাঁহাদের শিশুদের গ্রাস করিবেই। নোংরা অশিক্ষিত দাই অপরিষ্কার আঁতুড় গৃহ ও তৎসম্বন্ধ কয়েকটি কুসংস্কার ও কিয়ৎপরিমাণে বাল্যবিবাহ প্রায় ৩ মাতা ও ১৫ লক্ষ শিশুর মৃত্যুর কারণ। এই হেতুগুলি নিবার্য্য। যদি এইগুলির উপরে আমাদের একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়ে ও সেইগুলি সংশোধন করিতে চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে আমরা এতগুলি প্রাণীহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হই। কিন্তু দুঃখের বিষয় যখনই এই কথাগুলি বলিতে চেষ্টা করা হয় তখনই একদল সমালোচক তাঁহাদের কূট তর্ক দ্বারা অনিবার্য্য কারণগুলিকে সম্মুখে আনিয়া খাড়া করেন ও ভীষণ তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করেন। অবস্থা ঠিক যেন ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা। যেটি সম্ভব সেটিকে ছাড়িয়া যেটি পারিব না সেইটি লইয়া তর্ক করা। মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল অনুষ্ঠান মাতা ও শিশুদের জন্য না হইয়া আমার মনে হয় যে যদি শিশুদের পিতাদের শিক্ষার জন্য অনুষ্ঠিত হইত তাহা হইলে বিশেষ ফললাভ হইত কারণ যাহাদের হাতে এই মাতাদের ও সদ্যপ্রসূত শিশুদের ভার ন্যস্ত তাঁহারা অতিশয় উদাসীনভাবে এই নোংরা আঁতুড় ঘরের কথা কিংবা অশিক্ষিতা ধাত্রীর নিয়োগের কথা বলিলেই বলেন যে ওটা মেয়েদের কাজ—আমাদের উহাতে হস্তক্ষেপ করা ভাল দেখায় না।

অথচ অন্য সকল সাংসারিক বিষয়ে তিনিই হাকিম হইয়া কাজ করেন। যেখানে কোন একটি রীতি বা কুসংস্কার বদলাইতে হইবে সেইখানেই আমাদের পুরুষগণ গর্জন করিয়া বলে ও ওটা মেয়েলী কাজ আমাদের নয়। কোনরূপে মনকে আঁখি ঠারা। যদি আজ সকল গৃহস্থের পুরুষ অভিভাবক এই নারকীয় আচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেন তাহা হইলে কি আজ এতগুলি মাতার ও সদ্যপ্রসূত শিশুর মৃত্যু ঘটিত? এই অনুষ্ঠানের একটি মহৎ উদ্দেশ্য এই—আমাদের মাতারা ও ভাবী মাতারা যাহাতে তাঁহাদের নিজেদের ও তাঁহাদের শিশুদের কল্যাণকর বিষয়গুলি জানিতে ও বুঝিতে পারেন ও সুস্থ ও সবল শিশুজাতিকে উপঢৌকন দিয়া তাঁহাদের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন ও তাঁহাদের অপরাপর অশিক্ষিতা ভগ্নীদিগকে প্রসবকালীন কুসংস্কারের বিষয় বুঝাইয়া দিতে পারেন এবং যাহাতে পিতৃস্থানীয় পুরুষেরা তাঁহাদের এই কুসংস্কার অপনোদনে সহায়তা করিতে পারেন তাহার ব্যবস্থা করা। ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে বলার বিশেষ প্রয়োজন নাই কারণ যদি প্রত্যেক বৎসর গ্রামে গ্রামে এইরূপ অনুষ্ঠান হয় অশিক্ষিত ও গরীব মাতারা যাহারা ঘোর কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া শুনিয়া বুঝিবেন যে তাঁহাদের কি করা আবশ্যক ও মধ্যে মধ্যে সাধারণ চেষ্টা দ্বারায় (baby clinic) শিশুদের চিকিৎসালয় খোলা হইতে পারে যাহাতে গরীব মাতারা আসিয়া প্রসবকালীন অথবা তৎপরে শিশুসহিত সাহায্য পাইতে পারেন। এই অনুষ্ঠানের ফলে কলিকাতায় প্রায় ৫টী এইরূপ Baby clinic ও ঢাকায় একটি মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। আশা করা যায় যে যে অর্থব্যয়ে এই মাতৃমঙ্গল কার্য্য প্রত্যেক বৎসর অনুষ্ঠিত হয় অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করিয়া মাতা ও সদ্য প্রসূত শিশুদের প্রাণরক্ষা করিয়া তাহার সুদ ও আসল শোধ করিয়া দিতে সমর্থ হইবে।

"সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি"

[শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ]

আমরা সম্প্রতি বঙ্গলক্ষ্মী নামে একখানি মাসিক পত্রিকা পাইয়াছি। বাংলা দেশের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে মহিলা সমিতি স্থাপন করিয়া তথাকার নারীদিগের শিক্ষা স্বাস্থ্য শিল্প অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নতিসাধনের জন্য সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি নামে যে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে তাহারই মুখপত্র স্বরূপ বঙ্গলক্ষ্মী বাঙ্গলার নারী সমাজের সেবার জন্য প্রকাশিত হইতেছে। আমরা 'বঙ্গলক্ষ্মী'র তিন সংখ্যা—প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ—'সূচনা'য় দেখিতেছি বঙ্গলক্ষ্মীতে বাঙ্গলার মহিলাগণ কর্তৃক পরিচালিত নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানের কথা নারী শিক্ষার অবস্থা এবং নারীজাতির উন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইবে।

আজকাল বাঙ্গলা সংবাদপত্রে এই নারীমঙ্গল সমিতির কথা খুব বেশী পরিমাণে আলোচিত হইতেছে। ইহা কেবল ফাঁকা আওয়াজ নহে—এই সমিতির দ্বারা প্রকৃত কাজও কতক কতক হইতেছে বলিয়া শুনিতে পাইতেছি। ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় যুধ্যমান দেশসমূহের সমর্থ পুরুষমাত্রেই এই যুদ্ধে চলিয়া যাওয়ায় পুরুষদের কাজ কর্ম্ম নারীদিগকেই করিতে হইয়াছিল। কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া নারীরা তাঁহাদের শক্তির প্রকৃত পরিচয় লাভ করেন। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে নারীরা কেবল নারীজনোচিত কার্য্যেই নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু জাতীয় বিপদের দিনে বাধ্য

হইয়া যখন তাঁহারা পুরুষোচিত ও পৌরুষ মূলক কার্য্যগুলিও করিতে লাগিলেন তখন তাঁহাদের দিব্যনেত্র খুলিয়া গেল। এত দিন তাহারা প্রায় সকল কাজেই পুরুষদিগের উপর প্রধানত নির্ভর করিয়া থাকিতেন। এখন হইতে তাঁহারা জাগিয়া উঠিতে লাগিলেন। তখন হইতেই বিশ্বময় একটা নারীজাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল, সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া নারীজাতি আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। সেই আন্দোলনের তরঙ্গ ভারত বর্ষের উপকূলও আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল। দেড়শতাধিক বৎসর ইংরেজ শাসনাধীন থাকিয়া ভারতের নারীজাতি যে সামান্য শিক্ষার আলোক পাইয়াছিলেন সেই অল্পমাত্র আলোকের স্বাদ পাইয়া তাঁহারা তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না আরো আলো আরো আলোর (Light ! Light ! more Light !) জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। সেই জ্ঞানালোক লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষার ফলে বঙ্গদেশে কয়েকটি নারী সমিতি স্থাপিত হইল এবং সহরে ও মফস্বলে অনেকগুলি নূতন বালিকা বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইল। সরোজ নলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি সেই দেশব্যাপী নারী জাগরণেরই একটা অভিব্যক্তি।

এখন, যাঁহার নামে এই মহদনুষ্ঠানের সূচনা সেই সরোজ নলিনী কে? এই মহিয়সী মহিলা আমাদের বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই সি এস মহাশয়ের পত্নী। রাজকার্য্যের গুরুতর পরিশ্রমের পরেও দত্ত মহাশয় অবসর পাইলেই বহু জনহিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেইরূপ বহু অনুষ্ঠানের বিবরণ মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেমন স্বামী পত্নীও তদ্রূপ। ইনি প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ছিলেন (কিছুদিন পূর্ব্বে সরোজনলিনী লোকান্তরিতা হইয়াছেন)। স্বামীর প্রত্যেক জন হিতকর কার্য্যেই তিনি সহযোগিতা করিতেন। সমগ্র বঙ্গে বহু সংখ্যক নারী সমিতি গঠনের কল্পনা তাঁহারই মস্তিষ্ক প্রসূত। বঙ্কিম বাবু তাঁহার সীতারাম উপন্যাসে বলিয়া গিয়াছেন— হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে? স্বর্গীয়া সরোজনলিনীও বুঝিয়াছিলেন— নারীর মুক্তি সাধনের ভার নারী না লইলে কে লইবে? তাঁহারই পুণ্যস্মৃতি রক্ষার জন্য কয়েক মাস পূর্ব্বে কলিকাতা সহরে সরোজনলিনী দত্ত নারীমঙ্গল সমিতি নামে একটা কেন্দ্র সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। নারী দিগের শিক্ষা স্বাস্থ্য, শিল্প, সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। নারী শিক্ষা বিধানের জন্য এই সমিতি হইতে সুবিজ্ঞ বক্তাদিগকে ম্যাজিক লণ্ঠন সহ মফস্বলে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বক্তারা শিক্ষা স্বাস্থ্য, শিশুমঙ্গল মাতৃমঙ্গল খাদ্য শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বুঝাইয়া দিবেন। কলিকাতার কেন্দ্রীয় সমিতি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতার বাহিরে বাঙ্গলা দেশে মাত্র ৮৯টি মহিলা সমিতি ছিল। কেন্দ্রীয় সমিতির কয় মাসের চেষ্টায় ৪।৪২টি স্থানে মহিলা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গে এখন মহিলা সমিতির সংখ্যা ৪৯টি। ঐই সকল মহিলা সমিতির মধ্যে কোন কোনটির চেষ্টায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। কোথাও চরকা চলিতেছে। কোথাও কোথাও বা সেলাইয়ের কাজও হইতেছে। কোন কোন সমিতি শিল্পাশ্রম স্থাপন পূর্ব্বক খদ্দর প্রস্তুত ও বিক্রয় করাইতেছেন।

বন্দে মাতরম মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'সাম্য' প্রবন্ধে বাঙ্গলার নারীজাতির শোচনীয় দুর্দ্দশার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন নারীজাতির দুর্দ্দশা মোচনের জন্য কে অগ্রসর হইবে? বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রশ্ন করিবার পর চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়াছে, অথচ এই মহান্ কার্য্য সাধনের জন্য কেহ অগ্রসর হন নাই। স্বর্গীয়া সরোজনলিনী আজ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন বলিয়াছেন নারীজাতির দুর্দ্দশা মোচনের জন্য নারীকেই অগ্রসর হইতে হইবে। এ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কথাগুলি এই— 'আমি তাই আমাদের দেশের মা বোনদের অনুরোধ করছি জেগে উঠুন—প্রতি জেলায় প্রতি সহরে, প্রতি গ্রামে মহিলা সমিতি স্থাপন

করুন। স্ত্রী শিক্ষার প্রভাবে দেশ ছেয়ে ফেলুন। তা ছাড়া দেশের প্রকৃত উন্নতির আশা নাই। দেশের মহিলারা জাগ্রত হোন্ নতুবা যতই স্বাধীনতার আশা করি না কেন সবই বিফল হবে। সরোজনলিনী যে কল্পনা করিয়াছিলেন তাঁহার স্বামীর চেষ্টায় আজ তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

প্রতীচ্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের শান্তিপূর্ণ গণ্ডীবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার বিলক্ষণ বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। সমাজ শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়াছে আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক জীবন ধারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভগ্ন সমাজ দেহ হইতে এখনও নূতন সমাজ গড়িয়া উঠে নাই কারণ ভাঙ্গা যত সহজ গড়া তত সহজ নহে। কাজেই ভবিষ্য বাঙ্গালী সমাজ কি ভাবে গড়িয়া উঠিবে তাহা এখনও বলা যায় না। অতীত আমাদের হস্তচ্যুত অনাগত সমাজ ব্যবস্থার উপরও এখন কোন প্রভাব পরিচালনের সামর্থ্য আমাদের নাই। বর্ত্তমান সমাজ লইয়াই আমাদের কারবার। সমাজের অবস্থা এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে এই অবস্থাতেই যথাসাধ্য সমাজ শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ যাহাতে সুখে না হউক অন্তত স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে এবং যাহাতে অচির ভবিষ্যতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে তাহাই এখন সমাজের মঙ্গলকামী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতীচ্য শিক্ষা ও সভ্যতার তীব্র ও উজ্জ্বল আলোকে আমাদের স্নিগ্ধ শ্যাম প্রাচীন সভ্যতালোকের দীপ্তি ম্লান হইয়া লোকের চক্ষে একটা ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছে। আমরা একটা মস্ত বড় দ্বিধায় পড়িয়া গিয়াছি—প্রাচীন পন্থার অনুসরণ করিয়া চলিব না নব্য পন্থা অবলম্বন করিব? দেশকাল পাত্রের উপযোগী করিয়া সমাজকে নিয়ন্ত্রিত না করিলে সমাজের কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে নির্ব্বাহ হইতে পারে না ইহা ঠিক। সেই জন্য এ দেশে যেমন যুগে যুগে সমাজ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তদনুযায়ী করিয়া সমাজেরও মতি গতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইয়াছে। তাই আমাদের সমাজ এখনও টিকিয়া আছে।

আজ আবার একটা নূতন সমাজ বিপ্লবের যুগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সুদূর প্রতীচ্য ভূমি হইতে এক অতি তেজস্বী জড়বাদী নব সভ্যতালোক ও শিক্ষালোক আসিয়া আমাদের প্রাচীন হিন্দু সভ্যতাকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিতেছে। পূর্ব্বতন যুগগুলতেও আমরা এইরূপ আঘাত পাইয়াছি, এবং তাহা হজম করিতেও পারিয়াছি। বাহির হইতে যাহা আসিয়াছিল তাহাকে আমাদের নিজস্ব করিয়া লইয়া আমাদের সভ্যতার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া মিশাইয়া লইয়া একটা রফা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি। বর্ত্তমান প্রতীচ্য সভ্যতাকেও কি আমরা সেই ভাবে নিজস্ব করিয়া লইতে পারিব না একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িব? এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র মহাকালই দিতে পারে। অতএব এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর সেই মহাকালের জন্য রাখিয়া দিয়া আমরা কেবল বর্ত্তমান অবস্থা লইয়াই আলোচনা করিব।

প্রাচীন কালে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির কর্ম্ম বিভাগ ছিল। পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র ছিল বাহিরে নারীর ছিল অন্তঃপুরে। উভয়েই উভয়ের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া মিলিয়া মিশিয়া শান্তিতে বাস করিত। কিন্তু প্রতীচ্য ভূমিতে এই শ্রেণীর কর্ম্মবিভাগ নাই—ঘরে বাহিরের কোন পার্থক্য নাই সদর অন্দরের ভেদ ভেদ নাই। প্রতীচ্য ভূমিতে পুরুষ ও নারীর কর্ম্ম ক্ষেত্র এখন অনেকটা একই। পূর্ব্বে যদিই কিছু পার্থক্য থাকিয়া থাকে—নারীরা আন্দোলন করিয়া সে পার্থক্য টুকু রহিত করিয়াছেন। যেটুকু বাকী ছিল গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধ সেটুকুও শেষ করিয়া দিয়াছে।

কতকটা প্রতীচ্য সমাজ ও সভ্যতার দৃষ্টান্তে এবং কতকটা বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার ফলে আমাদের সমাজের অবস্থার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও হইতেছে তাহার ফলে সেকালের রীতিনীতি এবং কর্ম্ম বিভাগের আদর্শ নিখুঁত ভাবে মানিয়া চলা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

জীবন-সংগ্রাম ক্রমে প্রবল হইতেছে। জীবিকার্জ্জন ও সংসার প্রতিপালন পূর্ব্বে একমাত্র পুরুষের কার্য্য ছিল। এখন পুরুষ একা আর সেই ধাক্কা সম্পূর্ণরূপে সামলাইতে পারিতেছে না—স ধাক্কা পুরুষকে অতিক্রম করিয়া নারী সমাজকেও স্পর্শ করিতেছে। অর্থাৎ অনেক স্থলে জীবন সংগ্রামে পুরুষের সঙ্গে নারীরও যোগ দেওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। সেকালে যখন দেশে লোক সংখ্যা কম ছিল টাকার মূল্য বেশী ছিল, প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হইত এবং তাহার মূল্যও সস্তা ছিল তখন কেবল মাত্র পুরুষের পরিশ্রমের ফলে পরিবারের জীবিকা উপার্জ্জিত হইত এবং তাহাতে এক রকম স্বচ্ছন্দে দিন চলিয়া যাইত। এ দেশের এক নবাব সায়েস্তা খাঁর শাসনকালে টাকায় ৮ মণ চাউল পাওয়া যাইত, অন্যান্য জিনিসপত্রও তদনুপাতে সুলভ ছিল। এখন সব চেয়ে নিরেশ চাউলের মণও ৮ টাকার বেশী। উৎকৃষ্ট চাউল ১১ ১২ টাকার কমে পাওয়া যায় না। এমন অবস্থায় একা পুরুষের উপার্জ্জনে একটা পরিবার আর সুশৃঙ্খলে চলিতেছে না। সেইজন্য অনেক স্থলে মহিলাদিগকেও পুরুষদের অর্থোপার্জ্জন ব্যাপারে সাহায্য করিতে হইতেছে। নহিলে দিন চলে না।

কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের উপযুক্ত ক্ষেত্র কোথায়? তাহাও যে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। আর পুরুষদের অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্র যদিও কিছু কিছু মিলিতে পারে কিন্তু নারীর কার্য্য ক্ষেত্র পূর্ব্বেও যেমন ছিল না, এখনও তেমনি নাই। তাহা তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। নারীদের নূতন কার্য্য ক্ষেত্র হইবে—সহজ সহজ অনায়াসসাধ্য, অল্পশ্রমসাধ্য শিল্প। দেখিয়া সুখী হইলাম সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি এই দিকে বেশী ঝোঁক দিয়াছেন। সমিতির মুখপত্র বঙ্গলক্ষ্মী মাসিক পত্রিকাখানিতে এ বিষয়ে রীতিমত আলোচনা হইতেছে। সমিতির তত্ত্বাবধানে একটী নারী কুটীর শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহার কাজও বেশ ভালই চলিতেছে।

কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্যই যে শিল্প চর্চ্চা করা দরকার, তাহা আমরা মনে করি না। যাঁহাদের অবস্থা সচ্ছল, শিল্প কার্য্য করিয়া যাঁহাদের অর্থোপার্জ্জনের কোনই প্রয়োজন নাই তাঁহাদেরও কিছু কিছু শিল্প কার্য্য শিখিয়া রাখা ভাল মনে করি। এবং সেলাইএর কাজ শিখিলে নিজেদের গৃহস্থালীর যেমন উপকার হয় তেমনি দুস্থ পাড়াপড়শীরও অনেক উপকার করা যায়। প্রত্যেক পল্লীতেই যেমন সচ্ছল অবস্থার লোক আছেন তেমনি অতি দরিদ্র লোকও আছেন। স্বচ্ছল সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহিণী বা মহিলারা যদি নিজেদের ব্যবহৃত জামা ইজের পেণ্টলান প্রভৃতি কাটিয়া সেলাই করিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের উপযোগী জামা প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া গরীব প্রতিবাসীদের ছেলে মেয়েদের দান করেন তবে সামান্য পরিশ্রমে তাঁহারা কতই না পরোপকার করিতে পারেন। এইরূপ নানা কার্য্যে তাঁহারা জনহিত সাধন করিতে পারেন। ইহাতে সময়ের সদ্ব্যবহারও হয়। আর এরূপ কোন কাজ হাতে না থাকিলে পুরমহিলাদের পর চর্চ্চা পর নিন্দা বা তাস খেলা করিয়া বা বাজে উপন্যাস পড়িয়া সময় অতিবাহন করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না।

মহিলা সমাজের আরও একটী সুমহৎ কর্ম্ম ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। বাহিরে না গিয়া অন্তঃপুরে থাকিয়াই তাঁহারা এই কাজ করিতে পারেন। সেকালের গৃহিণীরা যেমন সেবাপরায়ণা স্নেহশীলা দয়ার্দ্র চিত্তা ও পরহিতপরায়ণা ছিলেন আজকালকার পুরমহিলারা এই সকল গুণ তেমন অর্জ্জন করিতে পারিতেছেন না। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা বিলাসপরায়ণা উপন্যাস পাঠরতা লঘুচিত্তা হইয়া উঠিতেছেন। স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিশুপালন সম্বন্ধে তাঁহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞা। ছেলেপুলেদের সামান্য সামান্য অসুখ হইলেও তাঁহারা শিক্ষার অভাব বশতঃ নিজেদের অত্যন্ত নিরুপায় ভাবিয়া ব্যাকুলা হইয়া পড়েন। নিকটে ডাক্তার বৈদ্য না থাকিলে তাঁহারা নিজেরা উদ্যোগী হইয়া কোনই প্রতিকার করিতে

পারেন না। সন্তান পালন এবং সামান্য সামান্য অসুখ বিসুখের টোটকা চিকিৎসা প্রণালী জানা থাকিলে অঙ্কুরেই যে সকল ব্যাধি নিবারণ করিতে পারা যায় চিকিৎসা বা প্রতিষেধকের অভাবে তাহাই বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে দুশ্চিকিৎস্য বা চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া পড়িতে পারে। ছেলেপুলেরা প্রায় দুষ্ট ও দুরন্ত হইয়া থাকে। ফলে দুর্ঘটনা প্রায় ঘটিয়া থাকে। First aid বা আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসা জানা থাকিলে অনেক সময় মহাবিপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রাথমিক চিকিৎসা না হইলে হয় ত তাহা সাংঘাতিক হইয়া পড়িতে পারে এবং হইয়াও থাকে। পুরমহিলারা এ সকল কাজ ত করিতে পারেনই তা ছাড়া অল্পবয়স্ক শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার এবং চরিত্র গঠনের ভারও তাঁহারা লইতে পারেন। এই সব কাজ করিতে হইলে তাঁহাদের নিজেদের প্রথমে শিক্ষালাভ করা দরকার। আলোচ্য বঙ্গলক্ষ্মীর সংখ্যাত্রয়ে সবোকনদি নারীমঙ্গল সমিতির কেন্দ্রে মহিলাগণের সেলাই ও কাটিং শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে দেখিতেছি। আমাদের মনে হয় সন্তান পালন স্বাস্থ্যরক্ষা গর্ভবতী নারীর তত্ত্বাবধান আঁতুড় ঘরের ব্যবস্থা ও কর্ত্তব্য দুর্ঘটনার (কাটাকুটি আগুনে পোড়া জলে ডোবা প্রভৃতি এবং বিষাক্ত কীটপতঙ্গাদির বা বিছা প্রভৃতির দংশন যন্ত্রণা নিবারণ ইত্যাদি) প্রাথমিক চিকিৎসা প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য ক্লাস খুলিলেও খুব ভাল হয়। মফস্বলে মহিলা সমিতিগুলির মধ্যে বরিশাল মহিলা সমিতি এই বিষয়ে কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন দেখিতেছি। অন্যান্য মহিলা সমিতিগুলিতেও অচিরে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উপসংহারে আমরা 'বঙ্গলক্ষ্মী' মাসিক পত্রিকাখানির সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়াই অবসর গ্রহণ করিব। বাঙ্গালা দেশে মহিলামঙ্গল কল্পে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়ের সুপরিচালনে বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গমহিলার সেবা করিয়া এক্ষণে কর্ম্মীর অভাবে লোকান্তরিত হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগে আরও দুই একখানি মহিলাপাঠ্য পত্র ও পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া অকালে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ঢাকা হইতে বঙ্গমহিলা নামে একখানি পত্রও এই উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইয়াছিল এখন আর তাহা দেখিতে পাই না। কলিকাতায় মাতৃমন্দির নামে একখানি মাসিক পত্র কিছুদিন ধরিয়া চলিতেছে। তার পর তিন মাস হইল বঙ্গলক্ষ্মীর' আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাতে গল্প উপন্যাস না থাকিলেও মহিলাগণের প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ের আলোচনা ইহাতে হয় এবং বিভিন্ন স্থানের মহিলা সমিতির মাসিক কার্য্য বিবরণ ইহাতে প্রকাশিত হয়। মহিলাগণকেও যখন জীবন সংগ্রামে পূর্ণমাত্রায় নামিতে হইয়াছে, তখন এই মাসিক পত্রিকাখানি তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়াই বোধ হয়।

খাদ্য বিচার

জীব যতদিন মাতৃজঠরে থাকে ততদিন প্রত্যক্ষ ভাবে ভ্রূণ দেহ মাতৃ রক্ত হইতে তাহার গঠনোপাদান সংগ্রহ করে বটে, কিন্তু পরোক্ষভাবে গর্ভিণী যাহা খায় তাহারই স্থিরদংশ রক্তে পরিণত হইয়া ভ্রূণদেহের গঠন ও পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে।

ভুমিষ্ঠ হইবার পর হইতে খাদ্যই শিশু-দেহ গঠনের একমাত্র উপাদান। তা সে খাদ্য মাতৃ স্তন দুগ্ধ গো দুগ্ধ বা কোন কৃত্রিম খাদ্য—যাহাই হউক না কেন। বয়ঃ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর খাদ্যেরও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। দন্তোদ্গমের সহিত শিশুকে সামান্য সামান্য

কঠিন খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত করানো হয়। পরে যেমন যেমন শিশুর বয়স বাড়ে তাহার খাদ্যের তেমনি প্রকার ভেদ হয়, পরিমাণেও তাহা বৃদ্ধি পায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—মানুষ যেরূপ খাদ্য ভক্ষণ করে তাহার দেহও সেইভাবে পরিণতি লাভ করে।

প্রকৃত পক্ষে শরীর গঠন নয় জন্য যাহা কিছু উপাদান আবশ্যক হয়, খাদ্যই সেই সমস্ত উপাদান সরবরাহ করে। বলিতে গেলে প্রধানত খাদ্যই আমাদের দৈহিক মান সিক এমন কি নৈতিক অবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। খাদ্যের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া শরীর ও মনের অবস্থার পরি বর্ত্তন ঘটানো যায়। মানুষকে যেমন ভাবে গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা তাহাকে সেইভাবে খাদ্য সরবরাহ করিলে মানুষটিও ঠিক সেইভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে।

দেহের উপর যখন খাদ্যের প্রভাব এত বেশী তখন দেহকে সুগঠিত, স্বাস্থ্যপূর্ণ রোগ প্রতিষেধক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে খাদ্যের গুণাগুণ প্রকৃতি পরি মাণ প্রভৃতি ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দেহ গঠনের দিক দিয়া মানুষের খাদ্য বিচার করিয়া দেখা হয় না। সাধারণত ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য এবং বিশেষত রসনার তৃপ্তিসাধন জন্য খাদ্য গ্রহণ করা হয়। যে খাদ্যে এই দুইটী প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সেই খাদ্য—তা তাহাতে শরীর গঠনের উপাদান যেমনই হউক না কেন—সচরাচর গ্রহণ করা হয়। কিন্তু হিসাব মত স্বাস্থ্যতত্ত্ব প্রকৃত ভিত্তির উপর গঠিত হইলে আমরা আগে খাদ্যের গুণাগুণ নির্ণয় করিয়া তবে খাদ্য গ্রহণে প্রবৃত্ত হইতাম, এবং কোন খাদ্য শরীরের উপর কিরূপ ফলোৎপাদন করিবে তাহা আগেই বলিয়া দিতে পারিতাম। তাহা করি না এবং করিতে পারি না বলিয়াই আমাদিগকে এমন সব অসুখে ভুগিতে হয় যাহা নিতান্তই অনর্থক ও অনাবশ্যক।

খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে সামান্য একটু আধটু পরীক্ষা করিলেই উপরিউক্ত সত্যগুলি প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। কেবল মাত্র ক্ষুধা নিবৃত্তি বা রসনার তৃপ্তি সাধনের জন্য খাদ্য গ্রহণ না করিয়া, খাদ্যের হিতাহিত গুণ বিচার পূর্ব্বক খাদ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে দুই চারি দিনের মধ্যে তাহার আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

সভ্যতার একটা অর্থ কৃত্রিমতা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। মানুষ যতই সভ্যতার উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিতেছে ততই সে সর্ব্ব বিষয়ে কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে—প্রকৃতির ব্যবস্থা হইতে ততই সে দূরে গিয়া পড়িতেছে। খাদ্য গ্রহণ বিষয়ে তাহার কৃত্রিমতা চরমে উঠিয়াছে। খাদ্য গ্রহণকালে তাহারা প্রাকৃতিক নিয়মেরও শাসন মানে না নিজের বিচার বুদ্ধিরও অনুসরণ করে না।

খাদ্য গ্রহণকালে একটুও বিচার বিতর্ক করিয়া দেখা হয় না। যাহা মুখে ভাল লাগে তাহাই মানুষ খায়। কিম্বা যাহার যাহা জুটে সে তাহাই খায়। কিম্বা যে যাহা পছন্দ করে সে তাহাই খায়। যে খাদ্য রন্ধন করিয়া খাইতে হয় সে খাদ্য রন্ধন করিতেও রীতিমত যত্ন লওয়া হয় না। আবার খাদ্য গ্রহণ বিষয়ে গতানু গতিকতার প্রভাবও কম নয়। একজনের দেখাদেখি আর একজন যেমন খাদ্য খায় সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষদের আচরণের অনুসরণ করিয়াও মানুষ তাহার খাদ্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে।

হিন্দু আমরা। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা খাদ্য সম্বন্ধে বিলক্ষণ বিচার করিতেন। প্রায় সকল প্রকার খাদ্যের গুণাগুণ তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছিলেন। যে খাদ্য যাহার পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া তাঁহারা বুঝিতেন তাহার জন্য সেইরূপ খাদ্যই তাঁহারা ব্যবস্থা করিতেন। আমিষ ও নিরামিষ ভোজন উপবাস হবিষ্যান্ন গ্রহণ তিথি বার হিসাবে বিশেষ বিশেষ খাদ্য গ্রহণ বা বর্জ্জন এ সকল নিয়ম খুব সুচিন্তিত ও সুবিবেচিত নিয়ম ছিল। সেই জন্য তাঁহারা দীর্ঘজীবীও হইতেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা খাদ্য বিচার পরিত্যাগ করিয়া, যখন তখন যা তা আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়াই আমাদের আয়ু দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। যাহারা অনিয়মিত ভাবে আহার করিয়া করিয়া ক্রমাগত

রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া জব্দ হইয়াছে তাহাদিগকেই পরিণামে খাদ্য বিষয়ে কিছু কিছু সংযম অবলম্বন করিতে দেখা যায়। নচেৎ যত দিন না দেহটি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে তত দিন পর্য্যন্ত লোকে আহার বিষয়ে সাবধান হইতে এবং খাদ্যের লোভ সংবরণ করিতে চাহে না।

খাদ্যের গুণাগুণ বিষয়ে সকল চিকিৎসক সংবাদ রাখেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ চিকিৎসা বিদ্যালয়ে এই বিষয়টি নিয়মিত ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় না। তবে ইদানী চিকিৎসা বিদ্যালয়ে খাদ্য নির্ব্বাচন বিষয়ে সামান্য মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। কিন্তু তাহা অতি যৎ সামান্য। খাদ্যের গুণাগুণ চিকিৎসা বিষয়ক অন্যান্য পাঠ্যের ন্যায় প্রধান পাঠ্য বিষয় হওয়া উচিত।

উপযুক্ত রূপ খাদ্য নির্ব্বাচন করিলে যা তা খাদ্য গ্রহণে বিরত হইলে স্বাস্থ্য রক্ষার যে কতখানি সাহায্য পাওয়া যায় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। খাদ্য বিষয়ে অসংযমের মূল আমাদের সভ্যতা। সভ্যতা মাত্রেই কৃত্রিমতা—প্রকৃতির সহিত বিরোধ। অথচ খাদ্য গ্রহণ করিয়া শরীর রক্ষা করা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ব্যাপার। প্রকৃতি দেবী প্রাণীমাত্রকেই খাদ্যাখাদ্য নির্ব্বাচনের একটা সহজ স্বাভাবিক সংস্কার দিয়াছেন। সেই সহজাত সংস্কারের অনুসরণ করিয়া খাদ্য গ্রহণ করিলে খাদ্যের দোষে কখনও শরীর অসুস্থ হইতে পারে না। তা যদি হইত তাহা হইলে জীবরাজ্য এত দিনে প্রাণিশূন্য হইয়া পড়িত সন্দেহ নাই। কারণ মানুষ ছাড়া কোন জীবকে কোনরূপ সভ্যতা খাদ্য নির্ব্বাচনে সাহায্য করে না। মানবেতর প্রাণীরা নিজেদের সংস্কার বশে তাহাদের শরীর রক্ষার উপযোগী খাদ্য মাত্রই গ্রহণ করে যাহা তাহার শরীর রক্ষার উপযোগী নহে তাহাও সেই সংস্কার বশেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এ বিষয়ে তাহার সহজাত সংস্কারই তাহার একমাত্র উপদেষ্টা— অপর কাহারও দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত হয় না।

ডারউইন সাহেবের বিবর্ত্তনবাদ থিয়োরীটি যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে বানর জাতিকে মানুষের নিকটতম আত্মীয় প্রাণী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সেই বানরদের মধ্যে মানুষের ন্যায় সভ্যতার প্রচার হয় নাই। তাহারা তাহাদের জন্মগত সহজাত সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। তাহারা কি খায়? তাহারা নিরামিষভোজী। তাহারা মানুষের ন্যায় রন্ধন করিয়াও খায় না। তাহারা প্রধানত ফল মূল বাদাম ইত্যাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহাতে তাহারা অসুস্থ হয় না ঘন ঘন তাহাদিগকে ডাক্তার ডাকিতেও হয় না। বানরেরা যে সকল ফল খায় তাহা বারো মাসই ফলে না। যখন ফলে তখন তাহারা বেশী পরিমাণে খায় এবং খুব মোটা হয় অর্থাৎ শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত শক্তি ও তেজ চর্ব্বির আকারে সঞ্চয় করিয়া রাখে। ফল যখন কমিয়া যায় এবং দুষ্প্রাপ্য হয় তখন এই সঞ্চিত 'এনার্জি' তাহাদের শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষা করে—তাহারা বাঁচিয়া থাকে। বানরের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীর অবস্থাও এইরূপ। সকল সময়ে তাহাদের খাদ্য মিলে না। তাই যখন মিলে তখন তাহারা বেশী করিয়া খায় যখন মিলে না তখন উপবাস করে। অথচ তাহারা বাঁচিয়াও থাকে—খাদ্যাভাবে একেবারে মরে না। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হয়? ঐ আগে যাহা বলিয়াছি—খাদ্যের প্রাচুর্য্যের সময় তাহারা শরীরে অতিরিক্ত এনার্জি সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং খাদ্য দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য হইলে তাহাই ব্যয় করে।

ইহার সার মর্ম্ম এই যে প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া চলে বলিয়া ইতর প্রাণীরা যখন ক্ষুধার্ত্ত হয় তখনই কেবল খায়। ইহাদের আহারের কোন নিয়ম নাই সময়েরও কোন স্থিরতা নাই। ক্ষুধার্ত্ত হইলে এবং খাদ্য জুটিলে তবে তাহারা খায়। প্রকৃতির নিয়ম এইরূপ। মানবেরও যথাসাধ্য প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলেই ক্ষুধার উদ্রেক হউক আর নাই হউক কেবল প্রথা মানিয়া চলিবার জন্য খাওয়া কর্ত্তব্য নয়। ইতর প্রাণীদের আহারের আর একটা প্রাকৃতিক নিয়ম এই

যে, তাহারা এক সময়ে এক প্রকার খাদ্য পেট ভরিয়া খায়। নানান রকম খাদ্য এক সময়ে এক সঙ্গে খাওয়া তাহাদের প্রথা নয়। ইতর প্রাণীরা যখন যে খাদ্য পায় তখন তাহাদের ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকিলে সেই একমাত্র খাদ্যেই উদর পূর্ণ করিয়া থাকে। এটা কিঞ্চিৎ ওটা কিঞ্চিৎ সেটা কিঞ্চিৎ এরূপ করিয়া নানাবিধ খাদ্য এক সঙ্গে উদরস্থ না করায় বিরুদ্ধ ভোজনের ক্লেশ ও অসুবিধা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হয় না। কিন্তু সভ্য মানুষ করে কি? সে নানান রকম খাদ্যের আয়োজন করিয়া খাইতে বসে। কেবল জলযোগ করিতেই তাহার পাঁচ সাত রকম খাদ্য না হইলে চলে না। এক এক রকম খাদ্য জীর্ণ করিতে এক এক রকম পাচক রস নির্গত হয়। একই পাচক রস সকল প্রকার খাদ্য জীর্ণ করিতে পারে না। এক সময়ে অনেক রকম খাদ্য ভোজন করিলে কাজে কাজেই পরিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। এক রকম খাদ্য যদি জীর্ণ হয় ত অন্য সকল খাদ্য জীর্ণ হয় না। কিম্বা এক খাদ্য অপর খাদ্য জীর্ণ করিবার পক্ষে বাধা ঘটায়। ফলে পাকস্থলীতে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া থাকে। সুতরাং এক সময়ে একাধিক খাদ্য না খাওয়াই ভাল। বড় জোর দুই তিন রকম খাদ্য এক একবারে চলিতে পারে। তবে এক রকম হইলেই সর্ব্বোত্তম হয়। ইহা সহজে এবং শীঘ্রই হজম হইয়া যায়। একাধিক খাদ্য একসঙ্গে খাইয়া পরিপাক ক্রিয়াকে জটিল করিয়া ফেলা হয় মাত্র।

আমরা সাধারণত দিবা রাত্রিতে অনেক বার খাইয়া থাকি। তাহাও উচিত নয় কারণ তাহা প্রকৃতির অনুমোদিত নিয়ম নয়। সকাল বেলা অনেকে প্রাতরাশ করিয়া থাকেন। তখন অবশ্য ক্ষুধার উদ্রেক হয় না কেবল খাওয়া অভ্যাস বলিয়া খাওয়া হয়। সেজন্য সে সময়ে উপযুক্ত খাদ্য নির্ব্বাচনের দিকে কোন দৃষ্টি থাকে না—যে দিন যাহা জুটিয়া যায় সে দিন তাহাই খাওয়া হয়। যাহাদের রীতিমত ক্ষুধার উদ্রেক হয় না তাহাদের কেবল অভ্যাসবশত প্রাতরাশ না খাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। দুই এক দিন প্রাতরাশ খাওয়া বন্ধ রাখিলে দেখা যায় মধ্যাহ্ন আহারের সময় বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। তখন বেশ তৃপ্তি পূর্ব্বক খাওয়াও যায়। আর প্রাতরাশ করিলে যাহাই খাওয়া হউক না কেন, মধ্যাহ্ন আহারের সময় তাহা সম্যকরূপ জীর্ণ হইবার যথেষ্ট অবসর পায় না। একে ত প্রাতরাশের সময়ই যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। তাহার উপর অক্ষুধার সময় মধ্যাহ্ন আহার করিলে ক্ষুধা আরও কমিয়া যায়। তিথি নক্ষত্র বিশেষে আমাদের যে উপবাস করিবার নিয়ম আছে তাহার উপকারিতা ইহা হইতেই উপলব্ধ হইতে পারে। উপবাসের পর যখন পারণ করা যায় তখন ক্ষুধারও যেমন উদ্রেক হইয়া থাকে, আহারে রুচিও হয় তেমনি। এবং একই জিনিসে উদর পূর্ণ করিয়া পারণ করিলে তাহা জীর্ণও হয় তেমনি সহজে। পূর্ণ ক্ষুধার সময় যে খাদ্যে রুচি হয় এমন একটী মাত্র খাদ্য বাছিয়া লইয়া তাহার দ্বারা পূর্ণাহার করিলে তাহার উপকারিতা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অজীর্ণ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঔষধ অপেক্ষা উপবাস সমধিক ফলপ্রদ চিকিৎসা। চব্বিশ ঘণ্টা কিম্বা প্রয়োজন হইলে ততোধিক সময় অর্থাৎ পূর্ণ ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া, তাহার পর যে খাদ্যে রুচি হয় তাহা ভক্ষণ করিলে অজীর্ণ রোগ অচিরে দূরীভূত হয় আর কোনও চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। এরূপ আহারের ব্যবস্থায় খাদ্য উত্তমরূপে জীর্ণ হয় শরীরে বলাধানও হয়। অবশ্য এই সঙ্গে আহারের অন্যান্য দুই একটী নিয়মও মানিতে হইবে অর্থাৎ তাড়াতাড়ি খাওয়া উচিত নয় ধীরে ধীরে উত্তম রূপে চর্ব্বণ করিয়া খাদ্যের সহিত লালা মিশ্রিত করিয়া তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বা পিষিয়া লইয়া পরে তাহা গলাধঃকরণ করিতে হইবে। আর আহার কালে মনের অবস্থা এমন থাকা চাই, যাহা খাদ্য জীর্ণ করিবার পক্ষে অনুকূল। অর্থাৎ, সে সময়ে মন সম্পূর্ণ প্রসন্ন অবস্থায় থাকিবে। তৎকালে মন যেন কোন প্রকারে উত্তেজিত অথবা রিপুর বশবর্ত্তী

না থাকে। আহারে যেন বেশ রুচি থাকে, এবং বেশ তৃপ্তি পূর্ব্বক যেন আহার করা হয়। যে খাদ্যে রুচি না হয় সেরূপ খাদ্য কখনও খাইতে নাই, কারণ তাহা কোন মতে জীর্ণ হয় না। ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও, যাহারা কেবল অভ্যাস বশত এবং প্রথার অনুসরণ করিতে হয় বলিয়া নির্দ্ধারিত সময়ে খায় তাহাদের খাদ্যে সকল সময়ে রুচি হয় না। এরূপ ভাবে আহার করিলে খাদ্য জীর্ণ করা কঠিন অসম্ভব বলিলেও চলে। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে এবং রুচি পূর্ব্বক আহার করিলে তাহার ফল যে সদ্য সদ্য ভাল হয় তাহার একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ এই যে প্রবল ক্ষুধার সময় আহার জুটিলে মুখে স্বত ই লালার স্ফুরণ হয়। সেইরূপ পাকস্থলীতেও স্বত ই পাচকরস নির্গত হয়। ক্ষুধার সময় যে আহারের ইচ্ছা প্রবল হয় সেই ইচ্ছাই লালা ও পাচক রসের জননী। এই ভাবে যথেষ্ট লালা ও পাচক রস নির্গত হওয়ায় খাদ্য চর্ব্বণের যেমন সুবিধা হয় উহা জীর্ণ করাও তেমনি সহজ হয়।

প্রত্যহ কয়বার খাওয়া উচিত? কেহ তিন বার, কেহ চারিবার, কেহ বা আরও অধিকবার আহার করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ দুইবার পূর্ণাহার যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন। আমরা এই শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী।

চাউল আমাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু সচরাচর যে ভাবে চাউল বিক্রয়ার্থ বাজারে আনীত হয় তাহা ঠিক শরীর পোষণোপযোগী অবস্থায় থাকে না। খরিদদারের মন ভুলাইবার জন্য চাউল খুব সাদা করিতে গিয়া তাহার সার পদার্থটিই বাদ দেওয়া হয়। ধান্য হইতে দুই প্রকারে চাউল প্রস্তুত হয় এক কলে অপর ঢেকিতে। কলে ছাটা চাউলের উপরের আবরণটী থাকে না। ঢেকি ছাটা চাউলে কতকটা থাকে। সুতরাং খাদ্যের হিসাবে কলে ছাটা চাউল অপেক্ষা ঢেঁকি ছাটা চাউল অধিকতর পুষ্টিকর। আবার ধান্যের শস্য হইতে খোসা পৃথক করিয়া চাউল বাহির করিবার জন্য দুইটী প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। এক সিদ্ধ করিয়া অপর সূর্য্যোত্তাপের সাহায্যে। ধান সিদ্ধ করিয়া চাউল প্রস্তুত করিতে হইলে ধান্যের মধ্যস্থ দ্রবণীয় পদার্থ জলের সহিত বাহির হইয়া যায়। কিন্তু আতপ চাউলে এই পদার্থগুলি পূর্ণ মাত্রায় থাকে। সুতরাং সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ চাউল অধিক উপকারী।

ভোজনের ষোল আনা উপকার খাদ্য প্রস্তুত করার উপর অনেকটা নির্ভর করে। একে আমরা বেশীর ভাগ সিদ্ধ চাউল খাই তাহার উপর ভাত রাঁধিয়া ফেন গালিয়া ফেলা হয়। সুতরাং আমরা যে জিনিসটা ভাত বলিয়া আহার করি তাহাতে সার পদার্থ বড় বেশী থাকে না। ভাত খাইয়া সম্যক উপকার লাভ করিতে হইলে ভাত রাঁধিবার সময় এমন পরিমাণ বুঝিয়া জল দেওয়া উচিত যাহাতে ভাতও সুসিদ্ধ হয়, এবং সমস্ত জলটুকুও মরিয়া যায়—ফেন গালিবার যেন প্রয়োজন না হয়। ধান্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উপকার পাওয়া যাইতে পারে খিচুড়ী প্রস্তুত করিয়া খাইলে। কিন্তু তাহাতে মসলা যত কম দেওয়া হয় ততই ভাল। আর একপ্রকারে ভাত খাইয়া তাহার ষোল আনা উপকার আদায় করা যায়—পরমান্নে। বস্তুত পরমান্ন যেমন সুস্বাদু উপাদেয় খাদ্য তাহার পুষ্টিকারিতা তদ্রূপ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। দুঃখের বিষয় পরমান্ন কালে ভদ্রে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে খাওয়া হয়। উৎকৃষ্ট আতপ চাউলের পরমান্ন প্রত্যহ খাইতে পাওয়া আমাদের দেশে বহু ভাগ্যের কথা। কিন্তু যাহার ভাগ্য সেরূপ সুপ্রসন্ন তাহার স্বাস্থ্যও তত উত্তম সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। আর একটা কথা—খাদ্যের পরিমাণ। সকল লোক একই পরিমাণে খাইতে পারে না। খাদ্যের পরিমাণ নির্ভর করে শারীরিক পরিশ্রমের উপর। যাহাকে যে পরিমাণে দৈহিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহার খাদ্যের পরিমাণও সেই অনুপাতে বেশী বা কম হওয়া উচিত। পরমান্নের ন্যায় সুজির পায়েস এবং মোহনভোগ বা হালুয়া অতি উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য।

চাউল ও গোধুম উপাদেয় পুষ্টিকর খাদ্য হইলেও কেবলমাত্র তাহাদের উপর নির্ভর করিলে আমাদের চলে না। শাকশব্জি বা আনাজ তরকারী খাদ্যের হিসাবে অপরিহার্য্য। তবে পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত অপেক্ষা একটা কি বড় জোর দুইটা তরকারী হইতে বেশী উপকার পাওয়া যায়। যখন যে তরকারী খাইতে সাধ যায় তখন সেই তরকারী খাওয়া উচিত। কিন্তু একবারে একটার বেশী নয়। পছন্দমত এক একটা তরকারী পরিমাণে বেশী খাইলেও ক্ষতি নাই। অন্ত পাঁচরকম অপেক্ষা এই একটা বেশী ফলপ্রদ।

কিন্তু রন্ধনের দোষে তরকারী অব্যবহার্য্য হইয়া যায়। আলু অতি উৎকৃষ্ট আনাজ এবং বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রধান আনাজ। কারণ অপর সকল আনাজ বৎসরের মধ্যে এক একটা নির্দ্ধারিত সময়ে মাত্র পাওয়া যায় কিন্তু আলু বারো মাসই পাওয়া যায় এবং খাওয়াও হয়। আলু খুব পুষ্টিকর পদার্থও বটে। আলু হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উপকার পাইতে হইলে তাহা পোড়াইয়া খাওয়াই ভাল। মরা আঁচে উনানের ভিতর আলুগুলি রাখিয়া দিলে ঘণ্টাকয়েক পরে তাহা খাইবার উপযুক্ত হয়। যদি আলু সিদ্ধ করিয়া খাইতে হয় তবে এই পরিমাণ জল দেওয়া উচিত যেন আলুও সুসিদ্ধ হয় অথচ জলটুকু মরিয়া শুকাইয়া যায়। ভাতের ফেন গালা যেমন ক্ষতিজনক আলু সিদ্ধ করিয়া উহ্বত্ত জল ফেলিয়া দিতে হইলেও তদ্রূপ ক্ষতি হয়। সর্ব্বাপেক্ষা ভাপে সিদ্ধ করা চাউল ও আলু সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য।

পাঠক হড়াপোড়া কখনও খাইয়াছ কি? হড়াপোড়া জিনিসটা কি তাহা পল্লীগ্রামের পাঠকগণকে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। এই শীতকালে ক্ষেত্রে কড়াইশুঁটির চাষ হইয়াছে। কতকগুলা গাছ শিকড় শুদ্ধ উপড়াইয়া এক যায়গায় স্তূপাকার করা হয়। দুই এক দিনের মধ্যেই গাছগুলি শুকাইয়া যায়। তখন সেই স্তূপে আগুণ ধরাইয়া দেওয়া হয়। গাছগুলি অবশ্য পুড়িয়া যায়। এবং শুঁটির ভিতর যে কড়াইগুলি থাকে তাহা বেশ সুসিদ্ধ হইয়া আহারোপযোগী হয়। এই কড়াই লবণ ও সরিষার তৈল সহযোগে যেমন মুখরোচক খাদ্য তেমনি পুষ্টিকর। রন্ধনশালায় হাজার মশলা দিয়া রাঁধিলেও এমন সুখাদ্য প্রস্তুত করা যায় না। সহরবাসী অবশ্য এই হড়াপোড়া জিনিসটা যে কি তাহার ধারণা করিতে পারিবেন না কিন্তু পল্লীগ্রামে শীতকালে ইহা একটা উৎসবের মত। সেই অর্দ্ধদগ্ধ ভস্মস্তূপের ভিতর হইতে কড়াইগুলি বাছিয়া সংগ্রহ করিতে আধপোড়া ছাইয়ে সর্ব্বাঙ্গ কালো হইয়া যায় বটে, কিন্তু ইহার আমোদেরও তুলনা হয় না। আর ইহার পুষ্টিকারিতার কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

মোট কথা ক্ষুধা ও রুচি খাদ্যের প্রধান নিয়ামক।

পরলোকে ডাক্তার সত্যশরণ চক্রবর্ত্তী

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি এ]

আমরা দুঃখ সন্তপ্ত চিত্তে উদারহৃদয় ও মহাপ্রাণ ডাক্তার সত্যশরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মৃত্যু সংবাদ জানাইতেছি। গত ২৪শে নবেম্বর তারিখে মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে সত্যশরণ বাবু পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব একজন অকৃত্রিম সুহৃৎ হারাইলেন এবং বাংলা দেশে একজন প্রাণবান্ চিকিৎসকের অভাব ঘটিল। আমরা শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

সত্যশরণ বাবু ১৮৭২ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রায় বাহাদুর বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় ছোটনাগপুর বিভাগের স্কুল সমূহের পরিদর্শক ছিলেন। সত্যশরণ বাবু হাজারিবাগে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের আদিনিবাস চন্দননগর।

১৮৯৮ সালে মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করিয়া তিনি প্রথমে পুরীতে Pilgrim Hospital এ হাউস সার্জ্জন হন এবং পরে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে Medical and Surgical Registrar হন। ইহা ছাড়া তিন বৎসর কাল তিনি Asst Apothecary র পদেও ছিলেন। সত্যশরণ বাবু ক্যাম্বেলেও শিক্ষকতা করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী সময়ে Pathology প্রভৃতি বিষয়ের পরীক্ষকও হইয়াছিলেন। বহু হাসপাতালে কাজ করিয়া চিকিৎসা বিদ্যায় তাঁহার যথেষ্ট

প্রতিপত্তি ও পসারও হইয়াছিল। ইনি একবার নেপালরাজের চিকিৎসাও করিয়াছিলেন।

সত্যশরণ বাবু কেবল বড় চিকিৎসক ছিলেন বলিয়াই আমরা তাঁহার স্মৃতি পূজা করিতেছি না। বাংলা দেশে সুচিকিৎসকের অভাব নাই কিন্তু রোগী অন্ত প্রাণ দরিদ্রের বন্ধু চিকিৎসকের সংখ্যা খুব বেশী নহে। সত্যশরণ বাবু রামকৃষ্ণ মিশন ও অন্যান্য বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ভাবে অর্থ দান করিতেন। আমরা শুনিয়াছি তিনি তাঁহার আয়ের এক দশমাংশ দান করিতেন। আজিকার এই ভোগ সর্ব্বস্ব যুগে এই দানশীলতার প্রশংসা করিতেই হইবে।

সত্যশরণ বাবু বাংলায় ধারাবাহিক ভাবে First aid সম্বন্ধে স্বাস্থ্য সমাচারে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার এই উদ্যম প্রশংসনীয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল নীতিগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে বাংলায় একখণ্ড Pathologyও তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। বইখানি সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার এই মৃত্যুতে বাংলা ভাষার এক মহা ক্ষতি হইল।

সত্যশরণ বাবু স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁহার দুইটী গুণের পরিচয়ে জনসাধারণ মুগ্ধ ছিলেন। তিনি একাধারে স্বাধীনচেতা ও পরোপকারী ছিলেন। বহু রোগীকে তিনি বিনা পারিশ্রমিকে দেখিতেন। শুধু তাহা নহে—তিনি অনেকের পথ্যেরও মূল্য দিতেন।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

লেডী ডফরিণ হাসপাতাল।—

কিছু দিন পূর্ব্বে আমাদের লাট পত্নী লেডী লিটন সাহেবা সংবাদপত্রে আবেদন প্রচার করিয়া লেডী ডফরিণ হাসপাতালের কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং এরূপ সদনুষ্ঠানে এদেশবাসীর সাহায্য দানে কৃপণতার অভিযোগ করিয়া কিছু নিন্দাও করিয়াছিলেন। আমরা তৎকালে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে এই হাসপাতালটি কাহাদের অর্থ সাহায্যে প্রধানত নির্ম্মিত হইয়াছে এবং মিউনিসিপ্যালিটী এই হাসপাতালে বাৎসরিক যে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন তাহাও পরোক্ষভাবে প্রধানত দেশীয় লোকদেরই টাকা কি না? সে প্রশ্নের কেহ এ পর্য্যন্ত কোন উত্তর দেন নাই। সে যাহা হউক আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম লেডী লিটন সাহেবার আবেদন বৃথা হয় নাই। সম্প্রতি এই হাসপাতালে অর্থ সাহায্যার্থ যে দানের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা গেল জনসাধারণ বেশ মুক্ত হস্তে দান করিয়াছেন এবং দাতৃগণ প্রধানত ভারতবাসী সুতরাং তাঁহারা যে মানবহিতকর সদনুষ্ঠানে অর্থ সাহায্যে উদাসীন এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। কেবল তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে এই সকল প্রতিষ্ঠানের অভাব অভিযোগ এবং তাহা দূর করণার্থ অর্থ দানের আবশ্যকতা জানাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইতে পারে।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্"

১৪শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৩২ সাল { [illegible]শ সংখ্যা

অনন্ত জীবন

জ্ঞান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চাহিয়াছে—অমৃত। এবং সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্পর্শমণি বা পরশ পাথরের সন্ধানে ফিরিয়াছে। মানুষ চায় অমর হইতে অন্ততঃ যতদূর সম্ভব দীর্ঘজীবী হইতে। মানুষ আরও চায়—স্পর্শমণি বা পরশ পাথর, যাহার স্পর্শে বস্তু মাত্রেই সোণা হইয়া যায় যে সোণা তাহার সকল সুখের সকল ভোগের উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে। এই দুইটী বস্তু তাহার চিরকাম্য—এই অমৃত ও এই স্পর্শ মণি। এই দুইটী বস্তু লাভের জন্য মানুষ চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নাই। যত কিছু উপায় তাহার মনে হইয়াছে, সে তাহাই অবলম্বন করিয়াছে। সে পৃথিবী তোলপাড় করিয়াছে শয়তানের উপাসনা করিয়াছে দেবতার কাছে বর মাগিয়াছে বিজ্ঞানাগারে মিশ্রণ ও বিশ্লেষণ করিয়াছে তপস্যা করিয়াছে, কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছে পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিয়াছে মহাসাগরের তলদেশে অনুসন্ধান করিয়াছে।

তথাপি সে তাহার প্রার্থিত বস্তু দুইটী পাইয়াছে কি? না—পায় নাই। অমৃত ও স্পর্শমণি দুইই তাহাকে ফাঁকি দিয়া এখনও লুকাইয়া রহিয়াছে। কেন সে পায় নাই? তাহার এত চেষ্টা বিফল হইল কেন? কারণ সে এত দিন কেবল ভ্রান্ত পথে—বিপথে চলিয়াছে। যে পথে গেলে তাহার এই দুইটী কাম্য বস্তু মিলিতে পারিবে তাহার সন্ধান এখনও পায় নাই।

তবে তাহার চেষ্টায় এখনও বিরাম নাই। বিজ্ঞানাগারে তাহার পরীক্ষা এখনও চলিতেছে। এর স্পর্শ মণির সন্ধান সে এখনও না পাইলেও সুবর্ণের সৃষ্টি কেমন করিয়া হয় তাহার একটু একটু সন্ধান সে যেন পাইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। এই কৃত্রিম উপায়ে সুবর্ণ প্রস্তুতের যৎকিঞ্চিৎ আভাষ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি কিন্তু অমৃতের সন্ধান এখনও মানুষের অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছে। লোকে এযাবৎ কেবল ছায়ার পশ্চাতে ছুটিয়াছে আসল জিনিস ছাড়িয়া প্রতিবিম্ব ধরিতে

গিয়াছে। তাই তাহার অদৃষ্ট— যোক্রাগণি পরিত্যজ্য অকবানি নিবেবতে কবানি তস্য নশ্যস্তি অর্ধবং নষ্টমেবহি হইয়াছে। সকলেই এমন কোন ঔষধ বা Elixir of Life খুজিয়াছে যাহা সেবন করিলে লোকে অমর হইতে পারে। অথবা এমন কোন উপায় অবলম্বন করিতে চাহিয়াছে যদ্দারা অল্প সময়ের মধ্যে গত যৌবন ফিরাইয়া আনা যায় দেহের পুরাতন অকর্ম্মণ্য কোষগুলির স্থলে নূতন সতেজ তাজা কোষ উৎপাদন করিয়া নিস্তেজ রক্তকে তেজসম্পন্ন করিয়া শরীরকে যৌবনোচিত লঘুত্ব ও ক্ষিপ্রতা প্রদান করা যায়।

একজন চিকিৎসক আবিষ্কার করিলেন যে যুবা বানরের গ্রন্থি লইয়া মানব দেহে কলম করিলে সে বৃদ্ধ হইলেও পুনরায় যৌবন লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু পরীক্ষায় ইহা টিকিল না। বস্তুত এই থিয়োরী টাই এত অসম্ভব যে ইহার কল্পনা করাই নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। জরা বা বার্দ্ধক্য প্রকৃত পক্ষে একটা রোগ মাত্র। শরীর যে ক্ষয় হইয়া হইয়া অকম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে—বার্দ্ধক্য তাহারই লক্ষণ মাত্র। দেহগঠনকারী কোষগুলি জীবনীশক্তি হারাইয়াছে তাই শরীরও অকর্ম্মণ্য হইযাছে। যৌবনে এই সকল কোষ সজীব সতেজ তাজা ছিল। যুবামাত্রেরই দেহগঠনকারী কোষ সকল জীবিত সতেজ কর্ম্মক্ষম। যদি বৃদ্ধকে আবার যৌবন লাভ করিতে হয় তাহা হইলে দেহের উপাদানভূত কোষগুলিকে আবার বাঁচাইয়া তোলা চাই অথবা যৌবন কাল হইতে তাহাদিগকে এমন সাবধানে রক্ষা করিতে হয় যেন তাহারা জীবনীশক্তি না হারায়। যে সকল কোষ নির্জীব হইয়া পড়িবে সেগুলিকে শরীর হইতে বাহির করিয়া দিয়া তাহাদের স্থান পুরণের জন্য নূতন নূতন কোষ বা Cell গঠন করিয়া লইতে হইবে। দেহের প্রত্যেক অংশে জীবনী শক্তি সঞ্চার করিতে হইবে। কি উপায়ে ইহা করা যায়? অতি সহজ উপায়ে। মৃত কোষগুলিকে শরীর হইতে বাহির করিয়া দিয়া, এমন ভাবে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে যেন নূতন নূতন সজীব কোষ গঠিত হইতে পারে। যৌবন রক্ষাই বল আর নব যৌবন লাভই বল—ইহাই তাহার একমাত্র ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ইহাই অমৃত—ইহাই Nectar—ইহাই elixir of life কেবল মাত্র এই উপায়েই অনন্ত কাল ধরিয়া যৌবন রক্ষা করা যাইতে পারে।

সাধারণত লোকের বিশ্বাস এইরূপ যে খাদ্য যখন শরীর পোষণ করে তখন সাধ্যমত যে যত বেশী খাইতে পারিবে সে তত সুপুষ্ট তত বল বীর্য্যশালী হইবে। উপবাস অনাহার অল্পাহারকে ইহারা বড়ই ভয় করে। ইহাদের বিশ্বাস খাদ্যের মাত্রা কিছু কম হইলে কিম্বা কোন দিন খাদ্য না জুটিলে অথবা বাধ্য হইয়া উপবাস করিতে হইলে নিরীব দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এর দুই চার বার এরূপ হইলেই চক্ষু স্থির। একে বারে পটোল তুলিতে হইবে। ইহা অতি ভ্রান্ত ধারণা। ইহাপেক্ষা ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হইতে পারে না। দুই এক দিন উপবাস করিলে বা কম খাইলে যদি লোকে মারাই পড়িত তাহা হইলে এ পৃথিবীতে অনেক বড় বড় জীবজন্তু কোন কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। কারণ মানুষ যদিও ভবিষ্যতের জন্য বা অসময়ের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু মানবেতর প্রাণীরা তাহা পারে না। উদ্ভিজ্জভোজী প্রাণীরা চাষ করিতে জানে না আমিষভোজী প্রাণীরা তাহাদের খাদ্য জাতীয় প্রাণীকে পালন করিতে জানে না। বুদ্ধিমান মানুষ এত দূরদর্শী ও সঞ্চয়শীল হইয়াও—সকল মানুষ সকল দিন সমান ভাবে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যাহারা সঞ্চয়শীল নয় এমন মানবেতর প্রাণীদের যে মধ্যে মধ্যে খাদ্যাভাবে উপবাস করিতে হয় তাহা স্বচ্ছন্দে ধরিয়া লইতে পারা যায়। এই উপবাসের সময়েরও স্থিরতা নাই। এক দিনও হইতে পারে আবার একমাসও হওয়া অসম্ভব নহে। অবশ্য উপবাসের সময়ের একটা সীমা আছে যাহার পর মৃত্যু অনিবার্য্য। পক্ষান্তরে কিছু দিন উপবাস করিবার পক্ষে শরীরের সামর্থ্যও অস্বীকার

করা যায় না। আর মধ্যে মধ্যে দুই এক দিন উপবাস করিলে ভাল বই মন্দ হয় না। যাহাকে কোন না কোন সময়ে স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়া উপবাস করিতে হইয়াছে তিনি উপবাসের পর যখন পারণ (উপবাস ভঙ্গ বা Break fast) করিয়াছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে উপবাসের পর যে কোন খাদ্যই খাওয়া যাউক না কেন তাহাতে প্রচুর তৃপ্তি লাভ করা যায়। কথায় বলে ক্ষুধার সমান তরকারী নাই। অতি ভোজন অনিয়মিত ভোজন এবং খাদ্য ঘটিত অন্যান্য অত্যাচারের ফলে যাহাদের ক্ষুধামান্দ্য অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণতা বুক জ্বালা কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছে তাঁহারা দুই এক দিন উপবাস করিলে তাহার আশ্চর্য্য ফল প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইবেন। অসুস্থতার প্রকৃতি ও অবস্থানুযায়ী পরিমিত সময় উপবাস করিলে যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক ত হইবেই তা ছাড়া আহারে রুচিও হইবে খাদ্য উত্তমরূপে হজমও হইবে।

বস্তুত উপবাস করিলেই লোকে মরিয়া যায় না। আমরা যেমন অসময়ের জন্য খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখি শরীরও তেমনি অসময়ের জন্য কিছু খাদ্য দেহের ভিতরেই সঞ্চয় করিয়া রাখে। শরীর গঠনের অন্যতম উপাদান যে টিসু সেই টিসু (tissue) যত ক্ষণ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ জীবিত থাকিতে পারিবে। অর্থাৎ টিসুর প্রভাবে অর্থাৎ টিসু আহার করিয়া মানুষ জীবিত থাকিবে। এই টিসু ফুরাইলে অর্থাৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে বা মরিয়া গেলে মানুষেরও মৃত্যু হইবে। ইতর প্রাণীরা যখন বাহির হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না তখন এই tissueই ভিতরে ভিতরে তাহাকে খাদ্য সরবরাহ করে ও জীবিত রাখে। দেহে যতক্ষণ টিসু থাকিবে দেহীও ততক্ষণ জীবিত থাকিবে।

এখন প্রশ্ন এই যে মানুষ কত দিন উপবাস করিয়া জীবিত থাকিতে পারে? এই প্রশ্নের কোন নিশ্চিত উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে যতদূর খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা গিয়াছে যে, বিনা খাদ্যে ৯ দিন পর্য্যন্ত কোন কোন লোক বাঁচিয়া থাকিতে পারিয়াছে। ৯ দিন অনাহারের পরও উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে সুবিবেচনা সহকারে খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া উপবাসকারীকে পুনরায় সবল সহজ মানুষ করিয়া তোলা হইয়াছে—কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। এই ৯ দিন উপবাসের ফলে লোকটির দেহের ওজন ৭৫ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছিল। যখন সে উপবাস আরম্ভ করে তখন তাহার দেহের ওজন ছিল ৩ পাউণ্ড এবং যখন উপবাস ভঙ্গ করে তখন তাহার ওজন হইয়াছিল ২২৫ পাউণ্ড। অর্থাৎ এই ৭৫ পাউণ্ড ওজনের টিসু ক্ষয় করিয়া বা খাইয়া লোকটি জীবিত ছিল। ৯ দিন উপবাসের পর লোকটির পুনর্জীবন লাভ হইয়াছিল বলিতে হইবে। কারণ তাহার দেহ মন নূতন করিয়া যৌবনোচিত তেজ ও সামর্থ্য লাভ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া আরও অনেক লোকে সখ করিয়া কিছু কিছু দিন উপবাস করিয়াছে। উপবাসের পর সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া আহার নিয়ন্ত্রিত করিয়া নব যৌবন লাভ করিয়াছে। নিয়মিত উপবাসে যে কোন অনিষ্টই হয় না বরং শরীর নীরোগ সুস্থ সবল কর্ম্মক্ষম থাকে এবং উপবাসকারী দীর্ঘ জীবন লাভ করে আমাদের দেশের নিষ্ঠাবতী উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বিধবাগণ তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। দীর্ঘ জীবন এমন কি অনন্ত জীবন ও স্থির যৌবন লাভের এই একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত ও নিশ্চিত উপায়—নিয়মিত উপবাস এবং উপবাসের পর উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ। শীতপ্রধান দেশে তথা মেরু সন্নিহিত প্রদেশে শীতকালটা এমন বিশ্রী সময় যে সে সময়ে কোন খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। মানুষ শীতকালের জন্য কিছু খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারিলেও অন্যান্য প্রাণীরা তাহা পারে না। ভেক সর্প সরীসৃপ প্রভৃতি প্রাণীরা, এমন কি হিম দেশের শ্বেত ভল্লুকেরা খাদ্যাভাবে সমগ্র শীত ঋতু অনাহারে থাকে তথাপি তাহারা জীবিত থাকে এবং শীত ঋতু অন্তে যখন খাদ্য মিলে

তখন সেই খাদ্য খাইয়া পুনরায় বলসঞ্চয় করে। যাহা ইতর প্রাণীরা পারে মানুষের তাহা না পারিবার কোন কারণ নাই। শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে সজীব টিসু মাংস চর্ব্বি থাকিলে মানুষ স্বচ্ছন্দে অক্লেশে অনায়াসে কিছু দিন করিয়া উপবাস করিয়া নূতন করিয়া তেজ সামর্থ্য সঞ্চয় করিতে পারে। যথেষ্ট সময় উপবাস করিলে শরীরের অতিরিক্ত চর্ব্বি ও মাংসপেশীগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়। এই জন্য উপবাস প্রণালীকে নবজীবন লাভের প্রণালী বলা যাইতে পারে। উপবাসের ফলে মৃত ক্ষয় প্রাপ্ত টিসুগুলি বাহির হইয়া যায় তাহাদের স্থলে নূতন সতেজ টিসু ও কোষ জন্ম গ্রহণ করে। উপবাসের ফল দেহে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। সমস্ত শরীরটা সতেজ চঞ্চল স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া উঠে।

সেই জন্য সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে দীর্ঘ দিন উপবাস অভ্যাস করিলে নব যৌবন লাভ অসম্ভব ব্যাপার নহে। যাহারা উপবাসে অভ্যস্ত তাহারা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারিবে এবং সে সাক্ষ্য আমাদের সিদ্ধান্তের অনুরূপ বই প্রতিকূল হইবে না। উপবাসের আশ্চর্য্য সুফল পরীক্ষা করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। সকলেই সাধ্যানুসারে দুই এক দিন বা দুই এক সপ্তাহ উপবাস করিয়া পরীক্ষা করিতে পারেন। তবে যাহার নব যৌবন লাভের আকাঙ্ক্ষা আছে তিনি বানরের গ্রন্থি কিম্বা অন্য কোন গ্রন্থি সন্ধানে না ছুটিয়া যদি এই পরিমাণ সময় উপবাস করিয়া থাকিতে পারেন তাহাতে তাঁহার দেহের সকল অংশের সমস্ত পুরাতন অকর্ম্মণ্য কোষ শরীর হইতে নিষ্কাশিত করা যায় এবং তৎপরে উপযুক্ত খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া নূতন কোষ গঠন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পুরাতন কোষগুলির স্থান পূর্ণ করিতে পারেন তবেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারিবে। এ বিষয়ে নিজের বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করা সঙ্গত নহে। উপযুক্ত চিকিৎসক বা দেহতত্ত্ববিদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ উপবাসের সময় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক সাবধানতা সহকারে তাহার উপদেশ অনুযায়ী উপবাস ব্রত পালন করা আবশ্যক। সম্পূর্ণ উপবাসের কাল ব্যক্তি অনুযায়ী ৩ দিন হইতে ৭ দিন কিম্বা ততোধিক সময় হইতে পারে। শরীরের অস্থি কঙ্কালের উপর মাংসের পরিমাণ অনুসারে উপবাসের কাল নির্দ্ধারণ নির্ভর করিবে। নিয়মিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট কাল উপবাস দ্বারা শরীরকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য মার্কিন দেশের কোন কোন স্থলে যোগ্য দক্ষ বিজ্ঞ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে স্যানিটেরিয়াম বা পরীক্ষাগার স্থাপিত হইয়াছে। নব যৌবন লাভেচ্ছু ব্যক্তিরা সেখানে থাকিয়া কর্ত্তৃপক্ষের উপদেশমত চলিয়া যথেষ্ট উপকার পাইয়া থাকেন। আমাদের দেশে জ্বর জাড়ির স্থলে ঔষধ পত্রব্যবহার করিবার পূর্ব্বে প্রথম প্রথম দুই তিন দিন লঙ্ঘন বা উপবাস দিবার ব্যবস্থা আছে। অনেক স্থলে কেবল এই উপবাসের ফলেই জ্বরজাড়ি আরাম হইয়া যায় ঔষধ আদৌ সেবন করিতে হয় না। আমেরিকার স্যানিটেরিয়ামে উপবাস ব্রত পালনের ফলে কেহ কেহ বা রোগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিয়াছেন দেখা গিয়াছে। উপবাসের দ্বারা যথার্থ উপকার পাইতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত উপবাস করা আবশ্যক। নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ হইবার পূর্ব্বেই ক্ষুধায় কাতর হইয়া বা উপবাস ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া মাঝখানেই ব্রত ভঙ্গ করিলে বিশেষ কোন ফল লাভের আশা নাই। তবে একাদিক্রমে দীর্ঘকাল উপবাস করায় অসুবিধা হইলে মধ্যে মধ্যে নিয়মিত ভাবে কিছু দিন করিয়া উপবাস করিলে তাহার ফলও মন্দ হয় না। আমাদের দেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে— বলী খাস ত অল্প খা অল্প খাস ত বেশী খা। ইহার অর্থ এই যে যদি দীর্ঘজীবী হইয়া জীবনকে দীর্ঘকাল সম্যক রূপে উপভোগ করিবার বাসনা থাকে তবে মিতাহারী হওয়া চাই এবং মধ্যে মধ্যে উপবাসও দেওয়া আবশ্যক। আর যদি শীঘ্র শীঘ্র জীবন উপভোগ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ কর তবে যত ইচ্ছা অবিশ্রান্ত ভাবে খাও—কিছুমাত্র বাছবিচার করিবে না। তাহা হইলে অচিরকাল

মধ্যে তোমার শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে এবং বাসনাও পূর্ণ হইবে।

এই উপবাস ব্রতের ফল এত নিশ্চিত ও এত বেশী যে ইহা অবলম্বন করিলে জীবনধারণ ও জীবন রক্ষার্থ ঔষধের ব্যবহার বারো আনা ভাগ কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণ করিয়া এবং নিয়ম শৃঙ্খলার সহিত জীবন যাপন করিয়া লোকে স্বচ্ছন্দে সুস্থ শরীরে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। যখন দেখা যায় বার্দ্ধক্য ও জরা আসিয়া অতর্কিত ভাবে শরীরকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে তখন উপবাস ব্রত আরম্ভ করিলে জরার আক্রমণ হইতে দেহ রক্ষা করা যায়—যৌবনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারা যায়। সপ্তাহে নিয়মিত ভাবে উপরি উপরি দুই দিন কিম্বা দুই দিন অন্তর একদিন করিয়া অন্তত সপ্তাহে এক দিনও নিয়মিত ভাবে উপবাস করিতে অভ্যাস করিলে তাহাও ব্যর্থ হইবে না—তাহার ফলও প্রত্যক্ষ করিতে পারা যাইবে।

টাকা কোথায় ?

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি এ]

ইংরাজ এদেশে আসিবার পর হইতেই একটা ধুয়া আমরা সর্ব্বদাই শুনিতে পাই যে ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। দেশে ম্যালেরিয়া হইল অমনি বিজ্ঞেরা বলেন খাদ্য শস্যের উৎপত্তি বেশী করা দরকার দেশে চাকরী নাই রব উঠিল অমনি ভারত বন্ধুরা উপদেশ দিলেন যুবকেরা লাঙল ধর। সকলেই ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন যে কৃষির বহুল প্রসারেই জাতীয় ধনবৃদ্ধি হইবে। কথাগুলি একেবারে যুক্তিহীন নহে। তবে ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ নহে অন্তত ইংরাজেরা যখন এদেশে আসিলেন তখন ছিল না।

পূর্ব্বে প্রতি কৃষক একাধারে শিল্পী ও কৃষক ছিলেন। কৃষিকার্য্য করিয়া যে সময়টুকু বাঁচিত সে সময়টুকু তাঁহারা আলস্যে না কাটাইয়া কোন প্রকার গৃহশিল্পে নিযুক্ত থাকিতেন। ফলে তাহার গৃহে কখনও দুর্ভিক্ষ হইত না। বর্ত্তমানে অধিকাংশ স্থানেই দেখা যায় কৃষক অজস্র পরিশ্রম করিতেছে অথচ তাহার খাই বাঁচে না। ভারতের কৃষক সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিশ্রমী তাহার বিলাসিতা নাই, ব্যয় বাহুল্য নাই অথচ তাহার অভাব যায় না কেন ইহা ভাবিবার কথা। ভারতের কৃষকের জয় গান করিয়া বিলাতের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড (Ramsay Macdonald) বলিয়াছেন—The people are the most industrious in the world much of their land is fertile and yields rich crops whenever a famine comes they are stricken with starvation and die by thousand whilst millions are shattered in physical vigour কৃষকেরও পরিশ্রমের অন্ত নাই ক্ষেত্রও বেশ উর্ব্বরা তথাপি একটা দুর্ভিক্ষ আসিলেই মানুষ দলে দলে অনাহারে মরে কেন ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে দেশের কৃষকের স্বাস্থ্যহানির ফলে চাষবাস পূর্ব্ববৎ চলিতেছে না, ইহা ছাড়া কেবল কৃষিকার্য্যেও দিন চলা শক্ত। আজ 'টাকা 'টাকা রব উঠিয়াছে—কৃষককে আজ গৃহশিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে নতুবা এই ক্ষুধা যাইবে না—এই দেশব্যাপী হাহাকারও থামিবে না। কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ও জলপ্লাবনে দেশের কৃষি নষ্ট হইতে পারে। তখন কৃষকের একাধিক আয়ের পন্থা থাকা দরকার।

১৮৮৭ সালে যে দুর্ভিক্ষ হয় উহার অনুসন্ধান সময়ে Famine Commission তাই বলিয়াছেন—A main cause of the disastrous Indian famines is to be found in the fact that the great mass of the people live directly on Agriculture and there is no other industry from which any considerable part of the population derives its support

গৃহশিল্পের যে কত বড় তাহা আমরা সকলেই জানি অথচ এদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। নিত্য ব্যবহার্য্য সব জিনিসই আমরা এখন বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকি। ঐ সকল জিনিস ইচ্ছা করিলে অধিকাংশ স্থলেই দেশে প্রস্তুত হইতে পারে। টাকা টাকা করিয়া না বেড়াইয়া আমরা যদি প্রতি গ্রামের বিশিষ্ট গৃহশিল্পটীকে পুনর্জীবিত করিবার প্রয়াস করিতাম তাহা হইলে জাতীয় ধনবৃদ্ধি বহুল পরিমাণে হইত।

সমগ্র বাংলা দেশে হাজারকরা ৭৮৭ জন চাষাবাদ দ্বারা প্রতিপালিত হয় বাকী ২১৩ জন মাত্র নানাপ্রকার কাজে নিযুক্ত থাকে। গৃহশিল্পে হাজারকরা ৫ জনও নিযুক্ত নহে অর্থাৎ শতকরা ৫ জনও লোক শিল্পের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন নহে। আমাদিগকে আজ কৃষি ও গৃহশিল্পকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া আয়ের পথ সুগম করিতে হইবে।

যে কৃষক পাট উৎপাদন করে সেই যদি পাট হইতে চটও উৎপাদন করিতে পারিত তাহা হইলে প্রতি বৎসর বহু কোটী টাকা এ দেশে থাকিত। গত ৯২ সালে ৭৪ কোটী টাকার পাট ও চট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে বাংলার কৃষককে তাহার উৎপন্ন জিনিসের নানাপ্রকার ব্যবহার জানিতে হইবে। যে রেড়ির চাষ করে সে ইচ্ছা করিলে এবং শিখিলেই রেড়ির তেল কষ্টর অয়েল প্রভৃতি মূল্যবান বস্তুও প্রস্তুত করিতে পারিবে।

কৃষকেরাই যে কেবল গৃহশিল্পের উন্নতি করিতে পারেন এমন নহে। বাংলার যুবকের ও বসিয়া না থাকিয়া কোন না কোন শিল্প চর্চ্চা করিয়া অর্থাগম করিতে পারেন। এজন্য প্রথমত যুবকদিগকে গ্রামের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকিতে হইবে যাহাতে অল্পব্যয়ে জিনিস উৎপন্ন হয় এবং বাজারে সর্ব্বদা উহার কাটতি হয় সে বিষয় উদাসীন থাকিলে চলিবে না। আমাদের বাঙ্গালী যুবকদের বিষয় বুদ্ধি কম থাকাতে অনেক স্থলে শিল্পোদ্ধার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে ইহা সকলেই জানেন। কেবল জিনিস উৎপাদন করিলেই হইবে না উহার qualityও লোকে দেখিবে। ইহা ছাড়া বাহিরে আসিলেই অন্যের সহিত প্রতিযোগিতাও করিতে হইবে—আবার marketও আছে কি না তাহাও বিচার্য্য। এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া তবে ক্ষেত্রে নামিতে হইবে।

বাংলার জঙ্গলে অসংখ্য পলাশ শাল কুসুম প্রভৃতি গাছ জন্মে। উহা হইতে লাক্ষা ও তসর হইতে পারে ইহা বোধ হয় অনেক যুবক জানেনই না। একটী কুলগাছে লাক্ষার চাষে বার্ষিক ৬৲ আয় হইতে পারে। ২৫৲।৩০৲ টাকার কেরাণীগিরি অপেক্ষা ইহা সহস্রগুণে ভাল। ১০টী গাছে বার্ষিক ৬০৲ আয় অর্থাৎ মাসিক ৫৲ এই আয়ে এক রকম করিয়া একটী পরিবার প্রতিপালন করা যায়।

বাঁশ বেত ও দড়ির কাজের জন্যও বেশী মূলধন দরকার নাই। বাংলায় বাঁশ ও বেত গাছের অন্ত নাই পল্লীগ্রামে বাঁশের গাছ কেবল ম্যালেরিয়াই বৃদ্ধি করে উহা দ্বারা নিত্য ব্যবহার্য্য ঝুড়ি ধামা প্রভৃতি বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে—বাঁশের ও বেতের fancy জিনিসও বিলাসীদের প্রিয় বস্তু। অনেক বিদেশী ব্যবসায়ী উহা ক্রয় করিয়া—একমাত্র middle man হিসাবেই অজস্র টাকা রোজগার করিতেছে ইহা আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি। দড়ির চাহিদা অত্যন্ত বেশী অথচ বাংলা দেশে খুব কম যায়গায়ই রীতিমত ভাবে দড়ি প্রস্তুত হইতেছে।

ইহা ছাড়া অনেক গ্রামে পিতল ও কাঁসার কাজের পূর্ব্বে খুব প্রসিদ্ধি ছিল ঐ সকল স্থানে এখন আর সে শিল্পের নাম গন্ধও নাই। উহাদের বংশধরদের

খোঁজ করিলে দেখা যায় হয় তাহারা মুটে মজুর হইয়াছে নতুবা ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া কেরাণী হইয়াছে। এই হতভাগ্য জাতির মধ্যে চাকুরীর নেশা যে কি প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছে তাহা সকলেই জানেন। সকলেরই ধারণা যেমন তেমন চাকরী ঘী ভাত। চাকরীর মোহ কত বেশী হইয়াছে তাহা আজ ৫ ৬ বৎসরের পূর্ব্বেকার একটী ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইয়া কোন বিদ্যালয়ের একটী বালক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করেন হাঁ বাবা তুমি বড় হইলে কি করিবে? বালক উত্তর করিল ম্যাজিষ্ট্রেট হইব নাপিত ছাত্রটী উত্তর করিল ডেপুটী হইব। কায়স্থ বৈদ্য ব্রাহ্মণ সকল ছাত্রই বলিল—কেহ মুন্সেফ কেহ সদরালা কেহ বা মুন্সী হইবে একটী ছাত্রও নিজের জাত ব্যবসায় লিপ্ত হইয়া বড় হইবে এরূপ বলিল না। ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাই বলিয়াছিলেন—A nation of munsiffs and deputies cannot survive বিলাতের প্রধান মন্ত্রীও cobbler পুত্র বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে জাত ব্যবসা গোপন করিতে পারিলে লোকে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। আমরা vocational education technical education—কার্য্যকরী ও অর্থকরী শিক্ষার বুলি ধরিয়াছি। উহার অর্থ আর কিছুই নহে—জাতিকে আবার স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে। নতুবা এই দারিদ্র্য যাইবে না। এই বাংলার চীনারা কাঠের কাজ করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা দেশে মনি অর্ডার করে—আমাদের মিস্ত্রীকুল ত লোপ পাইয়াছে। তাহারা জাত ব্যবসা করিয়া পেয়াদা হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন যে অবাঙ্গালীরা প্রতি সপ্তাহে না কি ৪।৫ লক্ষ টাকা মনি অডার করে—ইহা ছাড়া ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ত আছেই। এই অর্থ শোষণ বাঙ্গালীকে আজ বন্ধ করিতে হইবে। এজন্য চাই ধৈর্য্য বিষয় বুদ্ধি ও পারিপার্শ্বিকের জ্ঞান। নূতন দৃষ্টিতে দেশকে দেখিতে হইবে। মায়ের পল্লী গৃহে বহু কাঁচা মাল আছে উহাদিগকে finished productএ পরিণত করিয়া অর্থাগম করিতে হইবে। কেবল বসিয়া বসিয়া ভাবনা না করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া পড়িতে হইবে। বাঙ্গালীর ব্যবসায়ের কথা শুনিলেই লোকে অশ্রদ্ধা করে—এই গ্লানি দূর করিতে হইবে। জাতীয় ধন বৃদ্ধির উপায় বিদেশীকে গালাগালি করা অথবা ঈর্ষা করা নহে। আমাদিগকে নিজের ঘর সামলাইতে হইবে। কোন জাতিরই এমন ভাবে শিল্পনাশ হয় নাই। বাঙ্গালার কুটীরগুলি চরকার গুঞ্জন তাঁতের ঘর ঘর এবং মিস্ত্রী শিল্পীর কল কোলাহলে যে দিন মুখরিত হইবে সে দিন এই হা অন্ন হা অন্ন রব দূর হইবে। বাঙ্গালীকে আজ তাই মনে প্রাণে কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে—কৃষি ও শিল্পের মণি কাঞ্চন যোগে সোনা ফলাইতে হইবে। শিল্প ও কৃষির বহুল প্রসারে জাতীয় দুর্দ্দিনের অবসান হইবে

শিশু-মঙ্গল

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি এ]

বঙ্গীয় স্বাস্থ্যবিভাগের (Bengal Public Health Department) উদ্যোগে ও অর্থে কয়েক বৎসর যাবৎ শিশু মঙ্গল সপ্তাহ (Baby week) নামক একটী শিশু ও জনস্বাস্থ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতেছে। লোক শিক্ষা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রদর্শনীতে বক্তৃতা ও বায়স্কোপের সাহায্যে স্বাস্থ্যবিষয়ক জ্ঞান প্রচার করা হইয়া থাকে। বাস্তব প্রায় মডেল ও চিত্রের সাহায্যে —পুত্তলিকা ও মানচিত্রের মধ্য দিয়া আদম সুমারির

দুরূহ সংখ্যা ও তথ্যগুলি জনসাধারণের সমক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও দেখান হইয়াছে। বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল শিশু কল্যাণ মন্দিরটী। কেন আমাদের শিশুরা অকালে মরে এবং তাহার প্রতীকার কি—এ সকল কথাই কর্ত্তৃপক্ষ বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন। ছবি ও চিত্রগুলি যেন চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেয় যে আমরা ধ্বংসোন্মুখ জাতি। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ মহিলাদের—ভাবী মায়েদের (স্কুলের বালিকাদের) ও বিদ্যালয়ের বালকদের জন্য বিশেষভাবে যানাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রদর্শনী দেখিবার বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। আমরা এই আন্দোলনটীর মঙ্গল ও বিস্তার কামনা করি।

আমাদের দেশে একটা চলিত কথা আছে যে—

হওন মরণ বিয়ে
এ তিন বিধাতার দিয়ে

অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ এ তিনটীর উপরে মানুষের হাত নাই। বাংলার আবহাওয়াতে এই অদৃষ্টবাদ এমন বদ্ধমূল যে স্কুলের বালককেও যদি বল হয় শরীরের যত্ন কর সে অমনি বলিয়া বসিবে—

জন্মিলে মরিতে হবে
অমর কে কোথা ভবে
চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে।

অদৃষ্টবাদের ফলে বাঁচিবার চেষ্টা করাকে পর্য্যন্ত দেশবাসী অনর্থক বলিয়া মনে করেন। আজ যাহারা জাতির উন্নতিকামী তাহাদিগকে অনবরত প্রচার করিতে হইবে — বিফল নহে এ বাঙ্গালী জনম
বিফল নহে এ প্রাণ।

ইংরাজ কবি সত্যই বলিয়াছেন

Life is real life is earnest

এই মহাবাক্য দেশে বিদেশে প্রচারিত হইলেই জাতির মধ্যে বাঁচিবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। আকাঙ্ক্ষা জন্মিলেই উপায়ও আবিষ্কৃত হইবে—where there is will there is way

আমাদের অনেকের ধারণা যে ভারতবর্ষে স্বাস্থ্যনীতির জ্ঞান জনসাধারণের ছিল না। কথাটী ঠিক নহে। যাঁহারা স্মৃতি ও সংহিতা প্রভৃতি পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা দেখিবেন যে কি করিয়া ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া শয়ন কাল পর্য্যন্ত চলিতে হইবে তাহার একটা ধারাবাহিক routine (তালিকা) স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। শুধু কি তাই? গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী আতুড় নির্ম্মাণের নিয়ম অথবা রোগীর শয়ন কক্ষের বিবরণ সকলই লিপিবদ্ধ আছে। আজিকার মত জীবাণুভীতি তখনকার সমাজে ছিল কি না জানি না। তবে সংক্রামক ব্যাধির নিবারণার্থই যে স্বপাক আহার অথবা একত্র আহারাদি নিষিদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যাঁহারা নূতনের মোহে বলেন যে আমাদের কিছুই ছিল না—এবং পিতৃ পিতামহকে old fool বলেন তাঁহাদিগকে Pope এর সেই অমর বাক্য স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে—

We call our fathers fools
So wise we grow
Our wiser sons will no doubt call us so

কে বলিতে পারে যে বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে যখন আরো নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে তখন পরবর্ত্তীয়েরা আমাদিগকেই old fool বলিয়া বসিবে না? তাই মনে হয় আত্মস্থ হইয়া ঘরের কথা জানিয়া পরের কথা ভাবাই ভাল।

আমাদের প্রাচীনকালের নিজস্ব স্বাস্থ্যনীতি আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। দিন দিন নূতন নূতন রোগ আমদানী হইতেছে। ডাক্তারের থলি যতই পূর্ণ হইতেছে ততই প্রমাণ হইতেছে যে জনসাধারণের রোগ বাড়িতেছে। বিলাতী একজন ডাক্তার নাকি বলিয়াছেন যে— We live upon the ignorance of the people— কথাটী সমীচীন। সত্যই ত যতই আমরা স্বাস্থ্যনীতি ভুলিয়া যাইতেছি, অথবা স্বাস্থ্যনীতির অবমাননা করিতেছি রোগ ব্যাধি ততই আমাদের গ্রাইয়া বসিতেছে। আমাদিগকে এখন জনসাধারণের নিকট

নূতন করিয়া স্বাস্থ্যনীতিটী সহজ ও সরল উপায়ে প্রচার করিতে হইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে স্বাস্থ্যবিষয়ক গ্রন্থাদি অবশ্য পাঠ্য (Compulsory) না করিলে অথবা ব্যায়াম চর্চ্চার ব্যবস্থা না করিলে পরবর্ত্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র মঙ্গল সমিতি (Stud nt Welfare Committee) স্থাপন করিয়া কি ফল পাইবেন? গোড়াতেই যে গলদ —আমাদিগকে প্রাথমিক স্কুলের বালকদিগকে প্র থম শিখাইতে হইবে— কি করিয়া স্বাস্থ্যবান হইতে হয়—

কঁচায় না নোয়ালে বাঁশ
পাকলে করে টাস টাস

এ অতি সত্য কথা।

বালিকাবিদ্যালয়গুলিতেও গার্হস্থ্য স্বাস্থ্যনীতি মেয়েদের মধ্যে প্রচার প্রয়োজন। বালিকাই ভবিষ্যৎ কালে পরিবারের কর্ত্রী হইবেন এবং মা হইবেন। বালিকাদেরও স্বাস্থ্যনীতি জানা অত্যাবশ্যক।

জনসাধারণের জন্য মেলায় হাটে ও উৎসব আনন্দে, পূজা পার্ব্বণে যেখানে অধিক লোক সমাগম হয় সেখানেই স্বাস্থ্য বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শন (lantern lec ure) ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

পুস্তিকা প্রচার স্বাস্থ্যমূলক অভিনয় ও কথকতার সাহায্যে সংক্রামক রোগ ব্যাধি সম্বন্ধে আমরা জনমত যত শীঘ্র গঠিত করিতে পারিব ততই দেশের কল্যাণ হইবে।

আইনেরও প্রয়োজন আছে। Compulsory Vaccination Act হওয়াতে যে টীকা জিনিসটী দেশে প্রসারতা লাভ করিয়াছে ইহা ত সকলেই জানেন। এইরূপে জঙ্গল কাটা ডোবা পরিষ্কার করান পুকুর সংরক্ষণ (Reservation of Tanks) বিষয়েও আইনের কড়াকড়ির প্রয়োজন। স্বাস্থ্যবিভাগের ডিরেক্টার ডা বেণ্টলী মহাশয় Bengal Public Health Act প্রণয়ন করিলে যে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে তাহা দেশ বিদেশের উদাহরণ দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

শিশু মঙ্গল প্রচেষ্টা বিলাতেও গত ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বেই মাত্র আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু ইতিমধ্যেই সে দেশের আবহাওয়া পর্য্যন্ত বদলাইয়া গিয়াছে।

১৮৯৮ সালে বিলাতে ১ হাজারে ১৫৬টী শিশু মরিত কিন্তু ২৫ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সে দেশে ১৯২৩ সালে মাত্র ৮০টী মরিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। কি করিয়া এই অঘটন সংঘটন হইল তাহার বিবরণ শুনুন—

Nation interest was arou ed throughout the country a demand for legislation aro e and the fir t erie of acts which have revolutionised infant welfare in England was passed in 190 One of the mo t impor tant landmarks of progress in England was the formation of the National Baby week Council in 1917 This movement has assumed large proportions

ভারতেও এই আন্দোলন বড়লাট পত্নী লেডী রেডিং মহোদয়ার আমলে ১৯২৪ সালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক প্রদেশেই আন্দোলনটী ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতেছে। বাংলা দেশে মহামান্যা লেডী লিটন মহোদয়ার নেতৃত্বেও এই আন্দোলন আশানুরূপ প্রসার লাভ করিয়াছে। শিশু মঙ্গল প্রদর্শনী তাঁহারই আগ্রহে দিন দিন প্রতিষ্ঠা পাইতেছে।

কলিকাতাতে যে প্রাদেশিক শিশু মঙ্গল সপ্তাহের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা এখন কেবল সহরেই অনুষ্ঠিত হয়। কদাচিৎ দুই একটী গ্রামে উহার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদিগকে এই আন্দোলনটীর গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠান করিতে হইবে কারণ গ্রামই জাতির প্রাণ—The nation dwells in cottages

আপনারা জানেন কি?

প্রতিদিন বাংলাদেশে ৩১৯২টী শিশু জন্মে তন্মধ্যে ৮১৬টী মরে। অথচ অন্যান্য দেশে শিশু মৃত্যু কত কম! নিউজীল্যাণ্ডে ঐ স্থানে মাত্র ১৭৭ জন মরে।

যেখানে প্রতি ৫৩০০ শিশুর মধ্যে ১৫১ জন বয়স হওয়ার পূর্ব্বে অকালে প্রাণত্যাগ করে সেখানে লণ্ডনে ১৬৬ শিশুর মধ্যে মাত্র ১ টী মরে। আমদের দেশে শিশুমৃত্যু বিলাতের তুলনায় ৩ গুণ অধিক।

অথচ এ কথা সকলেই জানেন যে এই মৃত্যুর হার নিবারণ করা যাইতে পারে।

নিবার্য্য ব্যাধির মধ্যে ধনুষ্টঙ্কার একটা। আপনারা শুনিলে শিহরিয়া উঠিবেন যে প্রতি ১৫টা অন্তর একটা করিয়া শিশু ধনুষ্টঙ্কারে মরে। বাংলাদেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৬ হাজার শিশু কেবল নাড়ী কাটার দোষেই প্রাণ ত্যাগ করে। ধাত্রীদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই এই মৃত্যুর হার বন্ধ হইতে পারে।

প্রসূতি মৃত্যু আবার মাতৃহত্যাই কি এদেশে কম হইতেছে? ইংলণ্ডের তুলনায় আমাদের বাংলাদেশে প্রসূতির অকালমৃত্যু ৫ গুণ অধিক। বিলাতে ২ প্রসূতির মধ্যে ১টী মরে কলিকাতায় প্রতি ৪ টা প্রসূতির মধ্যে একটা মরে। অথচ সকলেই জানেন ইহার কারণ আর কিছুই নহে—বাল্যমাতৃত্ব অস্ত সর্ব্বা অবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে উদাসীনতা ও অজ্ঞতাই ইহার কারণ।

আদমসুমারির বিবরণ পাঠ করিলে ত চক্ষুস্থির হয়। স্বতই মনে হয় ইহার কারণ কি?

অনেকে সমস্বরে বলিবেন দারিদ্র্যই একমাত্র কারণ। অন্য কেহ বলিবেন দুগ্ধের অভাব মৃত্যুর কারণ। আমি বলি তৃতীয় কারণ অজ্ঞতা ও উদাসীনতা।

প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন যে ইহা সত্য যে দারিদ্র্য ভাল খাইবার পরিবার ঘর করিবার সামর্থ্য না থাকা বাস্তব ও শিশুমৃত্যুর ভীষণ আধিক্যের প্রধান কারণ। কিন্তু স্বাস্থ্যের নিয়ম না জানা ও তাহা না পালন করা এবং সূতিকাগারের শোচনীয় অবস্থাও প্রধান কারণ তাহা অস্বীকার করা যায় না। দারিদ্র্যই একমাত্র কারণ হইলে কলিকাতার বড়বাজার প্রভৃতি ধনী মাড়োয়ারীদের বাসস্থানগুলিতে শিশু মৃত্যু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইত না। দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা অবশ্যই হওয়া উচিত কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধ জ্ঞান বাড়াইবার ও সূতিকাগৃহের অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টাও হওয়া চাই।

দলাদলি

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায় এল্ এম এস]

অবশ্য বলা বাহুল্য যে দলাদলি কথাটা বাঙ্গালার নিজস্ব। নিষ্কর্ম্মা অর্থশালী লোকের পক্ষে এমন মনের মত কাব্ত আর নাই। তাই আজ পল্লীগ্রামে কথায় কথায় দলাদলি কিন্তু কচিৎ কথায় কথায় গলাগলি। যেখানে শিক্ষার অভাব সেই খানেই দলাদলির বাহুল্য এইটাই অনেকের মত কিন্তু আমার মনে হয় শিক্ষার অভাবে দলাদলি করিবার বুদ্ধিটা যতটা মাতিয়া উঠে ন্যায্য কাযের অভাবে দলাদলিটা তাহার চেয়েও বেশী করিয়া ও কায়েমী করিয়া ফুটিয়া উঠে। দলাদলি ব্যাপারটা মুখ্যত ও কার্য্যত সমাজ শাসনেরই অঙ্গ। কিন্তু হিন্দুর সমাজ যে আজ ব কাযই দলাদলিটা গলিত শবদেহের পূতিগন্ধ বহন করে।

আজ মৃত ছত্রভঙ্গ হিন্দুর সমাজে দলাদলির বাড়াবাড়ি ঘটিলেও আসলে হিন্দু সমাজের বাঁধনটি বড়ই মজবুত—তাই আজ সে সমাজের খোলসটাও হিন্দু আঁকড়াইয়া থাবি খাইতেছে। হিন্দু সমাজের মূলমন্ত্র হইতেছে—অন্যোন্যসাপেক্ষতা অর্থাৎ হিন্দু আর যাহাই হউক মূলত একোল-বেড়ে নয়। একটা কলের প্রত্যেক চাকার সঙ্গে অপর সকল চাকা সম্বন্ধ ও সম্পর্কিত হওয়ায় কলের প্রত্যেক চাকা যেমন অন্যান্য চাকার

উপরে ষোল আনা নিভর করে হিন্দু সমাজ ঠিক্ সেই ভাবেই গঠিত। হাজার জাতি বিচার থাকুক—হাজার ছুৎমার্গের শঙ্কারজনক বাড়াবাড়ি থাকুক—তবুও এক হিন্দু অপর হিন্দুর সুখে দুঃখে নানা রকমে বিজড়িত।

বেশী দিন নয়—৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুর সমাজে বৈদ্যের প্রাদুর্ভাব ছিল। গ্রামের বা চাকলার জমীদার জায়গীর দ্বারা সেই বৈদ্যের সাংসারিক দুশ্চিন্তা দূর করিতেন। এবং রাজ সরকারের ব্যয়ে মূল্যবান ঔষধগুলি প্রস্তুত করাইতেন। কাযেই ব্যারামে গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তিই বিনাব্যয়ে সে বৈদ্যের ও রাজব্যয়ে প্রস্তুত ঔষধের যুগপৎ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। কাযেই ধনী জমিদার বৈদ্য ও গ্রামবাসী—পরস্পর অচ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধা থাকিতেন। এখন সে বৈদ্য নাই—যাহারা আছেন তাঁহারা অধিকাংশই গোবৈদ্য বা অবৈদ্য তাঁহারা কেবল এই বচনটুকুই সার করিয়া বসিয়া আছেন— ধৃয়া ন পঠিতঃ ।স্য ময়া নহি চিকিৎসিতং কথ গ্রাম ধুমায়তে? এখন সে জমীদারও নাই কাযেই এখন চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। এখন আর কেহ আমি বিলাতি ঔষধ খাইব না—খাইলে জাতি যাইবে এইরূপ protectionist বা সংরক্ষণের দীব মত কথা বলেন না। এখন আপনিই সর্ব্বস্ব আপনার স্বার্থই বড়—স্বজাতির কল্যাণ এখন আর লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে না।

সংস্কৃত ভাষায় স্বাস্থ্য তত্ত্ব সম্বন্ধীয় কোনও স্বতন্ত্র পুস্তক আছে কি না অবগত নহি—সম্ভবত ঐ নামীয় স্বতন্ত্র পুস্তক নাই। তাহা হইতে কোনও দিগগজ গবেষণাকারী বা প্রত্নতাত্ত্বিক যেন সিদ্ধান্ত না করিয়া বসেন যে হিন্দুরা ব্যায়াম সারাইতে জানিত কিন্তু ব্যারামকে নিবারণ করা যায় এ বড় কথাটা হিন্দুরা জানিত না। প্রাত কালে শয্যাত্যাগ হইতে রাত্রে সহধর্ম্মিণীর প্রতি কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত হিন্দুর প্রত্যেক কাযের নিয়মের শিরায় শিরায় স্বাস্থ্যতত্ত্ব ওতপ্রোত ভাবে আছে। শৌচত্যাগ স্নানাক ভোজন অশৌচ বিধি যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি হিন্দুর প্রত্যেক কাযেই বর্ত্তমান স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্মত উৎকৃষ্ট বিধিগুলিই ছিল ও এখনো আছে। কাযেই এটা বলা মোটেই অন্যায় নয় যে হিন্দুর সমাজ ও হিন্দুর দৈনিক জীবনের আচার ব্যবহারের ভিতরে—ভেদনীতি বা দলাদলির এতটুকু গন্ধ ছিল না—বরং প্রত্যেক একজন হিন্দুর সঙ্গে অপর সকল হিন্দু ও হিন্দুর আচার অনাদি ভাবে মিশান ছিল। তাই তখন বিলাতী ঔষধ সেবন করিয়া জাতিকে উৎসন্নে দিবার ভয়টাও এতটা প্রবল ছিল! কিন্তু এখন সবই গিয়াছে—পাশ্চাত্য শিক্ষার ফেণিল জলের স্রোতের মুখে।

(১) আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান লোপ পাইয়া ব্যক্তিগত অহমিকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(২) আত্মত্যাগের পরিবর্ত্তে ঘোর স্বার্থপরতা ও সুবিধাবাদ আসিয়া পড়িয়াছে।

(৩) দেশের প্রতি—দেশের আচার ব্যবহার, সমাজ প্রতিষ্ঠান ধর্ম্ম কর্ম্ম রীতি নীতি দেশের মানুষ এমন কি দেশের দেবতারও প্রতি—প্রচ্ছন্নভাবে অবিশ্বাস ঘৃণা জন্মিয়াছে ও মমত্ব বোধ লোপ পাইয়াছে! তাহার স্থানে লোক দেখান মৌখিক 'স্বদেশী' ভাব জাগিয়াছে! এক কথায় আমরা ইতভ্রষ্টস্ততো নষ্ট হইয়া পড়িয়াছি! আমরা ঘরের ঠাকুরকে বিসর্জ্জন দিয়াছি পরের কুকুরেরও অনুগ্রহ উপার্জ্জন করিতে পারি নাই।

আমাদের সামাজিক জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতেই এই কথাগুলি প্রযুক্ত হইতে পারে। আমি অপর কোনও বিষয়ে সে কথাগুলি না লাগাইয়া স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বিষয়ে ঐ কথাগুলির উপযোগিতা কতকটা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের (অর্থাৎ প্রকৃত হিন্দুদের)—

(১) দৈনিক প্রত্যেক অনুষ্ঠানে ছিল কি—স্বাস্থ্যানুকূল বিধি নিষেধ সেই অনুষ্ঠানগুলি অন্যোন্য সাপেক্ষ ছিল সে অনুষ্ঠানে আত্মত্যাগের বীজ ছিল সে অনুষ্ঠানে সংযম শিক্ষা হইত। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া গ্রামের বাহিরে শৌচত্যাগ তৎপরে প্রাতঃস্নান পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ

করিতে করিতে প্রাচীন শাস্ত্রপকে অগ্রাহ্য করিয়া পূজা স্বপাক ভোজন দিবা নিদ্রা বর্জ্জন বৈকালে শাস্ত্র চর্চ্চা ও সাধুমহাত্মাদির সহিত মেশামেশা রাত্রি কালে লঘু ভোজন পূজা পার্ব্বণে পাঁচ জন অতিথি অভ্যাগতের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র নারায়ণের সেবা অশৌচাবস্থায় সংযম ও বর্ত্তমান "কোয়ারাণ্টাইন (quarantine) রক্ষা করা কোন্‌টা দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল না ছিল? স্বাস্থ্যই যে হিন্দুর সম্পদ ছিল এই নর দেহ যে হিন্দুর দেব মন্দির স্বরূপ ছিল সে হিন্দু সেই দেবস্থান দেহকে সুস্থ ও পবিত্র রাখিবার জন্য কি না করিয়া গিয়াছে।

(২) হৃদয়বান হিন্দু এটা অতি বেশী রকমে বুঝিয়াছিলেন যে অপর যে কোনও ব্যবসায় মানুষকে পাইয়া পয়সা উপার্জ্জন কর না কেন লোকের ব্যারামে বা মৃত্যু শয্যায় অন্ততঃ পয়সা রোজগারের সময় ও স্থান নহে। এই জন্য হিন্দু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে বেদ তুল্য পরম হিতকারী চিকিৎসাশাস্ত্রের পারদর্শী যিনি হইবেন তিনি রাজানুগ্রহে অর্থচিন্তা হইতে নিশ্চিন্ত থাকিয়া সমাজের কল্যাণ সাধনে তৎপর হইবেন। আর এখন তাহার স্থানে আবির্ভূত হইয়াছে কাহারা? মোটর বিলাসী স্বার্থপর বিলাসী ও মোটা দর্শনী আদায় কারী যমরাজের চেলা চামুণ্ডা। কেন এমনটি হইতেছে জান? তবে শুন।

(১) আমরা স্বার্থ সুবিধাবাদের দোহাই দিয়া এবং রাজপুরুষদিগের সুনীতি অনুকরণ (aping) করিয়া যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত রীতিনীতির প্রচলন করিতেছি তাহা সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যের প্রতিকূল। জুতা পায়ে ভোজন গৃহ প্রবেশ করা হোটেলে খাওয়া পাচকের হাতে খাওয়া দোকানের তৈয়ারী খাবার খাওয়া একই জামা কাপড় বহু দিন ধরিয়া পরা হেয়ার কাটারের বাড়ীতে চুল কাটান ও দাড়ী কামান রেলগাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ীতে চড়া থিয়েটার বায়স্কোপে যাওয়া অখাদ্য ও বৃথা মাংস ভোজন করা মদ্য পান করা বারবণিতালয়ে যাওয়া—আর কত দৃষ্টান্ত দিব? দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পাদ বিক্ষেপে অসংযম স্বেচ্ছাচার যথেচ্ছাচার নৈরাকার প্রকট হইয়া পড়িতেছে।

(২) আমাদের রাজসরকার মামুলি ভাবে দুঃস্থদিগের চিকিৎসার ও সাধারণ ভাবে স্বাস্থ্যতত্ত্বের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভুল এই খানেই। স্বাস্থ্য ও রোগ চিকিৎসা—স্বতন্ত্র বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। চিকিৎসকেরা অর্থ লোভী হইয়াছেন। দেশের বিশ্ব পণ্ডিতরা জন সাধারণকে এই বিশ্বের সকল কথাই শিখাইবার জন্য ব্যস্ত কিন্তু দেহতত্ত্ব স্বাস্থ্যতত্ত্ব মাতৃত্ব তত্ত্ব তুলিয়াও শিখিতে দেন না। কাযেই, জনসাধারণ স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা এতদুভয় বিভাগের লোকের এক জোটে সাহায্য পরামর্শ বা সুবিধা পান না। রাজ্য শাসন ব্যবস্থায় দেশে এই দলাদলির ফলে না জন সাধারণ না চিকিৎসক না সরকার—কেহই সম্যক্ উপকৃত হইতেছেন না। ইহাকেই বলে কালনেমির লঙ্কা ভাগ। এই দলাদলি যত দিন থাকিবে তত দিন এ দেশে সকল রকমের রোগই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে থাকিবে। মূর্ত্তিমান এভুল ইংরাজের। এখন আমাদিগকে সজাগ হইয়া এই ভুলের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া দলাদলি ভাঙ্গিয়া দিয়া যাহাতে জনসাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদেরা ও চিকিৎসক একত্রে গলাগলি হইয়া কায করিতে পারেন সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম-সঙ্ঘ

উদ্দেশ্য ও কার্য্য-পদ্ধতি

অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও অকাল মৃত্যু—এই তিনটী আমাদের জাতীয় জীবনের অবনতির প্রধান কারণ—ইহা উপলব্ধি করিয়া দেশ মধ্যে স্বাস্থ্য প্রজ্ঞা (Health conscience) জাগরিত করার জন্য 'স্বাস্থ্য সমাচার' মাসিক পত্র আজ ১৪ বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে। 'স্বাস্থ্য সমাচার' প্রকাশের পর হইতে দেশে ক্রমশ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু উৎসাহ দেখা যাইতেছে আলোচনা বক্তৃতা ও আলোক চিত্রের দ্বারা সাধারণকে এই সকল বিষয় বুঝাইবার জন্য বহু সমিতি পরিষদ্ এবং ও সরকারী স্বাস্থ্য প্রচার বিভাগ উত্তরোত্তর নানারূপ প্রণালীবদ্ধ চেষ্টা করিতেছেন।

সকল প্রতিষ্ঠানগুলির সমবেত চেষ্টায় স্বাস্থ্য জ্ঞান দেশের মধ্যে কথঞ্চিৎ বিস্তৃতি লাভ করিলেও, দরিদ্রতা ও অকালমৃত্যুর স্থায়ী প্রতিকারের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোন বিশেষ ধারাবাহিক ও আদর্শ ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে না তার উপর স্বাস্থ্য জ্ঞানগুলি অশিক্ষিতের নিকট হৃদ্য হইলেও বাস্তব জীবনে গ্রহণীয় হইয়া উঠিতেছে না। সেই জন্য জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্য অকালমৃত্যু প্রভৃতি নিবারণের উপায়সকল সরল, সুখসাধ্য ও সহজসাধ্য ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া এবং দেশের স্বাস্থ্য ও শক্তি বৃদ্ধিই যে এ যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মসাধন ও অর্থনৈতিক উন্নতিই যে মুক্তিলাভের প্রকৃষ্টতম পন্থা—তাহা নানা নিবন্ধ ও প্রস্তাবের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিয়া 'স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ পঞ্জিকা' আজ ৪ বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হইতেছে। দিন পঞ্জিকার সহিত জীবনীশক্তি-সঞ্চারক প্রবন্ধ ও কবিতাবলি পল্লী উন্নতি স্বাস্থ্যনীতি টোট্‌কা চিকিৎসা তাঁত চরকা খাদ্যনির্ব্বাচন শক্তি সঞ্চয় গো সেবা, দাম্পত্য বিজ্ঞান আয়ু বর্দ্ধন শিশু পালন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি এবং দেশ পরিচায়ক ও জাতীয়তা ভাবোদ্দীপক বৈচিত্র্যপূর্ণ সংবাদসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়া পঞ্জিকাটি সাধারণের মধ্যে প্রচারার্থ অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কথা ও কাজ—দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। মুখে বক্তৃতা করা, উচ্চ হইতে তুচ্ছ বচনগুচ্ছ রচনা করা বাক্‌সর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর জাতিগত সংস্কার কাজের বেলা বড়ই ঠেকাঠেকি সেখানে বাঙ্গালী—মাথাটি করিয়া নীচু হন সকলের পিছু।

'স্বাস্থ্য সমাচার' ও 'স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ পঞ্জিকা' এ যাবৎ কাল প্রথামত কেবল কথা কহিয়াই আসিতেছেন এবং সেইরূপ অন্যান্য মণ্ডলী সমিতি সভা ইত্যাদি এখনও করিতেছেন। কিন্তু কথায় আর প্রাণ গলিবে না, কাজ চাই, ঝড়ের রাতে আলোর অগ্রদূত চাই।

কথাকে কাজে পরিণত করিবার জন্য 'স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ' আজ দেশবাসীর দ্বারস্থ। এই উদ্দেশ্যে কতিপয় উদ্যোগী মিলিয়া স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘকে ১৮৬০ সালের ২১ আইন অনুসারে জন হিতকর কার্য্যে ব্রতী প্রতিষ্ঠানরূপে গত ৬ই মার্চ্চ ১৯২৫ তারিখে যথারীতি গভর্ণমেন্ট রেজেষ্টারী করিয়াছেন।

১৩৩১ সালে এই অভিপ্রায় সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াও নানারূপ অপরিহার্য্য বিঘ্ন ও বাধার জন্য কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারা যায় নাই। এক্ষণে Delay is dangerous এই বাক্যের অনুসরণ করিয়া নানারূপ বাধা বিপত্তি সত্বেও হৃদিস্থিত হৃষীকেশের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া সঙ্ঘ এই কার্য্যে অগ্রসর হইল। এক্ষণে সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও দেশবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনা করিয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম।

কাজের ধারা ও শিক্ষার স্বরূপ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি অজ্ঞতা দারিদ্র্য ও অকাল মৃত্যু—এই তিনটি বিপত্তি আমাদের জাতীয় অবনতির প্রধানতম কারণ জানিয়া তাহার প্রতিবিধান কল্পে স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। প্রথমতঃ অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য যাহাতে দেশের মধ্যে সার্ব্বজনীন কার্য্যকরী শিক্ষার বিস্তার হয় তজ্জন্য সঙ্ঘ প্রথম হইতে বিবিধ বৈধ ও সাধ্য উপায়ে চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয়তঃ দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য কুটীর শিল্প গোপালন ও উন্নত প্রণালীর কৃষি দ্বারা ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচের নানারূপ সহজ সাধ্য উপায় নির্দ্দেশ করিবে এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন প্রণালী শিক্ষা দিবে। তৃতীয়তঃ রোগ ও অকাল মৃত্যুর নিবারণার্থ সামান্য মুষ্টিযোগাদির দ্বারা অথবা রোগ প্রতিষেধক সাধারণ নিয়ম এবং শাস্ত্র ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত সদাচারসমূহ পালন করিয়া যাহাতে দেশের আপামরসাধারণ অটুট স্বাস্থ্য ও অনবদ্য সুখের অধিকারী হইয়া মনুষ্য জীবনের চরম পরিণতি লাভ করিতে পারে তজ্জন্য যথাসাধ্য উদ্যোগী হইবে।

মৃতকল্প জাতির এই অমৃত মন্ত্রে ক্রমে শিক্ষা দিবার জন্য স্বাস্থ্যধর্ম্ম বিদ্যাপীঠ নামক একটী বিদ্যালয় খোলা হইতেছে। প্রথম বৎসর অকৃত্রিম ও আন্তরিক দেশপ্রেমিক সচ্চরিত্র স্বার্থত্যাগী আত্মনির্ভরশীল ও স্বাস্থ্যবান্ ২০-২৫টি যুবক লইয়া কার্য্যারম্ভ করা হইবে। ইহারাই হইবে আমাদের পতাকাবাহী বালখিল্যের দল। প্রতি বৎসরই নির্দ্দিষ্ট সময়ে এইরূপে অন্ততঃ আট দশটি যুবকের প্রয়োজন হইবে। দুই তিন বৎসরের মধ্যেই শিক্ষাকাল সম্পূর্ণ হইবে। পরীক্ষায় কৃতকার্য্য ছাত্রদিগকে যথাযোগ্য সার্টিফিকেট উপাধি বা বৃত্তি দানের ব্যবস্থা আছে।

শিক্ষার্থীরূপে কাহাদের চাই?
শিক্ষার্থীদিগের প্রত্যেকের মোটামুটি স্বাস্থ্যবান্ ও শক্তিশালী হওয়া চাই এণ্ট্রান্স বা ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পাঠ সমাপন করা চাই বয়স অষ্টাদশ হইতে বাইশের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় ও অবিবাহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বাংলার মাটী বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান।

বিশ্ব কবির এই প্রার্থনাকে যাঁহারা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য জীবন আহুতি দিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহারা আসুন।

যাঁহারা পল্লীবাসীর সেবা পল্লীর মাটিকে জীবন কাঠি জ্ঞান করিয়া মনোবাক্যে প্রকৃতির পূজা দ্বারা পল্লীকে শ্রীমণ্ডিত করিতে নিজ ধন জন ও যৌবনের মোহকে চিরতরে বিসর্জ্জন দিতে পারিবেন তাঁহারা আসুন।

যাঁহারা লাঙ্গলের ফালের মুখে সোনা ফলনে বিশ্বাসী গো মাতার উন্নতির সহিত মরণোন্মুখ শিশুর জীবন রক্ষণে অভিলাষী পাথরের বুক চিরিয়া ভবিষ্য স্বাধীনতার পথ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম লাভের প্রয়াসী তাঁহারা আসুন।

যিনি নামের কাঙ্গাল তিনি আসিবেন না।
যশের
অর্থের
বিলাসিতার দাস
কদভ্যাসের
আলস্যের

শিক্ষার্থীদের কর্ম্মক্ষেত্র ও ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকলেই কার্য্য করে। সেই জন্য সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের দেশে ভূমিলক্ষ্মী ও গোমাতার সেবা ভিন্ন দেশের জীবিকা সংস্থান শক্তি বৃদ্ধির আর

কোন উপায় নাই। ব্যবসায়ী বল হাকিম বল উকিল বল ডাক্তার কবিরাজ বল, সকলেই সমাজ দহের জোঁক মাত্র। কোন না কোন প্রকারে তাহারা বিরাট সমাজ জীবের রক্ত চুষিয়া কেবল আপনাদিগকে ধনশালী করিতেছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কোনরূপ সার্ব্বভৌম অর্থবৃদ্ধিকর কার্য্য অথবা দেশের সুখ শান্তি বিধানে চেষ্টা করিতেছে না। দেশে উন্নত উপায়ে কৃষি ও গো পালন এবং অবসর সময়ে কুটীর শিল্প দ্বারা আয় বৃদ্ধি হইবে এবং রোগ প্রতিষেধ রোগীর সেবা শুশ্রূষা ও প্রাথমিক চিকিৎসা দ্বারা রোগভোগ কমিয়া আসিবে ও ক্রমে দেশের স্বাস্থ্যহীনতা ও অকাল মৃত্যু দূরীভূত হইবে।

ছাত্রেরা স্বাবলম্বন ও আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা করিয়া পুরাযুগের স্পার্টানদের ন্যায় বর্ম্মিষ্ঠ ও শক্তিশালী হইয়া দেশে ফিরিয়া গিয়া কৃষি গোপালন প্রাথমিক চিকিৎসা ও শ্রমজীবীদিগের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার দ্বারা স্বচ্ছন্দ ভাবে আপনার অন্ন সংস্থান করিয়া লইতে পারিবে। ইহাতে Village exodus আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যাইবে পল্লীর প্রাণ শক্তিও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। শিক্ষা কাল অন্তে যত দিন পর্য্যন্ত না ছাত্র আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে সক্ষম হন ততদিন পর্য্যন্ত সঙ্ঘ তাহার সহিত যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন রাখিবে।

শিক্ষার্থীদের কর্ম্মক্ষেত্র—বহু জনাকীর্ণ সহরে হইবে না। ইহার অবস্থান নিশ্চয় সুদূর পল্লীতে বাঙ্গালা মায়ের স্নিগ্ধ শীতল স্নেহ গভীর কোলের মধ্যে। কর্ম্মীগণ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া নিজ নিজ পল্লী আর সে ফিরিয়া গিয়া সঙ্ঘের আদর্শে কার্য্যারম্ভ করিবে ও একটি ক্ষুদ্রতর প্রতিষ্ঠানের প্রতীক সৃজন করিয়া লইবে। সঙ্ঘ প্রথম প্রথম তাহাদিগকে প্রয়োজন বোধে কিছু কাল পর্য্যন্ত অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা সাহায্য করিবে। তার পর কর্ম্মীরা প্রত্যেকেই সচ্ছল ও স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনোপযোগী হইয়া উঠিলে কেবল এই সঙ্ঘের পরোক্ষ ও নামমাত্র অধীনতায় অনেকটা স্বতন্ত্রভাবেই স্বীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালন করিতে ও উহার শাখা অনুশাখা বিস্তৃতির চেষ্টা করিতে থাকিবে।

নট কবি গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন কৃষ্ণ প্রেমের লাভ কৃষ্ণ প্রেম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছিলেন দেশসেবার লাভ দেশ সেবা—আত্মপ্রসাদ মাত্র। আমাদের উদ্দেশ্য—অকৃত্রিম দেশ সেবা জনিত আত্ম প্রসাদের সহিত অন্নোদরপূর্ত্তির শান্তিময় স্বাস্থ্যপূর্ণ স্বভাব সুন্দর আয়োজন।

☞ কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে কোন উপদেশাদি প্রদান করিবার ইচ্ছা হইলে অথবা এই পীঠে শিক্ষক শিক্ষার্থীরূপে ভর্ত্তি হইবার আকাঙ্ক্ষা হইলে সম্পাদক স্বাস্থ্য ধর্ম্ম সঙ্ঘ ৪৫ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা—এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন অথবা প্রাতে (৭৮) বা অপরাহ্ণে (২৩) আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন।

বাঁচিবার পথ

(ক) বিশ্রাম।—দেহ যন্ত্র এমনি কৌশলে গঠিত যে একটী অঙ্গ দুর্ব্বল অথবা পরিশ্রান্ত হইলে অপর অঙ্গগুলিও তদ্রূপ হইয়া পড়ে। যদি মস্তিষ্কের অবিশ্রান্ত ভাবে চালনা করা যায় তবে পেশীসমূহ আপনা আপনি শ্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহার একটী সুন্দর উদাহরণ বিটমলী ফার্থ (Bottomley) Firth মহাশয়ের জীবনে দেখা গিয়াছে। বিলাতী বাবু মহলে ছুটীর দিনে পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ান একটা নেশার মত। দেখা গিয়াছে কেহ

দেহ দীর্ঘকাল পরিশ্রমের পর একটুকুও বিশ্রাম না করিয়া ছুটীর দিনে পাহাড়ে চলিয়া যান। Bottomley Firth মহাশয় লণ্ডনের County Council এর একজন সদস্য ছিলেন। ছুটীর দিনেই ক্লান্ত দেহে পর্ব্বতারোহণ করিতে যাইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে। আমাদের দেশেও একদল লোক আছেন যাঁহারা বলেন change of occupation is rest। তাঁহারা এ কথাট ভুলিয়া যান যে দেহযন্ত্রের কোন একটী অংশকে চালনা করিলে সমস্ত অংশই চালিত হয়। বিশ্রামের অর্থ অলসতা নহে। একেবারে বিশ্রামহীনতা স্বাস্থ্যনাশ করে।

(খ) ব্যায়াম।—যাঁহারা মস্তিষ্কের চালনা করেন তাঁহাদের পক্ষে ব্যায়াম অত্যাবশ্যক। মহামতি গ্লাডষ্টোন (Gladstone) এর জীবন ইহার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ Gladstone প্রত্যহ দুই এক ঘণ্টা ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার প্রায় ৯ বৎসরব্যাপী জীবনে তিনি নিজে লিখিয়াছেন যে তিনি যখন প্রথম Chancellor of the Exchequer হইলেন তখন তাঁহাকে প্রত্যহ ১৬ ঘণ্টা করিয়া নিয়মিত ভাবে খাটিতে হইত। তখনও তিনি নিয়মিত ভাবে ভ্রমণ করিয়াছেন। ঝড় বৃষ্টি বাদল কিছুতেই তাঁহার ভ্রমণের ব্যাঘাত হইত না। আজকালকার বড়লোকদের মধ্যে নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করেন Lord Balfour। Ireland এর সেই ভীষণ অরাজকতার দিনেও তিনি তাঁহার সহকারীকে লইয়া প্রত্যহ ভ্রমণ করিতেন। Mr Loyed Georgeও নিয়মিতভাবে ভ্রমণ করেন। Parliament এর সদস্য Mr T P O connor এর আত্মজীবনীতে জানা যায় যে তিনি যখন প্রথম Dublin সহরের খবরের কাগজের সংবাদদাতা হইলেন তখন তিনি প্রত্যহ দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করিয়া সংবাদপত্রের আফিসে আসিতেন। Dublin এ গাড়ী খুব সস্তা কিন্তু তিনি কখনও গাড়ীতে আসিতেন না। Daily Telegraph কাগজের সহকারী সম্পাদক হিসাবে তাঁহাকে রাত্রি ৭টা হইতে ভোর ৭টা পর্য্যন্ত কাজ করিতে হইত। অবসর পাইলেই তিনি ভ্রমণ করিতেন। এবং সে অবসর তাঁহার প্রত্যহই জুটিত। আমাদের দেশে যাঁহারা ব্যায়ামের সময় পান না বলিয়া অজুহাত দেখান তাঁহারা কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন কি? O connor মহাশয় বলেন তিনি অল্পাহার করেন অল্প পান করেন যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। ফলে তিনি আজিও বালকের মত হাসিতে পারেন। বার্দ্ধক্যের ও জরার প্রতাপ মিতাচারীর নিকট বড় কম।

আমাদের দেশে ব্যায়াম চর্চ্চা নাই। স্বামী বিবেকানন্দের ও কেশবচন্দ্রের মত মহাকর্ম্মীগণও দীর্ঘজীবী হইতে পারেন নাই। দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ও অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। কেবল ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আত্মজীবনীতে দেখা যায় যে তিনি রীতিমত ব্যায়াম করিতেন। এই অল্পায়ুর দেশে সুরেন্দ্রনাথের উদাহরণ ঘরে ঘরে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

তুলসী

[লেখক ডাক্তার শ্রীবাপালচন্দ্র নাগ]

তুলসী হিন্দু মাত্রেরই পরিচিত পুণ্য ও পূজার উপকরণ। কাজেই তুলসীর অধিক পরিচয় দিবার প্রায় আবশ্যক হয় না। পরম করুণাময় জগদীশ্বর এই অমূল্য ভেষজটীর যে আদর করিয়াছেন তাহা দেখিলেই মনে হয় যে তুলসী আমাদের মহোপকারী বৃক্ষ। তুলসীবৃক্ষে জলদান কালে আমরা বলিয়া থাকি —

গোবিন্দ বল্লভাং দেবী ভক্ত চৈতন্যকারিনী
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী।

যদিও আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে বাংলার মানুষ সেকেলে মনুষ্যত্ব ছেড়ে বর্ত্তমান কালের বিংশ শতাব্দীর নূতন এক অভিনব জীবে পরিণত হইতেছে তথাপি এখনও পল্লীর প্রতি ঘরে ঘরে দরিদ্রের উঠানে ধনীর দেবমন্দিরের সম্মুখে তুলসী বৃক্ষ স্থাপিত প্রতি সন্ধ্যায় ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে বিশেষতঃ সেকেলে ঠাকুমার বয়সী মহিলারা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তুলসী তলায় দীপ দান ও বৃক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। ইহার ভিতর বিশ্বস্রষ্টার আর তাঁর ভক্ত অথবা মানব মঙ্গলকামী ঋষিগণের যে কি গভীর উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা আজকালের কয়জন বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন? ...নব পল্লী ভূমির নিরক্ষর মানুষরা তাঁহারা কোনের ছেলেদের মাথা তুলসীতলার মাটী দিয়া ...কেন। কিন্তু আধুনিক রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তুলসীতলার মাটী থেকে পাড়াগাঁয়ের ছেলেগুলোর টিন ম্যাণ্টাইল লিভার একবারেই হয় না। তুলসীর মৃদুমন্দ গন্ধযুক্ত বাতাস যখন এই পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত কৃষকের নাসিকায় অনুভূত হয়—তখনই সে নারায়ণকে ভাবে আর নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় বলে তাঁকে প্রণাম করে। বলতে পারি না আর কতদিন এমন ভাবে চলবে। অনেকেই হয়ত বলবেন, আর কিছুদিন—যত দিন না পাড়াগাঁয়ের কৃষকের ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে মাত্রই অন্ততঃ ম্যাট্রিকটা পড়ে। অনেকে হয়ত ভাববেন পাশ্চাত্য শিক্ষার নিন্দা করছি। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত ভাইগণ! বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি আপনাদের মধ্যে কয়জন প্রত্যহ তুলসী মঞ্চ প্রদক্ষিণ করেন? তবে আশার কথা এই যে হওয়া আবার ফিরছে স্বর্ণপ্রসূ বাংলার দিকে বাংলার সন্তান আবার ফিরে দেখছে দেশের ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসার সম্বল যুবকগণ যেন অদূরে বলছে—

বাংলার মাটী বাংলার জল,
বাংলার ফুল, বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান।

সেই আশাতেই বুক বেঁধে আজ তুলসীর সাধারণ মাহাত্ম্য অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবারণে তুলসীর উপকারিতার বিষয় বলতে সাহসী হয়েছি।

এ দেশেরই বড়াল কবি স্ত্রী বিয়োগের পর "এষা" নামক গ্রন্থে যে দুঃখময় জীবনের নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহারই এক স্থানে আছে —

হে পূত তুলসী বিষ্ণুর প্রেয়সী
বিবর্ণ তোমার দল
প্রভাতে আসি প্রণাম করিয়া
কেবা মূলে ঢালে জল।
সন্ধ্যায় আসিয়া গলে বস্ত্র দিয়া
কেবা তলে দীপ জ্বালে
...স মঞ্জরী ...ড় ঝরি ঝরি—
...তস ঢালে ঢালে।
পবিত্র আমায় ...মিছে তোমায়
দুটি পুষ্প তিল দিয়া
তোমার নিশ্বাসে সর্ব্ব রোগ নাশে
যায় দুঃখ পলাইয়া।

আজ এই বাংলাদেশের মা লক্ষ্মীগণ! কেহ কি তাহার স্বামীকে এই ভাবে তুলসী মঞ্চ প্রদক্ষিণ করিতে বলিতেছেন। তুলসীর সেবায় যে সর্ব্ব রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

এই জন্য শ্রীভগবান স্বয়ং সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন —হে সত্যভামে। তুমি স্থির জানিও যে —

দারিদ্র্য দুঃখ রোগার্ত্তি পাপানি সুবহূন্যপি।
হরতে তুলসী ক্ষেত্রং রোগানিব হরিতকী

অর্থাৎ এক হরিতকী যেমন রোগসমূহ দূর করে তদ্রূপ তুলসীদেবীও দারিদ্র্য দুঃখ রোগ শোক ও সর্ব্ববিধ পাপ আশু ধ্বংস করিয়া দেন।

এই সমস্ত দেবস্থের গুণাবলী না জানিয়া ও কেবল মাত্র পরের মুখ চাহিয়া থাকিয়া আমাদের দুঃখের ও কষ্টের অবধি নাই। শাস্ত্রের বিধানের অধিকাংশই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে।

তুলসীর ইংরাজী নাম ওসাইনাম স্যাঙ্কটৈাম,

পাশ্চাত্য দেশে অনেকে ইহাকে হোলি বেসিল বলেন। ঔষধার্থে ইহার বৃক্ষ বীজ ও পত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তুলসীর সংস্কৃত পর্য্যায় —সুভগা, তীব্রা পাবনী বিষ্ণুবল্লভা, সুরেজ্যা সুরসা কয়স্থা, সুরদুন্দুভি সুরভী বহুপত্রী মঞ্জরী হরিপ্রিয়া অপেত রাক্ষসী শ্যামা গৌরী ত্রিদ। মঞ্জরী ... ভূতপত্রী ... বৃন্দা কটিঞ্জর কুঠেরক বৈষ্ণবী পুণ্যা পবিত্রা মাধবী অমৃতা পত্রপুষ্প, সুগন্ধা গন্ধহারিণী সুবহা প্রেত রাক্ষসী সুবহা গ্রাম্য সুলভা বহুমঞ্জরী দেবদুন্দুভি।

ইহাকে বাংলায় তুলসী হিন্দীতে বরগুা ও তুলসী মহারাষ্ট্রদেশে তুলসীচে ঝাড তেলেগু ভাষায় তুষ্ট তামিলীতে তুলসী দাক্ষিণাত্যে তুলসী বং বোম্বাই প্রদেশে তুলস কহে।

আয়ুর্ব্বেদমতে তুলসীর গুণ —ইহা কটু তিক্তরস উষ্ণবীর্য্য সুরভি রুচিকর অগ্নিবর্দ্ধক দাহ ও পিত্ত নাশক বাতশ্লেষ্মানাশক এবং কাস ক্রিমি বমি কুষ্ঠ রক্তস্রাব জীর্ণজ্বর পার্শ্ববেদনা ও ভূতাবেশের শান্তিকারক।

এলোপ্যাথিক মতে তুলসীর গুণ —তুলসী কফ নিঃসারক ও ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বিবিধ সংক্রামক পীড়া নাশক। সর্দ্দিঘটিত বিবিধ পীড়ায়, কাস পার্শ্ববেদনা ব্রঙ্কাইটিস নিউমোনিয়া এজমা ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি পীড়ায় উপকারী সবিরাম ও স্বল্পবিরাম জ্বরের ইহা মহৌষধ প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস হইলে মূত্র করণার্থ ও স্নিগ্ধ করণার্থ ইহার বীজ প্রয়োজিত হয়।

এই সমস্ত ক্রিয়াদি দেখিয়া ও আয়ুর্ব্বেদে ইহার গুণাবলী পাঠ করিয়া এবং ধর্ম্ম শাস্ত্রে তুলসীর বিষয় অবগত হইয়া মনে হয় যে নিশ্চয়ই তুলসীর সংক্রামক পীড়ার জীবাণু নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে। তজ্জন্যই গত ইনফ্লুয়েঞ্জা এপিডেমিকের সময় ইহা বিবিধ উপায়ে প্রযোগ করিয়া পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছি যে থাইমল ইউক্যালিপ্টস প্রভৃতি অপেক্ষা তুলসীর শক্তি কম নয়।

আমি নিম্নোক্ত তিন প্রকার প্রয়োগরূপ প্রস্তুত করিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগীগণকে প্রয়োগ করিয়াছিলাম।

১। তুলসীর অরিষ্ট (টীংচার ওসাইনাম স্যাঙ্কটেটাম বা টীংচার হোলি বেসিল) তুলসীর পত্র ও বীজ চূর্ণ ২১ আউন্স শোধিত সুরা ১ পাইন্ট—এক সপ্তাহ কাল ইহা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ½—১ ড্রাম।

২। তুলসীর ফাণ্ট (ইনফিউজন ওসাইনাম স্যাঙ্কটেটাম বা ইনফিউজন হোলি বেসিল) শুষ্ক তুলসীর পত্র ১ আউন্স ফুটিত পরিস্রুত জল ১ পাইন্ট অর্দ্ধঘণ্টা ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা —১ আউন্স।

৩। সিরাপ ওসাইনাম স্যাঙ্কটেটাম (তুলসীর পাক) তুলসী পাতার রস ১২ আউন্স বিশুদ্ধীকৃত শর্করা ২ পাউণ্ড পরিস্রুত জল ৮ আউন্স বা যথা প্রয়োজন। তুলসীর রস ও পরিস্রুত জল একত্রে মিশাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল সামান্য উত্তাপে ফুটাইবে। পরে তাহাতে চিনি সংযোগ করিয়া ক্রমে সিরাপের আকারে পরিবর্ত্তিত করিবে। সর্ব্ব সমেত ৩ পাউণ্ড ওজন হইবে। মাত্রা —১—২ ড্রাম।

ছেলেদের সর্দ্দি কাসিতে অধিকাংশ সময়ে আমি তুলসীর সিরাপ বা নিম্নোক্ত চাটনী প্রযোগ করিয়া বিশেষ সুফল পাইয়াছি।

তুলসী পত্রের রস—৪ ড্রাম
বিশুদ্ধ মধু—১ আউন্স
আদার রস—২ ড্রাম
যমানী চূর্ণ—• ড্রাম

একত্রে মিশাইয়া লইবে। মাত্রা ৩ —৬ ফোঁটা।

ম্যালেরিয়া জ্বরে তুলসী পত্রের রস ১ তোলা ও আদার রস অর্দ্ধ তোলা মধু সহ সেবনে বেশ উপকার হয়।

তুলসীর মূল পানের সহিত চিবাইয়া খাইলে বক্তা মাশয় আরোগ্য হইয়া থাকে।

কর্ণশূলে ইহার রস বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

রক্তপ্রস্রাব বা হিম্যাচুরিয়া রোগে তুলসীর রস চিনি সহ সেবনে তাহা নিবারিত হইয়া থাকে।

তুলসীপত্রের রস প্রয়োগে প্রসবের পরবর্ত্তী বেদনা আরোগ্য হইয়া থাকে।

অন্ন কালীন বমনে জলমিশ্রিত সিরাপ তুলসী অথবা মিছরীর সরবতের সহিত তুলসী পত্রের রস হিতকর।

যমানী ও তুলসী নিয়মিতভাবে ব্যবহার করিলে বসন্তকালে প্রয়োগ করিলেও পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে।

তুলসীর বীজ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জল ছাঁকিয়া পান করিলে শুক্রমেহ বা স্বপ্নবিকার নিবারিত হয়।

গণোরিয়া বা প্রমেহ রোগে ও প্রস্রাবের জ্বালা নিবারণার্থ বহু স্থলে প্রয়োগ করিয়া উপকার পাইয়াছি।

দদ্রু বা দাদ রোগে ইহার পত্র ঘর্ষণে উপকার হইতে দেখা গিয়াছে। অনেকে কাগজী বা পাতি লেবুর রসে পিষিয়া দাদে লাগাইতে বলেন।

ছেলেদের হামজ্বরে তুলসীমঞ্জরী ও যোয়ান ও আদা একত্রে বাঁটিয়া প্রয়োগ করিলে হাম বাহির হইয়া রোগী আরোগ্য হইয়া থাকে।

তুলসীমঞ্জরী এক আনা মেথি এক আনা ও কুড় এক পাই ওজন করিয়া কিঞ্চিৎ জল দ্বারা সিদ্ধ করিয়া সেই অবশিষ্ট কাথ পান করিলে হামজ্বর নিবারিত হয়।

অনেক সময় তুলসী পত্র উত্তম বায়ু নাশক হইয়া অজীর্ণ পেট ফাঁপা মন্দাগ্নি প্রভৃতিতে উপকার করে।

প্রত্যহ প্রাতে তিনটী তুলসী পত্র তিনটা গোলমরিচ একত্র সেবন করিলে শরীরে প্রায় কোন ব্যাধি আক্রমণ করে না।

বাড়ীর মধ্যে—বেশী পরিমাণে তুলসী বৃক্ষরোপণ করিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

তুলসী বহু গুণবিশিষ্ট। সকল গুণের বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। সর্ব্বশেষে তুলসী গীতায় লিখিত ভগবান মুখ নিঃসৃত তুলসীর প্রণাম লিখিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রণাম —

যা দৃষ্টা নিখিলাঘ সংঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃ পাবনী,
রোগানামভি বন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তক ত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তি বিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তি ফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ।

অর্থাৎ যাহাকে দেখিলে নিখিল পাপসমূহ ধ্বংস পায় যাঁহাকে স্পর্শ করিলে দেহ পবিত্র হয় যাঁহাকে অভিবন্দন করিলে রোগরাশি বিদূরিত হয় যাঁহার সিক্ত জল গাত্রে স্পৃষ্ট হইলে অন্তকভয় বিদ্যমান থাকে না, যাঁহাকে রোপণ করিলে ভগবান কৃষ্ণে প্রত্যাসক্তি জন্মে যাঁহাকে কৃষ্ণ চরণে অর্পণ করিলে মুক্তিফল লাভ হয়— সেই তুলসী দেবীকে নমস্কার।

ডায়মণ্ডহারবার পঞ্চায়ত সম্মিলনীতে সম্পাদকের অভিভাষণ

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব সরকার।

[ডায়মণ্ড হারবার পঞ্চায়েত সম্মিলনীতে সম্পাদকের অভিভাষণের সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া গেল আমরা চৈত্র সংখ্যায় ২৪ পরগণায় পল্লী সংগঠন আন্দোলন প্রবন্ধে উক্ত জেলার শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কৃষি বিষয়ে বর্ত্তমান অবস্থা ও অভাব অভিযোগের বিস্তৃত আলোচনা করিব।—সম্পাদক স্বাস্থ্য সমাচার]

প্রিয়তম বন্ধুগণ এবং সমবেত ভ্রাতৃবৃন্দ

আমাদের এই সম্মিলনের আজ দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ আরম্ভ হল। এই আনন্দের দিনে এই উৎসব সভায় আপনাদের শুভাগমন যে শুধু আমাদের প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করেছে তা নয়, এই সম্মিলন আপনাদের আশীর্ব্বাদে আপনাদের স্নেহদৃষ্টির বলে দিনে দিনে শোভায় সম্পদে দীর্ঘজীবনের পথে অগ্রসর হবে—এ আশা আমরা করছি।

আমাদের এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য আমাদের এই ডায়মণ্ডহারবার সাবডিভিসনের অধিবাসীগণের মধ্যে

পর পর মিলন ...আমরা দেশের কাজ করিতে চাই।— বড় বড় বক্তৃতা করি লম্বা লম্বা কথা আওড়াই কিন্তু কাজের বেলা অষ্টরম্ভা গোল কড়াই কানা— ...দেশের কাজ যা হয় তা ...গঙ্গাই জানেন— তুমি ...দিয়ে তুমি সে ভিজিবে।

দেশের কাজ করতে গিয়ে মহাপুরুষেরা এ ভুল বুঝতে পেরেছেন যে সহরে বসে বড় বড় বক্তৃতা করলে দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা একটুও দূর হয় না। দেশের প্রাণ পড়ে আছে পল্লীগ্রামে—সেই পল্লীগ্রাম ম্যালেরিয়া কালাজ্বর বসন্ত কলেরার ক্রীড়া নিকেতন—রোগে জীর্ণ দারিদ্র্যে শীর্ণ বনে জঙ্গলে সমাকীর্ণ – সেই সব ঝোপ ঝাড় ভেদ করে স্বাস্থ্যকর পবিত্র হাওয়া কোন গ্রামে প্রবেশের পথ খুঁজে পায় না। রোগে ব্যবস্থা দেবার মত ডাক্তার নেই ঔষধ পথ্য যোগাবার মত অর্থ নেই ছেলে মেয়েদের শিক্ষা দেবার মত স্কুল পাঠশালা নেই— এই আমাদের পল্লীজননী। এই পল্লীমায়ের বুকের উপর রোগে শোকে অনাহারে অর্দ্ধাহারে অশিক্ষায় কুশিক্ষায় জর্জ্জরিত হয়ে কত প্রাণ যে নষ্ট হচ্ছে তার আর ইয়ত্তা নেই। এই অশিক্ষা কুশিক্ষার ফলে ভাইয়ের বুকে ভাই ছুরি মারতে উদ্যত হবে নানা মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি হয় আর তার ফলে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয়।

আমাদের এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য দেশের সেবা— সেবা অর্থে আমরা কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধাচরণ বুঝি না। আমরা বুঝি দেশের উপকার। দেশের উন্নতিকল্পে কর্ত্তৃপক্ষের সহায়তায় যদি আমরা আমাদের সকল অভাব দূর করতে সক্ষম হই তবে সে কর্ত্তৃপক্ষকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করতে আমাদের আপত্তি কি? আমরা চাই পরস্পর বন্ধুভাবে দেশের কল্যাণ সূচক কাজে পরস্পরকে সাহায্য করব—এই মহান উদ্দেশ্য নিয়েই এই সম্মিলনের জন্ম।

দেশের সেবা অর্থে আমরা বুঝি পল্লীর সেবা— পল্লীর উন্নতি চেষ্টা। পথ ঘাটের উন্নতি পানাপুকুর পরিষ্কার পচা ডোবা বন্ধ করা বিশুদ্ধ পানীয়ের ব্যবস্থা ঝোপ ঝাড় কাটিয়ে বায়ু চলাচলের পথ করে দিয়ে ম্যালেরিয়ার আস্তানা নষ্ট করা গ্রামে গ্রামে স্কুল পাঠশালা স্থাপন করে অজ্ঞানান্ধকার দূর করা দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করে দুস্থ গ্রামবাসীকে ব্যাধি যন্ত্রণায় ঔষধ পথ্য দান করা বাঁচার পথ করা। আজ ঐ যে কণ্ঠে কণ্ঠে শুনতে পাচ্ছি Back to the village—তার অর্থ আর কিছু নয়—যদি বাঁচতে চাও আগে গ্রামগুলিকে বাঁচাও। এই যে বাণী আজ দিকে দিকে প্রচারিত হচ্ছে এ বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফল। যে পথ ধরে আমরা দেশের সেবা করতে বেরিয়েছিলাম অভিজ্ঞতায় দেখা গেল তাতে প্রকৃত দেশের উন্নতি হয় না। সহরের গুটিকয়েক শিক্ষিত লোকের চীৎকারে প্রকৃত দেশের কোন কাজই হয় না।

সবার আগে চাই দেশকে প্রস্তুত করা। দেশের লোকের ভিতর পরস্পরের জন্য মমত্ববোধকে জাগ্রত করতে হবে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে নিজের দেশের লোককে ভাই বলে মনে ঠাঁই দিতে হবে দেশের কল্যাণের কাছে নিজের তুচ্ছ স্বার্থ বলি দিয়ে মনের সকল সঙ্কীর্ণতা সকল ক্ষুদ্রতা দূর করে প্রকৃত দেশের হিতসাধনে আত্মনিয়োগ করতে হবে। দেশের কাজ করতে হিন্দুমুসলমানের ভেদ জ্ঞান ভুলে যেতে হবে। আমি হিন্দু সুতরাং সকল কাজে মুসলমানকে দূরে ঠেলে রেখে নিজের জাতভাইকে সমর্থন করে যাব তেমন সঙ্কীর্ণতা যদি মনে আসে তবে আমাকে দিয়ে প্রকৃত দেশের মঙ্গল কাজ হবে না। যেখানে সঙ্কীর্ণতা সেখানে ক্ষুদ্রতা সেখানেই স্বার্থপরতা সেখানেই নীচতা— আর এই স্বার্থপরতা থেকেই দেশের ধ্বংস ও সর্ব্বনাশ। আজ যে হিন্দু মুসলমানকে অহিন্দু বলে দূরে ঠেলে রাখতে পারে কাল সেই হিন্দুই আবার সে ব্রাহ্মণ বলে ব্রাহ্মণেতর জাতিদের ঘৃণা করে সরিয়ে দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করবে না। ফলে দলাদলি রেষারেষি বিদ্বেষ বিতৃষ্ণার সৃষ্টি। তখন কায়স্থ বলবে 'আমি কায়স্থ ছাড়া আর কারো কথা মানি না।'—মাহিষ্য বলবে মাহিষ্য ছাড়া আর কারো কথা শুনব না— পৌণ্ড্র বলবে আমার জাতভাইকে ছেড়ে আর কারো

দিকে চেয়ে সেতে আমি রাজী নই—ইত্যাদি। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে দশের কাজ করতে যাবার মত বিড়ম্বনা আর কিছুই নেই।

আজ এই জাতীয় জীবনের নব অভ্যুদয় দিনে জয় যাত্রার পথে আমাদের প্রধান সম্বল করতে হবে **একতার বীজমন্ত্র**। এরই অভাবে আজ আমাদের ভিতর এত হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা। আজ আত্মপর ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এক প্রাণে একাকার হয়ে দলে দলে সমবেত হতে হবে। আমাদের লক্ষ্য হবে এক আমাদের সাধনা হবে এক আমাদের মন্ত্র হবে এক আমাদের উদ্দেশ্য হবে এক। কবির ভাষায়—

এক সূত্রে গাঁথা হবে সমস্তটি প্রাণ।

এক সুরে গাওয়া হবে লক্ষ কণ্ঠে গান।

সংহতি শক্তির পরাক্রমের কথা আর উচ্চকণ্ঠে ব্যক্ত তা করে না বললেও চলবে। শুধু যে এতটা বললাম সে শুধু পাছে ভুলে যাই বলে।

আমাদের এটা পঞ্চায়েতের সম্মিলন বলে এতে জনসাধারণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তেমন ভুল ধারণা কেউ করবেন না। পঞ্চায়েতগণ দেশের জনসাধারণেরই প্রতিনিধি। আমরা দেশের কল্যাণের জন্য কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি—আমাদের মনে কোন সংকীর্ণতা নেই। যে কেউ আমাদের মঙ্গল কাজে সহায়তা করতে অগ্রসর হবেন সাগ্রহে মাথায় করে আমরা তাঁর সাহায্য গ্রহণ করব।

মহৎ কাজ—বড় কাজ করতে গেলে নিজকে ছোট করতে হবে—সকল প্রকার প্রাধান্য গৌরব ভুলে গিয়ে নিজকে অতি সামান্য জ্ঞান করতে হবে—নইলে বড় কাজও করা যায় না—বড় হওয়াও যায় না। ইতর ভদ্র সকলকে ডেকে আজ দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দিতে হবে—দেশ যে দিনে দিনে ধ্বংসের পথে যাচ্ছে সেই কথাটা বুঝিয়ে দিয়ে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

গত সেন্সাসে জন্মমৃত্যুর যে তালিকা প্রস্তুত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে বাঙ্গালাদেশ ক্রমশ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তার ভেতর এই ২৪ পরগণা জেলায় প্রতি হাজারে ২২ জন লোক জন্মাচ্ছে আর ৩৩ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে—অর্থাৎ হাজারে ১১ জন লোক বেশী মরছে। এই ভাবে যদি জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার বেড়েই চলে তবে ধরাপৃষ্ঠ থেকে আমাদের লোপ পেতে আর বেশী দিন লাগবে না।

কিন্তু এর প্রতিকার কি কিছু নেই? আছে বই কি? বাঁচতে হলে এর প্রতিকার করতেই হবে। আর কি করে মানুষের মত বাঁচতে পারা যায় তারও পথ আমাদেরই করতে হবে। মানুষকে বাঁচতে হলে তার চাই পুষ্টিকর আহার বিশুদ্ধ পানীয় নির্মল বায়ু। এসবের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে।

গরীব চাষীকে রক্ষা করবার জন্য গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই সমবায় সমিতির ইতিহাস উপকারিতা দেশবাসীকে বুঝিয়ে দিতে হবে। আজ চাষের ফসল চাষী ভোগ করিতে পায় না কেন? কে তার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়? কেন? সে সব পথ বন্ধ করতে হবে। চাষের জমী চাষীর হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে—এ তার অপরিণামদর্শিতার ফল। হাতে কাচা পয়সা পেলে চাষী দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে—বাজারে তখন দুধ মাছ দুর্মূল্য হয়ে উঠে তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে মিতব্যয়ী করে তুলতে হবে। গ্রামে গ্রামে কৃষিভাণ্ডার স্থাপন করে অল্পায়াসে বেশী লাভের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার অভাবে এদেশে চাষের কোন প্রকার উন্নতিই হতে পারছে না—মান্ধাতার আগের কালে যে পদ্ধতিতে যা কিছু চাষ হয়ে আসছিল এখনও সেই ভাবেই তা চলছে। জমীর উর্ব্বরতাশক্তির হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে রীতিপদ্ধতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক এ বোধ আমাদের দেশের অনেক চাষীর নেই।

আমাদের এ দেশটাই সব রকমে সকলের পিছনে পড়ে আছে। নইলে পূর্ব্ববঙ্গের প্রত্যেক জেলায় প্রায় প্রতি জমীতেই দু তিনটা ফসলের চাষ চলে আসছে। মাটিকে যত্ন করতে জানলে তার কাছ

থেকে ফসল পেতে ত্রুটী হয় না—মায়ের স্নেহের মতই মাটির স্নেহও অপর্য্যাপ্ত—অপ্রতুল—শুধু আমরা তার সেবা যত্ন করতে জানিনা বলেই তার অজস্র স্নেহ পিযূষধারা হতে আমরা বঞ্চিত—এত হতভাগ্য আমরা।

দেশের কাজের উদ্দেশ্যে যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের কর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে আমাদের একটু তফাৎ আছে। তাঁরা গবর্ণমেণ্টের কাজের তীব্র সমালোচক এবং সরকারের সহযোগে কাজ করতে নারাজ কিন্তু আমরা সরকারের সঙ্গে যোগ রেখে গবর্ণমেণ্ট আমাদের যে সামান্য ক্ষমতা দান করেছেন তারই সদ্ব্যবহার করে আমাদের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে চাই। আমাদের বিশ্বাস এই পঞ্চায়েৎ সিষ্টেম এই ইউনিয়ন বোর্ড, এই লোকেল বোর্ড ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলিকে যদি আমরা ঠিক মত সঞ্চালিত করতে পারি যদি সকল প্রতিষ্ঠানে আমাদের সুপরিস্ফুট ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারি গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে আরো নূতন নূতন ক্ষমতা দিতে বাধ্য হবেন। এইভাবে ক্রমশ দেশের শাসন কার্য্যেও আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার এক দিন পাবই। সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে তার প্রতি কাজে বাধা জন্মিয়ে জোর করে কোন দিনই কোন অধিকার আদায় করা যাবে না। প্রতি কাজে প্রতি পদে নিজেদের কর্ম্মপটুতা দেখিয়ে দেশের কল্যাণ কাজে সরকারের সহায়তা আদায় করে বন্ধুভাবে তার সঙ্গে ব্যবহার করে দেশের সুশাসনে তার সাহায্য করতে হবে।

আজ দেশের মুক্তি সরকারের হাতে। সেই মুক্তি আমাদের চাই। কিন্তু সরকারের হাতে আমাদের জীবন বাঁচনের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। আমরা যে মানুষ মানুষের মত বেঁচে থাকবার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে তাই চাই **সমবেত চেষ্টা** তাই চাই **সংহতি শক্তির সংগঠন** তাই চাই **সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা**। যারা নিদ্রিত তাদের জাগাতে হবে যারা দুস্থ তাদের দুঃখ দূর করতে হবে যারা মরণোন্মুখ তাদের বাঁচাতে হবে যারা পদদলিত অন্ধতামগ্ন তাদের উদ্ধার করতে হবে। আমাদের এই সাধু সংকল্পে দেশবাসী আমাদের সহায় হোন **গবর্ণমেণ্ট আমাদের সাহায্য করুন**।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম ও স্বাস্থ্যসেবক।

অবতরণিকা।

বৌদ্ধধর্ম্মের মূলনীতি—অহিংসা পরমোধর্ম্ম। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের অন্যতম মূলতত্ত্ব—জীবে দয়া। হিন্দু ধর্ম্মনীতি অনুসারে অহিংসা ও জীবে দয়া ত পরম ধর্ম্ম বটেই তাহার উপর লোক সেবা হিন্দুর অপরিহার্য্য ধর্ম্মানুষ্ঠান।

লোক সেবা বলিতে সর্ব্বপ্রকারের লোক সেবা বুঝিতে হয়। দরিদ্রের দুঃখ মোচন অসহায়কে সাহায্য করা নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান ক্ষুধার্ত্ত বুভুক্ষুকে খাদ্য দান পীড়িতের সেবা শুশ্রূষা আর্ত্তের পরিত্রাণ বিপন্নের উদ্ধার তৃষ্ণার্ত্তকে জলদান—এ সকলই নর নারায়ণ সবার অন্তর্গত। হিন্দুর সমাজ এমন ভাবে গঠিত ছিল যে এই সকল জনহিতকর কার্য্য অতি সহজে অনায়াসে স্বত ই অনুষ্ঠিত হইত। সামর্থ্য সত্বে কেহ এই সকল কর্ম্ম করিতে অসম্মত বা বিরক্ত অথবা কুণ্ঠিত হইত না।

কিন্তু নানা কারণে সমাজ বন্ধন শিথিল হইয়াছে সমাজ গঠনের ব্যতিক্রমে ঘটিয়াছে সমাজে ভাঙন

ধরিয়াছে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণ হইয়াছে জনসেবাব্রত পালনে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। এখন কেবল স্বার্থ সেবা সকল প্রকার সেবাধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে। সমাজে এক বিরাট বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। সেই জন্য আমাদের প্রাচীন কালের পু।। অনুষ্ঠানগুলি অধুনা উপেক্ষিত হইতেছে। সমাজে দুঃখ কষ্টের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বহু লোকের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পীড়িতের সেবার ব্যবস্থা না থাকায় অকাল মৃত্যু সমাজকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে।

কিন্তু এরূপ অ স্থা ভ চলিতে পারে না। সমাজকে রক্ষা করা চাই। সেবাধর্ম্মের পুন প্রবর্ত্তন করা চাই। হিন্দুর সনাতন ও চিরন্তন ধর্ম্ম ক্ষা কর চাই। সেই উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যাহা গিয়াছে তাহার জন্য দুঃখ করিয়া কোন ফল নাই। এখন নূতন করিয়া বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া আধুনিক শিক্ষা দীক্ষার অনুসরণ করিয়া নব বিজ্ঞানের সহায়তা পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়া সেই প্রাচীন সেবাধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে।

এই মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত সর্ব্বগুণ সম্পন্ন কর্ম্মী তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। অমর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে দেশ সেবার জন্য লোক সংগ্রহ জন্য ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য কর্ম্মী গড়িবার ইঙ্গিত করিয়াছেন। গীতাপ্রোক্ত ত্যাগধর্ম্মের উপর সেবাধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্য এইরূপ কর্ম্মী গড়িবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘের অন্তর্গত কর্ম্মীদিগকে আপামর সর্ব্ব সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। সেই জন্য তাঁহাদিগকে সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা করিতে হইবে। যে মহৎ কর্ম্মের ভার তাঁহাদের উপর অর্পিত হইতে চলিয়াছে, তাঁহাদিগকে সম্যক প্রকারে তাহার উপযুক্ত হইতে হইবে। এই যোগ্যতা কিরূপে নির্ণীত হইতে পারে? না, তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে নিজেদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে শিখিতে হইবে। ইংরাজীতে একটী কথা আছে phy ician heal thyself। চিকিৎসক নিজে যদি রুগ্ন হন তাহা হইলে তিনি অপর রুগ্ন ব্যক্তিকে নিরাময় করিবার ভার গ্রহণে যো।। নহেন। নিজে যিনি স্বাস্থ্যধর্ম্ম সম্যকরূপে পালন করিতে পারিবেন তিনিই স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘের কর্ম্মী হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি। স্বাস্থ্য ধর্ম্মী লোক শিক্ষক। তাঁহাকে রুগ্ন পীড়িত আর্ত্ত ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে স্বাস্থ্যধর্ম্ম রক্ষার উপদেশ দিতে হইবে। তিনি নিজে সুস্থ না থাকিলে তাহা পারিবেন না। তাঁহার নিজের স্বাস্থ্য সুন্দর আদর্শ লোকের চক্ষের সম্মুখে ধরিতে পারিলে এই দৃষ্টান্তে যে সুফল ফলিতে পারিবে স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত শত উপদেশেও তাদৃশ সুফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। Example is better than precept—ইংরেজী এই প্রবচন এ ক্ষেত্রে যেমন খাটে, এমন আর কিছুতেই নহে। দৃষ্টান্ত উপদেশ অপেক্ষা সমধিক ফলপ্রদ—এটী অতি মূল্যবান প্রবচন। স্বাস্থ্য সেবকগণকে সর্ব্বদা এই মহামূল্য উপদেশটী স্মরণ রাখিতে হইবে এবং তদনুসারে কাজ করিতে হইবে। স্বাস্থ্য সেবক যে উপায়ে নিজে নীরোগ সুস্থ বলবীর্য্যসম্পন্ন থাকিতে পারিয়াছেন তাহা নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা রুগ্ন অস্বাস্থ্যকর ব্যক্তি বা পরিবারবর্গকে উপদেশ করিলে তাহাতে যেরূপ সুফল ফলিবার সম্ভাবনা এমন আর কিছুতেই নহে।

এ যাবৎ আমাদের দেশে স্বাস্থ্যরক্ষার কার্য্য কেবল শুষ্ক উপদেশের উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছে। কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ বিচার করিয়া কিসে স্বাস্থ্য ভাল থাকে কিসে স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয় সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতে কাহাকেও বড় একটা দেখা যায় না। ফলে হয় এই যে নীরস উপদেশগুলি এক কাণ দিয়া প্রবেশ করে এবং অপর কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা শ্রোতার মনের উপর কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু যদি শরীর তত্ত্ব অনুমোদিত জ্ঞানের উপর উপদেশের ভিত্তি স্থাপিত হয় শরীরের গঠন প্রণালী এবং শরীরস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির কার্য্য প্রণালী মোটামুটি

ভাবে বুঝাইয়া দিয়া সেই গঠন ও কার্য্যপ্রণালীর ব্যতিক্রমে কিরূপে শরীরে অসুস্থ হয় তাহা বুঝাইয়া দিতে পারা যায় তাহা হইলে সেই উপদেশ লোকে কিছুতেই ভুলিতে পারে না। লোকে তখন প্রত্যেক কার্য্যের সময় ভাবিয়া দেখিবার অবসর পায় যে তাহার ঐ কার্য্য স্বাস্থ্য অনুমোদিত কি না। তাহার কার্য্যের দ্বারা প্রকৃতির ব্যবস্থার কোন ব্যতিক্রম ঘটিয়া শরীর অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা আছে কি না। যদি সে দেখে যে তাহার কার্য্য স্বাস্থ্য রক্ষার অনুকূল হইবে না তবে শতকরা ৯৯টি ক্ষেত্রে সে ঐরূপ স্বাস্থ্যবিরোধী কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইবে এবং তাহার স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অতএব স্বাস্থ্য সেবকগণকে সর্ব্বাগ্রে এই সকল তত্ত্ব অবগত হইতে হইবে। তবেই তাঁহারা অপরকে শিক্ষা দিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিবেন। স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ কর্ম্মীদিগকে প্রথমে এই সকল বিষয় শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে সেবা ব্রতে দীক্ষিত করিয়া লইবেন। অতএব কর্ম্মীগণকে প্রথমে শিক্ষার্থীরূপে স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘে যোগদান করিতে হইবে।

শিক্ষার্থীরা তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রণালী ও নিয়মাবলী হাতে কলমে আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিবেন। এই স্বাস্থ্য রক্ষার প্রণালীর অনুসরণ পূর্ব্বক স্বাস্থ্যবিধি পালন করিয়া গেলে তাঁহারা কেবল যে নিজেরাই স্বাস্থ্যবান থাকিবেন তাহা নহে এই কার্য্যগত প্রত্যক্ষ লব্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাঁহারা অপরকেও সহজেও নিশ্চিতরূপ স্বাস্থ্য ধর্ম্ম পালন বিধি সম্বন্ধে উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবেন।

প্রথম অধ্যায

সুস্থতা ও স্বাস্থ্য ধর্ম্ম

সুস্থ থাকাই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়মের ব্যতিক্রমই অস্বাস্থ্য। শিশু সুস্থ দেহেই ভূমিষ্ঠ হয়। প্রকৃতির নিয়মের অনুসরণ করিয়া শিশুকে পালন করিলে শিশু সুস্থ থাকিয়া পুষ্টি লাভ করিয়া বড় হয়। প্রকৃতির নিয়ম পালনে অবহেলা করিলে শিশু অসুস্থ হয় পীড়িত হয়। শিশুকে কিছু কাল অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। এই নির্ভর কালটায় শিশুর পালনকর্ত্রী জননীর যোগ্যতার উপর শিশুর স্বাস্থ্য বা রুগ্ন অবস্থা নির্ভর করে। বড় হইয়া সে যখন নিজের ভার নিজেই লইতে সমর্থ হয়, তখন সুস্থ থাকা বা পীড়িত হওয়া তাহার নিজেরই কার্য্যের উপর নির্ভর করে। সে যদি স্বাস্থ্যবিধি ও প্রকৃতির ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া চলিতে শিক্ষা করে তবে সে সুস্থ থাকিবে। নচেৎ পীড়িত হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে প্রকৃতির বিধি ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলেই স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। অর্থাৎ শরীর ও মন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকাই স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যের অবস্থার কোন ইতর বিশেষ নাই। কম সুস্থ বা বেশী সুস্থ বলিয়া কোন অবস্থা হইতেই পারে না। সুতরাং অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হইলেই শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে।

স্বাস্থ্যরক্ষা সাধনা সাপেক্ষ। প্রকৃতি নির্দ্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি পালনই সেই সাধনা। সাধারণ লোকে সাধারণ পীড়ার সম্বন্ধে কিছু না কিছু জ্ঞান স্বতই লাভ করিয়া থাকে। সর্দ্দি কাসি উদরাময় প্রভৃতি সামান্য রোগ কেন হয় তাহা প্রায় সকলেই কিছু না কিছু জানে। এবং এই সকল রোগের আক্রমণ হইতে কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয় তাহাও যে তাহারা না জানে এমন নয়। একটু সাবধান থাকিলেই এই সকল পীড়া হইতে পারে না। স্বাস্থ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ শিশু দুই একবার এইরূপ সামান্য অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া এই সকল রোগের কারণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। তথাপি পরিণত বয়সেও মধ্যে মধ্যে লোককে এই সকল রোগ ভোগ করিতে হয়। তাহার কারণ অবহেলা ও উপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। গুরুপাক খাদ্য ভোজনে পেটের পীড়া হয় ইহা কাহাকেও শিখাইয়া দিতে হয় না। তথাপি লোভে পড়িয়া লোকে প্রয়োজন ও সুবিধা মত স্বাস্থ্য রক্ষার এই সাধারণ

তব ভুলিয়া যায় এবং গুরুপাক খাদ্য ভোজন করিয়া অসুস্থ হয়। লোভ অসংবরণীয় হইলে ক্রমাগত এই রূপ ভুল করিতে থাকিলে পেটের পীড়ায় ভুগিয়া তাহার পাকস্থলী এমন দুর্ব্বল ও রোগপ্রবণ হইয়া উঠে যে কারণে অকারণে সামান্য সূত্রেই তাহার পেটের অসুখ হয়। তখন সে নিজের অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করে এবং সুস্থকায় লোকের শুভা দৃষ্টের হিংসা করে। সে এইটুকু ভাবিয়া দেখে না যে সুস্থ লোকে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে না বলিয়াই সুস্থ থাকে, এবং সে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘনে অভ্যস্ত বলিয়াই পীড়িত হয়। নিবার্য্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে রোগীই সম্পূর্ণ দোষী ইহাতে অপর কাহারও কোন দোষ নাই অপরের হিংসা করিবারও কিছুই নাই।

বিপদে না পড়িলে লোকে ভগবানকে স্মরণ করে না। সেই জন্য কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই বর চাহিয়াছিলেন যে আমরা যেন চিরদিন বিপদে পড়িয়াই থাকি তাহা হইলে তোমাকে চিরদিন স্মরণ রাখিতে পারিব। তেমনি যত দিন লোকে সুস্থ থাকে যতক্ষণ না অসুস্থ হইয়া পড়ে ততক্ষণ সে স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে না। অসুস্থ হইয়া পড়িলেই স্বাস্থ্যের কথা তাহার মনে হয়। (তাই বলিয়া আমরা কুন্তীর মত এমন বর চাহিতে বলিতেছি না যে স্বাস্থ্যের কথা চিরদিন স্মরণ রাখিবার জন্য চির রুগ্ন অবস্থার কামনা করিতে হইবে।) তখন কেমন করিয়া সে স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবে এবং কেমন ভাবে চলিলে পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িবে না তাহাই সে ভাবিতে থাকে। কিন্তু কেবল চিন্তা করিলেই কোন ফল হয় না। পথ চলিতে চলিতে সামনে যদি কোন নদী আসিয়া পড়ে তবে নদীর তীরে বসিয়া বসিয়া কেমন করিয়া নদী পার হইব এই চিন্তা করিতে থাকিলেই নদী পার হওয়া যায় না। নদী পার হইতে গেলে তাহার উপায় অবলম্বন করিতে হয়। হয় সেতু না হয় নৌকা অন্তত একটা ভেলার সন্ধানও করিতে হয়, তবেই নদী পার হইবার উপায় হইতে পারে। সেইরূপ শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে কেবল সুস্থ হইবার কথা ভাবিলে চলিবে না। শরীর কেন অসুস্থ হইয়া পড়িল তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে পরে তাহার প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তবেই অসুস্থ শরীর পুনরায় সুস্থ হইবার ব্যবস্থা হইবে। নদী পার হইতে গেলে যেমন বুদ্ধি পরিচালন পূর্ব্বক সেতু বা নৌকা নির্ম্মাণ করিতে হয় অসুস্থ শরীরকে পুনরায় সুস্থ করিতে হইলেও সে রূপ বুদ্ধি বিবেচনা খরচ করিয়া যথোচিত প্রতিকারের উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য বা অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে মনে অতিরিক্ত মাত্রায় আন্দোলন করিয়া কোন ফল নাই তাহাতে বরং অহিতই ঘটিয়া থাকে। অভিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বৃথা এরূপ আন্দোলন না করিয়া অস্বাচ্ছন্দ্য দূর করিবার উপায় চিন্তা ও অবলম্বন করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে বৃথা মন খারাপ না করিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক প্রতিকারের যথোচিত উপায় অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কার্য্যক্ষেত্রে সহজে বিচলিত হন না। কাজ করিতে করিতে নূতন নূতন বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইলে সাধারণ লোকের মত একেবারে হাল ছাড়িয়া না দিয়া তিনি বুদ্ধি খাটাইয়া সেই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। তদ্রূপ স্বাস্থ্য রক্ষার মূল তত্ত্বগুলি যিনি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন তিনি যে কোন অবস্থাতেই হউক না কেন, স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন এবং কোন অনিবার্য্য কারণে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহার প্রতিকারেরও যথোচিত ব্যবস্থা করিতে পারেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাস্থ্য বিজ্ঞান

কি উপায়ে শরীর সুস্থ থাকে স্বাস্থ্য কেমন করিয়া রক্ষা করিতে হয় এবং পক্ষান্তরে যে যে কারণে আমাদের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে—এই সকল বিষয়

যে শাস্ত্রে আলোচিত হয় তাহাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞান। শরীর সুস্থ থাকিতে স্বভাবতই বাধ্য। এই স্বাভাবিক অবস্থার ব্যতিক্রমই অস্বাস্থ্য। অর্থাৎ স্বাস্থ্যের উল্টা যাহা তাহাই অস্বাস্থ্য। সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মগুলি জানিলেই স্বাস্থ্য কিরূপে ও কি জন্য ক্ষুণ্ণ হয় তাহা জানা গেল। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য—কিরূপে স্বাস্থ্য রক্ষা হয় তাহার উপায় নির্দেশ করা। সুতরাং পরোক্ষ ভাবে স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইবার কারণগুলিও ইহাতে আলোচিত হইয়া থাকে।

সভ্য মানব তাহাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রত্যেক কার্য্যের ক্ষেত্রেই কতকগুলি বিধি ব্যবস্থা রচনা করিয়া লইয়াছে। সে যখনই যে কোন কাজ করে তখনই সেই কার্য্যের জন্য নির্দ্ধারিত বিধি ব্যবস্থার অনুসরণ পূর্ব্বক বিবেচনা সহকারে কাজ করিয়া থাকে। এই ভাবে কার্য্য করাকে কলা বা Art বলা যায়। বহুদর্শিতা পর্য্যবেক্ষণ অনুসন্ধান গবেষণা পরীক্ষা ও চিন্তা শক্তির সাহায্যে মানুষ স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সত্য অবধারণ করিয়া লইয়াছে। সেই জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালীও কলাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানানুমোদিত স্বাস্থ্যবিধি পালন করাই সেই স্বাস্থ্য কলা। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের কাজটা কি তাহা এতক্ষণে বোধ হয় পরিষ্কার বোঝা গেল। যে নিয়মে স্বাস্থ্য রক্ষিত হয় ও যে অনিয়মে স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয় তাহা শিক্ষা দেওয়াই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের কাজ এবং সেই শিক্ষা সেই নিয়ম জীবনে কার্য্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই স্বাস্থ্য কলা। মানুষ বহু আয়াসে যে সকল বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করে, সেগুলি কেবল জানিয়া রাখাই যথেষ্ট নহে—সেগুলিকে কার্য্যে পরিণত করাও আবশ্যক—কৃপণের ধনের ন্যায় কেবল সঞ্চয় করিয়া রাখার কোনই লাভ নাই। বিবেচনা সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সুপ্রয়োগেই উপকার পাওয়া যায়। সাধারণ বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই কথাগুলি যেমন সত্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঠিক তাই। কিসে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, কিসে তাহা ক্ষুণ্ণ হয়—কেবল এই তথ্যগুলি জানিয়া রাখিলে কি হইবে। দৈনন্দিন জীবনে উহাদের প্রয়োগ করা আবশ্যক তবেই স্বাস্থ্য রক্ষা পাইবে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিয়া কলা বিদ্যার সাহায্যে তাহাদের প্রয়োগ করিতে হইবে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সুস্থ থাকাই স্বাভাবিক শিশু সুস্থ শরীরেই জন্ম গ্রহণ করে। তথাপি স্বাস্থ্য কেন ক্ষুণ্ণ হয় রোগ ব্যাধি শরীরকে আক্রমণ করে কেন? কারণ স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন করা হয় না। স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন না করিবার কারণ অজ্ঞতাও হইতে পারে উপেক্ষাও হইতে পারে অলসতাও হইতে পারে। যে কারণেই হউক স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম পালন করিতে হইলে নিয়মগুলি জানিতে হইবে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিলে নিয়মগুলি জানিতে পারা যাইবে। তার পর সেই সকল নিয়ম জীবনে পালন করিতে হইবে। স্বাস্থ্য অমূল্য নিধি। অতি যত্ন করিয়া এই নিধি রক্ষা করিতে হয়। ইহা রক্ষা না করিতে পারিলে উপভোগও করিতে পারা যায় না। নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা স্বাস্থ্য যাহাতে নষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার আগেই সাবধান হইতে হইবে যাহাতে উহা নষ্ট না হয়। নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার চেষ্টা অপেক্ষা স্বাস্থ্য নষ্ট হইতে না দেওয়া—উহা রক্ষা করা—অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ এবং তাহাতে যথেষ্ট আনন্দ লাভ ও উহা উপভোগের সুখও আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাস্থ্যের কারণ

সভ্য জগতে প্রাচীন কালে লোকে রোগের কারণ অনুসন্ধানে যতটা আগ্রহ প্রকাশ করিতেন—স্বাস্থ্যের কারণ জানিবার জন্য ততটা অবহিত ছিলেন না। রোগ হইলেই রোগ যন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের উপায় অবলম্বনে স্বভাবতই ইচ্ছা জন্মিতে পারে কিন্তু সুস্থ থাকাই স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া সুস্থ থাকার কারণ অনুসন্ধান করিবার কথা লোকের মনেই হয় না। কিন্তু একটু ভাবিয়া

দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃতি দত্ত স্বাস্থ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা করা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সরল পন্থা। সঞ্চিত ধন নষ্ট হইলে তাহার পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করা অপেক্ষা সঞ্চিত ধন যাহাতে নষ্ট না হইতে পারে সে পক্ষে পূর্ব্বে সাবধান হওয়া এবং ধন রক্ষার ব্যবস্থা করাই কি অধিকতর বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে?

স্বাস্থ্যের কারণ প্রধানত শরীরগত ব্যাপার। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির কার্য্য নিয়মিত ও স্বাভাবিক ভাবে চলিলেই শরীর সুস্থ থাকে। কেবল বাহ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নয়—শরীরের আভ্যন্তরিক যন্ত্র তন্ত্র এবং রস রক্ত অস্থি মাংস প্রভৃতি সমুদায় শরীরাংশের অবস্থা স্বাভাবিক ভাবে থাকা ও কার্য্যক্ষম রাখা চাই তবেই স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। টেলিগ্রাফের তারের মত আমাদের শরীরে একটা নাড়ী সংস্থান আছে। তাহা শরীরের প্রত্যেক অংশের সহিত অপর অংশের সংযোগ রক্ষা করিয়া থাকে। এই নাড়ীগুলি সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম অবস্থায় থাকিবে। আমাদের এই দেহ একটা বিরাট রসায়নাগার। এখানে সর্ব্বাতিসূক্ষ্ম ভাবে নিয়ত রাসায়নিক কার্য্য চলিতেছে। এই কার্য্য অব্যাহত ভাবে চলা চাই। এই রাসায়নিক কার্য্যের ফলেই দেহ খাদ্য হইতে শক্তি ও তেজ সংগ্রহ করিয়া থাকে। বিভিন্ন শারীর যন্ত্রের ক্রিয়ার ফলে খাদ্য হইতে শরীর গঠনের বিভিন্ন উপাদান বিশ্লিষ্ট ও প্রস্তুত হইয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের গঠন বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। আবার শারীর যন্ত্রের ক্রিয়ার ফলেই শরীরাভ্যন্তরে যে সকল ময়লা ও আবর্জ্জনা উৎপন্ন হয় তাহা বিভিন্ন দ্বার পথে শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। জীবন যাত্রা সম্যকরূপে নির্ব্বাহ করিতে হইলে এই সকল কার্য্যই নিয়মিত ও সুশৃঙ্খল ভাবে চলা চাই। শারীর যন্ত্রের এই সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলাই স্বাস্থ্যরক্ষার কারণ ও উপায়। সুতরাং স্বাস্থ্য সুন্দর ভাবে রক্ষা করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে (এবং মানুষ মাত্রকেই) শারীর যন্ত্রের কার্য্য প্রণালী মোটামুটি ভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে। সেই বিষয়ে সাহায্য করাই বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাই স্বাস্থ্যের কারণ এবং শারীর যন্ত্রের কার্য্য প্রণালী অব্যাহত রাখাই স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যকলা।

কুপথ্য

[শ্রীরমেশ চন্দ্র রায় এল্ এম্ এস]

কবিরাজী ভাষায় কুপথ্য বলিলে ঠিক্ কি ভাবের পথ্যকে বুঝায় বলিতে পারি না কিন্তু ডাক্তারি মতে এবং সাধারণ বুদ্ধিতে কুপথ্য বলিলে দেহের বয়সের ও অবস্থার অনুপযুক্ত খাদ্যকেই কুপথ্য বলা যায়।

শিশুদিগের পাকস্থলী অতি সুকুমার—একটুকু খাদ্যের ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহাদের উদরাময় বা জ্বর উপস্থিত হয়। অথচ শুধু এ দেশে বলিয়া নহে কাঁচা আম কষা (অপক্ক) পেয়ারা কাঁচা কুল তেঁতুল গোঁড়া লেবু, বাতাবীলেবু—প্রভৃতি পাইলেই ছেলেরা শুধু পায় না—প্রচুর পরিমাণে খাইতে চায় এবং অধিকাংশ সময়ে ভাল করিয়া না চিবাইয়া খায়। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এইরূপ দেখা যায় বলিয়া নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে প্রাকৃতিক প্রেরণার বশেই, ছেলেরা এ রকম খায়।

কেন এমন অদ্ভুত প্রেরণা? ইহার উত্তর বর্ত্তমান বিজ্ঞান দিবেন। অধুনা ভাইটামীন্স নামক খাদ্যের একপ্রকার অপরিহার্য্য রসের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। এই রস টাট্কা ফলমূলে ও মাংসে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে

থাকে। এ পর্য্যন্ত তিন জাতীয় ভাইটামীন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদিগের নাম—এ বি ও সি। কেহ কেহ ডি নামীয় চতুর্থ ভাইটামীনেরও উল্লেখ করিয়া থাকেন। যাহা হউক কাঁচা ফলমূলে কাঁচা ডাল ও চাউলে (ঢেকি ছাঁটা চাউলে) ভাইটামীন্ প্রচুর পরিমাণে থাকে—আর এই সব জিনিষই ছেলেরা মুঠামুঠা খাইতে ভালবাসে। তাহা হইলেই বেশ বোঝা গেল যে দেহের বৃদ্ধির ও স্বাস্থ্যের অনুকূল পদার্থ ঐ ঐ জিনিষে বেশী আছে বলিয়া ছেলেরা প্রাকৃতিক প্রেরণাতেই ঐ সকল ফুপ। খাইতে ভাল বাসে।

ইহা ছাড়া আরো কারণ আছে। ছেলেরা কখনো ভাল করিয়া চিবাইয়া কোনও খাদ্য খায় না—বিশেষ করিয়া ফলমূল। ফলমূল ভাল করিয়া না চর্ব্বণ করার ফলে অন্ত্র মধ্যে যাইয়া ঐ খণ্ডগুলি মলত্যাগে সহায়তা করে। সহজে ও সুন্দর ভাবে কোষ্ঠশুদ্ধি করার উদ্দেশ্যই দ্বিতীয় প্রাকৃতিক প্রেরণা। তবে এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে চাহি যে ভাল করিয়া চর্ব্বণ না করা প্রকৃতির উদ্দেশ্য নয়। কারণ অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে ভাল করিয়া না চর্ব্বণ করার সুফল অপেক্ষা কুফলই অধিক। প্রকৃতিদেবী মানুষকে যতটা অসহায় করিয়া—কাজেই পিতা মাতার যত্নসাপেক্ষ করিয়া—প্রেরণ করেন তেমন আর কোনও প্রাণীকে করেন নাই। কাজেই ছেলেরা কাঁচা ফল মূল খাইবার সময়ে তাহাদিগের পিতামাতার সে দিকে পূর্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। ছেলেরা ফলগুলিকে আস্ত আস্ত আস্তে গিলিবে—প্রকৃতির এরূপ উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য এই যে একটু আধটু কঠিনাংশ থাকে ত তাহাতে ক্ষতি নাই। তবে ফলমূল ভোজনের সুফল ছেলেরা যত বুঝে তত খেদের বিষয়, তাহাদিগের পিতামাতা তেমন বুঝেন না। ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে ও ব্যারাম হইবার ভয়ে প্রায় সকল রকম ফল হইতে পিতামাতারা শিশুদিগকে বঞ্চিত রাখেন।

কাঁচা আমের ঝোল অথবা শুধু কাঁচা আম তেঁতুল কলা কুল লিচু প্রভৃতি টক্ রসের জিনিষ গুলি খাইলে অম্ল হইবে—এই ভয়ে অধিকাংশ স্থলেই গৃহস্থ শিশুদিগকে ঐ ঐ মুখরোচক, পিত্তনাশক ক্ষুধাবর্দ্ধক অমৃতোপম খাদ্য হইতে বঞ্চিত রাখেন। ইহার বাড়া আর ভুল নাই।

তাহা ছাড়া কাঁচা, কঠিন ফল ভক্ষণের সময়ে দাঁতন কাঠি দিয়া দাঁত ঘষার কায হয়। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্রক জন্তুদিগের ভল্লুক গবাদি শাকসব্জী ভোজী জন্তুদিগের দন্তে পোকাও ধরে না দাঁতের মাড়িও ফুলে না—অথচ তাহারা দাঁতনও করে না বা টুথ পাউডার বা পেষ্টও ব্যবহার করে না। মাংশাসী জীবদিগের হাড়শুদ্ধ মাংস ও অপর জীবের, আস্ত আস্ত শাকপাতা বা কন্দমূল ভোজনের সময়ে দাঁত ঘষার কায হয়। যদি পশুদিগের পক্ষে এ নিয়ম খাটে তবে মানবশিশুর পক্ষে এ নিয়ম কতকাংশেও খাটিবে না কেন? যদি শুধু কন্দমূল ফলাহারেই মানবশিশু রত থাকিত তাহা হইলে বোধ হয় দাঁত মাজিবার প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু ভাতের মত নরম জিনিষ খায় বলিয়াই, শৈশব হইতেই দাঁতমাজা অভ্যাস করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

শিশুমাত্রেই মিষ্ট রসের অতিমাত্রায় প্রিয়। তাহার কারণ মিষ্টরস হইতে অতি সহজে ও সত্বর দেহের উত্তাপ রক্ষা ও মেদ সৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। শিশুদিগের পক্ষে এতদুভয়ই অতীব প্রয়োজনীয়। কিন্তু মিষ্ট ভক্ষণের পরে ভাল করিয়া মুখ না ধোয়ার ফলে দাঁত খারাপ হয়। এবং অতিমাত্রায় মিষ্টরস সেবনের ফলে কতকপরিমাণে পেটে আম সঞ্চিত হয়। কিন্তু মিষ্ট ভোজনে ক্রিমি হয় একথা একেবারেই ভুল। কচিছেলেদের ক্রিমি হয়—নখ বড় থাকা অবস্থায় মাটি কাদা ঘাটিলে ক্রিমি হয়—কাঁচা শাক বা মূল খাইলে এবং ক্রিমি হয়—ক্রিমি ডিম বহুল পুষ্করিণীর জল পান করিলে। প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে ক্রিমি গ্রস্ত মানুষ বা কুকুর বিড়াল শৃগাল প্রভৃতি জানোয়ারেরা যে মাঠে বা পুকুরের ধারে মলত্যাগ করে সে মাঠের ফসল ভাল করিয়া ধুইয়া খাইলে অথবা সেই পুষ্করিণীর জল ব্যবহার না করিলে ক্রিমি হয় না। কাজেই যদি কোনও শিশুর পেটে ক্রিমি না থাকে

তবে মিষ্ট ভোজনের ফলে ক্রিমি তাহার পেটে জন্মাইতে পারে না। তবে যদি তাহার পেটে ক্রিমি থাকে, তবে অতিমাত্রায় মিষ্ট ভোজনের ফলে, ক্রিমিগুলি খুব বাড়িয়া যাইতে পারে। অতএব স্থূল কথা দাঁড়াইতেছে এই —রুচি ছেলেদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মিষ্টভক্ষণ করিতে দিতে হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের দাঁত ও পেটের দিকে খরদৃষ্টি রাখিতে হয়।

এতক্ষণে আমরা মোট কথা কি বুঝিলাম ? আমরা বুঝিলাম দুইটি কথা,—(১) ছেলেরা কাঁচা ফল খায় কতকটা ভাইটামীন লাভের জন্য এবং কতকটা কোষ্ঠ শুদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং কাঁচা ফল ভক্ষণে তাহাদিগের দাঁত ভাল থাকিবার কথা। কাযেই পিতামাতার ঐ কার্য্যে বাধা না দিয়া বরং সহায়তা করা উচিত—তবে সবটাই পরিমিতি বা নিয়মের ভিতরে রাখা চাই। (২) ছেলেরা মিষ্ট খায়—সেটাও প্রাকৃতিক প্রেরণায় সে বিষয়ে ও পিতামাতার কর্ত্তব্য কি তাহা বলিয়াছি।

মণ্ডা মিঠাই, লজেনচেষ প্রভৃতির প্রতি আগ্রহ আমরাই সৃষ্টি করি। কিন্তু ছেলেরা অনেক সময়ে ঐ সব ফেরিয়া চাল কলাই ভাজা চিনার বাদাম কাঁচা মটর সুটি প্রভৃতি খাইতে চায় কেন ? প্রত্যেক খাদ্যের আস্বাদ রুচি ছেলেদিগকে ধরাইয়া শিখাইয়া দিতে হয়—কিন্তু খুব অল্প পিতামাতাই ইচ্ছা করিয়া চাল কলাই খাওয়ান ধরান। এমত অবস্থায় ঐ জিনিষের প্রতি ছেলেদের আগ্রহের প্রধান কারণ উহাদের রসনার স্বাদ নহে বরং ঐ সকল ভক্ষণে দন্ত সুখানুভবের আশাতেই ছেলেরা ঐগুলি খাইতে চায়। যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে যে ব্যক্তি বা জানোয়ার রীতিমত কঠিন দ্রব্য খায়, তাহার দাঁত তত ভাল থাকে। আর গলা ভাত ও সিঙ্গি মাছের হলুদ গোলা ঝোল খাইয়া আমাদের দাঁতের দফারফা হইয়া যাইতেছে। শিশুরা সেই জন্যই প্রাকৃতিক প্রেরণায়, দন্তের মঙ্গলার্থে ঐ দন্তসুখভোগের লালসায়, চাল কড়াই ভাজা খাইতে চায়। কিন্তু কয় জন পিতামাতা সে কথা শুনিবেন ?

বিবিধ-প্রসঙ্গ

[শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু]

(১) ফরাসীদেশে সূর্য্যকিরণের সাহায্যে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসা আবিষ্কার হইয়াছে। এই চিকিৎসা প্রণালী আশ্চর্য্য ফল প্রদান করিতেছে। সভ্য জগতে প্রতি মিনিটে ২টা, প্রতি ঘণ্টায় ১২ টি, প্রতিদিন ২৮৮ টি, প্রতি বৎসর ১ লক্ষ করিয়া লোক যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করিতেছে। কেবলমাত্র বঙ্গদেশ হইতে প্রতি বৎসর এই ভীষণ রোগে অন্যূন চারি সহস্র করিয়া প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক।

(২) ইংলণ্ডের চেশায়ার প্রদেশের এক ব্যক্তি একটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার সাহায্যে অনিদ্রা রোগ সারিয়া যায়। যন্ত্রটী রোগীর শয্যার নিকট একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর বসাইয়া যন্ত্র সংলগ্ন একটি বোতাম টিপিলেই তাহার মধ্য হইতে দ্বাদশ বর্ণের আলোক রশ্মি নির্গত হয়। সেই আলোক রশ্মিগুলির এরূপ অদ্ভুত ক্ষমতা যে, উহা রোগীর চক্ষুর মণির উপর পতিত হইলেই রোগী নিদ্রিত হইয়া যায়।

(৩) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীর বিদ্যা বিষয়ক পরীক্ষাগারের অধ্যক্ষ মি ওয়ালার মানবের চিত্তবৃত্তি পরিমাণ করিবার এক যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। সেই যন্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসকগণ রোগীর মানসিক ও স্নায়বিক অবস্থার সঠিক তত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ।

(৪) বার্লিনের অধ্যাপক বুর্গ নামক একজন বৈজ্ঞানিক মস্তকের খুলি প্রভৃতির আকৃতি ও আয়তন হইতে মনুষ্যের নৈতিক চরিত্র মাপিয়া কসিয়া দিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। অপরাধীদিগকে বুঝিবার পক্ষে এই যন্ত্রটী হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়।

(৫) জনৈক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক ডা' বারগার প্রাপ্‌টোমিটার নামে এক অভিনব যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার সাহায্যে মানুষের মনের ভাব সমস্ত বলা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত কোন লোকের ব্যাধি হইবার আশঙ্কা আছে কি না আর সে ব্যাধি শীঘ্র কি বিলম্বে হইবে এমন কি আক্রমণের সময় পর্য্যন্ত এই যন্ত্রের সাহায্যে অব্যর্থভাবে জানিতে পারা যায়।

(৬) মনুষ্যের কণ্ঠস্বরের রেকর্ড করিয়া চিকিৎসকগণ নানা প্রকার রোগ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছেন এবং সফলও হইতেছেন। স্নায়বিক রোগের প্রতিকার এই প্রকারে বহু পরিমাণ হইতেছে। কণ্ঠস্বরের ভাল মন্দের উপরই স্নায়বিক রোগ ধরা হয়। কথা বলার ধরণ নির্দ্দোষ হইলে প্রমাণ হয় যে, বক্তার কোন প্রকার স্নায়বিক পীড়া নাই কিন্তু স্নায়বিক পীড়া থাকিলে কথা বলা নির্দ্দোষ ধরণে হয় না এবং উচ্চারণ স্পষ্ট হইবে না— জিহ্বার জড়তা দোষ থাকিবে।

(৭) রেডিও যন্ত্র কোন লোকের বধিরতা দূর করিতে পারে না তবে খুব জোরে কথা বলিলে যাহারা শুনিতে পায় তাহাদের কর্ণে দিলে তাহারা সমস্ত কথা শুনিতে পায়। ডা হ্যারল্ড বধিরদিগের জন্য এক প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহার সাহায্যে বধির গণ সকল কথা বেশ স্পষ্ট শুনিতে পায়।

(৮) সিনসিনাটীর অধিবাসী হার্ব্বার্ট সিলভার একটি নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহার দ্বারা চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বড় বড় কঠিন অস্ত্র চিকিৎসা ভালরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

(৯) কেশবিরল মস্তক কেশাচ্ছাদিত করিবার জন্য সম্প্রতি একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে তদ্দ্বারা টাকের উপর চুলের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে চুল বসাইয়া দিতে পারা যায়।

(১০) ক্লোরোফর্ম্মের চৈতন্যাপহারক শক্তির বিষয় সর্ব্ব প্রথম ডেভিড ওয়াল্‌ডির মনে উদিত হয়। ইহার আবিষ্কার ব্যাপারের সহিত তাহার নাম অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। ১৮৩৫ খৃ তিনি ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে রাসায়নিক কারখানা স্থাপনের অগ্রণী। এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল গৃহে তাঁহার একখানি পিত্তল ফলক সংস্থাপিত হইয়াছে।

১। মান্যবর—শ্রীযুক্ত স্বাস্থ্য সমাচার সম্পাদক মহাশয় মান্যবরেষু—

সবিনয় নিবেদন মহাশয়ের ডাক বাক্সে আমার দুইটী প্রশ্ন প্রেরিত হইল। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী সংখ্যায় উত্তর প্রদানে বাধিত করিবেন, নিবেদন ইতি সন ১৩৩২ সন, তারিখ ২৪শে ফাল্গুন।

বিনীত
ডাক্তার শ্রীকাশীকুমার বিশ্বাস।

প্রশ্ন—

১। দক্র অতি কষ্টকর রোগ। 'পারদ বিহীন' "বিনা কষ্টে ২৪ ঘণ্টায় আরোগ্য" আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত দিব ইত্যাদি নানা প্রকার কথা সংবাদ পত্রে ও পঞ্জিকা প্রভৃতিতে পেটেণ্ট আবিষ্কার কর্ত্তারা বহুকাল যাবৎ প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ঐ সমস্ত পেটেণ্ট ঔষধ মধ্যে আমার চক্ষে যে কয়েকটী পড়িয়াছে তাহাতে দেখিয়াছি উহার প্রধান উপাদানই Acid chrysophanic। ঐ সমস্ত পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহারে দাদ সারিয়া যাইবার পর ২।১ সপ্তাহ মধ্যেই পুনরাক্রমণ করিয়া থাকে। আমি পুনরাক্রান্ত রোগীদিগকে এসিড ক্রাইসোফেনিক সালফার প্রিসিপিটেড, বিসমথ সব নাইট্রেট সোডি স্যালিসিলাস ভেসেলীন সহ মিশ্রিত মলম প্রয়োগ করিয়াও দাদের পুনরাক্রমণের গতি নিবারণ করিতে পারিতেছি না। চিকিৎসা প্রকাশ* নামক মাসিক পত্রিকার ২য় বর্ষের ১৩১৬ সালের শ্রাবণ মাসের ৪র্থ সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে যে দাদ সারিয়া যাইবার পর যদি সোডিয়ম হাইপোফস্ফাইট ২ ড্রাম ৪ আউন্স জলে দ্রব করত সেই দ্রব প্রত্যহ ৩।৪ বার আক্রান্ত স্থানে প্রয়োগ করা যায় তবে আর এ জন্মে সে স্থানে দাদ হয় না। উক্ত পত্রিকার ৪র্থ বর্ষের ১৩১৮ সালের ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ মাসে লিখিত আছে যে দক্ররোগের প্রতিষেধক ঔষধ সোডিয়ম হাইপোসলফাইটস ২ ড্রাম পরিশ্রুত জল ৪ আউন্স একত্র মিশ্রিত যে স্থানে দাদ হইয়াছিল সেই স্থানে প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়া তুলি করিয়া লাগাইতে হইবে। উক্ত ঔষধ ব্যবহার করিলে যাবজ্জীবনের মধ্যে আর উহা হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। এতদ্ব্যতীত উক্ত পত্রিকার ১ম সংখ্যা মাঘ মাসে ডা ব্রাউন্টন মহোদয় মেডিক্যাল ব্রিফ নামক পত্রিকায় দক্র রোগের পুনরাক্রমণ হইবে না বলিয়া যে প্রেস্‌ক্রিপসন করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উক্ত প্রেস্‌ক্রিপসনটী এই এপিকারিণ ১ ড্রাম সোহাগার খৈ ৩ গ্রেণ জিঙ্ক অক্সাইড ১ ড্রাম এসিড কার্ব্বলিক ৫ মিনিম ভেসেলীন ১½ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রযোজ্য।

উপরোক্ত ৩টী ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনার মত কি? উহা দ্বারা দক্র রোগের পুনরাক্রমণের গতি নিবারণ হইবে কি না তাহা জানাইবেন। জনৈক রোগী দ্বারা ঢাকার ৪।৫টী ঔষধালয়ে অনুসন্ধান করিয়াও এপিকারিণ না পাওয়ায় এপিকারিণের পরীক্ষার সুযোগ পাই নাই। আমাদের সে কালের মেটেরিয়া মেডিকায়ও এপিকারিণ পাইলাম না। বর্ত্তমান কালের ২।১খানি মেটেরিয়া মেডিকা অনুসন্ধান করিয়া উহা পাওয়া যায় নাই। আশা করি মহাশয় এপিকারিণের প্রয়োগ রূপ এবং উহার মূল্যাদি স্বাস্থ্য সমাচারে প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদ ভাজন হইবেন।

২। আজ কাল সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন স্তম্ভে কুইনাইনের নানাপ্রকার বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ কবিরাজী কুইনাইনও আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সমস্ত নব আবিষ্কৃত কুইনাইনের ক্রিয়াদি কি প্রকার তাহা নিরীহ অজ্ঞ পল্লীবাসী কিছুই জানে না। কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড আক্রমণে নিরুপায় হইয়া দোকানদারদিগের নিকট হইতে অনেকেই ২।৪ পয়সার কুইনাইন ক্রয় করিয়া থাকে। যদিও গবর্ণমেণ্ট হইতে ডাকঘরে কুইনাইন বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সত্য কিন্তু হতভাগ্য পল্লীবাসী এমনই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে যে একত্রে এক শিশি কুইনাইন ক্রয় করিবার পয়সা অনেকেরই অনেক সময় জুটিয়া ওঠে না। আবার অনেক সময় ডাক ঘরে কুইনাইন পাওয়াও যায় না। আমার এই কথা শুনিয়া সহরবাসী সম্পাদক মহাশয় অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না। আমরা পল্লীবাসী ক্ষুদ্র চিকিৎসক আজ পঞ্চবিংশতি বৎসর ধরিয়া পল্লীর যে দুরবস্থা দেখিয়া আসিতেছি তাহারই সামান্য একটী দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিলাম। যাক্ সে কথা এই সমস্ত কুইনাইনের মধ্যে জার্ম্মানীর নুতন আমদানী

* চিকিৎসা প্রকাশ—মাসিক পত্রিকা ডা ভি এন হালদার কর্ত্তৃক সম্পাদিত। পূর্ব্বে নদীয়া আলুলবাড়িয়া মেডিকেল ষ্টোর হইতে প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমান সময় কলিকাতা ১৯৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে বাহির হইতেছে।

ডি কুইনাইনের বিষয় আজ কাল অনেক সমব্যবসায়ী বন্ধুবর্গের মুখে শুনিতেছি এবং কোন কোন মাসিক পত্রে দেখিতেছি উহা ব্যবহার করিয়া সুফল পাওয়া যাইতেছে বলিয়া আলোচনা হইতেছে। আমি এ পর্য্যন্ত ডি কুই নাইন এবং নব আবিষ্কৃত অন্যান্য কুইনাইন ব্যবহার করি নাই। কিন্তু ঐ সমস্ত কুইনাইনের মধ্যে ডি কুইনাইনের একটী রোগী গত বৎসর এবং এবার জে বি ডি মেকারের কুইনাইনের একটী রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি। তাহাদের জ্বর বিরাম অবস্থায় ঐ কুইনাইন যথোপযুক্ত মাত্রায় চিকিৎসক কর্ত্তৃক প্রয়োগ হওয়া সত্বেও জ্বর বন্ধ না হইয়া উত্তরোত্তর টাইফয়ড অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। নব আবিষ্কৃত কুইনাইনের মধ্যে কোন কোন কুইনাইন আমরা কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে পারি এবং সর্ব্বসাধারণকে ব্যবহার করিতে উপদেশ দিতে পারি তৎসম্বন্ধে আপনার মতামত স্বাস্থ্য সমাচারে প্রকাশ করিবেন। ইতি—

উত্তর—

দাউদ অপরিষ্কার রাখার জন্য পুন পুন আক্রমণ করে। স্থানীয় ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য হইলেও স্থায়ীভাবে আরোগ্য জন্য শরীরের ভিতর ও বাহির দুইই পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিবে। কোনরূপ প্রস্রাবের দোষ থাকিলে তাহার চিকিৎসা করাইবে এবং পরিধেয় কাপড় জামা ইত্যাদি যথা সম্ভব পরিষ্কার রাখিবে।

আপনার ব্যবস্থাপত্রগুলি দ্বারা দদ্রু রোগ উপশম হইয়া থাকে। তবে পুনরাক্রমণ শরীরের ভিতরের ও বাহিরের ময়লা জন্য হইয়া থাকে।

এপিকারিণ নামক কোন ঔষধ Extra Pharma copiaতেও পাইলাম না। ইহা কোন পেটেণ্ট ঔষধ হইতে পারে। আপনি চিকিৎসা প্রকাশ সম্পাদক ডি, এন হালদার মহাশয়ের নিকট ইহার সংবাদ পাইবেন। আমার এ ঔষধের ব্যবহার জানা নাই।

২। ব্যবসায়ীরা ভিন্ন ভিন্ন নামে কুইনাইন আমদানী করিয়া বিক্রয় করিতেছেন এবং এই সকল নাম রেজেষ্টারি করিয়া বেশ লাভবান হইতেছেন। আমরা ফারমাকোপিয়ার নামধেয় কুইনাইন সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করিয়া থাকি, কারণ নূতন নামের কুইনাইনে কতদূর উপকার হইবে তাহা জানা নাই।

নবআবিষ্কৃত—(নূতন নাম বিশিষ্ট ও বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচারিত) কুইনাইন ব্যবহারে ক্ষতিই হইবে যে হেতু বিজ্ঞাপন ও ট্রেডমার্ক জন্য তাহাদের মূল্য অধিক। নবাবিষ্কৃত কুইনাইন ব্যবহার করা নিরাপদ নহে।

২। সম্পাদক মহাশয়—

স্বাস্থ্যধর্ম্ম সঙ্ঘ হইতে প্রকাশিত 'স্বাস্থ্যধর্ম্ম গৃহ পঞ্জিকাতে কৃষি সম্বন্ধ আলোচনা পড়িয়া আপনাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নটী উত্তরের জন্য পাঠাইলাম। যদিও এই প্রশ্নটী কৃষিবিষয়ক তথাপি স্বাস্থ্য সমাচারে কৃষি সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া এই প্রশ্নটী উত্তরের জন্য স্থান পাইবে এবং আলোচিত হইবে এইরূপ আশা করা যায়।

১। উত্তমরূপে আবাদি জমিতে এ বৎসর কলাই বুনিয়াছিলাম গাছ বেশ সতেজ হইল। ফলও বেশ বড় বড় হইল। কিন্তু আঁটী ছোট ও ভিতরের কলাই মুগের ন্যায় ক্ষুদ্র হইল।

প্রশ্ন ঃ—

কি কারণে বীজ পুষ্ট হইল না এবং কি উপায়ে ইহার প্রতিকার হইতে পারে তাহা আলোচনা করিলে সাধারণে বিশেষ উপকৃত হইবে।

শ্রীহরিচরণ গড়াই।
সাং নিশিন্দিপুর, পো আ মোকামপুর।

উত্তর —

আমরা কৃষিতে বিশেষজ্ঞ নহি। তবে জমিতে ফসলের আহার্য্যের অভাব হইলে এইরূপ ক্ষুদ্র বীজ উৎপন্ন হয়। জমিতে বিশেষ কোন উপাদানের অভাবে এইরূপ হইয়াছিল।

কি প্রকারে জমির রাসায়নিক শক্তি পরীক্ষা করিয়া ফসলের উপযোগিতা স্থির করিতে হয় তাহা বিশেষজ্ঞরাই ঠিক করিয়া বলিতে পারিবেন। এই জন্য আমরা বিশেষজ্ঞ দিগকে সহজে জমির উপাদান পরীক্ষা করিবার প্রণালী ও সেই অনুপাতে কৃত্রিম সার প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিতেছি। এইরূপ প্রবন্ধ আদরের সহিত স্বাস্থ্য সমাচারে প্রকাশিত হইবে।

'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম

১৪শ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৩২ সাল { ১২শ সংখ্যা

দেহ-রক্ষার ইঙ্গিত

হিন্দু দার্শনিকেরা মানব দেহকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গ তুলনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন প্রত্যেক মানুষের দেহই ক্ষুদ্রাকারের একটী বিশ্বজগৎ (Miniature universe)। বিশ্বপ্রকৃতির মূল নিয়ম সৃষ্টি স্থিতি লয়। গীতায় শ্রীভগবান চণ্ডীতে মেধস্ মুনি এই তত্ত্বেরই আভাস দিয়াছেন। এই বিশ্ব জগতে যেমন নিত্য সৃষ্টি স্থিতি, লয় চলিতেছে মানব দেহের মধ্যেও ক্ষুদ্রাকারে ঠিক সেই রকম কাজ চলিতেছে। আমরা যাহা আহার করিতেছি তাহা রূপান্তরিত হইয়া নূতন কোষ (cell) সৃষ্টি করিতেছে। স্থিতি গুণে এই সকল কোষ দেহের পুষ্টি সাধন করিয়া দেহ রক্ষা করিতেছে। জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য মানুষকে নিয়ত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে হইতেছে। তাহার ফলে শরীরের কিয়দংশ নিত্যই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে—সৃষ্টি তত্ত্বে ইহারই নাম লয়।

এই ক্ষয় প্রাপ্ত শেল বা কোষগুলি শরীরের পক্ষে আবর্জ্জনা স্বরূপ। ইহারা শরীর গঠন বা শরীর পোষণে কোনই সহায়তা করে না। পক্ষান্তরে শরীরের অনাবশ্যক বোঝা স্বরূপ থাকিয়া ইহারা দেহের অহিতই সাধন করিয়া থাকে।

কেবল যে ক্ষয়প্রাপ্ত শেলগুলিই দেহের ভিতর আবর্জ্জনার কাজ করে তাহা নয়। আরও নানা প্রকারে দেহের মধ্যে কিছু কিছু আবর্জ্জনা সঞ্চিত হয়। মোট কথা যাহা দেহের কোন কাজে লাগে না তাহাই আবর্জ্জনা।

গৃহস্থ বাড়ীতে অনেক আবশ্যক অনাবশ্যক জিনিস আমদানী রপ্তানী হয়। এই সমস্ত বস্তুই কিম্বা প্রত্যেক বস্তুর সমস্তটা অংশই গৃহস্থের কাজে লাগে না। অকেজো জিনিসগুলা আবর্জ্জনায় পরিণত হয়। গৃহস্থ প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যায় এই সকল আবর্জ্জনা ঝাট দিয়া বাড়ীর বাহিরে আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দেয়। এই

হিসাবে দেহের মধ্যে যে সব আবর্জ্জনা জমে সেগুলিও বাহির করিয়া ফেলা আবশ্যক। নচেৎ শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবে। গৃহস্থ ঘরে যেমন নিত্য যে আবর্জ্জনা জমে, এবং নিত্যই যাহা পরিষ্কার করিয়া ফেলা হয় দেহের আবর্জ্জনা সেরূপ ভাবে নিত্য বাহির করিয়া ফেলিবার সুবিধা না হইলেও মধ্যে মধ্যে—অর্থাৎ আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইয়া পরিমাণে বাড়িতে বাড়িতে শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই সেগুলিকে বাহির করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, A stitch in time saves nine—সময়ের এক কোঁড় অসময়ের নয় ফোঁড়ের কাজ করিয়া থাকে। দেহের আবর্জ্জনা সময় থাকিতে বাহির করিয়া ফেলিলে অনেক দুর্ভোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই স্বভাবতই ধর্ম্মপ্রাণ ও ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীল। রোগ শোক সুখ দুঃখ বিপদ আপদ সকল প্রকার পার্থিব ব্যাপারের সকল দায়িত্ব তাহারা ভগবানের বা দৈবের ঘাড়ে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। এই ভগবানের প্রতি নির্ভর শীলতার আমরা নিন্দা করি না। তবে আমরা কেবল এই কথাটি মাত্র স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি যে ভগবান ভাল মন্দ যাহা কিছু করেন তাহা মানুষের মধ্যস্থতাতেই করিয়া থাকেন। ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয় থাকিলেই যথেষ্ট হয় না। ঈশ্বরপরায়ণতার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও কাজ করিতে হইবে। কেবল আমাদের দেশের লোকই যে অদৃষ্টবাদী তাই নয়। সকল দেশেই অদৃষ্টবাদ অল্পাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। অন্য দেশের লোকেরাও কতকটা পরিমাণে সকল দোষ ভগবানের ঘাড়ে চাপাইয়া নিজেরা দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীলতা বা অদৃষ্টবাদের অর্থ নিজেরা নিশ্চেষ্ট থাকা নহে। সেইজন্য ইংরেজীতে এই প্রবচন প্রচলিত হইয়াছে যে God helps those who help themselves অর্থাৎ যাহারা নিজেরা কাজ করে ভগবান কেবল তাহাদেরই সাহায্য করিয়া থাকেন। আমাদের দেশেও একটী সংস্কৃত প্রবচন আছে—উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী। দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি। অর্থাৎ উদ্যোগী কর্ম্মী ব্যক্তিরাই লক্ষ্মী লাভ করিয়া থাকে। কেবল কাপুরুষরাই দৈবের উপর নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকে।

তার পর আমাদের দেশে আরও একটী কথা আছে—কর্ম্মফল। যে যেরূপ কর্ম্ম করিবে তাহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হইবে। অন্য সকল বিষয়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা কেবল স্বাস্থ্যের কথাই কহিব। এ ক্ষেত্রেও কর্ম্মফলের প্রভাব বিলক্ষণ। শরীর সুস্থ থাকা যেমন কর্ম্মফল পীড়িত হওয়াও তেমনি কর্ম্মফল। এই কর্ম্মফলের ভোগকাল ইহ জীবনই। ইহার মেয়াদ এই জীবনেই শেষ হয় পরবর্ত্তী জন্ম পর্য্যন্ত ইহার জের টানিতে হয় না। স্বাস্থ্য রক্ষায় অবহেলা স্বাস্থ্য বিরোধী দুষ্কর্ম্মের পরিমাণ অনুসারে দুঃখ ভোগের পরিমাণও নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সে কর্ম্মের পরিমাণ অনুসারে সাদাসিধে জ্বর জাড়ি সর্দ্দি কাসি পেটের অসুখ হইতে যত প্রকার কঠিন কঠিন রোগ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

খাদ্যের প্রকৃতি কাজ কর্ম্মের ধারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের প্রণালী প্রভৃতি অনুসারে শরীরের কোষগুলি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, এবং অন্য নানা উপায়ে শরীরের মধ্যে যথেষ্ট আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইতে পারে। এই সঞ্চিত আবর্জ্জনা যদি নিয়মিত ভাবে রীতিমত পরিষ্কার করিয়া ফেলা না হয় তাহা হইলে গ্রীস দেশের সেই রাজার আস্তাবলে সঞ্চিত জঞ্জালের মত দেহের মধ্যেও এত বেশী আবর্জ্জনা সঞ্চিত হইবে যে সেই ময়লা দূর করিবার জন্য চিকিৎসককে হারক্যুলেসের মত অমানুষিক বলসম্পন্ন হইতে হইবে।

আপনি এক গেলাস জল আর খানিকটা গুঁড়া নূন নিন। গ্লাসের জলে গুঁড়া নূন অল্পে অল্পে আস্তে আস্তে ঢালিতে থাকুন। দেখিবেন নূন গলিয়া গিয়া জলের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে। গেলাসের ভিতর নূন দেখা যায় না—কেবল স্বাদে বুঝা যায় জলে নূন

মিশ্রিত আছে। ঐ ভাবে নুন ঢালিতে ঢালিতে দেখিবেন নুন আর জলে গলিয়া যাইতেছে না—তলায় গিয়া জমিতেছে। নুন জলে দিলে গলিয়া যায় ইহা আপনি আগেই জানিতেন। এখন গেলাসের জলে নুন মিশাইয়া সেটা প্রত্যক্ষও করিলেন—খানিকক্ষণ নুন জলে গলিয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। তার পর আর গলিল না। ইহার কারণ কি। কারণ আর কিছুই নয়—পাঁচ ভাগ জলে এক ভাগ নুন সম্পূর্ণ গলিয়া যাইতে পারে তার বেশী আর পারে না। গেলাসে যে পরিমাণ জল আছে তাহার এক পঞ্চমাংশ নুন সহজেই জলে গলিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়াছে। এখন যে নুনটা অদ্রবীভূত রহিয়াছে তাহা ঐ এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত অংশ। অবশ্য জল গরম করিয়া লইলে আরও কিছু নুন দ্রবীভূত হইতে পারে কিন্তু জল শীতল হইলেই ঐ এক পঞ্চমাংশের অতিরিক্ত অংশ জমিয়া গিয়া আকার ধারণ করিয়া দৃষ্টি গোচর হইবে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে জলের নুন গলাইবার শক্তি সীমাবদ্ধ।

দেহের মধ্যে আবর্জ্জনা জমিতে জমিতে অবশেষে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যখন শরীর আর উহা ধারণ করিতে পারে না। তখন শরীর কর্ম্মে অক্ষম হইয়া পড়ে এবং খোস পাঁচড়া চুলকানি প্রভৃতি চর্ম্ম রোগের আকারে ঐ সকল আবর্জ্জনা বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করে। শরীর ক্লান্ত বোধ হওয়া আলস্য বোধ করা দৈনন্দিন নিত্য কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি প্রভৃতি এইরূপ অতিরিক্ত আবর্জ্জনা জমিবার বাহ্য লক্ষণ। রক্তে যে যে উপাদান থাকিলে শরীর লঘু চঞ্চল কর্ম্মক্ষম সতেজ থাকে—তখন সেই সকল উপাদানের পরিমাণ কমিয়া যায়। এ সময়ে কোন কাজ করিতে গেলে বড় ক্লান্তি বোধ হয়। এ সময়ে ক্ষুধা হ্রাস হয়। বুদ্ধিমান লোকেরা এই সময়েই সতর্ক হয়। তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্ধারিত খাদ্য আহারের জন্য ব্যস্ত না হইয়া বরং ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত আহার বন্ধ রাখে। কিন্তু আপামর সাধারণ লোকে খাদ্যে বঞ্চিত হইবার ভয়ে তাড়াতাড়ি ডাক্তারখানায় ঔষধ সেবন করিতে যায়। তাহারা ডাক্তারের কাছে গিয়া নানা ছন্দে বলিতে থাকে—কিছু ক্ষিদে হচ্ছে না—যাতে ক্ষিদে হয় এমন কোন ঔষধ দিন। কিন্তু ইহা তাহাদের মহা ভ্রম। স্বাভাবিক ভাবে ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া সত্ত্বেও যাহারা আহারে বিরত হয় না তাহাদিগের শরীরে বেশী পরিমাণে আবর্জ্জনা জমিতে থাকে। দেহে আবর্জ্জনার আধিক্যই ক্ষুধামান্দ্যের প্রধান কারণ। তাহার উপর আরও খাইলে আবর্জ্জনার আধিক্য না ঘটিয়াই পারে না। ফলে উপবাস করিলে যে ক্ষেত্রে অল্প চেষ্টাতেই শরীর পুনর্বার সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম হইতে পারিত, সে ক্ষেত্রে ইচ্ছা করিয়া গুরুতর পীড়া আহ্বান করিয়া আনা হয় মাত্র।

আহারের দোষগুণ।

গোগ্রাসে কতকগুলা খাবার জিনিস গিলিয়া উদর পূর্ণ করাই আহার করা নহে। আহার ব্যাপার একটা আর্ট এবং তাহার পিছনে তাহাকে সুপরিচালিত করিবার জন্য একটা বিজ্ঞানও রহিয়াছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে উপযুক্ত খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া তাহা উত্তমরূপে পাক করিয়া সুপ্রণালীতে আহার করাই আর্ট।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার করা বিজ্ঞানসম্মত নহে। খাদ্য এমন বিজ্ঞানসম্মত ভাবে নির্ব্বাচন করা উচিত যাহাতে দেহের পুষ্টিসাধন হইয়া জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। খাদ্যে শরীরের পুষ্টিকর পদার্থ না থাকিলে তাহা যত মূল্যবান ও মুখরোচক হউক না কেন তাহা অখাদ্য। কারণ তাহাতে খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য ত সিদ্ধ হয়ই না পরন্তু দেহ অনাবশ্যক ও অনর্থক ভারাক্রান্ত হয়।

খাদ্য খুব নরম হওয়া ভাল নয়। কারণ সে খাদ্য চর্ব্বণ করিবার প্রয়োজন হয় না কাজেই তাহাতে লালা মিশ্রিত হইয়া হজম করিতে সহায়তা করে না। গোগ্রাসে গেলা গোরুর পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে কারণ তাহাদের ভুক্ত খাদ্য রোমন্থন করিবার অভ্যাস আছে। কিন্তু মানুষ যখন ভুক্ত খাদ্য উদর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া রোমন্থন করিতে পারে না তখন গোগ্রাসে গেলা মানুষের উপযুক্ত নয়। মানুষকে

খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া তবে তাহা উদরস্থ করিতে হয়।

খাদ্য চর্ব্বণ করিবার জন্য মানুষ মাত্রেরই দুই পাটীতে ৩২টা দন্ত আছে। কিন্তু সভ্য সমাজে খাদ্য দ্রব্য এমন ভাবে তৈয়ার করিয়া লওয়া হয় যে অধিকাংশ খাদ্যই চর্ব্বণ করিবার প্রায় দরকারই হয় না। খাদ্য চর্ব্বণ করিবার দরকার না থাকায় ব্যবহারাভাবে অকালে দন্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সেই জন্য সভ্য সমাজে দন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব এত বেশী। দন্ত চিকিৎসকের সংখ্যা ক্রমাগতই বাড়িয়া চলিয়াছে। দন্ত রোগের বাহুল্যের ইহাই একাট্য প্রমাণ। এবং নরম খাদ্য ভক্ষণই দন্ত রোগের বাহুল্যের প্রধান কারণ।

আবার খাদ্য নির্ব্বাচনেও যথেষ্ট ত্রুটি দেখা যায়। অধিকাংশ খাদ্যেই অস্থি সংগঠনের উপাদানের অভাব। সেই কারণে দন্ত তেমন সুদৃঢ় ও দৃঢ় হইতে পারে না তাহার উপর চর্ব্বণের আবশ্যকতার অভাব। সুতরাং দন্ত রোগ যে বাড়িয়া যাইবে তাহা আর বিচিত্র কি। খাদ্য দ্রব্য এমন হওয়া উচিত যাহা রীতিমত চর্ব্বণ করা ব্যতীত কোন ক্রমেই উদরস্থ করা সম্ভব নহে। তাহা হইলে দন্ত রোগের বাহুল্য অচিরে কমিয়া যায় দন্ত রক্ষার জন্যও অসাধারণ প্রয়াস পাইতে হয় না। কঠিন খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইলে কেবল যে দন্তের ব্যায়াম হয় তাহা নহে—দন্ত পরিষ্কারও থাকে। কারণ চর্ব্বণ করিবার কালে মুখের ভিতর স্বভাবতই জীবাণুনাশক রসের সঞ্চার হয়। তাহাই দন্তকে পরিষ্কার রাখে এবং জীবাণু বিনাশ করে।

পীড়িত হইবার পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া আসন্ন পীড়ার কথা জানিতে পারিলে রোগ নিবারণের অন্তত তাহার তীব্রতা হ্রাসের যে যথেষ্ট সুবিধা হয় সে কথা বলাই বাহুল্য। ইহাতে অনেক কষ্টের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে। ইহাতে আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা করা যায়। খাদ্যের অপব্যবহার এবং আহার প্রণালীর নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িবার লক্ষণ দেখা গেলে দুই এক দিন উপবাস দিয়া গুরুতর পীড়ার হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে। ইহা কম লাভ নহে।

ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে সকাল বেলা উঠিয়া চা পান কিম্বা প্রাতরাশ ভোজন না করাই উচিত। অক্ষুধার উপর আহার করার অর্থ—পাকস্থলীকে অনাবশ্যক ভারাক্রান্ত করা। এবং ইহার ফল কখনও ভাল হয় না। আহার বিষয়ে পাকস্থলীর মত সুপরামর্শদাতা আর কেহই নহে। আহারের প্রয়োজন হইলে ক্ষুধার সঞ্চার করিয়া পাকস্থলীই তাহা জানাইয়া দেয়। আহারের প্রয়োজনাভাব থাকিলে পাকস্থলী খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করে। বুদ্ধিমান লোকে পাকস্থলীর এই মহামূল্য উপদেশে কখনও উপেক্ষা প্রদর্শন করে না। পাকস্থলীর উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আহার করিয়া পীড়িত হওয়া বুদ্ধিমানের লক্ষণ নহে। পাকস্থলী যখন খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক থাকে তখন ভাল খাদ্যেও রুচি হয় না। সেই জন্য আমাদের দেশে একটা কথা চলিত আছে যে পেট ভার থাকিলে মোণ্ডা তিত লাগে। খাইতে বসিয়া যদি তুমি দেখ যে খাদ্য ভাল লাগিতেছে না তাহা হইলে তাহা খাইও না, জোর করিয়া খাইলে অসুখ না হইয়া যায় না।

খাদ্যে যখন সম্পূর্ণ রুচি হইবে তখন জানিবে পাকস্থলীও খাদ্য গ্রহণ ও জীর্ণ করিতে প্রস্তুত। রুচি পূর্ব্বক আহারে যত আনন্দ পাইবে খাদ্য তত সুন্দর ভাবে জীর্ণ হইবে। আহার কালীন আনন্দের দরুণই যথেষ্ট পরিমাণে পাচক রস বহির্গত হয়। পাচক রস যথেষ্ট পরিমাণে বাহির হইলে খাদ্যও যে সুজীর্ণ হইবে ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা।

কিন্তু আহারের সময় উপস্থিত হইলে ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও বা খাদ্যে রুচি না হইলেও কেবল প্রথা আছে বলিয়া যদি খাওয়া যায়, তাহা হইলে সে খাওয়ায় কোন উপকার ত নাই ই—বরং সমূহ অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় পাকস্থলী খাদ্য গ্রহণে ও জীর্ণ করিতে প্রস্তুত থাকে না। সুতরাং তখন খাদ্যের কি দশা ঘটিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। ঐ খাদ্য

পাকস্থলীতে পড়িয়া থাকিয়া পেট ভার করিয়া রাখিবে কার্য্যে কোন উৎসাহ থাকিবে না। এ সময়ে প্রত্যেক কোঠা রক্ত আবর্জ্জনায় পূর্ণ থাকে। এই আবর্জ্জনার ফলে শরীর ম্যাজম্যাজ করে কিছুই ভাল লাগে না। অনিচ্ছায় শরীরের প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলেই ইহা ঘটিয়া থাকে।

রোগ যাহাতে না আসিতে পারে এই উদ্দেশ্যে যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত আহার করিয়ো না। সাধারণ পুষ্টিকর খাদ্য রুচি না জন্মিলে খাইয়ো না।

খাদ্য গ্রহণে অন্যান্য অনেক রকমের ভুলও অনেকের হয়। কেবল পুষ্টিকর খাদ্য ভক্ষণে যথার্থ আহার করা হয় না। খাদ্যের মধ্যে এমন বস্তু থাকা দরকার যাহা হজম হয় না অথচ নিজের ভারে শরীরের আবর্জ্জনা বহন করিয়া বাহির করিয়া লইয়া যায়। ইহাতে বাহ্যে খোলসা হইয়া শরীর হাল্কা হইয়া যায়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে আমিষ খাদ্য অপেক্ষা উদ্ভিজ্জ খাদ্যই সমধিক উপযোগী। ইহাতে যেমন পুষ্টিকর পদার্থ থাকে তেমনি বাজে জিনিসও অনেক থাকে। যাহা পুষ্টিকর তাহা শরীরে শোষিত হয় যাহা বাজে তাহা বাহির হইয়া গিয়া পেট খোলসা রাখে।

রন্ধনের দোষগুণ।

বিলাতের লোক উদ্ভিজ্জ খাদ্য খাইতে জানে না। তাহারা আলু প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া জলটা ফেলিয়া দেয়। ঐ জলের সঙ্গে তরকারীর পুষ্টিকর পদার্থ ও সদংশ বাহির হইয়া যায়। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা ছিবড়ে ও অখাদ্য। তাহারা তাহাই খায়। আমাদের দেশে খাবারের দোকানে আলু সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিয়া খোসা ছাড়াইয়া আলুর দম রান্না হয়। ইহা অখাদ্য। কিন্তু গৃহস্থ ঘরে আলুর খোসা ছাড়াইয়া ধুইয়া সাঁতলাইয়া আলুর দম রান্না হয়। এই জন্য তাহা অনেকটা পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। যদি খোসা না ছাড়াইয়া খোসাশুদ্ধ আলু ভাল করিয়া ধুইয়া একটু খানি চিরিয়া যথানিয়মে আলুর দম রান্না হয় তাহা হইলে আরও ভাল হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ভাত রান্নার প্রণালী ভাল নয়। অনেক বেশী জল দিয়া ভাত রাঁধিয়া ফ্যান ফেলিয়া দিয়া ভাত খাওয়া ভুল। পরিমাণ মত জল দিয়া ভাত রাঁধিলে ভাতও সিদ্ধ হয় অতিরিক্ত জলও মরিয়া যায়—ফ্যান ফেলিতে হয় না। সেই ভাতই বৈজ্ঞানিক হিসাবে সুখাদ্য। অন্যান্য তরকারী রাঁধিবার প্রথা আমাদের দেশে বিলাত অপেক্ষা অনেক ভাল। তবে ঘী গরমমশলা কম ব্যবহার করিলে ভাল হয়। অনেক রাঁধুনির বিশ্বাস তরকারীতে যত বেশী ঘী মশলা দেওয়া হইবে রান্না তত উৎকৃষ্ট হইবে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তরকারীতে ঠিক পরিমাণ মত মশলা ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট। অতিরিক্ত মশলা ব্যবহার অপচয়ও বটে অনিষ্টকরও বটে। যদি কোন আনাজ তরকারী সিদ্ধ করিয়া লইয়া রাঁধিতে হয়, তাহা হইলে এমন পরিমাণ মত জল দিতে হয় যে তরকারীও সুসিদ্ধ হয় অথচ জলটুকুও মরিয়া যায়।

আমাদের দেশে রন্ধনার্থ যে সমস্ত আনাজ তরকারী ব্যবহৃত হয় তাহার প্রত্যেকটির এক একটী বিশেষ গুণ আছে। সুতরাং যে সময়ের যে তরকারী সে সময়ে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া উচিত। তাহাতে উপকারই হইয়া থাকে।

সাধারণের ভ্রান্ত বিশ্বাস।

সাধারণ লোকে পীড়িত হইলে মনে করে, সে অসুস্থ হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত বিশ্বাস। বস্তুতঃ রোগ তাহার শরীরে অনেক দিন পূর্ব্বেই প্রবেশ করিয়াছে। এখন যাহাকে সে রোগ মনে করিতেছে, তাহা তাহার অসুস্থতার একটা বাহ্য লক্ষণ মাত্র। শরীরের ভিতর রোগ প্রতিষেধক যে স্বাভাবিক শক্তি আছে সেই শক্তির ক্রিয়ার ফলে রোগ আরোগ্যের প্রয়াসের ফলেই এই লক্ষণের উৎপত্তি। তথাকথিত' রোগ (অর্থাৎ প্রকৃত রোগের বাহ্য লক্ষণ) দেখা দিলেই বুঝিতে হইবে রোগের স্বাভাবিক চিকিৎসা আরম্ভ হইয়াছে। ডাক্তার এবং ঔষধ সেই স্বাভাবিক নিরাময় কার্য্যকে সাহায্য করে মাত্র। শরীরের ভিতর আবর্জ্জনা জমিতে জমিতে যখন তাহার পরিমাণ শরীরের পক্ষে অসহ্য হইয়া পড়ে তখন প্রকৃতি সেই সব আবর্জ্জন

বাহির করিয়া দিতে আরম্ভ করে। তাহারই ফলে বাহিরে রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের নিয়ম লঙ্ঘনের ফলেই অসুখ করে। অসুখ করিলেই পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিতে বাধ্য হইতে হয় এবং নিয়ম লঙ্ঘনও বন্ধ করিতে হয়। তখন শরীর পরিষ্কার করার কাজ ময়লা দূর করার কাজ সহজ হইয়া আসে। তাহা না হইয়া যদি আহার বিহার সমান ভাবেই চলে তাহা হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য। অতএব রোগ বরং আমাদের হিতৈষী বন্ধু। উহা প্রকৃতির সতর্কতার ইঙ্গিত। কারণ রোগই রক্ত পরিষ্কারের সদুপায়। উহাই প্রকৃত পক্ষে আমাদের জীবন রক্ষক। ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে অবশ্য দুই একটা ক্ষেত্রে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও যে ঘটে না এমন নহে। সাধারণতঃ শরীর যখন আপনাকে পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করে, তখনই সেই প্রণালী রোগের আকারে বাহিরে দেখা দেয়। শরীর পরিষ্কারের স্বাভাবিক প্রণালীকে ঠিকমত সাহায্য করাই সুচিকিৎসা। তাহার ফলে শীঘ্রই এই কার্য্যটি সাধিত হইয়া যায়। কিন্তু কুচিকিৎসা হইলে ভুল ঔষধ ব্যবহৃত হইলে, স্বভাবের এই রোগ নিরাময়ের প্রণালীতে ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়া অবস্থা গুরুতর হইয়া উঠে।

এখন তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্য এই যে রোগ আসিবার পূর্ব্বেই তাহার আসন্ন আগমন সংবাদ যাহাতে জানিতে পারা এবং সতর্ক হইতে পারা যায় এমন ভাবে জ্ঞান অর্জ্জন করা। রোগের লক্ষণ জানিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ জানিতে পারা অধিকতর ফলপ্রদ। তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক হইয়া রোগের আগমন নিবারণ করা যায় অন্তত তাহার তীব্রতা কমানো যায়।

অনেকে জল খুব কম পান করেন। ইহা ভাল অভ্যাস নয়। যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করিলে রক্ত তরল থাকিয়া সহজ প্রবাহিত হয় এবং শরীরের ময়লাও বাহির হইয়া যাইতে পারে। এই জন্য যথেষ্ট জল পানের অভ্যাস থাকা ভাল। জলের পরিবর্ত্তে প্রচুর তরল খাদ্য ভক্ষণেও কতকটা এই কাজ হয়। নানা বিধ ফলের রস এ পক্ষে খুব হিতকর। বিবিধ ফলের সিরাপ বা সরবৎ পান করিলেও খুব উপকার পাওয়া যায়।

মূলত খাদ্যের সুস্বাদ (মশলা সহযোগে কৃত্রিম সুস্বাদ নহে—স্বাভাবিক সুস্বাদ) খাদ্য গ্রহণ প্রণালী নিয়ন্ত্রণের পক্ষে আমাদের প্রধান পথ প্রদর্শক। যে স্বাভাবিক খাদ্য যতটা সুস্বাদ তাহা ই আমাদের শরীর পোষণের পক্ষে ততটা হিতকর। সুন্দর ভাবে পাক করা পুষ্টিকর খাদ্য সকল সময়েই সুস্বাদু হইয়া থাকে। নানাবিধ মশলা দেওয়া খাদ্য খাইতে ভাল লাগিলেও এই কৃত্রিম স্বাদ খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য সাধনে একটুও সাহায্য করে না।

অতএব এই কথাগুলি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে (১) যদি ক্ষুধা না থাকে (২) যদি গা ম্যাজ ম্যাজ করে আলস্য বোধ হয় (৩) যদি বাহ্যে ভাল খোলসা না হয় (৪) যদি মেজাজ রুক্ষ থাকে কিম্বা মনে ইতস্তত ভাব থাকে (৫) যদি সুনিদ্রা না হয় (৬) যদি মাথা ঘুরে কিম্বা শরীর কি পেট ভার ভার বোধ হয় তাহা হইলে তাহার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করিবে। যদি অতি ভোজনের ফলে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায় তাহা হইলে আহারে সংযম অতীব আবশ্যক। প্রকৃত ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত উপবাস দিলে খুব সুফল পাওয়া যায়। যদি ঐ সকল লক্ষণ জল কম খাওয়ার দরুণ উপস্থিত হইয়া থাকে বলিয়া অনুমিত হয় তাহা হইলে যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করিতে হইবে। যদি মশলাযুক্ত গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণে এই সকল লক্ষণ জন্মিয়া থাকে তবে শাক সব্জী ও ফলমূল বেশী করিয়া খাইতে হইবে। যদি ব্যায়ামের অভাব এই সকল লক্ষণ উৎপন্ন করিয়া থাকে তবে দীর্ঘ পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিলে উপকার পাওয়া যাইবে।

স্বাস্থ্যধর্ম্ম ও স্বাস্থ্যসেবক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ অধ্যায

স্বাস্থ্যজ্ঞান

এখন বেশ বুঝা গেল যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করা সর্ব্ব সাধারণের পক্ষেও কত বেশী দরকার। স্বাস্থ্যজ্ঞান রীতিমত অর্জ্জন করিতে হইলে মনকে সেই শিক্ষা লাভের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা দরকার অর্থাৎ স্বাস্থ্যজ্ঞান লাভার্থ মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ জন্মানো চাই। মনের এই অবস্থা যে কেবল স্বাস্থ্যজ্ঞান লাভের ক্ষেত্রেই হওয়া দরকার তাহা নয়—সকল প্রকার শিক্ষ ক্ষেত্রেই মনকে এই ভাবে প্রস্তুত করিয়া লইতে হয় তবেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করা যায়। নচেৎ শিক্ষার বনীয়াদ দৃঢ় হইবে না। একলব্যের মত একনিষ্ঠ সাধনা ব্যতীত জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে সফলতা লাভের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান লাভের গোড়ার কথা—আত্মানুসন্ধান। আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই আজ হউক বা দুই দিন পরেই হউক আত্মচরিত্রের অনেক ত্রুটি ধরা পড়িয়া যাইবে। স্বাস্থ্যের সম্পর্কে এই অনুসন্ধানের ফলে স্বাস্থ্যগত ত্রুটির কথা জানা যাইবে। কিন্তু কেবল জানিলে বা তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলেই যথেষ্ট হইবে না। কেবল কৌতূহল চরিতার্থ করা এই অনুসন্ধানের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কোন্ বিষয়ে স্বাস্থ্য আশানুরূপ উন্নত বা সুন্দর নহে তাহা জানিতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংশোধনের উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

কাহারও সামনে একটা কল চলিতেছে, বেশ চলিতেছে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মধ্যে মধ্যে চলার গোলমাল হইতে লাগিল। তখন কলের চালক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল—কেন চলার ব্যাঘাত ঘটিতেছে। অনুসন্ধানে যখন গোলযোগের কারণ ধরা পড়িল, তখন সে তাহা সংশোধন করিয়া দিল। তখন আবার কল রীতিমত চলিতে লাগিল। শারীর যন্ত্রের ক্রিয়া যতক্ষণ স্বাভাবিক ভাবে চলিবে কোন গোলমাল হইবে না ততক্ষণ স্বাস্থ্য ঠিক অবস্থায় আছে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু যখন দেখা যাইবে যে শারীর যন্ত্রের সকল অংশের ক্রিয়া ঠিকমত চলিতেছে না কোন কোন যন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিতেছে তখন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া ফেলিতে হইবে। কল চলিবার সময় যদি কয়লা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় নূতন কয়লা না দেওয়া হয় তাহা হইলে কল চলা বন্ধ হইয়া যাইবে। চরকায় যদি ঠিকমত তৈল না দেওয়া হয় তবে হয় চরকা চলিবে না আর না হয় বড় বেশী শব্দ হইবে। তখন চরকায় তৈল দিয়া ঠিক করিয়া লইলে চরকা আবার ঠিকমত চলিবে। শরীররূপ কলের সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। শারীর যন্ত্রের কার্য্যক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইলে তাহা সংশোধন করিয়া তাহাদিগকে পুনরায় কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে। এই কাজটি উপযুক্ত ভাবে করিবার জন্য স্বাস্থ্য জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক।

পঞ্চম অধ্যায

ভগবানের কলকারখানা।

মানুষ বুদ্ধিবলে কত রকমের কলকারখানা তৈয়ার করিয়াছে। তাহার কোনটা সরল, কোনটা জটিল কোনটা মোটামুটি ধরণের কোনটা অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু শ্রীভগবান মানুষের দেহরূপ এই যে কলটির সৃষ্টি করিয়াছেন ইহার মত জটিল, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলের ধারণাও মানুষ করিতে পারে না। শরীরকে কল বলিয়া ধরিয়া লইলে নূতন স্বাস্থ্য শিক্ষার্থীর অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। মানুষের তৈয়ারী অটোম্যাটিক

কলের এক অংশের সঙ্গে অপর অংশের যেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে ভগবানের তৈয়ারী এই দেহ যন্ত্রের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। দেহ যন্ত্রের স্থূল সূক্ষ্ম অংশগুলি ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে উপযুক্ত অবস্থায় থাকিলে দেহযন্ত্রের কাজ বেশ সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহ হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেহযন্ত্র ও মোটর গাড়ী।

দেহযন্ত্র কিরূপ অবস্থায় থাকা উচিত এবং তাহার কাজ কিরূপ ভাবে চলা উচিত তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য মোটর গাড়ীর দৃষ্টান্তটিই লওয়া যাউক। মনে করুন একজনের একখানি মোটর গাড়ী আছে। সে তাহার গাড়ীখানি সর্ব্বদা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখে। গাড়ীর রং মলিন হইয়া গেলে কিম্বা চটিয়া গেলে আবার নূতন করিয়া রং করাইয়া লয়। মোটের উপর সে তাহার গাড়ীর কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্যের দিকেই লক্ষ্য রাখে। গাড়ীর কলকব্জা ঠিক অবস্থায় আছে কি না কোন অংশ ভাঙ্গিয়া কিম্বা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে কি না কলকব্জাগুলিতে ঠিকমত তৈল দিয়া কার্য্যক্ষম অবস্থায় রাখা কলকব্জার ভিতর ময়লা জমিয়া আছে কি না এ সকল বিষয়ে তাহার কোনই লক্ষ্য নাই।

আর একজনের আর একখানি মোটর গাড়ী আছে। সে তাহার গাড়ীর বাহ্য সৌন্দর্য্যের দিকে তাদৃশ লক্ষ্য না রাখিলেও তাহার যন্ত্রতন্ত্রগুলির উপর বিলক্ষণ তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। কোন যন্ত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে মিস্ত্রীখানায় পাঠাইয়া ঐ অকর্ম্মণ্য অংশটির বদলে নূতন অংশ বসাইয়া লওয়া কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা মেরামত করানো বা বদলাইয়া দেওয়া যন্ত্রগুলি যথাবিহিত ভাবে তৈলসিক্ত করিয়া রাখা ভিতরে ময়লা জমিলে পরিষ্কার করিয়া ফেলা—প্রভৃতি বিষয়ে সে সর্ব্বদাই খুব অবহিত থাকে। এই দুইজনের দুইখানি গাড়ীর মধ্যে কোন্‌টি বেশী কর্ম্মক্ষম—কোনটী অপরটির অপেক্ষা বেশী দূর দৌড়াইতে সমর্থ—ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হয় না। যে কলকব্জা ঠিক অবস্থায় রাখিবে তাহার গাড়ীই বেশী চলিবে। যে কেবল বাহ্য সৌন্দর্য্য লইয়াই ব্যস্ত আছে তাহার গাড়ী কখন যে অচল হইয়া পড়ে তাহার কিছুই ঠিক নাই।

জীবন যাত্রার পথে মানুষ গাড়ীরও ঠিক এই অবস্থা। অনেক লোকে খুব সৌখিন। সে কেবল তাহার সাজ পোষাকের উপর দৃষ্টি রাখে। কিসে তাহাকে ভাল দেখায় ইহাই তাহার একমাত্র কামনা। এজন্য যাহা কিছু করিতে হয় সে দিকে তাহার কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু দেহের ভিতরের যন্ত্রগুলির দিকে তাহার আদৌ দৃষ্টি নাই। যন্ত্রগুলি ঠিক কর্ম্মক্ষম অবস্থায় থাকে কি না তাহা সে গ্রাহ্যই করে না।

আবার আর একজন লোক। সে বাহ্য সৌন্দর্য্যের উপাসক নহে। সে তাহার শরীরের বাহির ও ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিয়াই সন্তুষ্ট। সৌখিন সাজ পোষাক পরিয়া বাহার দিবার ইচ্ছা তাহার আদৌ নাই। কিন্তু দেহের ভিতরকার যন্ত্রগুলি সর্ব্বদা ঠিক কর্ম্মক্ষম অবস্থায় থাকে কি না, সে দিকে তাহার প্রখর দৃষ্টি আছে। কোন দেহযন্ত্র একটু বিকৃত হইয়াছে সন্দেহ হইলেই সে দেহযন্ত্রের মিস্ত্রী ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় কিম্বা মিস্ত্রীখানায় অর্থাৎ হাসপাতালে চলিয়া যায়। বিকৃত দেহযন্ত্র সম্পূর্ণ মেরামত অর্থাৎ সুস্থ না হইলে সে কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না। এখন জীবন যাত্রার পথ যাত্রী এই দুই ব্যক্তির অবস্থার তুলনা করুন্। কোন ব্যক্তি আপনার সমধিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে তাহাও কি আপনাকে বলিয়া দিতে হইবে। মোটর গাড়ী খানিকে ঠিকমত অবস্থায় রাখিতে হইলে মোটরের ভিতরকার যন্ত্র তন্ত্র সম্বন্ধে তাহার অধিকারীর মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক যাহাতে সে উহার কোন বিকৃতি ঘটিবার সম্ভাবনা হইলে তাহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মিস্ত্রী লাগাইয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইতে পারে। মানুষ গাড়ীকেও জীবন যাত্রার পথে দীর্ঘপথ ভ্রমণের উপযোগী করিয়া রাখিবার জন্য প্রত্যেক মানুষেরই দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র তন্ত্র দির ও তাহাদের কার্য্য প্রণালীর সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

সপ্তম অধ্যায়

অজ্ঞতার অশেষ দোষ

শারীব যন্ত্রের সংস্থান, তাহাদের ক্রিয়া, তাহাদের কর্ম্মক্ষম অবস্থা বা অকর্ম্মণ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান না থাকিলে মানুষকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হয়। শরীরের কোন যন্ত্র বিকল হইলে সে একেবারে অসহায় হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য তাহা সে নিজে স্থির করিতে না পারিয়া অপরের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে। এবং যে যাহা পরামর্শ দেয় তাহাই নির্ব্বিচারে বিশ্বাস কবিয়া তদনুসারে কাজ করিবার চেষ্টা করে। পরামর্শ ভাল কি মন্দ, তাহাতে তাহার হিত কিম্বা অহিত হইবে—কিছু জানা না থাকায় সে তাহা স্থির কবিতে পারে না। সাধারণত মানুষ এইরূপ অজ্ঞ বলিয়া পেটেণ্ট ঔষধের ব্যবসাটি ভাল চলে। কারণ পেটেণ্ট ঔষধওয়ালারা তাহাদের পেটেণ্ট ঔষধের শতমুখে এমন সুখ্যাতি কবিয়া থাকেন যে তাহা পড়িয়া অজ্ঞ লোকের তাহাতে অবিশ্বাস করা খুবই কঠিন হয়। কেবল পেটেণ্ট ঔষধ ব্যবহার করা নয়—সকল লোকের সকল প্রকার কু পরামর্শই সে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করে। সকল লোকে তাহাকে একই রকম পরামর্শ দেয় না বা দিতে পারে না। এই সকল পরামর্শের পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যও থাকে না। সুতরাং আজ হয়ত এক জনের পরামর্শ শুনিয়া সে যে কাজ করিল কাল অপর লোকের পরামর্শে সে হয় ত ঠিক তাহার উল্টা কাজ করিয়া বসিবে। এইরূপে সে একের পর আর একটা কাজ এমন ভাবে করিয়া যাইতে থাকে যে, তাহার চালচলন প্রায় উন্মাদ লোকের মতন হইয়া দাঁড়ায়।

অষ্টম অধ্যাব

স্বাস্থ্যসেবকের দায়িত্ব।

যাহারা রোগীর সেবারূপ মহৎ ব্রত গ্রহণ করিবেন—রোগীর প্রতি তাঁহাদের যেমন দায়িত্ব থাকিবে, নিজের প্রতিও তাঁহাদের সেইরূপ একটা কর্ত্তব্যের দায়িত্ব থাকিবে। সেই কর্ত্তব্য পালনে যেমন দায়িত্ব আছে, সেইরূপ অসীম আনন্দও আছে। সেবাধর্ম্ম ঠিকমত পালন করিতে হইলে কি করিয়া সেবা করিতে হয় তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। কি কি কারণে স্বাস্থ্য ভাল থাকে তাহা সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিয়া লইতে হইবে। তৎসহ নিজের আচার ব্যবহার ও অভ্যাসগুলিকে সেই অভিজ্ঞতার সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইবে। তাছাড়া, ভিন্ন ভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকমের সেবার দরকার হইবে। সেই সকল বিভিন্ন অবস্থায় কি কি করা দরকার তাহাও তাঁহাকে শিক্ষা করিতে হইবে। এই সকল শিক্ষা করিতে যত যে আনন্দ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কত পীড়িত ব্যক্তি সেবকের সেবার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে। কত রোগী রোগের যাতনায় ছট্‌ফট করিতে করিতে সেবক সেবিকার প্রতীক্ষা করিবে—যন্ত্রণার একটু লাঘবের জন্য, দুইটা সহানুভূতির, আশ্বাসের মিষ্ট বাণী শুনিবার জন্য। কেবল সময়ে ঔষধ ও পথ্য দেওয়াই সেবকের কাজ নয়। জীবনে হতাশ্বাস রোগীকে আশ্বাস, আশা, ভরসা দেওয়া সেবকের কাজ। কথায় কাহিনী রোগীকে গল্প বলিয়া প্রীত রাখিতে হয়। স্বল্প ত্রুটিতে বিরক্ত উগ্র প্রকৃতির রোগী রোগের যন্ত্রণায় আরও খিটখিটে হইয়া উঠিয়া থাকে। তাহার সেবার সময় সেবককে নিজের মন সর্ব্বদা ঠাণ্ডা রাখিয়া সংযত ভাবে কাজ করিতে হয়। রোগী তাঁহাকে বিরক্ত করিলেও তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া রোগীর মন যাহাতে প্রসন্ন হয় ও থাকে তাহা করিতে হইবে। বিকারগ্রস্ত রোগী কোন অসম্ভব দাবী করিয়া বসিলে শিশুর ন্যায় তাহাকে নানা উপায়ে ভুলাইতে হয়। সেবককে সর্ব্বাগ্রে নিজেকে এই ভাবে তালিম দিয়া তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। তিনি হইবেন প্রিয়দর্শন, মিষ্টভাষী সংযত-চরিত্র, সহিষ্ণু, রিপুজয়ী, সহানুভূতিপরায়ণ উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সেবানিপুণ। কেবল অর্থের খাতিরে নহে কেবল শুষ্ক কর্ত্তব্যের খাতিরে নহে—মানবতার খাতিরে—বিশ্বপ্রেমের খাতিরে—

তিনি মনে প্রাণে হইবেন সেবক। অনেক বিরক্তিকর ব্যাপারের সংস্রবে তাঁহাকে আসিতে হইবে। সেবা কার্য্যে কোনরূপ ভুলচুক হইলে রোগীরও সর্ব্বনাশ—সেবকেরও সর্ব্বনাশ। সর্ব্বোপরি সেবকের নিজের শরীর সর্ব্বদা সুস্থ রাখিতে হইবে। নিজের শরীর সুস্থ রাখা সেবকের সর্ব্বাপেক্ষা সেবা দক্ষতার পরিচয়। ডাক্তার রোগীর লক্ষণ দেখিয়া রোগীর শরীর ও রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াই খালাস। কিন্তু রোগীকে বাঁচাইবার প্রকৃত ভার সেবকের উপর। রোগীর শরীর ও মন স্বচ্ছন্দে রাখা তাঁহার কাজ। এই কাজটি যিনি যে পরিমাণ সফলতার সহিত করিতে পারিবেন তিনি সেই পরিমাণে দক্ষ সেবক। কেবল কতকগুলা সেবা তত্ত্বের শুষ্ক মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলে উৎকৃষ্ট সেবক হওয়া যায় না। সেবাধর্ম্ম ও সেবাকার্য্যের অন্তরতম গূঢ় মর্ম্মটি তাঁহার জানা থাকা আবশ্যক। যে অবস্থায় যাহা করা হইতেছে তাহার কারণ কি—কেন তাহা করা হইতেছে এটা জানা না থাকিলে সকল সময়ে সকল কাজ সুশৃঙ্খল ভাবে করিয়া উঠা যায় না। পুঁথিগত বিদ্যার যেখানে কুলায় না এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িলে অনভিজ্ঞ সেবক অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবেন কিন্তু সেবাধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ সেবক সেইরূপ কঠিন অবস্থায়ও একটা না একটা সদুপায় বাহির করিয়া অনেক সময়ে সাংঘাতিক বিপদ কাটাইয়া রোগীর প্রাণরক্ষা ও সেবাধর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে পালন করিতে পারিবেন। এক কথায় বলিতে গেলে সেবকের দক্ষতার উপরেই রোগীর প্রাণ প্রধানত নির্ভর করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও তিনি রোগীর প্রয়োজন বুঝিয়া এমন সুব্যবস্থা করিতে পারেন যাহাতে রোগী অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য লাভ করিতে পারে। সেবকের সেবা কার্য্যের পুরস্কার সেবা। রোগী তাহার প্রাণের জন্য সেবকের সেবা যত্নের কাছে ঋণী—এই বিশ্বাস ও সন্তোষ সেবকের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। 'অর্থের দ্বারা সেবাধর্ম্মের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ হইতে পারে না। চিকিৎসকের উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গেলেই সেবকের কর্ত্তব্য শেষ হইবে না—এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। কারণ রোগীর অবস্থার সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইতে পারে। চিকিৎসক সর্ব্বক্ষণ রোগীর কাছে বসিয়া থাকিয়া এই সকল পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। রোগীর কাছে সর্ব্বক্ষণ থাকিতে হইবে সেবককেই এবং রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তনের ধাক্কা প্রধানত তাঁহাকেই সামলাইতে হইবে, এবং প্রয়োজন বুঝিলে চিকিৎসককে সংবাদ পাঠাইতে হইবে। যিনি এই সকল কাজ যতটা দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিতে পারিবেন তিনিই সেই অনুপাতে যোগ্যতম সেবক।

এই সেবাধর্ম্ম অতি পবিত্র ধর্ম্ম। ইহা সেবকের মনুষ্যত্বের সাধনা। রোগ শোক আধি ব্যাধি পীড়িত এই বিশ্বসংসার। ইহার দুঃখ দুর্দ্দশা যতটা কমাইতে পারা যায় ততটাই মানবতার বিকাশ হইয়া থাকে। যিনি এই বিকাশের সহায়তা করেন সেই সেবক সর্ব্বজনের নমস্য। ভগবান তাঁহার মঙ্গল করেন।

নবম অধ্যায়

স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রয়োগ

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার পর তাহার সুপ্রয়োগ করিতে পারিলেই তবে সেই জ্ঞান অর্জ্জন করা সার্থক হয়। আমাদের দেশে শিক্ষা প্রণালী এমনই অব্যবস্থিত যে বিদ্যালয়ে বা কলেজে যাহা শিক্ষা করা যায় তাহার অধিকাংশ বিষয়ই আমাদের কর্ম্ম জীবনে কোনই কাজে লাগে না। যাহা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার অবসর পাওয়া যায় না সে শিক্ষা লাভ করা না করা সমান। সে শিক্ষা একেবারেই ব্যর্থ। যে জ্ঞান কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় সেই জ্ঞান লাভ করাই সার্থক। কার্য্যে প্রয়োগের দ্বারা লব্ধ জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। যিনি যত্ন করিয়া সেবাধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন তিনি যদি কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ না করেন, কিম্বা প্রয়োগের অবসর না পান, তাহা হইলে সে শিক্ষাও

বৃথা হইয়া যায়। সেবাধর্ম্ম শিক্ষা করিবার পর সেবককে পূর্ণ উৎসাহে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কর্ম্ম করিতে করিতে তিনি নব নব অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন এবং তাহাতে অসীম আনন্দ লাভ করিবেন। শিক্ষা যে যথার্থই লাভ হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা হয় কর্ম্মক্ষেত্র তাহার উপযুক্ত প্রয়োগের দ্বারা। কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে শিক্ষার অসম্পূর্ণতা দোষ, ত্রুটী, ভ্রান্ত শিক্ষা—এ সমস্তই ধরা পড়িয়া যায়। (ক্রমশঃ)

যৌবন-রক্ষা

[শ্রীদুর্গাদাস ঘোষাল।]

যৌবনকাল পরম রমণীয়। জীবনের এই শুভ সন্ধিক্ষণে কোন এক যাদুকরের অজ্ঞাত মোহন দণ্ড প্রভাবে বিশ্বের সকল দৃশ্য পট পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এক অনির্ব্বচনীয় প্রাণোন্মাদক নূতন রঙে সমস্ত জগৎ রঞ্জিত হইয়া উঠে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৈহিক বিকাশের সঙ্গে হৃদয়তন্ত্রী কি যেন এক নূতন সুরে বাজিয়া উঠে—অন্তরের যাবতীয় বৃত্তি পরিপূর্ণ গতিতে উদ্দামভাবে ছুটিতে চায় এবং নূতন আশা নূতন উদ্যম নূতন শক্তি লইয়া এই ক্ষুদ্র প্রাণ অনন্ত বিশ্বের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া কি এক সার্থকতা খুঁজিতে থাকে। মানুষের কামনা সাধনা সকলেরই পরিচালনা ও পরিতৃপ্তির সময় এই। শারীরিক যন্ত্র ও স্নায়ুসমূহের বিশেষ ও শক্তিশালী অবস্থার জন্য এবং মনের বিচিত্রতার নিমিত্ত ভোগ সুখের তীব্র আস্বাদনের সময়ও যেমন এই সুনির্দ্দিষ্টভাবে পরিচালিত হইলে তেমনি সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন ও আত্মানুশীলনেরও ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। এই শক্তি—এই অবস্থাটী হারাইলে মানুষ বড় কিছু করিতে পারে না। যিনি জগতে যত বড় হইয়াছেন, সকলেরই উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার ভিত্তি এই যৌবনে এবং এই সময়েই তাঁহারা জীবনের প্রকৃষ্ট কাজসমূহ করিয়াছেন।

সুতরাং এই যৌবনকাল বাঁধিয়া রাখিতে কাহার না প্রাণে স্বাভাবিক ব্যাকুলতা হয়? কে না ইহার কথা প্রাণের ভিতর তীব্রভাবে অনুভব করে? প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিয়া কে না একবার তৃষিত দৃষ্টিতে ইহার দিকে ফিরিয়া চায়? কিন্তু হায়! আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতাই আছে কিন্তু কাজ নাই। এবং সে জাতীয় চেষ্টাও আমরা জানি না। কৃচ্ছ্র সাধনা বলে বিধি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যৌবনকে চিরদিনের মত বাঁধিয়া রাখা যায় কি না তাহার মধ্যে যদিও কোনরূপ প্রশ্ন থাকে কিন্তু অধ্যবসায়, জ্ঞান ও কর্ম্মপ্রভাবে যৌবনকে যে নির্দ্দিষ্টকালের পরও বহুদিন পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখা যাইতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের বিষয় নাই। কিরূপ জ্ঞানের দ্বারা এবং কি নিয়মে কাজ করিলে আমরা এ বিষয়ে সফলকাম হইতে পারি বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই একটু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

যৌবনকে স্থির ও অবিকৃত রাখার জন্য মন ও চিন্তাশক্তির প্রভাবই সকলের উপর। এইজন্য সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রযত্নে মনকে সর্ব্বদার জন্য এইভাবে তৈয়ারী রাখিবে যে আমি কখনও যৌবন হারাইব না, বৃদ্ধ হইব না। প্রথম যৌবনে আমি যেমন ছিলাম তেমনটাই আছি আমার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই বা ঘটিতে পারে নাই। দিন, মাস বছর চলিয়া যাইবে কিন্তু নিজের জরা মরণের চিন্তা যেন মুহূর্ত্তের জন্য না আসে। সর্ব্বদা যৌবনোচিত স্ফূর্ত্তি ও সুখভোগ করিতে চেষ্টা করিবে এবং জোরপূর্ব্বক একান্ত মন সংযোগ সহকারে মনের মধ্যে যৌবনের স্ফূর্ত্তি

আনিবে। সর্ব্বদাই যেন এই অটল বিশ্বাস থাকে যে আমার যৌবন কখনও হারাইব না।

"যাদৃশী ভাবনা যস্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। চিন্তা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং এই যৌবন রক্ষা বিষয়ে মন সংযোগ ও ইচ্ছাশক্তির প্রভাব যে অসামান্য তাহা এইভাবে কিছুদিন কাজ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কোন একজন বিখ্যাত দার্শনিক বলিয়াছেন Would you always remain young and would you carry all joy and buoyancy of youth into your maturer years ? Then have care concerning but one thing—how you live in your thought world যদি তুমি পরিণত বয়সেও যৌবনোচিত সকল আনন্দ পাইতে ও যুবক থাকিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে একটী কথা মাত্র স্মরণ রাখিবে যে চিন্তা জগতের সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হইও। সর্ব্বদা কিশোর ও বালকদের সঙ্গে খেলা করিবে ও প্রা[ণ] খুলিয়া তাহাদের সহিত মি[শি]বে। যুবকের মত নিজের প্রাণটী সরস ও বালকের মত কোমল রাখিবে। দিনের পর দিন মনে করিবে আমি ক্রমশ পূর্ণযৌবন অবস্থায় যাইতেছি। শিশু ও বালকদিগকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিবে এব[ং] তাহাদের কোলে করিবে ইহাতে শরীর ও মনের গ্লানি অচিরাৎ দূরীভূত হইবা প্রাণ এক যৌবনসুলভ নূতন রসে অভিষিক্ত ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকিবে।

দ্বিতীয়ত, পবিত্র ও সাত্ত্বিক ভাবে জীবনযাপন করা যৌবন রক্ষা বিষয়ে প্রধান সহায়। শরীর ও মন পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। হিংসা দ্বেষ ক্রোধ ইত্যাদি রিপু ও হীন বৃত্তি সকলের পরিচালনায় শরীরস্থ রক্তের গতি দূষিতভাবে চালিত হয়। আমাদের মুখমণ্ডলের স্নায়ুআদি সুকুমার তন্তু সকল বিকৃত ভাবাপন্ন করে এবং আমাদিগকে শী[ঘ্র] শী[ঘ্র] জরাগ্রস্ত করিয়া তুলে। এই জন্ত এই সব কুপ্রবৃত্তি যে শুধু আমাদের শ্রী ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে তাহা নহে, অকালে জরা মৃত্যুও আনিয়া থাকে। ইহা আনুমানিক সত্য নহে, সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। যে লোক সর্ব্বদা হিংসা ক্রোধাদি সম্পন্ন, যাহার জীবন কদর্য্যভাবে পরিচালিত, তাহার দিকে চাহিলেই ইহার সত্যতা সম্যক উপলব্ধি হইবে। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে এই সব রিপু ও কুপ্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। সর্ব্বদা সাত্ত্বিক ভাবে জীবনকে চালিত করিবে মনোমধ্যে হিংসা দ্বেষ ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি স্থান দিবে না এবং দয়া ক্ষমা, পরোপকার ভগবদ্ভক্তি ইত্যাদি সদ্‌গুণাবলীর সম্যক অনুশীলনে যত্নবান হইবে। এই সব সৎপ্রবৃত্তির অনুশীলনে আমাদের নাড়ী (nerve) শিরা, ধমনী ইত্যাদিতে ও রক্তের ভিতরে এক নূতন রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে থাকিবে, যাহাতে আমাদের মুখে, চোখে, সর্ব্বাঙ্গে এক নূতন শ্রী নূতন ভাব নূতন শক্তির বিকাশ হইতে থাকিবে এবং আমাদের স্বাস্থ্য ও যৌবন শ্রী বহুদিন পর্য্যন্ত অটুট রাখিবে। এই জন্ত মিতাচারী ভগবদ্ভক্ত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের যৌবন ও সৌন্দর্য্য বিনা যোগসাধনায়ও বহুকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে এবং ইহার সত্যতা বোধ হয় সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রকৃত জ্ঞানের সহিত আন্তরিক ভাবে উপলব্ধি করিয়া চেষ্টা দ্বারা সকলেই এইভাবে নিজের জীবন চালিত করিতে পারেন এবং যিনি যতটুকু পারিবেন তিনি সেই পরিমাণেই ফলভাগী হইবেন, কাহারও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।

তৃতীয়তঃ, গুরুবাক্য ও যোগশাস্ত্র হইতে কতকগুলি নিয়ম এখানে উদ্ধৃত করা হইল, যাহা একান্ত ভক্তি ও যত্নসহকারে পালন করিলে আমরা নিশ্চয়ই সফল কাম হইব এবং এই সব অমূল্য উপদেশের মহিমা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইব।

১। দিবাভাগে বাম নাসিকায় ও রাত্রিতে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন রাখিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে আমাদের স্বাস্থ্য ও যৌবন বহুদিন পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকি[বে]। এজন্ত প্রথম প্রথম দিবাভাগের কিছু সময় দক্ষিণ নাসিকা পরিষ্কৃত তুলা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে

ও বাম নাসিকায় শ্বাস বহন করিতে চেষ্টা করিবে। একটু একটু করিয়া এ অভ্যাস করিতে হয় এবং কিছু দিন এই অভ্যাস করিলে শেষে আপনা হইতেই এইরূপ নিশ্বাস বহিতে থাকিবে। রাত্রিতে বাম পার্শ্বে ফিরিয়া শয়ন করিবে তাহাতে কিছুক্ষণ বাদেই দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকিবে। এইরূপে সমস্ত রাত্রি বাম দিকে শয়ন করিয়া দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন করিতে চেষ্টা করিবে। অভ্যাস দ্বারা অনায়াসেই ইহা সহজসাধ্য হইবে। স্বর শাস্ত্রোক্ত ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম এবং সকলেই ইহা ভক্তিসহকারে পালন করিতে চেষ্টা করিবে।

২। প্রত্যহ দুইবেলা আহারান্তে ৮।১০ মিনিট পর্য্যন্ত একটু শক্ত চিরুণীর দ্বারা মাথার চুল জোরে আঁচড়াইবে। ইহাতে মস্তিষ্ক শীতল রাখিবে এবং অকালে মাথার চুল উঠিবে না বা চুল পাকিবে না।

৩। চোখের জ্যোতি অব্যাহত রাখার জন্ম প্রত্যহ প্রত্যুষে নিদ্রা হইতে উঠিবার পরই মুখের ভিতর সম্পূর্ণরূপে জল দ্বারা পুরিয়া চোখে ৮।১০ বার শীতল জলের ঝাপটা দিবে। পরে একবার ঐ জলে কপালটা ধুইয়া ফেলিয়া পুনরায় ৭।৮ বার চোখে ঐরূপে জলের ঝাপটা দিবে। প্রত্যহ স্নান করিবার সময় দুই পায়ের অঙ্গুষ্ঠের নখের কয়েক ধারে একটু তেল দিয়া পরে অন্যান্য স্থানে তৈল মর্দ্দন করিবে। এতদ্ভিন্ন চোখের অন্যান্য সাধারণ স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করিবে। ইহাতে কোনও দিন চোখের জ্যোতি খারাপ হইবে না বা কোনরূপ চোখের ব্যারাম হইতে পারিবে না।

৪। যতবার মলমূত্র ত্যাগ করিবে ততবারই যতক্ষণ ঐ কার্য্য শেষ না হয় ততক্ষণ দুই পাটি দাঁতে দাঁতে একটু জোরে চাপিয়া ধরিবে ইহাতে দাঁত নড়িবে না বা বৃদ্ধকাল পর্য্যন্তও দাঁতের কোন অসুখ হইবে না। স্বাস্থ্য সমাচারের নিয়মিত পাঠকগণ দন্তরক্ষার অন্যান্য স্বাস্থ্যের নিয়ম অবগত আছেন। সুতরাং তাহার পুনরুক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন।

৫। যৌবনসুলভ ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যায় ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও কার্য্যক্ষম অবস্থা ক্রমশ হ্রাস হইয়া আইসে। এই জন্ম একটী নিয়ম সর্ব্বতোভাবে সকলে প্রতিপালন করিবে। যতবার মলমূত্র ত্যাগ করিবে ততবার যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সম্পন্ন না হয় ততক্ষণ বামহস্তের দ্বারা দৃঢ়মুষ্টিতে কোষদ্বয় শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকিবে। ইহাতে ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য অকালে কিছুতেই ঘটিতে পারিবে না।

মহাজন মুখনিঃসৃত ও শাস্ত্রোক্ত এই সব নিয়মগুলি মহামূল্যবান এবং ইহার প্রত্যেকটাই পরীক্ষিত সত্য। তবে সর্ব্বদাই আমাদিগকে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে একদিনে বা একবারেই কোন একটী কার্য্যের চরমফল লাভ করা যায় না। আমাদের চিত্তের স্থিরতা ও দৃঢ়তার একান্ত অভাব দু একদিন কোন কার্য্য করিয়াই তাহার ফল না পাইলে অমনি অধীর হই ও বিশ্বাস হারাই চিত্তের দৃঢ়তাও থাকে না। সুতরাং কোন বিষয়ে আমরা সফলকামও হইতে পারি না। তার পর সকল কার্য্যের পক্ষে ভক্তি ও বিশ্বাস এই দুটী বড় মূল্যবান জিনিষ। ভক্তি ও বিশ্বাস দ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে এবং একাগ্রতা হইতেই will force বা ইচ্ছা শক্তির সৃষ্টি হয়। এই শক্তিই সকল কার্য্যের প্রাণ। এই শক্তির অভাবেই আমরা প্রতিপদে বিফল মনোরথ হই এবং এই শক্তি যেখানে যে অনুপাতে আছে কার্য্যের ফল সেখানে সেই অনুপাতে অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রোক্ত এই সব স্বাস্থ্যের নিয়মগুলিতে আস্তিক্যবোধ বা সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া একান্তচিত্তে ইহা প্রতিপালন করিয়া চলিলে আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনে ইহার মহিমা ও আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মুগ্ধ হইব ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের বিষয় নাই।

চতুর্থত ব্রহ্মচর্য্য পালন যৌবন স্থির রাখার প্রধান সহায়। যাহার শুক্রধাতু অবিকৃত ও পরিপূর্ণ অবস্থায় আছে তাহার রক্ত স্নায়ু মাংসপেশী নাড়ী ইত্যাদি সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ ও সতেজ অবস্থায় থাকে এবং দেহস্থিত যন্ত্র সমুদায় উপযুক্ত অবস্থায় থাকে, সহসা জরা ব্যাধি, ইত্যাদি আক্রমণ করিতে পারে না। সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন। সুতরাং সর্ব্ব

প্রথমে এই বিষয়ে মনোযোগী হইবে। এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আজকাল অকালবার্দ্ধক্য, রোগ মৃত্যুর সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়া ছে। "যৌবন করিয়া ব্যয় বয়সে কাঙ্গাল" এই বাক্যটি অতি মূল্যবান। যৌবনে সাবধান না হইয়া অত্যাচার করাতেই আমরা শীঘ শীঘ যৌবন হারাইয়া জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ি। তখন ভবিষ্যতের চিত্র কিছুতেই আমাদের মনে স্থান পায় না। জীবনের সার ভূত এই শুক্রধাতু অবৈধ অত্যাচারে অযথা নষ্ট করিলে, অতি শীঘই জীবনীশক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলে এব অকালে বার্দ্ধক্যের সমস্ত লক্ষণ আসিয়া দেখা দেয়।

ইহার প্রমাণ চারিদিকে—কোনই অভাব নাই। ব্রহ্মচর্য্যপালন বিবাহিত জীবনেও হয় সুতরাং সকলেই সর্ব্বাগ্রে এইদিকে লক্ষ্য রাখিবে। যিনি যে পরিমাণে এই ব্রত সাধন করিবেন তিনি সেই পরিমাণে ফলভোগী হইবেন।

এতদ্ভিন্ন কয়েকটী আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ পালন করিতে হইবে যৌবনরক্ষার্থে এগুলিও একান্ত প্রয়োজনীয়।

ক। প্রত্যহ প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করার পরই এক গ্লাস পরিস্কৃত শীতল জল নাসারন্ধ্র দ্বারা পান করিবে। এই নাসাপান আয়ুর্ব্বেদ মতে পরম উপকারী। নিয়মিত ভাবে ইহা পালন করিলে ইহা রাসায়নিক কার্য্য করে এবং জরা পলিত অংস্থা ইত্যাদি দূর করিয়া যৌবন সুলভ সামর্থ্য ও শ্রী প্রদান করে। বরাবর এই নিয়মটী পালন করিলে কিছুতেই অকালবার্দ্ধক্য আক্রমণ করিতে পারিবে না। এই নাসাপান অভ্যাস করা কোনই গুরুতর ব্যাপার নহে। একটু একটু করিয়া চেষ্টা করিলে ৪।৫ দিনের মধ্যেই অনায়াসে ইহা অভ্যস্ত হইয়া যাইবে।

খ। প্রত্যহ কিছুক্ষণ নিয়মিতভাবে শারীরিক ব্যায়াম করিবে। শরীরকে সুস্থ, সুদৃঢ় ও স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিতে ব্যায়ামের মতন আর কিছুই নাই। নিয়মিত ব্যায়ামকারীকে সহসা জরা আক্রমণ করিতে পারে না। যৌবনোচিত শক্তি, গঠন ও সৌন্দর্য্য বহুদিন তাহাদের দেহে অব্যাহত থাকে। ইহার প্রমাণ আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। অশিক্ষিত ইতরলোক শারীরিক পরিশ্রমের জন্য দীর্ঘ দিন পর্য্যন্তও কেমন সুস্থ ও সুন্দর থাকে, বৃদ্ধবয়সেও শারীরিক সামর্থ্য হারায় না। আর আমরা ভদ্রশ্রেণী এই ব্যায়ামবিমুখ হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই ভু ড়িযুক্ত, লোলচর্ম্ম এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি। ইচ্ছাশক্তির সহিত নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিলে ইহার ফল অসামান্য ইহাতে আমাদের বেশী সময় নষ্ট বা অন্য ক্ষতিও হয় না। কিন্তু হায়, আমাদের এমন শিক্ষা এমনি অভ্যাস এবং আলস্য যে আমরা এই মহামূল্য জিনিষে একেবারে উপেক্ষা করিয়া থাকি। প্রত্যহ মাত্র ১ ।১৫ মিনিট ব্যায়াম করিলেই আমরা ব্যায়ামের সুফল সম্যক লাভ করিতে পারি। এবং কে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্য হইতে এই ১ ।১৫ মিনিট কাল ব্যয় করিতে না পারেন? যিনি কর্ম্ম জীবনের যে অবস্থাতেই থাকুন এ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান থাকিলে এই সামান্য সময় ব্যয় করিয়া শারীরিক ব্যায়াম কবিতে কাহারও আটকায় না এবং ইহা দ্বারাই তিনি আশাতীত ফল পাইতে পারেন। তবে এ বিষয়ে চাই শুধু একাগ্রতা নিয়মনিষ্ঠা ও প্রফুল্লতা।

গ। তৈলাভ্যঙ্গ ও উদ্বর্ত্তন বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে রাখিবে। অভ্যঙ্গ ও উদ্বর্ত্তন দ্বারা চর্ম্ম মসৃণ সতেজ মাংসপেশী স্নায়ু প্রভৃতি কার্য্যক্ষম থাকে এব এই জন্য চর্ম্মের লোলতা ইত্যাদি জরাবস্থা সহসা আসিতে পারে না। তৈলমর্দ্দন সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণও বলিয়া গিয়াছেন যে ঘৃতের চেয়ে তৈলের উপকারিতা আটগুণ বেশী কিন্তু ভক্ষণে নহে—মর্দ্দনে। কিন্তু হায়! পাশ্চাত্য শিক্ষা ও অনুকরণের কল্যাণে আমাদের এই প্রথা প্রায় লোপ হইতে বসিয়াছে। আজকাল আর প্রায় কাউকে তৈল মর্দ্দন করিতে দেখা যায় না। অনেকেই ইহা অসভ্যতার চিহ্ন বলিয়া বিদ্রূপের চোখে দেখিয়া থাকেন।

ঘ। মধ্যে মধ্যে উপবাস ও ফলমূলাদি আহার করা স্বাস্থ্য ও যৌবনের পক্ষে একান্ত অনুকূল। এইজন্য আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে যে একাদশীর উপবাস ও মধ্যে

মধ্যে অন্ত উপবাসাদির ব্যবস্থা আছে তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ উপবাস দ্বারা জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত ও শরীরস্থ যন্ত্রসমূহ সতেজ থাকে এবং ইন্দ্রিয়াদি সাম্যভাবে থাকায় আমাদের স্বাস্থ্যের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ বিধান হইয়া থাকে। যৌবনরক্ষা ও দীর্ঘজীবন লাভের জন্ত উপবাস ও মিতাচার প্রধান সহায় বলিয়া মনে রাখিবে। আমরা বর্ত্তমানে অত্যন্ত লোভী হইয়া পড়িয়াছি—এই সব শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত মর্ম্মও বুঝি না বা বুঝিতে চেষ্টাও করি না এবং ইহারই ফলে অকালে জরাগ্রস্ত ও নানা ব্যাধিযুক্ত হইয়া পড়িতেছি।

ফলমূল আহার একান্ত মঙ্গলজনক। বড় বড় ডাক্তারের মত সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ একদিন শুধু ফলমূল খাইয়া থাকিলে স্বাস্থ্য ও যৌবনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হয়। সুপক টাট্‌কা ফলই প্রশস্ত এবং এই ফলমূল আমাদের খাদ্যের একটা প্রধান অংশ হওয়া উচিত। শিক্ষার অভাবেই হউক আর বিকৃত রুচির জন্তই হউক আমরা এখন বাজে খাবার পচা তৈল ও ঘৃত ভাজা বাসি ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি খাইতে অভ্যস্ত হইতেছি, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ঐ অর্থে উৎকৃষ্ট ফলমূল যে সময়ের যা তাহা অনায়াসে খাইতে পারি এবং উহা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম মঙ্গলজনক তাহা সকলেরই মনে রাখা উচিত।

---

২৪ পরগণায় পল্লী-সংগঠন আন্দোলন।

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি এ]

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বীরভূম ও বাঁকুড়াকে বাংলার ক্ষয়িষ্ণুতম (most decaying) জেলা আখ্যা দিয়াছেন। ২৪ পরগণা জেলাটীকেও ঐ পর্য্যায়ভুক্ত করিলে কোন দোষ হইত না। কলিকাতার মত বড় সহরের নিকটবর্ত্তী এই জেলাটীর যা কিছু কৃষি ও শিল্পসম্পদ আছে, সমস্তই কলিকাতায় হুবহু চালান হয়। গ্রামে গ্রামে দুধ ও মাছ যেমন অপ্রতুল হইতেছে, দৈনিক যাত্রী (daily passenger) কেরানীর সংখ্যা তেমনি বাড়িতেছে। আমার কার্য্যোপলক্ষে যাইয়া দ্বিপ্রহরে এমন অনেক গ্রাম দেখিয়াছি যাহাতে পুরুষ একটীও গৃহে নাই—কেবল গ্রাম্য কৃষক, নাপিত ও ধোপা এখনও বাস্তর মায়া ছাড়াইতে পারে নাই অথবা সহরে তেমন বিশেষ সুবিধা নাই তাই মাটি আঁকড়িয়া পড়িয়া আছে অনেক গ্রামেই বিড়ির ও পানের দোকান দেখিয়াছি—চায়ের দোকানও দেখি নাই বলিতে পারি না। অনেক গ্রামে দেখিয়াছি শনি ও রবিবারে যুবকেরা অনন্তকর্ম্মা হইয়া নাটকের রিহার্সেল দিতেছেন। তাঁহাদের নিকট দেশ-প্রেমের কথা বলিতে যাওয়া অথবা পল্লীসংগঠনের কথা তোলা সুবুদ্ধির কার্য্য নহে। বহু খাটুনির পর এই দুইটী দিনের তাঁহারা সদ্ব্যবহার করিতে চান। Weekdaysএ ত তাঁহাদের মরিবারও সময় নাই।

কয়েকটী গ্রামের যুবকেরা কিন্তু এমন অরসিক যে তাঁহারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর শনি ও রবিবারে গ্রামের জন্ত খাটিতে চান। আমি এরূপ বহু যুবকের কার্য্যকলাপও লক্ষ্য করিয়াছি—ইহারা নমস্ত।

কেন এমন হয়? ধ্বংসোন্মুখ জাতি আমরা মুখে সবাই বলি, তাত কাপড়ের দুঃখের কথাও অনুভব করি, তবু কর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে না কেন?—জড়তা যায় না কেন?

আমার মনে হয় ইহার প্রধান কারণ এই—আমরা মুখে যা বলি মনে প্রাণে তা অনুভব করি না। আমরা দেশকে জানি না—তাই স্থায়ী দেশপ্রেম জন্মে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি ২৪ পরগণা জেলা সম্বন্ধে মোটামুটি

কয়েকটী সংবাদ দিব। আমার মনে হয় ইহাতে, যাঁহারা কাজ করিতে চান তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী ও পন্থা নির্দ্ধারণে সহায়তা হইবে। এই প্রবন্ধে বর্ত্তমানে যে যে প্রতিষ্ঠান সংগঠন কাজ করিতেছেন তাঁহাদেরও উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হওয়াতে সহরের প্রত্যেক আন্দোলনের ঢেউ এই জেলাতেও সকলেই অনুভব করে। প্রতি আন্দোলনেরই কিছু না কিছু সার্থকতা আছে। সেই হিসাবে হুগলী হাওড়া ও ২৪ পরগণা জেলার অধিবাসীরা বিশেষ সৌভাগ্যবান এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

লোক সংখ্যা হিসাবে প্রেসিডেন্সী বিভাগে এই জেলার প্রথম স্থান। ১৯১১ সালে এখানকার লোক সংখ্যা ২৪, ৩৪, ১ ৪ জন ছিল। ১৯২১ সালের আদম সুমারিতে দেখা যায় এখানকার লোক সংখ্যা বাড়িয়া ২৬ ২৮ ২ ৫ জন হইয়াছে। লোক সংখ্যা বাড়িয়াছে সত্য কিন্তু জন্মহার বাড়া ত দূরের কথা—বেশ কমিয়াছে। জন্মহার কম হইবার কারণ কি—এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা শক্ত। বাক্‌লে (Buckle) মহাশয় বলেন যে খাদ্যের প্রাচুর্য্য ও অপ্রাচুর্য্যের ফলে জন্মহারের বৃদ্ধি অথবা হ্রাস হয়। The population does undoubtedly fluctuate with the supply of food advancing when the supply is plentiful or receding when the supply is scanty কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পাশ্চাত্য জগতে ইহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। সেখানে লোকের ধনবত্তা বাড়িতেছে কিন্তু জন্মহার দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। এই সব দেখিয়া মি পেল (Pele) বলিয়াছেন যে জন্মহার বৃদ্ধির কারণ দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশা। তাঁহার কথাই এই যে High birthrates are the direct outcome of poverty and misery and falling birthrates are a natural result of increased prosperity আমাদের দেশেও প্রবাদ আছে যে গরীবের উপরই মা ষষ্ঠীর কৃপা অধিক হয়। যাহা হউক জন্মহার চব্বিশ পরগণায় কমিয়া গিয়াছে। মৃত্যুহার যদি বাড়িতে থাকে এবং জন্মহার ক্রমাগত কমে তবে জেলাটী লোকশূন্য হইতে খুব বেশী দিন লাগিবে না।

২৪ পরগণায় লোকক্ষয়ের প্রধান কারণ ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর। স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা বলেন যে বাংলা দেশে প্রতিদিন ১ • হাজার লোক কেবল ম্যালেরিয়ায় মরে। ১ • লোক যাহারা মরে তাহাদের ত গো জন্ম কাটিয়াই গেল। কিন্তু যাহারা রোগে ভুগিয়া জীবন্ম ত হইয়া আছে, তাহাদের সংখ্যা যে কত তাহা গ্রামবাসী মাত্রই জানেন। ম্যালেরিয়ার ফলে ২৪ পরগণার চাষী চাষ করিতে পারে না, বালক স্কুলে যাইতে পারে না। ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগিলে লোকের কর্ম্ম প্রবৃত্তি ক্ষীণ ও চরিত্র হীন হইয়া পড়ে। Dr Pais মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন—Distrust towards works of a social character, diminished will power, diminished liking for work, restricted vision towards all the phenomena of life are special characteristics of those with chronic malaria and of the peoples who have long suffered from it আমরা পল্লীবাসীর কর্ম্মে অনাসক্তি ক্ষুদ্র চিত্ততা দেখিয়া দুঃখিত হই—ইহার মূলীভূত কারণ ক্রমাগত জ্বরভোগ ও যন্ত্রণা।

কেবল ২৪ পরগণা নহে—পশ্চিম বঙ্গের অধিকাংশ জেলারই প্রতিগ্রামে দেখা যায় যে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে ভুগিতে লোকেরা জীবনের সমস্ত সরসতা হারাইয়াছে। ডা বেণ্টলী মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন—The man who is a prey to chronic malaria loses all interest in life his energy is sapped and his initiative destroyed, he becomes lethargic in mind and body and so intensely apathetic that it is with difficulty he can be induced to make an effort even to secure treatment ম্যালেরিয়ার ফলে রোগী মনে ও প্রাণে পঙ্গু হইয়া পড়ে।

ম্যালেরিয়ার পরই কালাজ্বরের নাম করা যাইতে পারে। ডা বেণ্টলী মহাশয় বলিয়াছেন—বাংলায় ২ লক্ষ লোক কালাজ্বরে ভুগি তেছে। ডা নেপীয়ার (Dr Napier) মহাশয় বলেন—প্রায় ১ লক্ষ লোক কালাজ্বরের রোগী। আমাদের মনে হয় কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়ার পার্থক্য গ্রাম্য বৈদ্যেরা নিরূপণ করিতে পারেন না। এই জন্যই এখনও ব্যারামটির সম্যক্ স্বরূপ ধরা পড়িতেছে না। বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যথার্থই বলিয়াছেন যে ১৯১৫ সালের পূর্ব্বে লোকে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের পার্থক্যই জানিত না। কাজেই রোগটার ভীষণ মূর্ত্তি ধরা পড়ে নাই।

১৯২১ সালে	১৫৫২ জন এই রোগে মারা যায়
১৯২২	১৫৩১
১৯২৩	৪৫৬৫

ইহা হইতেই স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে দিন দিন নূতন নূতন রোগী আবিষ্কৃত হইতেছে।

২৪ পরগণার ইতিহাসই দেখা যাক্। ১৯২১ সালে রোগীর সংখ্যা ছিল ১৭৭ কিন্তু নানাস্থানে কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া নিবারণী কেন্দ্র স্থাপিত হওয়াতে ১৯২২ সালে রোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৫৮ জন ১৯২৩ সালে ১৫৩৫ জন রোগী চিকিৎসিত হইতে আসিয়াছিল। সকলেই অবগত আছেন যে অধিকাংশ রোগীরই বয়স ১৫ বৎসরের নীচে। কালাজ্বর রোগটার বিশেষত্বই এই যে ইহাতে বালকেরাই বেশীর ভাগ আক্রান্ত হয়। স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ যথার্থই বলিয়াছেন যে The age incidence of kala azar is peculiar about 80 percent of the cases occuring in children under 15 years of age

এখন দেখা যাউক এই দুইটী ব্যাধির নিরাকরণ জন্য সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টা ও যত্ন কতটা করা হইতেছে। সমস্যাটী জটিল যথেষ্ট অর্থ ও কর্ম্মীর প্রয়োজন—এ সকল কথাও যেমন সত্য তেমনি ইহাও সত্য যে আজ সমস্ত জাতি যদি কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ না করেন তাহা হইলে এই ভীষণ ব্যাধিদ্বয় বাংলাদেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করিবে।

কালাজ্বর বৈঠকে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যথার্থই বলিয়াছেন যে বাংলার স্বাস্থ্যোন্নতিকল্পে সরকার ও জনসাধারণকে একযোগে কাজ করিতে হইবে—A problem of so vast a nature is incapable of solution by the efforts of government alone কোন দেশেই কেবল সরকারী চেষ্টায় সকল ব্যাধি দূরীভূত হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে কি করিয়াছেন দেখা যাউক। প্রথমত রোগটীর সম্যক স্বরূপ জানিবার জন্য একটা সার্ভে (Survey) করা হয় তৎপর বিশেষজ্ঞগণ রোগের কারণ প্রভৃতি লইয়া গবেষণা (research) করিয়াছেন। কলিকাতার School of Tropical Medicine নামক বিদ্যালয়ে এবং প্রত্যেক জেলায় সিভিলসার্জ্জন ও হেলথ অফিসারের নিকট শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগের একজন এসিষ্টাণ্ট তাঁহার ডিরেক্টার ও কর্ত্তৃত্বাধীনে ২১ জন ডাক্তার এই কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। ইহা ব্যতীত প্রতি বৎসর সরকার এজন্য অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান পরিচালক মেজর ষ্টুয়ার্ট মহাশয় বলিয়াছেন—In Bengal the central department is advisory only and the work is carried out by the local bodies aided financially to some extent by the central Govt Last year Rs 50000 was given The central Anti Malarial Society has this year (192) already received Rs 20000/ out of Rs 30000 allotted for Anti Malaria work part of this sum is devoted for Kala azar work

এই সমস্ত ব্যবস্থার কথা বাংলা দেশ সম্বন্ধে ব্যাপক ভাবে প্রযুজ্য। ২৪ পরগণার ম্যালেরিয়া ও কালা জ্বর নিবারণ কল্পে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কতদূর কি করিতেছেন তাহার একটু আলোচনা করা যাউক

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মধ্যে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ইউনিয়নবোর্ডগুলির কার্য্যালোচনার পর আমরা ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর নিবারণ কল্পে বাংলার বিখ্যাত সমিতি Co operative Anti malarial Society ও Bengal Health Association এই জেলায় কি কি কাজ করিতেছেন তাহার উল্লেখ করিব। ইহা ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে সরকারী সাহায্য বর্জ্জিত প্রতিষ্ঠানও এই জেলায় কাজ করিতেছেন। তন্মধ্যে দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতির নাম করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া অনেক গ্রামে যুবকেরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াও অনেকস্থলে কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। যে ভাবে সমিতি গঠিত হইতেছে তাহাতে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এই অমানিশার ঘোর কাটিয়া যাইবে।

প্রথমতঃ ২৪ পরগণা জেলা ২ লক্ষ টাকা কালাজ্বর নিবারণ কল্পে খরচের বরাদ্দ করেন। গভর্ণমেন্ট তাহাদের আরো ২৫ হাজার টাকা দেন। বর্ত্তমানে ৩৫ জন নব নিযুক্ত ডাক্তার ও ডি বোর্ডের ডিসপেন্সারীর ২২ জন ডাক্তার প্রায় ১৮ টী কেন্দ্রে কালাজ্বর রোগীর রক্ত পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় চিকিৎসা করিতেছেন।

ইহা ছাড়া ম্যালেরিয়া নিবারণ কল্পেও এই জেলাতেই বঙ্গের অধিকাংশ জেলা অপেক্ষা বেশী কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ডাঃ রায় বাহাদুর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—Our movement has made headway only in the districts near our headquarter very little has been done in the outlying districts ২৪ পরগণা জেলার বারাকপুর মহকুমায় ২২টা বারাসতে ৩৯টী এবং ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় টী ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।

কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া নিবারণ কল্পে এই জেলাতে জেলাবোর্ড Central Co operative Anti malarial Society (কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি) ও Bengal Health Association (বঙ্গীয় স্বাস্থ্য সমিতি) যে কাজ করিতেছেন তাহাতে জেলার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

সরোজনলিনী স্মৃতি সমিতিও বারাসত প্রভৃতি স্থানে মহিলা সমিতির মধ্য দিয়া নারীকল্যাণে অবহিত হইয়াছেন।

কলেরার প্রাদুর্ভাব হইলে কেন্দ্রীয় সমিতির ও বঙ্গীয় স্বাস্থ্য সমিতির কলেরা বিগ্রেড (cholera brigade) এর স্বেচ্ছাসেবকেরা রোগ প্রতিষেধক বহু ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক বাড়ীতে Bleaching powder Izal Potassium Permanganate বিতরণ করা আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করা জলাশয়গুলি বিশুদ্ধ রাখা এবং বক্তৃতা ও সেবার মধ্য দিয়া গ্রামবাসীকে রক্ষা করা ইহাদের কাজ। গঙ্গাসাগরের মেলাতে ইহারা যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন।

২৪ পরগণার স্থানে স্থানে কলেরা নিবারণ কল্পে ঔষধও এবার মজুত রাখা হইয়াছে। ব্লিচিং পাউডার (Bleaching powder) ক্লোরোজেন ও আইজাল (Izal) কয়েকটি কেন্দ্রবর্ত্তী গ্রামে বিশিষ্ট ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ভদ্রলোকের নিকট মজুত রাখা হইয়াছে। গ্রামবাসীগণ প্রয়োজন হইলেই উহা পাইতে পারিবেন।

কংগ্রেস পরিচালিত দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতির বড় বেশী কেন্দ্র এখনও স্থাপিত হয় নাই কোদালিয়াতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্বগ্রামের সমিতি রীতিমত কাজ করিতেছেন দেখিয়াছি।

ইহা ব্যতীত ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্বগ্রামে স্ব স্বাধর্ম্মপত্নের তত্ত্বাবধানে একদল যুবক কৃষি স্বাস্থ্য ও গোপালন বিষয়ে নিজেরা শিক্ষা লইতেছেন। আশা আছে অদূর ভবিষ্যতে ইহারা বহু গ্রামে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পল্লীসংগঠন কার্য্য করিবেন।

স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সমিতি কাজ করিতেছেন আশা হয়, ইহারা জমাট বাঁধিয়া কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃত্বে কাজ করিলে যথেষ্ট উপকার হইবে।

আমার মনে হয় প্রতি জেলা বোর্ড এই উদাহরণ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিলে বাংলার মৃত্যুহার অচিরে কমিয়া যাইবে। বাংলায় ৯ ডিসপেন্সারী আছে। প্রত্যেক ডিস্পেন্সারীকে কেন্দ্র করিয়া এক একটী জনহিতকর সমিতি খোলা যাইতে পারে। বাংলার জেলাবোর্ডের কর্তৃপক্ষগণ অবহিত হইলে পল্লীসংগঠন আন্দোলন সহজ ও সফল হইবে।

পল্লীসংগঠন জন্য কি কি প্রতিষ্ঠান চাই এই কথা অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য একটী প্রতিষ্ঠান তালিকা দিলাম।

(ক) লোকশিক্ষা—শিক্ষাভাব দূর করিবার জন্য প্রাথমিক ও নৈশ বিদ্যালয় চাই। আলোক চিত্র পুস্তিকা প্রচার ও অভিনয় সাহায্যে জন সাধারণকে স্বাস্থ্য কৃষি ও সমবায় প্রভৃতির মূল নীতি বোঝান দরকার।

(খ) ধন সমাগম—কুটীর ও গৃহ শিল্পের প্রবর্ত্তন করিয়া বিধবা বেকার ও অলস লোককে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। প্রতি গ্রামের লুপ্ত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে। তৈয়ারী জিনিষের জন্য বিক্রয় কেন্দ্র সহরে ও হাটে বন্দরে স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) স্বাস্থ্যোন্নতি—জন স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য মূল স্বাস্থ্যতত্ত্বটা আলোকচিত্র বক্তৃতা ও পুস্তিকার সাহায্যে গ্রামবাসীকে বোঝাইতে হইবে। বসন্তের সময়ে টীকা লওয়ার প্রবৃত্তি লোককে দিতে হইবে। কলেরার সময় রোগ প্রতিষেধক নিয়মাবলীর প্রচার ও অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর চিকিৎসা ও নিবারণ সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। শিশুমৃত্যু হ্রাস করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে দাইদিগকে নাড়ী কাটার ও প্রসূতি ও শিশুর কল্যাণকর ব্যবস্থাগুলি শিক্ষা দিতে হইবে।

এ জন্য কি কি চাই?

(১) স্থানীয় প্রাণবান কর্ম্মী। বাহিরের লোক আসিয়া আমার গ্রাম ভাল করিতে পারে না।

(২) গ্রামেই অর্থ সৃষ্টি করিতে হইবে—ভিক্ষা করিয়া সমিতি চলে না।

(৩) মুষ্টিভিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। চাঁদা আদায় করা সর্ব্বত্র সম্ভব নয়।

(৪) টাকার হিসাব চাই।

(৫) মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা নেতৃত্ব মানিয়া চলা ও অনলস থাকিয়া সমিতির জন্য কার্য্য করা চাই।

আজ দেশে সুবাতাস বহিয়াছে। কর্ম্মীও দেখা দিয়াছে। গ্রামকে বাঁচাইবার জন্য আগ্রহ অনেকের হইয়াছে। কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা হয় আর দুঃখ বেশী দিন থাকিবে না— দিন আগত ঐ।

প্লেগের ইতিবৃত্ত

[শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু]

প্লেগ অতি ভীষণ পীড়া। ইহা অতি মারাত্মক ও সংক্রামক ব্যাধি। ভিন্ন ভিন্ন যুগে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। প্লেগ অর্থে বহু লোক নাশক ব্যাধি মাত্র বুঝায়। কিন্তু অধুনা প্লেগ শব্দ বিশেষ একটি স্বতন্ত্র বহু লোকনাশক রোগকেই বলা হয়। ইহার নাম বিউবোনিক প্লেগ অর্থাৎ বাঘীর মড়ক। কারণ বাঘীর স্ফীতি ও বদ্গাঁঠ এই রোগের নিত্য লক্ষণ।

প্লেগে প্রায় কুচকী অথবা বগলের বীচিতে বেদনা হইয়া ফুলিয়া ওঠে এবং লাল বর্ণ হয়। সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর জ্বর ও চক্ষু লালবর্ণ হইয়া বিকার উপস্থিত

করে। অবশেষে রোগী অজ্ঞান হইয়া যায়। চব্বিশ ঘণ্টা হইতে ৩।৪ দিনের মধ্যে প্রায় রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সকল প্লেগে আবার কুচকী বা বগল স্ফীত হয় না—কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ দেখা যায়। আনুষঙ্গিক জ্বর সন্ধিসমূহের গ্রন্থি স্ফীতি কিম্বা দুষ্ট ব্রণ এবং অন্য বিশেষ টিকোৎপত্তি এই রোগের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। ইহার বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইবার অনতি বিলম্বেই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং অব্যবহিত পরেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে পারে। বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইবার ৩।৪ দিন মধ্যে প্রধান গ্রন্থিসমূহ স্ফীত হয়। রোগ প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বে শরীরের অত্যন্ত অবসাদ ও দৌর্ব্বল্য হয় বুদ্ধির জড়তা স্মৃতিশক্তি দুর্ব্বল ললাটে বেদনা, চক্ষু রক্তবর্ণ হয় ও হৃৎপিণ্ড চড় চড় করে। শীত কম্প অস্থিরতা অবসাদ মাথাধরা বিবমিষা বমনোদ্রেক বক্ষস্থলে বেদনা এই সমস্ত রোগের পূর্ব্বাভাস। ইহাতে কথা ভারি ভারি ও এলোমেলো নয়নদ্বয় আবিল অশ্রুপূর্ণ হয় এবং শীঘ্র শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। নাড়ী দ্রুতগামী অথবা দুর্ব্বল হয়। সময়ে সময়ে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ বমন অত্যধিক পিপাসা দুর্গন্ধযুক্ত অতিসার শ্বাস প্রশাস দ্রুত ও দুর্গন্ধময় প্রস্রাব অল্প হয়। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের প্রলাপ ও শরীরের খিচুনি প্রভৃতি সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টের জন্মের তিন শতাব্দী পূর্ব্বে গ্রীস লিবিয়া মিশর ও সিরিয়ায় ইহার প্রথম আবির্ভাব হয়। বাইবেলোক্ত রাজা সলোমনের সময়েও একবার প্লেগ হইয়াছিল। ইহা ইয়োরোপে অনেকবার দেখা দিয়াছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে মিসর দেশ হইতে তুরস্কের কনষ্টাণ্টিনোপল হইয়া ইয়োরোপে গিয়া তুরস্ক ফ্রান্স ও ইটালী লণ্ডভণ্ড করিয়াছিল। ৫৪৬ খৃ ফ্রান্সে ইহার প্রথম আবির্ভাব হয়। তৎপর ৬৫১ খৃ ইটালীতে লোকক্ষয় করে। ৫৯ ইহা রোমরাজ্যের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। নবম শতাব্দীতে ইয়োরোপে ইহার ভয়ঙ্কর উপদ্রব হয়। ১৩৪৫ খৃ ইহা সিসিলিতে আরম্ভ হইয়াছিল। ১৩৪৬ কনষ্টাণ্টিনোপল, গ্রীস ইটালী ফ্রান্স স্পেন জার্ম্মাণী সুইডেন ও নরওয়েতে ইহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। ১৩৪৮ খ লণ্ডন সহরে ইহার প্রথম আবির্ভাব হয় ১৩৯৮ খ স্কটল্যাণ্ড ও আয়র্ল্যাণ্ডে ইহার আবির্ভাব হইয়াছিল। ১৫৪২ খ মিশরে আরম্ভ হইয়া ইহা কনষ্টাণ্টিনোপল হইয়া পুনরায় ইয়োরোপে গিয়াছিল। ১৬৬৫ খৃ ইংল্যাণ্ডে মহামারীরূপে ইহা আত্ম প্রকাশ করে। তদ্রূপ প্লেগ তথায় আর কখন হয় নাই লণ্ডন সহরেই লক্ষাধিক লোক মারা যায়। যোড়শ শতাব্দীতে ইহার প্রাদুর্ভাবে ইয়োরোপে ভয়ঙ্কর মড়ক হইয়াছিল। ১৭৬৯ খৃ রুষ তুরস্ক যুদ্ধের পর বৎসর রুসিয়া দেশে আবির্ভূত হইয়া ইহা বহু লোক ক্ষয় করিয়াছিল। তদবধি ইয়োরোপ ইহার বিশেষ লীলাভূমি। অধুনা মধ্যে মধ্যে ঐ মহাদেশে ইহা সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে।

৫৪২ খৃ প্লেগ মিশরদেশে আরম্ভ হইয়া আফ্রিকা মহাদেশে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ছিল। ক্রমে সমগ্র আফ্রিকায় বিস্তৃত হইয়া এসিয়া মহাদেশের চীন পারস্য ও আরব দেশে ইহা আবির্ভূত হয়। ৮৮২ খৃ চীনদেশে ভয়ঙ্কর মড়ক হইয়াছিল। ১৮৯৪ খৃ হংকং হইতে ক্রমশ বৃদ্ধি হইয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইয়া ক্রমে সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

অতি পুরাকালে প্লেগ এদেশে আবির্ভূত হইয়াছিল। অনেকে বলে। চীনদেশ হইতেই প্লেগ প্রথম ভারতবর্ষে আসিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে প্লেগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ১৩৩৪ খৃ দিল্লীর পাঠান নরপতি মহম্মদ তোগলকের সময় ভারতে প্লেগ প্রবেশ করে। ১৩৯৯ খৃ আফগান সর্দ্দার টাইমুর যখন দিল্লীনগরে নর শোণিত প্রবাহিত করেন সেই সময় দুর্ভিক্ষের সহিত প্লেগের আবির্ভাব হইয়াছিল। ১৫৭৫ খৃ প্লেগ বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গৌড় নগরের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ৬১ খৃ মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় দিল্লীতে মহামারীরূপে ইহা দেখা দিয়াছিল। ১৬৮৪ খৃ সুরাট বন্দরে আবির্ভাব হয়। ১৬৮৯ খৃ বোম্বাই সহরে ইহার

লীলার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। ১৮১২ খৃ কচ্ছ কাথিয়ার গুর্জ্জর এবং সিন্ধুদেশে ইহার দৌরাত্ম্য হয়। ১৮১৫ খৃ ইহা হিমালয় প্রদেশের কুমায়ুন অঞ্চলে উৎপাত করিয়াছিল। ১৮২৩ খৃ কুমায়ুনের অন্তর্গত গাড়োয়াল প্রদেশে প্লেগ বহু দিন অবস্থিতি করে। ১৮২৯ খৃ দিল্লী রোহিলখণ্ড ও তৎনিকটবর্ত্তী প্রদেশে ইহার আবির্ভাব হয়। ১৮৩১ খৃ গাড়োয়ারের অন্তর্গত পালি এবং রাজপুতানার অন্যান্য স্থানে ইহা ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। ১৮৩৬ খৃ ভারতের পশ্চিমসীমান্ত প্রদেশে প্লেগ আবির্ভূত হইয়া তথা হইতে রাজপুতানার পালিনগর ধ্বংস করে। সেই সময় এই মহামারী হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে চীনদেশে ব্যাপ্ত হয়। ১৮৯৫ খৃ চীনদেশ হইতে পুনরায় ভারতে পদার্পণ করিয়াছিল। ১৮৯৬ খৃ ইহার আবিভাব হইলে ভারতের প্রায় ২৫ লোকের মৃত্যু হয়। ১৮৯৭ খৃ বোগদাদ নগর হইতে প্লেগ ষ্টীমারযোগে বোম্বাই সহরে আগমন করে। উক্ত বৎসর প্লেগ কলিকাতা সহরে আবির্ভূত হইয়া ভীষণ সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। সেই সময় বহু লোক সহর পরিত্যাগ করেন। ঐ বৎসর সমগ্র ভারতে প্রায় ৫৬ লোক ক্ষয় হয়। ১৮৯৮ খৃ ১ ১৮ জন ১৮৯৯ খৃ ১ ৩৪ ৮ জন ১৯ খৃ ৯৩ ১৫ জন ১৯ ১ খৃ ২ ৭৩ ৬৭৯ জন ১৯ ২ খৃ ৫ ৭৫ জন ১৯ ৩ খৃ ৮৫ জন ১৯ ৪ খৃ ১ ২২ ২৯৯ জন ১৯ ৫ খৃ ১৩ ৮৩ জন, ১৯ ৬ খৃ ১ ০২ জন প্লেগে মারা পড়ে এবং ১৯ ৭ খৃ প্লেগ প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রায় ১৫ লক্ষ ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়াছে। তদবধি ভারতে প্লেগ চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষে প্লেগে প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় দেড় লক্ষের উপর লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। অধুনা বীরজননী পঞ্চনদ প্লেগের লীলাভূমি। ভারতে প্লেগ আত্মপ্রকাশ করিবার পর হইতে এই প্রদেশে যত লোকক্ষয় হইয়াছে সেরূপ আর অন্য কোথাও হয় নাই। তথায় প্লেগ এত অধিক পরিমাণে হয় যে সময়ে সময়ে আদালতের কার্য্যাদি বন্ধ করিতে হয়। কলিকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ, পাঞ্জাব দিল্লী সুরাট পুনা পাটনা ভাগলপুর করাচী উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রদেশ প্রভৃতি নানা স্থানে মধ্যে মধ্যে ইহার প্রকোপ হইয়া থাকে। অধুনা ইহা পল্লীগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। বঙ্গদেশে শীতের শেষে ও বসন্তকালে অর্থাৎ জানুয়ারী হইতে এপ্রেল পর্য্যন্ত ইহার প্রকোপ অধিক হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক এই রোগে জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে। আর ম্যালেরিয়ার ত কথাই নাই॥

অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইন্দুর হইতে প্লেগের পরিব্যাপ্তি হয়। এক জাতীয় কীট বা পিশু ইন্দুরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। তাহাদের দংশন দ্বারা প্লেগবীজ ইন্দুরের দেহ হইতে মনুষ্য শরীরে সংক্রামিত হয়। ইংরাজ পণ্ডিতেরা বলেন যে স্থানে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ সেই স্থানেই ইহার আধিপত্য। রোগীর বস্ত্রাদি অবলম্বনপূর্ব্বক প্লেগ দেশ দেশান্তরে গমনাগমন করে। চীনা পণ্ডিতেরা বলেন যাহার মুখ ভূমির যত নিকট সে তত শীঘ্র প্লেগ রোগাক্রান্ত হয়। ডাক্তার বাসল বলেন ইহা সংক্রামক এবং পালাজ্বরের ন্যায় বিস্তারিত হইয়া সময় বিশেষে প্রবল হয়।

প্লেগের চিকিৎসা বিষয়ে চিকিৎসকগণ এখনও আশানুরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করেন নাই। এই রোগের জীবাণু আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু তাহার স্বাভাবিক বাসস্থান কোথায় তাহা জানা যায় না। তবে সূর্য্যালোক ও নির্ম্মল বায়ুতে ইহার বীজ বর্দ্ধিত হইতে পারে না। ইহার প্রতিকারের বিশেষ কোন ঔষধ বা প্রতিষেধক পদার্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। অনেকে বলেন প্লেগের সময় এক ছটাক জলে কয়েক ফোঁটা টিঞ্চার আইওডিন্ দিয়া একবার প্রাতে ও একবার সন্ধ্যায় সেবন করিবে এবং জ্বর অনুভব হইলে জোলাপ খাইয়া উদর পরিষ্কার রাখিলে ইহার প্রকোপ হয় না। ইহাতে প্লেগবীজ বিনষ্ট হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান প্লেগ নিবারণের বহু উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—স্বতন্ত্রীকরণ ইন্দুর ধ্বংস

হাফকীনের টীকা প্লেগের সময় বাসগৃহ ত্যাগ ইত্যাদি। গবর্ণমেণ্ট প্লেগের টীকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই টীকা লইলে প্রায় ছয় মাস পর্য্যন্ত তাহা কার্য্য করে কিন্তু পরে পুনরায় টীকা লইতে হয়। আবার অনেক স্থলে টীকাতে কোন উপকার হয় না। কবিরাজী মতে খাঁটী সরিসার তৈল প্রত্যহ সমস্ত শরীরে ভালরূপে মর্দ্দন করিলে প্লেগ হয় না।

প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইলে, সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে এবং সূর্য্যালোক ও নির্ম্মল বায়ু বিশিষ্ট স্থানে বাস করিলে এই রোগের সংক্রামকতা নিবারণ হইতে পারে। দূষিত জলবায়ু প্রভৃতি দ্বারা অনেক সময় মহামারী উপস্থিত হয়। রোগীকে একাকী পৃথক স্থানে রাখা উচিত এবং আরোগ্য হইলে পর অন্তত এক মাস কাল তাহার পৃথক গৃহে বাস করা কর্ত্তব্য এবং সুস্থ ব্যক্তির সংস্রবে তাহার থাকা উচিত নহে। শরীরের মধ্যে ক্ষতাদি থাকিলে রোগীকে কেহ স্পর্শ করিবে না। মড়কের সময়ে যে পর্য্যন্ত না এই পীড়া সম্পূর্ণরূপে হ্রাস হয়, তদবধি বাসগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক মাঠের মধ্যে পরিষ্কার স্থানে গিয়া বাস করা উচিত। কোন স্থানে পীড়া হইলে, তথায় লোককে আসিতে দেওয়া উচিত নহে। প্লেগের সময় বাটীর দরজায় অথবা ফটকে চূণ ছড়াইয়া রাখিবে। যে কোন ব্যক্তি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলে, তাহাকে চূণ মাড়াইতে হয়। পায়ে বা জুতায় যে প্লেগবীজ বাহির হইতে আসিবার সম্ভাবনা থাকে তাহা এইরূপে নষ্ট হইতে পারে। তৎকালে পায়ে মোজা ও জুতা থাকিলে অনেক সময় উপকার হয়। ফল কথা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি যত্নের সহিত পালন করিলে ইহার আক্রমণ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়।

তাম্রকূট-মাহাত্ম্য।

[শ্রীশ্রীশচন্দ্র গোস্বামী বি এ]

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র আলবোলার জয়গান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বপ্ন সফল হইয়াছে—ধূম পানে বাঙ্গালী যুবা, বৃদ্ধ ও বালক মজিয়াছে। তামাক কোন না কোন আকারে সকলেই ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। বৃদ্ধ আলবোলাতে তাম্রকূটের পূজা করেন—আলবোলা মধ্যস্থিত জল কল্লোল তাঁর কাছে কোন সুদূরের সমুদ্র কল্লোলবৎ প্রতীয়মান হয়। প্রৌঢ় ও যুবক চুরুট ও সিগারে মত্ত—স্কুলের পড়ুয়া ছাত্র নস্য লইয়া মাতিয়া আছে। রাস্তায় ঘাটে পল্লী বাসী বিড়িতে মসগুল হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম—তামাকু তুমি ধন্য। পৃথিবীতে এমন সভ্য অথবা অসভ্য জাতি নাই যাহাদের নিকট তামাকুর মহিমা অপরিজ্ঞাত। পণ্ডিতেরা বলেন, তামাকসেবীর সংখ্যা না কি বর্ত্তমানে ৬ কোটি। পাশ্চাত্য দেশে বিলাসিনীরাও না কি তামাকুর প্রেমে পড়িয়াছেন এমন শুনিতেছি। ডা জর্জ্জ টমাসন (Dr George Thomason M D) মহাশয় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—'Smoking among women is growing at an appalling rate It is reported as now involving all classes of women হায় কবি ঈশ্বরগুপ্ত, তুমি আজ বাঁচিয়া থাকিলে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া ধন্য হইতে পারিতে।

তামাকসেবীকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি কেন পয়সা দিয়া এই বিষ খান তিনি তদুত্তরে বলিয়া থাকেন যে ইহাই সনাতন রীতি। আমার ঠাকুরদাদা প্রত্যহ ১ পোয়া তামাক পোড়াইতেন তিনি

৯ বছর বাঁচিয়া গিয়াছেন—তামাক খাইলে আয়ু বাড়ে।

অনেকের যেমন ধারণা আছে যে চা পানে জীবনী শক্তি বাড়ে—(The cup that cheers but not inebriates), তেমনি আবার এক দল লোকের ধারণা এইরূপ যে তামাকু সেবনে ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধ করা যায়। তামাকুর মহিমার বিস্তারিত ইতিহাস যাঁহারা জানিতে চান তাঁহারা যে কোন তাম্রকূটপ্রণয়ীর নিকট গেলেই তামাকু মাহাত্ম্য সবিস্তারে শুনিতে পাইবেন।

ডাক্তারেরা বলেন তামাকের উপাদানগুলি এমনই বিষাক্ত যে উহাতে মানুষের আয়ুক্ষয় না হইয়াই পারে না। তামাকের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে নিকোটিন (nicotine) নামক বিষ থাকে। ডাক্তারেরা নিকোটিনের কি গুণ বর্ণনা করিয়াছেন শুনুন—Nicotine is one of the most violent poisons known It closely resembles prussic acid নিকোটীন বিষ প্রুসিড এসিড তুল্য। অনেকে হয়ত বলিবেন এ বিষে তকৈ একটা লোকও মরিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে তামাকু সেবনে প্রথম প্রথম কত কষ্ট হয়। গা বমি বমি করা দীর্ঘ শ্বাস উঠা মানসিক চাঞ্চল্য ও বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি উপসর্গগুলি প্রত্যেক novice (শিক্ষানবীশ) তামাকুসেবীই অনুভব করিয়া থাকেন। ধীরে ধীরে অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হয় (habit is second nature)। তখন আর ও সব লক্ষ্য হয় না।

তামাকের দ্বিতীয় উপাদানটী কলিডাইন (collidine)। ডাক্তারেরা বলেন ইহা হইতেই তামাকের সুগন্ধ হয়। কলিডাইনও নিকোটিনের মতই বিষাক্ত। ইহার ১ কোটীর ২ ভাগের ১ ভাগ খাইলেই একটী ভেক মরিয়া যায়। ডাক্তারদের নিজেদের কথাই শুনুন—Another constituent of tobacco is collidine, a liquid of very penetrating odour and the principal substance giving the odour to tobacco Collidine is an alkaloid as poisonous as nicotine It is so poisonous that the twentieth part of a drop will rapidly kill a frog

তামাকের তৃতীয় উপাদানটী পূর্ব্ব কথিত প্রুসিক্ এসিড স্বরং। প্রুসিক্ এসিডের (Prussic acid) দরুণই তামাকু সেবনের পর মাথাধরা অথবা গা বমি বমি করা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। হাভানা চুরুটে ইহার মাত্রা অধিক পরিমাণে থাকে।

চতুর্থ উপাদান কারবন্ মনোক্সাইড (carbon monoxide)। ইহার মহিমায় তামাকুসেবীর লাল রক্তকণিকা (red blood cells) গুলি নিস্তেজ হইয়া পড়ে—ফলে তামাকুসেবী রক্তশূন্য হন। এই বিষয়ে ইহার মহিমা অপার। ইহার ফলে সদ্য মৃত্যু হয় না সত্য কিন্তু ইহা তামাকুসেবীকে জীবন্মৃত করিয়া রাখে। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা অজীর্ণ অথবা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ইহারই ফল। ডাক্তারেরা বলেন—If it does not kill it leaves its pernicious effects—nervous troubles irregular pulsation of the heart partial paralysis inflammation of the respiratory organs and a weakened digestion

পঞ্চম উপাদানটী ফারফারল (Furfurol)। ভার্জ্জিনিয়া ও টার্কিশ তামাকে (Virginia and Turkish tobacco) এই উপাদানটী প্রচুর পরিমাণে থাকে। ইহাও বিষ—Furfurol is 50 times as poisonous as alcohol

তামাক যে যে বিষাক্ত উপাদানে গঠিত তাহার ফর্দ্দ পূর্ব্বেই দিয়াছি। এখন তাম্রকূট মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করা যাক্।

মদ্যপায়ী বেশ জানে যে মদ অপেয় ও অদেয়। সে তাহার অভ্যাসের জন্য লজ্জিত হয়। কিন্তু তামাকসেবী জানেও না যে সে ধীরে ধীরে বিষ সেবনে জর্জ্জরিত হইতেছে। তামাক সেবনে blood pressure

অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। Janeway has shown that a single cigarette or cigar causes a rise of blood pressure ten to fifteen points ক্রমাগত তামাক সেবনে রোগ প্রতিষেধক শক্তিও লোপ পায় কারণ তামাকের মধ্যে যে নিকোটিন বিষ থাকে উহা রক্তকণিকাগুলিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। লাল রক্তকণিকা দুর্ব্বল হইলেই মানুষকে রক্তহীন দেখায় এবং তাহার নানা ব্যাধি মন্দির হইয়া দাঁড়ায়।

পাশ্চাত্য স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদেরা আরো বলিতেছেন যে গত ৫ বৎসর যাবৎ যে মস্তিষ্কের পীড়া ও বাতুলতা (insanity) বাড়িয়া চলিয়াছে ইহারও মূলে তামাকু সেবন। মদ্যপান তামাক সেবন ও দুশ্চরিত্রতা বাতুলতার প্রধান কারণ। বঙ্গবাসী সাবধান হইবে কি? ম্যালেরিয়া কালাজ্বরেই তুমি জর্জ্জরিত। ইহার উপর সৌখীন ব্যাধিগুলি আর ডাকিয়া আনা কেন? স্কুলের বালকদের মধ্যে এই কথাগুলি প্রচারিত করা অত্যাবশ্যক। আমি কোন যুবকের সহিত একত্র কিছু দিন ছিলাম। তাহাতে দেখিয়াছি তাহার দৈনিক চা ও চুরুটের খরচ ॥। অথচ শুনি আমরা না কি বড় গরীব। থিয়েটার সে চা চুরট এগুলির বিক্রয়াধিক্য দেখিলে বিস্মিত হইয়া মনে হয় যে আমরা গরীব নহি। বাঙ্গালী যুবক ও অভিভাবক এখনও সাবধান না হইলে এই চা চুরুটেই জাতির সর্ব্বনাশ হইবে।

জনৈক বৃদ্ধ মহাজনের ডায়েরী

[শ্রীবাংলাদাস ভৌমিক]

১৩৩২ সাল যায় যায় হইয়াছে। পুরাতন বৎসর আর কয়েকদিন পরেই শেষ হইবে আমরা আবার নূতন বৎসরে পদার্পণ করিব। এরূপ কত পুরাতন বৎসর গিয়াছে কত নূতন বৎসর আসিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তবে আমার গণনা মধ্যে যে কয় বৎসরের হিসাব আছে তাহা যদি একবার নিকাশ লই তবে দেখিতে পাই যে অপরাপর পুরাতন বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও আমার ব্যবসায়ে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশী হইয়াছে। আর সেই ক্ষতি পূরণের চেষ্টা না করিয়া আমরা পুরাতন বৎসরের ক্ষতির জের নূতন বৎসরে টানিয়া আনিতেছি। লাভের মধ্যে এই হইতেছে যে পুরাতনের জের মিটাইতে মিটাইতেই নূতন বৎসর চলিয়া যায়। নূতন লাভের আশায় নূতন উদ্দীপনায় আমরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারি না—পুরাতনের ঋণ পরিশোধই নূতন বৎসরের কাজ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং কবি যে বলিয়াছেন 'নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা' এ সব আমাদের ঘটিয়া উঠে না। এমতাবস্থায় বুঝিতেছি যে কারবার করিয়া লাভ নাই। তবে যে পর্য্যন্ত না একেবারে দেউলিয়া হই সে পর্য্যন্ত ঠাট বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছি মাত্র নতুবা কারবার আমার লোকসানী।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন কারবার লাটে উঠাইয়া দাও না কেন? উত্তর বলি যে দেখ যত লোকসানী কারবারই হোক এ কারবারে আমার এক দিন নাম ছিল প্রতিষ্ঠা ছিল—হঠাৎ তুলিয়া দিতে নিজে হাতে পারিব না। তবে যদি আপন আপনি ধ্বংস হয় তাহাতে আক্ষেপ নাই কারণ সময়ে সবই ধ্বংস সাপেক্ষ। বুঝিতেছি যে আমার এ কারবারী ইমারতের দরজা জানালা দিন দিন খসিয়া পড়িতেছে ইটে লোণা ধরিয়াছে ছাদ ফুটা হইয়াছে ভিত বসিয়া যাইতেছে তবুও স্বেচ্ছায় আমি ইহার ধ্বংস সাধন করিতে পারিব না, কারণ, অনেক রক্ত জল করিয়া মাথার ঘাম পায়ে

ফেলিয়া আমি এ সাধের ব্যবসা দাঁড় করাইয়াছিলাম। এ কারবার আমার প্রাণে স্বর্গাদপি গরিয়সী। কিন্তু লোক বলিবেন যে লোকটা কি মুর্খ। লোকসানী কারবারের জন্ত চেঁচাইয়া মরিতেছে। তাঁহাকে আমি বলি যে মরিবার পূর্ব্বে একবার জানিয়া যাইতে চাই যে, এমন লোক আছেন কি না যিনি আমার কারবার আবার গড়িয়া তুলিতে পারিবেন যাহার দ্বারা আমার কারবারের জন্ত স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য ও শ্রী আবার ফিরিয়া আসিবে। এমন লোকের যদি সন্ধান পাই তবে আমি সুখে মরিতে পারিব নতুবা আমার মরিয়াও শান্তি নাই।

পরিশেষে একটা আশার কথা আমি শুধু বলিব যে যদিও আমি দিন দিন নিরাশ হইতেছি তবুও একেবারে আমি আশা হীন হই নাই। কারণ আমার ধারণা আছে যে আমার কারবারের যেমন বাঁধ যেমন নিয়ম ও যেমন শৃঙ্খলা ছিল তাহা যদি একবার জোর বাঁধে তবে আমার কারবারী জাহাজ ভাটার মুখে পাল তুলে তীর বেগে একেবারে ঘাটায় গিয়ে পৌঁছাইবে।

যদি উপযুক্ত লোকের সন্ধান পাই তবে শেষ শ্বাস রোধের পূর্ব্বে আর একবার আমার কারবারের কোথায় ক্ষতি ও লোকসান হইতেছে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আমার কারবারের শেষ পৃষ্ঠা

কোন কোন ব্যক্তি আমার কারবারের ইতিহাস জানিতে চাহিতেছেন বলিয়া আমি তাহার আলোচনা আরম্ভ করিব। আমার ব্যবসায়ের পূর্ব্বে নাম ছিল বাঙ্গালী ভাই কারবার এ কারবার এ দেশেই এ দেশীয় লোক দ্বারা চালিত হইত কিন্তু দুঃখের কথা কি বলিব এখন অনেক গণ্য মান্য বিজ্ঞ লোক ইহার নাম করণ করিয়াছেন বাঙ্গালী ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই কারবার। ব্যবসায়ের নূতন নামেই বুঝিতে পারিবেন যে কারবারের বর্ত্তমানে অবস্থা কিরূপ। যদি বলেন যে Proper name has no meaning—আমি বলিব তাই বা কেন? এই ত কত সর্ব্বনামের মানে হয়। যেমন, কালকাট্টা থেকে কলিকাতা আর ঢাক থেকে ঢাকা। এতদ্ভিন্ন আমাদের দেশের বিকবন্দের নাম করণের খাতা উটাইলে দেখিতে পাইবেন যে বাঙ্গালী যে military race নয় তাহার নামই তাহার দ্যোতক। নতুবা প্রতাপ নাম আজকাল সেকেলে হইয়াছে কেন? আর তৎস্থলে সুখেন্দু বা কেন হ'ল? পক্ষান্তরে শিখদের ভিতরে দেখিতে পাইবেন রঞ্জিৎ সিং তেজ সিং ইত্যাদি নাম—শুনিলেই মনে হয় যেন গুতো দিতে আসিবে। তাহলে দেখা গেল যে নামের সঙ্গে ভাবেরও সামঞ্জস্য আছে।

পূর্ব্বে আমার এই কারবারে ৫ কোটি লোক কাজ করিত স্ত্রী ও পুরুষ কার্য্যের গুরুত্ব অনুসারে কাজ ভাগ করিয়া লইত। এখন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দিনে কাহাকেও কোন কাজ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার উপায় নাই—সবাই যার যার কাজ বাছিয়া লয়। যদি আমি কুমোরের ছেলেকে স্যাকরা হইতে নিষেধ করি আর নাপিতের ছেলেকে ধোবা হইতে না দিই তাহলে না কি আমার অত্যন্ত অন্যায় হয় লোকে আমায় নিন্দা করে—বলে যে লোকটী পরশ্রীকাতর। ফলে এখন ব্রাহ্মণের ছেলে হইতে আরম্ভ করিয়া নিরক্ষর ব্যক্তিও ইউনিভার্সিটী টোলের বিদ্যার্থী। অধ্যাপক মহাশয় পর্য্যন্ত Dyeing and cleaning house খুলিয়াছেন।

আমার কারবারে এই ভাগ বিভাগের গণ্ডগোল হওয়াতে কাজ ভাল চলিতেছে না—এমন কি কতক গুলি কেন্দ্র আমাকে তুলিয়া দিতে হইয়াছে।

বর্ত্তমানে আমি বস্ত্রবয়ন ও সুতাকাটা বিভাগ তুলিয়া দিয়াছি। দেশের লোকের লজ্জা নিবারণের জন্য বিদেশ হইতে ৬ কোটি টাকার কাপড় আনাইতেছি। ইহার পুন প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম কৃষকদের তুলার চাষ করিতে উপদেশও দিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা না কি তুলার চাষ ভুলিয়া গিয়াছে। বাহিরে অপারগ হইয়া ঘরে ফিরিলাম—গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তুমি সুতা কাট না কেন? তিনি বল্লেন এই কি তুমি শিক্ষিত হয়েছ? কোথায়

আমার একটা Singr sewin machine এনে দিবে তা নয় আমি আমি শংি দোপাদের জন্য হেঁটে কাটতে যাব। আব সাহস করিলা না।

শিল্প বিভাগের বড় কর্মচারীকে একদিন ডেকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে কিহে বাপু তোমার বিভাগে লাভ দাঁড়াচ্ছে না কেন সে বলে কি করব মশায় আমার দোষ কি? দেখছো না বাজারে জিনিসের কাটতি হয় না। সেটা ত আর আমার দোষ নয় আমি জিনিস তৈরী করিতে পারি। যদি না বিক্রি হয় তবে কি করিব। যা দেখছি—আপনার এ কারবারও চলবে না। শুনিয়া কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিয়া গেলাম। হঠাৎ স্বাস্থ্য সমাচারের এক বিশেষ কারণ দেখিলাম। রিপোর্ট আছে যে বাঙ্গালী মেয়েদের ভিতরে স্বাস্থ্যের অভাব দেখা দিয়াছে তাঁদের ভিতরে নানা রোগ এসে দিন দিন তাদের শক্তি ক্ষয় করছে। তারা এখন কাঁখে কলসী করে দু পা হেঁটে জল আনতে সাতবার হাঁপান। ছেলেদের কাছে হাড়ী নামাতে পা পুড়িয়ে ফেলেন কব্জির জোর কমে যাওয়াতে দরকারী হাতা চালনা করিতে পারেন না। এখন তাহারা স্বামীদের ডেকে তাদের বলছেন—

দেখ আমার শরীর ত খারাপ হয়েই চলেছে—আর যে ভাল হবে আশা হয় না। তুমি যদি একটু পাতলা হাড়ি ঠুনকো না হয় এমন জিনিস—এনে দিতে পার আমার তাতে ভারী উপকার হয়। বাবু অমনি বাজার ঘুরে মুর্গীহাটা থেকে রাঁধিবার উপযুক্ত একটি এ্যালুমিনিয়মের তৈজস কিনে নিয়ে এলেন। গিন্নী ভাবলেন যে কর্ত্তা তাঁকে সত্যই আদর করেন। আর কর্ত্তাও গিন্নীর শ্রম লাঘব করতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। আমি যা দেখছি আমার এ বিভাগও চলবে না।

এখন আমার আড়তদারী কারবারের কথা বলে বক্তব্য শেষ করব। যাঁরা আমার এ কারবারটীর সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন যে আমার আড়তের চাল না পেয়েছেন এমন লোক নাই বলিতে হইবে। চাল আমি দেশের জন্য রেখে বাকী কত বিদেশে বিতরণ করেছি। এখন আমার বিদেশে দাদন বেড়েছে কিন্তু দেশে অন্ন অন্নের অভাব হয়েছে। ধানের আমদানীর কমতি দেখে কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওহে ধান দাও না কেন? সে বলে ধানে কি হবে বাবু? ধানে লাভ কি? শুনে ত আমি অবাক। বলিলাম ওরে বাঁচবি কিসে? সে বলিল বাবু ধানে কি বাঁচি বাঁচি ত পয়সায়। সেই পয়সা হয় পাটে। পয়সা যদি থাকে তবে ধানের অভাব কি? আমার আড়তদারী ব্যবসায়ে ধানের স্থানে পয়সা দেখা দিয়াছে। কৃষক যেখানে গোলাভরা ধান রাখিতে চেষ্টা করিত এখন সে সিন্দুকভরা টাকা রাখিতে ব্যস্ত। আমার ব্যবসায়ে জিনিসের স্থানে টাকা আসিয়াছে। এ সমস্যার সমাধান কোথায়? আমার মনে হয় যে আমাদের অন্তিমকালে ধনকুবের Rothschild এর দশা হবে—Rothschild dies without food

---

পল্লী-সংগঠনে রবীন্দ্রনাথ

[গত ২ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতে পল্লী সমস্যা সম্বন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা হইতে কিছু কিছু পাঠকগণকে উপহার দিলাম। সম্পাদক।]

যে দেশের মানুষ আমরা সে দেশকে গভীরতর করে জানতে হলে আমাদের দেশে যে আধ্যাত্মিক আত্মীয়তার মিলনসূত্র আছে সেইটাকে নূতন করে উপলব্ধি করতে হবে।

একদিন ছিল—এদেশে যখন জীবন প্রণালী অন্যরকম ছিল—সকলের জীবন যখন সচ্ছল ও আনন্দময় তখন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার ভাবটী বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তখন অতিথি এলে তাড়ান যায় না—

আত্মীয় স্বজনকে বিমুখ করা যায় না—বুভুক্ষুকে বলতে পারা যায় না—না তোমাকে দেব না।

কিন্তু এখন আর সেদিন নেই। এখন পরিবর্তন হয়েছে।

আজকে সমস্ত পৃথিবীর দাবী আমাদের সামনে এসেছে। দূরদূরান্তর হতে লোক এসেছে—তাদের ঠেকান যায় না। এ শুধু যে আমাদের দুর্ব্বলতার জন্য তা নয়—এ হচ্ছে যুগধর্মের ফল—পৃথিবীর দাবী আমাদের মিটাইতেই হবে। তাই আজ অন্নের ভাগ বহু বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। আমাদের সভ্যতা—আত্মীয়তার সভ্যতা কিন্তু সেটির রস শুকিয়ে যাচ্ছে—তাই ক্রমে আত্মীয়তায় বাধা পড়েছে। এখন আর আমরা তেমন করে সকলকে বলতে পারিনে যে এস এস তোমরা সবাই এস—তোমাদের সেবার জন্যই আসন পাতা হয়েছে। পূর্ব্বে বিবাহাদি অনুষ্ঠানে কত রবাহূত কত অনাহূত লোক আসত—সকলের জন্যই সমানভাবে মুক্তদ্বার। তখন একটা বহুবিস্তৃত পরিবারের মত সকলেই একই সুখের একই ঐশ্বর্য্যের ভাগ পেত। আজ সে স্বচ্ছলতা না থাকলেও তাহাদের হৃদয়জাত আত্মীয়তা—সেবার ঔৎসুক্য এখনও বর্ত্তমান। বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি। আমার নিজের অনুষ্ঠানটিতেই আমি তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। সেখানে ছেলেরা রোগীর সেবা শুশ্রূষার জন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাহা বাস্তবিক হৃদয়স্পর্শী।

আমাদের দেশের সভ্যতা আত্মীয়তামূলক সভ্যতা। আমি নিজে কলিকাতায় জন্মেছি—সেখানে দেখেছি আত্মীয়তার বন্ধন শিথিল—সেখানে মিশামিশি। শুধু সভা সমিতিতে হৃদয়ের যোগাযোগ সেখানে নেই। আমি সহরে থাকি—কিন্তু সে যেন একটা কারখানা—সেখানে প্রয়োজনের জন্য আত্মীয়তা হতে পারে—কিন্তু আত্মীয়তার জন্য আত্মীয়তা শুধু গ্রামেই সম্ভব। সেই আত্মীয়তার শান্তি স্থাপনেই আবার দেশের সর্ব্বত্র জলাশয় জেগে উঠবে ভাঙ্গা দেউল গড়ে উঠবে—আবার সমস্ত দেশ মুখরিত হয়ে উঠবে—আনন্দের কল্যাণে সখ্যে।

তাহলে আমাদিগকে পল্লীতে যেয়ে কাজ করতে হবে। এ আমি বলছি ভাবুকতায় নয়—অভিজ্ঞতায়। আমার যেখানে কর্ম্মক্ষেত্র সেখানে হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ই আছে। যেসব ছেলেরা তাদের ভিতরে গিয়ে কাজ করছে তাদের আমি ব্রতীবালক নাম দিয়েছি। তারা সবাই সমান কাজ করে। এই কেন্দ্র থেকে হিন্দু মুসলমান উভয়েই সেবা পাচ্ছে। আমাদের লোকেরাই তাদের সব বিরোধ মিটান। পূর্ব্বে কত মারামারি মাথা কাটাকাটি হত পুলিস এসে শাসন করতে পারেনি কিন্তু আজ তারা নিরস্ত হয়েছে কেন? কারণ আমি তাদের নিকট কোন স্বার্থের দাবী করিনি তাই। আমি শুধু তাদের বলেছি আমি তোমার দেশের লোক তোমাদের সেবা করবার অধিকার আমার আছে সে অধিকার রুদ্ধ করোনা হৃদয়ের দ্বার খোল। তোমরা সবল হও সুস্থ হও আমি কৃতার্থ হব। আমার আর কোন দাবী নেই আর কোন প্রয়োজন নেই আমি আর কিছু চাইনে। তুমি বড় হও ভাল হও তবেই আমার কাজ শেষ হবে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে এত তেত্রিশকোটী ভারতবাসীর কি হবে? এতে কিছু হবে না। আমি বলি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেও আত্মশক্তি যদি সত্য হয় তাতেই ভারতের সেবা হবে। প্রদীপের আলোটী ক্ষুদ্র হলেও তাতে সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করবার ক্ষমতা বর্ত্তমান। অসত্য দ্বারা ভারতের কোন কাজই হবে না। গীতার উপদেশ—আমাদের শুধু কর্ম্মের অধিকার—আমরা শুধু কাজ করি ফল পাই বা না পাই—ফলের ভার শুধু তাঁরই উপরে ন্যস্ত

আমাদের দেশের যেখানে যে আছে সকলের ভিতর শক্তি দিতে হবে। আমরা তা করতে পেরেছি? আমাদের দেশের নমশূদ্র জাতি সমাজ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেল। তাহাদের কেমন করে যেতে দিলুম? আত্মীয়তার বন্ধন নেই বলে আজ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে বলছি—এস ভাই তোমরা এস। এতে আত্মীয়তা হবে না। এতে দেশের শুধু ক্ষতিই হবে। আমাদের

দেশে শুধু ত্যাগ করে গ্রহণ নেই—ব্যয় আছে আয় নেই। কিন্তু তাতে ত চলবে না। যারা নিকটে আছে তাদের আরও নিকটতর—যারা আপন সেবা দ্বারা তাদের আরও ঘনিষ্ঠতর আত্মীয় করতে হবে। এই হচ্ছে আমার বক্তাবাণকদের কাজ।

মানুষের দুই দিক। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। অর্থ প্রয়োজন—ধর্ম আদর্শ।

আদর্শ এবং প্রয়োজন উভয়কেই স্বীকার করতে হবে। অর্থের সংকীর্ণ বন্ধন ধর্মের বৃহৎ বন্ধন। ভারতের ধর্ম এবং অর্থ উভয়ই দরকার। আমি অর্থকে উপেক্ষা করিনি—সেবাকে সত্যে পরিণত করতে গিয়ে তাকে উপেক্ষা করতে পারিনি। আপনারা আমার কাজ যদি চোখে দেখতেন তাহলে আজ আর আমাকে বক্তৃতা করতে হত না। যুবকগণ দেশের প্রাণ ফিরিবার প্রতি দৃষ্টি করুন। ঘরে ফিরে আসুন দেশের মাটিকে সার্থক করুন দেশকে সফল করুন।

পল্লীর প্রাণ সজীব শুধু অন্নবস্ত্র দ্বারা হবে না—শিক্ষার আবশ্যক। পল্লীতে প্রাণ আছে তাকে পুষ্ট করা চাই—তাকে সর্ব্বপ্রকারে পরিপুষ্ট করতে পারলে সমস্ত চেষ্টা সার্থক হবে। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান আধ্যাত্মিক বটে, কিন্তু তাতে দেশে যে চৈতন্য জাগল তাতে চিত্তকে উর্দ্ধবা করে চারিদিকে ছাপিয়ে উঠল। তখন শুধু ধর্ম্মের না চারিদিক হতেই দেশ সজীব হতে পেরেছিল। তেমন কোন সত্যকে পেলে ভারত আবার শুধু আধ্যাত্মিকতায় না। সমস্ত রকমে প্রাণ পাবে। ইয়োরোপে Christianityর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভ্যতাও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। প্রদীপ শুধু একটি কাজ করে না। প্রদীপ একবার জ্বললে তাতে অনেক কাজই হয়।

তাহা বলছি পল্লীর বিপুল প্রাণে নব বসন্তের সমাগম হলে তাতে শুধু মধুকর গুঞ্জন নয় তাতে ফুল হবে ফল হবে। তেমনই বাংলায় বসন্ত হউক। নব প্রাণের হিল্লোলে একবার জেগে উঠক সেই আনন্দের ভিতর দিয়ে সর্ব্বকর্ম্মের জন্য দেশ বলিষ্ঠ হয়ে উঠক আমার শান্তিনিকেতনের জ্ঞান শিক্ষিতদের জন্য Reserved নয় তাতে সকল দেশের সকল লোকের সমান অধিকার—সকলে তা লাভ করুক তাতে জেগে উঠক—এই আমার নিবেদন।

বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে উদ্যত হউক—যেখানে সৃষ্টি করেছে—সেখানেই সে ধন্য হয়েছে। এতে সিদ্ধিলাভ বাক্য দ্বারা হবে না গ্রামের ভিতর গিয়ে কাজ করতে হবে। নিজেদের কাজ নিজেদের করতে হবে। সব বাধা ভুলে গিয়ে কাজে লাগতে হবে। তা হলে ২।১টা গ্রামেই যে আলো জ্বলে উঠবে—সমস্ত দেশের লোকই তাকে দেখতে পারবে। সত্য বালকবেশে আসে ভগবানের মত অনেক বাহু রাক্ষসের তাই রাবণের বিংশতি বাহু ছিল কিন্তু আমাদের ভগবানের তা দরকার হয় না। তিনি ছোট হয়ে গোপালের বেশে আমাদের প্রাণে এসে যে বাঁশী বাজান তাতে বিশ্বাস থাকলে সবই আমরা সহজে বুঝব।

আমাদের সাধনাকে সত্য করতে হবে এই শুধু জানি। তাতেই দেশ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠব।

বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাস্থ্যের ইঙ্গিত

(১) রোগের আশ্রয় দ্বিবিধ—শরীর ও মন। বায়ু পিত্ত ও কফ ইহারা শরীর প্রভব দোষ। রজ ও তম ইহারা মন প্রভব দোষ। এই দুই প্রকার দোষের অভাব হইলে আর রোগোৎপত্তি হয় না।

(২) যে স্থানে স্বাস্থ্য নাই সে স্থানে অর্থও নাই।

স্বাস্থ্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ এবং য ক্ষণ না লোকে ইহা হইতে বঞ্চিত হয় তত্তক্ষণ স্বাস্থ্যের মর্য্যাদা বুঝিতে পারে না।

(৩) শরীরকে সুস্থ রাখা এবং অকাল মৃত্যু নিবারণ করাই স্বাস্থ্য বিদ্যা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়।

(৪) সধারণতঃ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে এবং রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিতে হয়। বিষাদযুক্ত জীবনে রোগের আক্রমণ অ ত্যন্ত অধিক হইয়া থাকে।

(৫) পুরুষের একবিংশতি বৎসর বয়সের পূর্ব্বে এবং স্ত্রীলোকের ষোড়শবর্ষ বয়সের পূর্ব্বে সর্ব্বাবয়ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। বালকের ষোড়শ ও বালিকার ত্রয়োদশবর্ষ বয় ক্রম কালে যৌবনের সঞ্চার হয়। প্রকৃত পক্ষে ১২।১৩ বৎসর বয়সেই বালকের দেহে বীর্য্যের সঞ্চার হইয়া থাকে কিন্তু তাহা পূর্ণ এবং কীটযুক্ত ষোড় বর্ষে হয়। পুরুষের বীর্য্য ও স্ত্রী লাকের শোণিতে সন্তানের জন্ম হইয়া থাকে। বাল্য মাতৃত্বর ফলে বাঙ্গালী ক্রমে বালখিল্য জাতিতে পরিণত হইতেছে।

(৬) সাধারণত পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক দীর্ঘজীবনী হয়। অবিবাহিত পুরুষ অপেক্ষা বিবাহিত পুরুষের পরমায়ু বেশী হইয়া থাকে।

(৭) অতিভোজন অতি নিদ্রা অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় পরিচালনা অল্প য়ুর কারণ। অবশ্য পরিমিত পানাহারের জন্যই মানুষের দীর্ঘজীবন লাভ হয়। আহারের ন্যায় বিলাসিতার বাহুল্যের জন্যও মানুষের পরমায়ু কমিয়া যায়।

(৮) যাহারা স্বাস্থ্যকর পল্লীগ্রামে বাস করে সহরের লোকের অপেক্ষা তাহাদের পরমায়ু অন্তত ষোল বৎসর বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

(৯) ভাল চিকিৎসক না পাইলে বিনা ঔষধে থাকা উচিত। ঔষধ যত কম ব্যবহার করিয়া আরোগ্য লাভ হয় ততই নিরাপদ। যত অধিক পরিমাণ ঔষধ ব্যবহার করিবে শরীর তত শীঘ্রই অধিক পরিমাণে জরাগ্রস্ত হইবে।

(১০) বিশুদ্ধ বায়ু বিশুদ্ধ জল সূর্য্যালোক ও পর্য্যাপ্ত উত্তাপ যাহা করে লক্ষ চিকিৎসক তাহা করিতে পারে না।

মুষ্টিযোগ

(১) যাহাদের হস্ত অত্যধিক ঘামে তাহারা গরম জলে ফিটকারি বা ভিনিগার গুলিয়া সেই জলে হস্ত ধৌত করিলে উপকৃত হইবে।

(২) কাঁচা আলু থ্যাৎলাইয়া দেহের পোড়া স্থানের উপর পুলটিসের ন্যায় প্রলেপ দিলে তাহাতে দাহের যন্ত্রণা অনেকটা কমিয়া যায়। দেহের কোন স্থান কাটিয়া ছড়িয়া বা থ্যাৎলাইয়া গেলে মাখন ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৩) শরীরের বাহিরে কোন স্থানে রক্ত পড়িলে তথায় চায়ের পাতা অথবা ফিটকারি চূর্ণ দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া যায়।

(৪) যাহাদের নাসিকা দিয়া রক্ত পড়া রোগ আছে, তাহাদের নাসিকা দিয়া যখন রক্ত পড়িবে তখন গুড়া ফিটকারি নস্যের ন্যায় নাসিকায় টানিয়া লইলে রক্ত পড়া বন্ধ হইয়া যায়।

(৫) হস্তের অঙ্গুলি পুড়িয়া গেলে পোড়া যায়গায় উপর যন্ত্রণা কমিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত বরফ চাপিয়া রাখিলে চামড়া শুকাইয়া যাইবে এবং তাহার উপর ফোস্কা ও হইবে না।

(৬) সামান্য রকমের কর্ণের ভিতরের বেদনায় গরম গ্লিসারিনে তুলা ভিজাইয়া কর্ণে দিলে উপকার হয়।

(৭) তার্পিন তৈলের সহিত কিছু ময়দা মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে পায়ের কড়া সারিয়া যায়।

(৮) কাটা ঘায়ে আইওডিন দিলে ঘা আর বিষাক্ত হইতে পারে না এবং শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যায়।

(৯) বোলতা কামড়াইলে সেই স্থানে সামান্য ভেজা তামাক দিয়া প্রলেপ দিলে ব্যথা কমিয়া যায়। কোন কোন স্থানে জলে নীল গুলিয়া সেই জল লাগাইলেও উপকার পাওয়া যায়। কাঁকড়া বিছার কামড়ে দষ্ট স্থানে মধুর প্রলেপ দেবা মাত্রই সকল যন্ত্রণা আরোগ্য হইয়া যায়।

মধ্যপ্রদেশে যক্ষ্মা রোগ।—

কলিকাতা এবং অন্যান্য বড় বড় সহরেই যে কেবল যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তাহা নহে—মধ্য প্রদেশের অনেক স্থলেই যক্ষ্মা রোগ বড় প্রবল হইয়াছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। এ কারণ উক্ত প্রদেশের অধিবাসীরা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। মধ্য প্রদেশে যক্ষ্মা রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া রবার্টসন মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ডক্টার এস সি রায় নাগপুর—ইতবাসি লাইনের ধারে বেতুল নামক স্থানে একটী যক্ষ্মা চিকিৎসাগার বা স্যানাটোরিয়াম স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। বেতুলের জলহাওয়া খুব ভাল। যক্ষ্মা রোগ যাহাতে সুস্থ দেহে সংক্রামিত না হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে জন সাধারণকে যক্ষ্মারোগ নিবারণ সম্বন্ধে উপদেশ দিবারও চেষ্টা হইতেছে। কেবল মধ্য প্রদেশ কেন—ভারতে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব নাই এমন স্থান কোথায়? ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই এক বা একাধিক যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসাগার স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য। আর যে সকল প্রদেশে স্যানাটোরিয়ম স্থাপনের উপযুক্ত স্থান নাই কিম্বা অন্য কারণে স্যানাটোরিয়াম স্থাপন করা সম্ভব নহে সেই সকল প্রদেশের জন্য ভারতের কোন কেন্দ্রীয় স্থানে একটা নিখিল ভারতীয় যক্ষ্মাযক্ষাগার স্থাপন করিতে পারিলে ভাল হয়। এই সকল স্যানাটোরিয়ামে প্রধানত পাস্তর সাহেবের চিকিৎসা প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে ভাল হয়। আর স্যানাটোরিয়াম কোন পর্ব্বতোপরি উচ্চ স্থানে স্থাপিত হইলে এবং সেখানকার জল হাওয়া ভাল হইলে এবং বারোমাস সূর্য্যকিরণ পাওয়া গেলে রৌদ্র চিকিৎসাই সমধিক উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

জন্ম সংরোধ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ।—

আমেরিকার মিসেস মার্গারেট স্যাঙ্গারের বার্থ কণ্ট্রোল রিভিউ" বা জন্ম সংরোধ সমালোচন নামক সাময়িক পত্রে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি কৃত্রিম উপায়ে জন্ম সংরোধের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন জন্ম সংরোধ আন্দোলন একটা মস্ত বড় আন্দোলন। ইহার দ্বারা স্ত্রীলোকেরা অনিচ্ছার গর্ভধারণ করিতে বাধ্য হওয়া হইতে কিম্বা অবাঞ্ছনীয় সন্তানের জননীত্ব হইতে রক্ষা পাইবে ত বটেই তদুপরি একটা দেশের অতিরিক্ত জনগণের সংখ্যা কমাইয়া শান্তি স্থাপনে সহায়তা করিবে। ভারতবর্ষের ন্যায় ক্ষুৎপীড়িত দেশে নির্ভাবনায় অসংখ্য সন্তানের জন্ম দেওয়া তার পর তাহাদের রীতিমত প্রতিপালন করিতে না পারা একটা মস্ত বড় পাপ। ইহাতে সন্তানদের কষ্টের সীমা থাকে না সমগ্র পরিবারেরও অবস্থা হীন হইয়া পড়ে। দারিদ্র্যজনিত অসহায়তার ফলে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি নিবারিত হয় না। লোকে স্বভাবের অনুসরণ করিয়া

সন্তান প্রজনন করিতে থাকে—তাহার অপকারিতা বুঝে না। অতএব জন্ম সংরোধ আন্দোলন আবশ্যক বটে। আমরাও জন্ম সংরোধের বিরোধী নহি। কিন্তু জন্ম সংরোধের নামে ইয়োরোপ আমেরিকায় যে সব অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাহার আমরা সমর্থন করিতে পারি না। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জন্ম সংরোধ করার চেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা আর নাই সত্য কিন্তু রক্ত মাংসের ক্ষুধা (Biologic urge) সকলেরই আছে। সেই জন্য বহু কৃত্রিম গর্ভনিয়ামক যন্ত্র ও ঔষধাদির উদ্ভব হইয়াছে। এইগুলির মধ্য হইতে সাচ্চা ঝুটা বাছিয়া দেশ কাল পাত্রোপযোগী উপায় গুলি দেশহিতৈষী সুপণ্ডিত বৈদ্যগণ দ্বারা নির্নীত হইয়া যথাসম্ভব প্রচারিত হওয়া প্রযোজন।

বিদ্যালয়ের সময় পরিবর্ত্তন।—

আমরা সংবাদপত্রে দেখিলাম বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর হাই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ স্কুলের সময় দুপুর বেলা হইতে সকাল বেলায় পরিবর্ত্তন করার বিষয়ে চিকিৎসকদের মতামত লইয়াছিলেন। অধিকাংশ চিকিৎসকই সকাল বেলা স্কুল হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করায় স্কুলের কর্ত্তারা সকালে স্কুল বসাইতেছেন। সকাল বেলা স্কুল হওয়ার ব্যবস্থা আমাদের দেশের পক্ষে খুব উপযোগী। দুপুর বেলা স্কুল কলেজ হওয়া এ দেশের লোকের আচার ব্যবহারের আদৌ উপযোগী নহে। আমাদের সনাতন প্রথা অনুসারে পাঠশালা চতুষ্পাঠী প্রভৃতি শিক্ষায়তনে সকাল বেলাতেই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইয়া থাকে। দেশীয় ব্যবসায়ীদের কাজকর্ম্মও সকাল সন্ধ্যাতেই হয়। কেবল ইংরেজিওয়ালাদের কল্যাণে মাধ্যাহ্নিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মধ্যাহ্নে ছেলেদের লেখাপড়া কিম্বা সরকারী ও বেসরকারী আপিসের কেরানী বাবুদের কাজকর্ম্ম করা এ দেশের আবহাওয়া ও দেশবাসীর আচার ব্যবহারের কোন ক্রমেই উপযোগী নহে এবং হইতেও পারে না। স্কুলে ও আপিসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পৌছিবার জন্য ছেলেদের ও বাবুদের অসময়ে কোন রকমে তাড়াতাড়ি অর্দ্ধসিদ্ধ ভাত তরকারী নাকে মুখে গুঁজিয়া দৌড়াইতে হয়। খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণের অবসর তাহাদের হয় না, কাজেই ভুক্ত দ্রব্য ভালরূপ জীর্ণও হয় না। ইহার বিষময় ফলও ফলিতেছে—দেশব্যাপী অজীর্ণ রোগ অকালে দন্ত ধ্বংস প্রভৃতিও দেখা দিয়াছে। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে দুপুর বেলা কাজকর্ম্ম করা দুঃসাধ্য বলিয়া স্কুল কলেজগুলি গ্রীষ্মের দুইমাস বন্ধ রাখিতে হয়। দুর্ভাগ্য কেরাণীকুল অবশ্য এ সুবিধাটুকু পান না। ইহাতে ছাত্রদের পড়াশুনায় যে যথেষ্ট ক্ষতি হয় তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমাদের মনে হয় সকালে ও বৈকালে পড়াশুনার ব্যবস্থা থাকিলে এই দুই মাস কাল লোকসান হইত না। আমরা আশা করি বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর হাই স্কুলের দৃষ্টান্ত ক্রমে ক্রমে সকল স্কুল কলেজেই অনুসৃত হইবে।

কালাজ্বর কনফারেন্স।—

গত ২১শে নবেম্বর হইতে ২৪শে নবেম্বর পর্য্যন্ত যে কালাজ্বর কনফারেন্স বসিয়াছিল তাহার রিপোর্ট এত দিনে প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্টটিতে সাধারণের জ্ঞাতব্য অনেক কথা আছে। কলিকাতা কর্পোরেশন সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ বাঙ্গলার বহু জেলাবোর্ড এবং প্রায় দুইশত গ্রাম্য এন্টিম্যালেরিয়াল সোসাইটীর প্রতিনিধিরা কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সভায় সকল প্রধান প্রধান বক্তার বক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলি রিপোর্টে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া পীড়িত স্থানগুলির অধিবাসীরা এই রিপোর্ট হইতে কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া নিবারণের পক্ষে অনেক সহায়তা পাইতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা।—

দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল ছাত্রগণ তাহাদের স্বাস্থ্য যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে ইহা দেখা দেশবাসীর প্রধান কর্ত্তব্য। সুখের বিষয় চিকিৎসকগণের দ্বারা মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার আবশ্যকতা

দেশের লোকে ক্রমশ উপলব্ধি করিতেছেন। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের লোকেই ছাত্র স্বাস্থ্য পরীক্ষার দাবী করিতেছেন। এ দাবী যেমন সময়োপযোগী তেমনি ন্যায়সঙ্গত। পৃথিবীর যাবৎ সুসভ্য দেশেই আইন প্রণয়ন করিয়া ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাকা রকম বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এ দেশে এখন সবেমাত্র গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ হইয়াছে—আসল পালা আরম্ভ হইতে এখনও অনেক দেরী। ছাত্র স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজন ও উপযোগিতা সম্বন্ধে এখন এ দেশে মাত্র লোকমত গঠনের চেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টার ফল ফলিতে কিছু সময় লাগিবে। দেশের প্রজাদের বাপ মা আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্ট স্কুল কলেজের ছাত্রদের পড়াশুনার বিষয়ে খুব কড়া নজর রাখিয়া থাকেন। ছেলেরা কুশিক্ষা পাইতেছে কি না তাহা দেখিবার জন্য স্কুল ইনস্পেক্টর ও সবইন্স্পেক্টর বহুকাল হইতেই নিযুক্ত রহিয়াছেন। ছেলেরা পাছে যা তা বই পড়িয়া কোন রকম কুশিক্ষা পাইয়া বসে এই আশঙ্কায় স্কুল পাঠ্য পুস্তকগুলি সরকারের তত্ত্বাবধানে সরকারী টেক্সট বুক কমিটির পরামর্শে সরকারী ছাঁচে ঢালিয়া তৈয়ার করিয়া লওয়া হয়। কুশিক্ষা নিবারণের দিকে সরকারের ঝোঁক এত বেশী অথচ ছাত্রদের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে সে বিষয়ে সরকারের একটুকুও লক্ষ্য নাই—এ বিষয়ে সরকার সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। ইহা অতি বিসদৃশ ব্যাপার এবং কলঙ্কের কথাও বটে। আশা করি সরকার এ বিষয়ে অবিলম্বে কলঙ্ক মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবেন।

আমাদের ছাত্রজীবন।

ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশে ছাত্রজীবন অন্য একরকম ছিল এখন তাহার অনেকাংশে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেকালে টোলের ও পাঠশালার ছাত্রেরা সকালে ও বৈকালে বিদ্যাভ্যাস করিত। এখনও টোল পাঠশালার ছাত্রেরা বোধ হয় তাহাই করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা ইংরেজী লেখাপড়া করে তাহারা দুপুর বেলা স্কুল কলেজে গিয়া পড়াশুনা করে। ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে যাইবার জন্য তাহাদিগকে ৯টা সাড়ে ৯টার মধ্যে তাড়াতাড়ি কোন রকমে মুখে চারিটি ভাত গুঁজিয়াই বিদ্যালয়ের অভিমুখে ছুটিতে হয়। এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে প্রায়ই রীতিমত রন্ধন হইয়া উঠে না। কোন রকমে ভাতে ভাতটা তৈয়ার হইয়া উঠে মাত্র। আবার তাহাও এমন গরম যে তাহা উদরস্থ করিতে ভোক্তাদের বিলক্ষণ বেগ পাইতে হয়। আবার তাড়াতাড়ির দরুণ ভাত চর্ব্বণ করিয়া খাইবারও সময় পাওয়া যায় না। ফলে অজীর্ণ রোগ দেশব্যাপী হইয়া পড়িতেছে। দেশের আশা ভরসার স্থল বাঙ্গলার যুবক সমাজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এই কারণে অনেকে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন এবং বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসের সময় পরিবর্ত্তনের জন্য সংবাদপত্রে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। আমরা অন্তরের সহিত এই আন্দোলনের সফলতা কামনা করিতেছি। ছাত্র সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে। স্কুলের সময় পরিবর্ত্তনের আন্দোলনটিও ঠিক সময়োপযোগী হইয়াছে। পূর্ব্বকালের ন্যায় সকালে ও বৈকালে বিদ্যালয়ের কার্য্য হইলে ছাত্রেরা মধ্যাহ্নে তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার ও বিশ্রামের যথেষ্ট সময় পায়। কেবল ছাত্র সমাজ কেন বাঙ্গালী কেরাণীকুলের দুর্দ্দশা আবার আরও বেশী। তাহাদিগকে বেলা ৮টা সাড়ে আটটার মধ্যেই কোনরকমে দুইটা ভাত মুখে দিয়া আপিসে দৌড়াইতে হয়। ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের দুর্দ্দশার বর্ণনা ত লেখনীর মুখে আসেই না। এই সকল বিকৃত নিয়মের পরিবর্ত্তন হওয়া অতীব আবশ্যক। নতুবা বাঙ্গালী জাতিটা ধ্বংস হইয়া যায়।